নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৯

মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০

সম্পাদনা

আশা দেবী

অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন : গৌতম রায়

মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা

"সাগরিক" রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডের প্রথম গ্রন্থ। এই উপন্যাস যেন অনেকটা ডাইরী। লেখক নিজেই বলেছেন, সমুদ্রতীরের কয়েকটা দিনের সঞ্চয়।

সমুদ্রের অশ্রান্ত গর্জনটা কিছুতেই থামে না। বিশ্রী লাগে, ঘুম আসে না। নানা কথা মনে ভিড় করে।

হাটখোলার সেই পুরনো মেসবাড়ি। ছাত্রজীবনের বহু সুখদুঃখের স্মৃতিবিজড়িত ছেষট্টি নম্বরের বাড়ি। মামা-ভাগ্নের হোটেল। ভাগ্নে ভবতোষ মুখুজ্যে কিচেন ডিপার্টমেণ্ট ইনচার্জ—পরিবেশন হয় মাছ, ডাল, লটপটি, ডিমের লবঙ্গলতিকা, মাংসের মনোমোহিনী, হিসেব লেখে সে। এই সমস্ত চিত্রই লেখকের মনে ভিড় করে।

সাগরিকের ডাইরীর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে ঘটনা থেকে ঘটনার প্রবাহ, মানুষ থেকে মানুষের মনোরাজ্যের আরণ্য বৈচিত্র্য। সুধীশ, তপতী, ইরা, রামকুমার এরা সবাই ডাইরীর রঙ্গমঞ্চ থেকে অকস্মাৎ বিদায় নিয়েছে।

দু বছর পরে ইরার চিঠিতে যে আনন্দবার্তা ছিল তার সঙ্গে ছিল দক্ষিণ ভারতের একটা হোটেলে কলকাতার বিশিষ্ট হার্ডওয়ার মার্চেণ্ট চাটুজ্যে নিজের রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে।

ডায়েরী ধরনে গ্রথিত হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাস পড়া শেষ হলে একটি করুণ মধুর সুরের রেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাঠকের মনে ছড়িয়ে থাকে।

"উপনিবেশ" উপন্যাসের প্রথম দুই পর্ব যথাক্রমে রচনাবলীর ১ম ও ২য় খণ্ডে গেছে। বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় পর্বেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

চর ইস্‌মাইলের বর্বর জীবনের ওপর যেন নেমেছে স্তিমিত আর নিরুত্তেজ সভ্যতা।

দশ বছর বয়েস বেড়েছে বলরাম ভিষকরত্নের। টাকের আশেপাশে স্বল্পাবশিষ্ট চুল-গুলোয় সাদা রঙ ধরেছে। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে—মুখে বয়সের ভাঁজ পড়েছে। পোস্ট-মাস্টারকে তিনি সত্যিই ভালবেসেছিলেন। কালো কুৎসিত চেহারার মানুষটা, জিলজিলে বুকের চামড়ার নিচে হাড়গুলো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঁকি মারে, হাতে গলায় একরাশ তাবিজ, হাঁপানির টান উঠলে মুমূর্ষু কাতলার মতো 'হাঁ' করে খাবি খায়। কত দেশই ঘুরেছে আর কত গল্পই না সে করতে পারে।

আর মুক্তো? ঝড়ের রাতে অবাঞ্ছিত সন্তান নিয়ে সে উধাও। শুধু বিষাক্ত স্মৃতিই এখন তার একমাত্র উপহার।

চর ইস্‌মাইলের ওপর বলরামের আকর্ষণ নেই। যদি কখনও নিজের ইচ্ছা হয় তিনি

ফিরবেন। নইলে এখানেই শেষ। মুক্তোকে তিনি ফিরে পেয়েছেন। সব অভাব পূর্ণ হয়ে গেছে তাঁর।

চর ইস্‌মাইলে দুরন্ত যৌবন জেগেছে। নতুন কালের,—নতুন রূপে রূপসী সে। এর কাছ থেকে মণিমোহনও পালাতে চায়। মণিমোহন-বলরামরা এর বিচিত্র বিপুল সংঘাতকে সহ্য করতে পারে না।

সেদিন হয়তো দূরে নয়—যেদিন এখান থেকে নিজেকে প্রকাশিত করবে বাংলার গণ-শক্তি—বাংলার প্রচণ্ড ও বিপুল প্রাণশক্তির আদি মন্ত্র।

"সূর্যসারথি" উপন্যাসের পটভূমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলকাতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের করাল ছায়া নামল শহরে। ভয়, আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার কালো হাত রূঢ় আঘাত হানল মানুষের মনে। মাটির তলা থেকে রাশি রাশি নাগিনীর মতো মাথা তুললো স্বার্থপরতা, ভীরুতা ও দীনতা।

অন্য দিকে ডুয়ার্সের চা-বাগান। এই যুদ্ধের পরিবেশে সেখানে মাথা তুললো নবযুগের বিদ্রোহী শূদ্র শক্তি। জেগে উঠল যুগযুগান্তরের পুঞ্জীভূত অত্যাচারের অবসান ঘটাবার জন্য। নির্যাতিত শক্তি দৃঢ় মুষ্টিতে আঘাত হানল,রক্তে রক্তে লাল হয়ে উঠলো কালীঝোরার জল। সেই জলে সবার রক্তের সঙ্গে মিশে গেল রবার্টের রক্ত।

অন্ধকার শপথ নিল সে সুদিনের আলোর স্বপ্ন ফিরিয়ে আনবে। দুর্দিন দূর থেকে দূরে সরে যাবে। সরে যাবে অপঘাতের অপচ্ছায়া। মৃত্যু নয়। এ ভয় ক্ষণিকের। মাথার ওপর দিয়ে কর্কশ ধ্বনিতে বিমান উড়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ স্বুদ্ধ গণতন্ত্রের জন্যে—স্বাধীনতার জন্যে। ভারতের শৃঙ্খলিত বুকের উপর ট্যাঙ্কের চাকা কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। না, যুদ্ধ নয়। যুদ্ধ আমরা চাই না।

উজ্জ্বল নীলকান্ত মণির মতো তীব্র দৃষ্টিতে সন্ধ্যার কালো আকাশের দিকে তাকালো আদিত্য। মৃত সৈনিকের চোখে উষার স্বপ্ন। কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্গশিখর থেকে সাগর-প্রান্তের কলকাতা পর্যন্ত—আসমুদ্রহিমাচল সূর্যসারথির রথচক্রের নির্ঘোষে মন্দ্রিত।

"শিলালিপি"র নায়ক রঞ্জু বা রঞ্জন লেখকের একটি অসামান্য চরিত্রসৃষ্টির নিদর্শন। ইস্কুল-পালানোর সুবুদ্ধি রঞ্জুর মাথায় প্রথম দিয়েছিল বাদল। ওরা স্কুল পালিয়ে খরগোশ ধরতে গিয়েছিল। তারপর বনবাদাড় চণ্ডীবাড়ি পেরিয়ে তার পা আর ওঠে না। দুর্গা-পুজোর সময় পুজোর চালি তোলা হয়। তারপর সারাটা বছর পড়ে থাকে অনাদৃত হয়ে। শেয়াল কুকুরের আবাস হয়ে। চণ্ডীতলায় ঢুকতে রঞ্জুর পা ওঠে না। খরগোশ মারতে গিয়ে যদি ব্রহ্মদৈত্যের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

তারপর আতরাই-এর বান, অবিনাশবাবুর গলার স্বরে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের উদাত্ত কণ্ঠ,—সবই যেন ছোটবেলার স্মৃতির মণিকোঠায় হীরেমাণিক্যের সঞ্চয়।

বিপ্লব—স্বাধীনতা সংগ্রাম—দেশ, সঙ্গে সঙ্গে আসে প্রেম। সীতা পথচলা লতার মতো পায়ে জড়িয়ে ধরে। পথ চলতে গেলে অমন তো কতই জড়িয়ে ধরে, তাদের ছিঁড়ে ফেলে এগিয়ে চলবার নামই জীবন। ডাকছে জনগণ। কর্মবহুল পৃথিবী। কতদিন সে দেশের রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। সে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে—সময় নেই আর। ফিরতে পারবে না, পারবে না পেছনের জীবনের দিকে তাকাতে। দেশ জুড়ে চলেছে জন-জগন্নাথের জয়রথ। কালের যাত্রা। সেই রথযাত্রার ভিড় তাদের ঠেলে নিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে তারই আদর্শ আর ব্রতরক্ষার নির্ভুল লক্ষ্যে।

সীতা ভুলে যাবে—মিতা প্রতীক্ষা করে থাকবে। সীতার মধ্যে উষার পুনরাবির্ভাব দেখেছিল সে—মিতার দৃষ্টিপ্রদীপে আজ সূর্যমুখীর তপস্যা। দুরূহ পথে নিত্য সহ-চারিণী সে।

সীতা আজ মৃত অতীত হয়ে পড়ে রইল কবি রঞ্জুর গীতিকবিতার খাতায়। আর ওই আগুনের পথে মিতা তাকে ডাক দিয়েছে—, তার ডাক অনির্বাণ বিপ্লবের রংমশাল।

এই খণ্ডে "শিলালিপি"র প্রথম অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত হল।

"ভোগবতী"র গল্পগুলোর সৌন্দর্য তার অসাধারণ বক্তব্যে। গল্পগুলো পড়লে সহজে ভোলা যায় না। কালাবদরের "টোপ" যেমন সুবিপুল সঙ্গীতের মতো—গান থামে, সুর থামে কিন্তু সুরের রেশ শ্রোতাকে আচ্ছন্ন করে রাখে—ভোগবতীর গল্পগুলোরও সেই গুণ আছে। বনতুলসী, ভোগবতী, ধন্বন্তরী, ইতিহাস, একটি শত্রুর কাহিনী, প্র্যাকটিস, ডিনার প্রভৃতি গল্প পাঠ-শেষের পরও পাঠকের মনের মধ্যে নতুন করে অনুরণন সৃষ্টি করে। সব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরই বোধ হয় ধর্ম এটি। তাঁর "ইতিহাস" গল্প শুধু যে পুরস্কারে ধন্য বা তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে সর্বাধিক ভোট পেয়েছিলেন তাই নয়, শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র দেব এবং শ্রদ্ধেয়া রাধারাণী দেবী গল্পটি হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে এটি যে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পাবে তা তাঁরা আগেই ধরে নিয়েছিলেন।

আশা দেবী

অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

না—র—তম্ন

সাগরিক

সমুদ্রতীরের কয়েকটি দিনের সঞ্চয় এই 'সাগরিক'।

এই সামান্য ক'টি দিন একটি দীর্ঘ সরল রেখায় টানা। যে সমস্ত মানুষগুলো এর মধ্যে এসেছে গেছে, তারা অনেকেই হয়তো এক একটি পরিপূর্ণ কাহিনীর ভূমিকা। কিন্তু সে পরিপূর্ণতার রূপ অনুমান করা আমার অধিকারের বাইরে, কারণ প্রবাসের দিনলিপির আরম্ভ যেমন আকস্মিক, তার সমাপ্তিও তেমনি অর্ধপথে। 'সাগরিক' পড়তে গিয়ে লেখককে কেউ অপরাধী না করেন, সেইজন্যেই গোড়াতে এই কৈফিয়ৎ।

—লেখক

এক

কাল সমস্ত রাত ওই বিরাট হিংস্র জন্তুটার ডাক শুনেছি।

অস্বস্তি লাগছিল, ঘুম আসছিল না। পাশের টেবিলটার ওপর আমার রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িটা জ্বলজ্বল করছিল একটা সবুজ চোখের মতো;—যতবার পাশ ফিরেছি ওইটে যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমায় লক্ষ্য করেছে। বাইরে সারারাত দাপাদাপি করেছে দামাল বাতাস, বাড়িটার কোথায় একটা ভাঙা জানালার পাল্লা ককিয়ে উঠেছে পেত্নীর কান্নার মতো—এক একবার ইচ্ছে করছিল উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

কিন্তু ঘুম আসেনি। কাল সারারাত আমার ঘুম এল না।

পুরনো ইনসমনিয়া—মাঝে মাঝে এমন হয়। কিন্তু এ তো কলকাতার রাত নয়। বালিশ উলটেপালটে নানারকম শোবার কসরৎ। শাদা ভেড়া গুণে গুণে শেষ পর্যন্ত হয়রান হয়ে আশা ছেড়ে দেওয়া। পৃথিবীর সম্ভব অসম্ভব যত চিন্তা মগজের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়ানো। কাল কলেজে ফার্স্ট পিরিয়ডে একটা নোট দেবার কথা আছে সেটা তৈরি হয়নি। বার্নার্ড শ'র পানিশমেণ্ট সম্বন্ধে বইটা কি খুব সিরিয়াসলি লেখা? 'ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা'—আচ্ছা, বিহঙ্গ বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝেছেন বাস্তবিক? ভালো কথা, অনেক দিন রমেশের কোনো খবর পাইনি। ভবানীপুরে একবার যাওয়া দরকার, কিন্তু ট্রাম-বাসে যা মারাত্মক ভিড়! ট্রাম কোম্পানির কত লক্ষ টাকা মুনাফা হয় বছরে? রেবা মেয়েটার বোধ হয় বিয়ে হয়ে গেছে এতদিনে—বছর কয়েক আগে দিন সাতেকের জন্যে ওর প্রেমে পড়েছিলাম। একটা জুতোর কালি কাল কিনতেই হবে—এক সপ্তাহ ধরে রোজ ভুলেই যাই। ওই যাঃ—আজ তো রেশন আনানো হল না, কাল আবার দিলে হয়। চালে যা কাঁকর—নাঃ, কলকাতা ছেড়ে পালাতেই হল আবার।

ঘুম আসে না, উঠে বসি। ঢক ঢক করে আধ কুঁজো জল খেয়ে বেরিয়ে আসি ঘর থেকে, একটা সিগারেট ধরিয়ে দাঁড়াই বারান্দায়। কলকাতার আকাশটাকে এই রাত্রে আশ্চর্য বিশাল বলে মনে হয়—এখানেও যে এত রাশি রাশি জ্বলজ্বলে তারা আছে—এত পরিচ্ছন্ন, এত অপর্যাপ্ত—এই রাত্রে তা যেন নতুন করে আবিষ্কার করি। কাদের ফুলদানিতে জিয়োনো রজনীগন্ধার একটা হালকা গন্ধ আসে বাতাসে। রাস্তার ওপর কার জুতোর শব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যায়—রাত্রির নিঃসঙ্গ তমসায় ওই শব্দটা ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে বোধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ ধরে।

কিন্তু এ কলকাতার রাত্রি নয়।

সে বিচিত্র শব্দময় পরিবেশ নয়—সব কিছু মিলিয়ে একটা আশ্চর্য বিশ্রাম আর

বৈরাগ্যের কোনো ব্যঞ্জনা নেই এখানে। মাঝে মাঝে প্রকৃতির আস্বাদের জন্যে মনটা ক্লান্ত হয়ে ওঠে কলকাতায়, মনে হয় ফুসফুস ভরে নেবার মতো যথেষ্ট বাতাস নেই কোথাও—যা আছে তা সংখ্যাতীত ব্যাকৃটিরিয়ায় বিষাক্ত। ঘুরন্ত পাখাটা থেকে 'লু'য়ের মতো তপ্ত বাতাস ছড়িয়ে পড়ে। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন—'

এখানে বাতাস অফুরন্ত, অবারণ বাতাস। গলি-ঘুঁজির মধ্য দিয়ে, ডাস্টবিনের গন্ধ বয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে, এক একটা আকস্মিক ঝলকে আসে না এখানে। এ বাতাস আসছে দিক্‌চিহ্নহীন দিগন্ত পার হয়ে—সপ্ত-সমুদ্রের নোনা ঢেউয়ের সঙ্গে মাতামাতি করে। কোনো দূর হিমানীশুভ্র মেরুর বুকে, পেঁজা তুলোর মতো তুষার নিয়ে খেলা করছে, নেচে নেচে ফিরেছে আইস্‌বার্গের চূড়োয় চূড়োয়। কোনো গ্র্যানাইট্ উপকূলে ঢেউয়ের সঙ্গে গিয়ে আর্তনাদের মতো আছড়ে পড়েছে, হাজার হাজার টন মুক্তোর রেণুর মতো, ফেনার হাসি ঠিকরে উঠছে আকাশের দিকে। মর্মর জাগিয়েছে প্রবাল দ্বীপের কোনো নারিকেল কুঞ্জের পত্রপল্লবে—প্রথম প্রেমের রোমাঞ্চ জাগিয়েছে কোনো নির্জন লেগুনের স্তব্ধ বিষণ্ণতায়। হঠাৎ ঝড়ের আনন্দে দুলে দুলে উঠেছে কোনো ফিয়র্ডের গিরি-সঙ্কটে, তিমিশিকারী জাহাজের পালে লাগিয়েছে ঊনপঞ্চাশ পবনের বেগ। অরণ্যময় আফ্রিকার কোনো নির্জন উপকূলে আঙুল বুলিয়ে এসেছে গরিলার রোমশতায়—উচ্চকিত সিংহের স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছে দিয়েছে কোনো অসতর্ক হরিণের ঘ্রাণ ; বিষাক্ত হয়ে উঠেছে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কোনো ঘন অরণ্যছায়ায় নরখাদকদের মানুষ পোড়ানোর কটুগন্ধে। দ্বীপময় ভারতের কোনো নির্জন গিরিপীঠে যেখানে শিলাঙ্কিত বোরোবুদুর কাল-কালান্তের ধ্যানে নিস্তব্ধ সমাসীন হয়ে আছে, সেখানে গিয়ে জানিয়েছে ভক্তিবিনম্র প্রণাম ; বালী দ্বীপের কোনো ভাঙা মন্দিরের পাষাণ ভিত্তিতে ভিত্তিতে ফেলেছে অতীত হিন্দুসভ্যতার বেদনার্ত দীর্ঘশ্বাস, দারচিনি-লবঙ্গের গন্ধ কেড়ে নিয়ে মাতামাতি করেছে অনেকক্ষণ, তার পর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সোয়ার হয়ে এইমাত্র আমার জানালায় এসে পৌঁছেছে।

কাল সমস্ত রাত্রি অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ করেছি আমি—রেডিয়াম ডায়ালটার সবুজ আলো সমস্ত রাত যেন আমাকে ব্যঙ্গ করেছে। শেষে আর থাকতে পারিনি—উঠে গিয়ে ঘড়িটার ওপর একটা রুমাল চাপা দিয়ে দিলাম। আমার এই রাত্রিজাগরণ, এই অসহায় মুহূর্ত-মন্থনের কোনো সাক্ষী থাকবে—এ যেন সহ্য করা অসম্ভব।

নিজেকে এমন আশ্চর্যভাবে অসহায় বলে মনে হয়েছে। এত বাতাস—দিক্‌চিহ্নহীন দিগন্তের পরপার থেকে বয়ে আনা এই অজস্র অপর্যাপ্ত বাতাস। যেন ভাসিয়ে নেয়—যেন তলিয়ে দেয় নিজেকে! মনে হয় আমি কোথাও নেই—এই নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে যেন হারিয়ে যাচ্ছি নিশ্চিহ্ন হয়ে—নিঃসত্তা হয়ে। হঠাৎ একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে। নিজের

ব্যক্তিত্ব নিয়ে—নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন আর প্রত্যয়শীল থেকে—কতটুকু জায়গা জুড়ে আছি আমি, বেঁচে আছি আমার কতটুকু গণ্ডির মধ্যে? এই সপ্ত সমুদ্র পার হয়ে আসা বাতাস—যা এই মুহূর্তে অসংখ্য আত্মবিকলনে জর্জরিত আমার এই সত্তাকে স্পর্শ করে যাচ্ছে, আমার মন থেকেও কি সে নিতে পারছে কোনো সমুদ্রের শীকরকণাকে, কোনো দারচিনি-লবঙ্গের ঘ্রাণকে? ফুলের বুক থেকে গন্ধ ছিনিয়ে নেওয়ার মতো এই বাতাস যদি আমার মনটাকে কেড়ে নিতে পারত—বয়ে নিয়ে যেতে পারত তার দিগন্তচারী পাখায় পাখায়! আঃ—কত সহজ হয়ে যেত—কত লাঘব হয়ে যেত মনের ভেতরকার রাশি রাশি বোঝা—যে বোঝা বয়ে প্রতিদিন আমি ক্লান্তি-শিথিল পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছি!

কিন্তু ভয় করে। সত্যিই যদি তাই হয়? সত্যিই যদি এ বাতাস এমন করে কেড়ে নিয়ে যায় আমাকে? কতটুকু থাকব আমি—কী আমার অবশিষ্ট থাকবে তা হলে? একেবারে ফুরিয়ে যাব—একেবারে মিলিয়ে যাব—সমস্ত বোধের অতীতে, যা কিছু অনুভূতির ওপারে। নির্বাণ—'অ্যানাহিলেশন!' আমি নেই, আমার সত্তা নেই, আমার অনুভূতি নেই—একথা ভাবতে ভালো লাগে; কিন্তু সত্যিই যদি আমি না থাকি—যদি ওই শূন্য দিগন্তে সব কিছু হারিয়ে মুছে যাই ফুলের গন্ধের মতো—তা হলে? তা হলে সে অবস্থাটা যেন কল্পনাও করা যায় না।

আমি থাকব না, অথচ পৃথিবী থাকবে; আমি নিঃসত্তা হয়ে যাব—তবু ফুটবে সহস্রদল সূর্যের সূর্যমুখী, জ্যোৎস্নার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবে চন্দ্রের চন্দ্রমল্লিকা—ভাবতেও কেমন একটা ক্ষিপ্ত হিংসা অনুভব করি যেন!

বাইরে হিংস্র জন্তুটা সমানে দাপাদাপি করে চলেছে। কাল সকালে ওর সঙ্গে পরিচয় হবে—যখন ওর ওপর দিয়ে দেখা দেবে রূপকথার মতো হিরণ্যদ্যুতি। তখন হয়তো ওর দিকে তাকিয়ে আমার চোখে পলক পড়বে না, মনে হবে এমন রঙের খেয়ালখুশি আমি জীবনে কোনো দিন দেখিনি।

কিন্তু আজ রাত্রে ও অপরিচিত—ও ভয়ঙ্কর! হার্পুন-বেঁধা লক্ষ লক্ষ তিমির মতো ও যেন এখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে, ওর কষ বেয়ে ফেনা নামছে (তিমির কষে কি ফেনা গড়ায় কখনো?), অন্তিম আক্ষেপে মারছে অতিকায় লেজের ঝাপট, আর শোঁ শোঁ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। জানালা দিয়ে তাকালে এখনি অবশ্য ওকে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমি তাকাবো না। আমার ভয় করে, আমার সাহস নেই।

শোঁ—শোঁ—শোঁ—

সেই ভাঙা কব্জাটা পেত্নীর কান্নার মতো কঁকিয়ে উঠছে। জানালা দিয়ে খানিক বালির ঝাপটা এসে চোখে মুখে একটা করকরে ছোঁয়াচ দিলে, যেন শীতে-ফাটা একখানা হাত

মুখের ওপর আলতোভাবে বুলিয়ে গেল কেউ। বিছানাটা বালিতে একেবারে ভরে গেছে, একটুখানি ঝেড়ে নিলে হত। কিন্তু ওঠবার উৎসাহ নেই, শক্তিও নেই যেন!

শীতে-ফাটা একখানা করকরে হাত! হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

হাটখোলার সেই পুরনো মেসবাড়ি! ছাত্রজীবনের বহু দুঃখের সঙ্গে জড়ানো—ছেষট্টি নম্বরের বাড়ি। নিচে যতীন বাঁড়ুয্যের পাইস হোটেল। ভাগ্নে ভবতোষ মুখুয্যে কিচেন্ ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ—অর্থাৎ রান্নাবান্না পরিবেশন ইত্যাদি করে থাকে। আর মামা যতীন বাঁড়ুয্যে ম্যানেজারী করে, অর্থাৎ কাঠের বাক্সে খাতা রেখে নম্বরে নম্বরে বিতরিত ভাত-ডাল-লটপটি ডিমের লবঙ্গ-লতিকা আর মাংসের মন-মোহিনীর হিসেব লেখে। আর কলতলায় ঘষাঘষ বাসন মাজে মাঝবয়েসী ঝি প্রফুল্লনলিনী।

মামা-ভাগ্নে এমনিতে বেশ আছে, কিন্তু রাত্রে বদলায় দুজনের মূর্তি। দুজনের সাধনার মার্গ আলাদা—মামা গাঁজা টেনে ব্যোমারোহী হয়—ভাগ্নে বোতল টেনে তলিয়ে যায় অতলে। তারপরেই বিতর্ক শুরু হয় প্রফুল্লনলিনী সত্যি সত্যিই কাকে ভালোবাসে। মাঝে মাঝে সে তর্কের মাত্রাটা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছোয় যে আমাদের কখনো-সখনো গিয়ে তার নিষ্পত্তি ঘটিয়ে দিতে হয়। পরদিন সকালে দেখা যায় কপালে ফ্যাটা বেঁধে ভবতোষ মাছের লটপটি রাঁধছে আর স্ফীত নাকে এবং একটা বুজে-যাওয়া চোখে খাতায় হিসেব লিখে চলেছে যতীন।

বলা বাহুল্য খুব হাসাহাসি করতাম আমরা। প্রফুল্লনলিনীর রূপতত্ত্ব নিয়ে সকৌতুক গবেষণাও নেহাৎ কম হয়নি।

সেবার পুজোর ছুটিতে মেস ফাঁকা—দু'একজন ছাড়া একেবারে খালি। হঠাৎ জ্বরে পড়লাম।

প্রবল জ্বর—কয়েকটা দিন কেটেছিল অঘোর অচৈতন্যের মতো। মেসের দু'চারজন মাঝে মাঝে কাছে এসে বসতেন—কিন্তু তাঁদের সময় ছিল না। আর প্রায়ই কপালের ওপর অনুভব করতাম একখানা ফাটা ফাটা করকরে হাত—সে হাতের ছোঁয়ায় জ্বরের জ্বালা যেন জুড়িয়ে যেত আমার। টের পেতাম সেই ফাটা কর্কশ হাতখানাই আমার মুখে বার্লির বাটি তুলে ধরেছে।

ভালো হয়ে উঠলাম। কিন্তু যে মুহূর্তেই পরিপূর্ণ সজ্ঞান চোখ মেলে তাকাতে পারলাম, সেই মুহূর্তেই ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল প্রফুল্লনলিনী। আমার মতো ভদ্রলোকের কাছে তার অধিকারের সীমা ওই পর্যন্তই। নিজের পায়ে ভর দিয়ে আমার পরিপূর্ণ ভব্যতা ও রুচিবোধের মধ্যে যখনি আমি দাঁড়িয়ে উঠতে পারব, তখনি সে আমার অস্পৃশ্য। তাকে আমি ঘৃণা করব, কুৎসিত রসিকতা করব তাকে নিয়ে।

এখন মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখেছিলাম। চোখে কী দেখেছি মনে নেই, কিন্তু স্নায়ুতে

জড়িয়ে আছে সে অনুভূতির রণন। আজ এই রাত্রে—এই আশ্চর্য অস্বস্তিকর রাত্রে সেই অনুভবটাকে যেন মনে পড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোথায় যেন ভয়ঙ্কর অবিচার করে ফেলেছি একটা—করে ফেলেছি অন্যায়, অর্থহীন আত্মবঞ্চনা।…

আঃ—বাইরে ওই অশ্রান্ত গর্জনটা কি কিছুতেই থামবে না? কী বিশ্রী লাগছে এই রাত্রে—এই অন্ধকারে! হঠাৎ একটা অবাঞ্ছিত অসম্ভব ভাবনা বুকের মধ্য দিয়ে ভয়ের খানিকটা শীতল শিহরণ বইয়ে দিয়ে গেল। পৃথিবী ঘুমুচ্ছে—শিথিল, অসতর্ক পৃথিবী। এই রাত্রে তার জাগ্রত চোখ অলস ক্লান্তিতে মুদিত হয়ে এসেছে যখন, তখন শেষের সেদিন ভয়ঙ্করের মতো হঠাৎ নিজের সমস্ত বাধা-বন্ধন ভেঙে, ও কি ছুটে আসতে পারে না, বইয়ে দিতে পারে না একটা ভয়ানক মৃত্যুর প্লাবন? জাপান-সমুদ্র থেকে যেমন করে ধ্বংসের কোন রূপ নিয়ে টাইফুন ছুটে আসে—তেমনি করে?

বিলিতী কাগজে একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম কিছুদিন আগে। দক্ষিণ-মেরুর ওপরে যেখানে দশ হাজার ফুট উঁচু হয়ে তুষারের চাদর ছড়িয়ে আছে, সুদূর ভবিষ্যতে একদিন হয়তো সেই তুষার গলে যাবে। তার তলা থেকে বেরিয়ে আসবে—লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার পৃথিবী—যে পৃথিবীতে শিলীভূত হয়ে আছে ডাইনোসর, ব্রণ্টোসর, মহাকায় ডিপ্লোডোকাস, আর ইগুয়ানোডোনের কঙ্কাল; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টন জল ঝাঁপিয়ে পড়বে দক্ষিণ-সাগরে—বাইবেলের আদিম বন্যার মতো আবার মানুষকে গ্রাস করতে আসবে কালান্তক জলোচ্ছ্বাস।

কিন্তু সে কত বছর পরে? অথবা আজ—এই মুহূর্তেই? তারপর?

আমি—আমিত্ব—আমরা। সপ্ত সমুদ্রের দোলায় দোলায় মিলিয়ে যাব চিহ্নহীন শূন্যতায়—প্রসারিত হয়ে যাব সীমানাহীন মহাপৃথিবীর উত্তর সাগর থেকে সেই দক্ষিণ-সমুদ্র পর্যন্ত। তারপর একদিন ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে আমাদের শাদা শাদা হাড়গুলোকে বয়ে নিয়ে যাবে—বয়ে নিয়ে যাবে সূর্যালোকিত কোনো প্রবাল দ্বীপে। সেই প্রবাল বলয়ে আমরা নতুন করে মিলে যাব, নবজন্ম হবে আমাদের; আমাদের দেহাবশেষের ওপর জাগবে কোনো নতুন নারিকেল-বীথি, কোনো নতুন নীল-শ্যামলের পরিপূর্ণতা—

—বাবু, বাবু!

আচ্ছন্নতা কেটে গেল। দরজায় ঘা পড়েছে। প্রায় আর্তনাদের মতো আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, কে?

—ভোর হয়ে আসছে বাবু। সাগরে সূর্য ওঠা দেখবেন বলেছিলেন না?—বাইরে থেকে হোটেলের চাকর জবাব দিলে।

—আসছি—আড়ষ্ট গলায় জবাব দিলাম আমি। একটা বিনিদ্র রাত্রির অবসানে নতুন করে দেখব সমুদ্রকে। দেখব রাত্রে যে অত ভয়ঙ্কর, দিনের আলোয় তার রূপ কী রকম, কী

আশ্চর্য কুহক আছে তার!

একটা গেঞ্জি পরে, পায়ে চটি টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

রাত্রির আচ্ছন্নতা কেটে গেছে। এখন জেগে উঠেছি একটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে। রাত্রের ভাবনাগুলোকে এখন যেন মনে হচ্ছে খানিকটা অসুস্থ মস্তিষ্কের প্রলাপ। দক্ষিণ-সমুদ্র এখনো দক্ষিণেই থাক; গ্রেট আইস ব্যারিয়ারের বরফ গলবে—হয়তো লক্ষ বছর দেরি আছে এখনো।

এমনিই হয়। ইন্‌সমৃনিয়ার রাত্রিতে আমার মধ্য থেকে যেন একটা দ্বিতীয় সত্তা জেগে ওঠে। নিজেকে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করতে চাই—অবাস্তব কল্পনায় সমস্ত চেতনা তার নিশানা হারিয়ে ফেলে। সপ্ত-সমুদ্রের সুদূর স্বপ্ন কোন্ দিগন্তে মিলিয়ে গেছে এখন।

সামনে আমার পুরীর সমুদ্র। কাল রাত্রের ট্রেনে যখন পৌঁছেছি তখন একে ভালো করে দেখতে পাইনি। শুধু অন্ধকারে মনে হয়েছিল দৃষ্টির সামনে একটা বিরাট হিংস্র জানোয়ার, অন্ধ আক্রোশে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। তারই প্রতিক্রিয়া গেছে কাল রাত্রের বিনিদ্র প্রহরগুলোতে।

জলসিক্ত খানিকটা বাতাসের ছাট্ চোখে-মুখে এসে লাগতে স্নায়ুর আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলাম সমুদ্রকে। এখনও সকাল আসেনি—ভোরের আবছা আলোয় নীল-কালোয় মেশানো আদিগন্ত জল ফেনায় ফেনায় ফেটে পড়ছে। ক্লান্ত মাথাটা যেন জুড়িয়ে যেতে লাগল।

চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি সী-বীচ তখনো জেগে ওঠেনি। এখনো শুরু হয়নি স্বাস্থ্যকামীদের ভিড়। দূরে দূরে দুটি-একটি মানুষ চোখে পড়ছে; আর কতকগুলি কালো ছেলে বালির ওপর যেখানে শুভ্র ফেনার বিসর্পিল রেখা রেখে রোলারগুলো ফিরে যাচ্ছে, সেইখানে ছুটোছুটি করে কী কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে, খুব সম্ভব ঝিনুক আর নুড়ি।

হঠাৎ ইচ্ছে করল, আমিও নুড়ি কুড়োই—ঝিনুক সংগ্রহ করি। বালি ভেঙে ভেঙে নেমে এলাম জলের কাছে, কুড়োতে আরম্ভ করলাম।

কত রকমের ছোট বড় ঝিনুক! একমুঠো হাতে করে তুলে নিতেই যেন মন ভরে গেল আমার। ছোট ছোট ঝিনুক আর শামুকের খোলার কত রকম রঙ—কত আশ্চর্য কারু-কাজ! যেন কোনো রূপদক্ষের সীমাহীন সাধনা দিয়ে এদের রচনা। অপূর্ব রেখাবিন্যাস, অপূর্ব রঙের খামখেয়ালি।

কুড়িয়ে চলেছি। দুটো কড়ি পেলাম—একটা পরিচিত জিনিস আবিষ্কারের আনন্দে মন ভরে উঠেছে। মস্ত একটা ফুলের মতো এটা কী পড়ে আছে? ওঃ, চিনেছি, স্টার ফিশ্। ছেলেমানুষি কৌতূহলে তুলে নিলাম সেটাকেও। একটা আঁশ্‌টে গন্ধ নাকে এল

—তা হোক, তা হোক !

কোঁচড়টা কখন ভরে উঠেছে টের পাইনি। কখন যে সমুদ্রের ধারে একটি দুটি করে মানুষ জড়ো হচ্ছে তাও জানতে পাইনি। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হল। কোথা থেকে প্রচণ্ড একটা জলের উচ্ছ্বাস এসে আমার কোমর পর্যন্ত ভাসিয়ে দিয়ে গেল, পড়তে পড়তে সামলে নিলাম।

এ কী বিশ্বাসঘাতকতা ! এমন তো কথা ছিল না !

বোকামির ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠবার আগেই আর একটা ঢেউ এসে তেম্‌নি আছড়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম একটা সকৌতুক হাসির শব্দ।

—উঠে আসুন, উঠে আসুন, নইলে একদম ভিজিয়ে দেবে।

তাকিয়ে দেখি বছর ত্রিশেক বয়সের একটি ভদ্রলোক। একটু দূরে বালির ডাঙার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। চশমার আড়ালে দুটি উৎসুক প্রসন্ন চোখ ঝকমক করছে ; খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরা, খালি পা, হাতে একটা বৃহদাকার ছড়ি—প্রায় লাঠি বললেও চলে।

ভদ্রলোক বললেন, উঠে আসুন। এখন জোয়ার আসছে কিনা, ঢেউ ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।

অদূরে একটা ব্রেকারের বিপুল মূর্তি দেখে তাঁর কথাটার সত্যতা বুঝতে আমার দেরি হল না। তৎক্ষণাৎ বালির ডাঙাটার ওপর লাফিয়ে উঠে পড়লাম, এসে দাঁড়ালাম তাঁর পাশটিতে।

অপ্রতিভের মতো হেসে বললাম, এঃ—একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছে।

—ও কিছু না, হাল্‌কা জল, সমুদ্রের বাতাসে এখুনি শুকিয়ে যাবে।—ভদ্রলোক হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমার দিকে তাকালেন : ঝিনুক কুড়োচ্ছিলেন বুঝি ?

আমি মাথা নাড়লাম।

—ও আর কত কুড়োবেন। এ রত্নাকর—এর ভাণ্ডার অফুরন্ত। তার চেয়ে চলুন—সমুদ্রের ধার দিয়ে বেড়িয়ে আসা যাক। একেবারে চক্রতীর্থ পর্যন্ত। আপত্তি আছে ?

বললাম, না না, আপত্তি আর কিসের ! চলুন।

ভদ্রলোকের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যে এক কথায় পরিচয় হয়ে যেতে দেরি হয় না। কলকাতার অভ্যস্ত আত্মকেন্দ্রিকতা নেই এখানে, নিজেকে ছাড়িয়েও চারদিকে চোখ মেলে দেখবার মতো বিস্তীর্ণ হয়ে আছে অফুরন্ত অবকাশ। অকারণে বেড়ানো চলে, গায়ে পড়ে কেউ আলাপ করতে চাইলেও বিরক্তি লাগে না। আমারও লাগল না।

বালির ওপর দিয়ে দুজনে হেঁটে চললাম।

—নতুন এসেছেন বুঝি পুরীতে ?—তিনি প্রশ্ন করলেন।

—হাঁ—মাথা নেড়ে জবাব দিলাম।

—আপনার ঝিনুক কুড়োবার উৎসাহ দেখে তাই মনে হচ্ছিল। আগে তাহলে সমুদ্রও দেখেননি কখনো?

—না।

—ও, তাই।—আস্তে আস্তে তিনি মাথা নাড়লেন : সেই জন্যেই সমুদ্র-সম্পর্কে রোমান্স রয়েছে মনে। কিন্তু আমাদের মতো দিনের পর দিন যদি এখানে কাটাতে হত, তাহলে দেখতেন কী বৈচিত্র্যহীন সমুদ্র, কী অসহ্য ক্লান্তিকর!

কথার ধরনে আমার খোঁচা লাগল।

—আপনি বুঝি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা?

—হাঁ, দায়ে পড়ে। নইলে এখান থেকে অনেক কাল আগেই আমি পালিয়ে বাঁচতাম মশাই। জানেন, মাঝে মাঝে এমন হয় যে সমুদ্রের দিকে তাকালে আমি ক্ষেপে উঠি। মনে হয় কী অনর্থক একটা সৃষ্টি—পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ দেশের কী বিপুল অপব্যয়!

আমি হাসলাম।

—মাঝে মাঝে আপনি ক্ষেপে ওঠেন না, সব সময়েই ক্ষেপে আছেন দেখতে পাচ্ছি।

ভদ্রলোক একটু অপ্রতিভ বোধ করলেন।

—মাপ করবেন, প্রথম আলাপের পক্ষে একটু বেশি ইমোশন্যাল্ হয়ে পড়েছি। ভালো কথা, কোথায় উঠেছেন?

হোটেলটার নাম করলাম।

—ভালো জায়গা। আপনাদের প্রোপ্রাইটারটিও চমৎকার লোক। কলকাতা থেকেই আসছেন তো?

মাথা নেড়েই জবাব দিলাম আমি।

ভদ্রলোক হাসলেন : বেশ। সমুদ্র সম্বন্ধে মোহ নিয়ে এসেছেন, কয়েকদিন দেখে মোহ-মুক্তি ঘটিয়ে যান। যদি কিছু মনে না করেন—পরিচয়টা জানতে পারি?

পরিচয় দিলাম। নাম শুনে ভদ্রলোক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

—আপনি তো বোধ হয় কাগজে-টাগজে লেখেন, না? দু-একটা লেখা যেন পড়েছি।

সবিনয়ে হাসলাম।

—সেই জন্যেই সমুদ্রকে আর একটা নতুন চোখ দিয়ে আপনি দেখছেন। হয়তো এর ভেতরে অসীমের কান্না, ভূমার গান, এই সব ভালো ভালো জিনিস আপনারা শুনতে পাবেন। কিন্তু আমি—কথাটা শেষ না করেই থেমে গেলেন।

আমিও আর প্রশ্ন করলাম না। এইটুকুর ভেতরেই যতটুকু দেখতে পাচ্ছি তাতেই ভদ্রলোকের অনুচ্চারিত কথাগুলো বুঝতে পেরেছি আমি। আমরা, যারা সমুদ্রকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি, আবেগমুগ্ধ কাব্য রচনা করি, আমাদের অনুকম্পার চোখেই দেখেন

তিনি। শিশুর প্রতি বিজ্ঞ অভিভাবকের একটা বেশ উদার মনোভাব। ভাগ্যিস, পৃথিবীতে সব মানুষ এমনি বিজ্ঞতার শিখরে পৌছয়নি—নইলে বাঁচা শক্ত হত—আমি মনে মনে ভাবলাম।

খানিকটা পথ নিঃশব্দে কাটল।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার পরিচয়টা কিন্তু—

পরিচয় দিলেন তিনি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের পি. এইচ ডি.। এখানকার কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। নাম রামকুমার মুখার্জী—ডক্টর মুখার্জী নামে পরিচিত।

চলতে চলতে গল্প জমে গেল।

হঠাৎ চমক ভাঙল। তাকিয়ে দেখি সমুদ্রের জলে প্রথম সূর্যের আলো ঝলমল করছে।

—ওই যাঃ!—আমি সখেদে বললাম, সূর্য অনেকটা উঠে পড়েছে তো! সূর্যোদয় দেখা হল না।

রামকুমারবাবু হাসলেন: ক্ষোভ করবার কোনো কারণ নেই। সূর্যোদয় এমনিতেও দেখতে পেতেন না। কারণ এ সময়ে সূর্য জলের ওপরেই ওঠে না। সে পূজোর সময় আসতে হয়, কিংবা শীতকালে।

—তাই নাকি?

আমার হতাশাক্ষুব্ধ মুখের দিকে রামকুমারবাবু সকৌতুকে তাকালেন: শক্ পেলেন বুঝি? আমার কিন্তু মনে হয় সুকুমারবাবু, এ ভালোই হল। যার উচ্ছ্বসিত এত বর্ণনা কাগজে পড়েছেন, যার সম্পর্কে মনের মধ্যে এত রঙবেরঙের কল্পনা গড়ে রেখেছেন তাকে বাস্তবে না দেখাই ভালো। অনেক সময় বিশ্রী রকম ছন্দোপতন হয়ে যায়—আমারও হয়েছে।

ভদ্রালোকের ভঙ্গিটা একটু 'সিনিক'। মনে হয় কোথায় একটা মস্ত ঘা খেয়েছেন; আর সেই জন্যেই পৃথিবী সম্বন্ধে একটা তির্যক আর খানিকটা নিরাসক্ত দৃষ্টি আহরণ করে বসে আছেন। ওঁর চশমার ওপর কালো রঙের একটা অদৃশ্য অ্যাটাচি আছে যেন। অথবা এই হয়তো দার্শনিক মনের স্বভাবধর্ম; আবেগ নয়, খানিকটা নিষ্ঠুর কঠিন বিচার বোধ, নগ্ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আলোকে তার মূল্য যাচাই করে নেওয়া। বেশ নতুন রকমের লাগল।

—অনেকটা হাঁটা গেছে, একটু বসা যাক আসুন—তিনি প্রস্তাব করলেন।

আমি হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালাম। সাতটা বাজে।

রামকুমারবাবু বুঝলেন। বললেন, চায়ের কথা ভাবছেন বুঝি? ভয় নেই, সে সাড়ে আটটার আগে নয়। এখানকার হোটেলগুলোর এই নিয়ম। বাবুরা হাওয়া খেয়ে ফিরলে তবে চায়ের পাট হয় এখানে, সুতরাং এখনো যথেষ্ট সময় আছে হাতে।

দুজনে বসলাম। পকেট থেকে সিগারেট বের করে রামকুমারবাবু এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। দুজনে দুটো সিগারেট ধরালাম।

সামনে সমুদ্র। পাড়ের কাছে বালি-মেশানো ফিকে নীলটা ক্রমশ নিবিড় হতে হতে দূরান্ত সীমায় একেবারে ঘন কালো হয়ে মিলিয়ে গেছে। ফেনার ফুল ফুটেছে—ভেঙে পড়েছে, জল দুলছে—দিগন্ত-রেখায় যেখানে চক্রাকারে আকাশ নেমে পড়েছে একেবারে সেই পর্যন্ত। চেয়ে চেয়ে কেমন ঘোর লাগে, মনে হতে থাকে এই যেখানে বসে আছি—এই যে বালির ডাঙাটা—এটাও যেন ওই চঞ্চল সমুদ্রের মতোই দোল খাচ্ছে।

মাথায় লম্বা লম্বা টুপি পরে নুলিয়ারা নৌকো ভাসাচ্ছে সমুদ্রে। কালো কুচকুচে শরীরগুলো স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে তরঙ্গিত—যেন গ্রীক্ ভাস্করের স্বপ্ন দিয়ে গড়া। মিকায়েল অ্যাঞ্জেলো থাকলে জুপিটারের মডেল করে নিতে পারতেন। অনার্য শক্তিমত্তার প্রতীক। বড় বড় কাঠের জোড় লাগানো নৌকোগুলো ঢেউয়ের বাধা ঠেলে এগোতে পারছে না, দু হাত যেতে না যেতেই উল্‌টে যাচ্ছে ; পরক্ষণেই নোনাজলে একটা ডুব দিয়ে নুলিয়ারা সেটাকে সোজা করে আবার ওর ওপর উঠে বসছে। হিংস্র একটা আদিমতার সঙ্গে চলেছে মানবিক শক্তির প্রাগৈতিহাসিক প্রতিযোগিতা।

রামকুমারবাবুও ওই দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, সমুদ্র ওদেরই জন্য, আমাদের নয়।

—কেন বলুন তো?

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি।

—কিছু যদি মনে না করেন সুকুমারবাবু—হাতের মোটা ছড়িটা দিয়ে তিনি বালি খুঁড়তে শুরু করলেন : আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত তা হলে আইন করে এখানে বাঙালীদের আসা আমি বন্ধ করে দিতাম।

তাঁর কথার ভঙ্গিতে আমি হকচকিয়ে গেলাম।

—কেন বলুন দেখি? হঠাৎ বাঙালীদের ওপরে এভাবে ক্ষেপে গেলেন কেন?

—কেন ক্ষেপলাম? যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে তার। এই বিরাট শক্তিকে শুধু কৌতূহলের চোখ মেলে দেখবার জন্যে যে শক্তিহীনের দল এখানে এসে জড়ো হয়, আসে সস্তার কাব্য করতে আর বেখাপ্পা সুইমিং কস্টিউম পরে হাঁটুজলে ঝাঁপাঝাঁপি করতে—তারা কোনো জাতির পরিচয় তো নয়ই, বরং তার লজ্জা।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। আক্রমণটা একটু বেশি দার্শনিক হয়ে যাচ্ছে না কি? এই সমুদ্রের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে জয়লাভ করতে পারে এমন কোনো বীরজাতি পৃথিবীতে আছে বলে তো আমি জানি না।

—সে কথা আমি বলছি না।—রামকুমারবাবু ছড়ির মুখে খানিকটা বালি উড়িয়ে

দিলেন : সন্ধ্যার অন্ধকারে সমুদ্রের ধারে মেয়েদের নিয়ে যারা কাব্য করে, অথচ ইতরতার আক্রমণ থেকে মেয়েদের বাঁচাবার ক্ষমতা যাদের নেই—তাদের এই বিলাস কেন বলতে পারেন ?

—মানে ?

—মানে অত্যন্ত সোজা। এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটছে আজকাল। মেয়েদের অসম্মানিত করে, নিজেদের অপমান করে বেড়াচ্ছি আমরা। কোনো ভদ্র বাঙালী মেয়ের পক্ষেই সন্ধ্যার পরে এখানকার সী-বীচ্ আর নিরাপদ নয় আজকাল।*

—কী অন্যায় !

—অন্যায় ?—চশমার মধ্য দিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে রামকুমারবাবু আমার দিকে তাকালেন : কার অন্যায় বলতে চান ? এখানকার উড়েদের ? একেবারে ভুল। আগে এরা কখনও এরকম ছিল না, বাঙালীরাই এদের চোখের দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। মদ খেয়ে বীচের ওপর মাতলামি করেছে তারা, মেয়েদের নিয়ে নানা অশোভন দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে, এখানকার বখাটে ছেলেদের দলে জুটিয়ে, কুৎসিত মন্তব্য করেছে অন্য মেয়েদের সম্পর্কে। তাদেরই দেওয়া শিক্ষা এটা—এরা শুধু নিষ্ঠাভরে তা গ্রহণ করেছে, তার বেশি কিছু নয়।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

—শুধু কি তাই ? বাঙালী আমরা, সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষকে অনুকম্পার চোখে দেখতেই অভ্যস্ত। এককালে ইংরেজের পেয়ারের কেরানী ছিলাম, সেই অধিকারে কাউকে মেড়ো বলি, কাউকে ছাতু, কাউকে উড়ে। এখানকার মানুষদের হোটেলের ঠাকুরের চাইতে বড় মর্যাদা দিতে আমাদের মানসিক আভিজাত্যে বাধে। তাই এরা আজ সেই ঋণ কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে নিচ্ছে। নেবেই—তাই ইতিহাসের ধর্ম। জানেন, এসব দেশে বাঙালী কথাটা আজকাল গালাগালি হয়ে গেছে ?

মুহূর্তে সমস্ত মনটা আমার যেমন বিস্বাদ তেমনি কালো হয়ে গেল। চক্ষের পলকে যেন দৃষ্টির সামনে বদলে গেল সমুদ্রের রূপটা। সমুদ্রকে কেন্দ্র করে কাল রাত থেকে আমার মন যে একটা রূপময়, স্বপ্নময় মায়াজগৎ রচনা করেছিল, অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অত্যন্ত রূঢ় খানিকটা বাস্তব এসে অশুচি হাতে স্পর্শ করেছে। কালো করে দিয়েছে তাকে, দিয়েছে গ্লানিতে মলিন করে।

রামকুমারবাবু বললেন, এই মানুষগুলোকে দেখে এদের রোমান্টিক বিহ্বলতা দেখে, সমুদ্র সম্বন্ধে আমার মোহ কেটে গেছে। এরা সমুদ্রকে দেখতে আসে না ; তাকে বুঝতে আসে না। চিনতে পারে না সমুদ্রের মতো কোন্ বিরাট সত্য এখানকার আকাশে বাতাসে তরঙ্গিত হয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখতে পেলে এদের দৃষ্টি বদলে যেত, নতুন সৃষ্টিকে খুঁজে পেত তারা। আপনি তো লেখক মানুষ মশাই, সেই সমুদ্রের কথা আপনি বলুন। আপনিও এদের মতো সমুদ্র নিয়ে সস্তার কাব্য করলে লজ্জা আর দুঃখের সীমা থাকবে না।

কাল রাত্রে নিজের বিনিদ্র আবিষ্ট প্রহরগুলোর কথা মনে পড়তে আমি চমকে উঠলাম। মনে হল, রামকুমারবাবুর কথাগুলো যেন আমাকেই আক্রমণ করছে।

—কোন্ সত্যের কথা বলছেন আপনি? আমি তো বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ রামকুমারবাবু যেন সচেতন হয়ে উঠেছেন।

—সে বলব আর এক সময়। কিন্তু ছিঃ ছিঃ, ভালো করে আলাপ হবার আগেই অনেকগুলো এলোমেলো বকে বসলাম আপনার কাছে। কিছু মনে করবেন না, চলুন, এবার আস্তে আস্তে আপনার হোটেলের দিকেই এগোনো যাক।

দুই

হোটেলে এসে আমার সঙ্গে চা খেলেন রামকুমারবাবু, কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলেন।

—বলব কি মশাই, দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। এই পরশুই তো ব্লু-ড্রীম হোটেলের সামনে একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনে যেতে লাগলাম।

—কলকাতা থেকে একজোড়া আনকোরা বাবু এসেছেন সমুদ্র-বিলাস করতে। একেবারে খাঁটি বাবু, কুঁজো পিঠ, রোগা শরীর, মুখে পাইপ, চোখে সোনার চশমা। ট্রেন-জার্নি করেও জামার ভাঁজ নষ্ট হয়নি। হোটেলের সামনে নেমেই ঝগড়া করলেন রিক্‌শওলার সঙ্গে, বললেন, 'শালা', একজনকে একটা চড়ও বসিয়ে দিলেন। বোধ হয় ভেবেছিলেন, কলকাতার উড়ে ঠাকুর আর ঠেলাওয়ালার সঙ্গে এর চাইতে ভদ্র ব্যবহার করা উচিত নয়। ভুলে গিয়েছিলেন এটা ওদেরই দেশ। ফল যা হওয়ার তাই হল। হৈ হৈ করে লোক এসে পড়ল, ছিঁড়ল গিলে-করা পাঞ্জাবি, উড়ে গেল সোনার চশমা। তারপর ফার্স্ট এইডের জন্যে যেতে হল হাসপাতালে।

গলার স্বরে খানিকটা বিরক্ত রেশ মিশিয়ে রামকুমারবাবু কাহিনী শেষ করলেন।

আমি সামনের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বঙ্গোপসাগর—বংগাল কী খাড়ি। শুধু ইংরেজের দেওয়া নামই নয়। ইতিহাসের পাতায় একদিন বেঁচেছিল অমর বাংলা—

একদিন যে বাংলার অধিকার ছিল সমুদ্র-শাসনের। গ্রীক থেকে শুরু করে মুসলমান ঐতিহাসিকের বিবরণীতে পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে গৌড়ীয় নৌ-বাহিনীর কীর্তিগাথা। দুর্জয়, দুর্ধর্ষ। লেখা আছে গৌড়ীয় বণিকদের কথা—সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর ভাণ্ডার থেকে সপ্ত-গ্রামের যে বণিকেরা সপ্তডিঙা ভাসিয়ে ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে আনত। বলি-যবদ্বীপ-মহাচীন—হয়তো আরো দূর-দূরান্তে দক্ষিণ আমেরিকার বিস্মৃত মায়াসভ্যতা পর্যন্ত, বাঙালার বার্তা নিয়ে গিয়েছিল কাল-সমুদ্রে চিরমজ্জিত কত মধুকরের দল।

কোথায় সেই বাংলার সমুদ্র? অজেয় বঙ্গের সে গৌড়-সমুদ্র চিরদিনের মতো বাংলার পায়ের তলা থেকে সরে গেছে। কালিমাখা কিংবদন্তীতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ—আর গঙ্গা-সাগরে সন্তান-বিসর্জনের প্রাগৈতিহাসিক বীভৎসতার কাহিনী!

তবু শেষ নয়। তবুও কিছু ছিল। কিছুদিন আগেই চোখে পড়েছিল একশো বছর আগেকার কলকাতার একশোজন বণিকের নামের তালিকা। তার মধ্যে অন্তত ছিয়ানব্বুই জন বাঙালী—আর তাদের জাহাজ একশো বছর আগেও 'ফরবিডেন প্যারাডাইজ' চীনের বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য করে এসেছে।

আর আজ?

শৌর্য দিয়ে সমুদ্র অভিযান শেষ হয়েছে। বাণিজ্য দিয়ে বিজয়-যাত্রার কাহিনী স্বপ্নের চাইতে অলীক। আজ বাংলাদেশের কাছ থেকেই সরে দাঁড়িয়েছে সমুদ্র। ভাঙা জাহাজের কঙ্কালে কঙ্কালে পলিমাটির নিবিড় আস্তরণ ফেলে মাথা তুলেছে, দুর্ভেদ নিবিড় লজ্জাহারী সুন্দরবন। বুকে 'টি-বি'র ব্যাসিলি আর ডিস্‌পেপটিক শরীর নিয়ে বাবু বাঙালী পুরীর সমুদ্রে হাওয়া খেতে আসে।

ভাবনার মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলাম। রামকুমারবাবু আরো কী বলে যাচ্ছিলেন খেয়াল নেই, খুব সম্ভব 'হুঁ' দিয়ে চলেছিলাম অন্যমনস্ক ভাবে। তারপর যখন তিনি হাতের মোটা লাঠিটা সংগ্রহ করে উঠে দাঁড়ালেন, তখন আমার চমক ভাঙল।

—এবেলা তবে ওঠা যাক মশাই। নটা বাজে—আমায় আবার বাজার যেতে হবে।

—বাজার!—কথাটা অত্যন্ত স্থূল ভাবে কানের ওপর এসে আঘাত করল।

—হ্যাঁ, বাজার। রামকুমারবাবু হাসলেন: আপনাদের আর ভাবনা কী মশাই, আপনারা তো হোটেলের অতিথি—অবশ্য পেয়িং গেস্ট। বসে বসে সমুদ্রের নীলিমা ধ্যান করলেও পেটের ভাবনা নেই। কিন্তু আমার তো তা নয়। ছা-পোষা মানুষ—এখুনি থলে হাতে না ছুটলে হাঁড়ি চড়বে না হেঁসেলে।

—কতদূরে বাজার?

—সে অনেকটা। জগন্নাথের শ্রীপাদপদ্ম ছাড়িয়েও আরো খানিকটা—প্রায় মাইল দুয়েকের ধাক্কা। ওদিকটায় যাননি বুঝি এখনো?

আমি হাসলাম : না, কই আর গেলাম ! এসেইছি তো কাল সন্ধ্যায়।

—যাবেন, যাবেন, মন্দির দেখবেন। আরে কাব্য তো আছেই, নীলাচলের নীলমাধব দেখে পুণ্যের ফাউটুকুও বা ছাড়বেন কেন !—তা ছাড়া—রামকুমার বিস্বাদ হাসি হাসলেন : পুরীর মন্দিরে ধর্ম আর কাম দুই-ই আছে। পাণ্ডাদের কিঞ্চিৎ অর্থ দিলেই মোক্ষলাভও নিশ্চিত।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল।

—শুনলাম নাকি মন্দিরের গায়ে কতকগুলো কদর্য মূর্তি আছে—

—কদর্য মানে ? সে যে কী বিভীষিকা ভাবতে পারবেন না। আর ওই মূর্তিগুলো একটি মাত্র সত্যকেই প্রচার করে আসছে। সে সত্য হল এই : ধর্মের ভেতরেও এত বড় পচন ধরেছিল বলেই হিন্দু সভ্যতার অপমৃত্যু অমন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

রামকুমারবাবু সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। বললেন, নাঃ, কথায় কথা বাড়ছে। আরো কিছুক্ষণ বক বক করলে আজ বাড়িতে রান্না হবে না মশাই। এখন চলি।

আরো দু পা নেমে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন।

—আমাকে আপনার অসহ্য লাগছে না তো ?

—ছিঃ ছিঃ ! কেন বলছেন একথা ?

রামকুমার হাতের লগুড়াকার ছড়িটা সিঁড়ির ওপর ঠুকলেন : দেখুন, অপ্রিয় সত্য যেমন আমি বলতে পারি, তেমনি শুনতেও আমার খারাপ লাগে না। আমি বড্ড বেশি কথা বলি—তার মধ্যে অধিকাংশই কটু। সকলে আমায় সইতে পারে না।

—না, না, আমার বেশ লাগছে।

—ভদ্রতা করলেন ?—রামকুমার হাসলেন : তা হলে এর দামও দিতে হবে কিন্তু। বিকেলে আবার জ্বালাতে আসব।

—নিশ্চয় আসবেন। ভাবি খুশি হবো তা হলে।

রামকুমার বিদায় নিলেন।

সত্যি কথা, আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে একটা ঘা দিয়েছেন ভদ্রলোক। ইন্‌সম্‌নিয়ার চিন্তাবিলাসকে যেন উড়িয়ে দিয়েছন দম্‌কা ঝোড়ো হাওয়ায়। তবু এটুকুর দরকার ছিল। দরকার ছিল মোহ মোচনের।

সমুদ্র। অতীতে আমাদেরও ছিল। আজ ইংরেজের 'রুল দ্য ওয়েভস্!' জন্ মেস্‌ফিল্ডের কবিতা। 'ডবার' স্বপ্নের সাগর নয়। কোটি কোটি বুনো ঘোড়ার মতো সমুদ্র তরঙ্গের লাগাম টেনে ইংরেজের ঔপনিবেশিক অভিযান। কালো অ্যাল্‌বাট্রসের প্রেতমূর্তি আর স্টর্ম পেট্রেলের ছায়া সে জয়যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

হোটেলের চাকর রামানুজ কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

—বাবু কাগজ পড়বেন ?

কাল কলকাতায় পড়ে এসেছি—স্থতরাং এখানে বাসি খবর। নিরুৎসাহ গলায় বললাম, থাক এখন।

রামানুজ তবু গেল না।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল, মনে হল যেন কিছু বলতে চায়।

চোখ তুলে তাকাতে হাসল অপ্রতিভের মতো।

—কেমন সমুদ্র দেখলেন বাবু ?

—ভালোই।

রামানুজ বললে, এ আর কী সমুদ্র ! শুধু বালির ওপর ঢেউ খেলছে। পাহাড়ের গায়ে ঢেউ ভেঙে ভেঙে না পড়লে তবে কি আর সাগরের চেহারা খোলে !

হোটেলের চাকরের পক্ষে কথাটা একটু বেশি কাব্যিক। আমি বিস্মিত হয়ে রামানুজকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

রামানুজ লাজুক গলায় বললে, যাবেন না একবার আমাদের দেশে ! দেখে আসবেন।

—কোথায় তোমাদের দেশ ?

—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি। বিশাখাপত্তন। আপনারা ভাইজাগ বলেন।

—ওঃ, তুমি মাদ্রাজী ?—আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিলাম রামানুজের। দীর্ঘ দেহ, পেশল চেহারা। ঠিক কথা—উড়িষ্যার নরম বালুতট নয়, কোথায় যেন পূর্বঘাট পাহাড়ের একটা কাঠিন্য সঞ্চিত হয়ে আছে।

—বেশ, যাবো নিশ্চয়ই তোমাদের দেশে।—রামানুজকে বললাম। মৃদু প্রসন্নতার একটা হাসি দেখা দিল তার মুখে। স্বদেশপ্রীতি। পুরীর সমতল বালু-বেলায় দাঁড়িয়ে গিরিমালা-বন্ধুর তটে তটে গর্জিত সাগরের স্বপ্ন।

—হাঁ বাবু, গেলে সত্যি আপনার ভালো লাগবে।

আরো হয়তো কিছু তার বক্তব্য ছিল, এমন সময় ভেতর থেকে কে ডাকল : রামানুজ, রামানুজ !

—যাই বাবু—সাড়া দিয়ে সে চলে গেল।

আমি হোটেলের বারান্দায় চুপ করে বসেই রইলাম। সামনে সমুদ্র। রোদ প্রখর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার রঙ বদলাচ্ছে—তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতায় ঝক ঝক করছে ফেনাগুলো। ফিকে নীল থেকে ঘন নীল, আরো নীল, আরো নীল, দিগন্তে দিগন্তে শুধু স্তবকে স্তবকে রূপোর ফুল ফুটে উঠছে।

তার মাঝে মাঝে নুলিয়াদের নৌকো। ব্রেকারের সীমা ছাড়িয়ে কত দূরে চলে গেছে

এখন, শুধু দেখা যাচ্ছে কালো কালো কতগুলো রেখার মতো। ওখানে গিয়ে আমরা কোনোদিন পৌঁছুব না, শুধু বালির ডাঙায় খানিকটা ঝাঁপাঝাঁপি দাপাদাপি করে সমুদ্র-স্নানের আনন্দ কুড়িয়ে নিয়ে যাবো! কথাটা মনে হতেই দূরচারী দৃষ্টিটা ফিরে এল নী-নীচে।

তাইতো, এতক্ষণ যে চোখেই পড়েনি!

একটি বাঙালি দম্পতি। কস্টিউমের বীরসজ্জায় নুলিয়ার হাত ধরে এগোচ্ছে সমুদ্রের দিকে। যেন কতবড় দিগ্বিজয় করতে চলেছে একটা। কিন্তু পরক্ষণেই ঢেউয়ের ঝাপটায় আঁকুপাঁকু করে নুলিয়ার আশ্রয়ে কোনো মতে সামলে নিচ্ছে বিরাট একটি পতনের সম্ভাবনাকে।

যেমন করুণ, তেমনি বিসদৃশ। নুলিয়াটা হাসছে। এতদূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি তার কালো মুখে শাদা শাদা দাঁতের উজ্জ্বল হাসি। আশ্বাস আর আত্ম-প্রত্যয়। কে জানে তার সঙ্গে খানিকটা অবজ্ঞাও মিশে আছে কি না!

ইতিমধ্যে পুরুষটি বোধ হয় কিছুটা সাহসী হয়ে উঠেছেন। নুলিয়ার হাত ছেড়ে লাফাতে লাফাতে কয়েক পা এগিয়েও গেলেন। স্ত্রীর কাছে খানিকটা বাহাদুরী দেখানোর সদুদ্দেশ্যও হয়তো তাঁর ছিল কি না কে জানে, কিন্তু ফল হল মারাত্মক।

মাথার ওপর শুঁড়-তোলা হাতীর মতো আবির্ভূত হল একটি অতিকায় ব্রেকার। সম্ভবত এখানে ডুব দেওয়াই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ—অন্তত নুলিয়ার নির্দেশ ছিল বোধ হয় সেই রকমই। কিন্তু হিসেবে ভুল করলেন ভদ্রলোক—ব্রেকারটাকে ডিঙোবার জন্যে লাফ মারলেন একটা।

তারপর—

তারপর কয়েক শো গ্যালন জল উদ্দাম বেগে তাঁকে ছুঁড়ে মারল ডাঙার ওপর। তাঁর স্ত্রী চিৎকার করে উঠলেন। কাটা কুমড়োর মতো আট-দশটা পাক খেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আর পায়ের তলা থেকে সকৌতুক হাসির একরাশ ফেনা ছড়িয়ে সরে গেল চঞ্চল সমুদ্র।

নুলিয়াটা হাসছে। এতদূর থেকেও দেখছি তার শাদা শাদা দাঁতে একরাশ সেই উজ্জ্বল হাসি।

সত্যেন দত্ত লিখেছিলেন: 'মাথায় যাহার বরণ ছত্র, সমুদ্র যার সেনা।' সন্দেহ নেই, আমরা সেনাপতি বাঙালিই বটে!

কিন্তু সমুদ্র থেকে চিন্তাটা চমকে ফিরে এল একটা প্রচণ্ড চিৎকারে।

পাশের ঘর থেকে আসছে। একজনের চিৎকার নয়—এক দলের। গুটি পাঁচেক ছোকরা সমস্বরে কথা কইছে। বোধ হয় সকালে বেড়াতে বেরিয়েছিল—এই ফিরল।

কিন্তু ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণপণে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে শুরু করেছে।

—বেশ মন্দির, না রে ?

—হ্যাঁ—খাসা।

—সব চেয়ে খাসা দেয়ালের ছবিগুলো। মাইরি কী কাণ্ড !—একজন শিস টানল।

—পাণ্ডা ব্যাটাদের কী রকম কড়া নজর দেখেছিস ? ঠিক তক্কে তক্কে আছে। পকেট থেকে ক্যামেরাটা অবধি বের করবার সুযোগ পেলাম না।

—ভালোই করেছিস। ছবি তুলতে গেলে শুধু ক্যামেরা কেড়ে নিত না, মেরে হাড় ভেঙে দিত।

—হুঁ, ভারী কড়া পাহারা !—বক্তার স্বরে নৈরাশ্য : তার চেয়ে চল্, কোনারকে যাই। সেখানে নাকি অঢেল আছে। আর ছবি তুলতেও বিশেষ অসুবিধে নেই।

—কোনারক ! সে আবার কোথায় ?

—মাইল ছাব্বিশেক। গোরুর গাড়িতে করে যেতে হয়।

—গোরুর গাড়ি !—আর একজন বললে, মাপ করো ব্রাদার !

—এখানে পাণ্ডার ঠ্যাঙানিতে দু-চারখানা হাড় বাঁচলেও বাঁচতে পারে—কিন্তু গোরুর গাড়িতে চাপলে শরীরের আর কিছু থাকবে না, একদম কিমা বানিয়ে দেবে।

—আরে ওটুকু কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলবে কেন ? এত খরচা করে পুরী আসাই যে তবে পণ্ড হয়ে যাবে।

একজন একটা অশ্লীল মন্তব্য করল। খানিকটা উৎকট হাসির ঢেউ যেন চারদিককে আবিল করে দিলে। আর সহ্য করা যায় না—আমি উঠে দাঁড়ালাম। সারা শরীর ঘিন্ ঘিন্ করছে। সমুদ্র নয়, মন্দির নয়,—যেন একরাশ পচা আবর্জনার গন্ধ একপাল মাছিকে আমন্ত্রণ করে এনেছে ! এই সমাপ্তিহীন আকাশ—অন্তহীন জল আর অফুরন্ত বাতাসকে এক মুহূর্তে কলুষিত করে দিয়েছে এরা !

রামকুমারবাবুর কথার সত্যটা ধরা পড়েছে একটু একটু করে। বুঝতে পারছি, আজ সমুদ্রের বিরাট বিস্তীর্ণ তীরভূমি থেকে কেন নির্বাসিত হয়ে গেছি আমরা। কেন আজ নিবিড় ঘন সুন্দরবনের দুর্লঙ্ঘ্যতা এমন করে সমুদ্রকে আড়াল করে দিয়েছে আমাদের দৃষ্টি থেকে।

হ্যাঁ—এখানে আমাদের জায়গা নেই। এখানকার সমুদ্রতীর আমাদের মেয়েদের পক্ষে বিপজ্জনক করে তোলার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমাদেরই। বাঙালি শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে এদের জিহ্বা থেকে যে তীব্র ঘৃণা উদ্গীর্ণ হয়ে পড়ে—তিলে তিলে আমরাই তা সঞ্চয় করেছি।

ঘরের মধ্যে সমানে হল্লা চলছে—চলছে শিস্ আর গান।

—একটা সিগারেট ঝাড় দেখি পরেশ।

—অত সুখে কাজ নেই। বাপের পকেট মারা টাকা, তোমাদের সিগারেট খাইয়ে ফতুর করব—ইয়ার্কি পেয়েছ নাকি? অত সিগারেটের লোভ থাকে তো গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনে খাও গে।

নাঃ—অসম্ভব। আর বসতে দিল না। ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

তালা খুলে সবে ঘরে এসে বসেছি—এমন সময় পর্দা সরিয়ে রামানুজ উঁকি মারল আবার।

—কী খবর?

—আট নম্বর ঘরের মাইজী আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান বাবু।

—আট নম্বর ঘরের মাইজী?—আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

—তা তো জানি না।

—তাঁর ওখানে যেতে বললেন?

—না, তিনিই এখানে আসতে চাইছেন।

—বেশ তো, আসতে বলো।

পর্দার আড়ালে রামানুজের মুখ অদৃশ্য হল।

আট নম্বর ঘরের মাইজী! হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করতে চান? নিশ্চয় চেনা-শোনা কেউ হবে। কিন্তু কে হতে পারে? আত্মীয় কেউ? তা হলে খবর পাঠিয়ে ঘরে দেখা করতে চায় কেন? কে হতে পারে?

কতকগুলো সম্ভব অসম্ভব মুখের কথা চিন্তা করতে করতে আবার পর্দাটা সরে গেল। যে ঘরে এসে দাঁড়ালো—কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কথা খুঁজে পেলাম না। একটি তরুণী। দেখা—অথচ ঠিক যেন চেনা নয়। যেন ট্রেনের কামরায় একসঙ্গে এক রাত পথ চলবার পরে, ভোরের আলো ফোটার আগেই কোনো অচেনা স্টেশনে নেমে যাওয়া একখানা মুখ। আলাপ হয়নি, পরিচয় নেই—তবু যে মুখখানা আরো অনেকটা পথ পর্যন্ত ফিকে হতে হতে সঙ্গে চলতে থাকে।

কে—কে হতে পারে মেয়েটি?

অস্বস্তিকর অবস্থার হাত থেকে সে-ই রক্ষা করল শেষ পর্যন্ত। এগিয়ে এসে আমার পায়ের ধুলো নিলে।

—চিনতে পারলেন না? আমি ইরা।

ইরা! না—আর ভুল নেই। এবারে চিনেছি। পাঁচ বছর আগে এই শান্ত নম্র মেয়েটির চোখ মনীষার তীক্ষ্ণ দ্যুতিতে ঝিকিয়ে উঠত, আতঙ্কে কণ্টকিত করে তুলত আমার প্রথম অধ্যাপনা-জীবনের ক্লাসগুলি!

সে ইরা এই !

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, এসো এসো ইরা, বোসো।

তিন

ইরা কিন্তু বসল না, তেমনি সলজ্জ নতমুখেই দাঁড়িয়ে রইল। বললে, থাক।

—থাকবে কেন ? বোসো।—আমি আবার অনুরোধ জানালাম।

এবার অতি সন্তর্পণে আলগোছে একখানা চেয়ারে ইরা আসন নিলে। তারপরে তেমনি নত চোখেই মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। যেন কোন্‌খান থেকে কথা আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না।

নীরব অস্বস্তিতে ঘরটা ভরে রইল কতক্ষণ। শুধু জানলা দিয়ে ঝোড়ো হাওয়ায় সী-বীচের কর্‌করে বালি ঘরের মধ্যে এসে উড়ে উড়ে পড়তে লাগল, বাতাসে দুলতে লাগল পর্দাটা, আর অবিশ্রাম কানে আসতে লাগল ক্রুদ্ধ অজগরের ফোঁসানির মতো সমুদ্রের গর্জন।

তারপর আমিই কথা আরম্ভ করলাম।

—কবে এসেছ পুরীতে ?

—দিন দশেক।—সংক্ষেপে জবাব দিলে ইরা।

—তোমার স্বামীর সঙ্গে ?

লজ্জারক্ত মুখে ইরা মাথা নাড়ল, উত্তর দিলে না।

আবার নীরবতা। আলোচনাটার জের আর টানতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সিগারেট ধরালাম একটা। দেশলাই জ্বালবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আত্মপ্রত্যয়টা খানিক সজাগ হয়ে উঠল। বাতাসে খানিকটা ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে বললাম, যাক, ভারী খুশি হওয়া গেল তোমায় দেখে। ভালোই আছো তা হলে।

ইরা এবার মাথা তুলল। কিন্তু কথাটার জবাব দেবার জন্যে নয়। এতক্ষণে সংকোচে মাথা নিচু করে ছিল, এবারে কেমন অস্বস্তিভরা চোখ তুলে তাকালো আমার দিকে।

আস্তে আস্তে বললে, সকালে আপনি যখন বেরিয়ে গেলেন তখনি ছাত থেকে আপনাকে লক্ষ্য করেছি। সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু ঠিক চিনে উঠতে পারিনি। এই পাঁচ বছরে অনেক বদলে গেছেন আপনি।—ইরার ঠোঁটের কোণে হঠাৎ পুরোনো হাসিটা ধারালো হয়ে উঠল।

আর এই হাসিটা দেখবামাত্র আমি সংকুচিত হয়ে গেলাম। মনে পড়ল প্রথম অধ্যাপনা করতে এসে ওই হাসির ধারালো ফলকে আমি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলাম। ফোর্থ ইয়ার অনার্স ক্লাস থেকে যখন বেরিয়ে এসেছিলাম, তখন পৌষের একটি ঠাণ্ডা সকালেও আমার

গেঞ্জির ভেতর দিয়ে দরদর করে ঘাম বেয়ে পড়েছিল।

কোনো দিক না তাকিয়েই পড়াতে শুরু করেছিলাম সেদিন। দুর্ভাগ্যক্রমে বইটি ছিল রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' এবং কবিতাটির নাম ছিল 'বিজয়িনী'।

এমন একটি আশ্চর্য ভালো লাগা কবিতা সময় বিশেষে কী মর্মান্তিক হয়ে উঠতে পারে সে অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। মাথা নিচু করে ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করে চলেছি—হঠাৎ কানে এল, কিছু শুনতে পাচ্ছি না স্যার।

যে প্রশ্ন করেছিল তার দিকে চোখ তুলে একবার তাকাতেই আমার এতক্ষণের সাহস চক্ষের পলকে যেন উবে গেল। জলজ্বলে দুটি চোখ—ঠোঁট দুটিকে উদ্ভাসিত করে প্রখর তীক্ষ্ণ হাসির রেখা। কৌতুক, অনুকম্পা, কৌতুহল এবং খুব সম্ভব খানিকটা অবজ্ঞাও তাদের থেকে বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে। আর শুধু বিকীর্ণ হয়েই পড়ছে না—রীতিমতো বিদ্ধ করে ফেলতে চাইছে।

অসীম অস্বস্তিতে একবার শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে আমি জানতে চাইলাম, কিছু বুঝতে পারছো না?

—না স্যার।—তেমনি হাসিভরা মুখে মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো: প্রায় স্বগতোক্তির মতো শোনাচ্ছে।

ক্লাসে হাসির একটি কলধ্বনি উঠল। ললিতাধরাদের হাসি যে কখনো কখনো কী ভয়ঙ্কর মর্মঘাতী হয়ে ওঠে, ওরকম অবস্থায় না পড়লে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। আমার চোখে মুখে অসহ্য একটা উত্তাপ অনুভব করলাম—যেন জলন্ত কোনো বয়লারের পাশা-পাশি এসে দাঁড়িয়েছি আমি। কান গরম হয়ে উঠল, ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল তার ভেতরে।

ঠিক সেই সময়ে বেয়ারা একটা নোটিশ নিয়ে ক্লাসে আসতে যেন নিষ্কৃতির পথ পাওয়া গেল। তারও কয়েক মিনিট পরে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠতে মুক্তি পেলাম আমি। করি-ডোরে এসে দাঁড়ালাম—সামনে পার্ক থেকে এক ঝলক বাতাস এসে বিপর্যস্ত উৎপীড়িত চেতনাকে শান্ত করে দিলে।

তারপর থেকে ওই অনার্স ক্লাসটা যেন বিভীষিকা হয়ে থাকত আমার কাছে। মাথা তুলে তাকালেই দেখতাম নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে ইরা চৌধুরী তার ধারালো হাসি আর উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে আমাকে বিশ্লেষণ করছে, অসহ্য অস্বস্তিতে জ্বালা করে উঠত সমস্ত শরীর; প্রতি মুহূর্তে মনে হত মেয়েটা যেন ব্যঙ্গ করছে আমাকে, অনুকম্পা করে চলেছে।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত শুনতে পেতাম কূলভাঙা ঝর্ণার মতো কলোচ্ছল হাসির শব্দ। সে হাসি মনকে খুশিতে দুলিয়ে দিত না, আচ্ছন্ন করে ধরত একটা দুর্বোধ্য অপমানে। পরিষ্কার বুঝতে পারতাম সকলকে ছাপিয়ে বেহালার তীক্ষ্ণ স্বরের মতো লহরে লহরে উঠে আসছে ইরার হাসি—যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি নিঃসঙ্কোচ।

কয়েক মুহূর্তের জন্য চিন্তাগুলো হাল্কা মেঘের মতো মনের ওপরে এসে সঞ্চিত হচ্ছিল। হঠাৎ বাইরে থেকে ক্রুদ্ধ অজগরের ফোঁসানির মতো এল প্রবল একটা ব্রেকারের আওয়াজ। সমুদ্রে জোয়ার আসছে বোধ হয়। আমি ইরার দিকে দৃষ্টি ফেললাম।

—কত দিন বিয়ে হয়েছে তোমার ?

সেদিনকার সেই তীক্ষ্ণহাসিনী মেয়েটি মুহূর্তে দেখা দিয়েই আবার হারিয়ে গেছে। বধূ ইরা লজ্জা-ভরা মুখে জবাব দিলে, বছর তিনেক।

—স্বামী কী করেন ?

—রোজগারের ভাবনা না থাকলে লোকে যা করে, তাই। ছবি আঁকেন।

—আর্টিস্ট ?

ইরা মাথা নাড়ল। বললে, ওঁর নামটাও হয়তো আপনি শুনে থাকবেন মাস্টার মশাই। পঙ্কজ সেন।

—পঙ্কজ সেন ?—আমি সবিস্ময়ে বললাম, গতবার যিনি অল্ ইণ্ডিয়া আর্ট একজিবিশনে ওয়াটার কালারে ফার্স্ট হয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ, তিনিই।—মৃদুকণ্ঠে ইরা জবাব দিলে।

—তাই নাকি ?—আমি খুশি হয়ে বললাম, বড় আনন্দের কথা। মিস্টার সেনের সঙ্গে তা হলে তো ভালো করে আলাপ করে নিতে হচ্ছে। কোথায় তিনি ?

—বেরিয়েছেন।—ইরার দৃষ্টি হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে উঠল : ছবি আঁকতে গেছেন ঝাউ-বনের দিকে।

—ফিরবেন কখন ?

ইরা চুপ করে রইল। আবার বাইরে থেকে ভেসে এল ব্রেকারের আর্তনাদ। জোয়ারের জোর বেড়েই চলেছে ক্রমশ। জানালা দিয়ে আমার দৃষ্টি চলে গেল সমুদ্রের দিকে। বেশ রোদ চড়েছে, অজস্র মহানাগের জড়াজড়ির মতো সমুদ্রের ঢেউ দোল খাচ্ছে—ফেনার ফুলঝুরি জ্বলন্ত ধাতুর মতো চোখে যেন ধাঁধা লাগায়। বহুদূরে গোটাকতক কালো কালো বিন্দু, ঢেউয়ের মুখে উঠছে পড়ছে—নুলিয়ারা বোধ হয় মাছ ধরে ফিরছে এতক্ষণে।

—কখন ফিরবেন ?—ইরা হাসল। কিন্তু সেদিনের সে প্রখর তীব্র হাসি কোথাও নেই আর। আরো দশজন বাঙালী মেয়ে যেমন করে শান্ত বিমর্ষভাবে হাসে, ঠিক ততটুকুই মাত্র, তার বেশি কিছুই নয়। একটু থেমে জবাব দিলে, কিছুই তো ঠিক নেই। খাবারের থলে আর ওয়াটার ক্যারিয়ার নিয়ে অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে গেছেন। যদি কাজ শেষ হয় তবে দুপুরে ফিরতে পারেন আর নইলে আসবেন আবার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে।

—কী আশ্চর্য !—অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি বলে ফেললাম, একা থাকো নাকি তুমি ?

—তিনি শিল্পী। সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি নিঃসঙ্গ।

—আর তুমি ?—এবারেও কথাটা মনের নিষেধ না মেনেই বেরিয়ে এল।

—আমি ?—এবার ইরার নতুন হাসি দেখতে পেলাম আর একটা। যেমন ফাঁকা তেমনি অর্থহীন : ওঁর সব জিনিসপত্র, আঁকবার সরঞ্জাম, কফির বন্দোবস্ত আর চুরুটের বাক্স ঠিক করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি। কাজের সময় হাতের কাছে না পেলে বড্ড ক্ষেপে যান, 'ওঁর' মুড্ নষ্ট হয়ে যায়।

এক মুহূর্তে ইরাকে আমি চিনতে পারলাম। বিদ্যুতের চমকের মতো যেন একটা কঠিন সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে আমার সামনে। বুঝতে পেরেছি ফোর্থ ইয়ার অনার্স ক্লাসের সেই তীক্ষ্ণহাসিনী মেয়েটি আজ কোন্‌খানে আত্মগোপন করেছে, তলিয়ে গেছে কোন্ অন্ধকারের আড়ালে।

কোনো কথা মুখে এল না আর। ইরার দিক থেকে আজও আমি সেদিনের মতো চোখ ফিরিয়ে নিলাম। সেদিন করুণার্থী ছিলাম তার কাছে ; আজ বোধ হয় ইরাই আমার করুণার পাত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্তব্ধতায় আড়ষ্ট হয়ে রইল ঘরটা। শুধু বাইরে থেকে সমুদ্রের গর্জন চারদিক ঘিরে ঘিরে একটা অব্যক্ত আর অর্থহীন বেদনার ব্যূহ রচনা করতে লাগল।

তারপর ইরা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। হয়তো উঠে দাঁড়ানো ছাড়া এখন আর কিছুই বলবার ছিল না।

—আজ সন্ধ্যেবেলা আমার ঘরে চায়ের নেমন্তন্ন রইল মাস্টার মশাই। আসবেন কিন্তু।

—আচ্ছা আসব।

যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি ভাবেই বাতাসের ঝাপটায় পর্দাটা উড়ে যাওয়ার মতো ইরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। শুধু ওর শাড়ি অথবা চুল থেকে উৎসারিত একটা লঘু সুগন্ধ কিছুক্ষণ ঘরের ভেতরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তারপর সমুদ্রের ভিজে নোনা বাতাসে ফিকে হতে হতে মিলিয়ে গেল এক সময়ে।

আমিও উঠলাম। ঢের বেলা বেড়েছে—একবার স্নানের চেষ্টা করা দরকার।

জলের কাছাকাছি খানিকটা নেমে যেতেই পায়ের গোড়ায় ঢেউ এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেল। অর্ঘ্য দিয়ে গেল কোমর অবধি একরাশ বালির ঝাপটা, কতগুলো ভাঙা ঝিনুকের টুকরো। পায়ের তলার জমিটা সর্ সর্ করে সমুদ্রের দিকে সরতে শুরু করল, একটু হলেই ফেলে দিত। সভয়ে আমি পেছনে সরে এলাম।

—নুলিয়া চাই না বাবু ?

একটি মিশকালো পেশলমূর্তি অনার্য মালাবারী, শরীরে শক্তি আর পৌরুষের দীপ্তি

প্রতিটি পেশীতে পেশীতে প্রদীপের মতো জ্বলছে। হঠাৎ আর্টিস্ট পঙ্কজ সেনের কথা মনে পড়ল। ঠিক এমনি একটা মানুষকে মডেল্ করেই সে আঁকতে পারত নতুন কোনো প্রমিথিয়ুস আন্‌বাউণ্ডকে, পৃথিবীর নিত্য ভারবাহী নতুন কোনো অ্যাটলাসকে। মাথায় শাদা রঙের চোখা টুপিটাকে চমৎকার মানিয়েছে লোকটার গভীর কালো রঙের পট-ভূমিকায়। প্রাগৈতিহাসিক কোনো শত্রুজয়ী মানুষের কালো মাথায় বীরভোগ্যা নারী কি এমনি করে জড়িয়ে দিত ফুলের মালা, পরিয়ে দিত নতুন কিশলয়ের জয়মুকুট ?

পেটা ইস্পাতে গড়া হাতখানা আবার আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, রিকোয়ার কুলিয়া স্যার ?—বিচিত্র ইংরিজি উচ্চারণে ব্যাখ্যা করতে চাইল : এ হেল্‌পার স্যার—ফর্ ইয়োর বেদিং ?

কেমন ঘা লাগল আত্মমর্যাদায়। একটু আগেই কুলিয়ার করাশ্রিত বঙ্গসন্তানের যে করুণ মূর্তি দেখেছি নিজেকে তাদের দলভুক্ত করতে রুচিতে বাধল। আদি মানুষের আদিম শক্তিকে শ্রদ্ধা করি আমি ; কিন্তু তারপরে তো হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথ পার হয়ে এসেছি আমরা। ভল্‌ক্যানিক ব্ল্যাক্ সয়েলের ওপর দিয়ে পায়ের চিহ্ন এঁকে এঁকে, কলোরাডোর খাতের আদিম মৃত্তিকায় অস্থি ছড়িয়ে ছড়িয়ে, গ্র্যানাইট্, কষ্টি-পাথরের বুকে স্বাক্ষর রেখে রেখে শ্যামায়িত পৃথিবীতে আসন ঢেলে দিয়েছি। গুহামানবের নিভৃত নিবাস ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি অ্যালপাইন রেলওয়ে, ওক আর বাওয়ারের হিংস্র জটিল অরণ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আমরা কাঠের গুঁড়ি ভাসিয়ে দিয়েছি কঙ্গোনদীর প্রখর স্রোতে—ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউয়ের আশীতলা বাড়িতে তারা তাদের চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করছে।

হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথ পেরিয়ে চলে এসেছি আমরা। অ্যাক্রোপলিস পার্থেননের ধ্বংসস্তূপ ছাড়িয়ে, মায়াসভ্যতা, তুষারসভ্যতাকে পেছনে রেখে পিরামিডের মৃত্যুগহ্বরে—স্ফীংসের চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমাদের ইতিহাস। আদিম অন্ধকার থেকে খর বিদ্যুতের আলোকে। পাতার ঘর থেকে স্কাইস্ক্রেপারে। হাজার হাজার বছর আগেকার প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষের মুখের দিকে আমি অবজ্ঞাভরে তাকালাম। মিথলজিক্যাল গোল্ডেন এজের আদি-পিতাকে আজকের লৌহযুগে শ্রদ্ধা করা যায় না।

—না দরকার নেহ।

—অন্‌লি টু অ্যানাস্ স্যার—গুড বেদিং—

—দরকার নেই—

—থ্যাঙ্ক ইউ।—কালো মুখের ভেতর থেকে ধবধবে তীক্ষ্ণ শাদা দাঁত বের করে হাসল লোকটা। একটুও মনঃক্ষুন্ন হয়নি, হতাশও নয়। পাশাপাশি মনে পড়ল খুর্দা রোড

পেরুবার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডাদের দুবিষহ অত্যাচার। এড়াবার চেষ্টা করাতে অভিশম্পাত দিতে শুরু করেছিল।

কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। এক পা দু পা করে আবার জলের দিকে নামলাম। সঙ্গে সঙ্গে সামনের ফুলে-ওঠা জলটা হঠাৎ কোনো অতিকায় সাপের ফণার মতো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ালো, নোনা বালিভরা জলের প্রবল ঝাপটা আছড়ে পড়ল বুকের ওপর, পায়ের তলা থেকে এক টান দিয়ে যেন মাটিটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল!

হাত ধরে তুলল সেই নুলিয়াটাই। কালো মুখের ধবধবে দাঁতে কৌতুকের হাসি উচ্ছলিত হয়ে পড়ছে। একটু আগে অন্যের দুর্গতিতে কৌতুক বোধ হচ্ছিল, নিজের পরিণামের কথাটা তখন মনে হয়নি। ততক্ষণে বালির ওপর তিন-চারটে পাক গড়ানো হয়ে গেছে আমার, ছড়ে গেছে হাত পা, আঁশটে নোনা জলে সমস্ত মুখ বিস্বাদ হয়ে গেছে, চোখ দুটো জ্বালা করছে আর ঝাপসা ঝাপসা দেখাচ্ছে সব কিছু।

একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। আদিম সমুদ্রের সঙ্গে আদিম মানুষের মিতালিই সম্ভব—আমাদের নয়। দু' হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ফিরে চললাম হোটেলের দিকে। আজ এই পর্যন্তই থাক। আপাতত হোটেলের বাথরুমে কলের জলে গায়ের বালিগুলো ধুয়ে নিতে হবে। একদিনের পক্ষে সামুদ্রিক ব্যায়ামটা ওভারডোজ হয়ে গেছে, গায়ের ব্যথা কবে সারবে কে জানে!

খাওয়াদাওয়া করে যখন বিশ্রামের জন্যে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম তখন বাইরে ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। সামুদ্রিক আলিঙ্গনটা শরীরে এখনো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, নড়তে চড়তেই সেটা টের পাচ্ছি। তা ছাড়া কালকের সমস্ত রাত কেটেছে বিশ্রী অনিদ্রায়, ইন্‌সোম্‌নিয়ার উপদ্রবে। জাগরণ আর ক্লান্তি রক্তের মধ্যে জ্বরের উত্তাপের মতো কাঁপছে, কে যেন চোখের পাতা দুটোকে টেনে ধরছে ভেতর থেকে। একটু ঘুমোনো দরকার।

কিন্তু ঘুম আসছে না।

পাশের ঘরের ছোকরারা ফিরে এসেছে। একটু আগেই ওদের খাওয়ার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। সে এক দানবিক কোলাহল। যেন একদল আফ্রিকার লোক নরমাংস খাচ্ছে—ঠিক সেই রকম কলরব। চেঁচামেচি করে, ঠাকুরকে ধমকে দিয়ে, রান্নার সমালোচনা করে যেন লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল।

এখন সম্ভবত স্টেকে ব্রীজ খেলা চলছে। অন্তত কথাবার্তা শুনে সেই রকমটাই মনে হচ্ছিল। পার্টিশনের ওপর দিয়ে সিগার আর সিগারেটের নীল ধোঁয়া ভেসে আসছে আমার ঘরে আর সমুদ্র বাতাসের ঝাপটায় মিলিয়ে যাচ্ছে ভেঙে চুরে। খেলার সঙ্গে সঙ্গে চলছে খিস্তির চাট্‌নি—আদিম সমুদ্রের আদিম সত্তা এসে ওদের স্পর্শ করেছে।

'চাক্কু মাইর‍্যা চইলা গেলি ওরে কালাচাঁদ'—একজন গান গেয়ে উঠল। একটা কান্না

বালিশে চেপে আর একটা হাত দিয়ে ঢেকে আমি অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করলাম। মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন আচমকা জেগে উঠল : আর্টিস্ট পঙ্কজ সেন কী করছে এখন ?

নির্জন ঝাউবনের নিঃসঙ্গ ছায়ার মধ্যে ইজেল পেতে ছবি আঁকছে সে। সমুদ্রের বাতাসে গানের সুরের মতো শোঁ শোঁ করে ঝাউগাছের অবিশ্রাম শব্দ উঠছে চারদিকে—আর দু-একটা পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে কখনো কখনো। ধ্যানস্থ হয়ে গেছে শিল্পী। তার সমাজ নেই, সংসার নেই—এমন কি হোটেলের আট নম্বর ঘরটাও নেই। তার সমস্ত ব্যক্তিক চেতনাকে আচ্ছন্ন আবৃত করে দিয়ে যেন একটা মেঘের পর্দা নেমে এসেছে, তার ওপরে রামধনুর মতো খেলা করছে রঙ ;—সেই রঙ সে বুলিয়ে চলেছে ইজেলের ওপর ক্যান্‌ভাসের পর্দায়। আসছে বছর অল্‌ ইণ্ডিয়া আর্ট এক্‌জিবিশনে আর একটা চাঞ্চল্যকর ছবি!

আর শিল্পীর স্ত্রী ? আপাতত সে তার জিনিসগুলো যথাস্থানে যথানিয়মে গুছিয়ে রাখছে। তার কাজ সাত-রঙের রূপকথা নয়, বড় বেশি বিরক্তিকর বাস্তব ; আর এই বাস্তবের সুব্যবস্থা না হলে সব মাটি হয়ে যাবে, পানের থেকে চুনটি খসলেই 'মুড' নষ্ট হয়ে যাবে আর্টিস্ট পঙ্কজ সেনের। ক্ষতি হয়ে যাবে সমস্ত দেশের, ব্যর্থ হয়ে যাবে একখানা অনবদ্য, আশ্চর্য ছবি। সে ক্ষতির কথা কল্পনাই করা যায় না!

শিল্পী চিরদিন নিঃসঙ্গ। সৃষ্টির জগতে সে একা—সেখানে তার কেউ নেই।

কিন্তু ইরা ? সে তো শিল্পী নয়। শিল্পীর মডেল, না—তাও নয়। এ নিঃসঙ্গতার দীক্ষা সে পাবে কেমন করে ? কেমন করে নেমে আসবে এই ধ্যানের অতলে—যেখানে সমাজ সংসার সব কিছু মায়া-মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে ?

উত্তর পাই না। শুধু বাইরে থেকে ব্রেকার ভাঙবার অশ্রান্ত কলরোল আসে।

যখন চমক ভাঙল, তখন দেখি একমুখ হাসি নিয়ে সামনে রামকুমারবাবু বসে আছেন।

—বাপ রে, কী ভয়ঙ্কর ঘুমোতে পারেন! সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল, বেড়াতে বেরুবেন না ?

লজ্জিত হয়ে আমি বিছানায় উঠে বসলাম। আর তখনি পর্দা ঠেলে চায়ের ট্রে নিয়ে এল রামানুজ। আমার দিকে কৌতুকভরা দৃষ্টি ফেলে বললে, দুবার এসে ঘুরে গেছি।

চার

রামকুমারবাবুর সঙ্গেই আবার বেরোনো গেল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রামকুমার বললেন, কোন্‌দিকে যাবেন ?

—একবার মন্দির দেখে আসা যাক চলুন। নীলমাধবের দর্শন নিয়ে পুণ্য করে আসি।

—তা মন্দ নয়। ফাঁকতালে পরলোকের কাজ যতটা এগিয়ে রাখা যায়, তাই ভালো। কী বলেন ?

—হাঁ, ইহলোকে যখন সুবিধে করা গেল না, তখন ওপারের ব্যবস্থা করে রাখা মন্দ নয়। একেবারে একূল ওকূল হারানোর মানে হয় না কিছু।

ফ্ল্যাগস্টাফের পাশ দিয়ে উঁচু রাস্তা ধরলাম আমরা। দক্ষিণে সমুদ্রের উল্লাস—বাঁদিকে হোটেলের সারি। সুইমিং কস্টিউম পরে এখান থেকে দু-চারটি বাঙালির ছেলে সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছে বৈকালিক স্নানের জন্যে। শাদা গাউন জড়িয়ে ভিজে চুলে রাস্তা পেরিয়ে গেল একটি শ্রীমতী বাঙালি তরুণী, স্নান করে এল। হঠাৎ ভারী ভালো লেগে গেল মেয়েটির সদ্য-ধোয়া উজ্জ্বল মুখখানা।

—যক্ষ্মা, স্নবারি, প্যান্‌পেনে কাব্য আর বাঁদরামি—রামকুমারবাবু স্বগতোক্তি করলেন।

একসঙ্গে এতগুলো মধুমাখা বাক্য শুনে চমকে উঠলাম আমি। বৃষ্টিধোয়া পদ্মের মতো একটি মেয়ের মুখের পদ্মে যেন ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা লাগল।

—হঠাৎ ?

রামকুমারবাবু হাতের লাঠিটা রাস্তার খোয়ার ওপর একবার ঠুকলেন : না, ও কিছু না। হোটেলগুলোকে দেখলে আমার ওসব মনে পড়ে যায়।

—কোনো ব্যঞ্জনা নেই ওদের মধ্যে ?

—ব্যঞ্জনা ?—রামকুমার ভ্রূকুঞ্চিত করলেন : হাঁ, খানিকটা জাপানী হুক্কো কবিতা বলতে পারেন। সেই যে কী বলে—পানাপুকুর, ব্যাঙের লাফ, জলের শব্দ—

আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথের প্যারডিও আছে :

> "ডাণ্ডা—
>
> ধপাৎ
>
> ঠাণ্ডা !
>
> কম্পাউণ্ড্ ফ্র্যাক্‌চার !"

—কিন্তু এ তো গেল প্যারালাল প্যাসেজ। আপনি কী বলতে চান ?

রামকুমার বললেন, টীকাটা সুখের হবে না। হোটেলওয়ালাদের পক্ষে নয়—আমার ক্ষেও না, ওদের সুনামের বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রোপাগ্যাণ্ডা করছি বলে মানহানির মামলা জুড়ে বসতে পারে আমার নামে।

—কিন্তু এই কি আপনার বক্তব্য ?

—না, আর একটু আছে।—রামকুমারের মুখ সিনিকের হাসিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল : একটা বাদ পড়ে গেছে। সে হল ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। কিন্তু কে তাদের বোঝাবে যে সমুদ্রের

নোনা হাওয়া ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার পরম মিত্র—সের দরে ভুবনেশ্বরের জল কিনে খেলেও তাকে তাড়ানো যায় না ?

আমার আঘাত লাগল।

—কিন্তু এ আপনার অবিচার। মাত্র কয়েকটা দৃষ্টান্ত নিয়েই আপনি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না।

—তা হবে—রামকুমারবাবু তর্ক করলেন না। হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন, ওঁর এ জিনিসটা আগেও লক্ষ্য করেছি আমি। কথা কইতে কইতে আচমকা সূত্র হারিয়ে ফেলেন, নিজের মধ্যে তলিয়ে যান, কী বলেছিলেন তা আর মনে থাকে না। তখন আবার আলোচনা আরম্ভ করেন অন্য প্রসঙ্গ ধরে।

বাঁচের পথ পার হয়ে আমরা কাছারীর দিকে মোড় ঘুরলাম।

—মিষ্টি খাবেন ?

—কেন বলুন তো ?—অনেকক্ষণ নীরবতার পর তাঁর এই আচমকা প্রশ্নে কেমন ধোঁকা লেগে গেল আমার। একটা আকস্মিক আর উদ্ভট প্রশ্ন।

—এখানে একটা বাঙালির মিষ্টির দোকান আছে। বেশ ভালো খাবার বানায়—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন রামকুমারবাবু।

—থাক, এখন দরকার নেই।—সকৌতুক কৌতুহলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম : আপনি বুঝি খুব মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন ?

—না, তা ঠিক নয়। কিন্তু কী জানেন—এখানকার বাঙালির যদি বিন্দুমাত্র মাধুর্য কোথাও অবশিষ্ট থেকে থাকে, তা হলে ওই মিষ্টির দোকানেই আছে।

—স্বজাতিনিন্দা করতে গেলে আপনার রসনা খরধার হয়ে ওঠে রামকুমারবাবু।

—কিন্তু এ আত্মনিন্দা নয়, আত্মসমালোচনা !—রামকুমার প্রখর চোখে তাকালেন : আর সে আত্মসমালোচনা যে করতে পারে না, তার অপঘাত অনিবার্য।

আমি সন্দিগ্ধ চোখে তাঁর দিকে তাকালাম।

—সত্যি করে বলুন তো, আপনার এ ধারণা কি এখানকার বাঙালিদের সম্পর্কেই, না সমগ্র ভাবে বাঙালি জাতটার ওপরেই আপনার আক্রোশ ?

—বাঙালির ওপর আক্রোশ ! বলেন কি !—একটা তীক্ষ্ণ হাসিতে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে উঠল : 'আমরা বাঙালি বাস করি সেই তীর্থে বরদ-বঙ্গে !' দুনিয়ার লোককে আমরা নস্যাৎ করে দিই মশাই—একেবারে জন্ম-নৈয়ায়িক ! এমন একটা বিচক্ষণ জাতের বদনাম গাইব মশাই—আমি কি এতই নরাধম !

এরপরে আমিই চুপ করে গেলাম। সত্যি বলতে কি তাঁর সাহচর্য এতক্ষণে আমাকে ক্লান্ত করে তুলছে, বিপর্যস্ত করে তুলছে আমার স্নায়ুকে। মুখের ওপর যেন একরাশ জমাট

অন্ধকারকে ঘনিয়ে রেখেছেন ভদ্রলোক। সেদিকে তাকালে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত উৎসাহ নিভে যায়—তাঁরই মতো একটা তিক্ত নৈরাশ্য এসে সমস্ত বোধকে আচ্ছন্ন করে ধরতে থাকে। নিজেকে একান্ত অকর্মণ্য আর অপদার্থ বলে মনে হয়।

বাকি পথটা প্রায় নীরবতার মধ্যে কাটিয়েই আমরা মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছুলাম। অমনি চারদিক থেকে পাণ্ডার অরণ্য গজিয়ে উঠল। মুহূর্তে ঘিরে ধরল চক্রাকারে।

—এই দিকে বাবু—এই দিকে।

—দর্শন হবে তো?

—বাবুর নাম কী—বাবুর পিতার নাম কী?

—আজ বড় ভালো দিন বাবু, সংক্রান্তি। পূজো দিন—মঙ্গল হবে।

পেছন থেকে একজন আমার জামা টেনে ধরল, জন দশেক কানের কাছে তারস্বরে বক্তৃতা শুরু করল।

—মশায় মেরে ফেলল যে!—করুণ কণ্ঠে আমি রামকুমারবাবুর কাছে আবেদন জানালাম।

অন্যমনস্কের মতো আমাকে পেছনে ফেলে তিনি কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলেন, আমার ডাক শুনে বোধ হয় চট্‌কা ভাঙল। তড়িৎ গতিতে ফিরে দাঁড়ালেন।

গম্ভীর গভীর গলায় ঘোষণা করলেন: বাবুর পাণ্ডা লাগবে না। পাণ্ডা আছে।

—কে পাণ্ডা?—আশা-ভঙ্গে একটা সমবেত কোলাহল উঠল।

—আমি। আমি পাণ্ডা!—আবার নাদধ্বনির মতো একটা গভীর রব বেরুল রামকুমারের গলা থেকে: সরে পড়ো সব—এখানে চিঁড়ে ভিজবে না।

—তুমি পাণ্ডা! তুমি আবার কি রকম পাণ্ডা?—একটা বিদ্রোহের কোলাহল শোনা গেল।

—একেবারে খাঁটি পাণ্ডা।—আদত ব্রাহ্মণ!—জামা সরিয়ে গেঞ্জির তলা থেকে পৈতেটা টেনে বের করলেন রামকুমার: দেখছ তো?

কয়েক মুহূর্ত, নীরব হয়ে গেল পাণ্ডার দল। যেন অবস্থার সম্ভাব্যতাটা ভেবে নেবার চেষ্টা করল একবার। রামকুমারবাবুর দাবিটা কতখানি মেনে নেওয়া যায়—কিছুক্ষণ তাই বিচার করে নিল হয়তো।

রামকুমার ভ্রূকুটি করলেন।

—আমি পুরীর লোক—বুঝেছ তো? কলকাতার বাবু নই যে মাথায় হাত বুলিয়ে পয়সা কামাবে। যাও, সরে পড়ো।

শেষ কথাটায় যেন মন্ত্রের কাজ হল।

ক্ষুণ্ণ চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে সরে গেল পাণ্ডার। শুধু দূর

থেকে শোনা গেল একজনের অস্ফুট গালাগালি : শড়া কৃপণো অছি। পাণ্ডাকো পয়সা দিবো না—নরকো যিবো।

মন্দিরের চৌহদ্দিতে ঢুকলাম আমরা। চোখে পড়ার মতো কিছু নয়—বড় বেশি সাধারণ। চিরকালের আন্‌ভিজিটেড্ ইয়ারো! কিন্তু ভয়াবহ কুশ্রীতার মতো তার গায়ে কতগুলো বীভৎস মূর্তি—তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে আসতে চায়। চতুর্বর্গের তৃতীয় বর্গের এমন বিকট ঘোষণা কোন ধর্মমন্দিরের গায়ে থাকতে পারে এ যেন কল্পনাও করা যায় না।

রামকুমারবাবু খুব সম্ভব আমার মনের কথাটা অনুমান করে নিলেন।

—মূর্তিগুলো খুব বিশ্রী লাগছে, না?

—শুধু বিশ্রী নয়—বিভীষিকা বলে মনে হচ্ছে।

—হওয়াই স্বাভাবিক—ব্যঙ্গাত্মক মৃদু ভঙ্গিতে তিনি হাসলেন : কিন্তু ওরও একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে।

—ব্যাখ্যা! কী ব্যাখ্যা?

—বুঝলেন না? ওরা বলতে চায়—যা কিছু লালসা-কামনা মন্দিরের বাইরে এম্‌নি করে রেখে এসো। তারপর মুগ্ধ শুদ্ধ চিত্তে মন্দিরে ঢুকে জগন্নাথকে প্রণাম করো।

—কিন্তু তত্ত্বের চাইতে ওর নগ্ন সত্যটাই যে বেশি খোঁচা দিচ্ছে মশাই। ওগুলো তুলে দেওয়া যায় না ওখান থেকে? মা বোনকে নিয়ে আসা যায় না যে এখানে!

—ওসব লৌকিক সংস্কার নিয়ে কি কখনো তীর্থক্ষেত্রে পদার্পণ করা যায়, সুকুমারবাবু? ঘৃণা লজ্জা ভয়কে একেবারে দমিয়ে দিয়ে তবে ঢুকতে হয় এখানে।—আবার সেই ব্যঙ্গভরা হাসি হাসলেন রামকুমার : তাছাড়া ওগুলো ওখান থেকে সরাবেই বা কে মশাই? ধর্মে আঘাত লাগবে যে। সনাতন হিন্দুত্বের পায়ের তলায় যে মাটি সরে যাবে। সে চেষ্টা কেউ করতে গেলে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে যাবে দস্তুর মতো। আর তা ছাড়া শুধু পুরীর মন্দিরকেই বা দোষ দিচ্ছেন কেন? কোণারকে যান, দাক্ষিণাত্যে যান—দেখবেন এর ছড়াছড়ি।

—সত্যি, ভারী জঘন্য!

—ওই তো আপনাদের দোষ। দু'পাতা ইংরেজি পড়ে ধর্মকর্ম বুঝতে চান না!—রামকুমারবাবু টেনে টেনে হাসলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, জগন্নাথ দর্শন করবেন?

—এসেছি যখন ওটাই বা ফাঁক থাকে কেন? সেরেই যাই।

—তা হলে কিন্তু পাণ্ডাদের দ্বারস্থ হতে হবে, খরচাও হবে কিছু।

—খরচা দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু উৎপাতটা না হলেই বাঁচি।

—সে ভার আমার—আসুন—

পাঁচ টাকা থেকে দরাদরি শুরু করে এক টাকাতেই রফা করা গেল পাণ্ডার সঙ্গে।

হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ, চতুর্ধাম পুণ্যভূমির অন্যতম পুণ্যচূড়া নীলমাধব দারুব্রহ্মের মন্দিরের মধ্যে পা দিলাম।

অন্ধকার। ভেতরে বিদ্যুতের আলো জ্বলে না—নিয়ম নেই। খুব সম্ভব পাণ্ডাদের প্রদীপ বিক্রি হবে না বলে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে—জগন্নাথকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে জগতের সমস্ত আলোর কাছ থেকে।

প্রদীপের আলোতেই ভক্তিভরে দেব দর্শন সাঙ্গ করা গেল। দু-পাশে সুভদ্রা এবং বলরামকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দারুব্রহ্ম। বাইরের মিথুন মূর্তিগুলোতেও হিন্দু ভাস্কর্যের যে অপূর্ব কলানৈপুণ্য উজ্জ্বল হয়ে আছে এইখানে এসে যেন তা থমকে থেমে দাঁড়িয়েছে। দেবতাকে কত কুৎসিত করে তৈরি করা যায়—তারই যেন একটা পরীক্ষা কার্য করা হয়েছে এখানে। আচমকা মনে হয় আফ্রিকার অরণ্য থেকে কোনো দারু-নির্মিত প্রেত দেবতাকে তুলে এনে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে! অথবা 'আজ্‌টেক আর্টে'র কোনো শিল্পী এসে ভারতবর্ষের মাটিতে রেখে গেছে তার প্রতিভার স্বাক্ষর!

কিন্তু রামকুমারবাবুর গলার আওয়াজ কেমন বিচিত্র শোনালো এইবার।

—জগন্নাথের চোখ দুটি দেখেছেন?

—দেখেছি।

রামকুমার ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, কেমন অদ্ভুত, না? ওই চোখ দুটোর দিকে তাকালেই আমি যেন তন্ময় হয়ে যাই। কী উজ্জ্বল—কী নিবিড়! মনে হয় যেন সমুদ্রের মতো অতল—যেন ওই চোখের মধ্যে আমিও নিশ্চিহ্ন হয়ে ডুবে যাই!

ভূতের মুখে কথাগুলো রামনামের মতো শোনাতে লাগল। কী বলব ভেবে পেলাম না।

রামকুমার বললেন, জানেন, ওই চোখ দুটোর একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। আমাকে প্রায়ই টেনে আনে। ওই চোখের দিকে তাকিয়ে মন্দিরের এক কোণায় আমি চুপ করে বসে থাকি—।

আমি শিউরে উঠলাম। রামকুমারবাবু এখন যদি ধ্যানস্থ হয়ে বসে পড়েন—তা হলেই সর্বনাশ। আমার দুর্ভাগ্য, মন্দিরের বদ্ধ অন্ধকার যেন আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে; ওই চোখ দুটির চাইতেও ঢের বেশি লোভনীয় মনে হচ্ছে বাইরের আকাশ ভরা আলোর হাতছানি—বিকেলের জোয়ার-আসা মাতাল ঢেউয়ের মাতামাতি। ইচ্ছে করছে, জলের ঝাপটার ভয় না রেখেই বালির ওপর কাঁকড়ার সন্ধানে ছুটোছুটি করে বেড়াই। সুতরাং যেমন করে হোক—ওঁকে এখন এখান থেকে বের করে আনা দরকার।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ি অন্ধকারেও বলে দিচ্ছে এখন প্রায় ছ'টা। সন্ধ্যার সময় আট নম্বর ঘরে চায়ের নেমন্তন্ন আছে ইরার। মন উস্‌খুস করে উঠল।

—এখন বেরুনো যাক রামকুমারবাবু। আমার আবার হোটেলে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—তবে চলুন—

সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিলেন রামকুমার। বুঝলাম—অন্য কথা ভাবছেন। হয়তো নীল-মাধবের কালো চোখের রহস্যময় গভীরতার মাঝখানেই হারিয়ে ফেলেছেন মনকে। ওঁর মতো সিনিকের কাছে জিনিসটা প্রত্যাশা করা যায় না—তবু বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। মনের ভেতর যত শক্ত করেই লোহার বাসরের প্রাচীর গড়া যাক—একটা ছিদ্র কোথাও থাকেই ; বুদ্ধির হাজার সতর্ক পাহারা এড়িয়েও, কোন্‌খান দিয়ে যে আসে আবেগের সরীসৃপ—তা কি আমরা নিজেরাই জানি ?

খানিকটা এগিয়ে এক জায়গায় আমি একটা হোঁচট খেলাম।

রামকুমার হাত ধরে পতনটা রক্ষা করলেন। তাকালেন আমার দিকে, বিকেলের আলোয় তাঁর চশমার কাচটা জ্বলজ্বল করতে লাগল।

—জানেন, কী এটা ?

—কী ?

—গরুড় স্তম্ভ। এইখানে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন আকুল দৃষ্টিতে মহাপ্রভু তাকিয়ে থাকতেন নীলমাধবের মূর্তির দিকে—দু চোখ দিয়ে অবিরাম জল ঝরে পড়ত। পড়েননি ?

"গরুড় স্তম্ভের নীচে আছে নিম্নখালে,
সেই খাল ভরিল প্রভুর অশ্রুজলে।"

আমি দাঁড়িয়ে গেলাম—মুহূর্তে আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ভক্তি নয়—ধর্ম নয়—কিছুই নয়। হঠাৎ এই অন্ধকার মন্দিরের ভেতর থেকে যেন একটা করুণ আর্তি, একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার জ্বালা আমার চারপাশে এসে কুয়াশার মতো ঘিরে দাঁড়াতে লাগল। মনে পড়ল—কী অসহ্য আকুলতায় সেদিন ঘর-সংসার সমস্ত ছেড়ে সেই 'কনক-বরণ গোরা' নীলাচলের এই তীর্থপথে ছুটে এসেছিলেন। হয়তো এইখানেই ভাবের আবেগে তিনি অচেতন হয়ে পড়েছিলেন—নিশ্বাস ছিল না—জীবনের লক্ষণ ছিল না। মন্দিরের পুরোহিতেরা এই অনধিকারীকে আঘাত করবার জন্যে ছুটে এসেছিলেন—আর সেই সময় তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন সৌম্য শান্ত এক দীর্ঘাকার মানুষ। নীলাচলের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তিনি—তাঁর নাম বাসুদেব সার্বভৌম। তারপর :

"যে ভট্টাচার্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদে।
তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদে॥
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে॥

ভট্টচার্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥"

কোথায় গেল দুর্জয় তার্কিক—মিথিলাবিজয়ী সেই দুর্ধর্ষ পণ্ডিত! এই গরুড় স্তম্ভের তলায় যে অশ্রুর বিন্দু দিনের পর দিন ঝরে পড়ল—সেই অশ্রুতে কত সার্বভৌম, কত বেদান্তবাগীশ নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেলেন!

ধর্মবিশ্বাস নয়—ভাবের আবেগ নয়, একটা অপূর্ব বেদনাভরা ইতিহাস যেন মনের মধ্যে ছায়া জমাতে লাগল! মনে হতে লাগল, এই অন্ধকার মন্দিরের প্রতিটি অণুতে অণুতে একটা নিঃশব্দ হাহাকার বেজে উঠছে : হা কৃষ্ণ হা জনার্দন—মোর প্রাণনাথ!

এবার নেশা ধরবার পালা আমার। কিন্তু রামকুমারবাবুই ঘোর ভেঙে দিলেন।

—কই মশাই, আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? হোটেলে এন্‌গেজমেণ্ট আছে বলছিলেন না?

—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—চলুন—অপ্রতিভ ভাবে আমি পা বাড়ালাম।

মন্দির ছাড়িয়ে খানিকদূর হাঁটবার পরে রামকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, সোনার গৌরাঙ্গ দেখেছেন?

বুঝলাম আমার ভাবনাটা অনুমান করেছেন। হেসে বললাম, না, কোথায়?

—চক্রতীর্থ ছাড়িয়ে আরো খানিকটা। যান—দেখে আসুন!

—থাক। উৎসাহ হচ্ছে না।

—কেন বলুন তো?—রামকুমার অভয় দিলেন : ভয় নেই, সেখানে পাণ্ডাতে উপদ্রব করবে না।

—পাণ্ডার জন্যে নয়। আমি ভাবছিলাম, সনাতন গোস্বামীর গায়ে তিন টাকা দামের ভোট-কম্বল পর্যন্ত যিনি সহ্য করতে পারেননি, নিজের সোনার মূর্তি দেখে সে সন্ন্যাসী কতটা খুশি হচ্ছেন।

রামকুমার মৃদু হাসলেন : ভক্তির ওপরে তো আর ভক্তিভাজনের হাত নেই—ওটা ভক্তের এলাকায়। তারা যেমন করে খুশি তাঁর পূজো করবে।

—তা বটে। তবে ভক্তির উপসর্গ টা মাঝে মাঝে দেবতাকে অনেকখানি টেনে নামায়। বিশ্বনাথ মাখেন ছাই, আর তাঁর সেবায়েৎ পরেন সোনার হার। এবং সে সোনার হারের পেছনে যে-সব কাহিনী মেলে, সেগুলো উহ্য থাকাই ভালো।

—আপনি দেখছি দারুণ সীরিয়াস্ হয়ে উঠছেন—রামকুমার এবার সশব্দে হেসে উঠলেন।

—আপনার সঙ্গগুণে বলতে পারেন—আমি পাল্‌টা জবাব দিলাম : কিন্তু চৈতন্যদেব সম্বন্ধে একটা কথা আমি বলব। তাঁর জায়গা মন্দিরে হওয়া উচিত নয়—পার্কে।

—পার্কে? মানে? নিন্দে করছেন নাকি?—রামকুমার সবিস্ময়ে জানতে চাইলেন।

—নিন্দে নয়। চৈতন্যদেবের ধর্মতত্ত্ব যাই থাক, আসলে তিনি সোশ্যাল রিফর্মার। রামমোহন রায়ের হাতে পড়ে যা ঘটেছে, চৈতন্য তারই সূচনা করে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর মূর্তি পার্কে বসানো উচিত—মন্দিরে নয়।

—চৈতন্যের এ কি বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা মশাই!

এটা ঐতিহাসিক সত্য। ওঁর সময়টা দেখুন। তিন দিক থেকে ওঁকে লড়তে হয়েছে। একদিকে মহাযান-তন্ত্রের বিকৃত রূপ, অন্যদিকে অদ্বৈতবাদের মরীচিকা, আর এক দিক থেকে হোসেনসাহি ঔদার্যের পথে ইসলামের জয়যাত্রা। দেশের লোকে ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছিল। চৈতন্য তাদের হাতে বাঁচবার উপায় তুলে দিলেন শুধু হরিনাম জপের সোজা রাস্তায়। অভিচার ব্যভিচার থেকে লোকে রক্ষা পেল, পরিত্রাণ পেল 'তত্ত্বমসি'র দুর্বোধ্য শুষ্কতা থেকে। ওদিকে আচণ্ডালকে কোল দিয়ে ঐশ্লামিক ভ্রাতৃত্ব এনে দিলেন সমাজের ভেতর। নইলে এত দিনে দেশে একটাও হিন্দু থাকত নাকি?

—হুঁ, বুঝেছি আপনার যুক্তি। আপনি এইজন্যেই গড়ের মাঠে মহাপ্রভুর স্ট্যাচু বসাতে বলছেন।—রামকুমার গম্ভীর হয়ে বললেন, কিন্তু হিন্দু না থাকলে সত্যিই কি কোনো ক্ষতি হত?

আমি হাসলাম: সেটা আলাদা কথা। কিন্তু সমাজেই বলুন আর সাহিত্যেই বলুন, বাংলা দেশে চৈতন্যই প্রথম ডিমোক্র্যাসির বন্যা এনে দিয়েছেন। যে যুগে কায়স্থ গুরুর পায়ের ধুলো ব্রাহ্মণ শিষ্য মাথায় রেখেছেন, তার সোশ্যাল ভ্যালু ভাবতে পারেন? আরো সেই অদ্বৈতবাদের ভয়াবহ প্রতিপত্তির সময়? দেখুন না—মনের বন্ধনটা ঘুচল বলেই বাংলা-সাহিত্যে কী বিরাট একটা স্বর্ণযুগ গড়ে উঠল সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সাহিত্যের উৎকর্ষই জাতির একটা রেনেসাঁসের লক্ষণ।

—নিজের আওতায় এসে পড়ে সুকুমারবাবুর মুখ খুলছে—রামকুমার সশব্দে হাসলেন: তবে ধর্মপ্রাণ এই দেশ আপনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মানলে হয়! গোবর দিয়ে যারা মার্বেলের মেজে পবিত্র করে মশাই, তাদের এত সহজেই আপনি দমাতে পারবেন না।

—তা পারব না। তবু সোনার গৌরাঙ্গের কথায় আমার আপত্তি আছে।

—আপনার আপত্তি থাকলো তো রয়েই গেল! আপনি তো আর একদিনও বৈষ্ণবদের গাঁটের কড়ি খসিয়ে 'ভাণ্ডারা' খাইয়ে আসছেন না। সুতরাং ও সব থাক। তার চেয়ে একটা রিক্‌শা থামানো যাক মশাই—আর হাঁটা যাচ্ছে না।

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, ডাকুন রিক্‌শা। কথায় কথায় আমার চায়ের নেমন্তন্নটার ব্যাপারও আমি বেমালুম ভুলে যাচ্ছিলাম।

পাঁচ

আর্টিস্ট্ পঙ্কজ সেনই অভ্যর্থনা করলেন।

—আসুন, আসুন মিস্টার গুপ্ত।

আট নম্বর ঘরে পা দিলাম।

হোটেলের ঘর—আরো বিশেষ করে মধ্যবিত্ত হোটেল। তক্তাপোশ ছাড়া বাড়তি আসবাবের মধ্যে একটা ছোট ডাইনিং টেবিল, দু'খানা চেয়ার, দেওয়াল ঘেঁষে ছোট একটি আলমারী। চেহারাটা ব্যবহারিক এবং নিরাভরণ!

তবু শিল্পীর স্ত্রী এরই মধ্যে একটুখানি ছোঁয়া দিতে চেয়েছে নিজের হাতের। একটু রং ধরাতে চেয়েছে প্রয়োজনের শূন্যতার ওপর। ডাইনিং টেবিলটার লজ্জাকে ঢেকে দিয়েছে সমুদ্রনীল একখানা টেবিল ক্লথে—কটকী জিনিস, পুরী থেকেই কেনা। হোটেল-ওয়ালার কাছ থেকে চেয়ে এনেছে মিনার কাজ-করা দুটি কাশ্মীরী ফুলদানি—তাতে দুটি কণ্টকপত্রী আধফুটন্ত কেয়া। কয়েকটি ধূপকাঠি জ্বলছে আলমারীটার মাথার ওপর। সমুদ্রের এক একটা হাওয়ার ঝাপটায় ঘরের ভেতর ধূপ আর কেয়ার উগ্র মধুর গন্ধ আবর্তিত হচ্ছে।

—আসুন মাস্টারমশাই, বসুন—এবার ইরা সম্বর্ধনা জানালো।

একটা চেয়ারে বসলাম। পঙ্কজ সেন টেবিলের কোণা ধরে একেবারে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

—আপনার নাম শুনেছি ইরার মুখে অনেকবার। দু-একটা লেখাও পড়েছি—মন্দ লাগেনি।—কৈফিয়ৎ দেবার একটা বিনীত ভঙ্গিতে হাসলেন পঙ্কজ সেন : অফ্ কোর্স সাহিত্য-টাহিত্য আমি তেমন পড়ি না—বিশেষ বুঝিও না।

ভালো করে দেখলাম আর্টিস্ট্ পঙ্কজ সেনকে। ফর্সা লম্বা চেহারা; উজ্জ্বল গৌর নয়, একটু পীতাভ, একটু স্তিমিত। ওভালশেপ মুখ, দার্শনিকের চওড়া উন্নত কপাল,—কোঁকড়া চুলের কয়েকটা অবিন্যস্ত কুণ্ডলী নেমে এসেছে সেখানে। চোখের দৃষ্টি চঞ্চল—তন্ময়তা নেই, একটা অস্থিরতার আভাস আছে।

—সাহিত্যে আপনার তেমন অনুরাগ নেই বুঝি?

মাঝামাঝি ধরনের প্রশ্ন করলাম একটা।

—অনুরাগ নেই? আমার মুখোমুখি চেয়ারটায় বসলেন পঙ্কজ সেন : না, ঠিক তা নয়। কি জানেন সুকুমারবাবু—মিস্টার গুপ্ত ছাড়িয়ে এবার অন্তরঙ্গতার পরিধিতে নামলেন তিনি : মুশকিল হচ্ছে এই—ঠিক সময় পাই না। যদিও জানি একদিক থেকে

আমরা সমমর্মী, তবুও ঠিক সহধর্মী বলা যায় না। তাই সাহিত্য পাঠটাকে যথেষ্ট অবকাশ দিতে পারি না।

—স্বাভাবিক।—ভদ্রতার খাতিরে আমি জবাব দিলাম।

কিন্তু স্বাভাবিক! নিজের মনের কাছেই এমনি একটা প্রশ্ন জেগেছে বার বার। সাহিত্য ঠিক কাদের জন্যে? শিল্পীর ক্ষেত্র ক্যান্‌ভাসের মধ্যে সীমিত; সুরের রেখাচক্রে নির্ধারিত গায়কের পৃথিবী; কেরানীর জন্য উদয়াস্তের ট্রামযাত্রা; সিরিঞ্জের কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ডাক্তারের 'প্রোটেক্টেড্ এরিয়া'; ল রিপোর্টের গ্র্যানিট্ প্রাচীর 'বারের' চতুর্দিকে ঘিরে আছে; ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ। তবে? তবে কার জন্যে সাহিত্য—কে পড়বে সাহিত্য?

সাহিত্যিক বন্ধুরা—যাদের পয়সা দিয়ে বই কিনতে হয় না? কাগজের সমালোচক—যাঁরা বিনামূল্যে বই পান এবং অকুণ্ঠ নিন্দা আর উচ্ছ্বসিত স্তুতির দ্বিমুখী পথে যাঁদের পরিক্রমা? আর গুটিকয়েক লাইব্রেরীর পাঠক—যাঁরা এক সপ্তাহের খোরাক সংগ্রহের জন্য পৃথুলকায় উপন্যাস খোঁজেন? এবং মহিলারা, দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাকর্ষের জন্যে একখানা বাংলা উপন্যাস যাঁদের দরকার?

চিন্তাটাকে থামিয়ে দিলে ইরা।

—এক মিনিটের জন্যে মাপ করুন মাস্টারমশাই—আমি একটু চা-টা দেখি।

—নিশ্চয়।

ইরা বেরিয়ে গেল। অন্যমনস্কভাবে একবার সেদিকে দেখলেন পঙ্কজ সেন, তারপর আবার আমার দিকে তাকালেন।

—কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি সুকুমারবাবু।

—স্বচ্ছন্দে।

—আজকের বাংলা সাহিত্য কি খুব বেশী ডেটোরিয়েট করেনি? এখন একখানা বই বা এমন একজন লেখকের কি নাম করতে পারেন—যাঁর লেখা ক্লাসিক হয়ে থাকবে?

বললাম, এটা যুগের ট্রাজেডি। ঠিক যুগের নয়—যুগসন্ধির। রোমাঁ রোলাঁ এর জবাব দিয়েছেন। তাঁর মতে যুগসন্ধির প্রথম বলিই হল সাহিত্য।

—আরো স্পষ্ট করে বলুন।—পঙ্কজ সেন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন একটু। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টি পড়ল ওঁর হাতের চেটোর দিকে। নিটোল পরিপুষ্ট হাত—উন্নত মাউণ্ট্ অব জুপিটার, রেখা-জটিল ভেনাস। গায়ের রঙের চাইতে হাতের তেলো আরো বেশি হরিদ্রাভ। সামুদ্রিক বিদ্যায় আমার বিশ্বাস নেই, নইলে বলা যেত: প্রতিভার সঙ্গে মিশেছে শিল্প-কল্পনার বহুমুখী জটিলতা; হাতের আপীত-বর্ণে একটা নিষ্ঠুরতার ব্যঞ্জনা।

নিষ্ঠুরতা? ঠিক জানি না। হয়তো ইরা বলতে পারে।

পঙ্কজ সেন আবার বললেন, আপনার কথাটা আর একটু স্পষ্ট করুন।

আমি সংযত করে নিলাম নিজেকে : হ্যাঁ—সেই কথাতেই আমি আসতে চাইছি। আসল সমস্যাটা কোথায় জানেন? জীবন আর দর্শনের মূল্যমান যখন একটা পরিপূর্ণ বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়ায়—তখন সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেয় বুদ্ধিজীবীর। একদিকে তার পিছুটান—অন্যদিকে নতুন সম্পর্কে আশা অবিশ্বাসের অনিশ্চয়তা। এই দোটানার মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্যে থেমে দাঁড়াতে হয় তাকে। এই দ্বিধা তাকে এগোতে দেয় না—কিছুক্ষণ পথ খুঁজে মরতেই হবে—উপায় নেই।

—তাহলে বাংলা সাহিত্য এইখানেই থমকে থাকবে? এর কোনো ভবিষ্যৎ নেই?

—বর্তমানের দ্বিধাটা সেই ভবিষ্যতেরই প্রস্তুতি-পর্ব। মতভেদ দেখা দেবে, তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠবে, পরস্পর সম্পর্কে জাগবে তিক্ততার বিষাক্ত সন্দেহ। কিন্তু বিরোধই তো প্রাণের লক্ষণ।

—আপনার কথাগুলো এখনো ঝাপসা—শুধু থিয়োরির বিবৃতি। আরো স্পষ্ট করুন—আরো কংক্রীট।—পঙ্কজ সেন হাসলেন।

—বলছি। সোজা কথায় ধরুন, আজকের সাহিত্য নিজেকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে নিতে পারছে না। আর আজকের রাজনীতি রাজার নীতি নয়—একেবারে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ব্যাপার। সমাজ বলুন, জীবন বলুন, মনোভঙ্গি বলুন—সব কিছুর ওপর এর চেতন-অচেতন ছাপ পড়ছে। আর এই রাজনৈতিক পথ নিয়ে সাহিত্যিকদের মধ্যে ঘটছে মতভেদ—সেই সঙ্গে প্রচুর মনোভেদও বটে। সাম্যবাদের সাধারণ লক্ষ্য থাকলেও পথের পার্থক্য অনেক; অনিশ্চিতকে তা আরো অনিশ্চয় করে তুলছে।

—তারপর? এর শেষ কোথায়?

—রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাটা যত স্পষ্ট হয়ে উঠবে, লেখকের লক্ষ্য ততই স্থির হয়ে আসবে। সে ঠিক বুঝতে পারবে কাদের জন্যে সে লিখছে—কী সে লিখছে। আর এটা তো নিশ্চয় মানেন যে কোনো একটা তরল ভিত্তির ওপর পাকা গাঁথুনির বনিয়াদ দাঁড়াতে পারে না! ক্লাসিক সাহিত্য রচিত হয়ে গড়ে ওঠে কতকগুলো স্থায়ী মূল্যের স্তম্ভে ভর দিয়ে। সেই স্তম্ভই যখন গড়ে উঠছে না তখন আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে বইকি।—আমি হাসলাম : তবে খুব বেশিদিন নয়। সময় এগিয়ে আসছে, বিশ্বাসের মাটি আমরা খুঁজে পাচ্ছি পায়ের তলায়। মতভেদ যতই থাক—মানুষের কল্যাণবোধের ঐক্যে সব লেখক সেদিন পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবেন।

—তাহলে সেইদিন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হবে?

—হবে বইকি। সাহিত্যিক তো চিরকাল সাধনা করে এসেছে মানুষ আর জীবনের জন্যেই। মানুষের কল্যাণ-চেতনার ওপর আমাদের সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তিত্বের মুক্তি—

সামাজিক বন্ধন মোচন।

—শুনতে মন্দ লাগল না।—একটা সিগারেট ধরালেন : পায়াস্। কিন্তু একদিকে যেমন আপনারা ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন যুগসন্ধির ঘা খেয়ে, অন্যদিকে সাহিত্যের নামে এক ধরনের নোংরামি সারা বাজার ছেয়ে ফেলছে। আমি তো বিশেষ পড়ি-টড়ি না, তবু সেদিন হাতে একটা ছোট কাগজ পড়ল। খুলে দেখি কিছু বাজে কার্টুন, আর জঘন্য গালাগালি। আরে মশাই, তাতে তো আপনাকেও বেশ এক হাত নিয়েছে দেখলাম। সাহিত্য থেকে শুরু করে চৌদ্দপুরুষ ধরে বাপ-বাপান্ত করেছে, আপনার পার্সোনাল লাইফ নিয়েও কী কতগুলো বলেছে।

বললাম, আমার লেখা সকলের ভালো লাগবে, অমন অদ্ভুত দাবি করবার মতো মনের বিকার এখনো ঘটেনি। তা ছাড়া ব্যর্থতার মূল্য তো নিতেই হবে। পাঠক সমালোচক নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করবে না। বাংলার দিকপাল লেখকেরাও কেউ সমালোচনার উর্ধ্বে নন, আমার প্রশ্ন তো ওঠেই না। আর কুৎসিত গালাগালি? কুৎসিতের মানদণ্ড সকলের কাছে তো এক নয়। আপনার আমার কাছে যা অশ্রাব্য, অনেকের কাছে তা সাধারণ সম্ভাষণ।

—কিন্তু ওরকম সম্ভাষণটা অঞ্চল বিশেষে চলে বলেই জানতাম। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়।

—সাহিত্যের ক্ষেত্রই কি একটা?—আমি হাসলাম : তাতেও অঞ্চল বিশেষ আছে। কিন্তু সে কথা বলছি না। আজ যে এইসব পত্র-পত্রিকা গজিয়ে উঠছে, তার পেছনে নিশ্চয়ই সমর্থন আছে বাংলা দেশের পাঠক-সাধারণের। আর পাঠক যখন এ জিনিস চায়, তখন বুঝতে হবে এরও প্রয়োজন ছিল।

—প্রয়োজন? পঙ্কজ সেন ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন : তাড়ির আড্ডার প্রয়োজন বলুন?

আলোচনাটায় সাময়িক ভাবে ছেদ পড়ল। চায়ের ট্রে হাতে ঢুকল রামানুজ। পেছনে পেছনে ইরা।

—এসব কী? এত আয়োজন?—আমি শিউরে উঠলাম।

—খালি পেটে চা খেতে নেই।—সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে ইরা।

—তাই বলে, এত?

—যত বেশি ভাবছেন, তত নয়। তা ছাড়া আমরাও আছি, ভাগাভাগি হয়ে যাবে —পঙ্কজ সেন হাসলেন।

আমাদের খাবার সাজিয়ে দিয়ে শুধু এক কাপ চা নিয়ে বিছানায় বসল ইরা।

—ও কি, তুমি কিছু নিলে না?

—বিকেলে তো আমি কিছু খাই না মাস্টারমশাই।

—ও।—ভদ্রতা করে আরো কিছু আমি বলতে চাইলাম, কিন্তু কথা এল না। অদ্ভুত নিঃসঙ্গ লাগল ইরাকে, আশ্চর্য বিষণ্ণ। ঘরের ম্লান আলোয় একটা শান্ত করুণতার মতো মনে হল তাকে। বাইরে থেকে আবার সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল—আবার দেখলাম পঙ্কজ সেনের একখানা হাত পড়ে আছে টেবিলের ওপর। মাউন্ট অব জুপিটারের ওপর আলো পড়েছে, হাতের পীতাভ বর্ণে নির্মমতার ব্যঞ্জনা। কিন্তু—কিন্তু সামুদ্রিক বিদ্যায় তো আমি বিশ্বাস করি না!

এক টুকরো ফ্রেঞ্চ টোস্ট দাঁতে ছিঁড়ে নিয়ে ভরামুখে পঙ্কজ সেন বললেন, কিন্তু আলোচনাটা চলুক—থামলেন কেন? চায়ের সঙ্গে জলযোগ।

—জলযোগের ব্যবস্থাটা এত প্রচুর যে আর বাড়িয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে বলুন মাস্টার্ড। কিংবা ভেজিটেবল্‌স্।

—উপমা যা খুশি দিন—পঙ্কজ সেন চায়ের পেয়ালার দিকে হাত বাড়ালেন: স্বাদ বাড়ালেই হল। চালিয়ে যান।

—কী বলব বলুন?

—আমার শেষ কথাটার তো জবাব দেননি?

—তাড়ির আড্ডার কথা বলছিলেন? হাঁ, তারও দরকার আছে।—কথা শুরু করার আগে আমি একবার তাকিয়ে নিলাম ইরার দিকে। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে তন্ময় হয়ে বসে আছে। হয়তো আমাদের কথা শুনছে না, হয়তো শুনতে পাচ্ছে না। সমুদ্র। তার তরঙ্গ-গর্জন আমাদের কানে আসছে, তার অতলে লীন হয়ে আছে ইরা।

চোখ ফিরিয়ে নিলাম। যেমন আছে, তেমনি থাক। ইরা চৌধুরী নেই—এখন ইরা সেন। 'চিত্রা'র ক্লাস নয়। 'হৃদয় যমুনা'। অকারণে মনে হল: 'যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও সলিল মাঝে'—

পঙ্কজ সেন মুখ থেকে পেয়ালা নামালেন। অ্যাশট্রেতে রাখা চুরুটটা তুলে টান দিলেন একটা:

কী প্রয়োজন?

—কিসের?—বলেই লজ্জা পেলাম। ইরা থাক—যেখানে আছে সেখানেই থাক।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—যা বলছিলাম। আমি গুছিয়ে আনলাম নিজেকে: আসল কথা, খাদ্যে যখন মানুষের তৃপ্তি হয় না, তখনি সে নেশা করতে ছোটে। আজকের সাহিত্য মনের খোরাক দিতে পারছে না, তাই পাঠকের মন তাড়ির খোঁজ করছে। এর জন্যে অনিচ্ছায় হোক, ইচ্ছায় হোক বাংলা দেশের সাহিত্যিকরাই দায়ী। আজকের লেখক যদি দেউলিয়া হয়ে যায়, তবে পাঠক তার মনের খোরাক খুঁজে বেড়াবেই—সে যেখান থেকেই হোক।

—কিন্তু এ যে ভয়ঙ্কর দুর্লক্ষণ মশাই।

—কিছু না। পৃথিবীর সব দেশেই এমন হয়ে থাকে। এখনকার অ্যামেরিকান পত্র-পত্রিকাগুলো নাড়াচাড়া করবেন, দেখবেন কোন্ স্তরে নেমে গেছে সব। এই স্বাভাবিক। রক্তে জোর না থাকলেই গায়ে ব্রণ দেখা দেবে। ভাববেন না, নতুন সাহিত্য যেদিন বাংলা দেশে গড়ে উঠবে—সেদিন আর এদের চিহ্নও থাকবে না।

—সম্ভব।—পঙ্কজ সেন চিন্তা করতে লাগলেন। আমিও চুপ করে গেলাম। কেমন আকস্মিক ভাবে থেমে দাঁড়িয়েছি, আর কথা আসছে না। ঘরের ভেতর ইরার সেই নিঃশব্দ সুদূর উপস্থিতি। একটু একটু করে যেন ভার জমে উঠেছে আমার মনের ভেতর।

—এখন তো কলকাতাতেই আছেন মাস্টার মশাই?—চমকে উঠলাম। ইরার স্তিমিত চোখ দুটো চকিত হয়ে উঠেছে।

—হ্যাঁ।

—সেই কলেজেই?

—কোথায় আর যাব? তা ছাড়া কলেজটার ওপর মায়াও পড়েছে, একটা সুখদুঃখের সম্পর্ক এসে গেছে।

—আমাদের মর্নিং সেক্‌শন?

—খুব বড় হয়ে গেছে। বিস্তর ছাত্রী আজকাল।

—বেশ ছিলাম।—ইরা যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। কিন্তু আমার আর ভালো লাগছে না। কেন বকলাম এতক্ষণ—কী দরকার ছিল এতগুলো কথা বলবার? বহুদিনের ভুলে যাওয়া একটা রাত মনে ভেসে এল ছবির মত। শীতের আড়ষ্ট কুয়াশায় মধ্যরাত্রির কলকাতায় মড়া নিয়ে চলেছি আমরা জনসাতেক। জড়তা আর বিরক্তিকে চাপা দেবার জন্যে তারস্বরে একটা বিকট হাসির গান ধরেছে এক বন্ধু—হো হো করে হাসছি আমরা। আর আসবার আগে দেখেছি ঠাণ্ডা একটা স্যাঁৎসেঁতে মেঝেতে একমাথা চুল ছড়িয়ে অচেতন হয়ে পড়ে আছে মৃতের বধূ—তার বয়স সতেরো-আঠারোর বেশি নয়!

এসব স্মৃতির কি কোনো অর্থ আছে? কী প্রয়োজন আছে এর: পুরীর এই হোটেলে—সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে অনুজ্জ্বল আলোয় একটা চায়ের আসরে!

কিন্তু পঙ্কজ সেনের পীতাভ হাতখানা আমার সামনেই মেলা আছে। এত সহজেই তিনি আমায় ছাড়বেন না। টেবিলের ওপর আর একটা সিগারের গোড়া ঠুকতে ঠুকতে বললেন, আচ্ছা, মডার্ন আর্ট সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়?

ছয়

পুরীতে এলেই কবিতা লিখতে হয়। অন্তত যারা আসে, তারাই লেখে। এটাকে বলা যেতে পারে অলিখিত আইন। মানাবার জন্য কেউ লাঠি হাতে করে বসে নেই, কিন্তু না মানলেও মনটা যেন খুঁতখুঁত করতে থাকে।

সুতরাং আমিও কিছু চেষ্টা করে দেখি। এককালে চর্চা খানিকটা ছিল ; হাতের কাছে 'টেল পীস' না পেলে বহু সম্পাদক আমার কবিতা দিয়েই তাঁদের সমস্যার সমাধান করেছেন। উড়ন্ত পরী জাতীয় একটা ধ্যাব্ড়া ব্লক যদি তাঁদের সময়মতো না জুটে থাকে, আমার দুরন্ত কবিতা তাঁদের সেবার্থে সব সময় তৎপর হয়ে থাকত।

সমুদ্র নিয়ে কবিতা তো লিখব, কিন্তু লিখি কী ছাই। যাও দু-চারটে ভাবের বুদ্বুদ ফোটবার উপক্রম করছিল, রামকুমার তাদের সর্বনাশ করে দিয়ে বসে আছেন। তা ছাড়া সৃষ্টির একেবারে আদি থেকে শুরু করে পৃথিবীর যত কবি সমুদ্র আর পাহাড় নিয়ে এত টানাটানি করেছেন যে বলার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট রাখেননি তাঁরা।

সংস্কৃতের কবিরা দুঃখ করেছেন যে মহাকবি বাণের জ্বালায় তাঁদের আর কিছু লেখবার নেই—রাজকবি সব কিছু উচ্ছিষ্ট করে দিয়ে বসে আছেন। রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্মে আমাদেরও সেই দুর্গতি। তাঁর নিজের ভাষাতেই "শুধু যে তিনি অন্যায়রকম বেঁচেছেন" তাই নয়, সব কিছুতেই অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেও রেখেছেন। যেদিক দিয়েই যাওয়া যাক— "সম্মুখে রয়েছে বসি পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর।" সুতরাং গভীর ক্ষোভের একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলতে হয় : "রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি!"

সত্যেন দত্ত ছন্দ নিয়ে এমন করে আসরে নেমেছিলেন কেন, এখন সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। ভাবের দিকটায় রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে পাথরের দেওয়াল তুলে দিয়েছিলেন যে সেদিকে আর ভালো করে পা বাড়াতেই পারলেন না ভদ্রলোক। অগত্যা নিরুপায় হয়ে কখনো সাঁওতালী সুর সাধলেন, কখনো বা স্যার ওয়াল্টার স্কটের পাল্লায় পড়ে হাইল্যাণ্ডারী ড্রাম বাজালেন ইয়ং লোচিনভার ছন্দে ; কখনো মন্দাক্রান্তাকে আক্রান্ত করলেন আবার কখনো বা মল্লক্রীড়া করলেন পঞ্চ-চামরের সঙ্গে। ট্রাজেডি আর কাকে বলে!

আমিও কি তাই করব নাকি? কবিতা হোক বা না হোক—অন্তত একটা শব্দ-কল্পদ্রুম দাঁড় করাবার চেষ্টা করব? উঁহু, সেও সুবিধে হবে না—হাতের কাছে আড়াই-মণী অভিধান নেই।

কিন্তু কিছু আমাকে চেষ্টা করতেই হবে। কারণ, আজ রাতে ঘুমের দফা শেষ করে দিয়েছেন পঙ্কজ সেন। একটু পরেই ইরা তো ছাতের দিকে সরে পড়ল, কিন্তু আর্টিস্ট্

ছাড়বার পাত্র নন। সাহিত্য-চর্চার পালা চলতে চলতে কখন যে এজ্‌রা পাউণ্ডের কবিতা এসে পড়ল কে জানে, তার পরেই পঙ্কজ সেন সোজা নিজের ক্ষেত্রে চলে এলেন। পাউণ্ডের কবিতার পাশে পাশে চলে এল আর্টের স্যুর-রিয়্যালিজম। কোত্থেকে টেনে বার করলেন, 'স্যালভেডর ডালীর' অ্যাল্‌বাম এবং তারপরে শুরু করে দিলেন ছবিগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা।

আর্টের সমঝদার হিসেবে আমার কোনো দাবি নেই। ছবি দেখে যাদের চোখ খুশি হয় এবং কখনো কখনো মন দোল খেয়ে ওঠে, আমি তাদেরই দলে। আর্ট একজিবিশনে ঘুরতে আমার ভালো লাগে—অবশ্য একা একা। বন্ধু যদি মনের মতো একটি জুটে যায় ক্ষতি নেই, কিন্তু কোনো মহিলাকে (ক্ষমা করবেন, ব্যতিক্রমের কথা মনে রেখেই বলছি) —বিশেষ করে আর্ট-রসিকা যদি হন—সঙ্গে করে ছবি দেখতে যাওয়ার মতো দুর্ভোগ আর হতে পারে না। তাঁদের মতামতগুলো শিল্পীরা স্বকর্ণে শুনতে পান না এটা পরম সৌভাগ্য। মনে আছে, কোনো আধুনিক শিল্পীর ইম্‌প্রেশনিস্ট্‌ ঢঙে আঁকা সেল্‌ফ-পোর্ট্রেট দেখে আমার কোনো রক্তাধরা সঙ্গিনী ম্যানিকিয়োর করা নখ রুজ-রঞ্জিত গালে স্থাপন করে বলেছিলেন, দেখেছেন, কী চমৎকার অ্যানিম্যাল্‌ স্টাডি !

—অ্যানিম্যাল স্টাডি ! মানে ?—আমি চমকে উঠেছিলাম ভয়ঙ্কর ভাবে।

—দেখেছেন, কী গ্র্যাণ্ড্‌ শিম্পাঞ্জী এঁকেছেন একটা ?

আশ্চর্য হওয়ার একটা সীমারেখা আছে, তারপরে মানুষ বোধশক্তি হারায়। সুতরাং এর পরে আমি আর বিস্মিত হইনি। তিনি নির্বিকার মুখে গাছকে বলে যেতে লাগলেন সমুদ্র, ফ্লাওয়ার-স্টাডিকে বলে গেলেন ইটের পাঁজা। একবার হাতের প্রোগ্রামটা খুলে তিনি স্বচ্ছন্দেই ছবিগুলোকে মিলিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু দেখলাম, ছবি তিনি এত ভালো বোঝেন যে ওটুকু পণ্ডশ্রম করারও দরকার মনে করলেন না।

কিন্তু পরচর্চা থাক। পঙ্কজ সেন যখন ডালীর ছবি নিয়ে পড়লেন, তখন দেখলাম আমার আর সে ভদ্রমহিলার মগজের ভেতর খুব বেশি তফাৎ নেই। মানুষ প্রতিভার কোন্‌ স্তরে উঠলে স্যুর-রিয়্যালিস্ট্‌ হয় সেটা আমার জানা নেই ; কিন্তু কোনো সুস্থ লোককে যদি একেবারে ক্ষেপিয়ে দিতে হয়, তা হলে বোধ হয় ওই রকম একখানা অ্যাল্‌বামই যথেষ্ট। কিউবিজমের গোলোকধাঁধায় একটা জ্যামিতিক উল্লাস আছে, থিয়োরি অব্‌ রিলেটিভিটি জানা থাকলে হয়তো গাণিতিক আনন্দও পাওয়া যায় খানিকটা। কিন্তু স্যুর্-রিয়্যালিজম ! শিল্পীর জাগর-স্বপ্ন থেকে মেণ্টাল হস্‌পিটাল্‌ কত কিলোমিটার দূরে—এমনি একটা গবেষণা করতে আগ্রহ জাগে। আশা করি, সরল স্বীকারোক্তির এই অপরাধটুকু শিল্পীরা নিজগুণে মার্জনা করবেন !

পঙ্কজ সেনের আলোচনা সারা সন্ধ্যা আমার মাথার ভেতরে যেন একরাশ কীটের মতো কিলবিল করেছে। অর্থাৎ, আজ রাত্রেও আর ঘুম আসবে না—ভদ্রলোক নির্ঘাৎ ইন্‌-

সোমনিয়া ধরিয়ে দিলেন। অগত্যা কী আর করা যাবে—বিনিদ্র প্রহর জেগে জেগে সামুদ্রিক কবিতাই লেখা যাক।

বাইরে সমুদ্রের গর্জন—শোঁ-শোঁ করে একটানা দীর্ঘনিশ্বাস। বিছানায় একরাশ কর-করে বালি। সেই কব্জা-ভাঙা পাল্লাটা আজো তেমনি ককিয়ে চলেছে। নাঃ, কবিতা আমাকে লিখতেই হবে। কিন্তু কী লিখি?

সৃষ্টির আদি-ক্রন্দসীর অতলান্ত অশ্রুধারা
হে সমুদ্র!
জলন্ত সূর্যের কোল থেকে ঠিকরে পড়া
আশ্রয়হীন শিশুসন্তান এই পৃথিবী
ক্ষত-বিক্ষত বুক নিয়ে যেদিন ডুকরে কেঁদে উঠল—

নাঃ, বড্ড গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। কিংবা রবীন্দ্রনাথের প্যারডির মতো শোনাচ্ছে যেন। কবিতা জিনিসটার দোষই এই। খেয়াল-খুশিতে যখন আসে তখন দুর্বার; যখন আসে না তখন কিছুতেই আসতে চায় না—ছন্দের ভানুমতীর খেল আর অভিধানের গদাযুদ্ধ চালিয়ে দায় সারতে হয়। কলম নামিয়ে রাখলাম। লিখব না কবিতা।

কিন্তু ইরা আর পঙ্কজ সেন—পঙ্কজ সেন আর ইরা! জীবন আর সুর্-রিয়ালিজম। মাথার ভেতরে যেন ঘড়ির একটা পেণ্ডুলাম দুলছে। চলন্ত কাঁটার মতো কী যেন অবিশ্রান্ত ভাবে কানের কাছে বেজে চলছে—টক্-টক্-টক্।

ইন্‌সোমনিয়া ভোলবার জন্যে কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম—কিন্তু সময় বুঝে কবিতাও বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। অর্থাৎ সমুদ্রের অস্বস্তিকর গর্জন শুনতে শুনতে আর একটা রাত আমায় জাগতে হবে—আর একটা প্রলম্বিত অসহ্য দীর্ঘ রাত!

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘরময় অন্ধকার সমুদ্রের হাওয়ায় যেন উড়তে লাগল একটা কালো পর্দার মতো। আর নিঃশ্বসিত ব্যাকুলতার সঙ্গে সঙ্গে দুই কানের ভেতরে অদৃশ্য ঘড়ি বেজে চলল—টক্-টক্-টক্—

পরদিন ঘুম ভাঙল বেলা ন'টায়।

আজ রামকুমার আসেননি, আমাকে জাগায়নি কেউ। উঠে বসে একটা হাই তুলতে না তুলতে দরজার কড়া নড়ল। রামানুজ।

—খুব ঘুমিয়েছেন বাবু আজ।

—হুঁ।

—চা দেব?

—দাও।

মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে যখন নীচে বেরুলাম, তখন দশটার কাছাকাছি। ভ্রমণার্থীদের পালা চুকে গেছে, এখন স্নানার্থীদের অধ্যায়। রামকুমারের না-আসাটা কেমন নতুন রকম লাগছে। নিশ্চয় কোনো কাজে আটকে গেছেন।

কিন্তু যাই কোন্ দিকে ?

চক্রতীর্থের উলটো পথ ধরে স্বর্গদ্বারের দিকে চললাম।

খানিকদূর হাঁটতেই মন ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগল। পুরীর এ আর এক রূপ ! এমন একটা শূন্য অভিশপ্ত চেহারা পুরীর আর কোথাও আমি দেখিনি। পর পর বাড়ির সারি চলেছে—নোনাধরা, জরাজীর্ণ। ফাটা দেওয়াল, ঝুলে পড়া ছাদ ; শুধু কোথাও কোথাও ভাঙা ফটকের গায়ে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শ্বেতপাথরের ওপর নামাঙ্কন : 'রূপকুটির', 'সিন্ধু-বিহার'। কিন্তু 'রূপকুটিরে' আর রূপের জৌলুস নেই, 'সিন্ধু-বিহারে' কেউ আর বিহার করে না।

কেমন অসঙ্গত মনে হল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের দিক থেকে একটা দমকা হাওয়া এল, সেই হাওয়ায় এল মানুষ পোড়ানোর তীব্র গন্ধ। চিতার আগুনের একটা হল্‌কাও যেন অনুভব করা গেল।

তাই বটে ! 'স্বর্গদ্বার' নামটার তাৎপর্য বোঝা যাচ্ছে। নিচেই শ্মশান। সমুদ্রের হাওয়ায় চিতার ধোঁয়া আর গন্ধ 'রূপকুটির' 'সিন্ধু-বিহারের' সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। স্বর্গটা প্রত্যেকেরই কাম্য, কিন্তু পোড়া মাংসের স্বর্গীয় গন্ধটা রূপরসিক কিংবা বিহার-বিলাসীরা সহ্য করতে পারেনি।

গায়ের ভেতরে গুলিয়ে উঠল। ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াব, এমন সময় মনটা থমকে গেল। এই জীর্ণতার ভেতরেও একটুখানি ভব্যগোছের একটা ফাটল-ধরা বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তপতী। তপতী মল্লিক।

বন্ধুর বোন। এককালে যখন কবিতার জন্যে রাত জেগে সাধ্য-সাধনা করতে হত না, যখন মনের ভেতরে তার-বাঁধা যন্ত্রগুলো একটুখানি ছোঁয়া পেলেই ঝনঝন করে বেজে উঠত, সেই সময় আমার কবিতার ভক্ত-পাঠিকা ছিল তপতী। আই. এ.-তে বাংলার খাতায় আমার কবিতার কোটেশন দিয়েছিল বলেই বোধ হয় স্কলারশিপ পেল না। ওকে ভালোবাসি কিনা মনের মধ্যে এমনি একটা সমস্যার সূচনা করতে করতে শুনতে পেলাম, তপতী সুধীশ মল্লিকের প্রেমে পড়েছে। টাইটানের কাছ থেকে পিগমি যেমন সরে যায়—সেই মুহূর্তেই সভয়ে তেমনি সরে গিয়েছিলাম। আমার কবিতাকে ভালোবাসে তপতী, সে আমার ব্যক্তিত্বের একটা দিক ; কিন্তু সম্পূর্ণ যে মানুষটাকে সে ভালোবাসে, সে সুধীশ মল্লিক।

সম্পূর্ণ মানুষই বটে ! সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা—ঈর্ষা করার মতো স্বাস্থ্য—অসাধারণ রূপবান না হলেও অসামান্যতায় দীপিত। এম্. এস্‌-সি. পড়ত অ্যাপ্‌লায়েড ফিজিক্‌সে।

চওড়া-কব্জিওলা হাতে হকি-স্টিক্ নিয়ে যখন খেলতে যেত, তখন নিজেকে বড় বেশি দীন বলে মনে হত। একটা উপমা দিয়ে বলতে ইচ্ছে করত : টাওয়ার অব্ বেবিলন।

সে আজ আট বছর আগেকার কথা। আমি আর সুধীশ একসঙ্গেই এম এ. আর এম. এস-সি. পাস করলাম। আমি চাকরি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেলাম। সেইখানেই খবর পেলাম, তপতীর সঙ্গে সুধীশের বিয়ে হয়ে গেছে—সুধীশ অধ্যাপনা নিয়েছে ইউ-পির একটা শহরে।

কিন্তু বেলা সাড়ে দশটার সময়, পুরীর স্বর্গদ্বারের এই বাছা জায়গাটিতেই তপতীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে কে জানত সে কথা!

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তপতী আমায় চিনতে পেরেছে কিনা এবং তাকে কোনো সম্ভাষণ করা উচিত কিনা—এ নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুনোর আগে তপতীই আমায় ডাকল।

—কুমারদা!

তপতীই ডাকল। নিজেকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না—এই ভাবেই আমি এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে।

—তপতী, তুমি এখানে!

কব্জাখোলা কাঠের গেটটার একটা পাল্লায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তপতী। মুখের এক-দিকে রোদ পড়েছে, কানের ছোট সোনার রিংটা জ্বলছে; আর একপাশে ছায়াটা সকালের এই রোদেও যেন বড় বেশি অন্ধকার বলে মনে হল। আশ্চর্য—তপতী এত বিবর্ণ, এমন পাণ্ডুর হয়ে গেল কবে!

হাসল। দুটো কালো রেখা পড়ল ঠোঁটের দুধারে। আগে টোল খেত।

তপতী বললে, চেঞ্জে এসেছি।

—সুধীশ কোথায়?

—তার জন্যেই এসেছি।—কেমন আবছা গলায় তপতী জবাব দিলে।

—কী হয়েছে সুধীশের?—বিস্মিত উৎকণ্ঠায় আমি প্রশ্ন করলাম।

ক্লান্তভাবে গেটের পাল্লা দুটো খুলে ধরল তপতী : ভেতরে এসো—বলছি।

গেট থেকে বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত হাতকয়েক জমি। কয়েকটা পুরোনো জংধরা টিনের কৌটো, কয়েক টুকরো বৃষ্টিভেজা হল্‌দে রঙের পুরোনো খবরের কাগজ আর কিছু ভাঙা ইট ছড়িয়ে আছে। লক্ষ্মীশ্রীহীন—পোড়ো বাড়ির আবহাওয়া।

—বেছে বেছে বাড়িটি বের করেছ চমৎকার!—অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নিঃশব্দে হাসল তপতী—জবাব দিলে না।

দুপাশের নোনাধরা জীর্ণ ঘরের ভেতর দিয়ে—একফালি করিডোর পেরিয়ে পেছনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম আমরা। আর এই বারান্দাতেই একখানা ডেক-চেয়ারে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিল সুধীশ।

তপতী বললে, দেখো, কাকে এনেছি।

সুধীশ মুখ ফেরালো। কিন্তু সুধীশ? কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল দৃষ্টি ফেলে রাখলাম তার দিকে। টাওয়ার অব্ বেবিলন নয়—তার ধ্বংসস্তূপ!

সুধীশ বললে, সুকুমার! হোয়াট্ এ হ্যাপি সারপ্রাইজ!

কোথা থেকে তপতী একটা চেয়ার ঠেলে দিয়েছে আমার দিকে। বসতে বসতে আমি বললাম, কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে সুধীশ? ব্যাপার কী তোমার?

সুধীশ হাসল: ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু চেয়ারটা আর একটু সরিয়ে বোসো সুকুমার—যক্ষ্মারোগীর অত কাছাকাছি না আসাই নিরাপদ!

যক্ষ্মা! এক মুহূর্তে আমার মাথার ভেতর ঘুরপাক খেয়ে উঠল। এই ঘর, বারান্দা, এলোমেলো রুক্ষ চুলের নিচে সুধীশের কোটরগত জ্বলন্ত দৃষ্টি, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকা তপতীর বিবর্ণ মুখ—সব একসঙ্গে দুলতে লাগল সামনের আনীল সমুদ্রের মতো।

অত্যন্ত অশোভন ভাবে হা হা করে হেসে উঠল সুধীশ। হেসে উঠল এম. এস্‌সি. ক্লাসের উজ্জ্বল ছাত্র, ইউনিভার্সিটি হকি-টিমের বিখ্যাত খেলোয়াড় সুধীশ মল্লিকের কঙ্কাল।

—বেশ রোমান্টিক্ রোগ, তাই নয়? আরো রোমান্টিক্ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা। কী বলো?

কী বলব? আমার সমস্ত চেতনার ওপর শুধু একটার পর একটা দীর্ঘশ্বসিত সমুদ্রের ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে।

চড়া রোদে একা একাই সমুদ্রের ধার দিয়ে হোটেলে ফিরছিলাম। সামনের নীল জলটাকে কেমন ঘোলাটে মনে হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে তপতীর দীপ্তিহীন চোখের মতো সমুদ্রের রঙ।

বলেছিলাম, কিন্তু টি-বির জন্যে তো 'সী-শোর' খুব ভালো জায়গা নয়।

সুধীশ জবাব দিয়েছিল, কিন্তু সেফ্‌টির দিক থেকে পুরীই আমার দরকার ছিল।

—সেফ্‌টি? কিসের সেফ্‌টি?

—আমি যে ফেরারী। তিন-তিনটে পোলিটিক্যাল্ কেসের পরোয়ানা ঝুলছে আমার নামে। ইউ-পি বিহারে পা দেবার জো নেই, উড়িষ্যা গবর্নমেণ্ট্‌ও খোঁজ পেলে ছেড়ে কথা কইবে না—যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবে।

কিছু একটা বলবার জন্যে আমি কথা খুঁজতে লাগলাম—কিন্তু খুঁজে পেলাম না।

সুধীশই নীরবতার ফাঁকটা পূর্ণ করে দিলে: বেশিদিন হয়তো বাঁচব না। কিন্তু

আফ্‌টার অল—আই মাস্ট্‌ ডাই এ ফ্রি ম্যান !

বুঝতে পারলাম রেলিং ধরে তপতী এখন তাকিয়ে আছে সুধীশের দিকেই। তার চোখের দিকে চেয়ে দেখবার মতো সাহস আমার ছিল না।

জোর করে বলতে চেষ্টা করলাম : কেন বলছ এ সব বাজে কথা ? টি-বি হলেই কিছু মানুষ মরে না।

সুধীশ বললে, বিনা ট্রিট্‌মেণ্টে চোরের মতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে আর একটা পোড়ো বাড়িতে বসে থাকলে যক্ষ্মার রোগী বেঁচে ওঠে—এতটা অপ্‌টিমিস্ট্‌ কেন হচ্ছ সুকুমার ?

শাড়ীর উস্‌খুস্‌ শব্দ কানে এল—তপতী চলে যাচ্ছে।

যখন উঠে আসি, তখন সুধীশ বলেছিল, আজ দেখা হয়ে ভালোই হল সুকুমার। হয়তো এই শেষ দেখা।

—মানে ?—আমি আর চমকাইনি। চমকাবার অবস্থা অনেক আগেই পার হয়ে গিয়েছিলাম।

—একটা লোক কাল থেকে বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করছে। জায়গাটা হাওয়া খাবার পক্ষে খুব প্রশস্ত নয়, কাজেই একটু সন্দেহজনক। আজকের ট্রেনেই হয়তো আমরা চলে যাব।

—কোথায় ?

—আরো দক্ষিণে। আশা আছে বঙ্গোপসাগরের ধারেই কোথাও ছুটি নেব চিরদিনের মতো। এই বিরাট সমুদ্রের মুক্তির ভেতরেই ছেড়ে দেব মুক্তির শেষ নিশ্বাস।

এতক্ষণে একটা বোবা যন্ত্রণায় আমি বলেছিলাম, কিন্তু তপতী ?

সুধীশ জবাব দেয়নি।

কী ছিল জবাব দেবার ? তপতী। এই পুরীর সমুদ্রের ধারে এমন কত তপতী সিঁথির শেষ সিঁদুর মুছে ফেলে বিদায় নিয়েছে। কে ভেবেছে তার জন্যে—কার ভাবার সময় আছে ?

আসতে আসতে দেখতে লাগলাম, কস্টিউম পরে সমুদ্রের জলে করুণভাবে দাপাদাপি করছে—শীর্ণ-দেহ, সমুদ্র-বিলাসী বাঙালী বাবুর দল। মালাবারী নুলিয়াদের কাছে পরম কৃপা আর উপেক্ষার পাত্র।

আর সেই সময়—নোনাধরা একটা পোড়ো বাড়িতে এলিয়ে পড়ে আছে টাওয়ার অব্‌ বেবিলন। এই মেরুদণ্ডহীন দেশে মেরুদণ্ড সোজা করে বাঁচবার অধিকার যার ছিল—এই দেশের জন্য সে আজ মরতে চলেছে !

কিন্তু সুধীশ মল্লিকের যা খুশি হোক—আমার কী আসে যায় ? আমি সমুদ্রের ধারে

বেড়াতে এসেছি—সুযোগ পেলেই কবিতার খাতা ভরিয়ে তুলব। আজ সে কবিতা তপতী না পড়লেও আমার কোনো ক্ষতি নেই। আর তপতীর জন্যে নতুন কবিতা লেখবার শক্তি কি আছে আমার—আছে সাহস ?

সাত

খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়া আসছিল সমুদ্র থেকে। ঘুমের মধ্যেই শীত শীত করছিল। উঠে জানালাটা বন্ধ করতে গিয়েই দেখি ফিকে হয়ে এসেছে রাতের রঙ। একবার ইচ্ছে করল আরো খানিকটা কুড়েমি করে নিই ; তার পরেই মনে হল—নাঃ থাক। জীবনে অন্তত একটি দিন প্রাতরুত্থান অভ্যাস করে নিই।

আশ্চর্য বেশি ঘুমিয়েছি কাল রাতে। তপতীর কথা ভাবতে ভাবতে আর সুধীশের জ্বলন্ত মৃত্যুমগ্ন চোখ দুটোকে দেখতে দেখতে এমন ঘুম আসবে কে জানত! আঘাতটা যখন বেশি বাজে, তখন মানুষের মন কি এমনভাবে নিঃসাড় হয়ে যায় ? অথবা সুধীশের কথাটা বেশিক্ষণ আমার ভাবতে সাহস নেই—কারণ, আমি ভীরু, আমি দুর্বল ? দূর হোক ছাই। ওসব আর ভাবব না।

শীগ্‌গির ঘুমুবে—শীগ্‌গির উঠবে—এই হল মহাজনদের নির্দেশ। এ ব্যাপারে আমি ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম বলাও ঠিক নয়—একেবারে উল্‌টো। আমার পড়া লেখা যা কিছু সাধারণত রাত দশটার পর। বাড়ির সবাই যখন একে একে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়, আস্তে আস্তে আশপাশের বাড়িগুলোর জানালা অন্ধকার হয়ে আসে, আমাদের গলিতে থেমে আসে জুতোর শব্দ আর কয়েক হাত দূরের হ্যারিসন রোডে ট্রামের ঘণ্টা ক্ষীণতর হতে থাকে—তখন আমার সময়। আমার সেই একক মুহূর্তগুলোতে কলকাতার নিশ্ছিদ্র আবরণটা সরে যায় : শুধু নিমতলার নিশীথ-যাত্রীদের হরিধ্বনির সঙ্গে আমার মন্থর প্রহর-গুলি এগিয়ে চলে।

কলেজে যেদিন মর্ণিং ক্লাসের তাড়া থাকে—সেদিন জ্বালাধরা ঘুমজড়ানো চোখ নিয়েই ছুটতে হয় উর্ধ্বশ্বাসে। ত্রিযামা রাত্রির মধ্য আর শেষ প্রহরে চাঁদ ডোবা দেখি অনেকবার ; কিন্তু চলন্ত কোনো ট্রেনের জাগরক্লান্ত যাত্রীর চোখ ছাড়া সূর্যোদয় দেখবার সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত।

আজ একটা দুর্লভ সুযোগ সন্দেহ কী!

সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখতে পাব না জানি। সীজ্‌নের হিসেবে ভুল হয়ে গেছে। তবু মন্দ কী! সূর্য যেখানেই উঠুক—এই আনীল জলের ওপর তার রক্তরাগ পড়বেই ; ঝলমলিয়ে

উঠবে ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীর মতো—। সত্যেন দত্তের কল্পনায় সোনার ঘট মাথায় রূপসী হয়তো উঠে আসবে না, কিন্তু তার 'তয়ফা' নাচের জরিদার পেশোয়াজ একবার ঝলক দিয়ে যাবে অন্তত। সেটুকুই কি কম লাভ!

আবার সুধীশের কথা মনে পড়েছে। সমুদ্রের জলে তপতীর ঘোলা চোখ। স্বপ্নের ওপর কেন এমন করে চারদিক থেকে আঘাত করে? কেন ভুলতে দেয় না? নাঃ, আর নয়।

উঠে পড়লাম। বেরিয়ে পড়লাম ঘরে তালা দিয়ে।

দুপাশে ঘুমন্ত ঘরের সারি। মাঝখানের করিডোরের মতো ফালি পথটা দিয়ে যখন বাইরের বারান্দায় এসে পৌঁছুলাম তখন দেখলাম আমি ছাড়াও হোটেলের আর একটি মানুষ জেগেছেন। হয়তো আমার আগেই জেগেছেন। পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন সমুদ্রের দিকে চোখ মেলে। গেঞ্জি গায়ে, পরনে সবুজ লুঙ্গি, পায়ে শাদা চটি। বেঁটে, ফর্সা, গোল-গাল একটি মাঝবয়সী ভদ্রলোক।

এই তিন দিনের মধ্যে দেখিনি। সম্ভবত নতুন এসেছেন—কালকের বিকেলে বা রাত্রের কোনো ট্রেনে।

পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। কিন্তু অনুভব করলাম, ভদ্রলোক থেমে দাঁড়িয়েছেন পায়চারি বন্ধ করে—মন দিয়ে লক্ষ্য করছেন আমাকে।

হয়তো নিতান্তই ফাঁকা কৌতূহল। হোটেলের অন্যান্য বাসিন্দাদের সম্পর্কে আঁচ করে নিতে চাইছেন একটা কিছু।

—শুনুন?

সিঁড়ির নিচে বালির ওপর পা দিতেই শুনলাম, তিনি ডাকলেন। আমাকেই নিশ্চয়ই, কারণ ভোরের আবছা আলোয় কাছাকাছি কোনো তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব চোখে পড়ল না।

বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকালাম।

—সকাল বেলাতেই পেছু ডাকলাম—কিছু মনে করবেন না। তিনি বিনীত ভাবে হাসলেন। আশ্চর্য পরিপাটী আর শুভ্র তাঁর হাসিটি; কোনো টুথপেস্ট্ কোম্পানী ওই হাসির ফোটো নিয়ে বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে—আচমকা এমনি একটা কথা আমার মনে হল।

—না, না, তাতে আর কী হয়েছে!—আমাকে জবাব দিতে হল।

আশা করেছিলাম, এইবার তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করবেন। কিন্তু কিছুই করলেন না—কিছুক্ষণ ধরে কেবল নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। যেন পরীক্ষা করতে লাগলেন আপাদ-মস্তক।

এই রকম একটা অবস্থা সবচেয়ে অস্বস্তিকর। আমরা সাধারণত সচেতন থাকি

আমাদের বহিরাবরণের ব্যাপারে ; দাড়ি কামিয়ে একটা পাটভাঙা জামা পরে কিছুক্ষণ নিজেদের নিরীক্ষণ করি মুগ্ধ চোখে। আমাদের নার্সিসিজ্‌মের সীমা ওই পর্যন্তই। কিন্তু হঠাৎ যদি কোনো অপরিচিত লোক পেছন থেকে ডাক দিয়ে থামিয়ে দেয়, তারপর মাইক্রোস্কোপের স্লাইডে ফেলা কোনো নতুন ব্যাক্‌টিরিয়ার মতো তীক্ষ্ণ মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে, তার চাইতে বিরক্তিকর অবস্থা আর নেই। হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত অধম বলে মনে হতে থাকে, শরীরটাকে কেমন অশ্রদ্ধেয় বোধ হয়। শুধু তাই নয় ; ভেতরটাও যেন উদ্ঘাটিত হয়ে যায়—আর চেতন-অচেতন সত্তার সঞ্চিত যা কিছু অপরাধের বোঝা, সেগুলোকে ঘাড়ে করে কাঠগড়ার আসামীর মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

কিন্তু বেশিক্ষণ এ অবস্থায় তিনি আমায় রাখলেন না। বোধ হয় করুণা হল।

—দেখুন—তিনি থামলেন। কী একটা বলতে চাইছেন কিন্তু থেমে যাচ্ছেন দ্বিধায়।

—বলুন না, কী বলবেন !

—যদি কিছু মনে না করেন—আবার একসার পরিচ্ছন্ন দাঁতের ঝলক।

—মনে করব কেন ? বলুন !—এতক্ষণে বিরক্তি বোধ করলাম। ভোরের হাওয়ায় দিব্যি বেড়াতে চলেছিলাম সমুদ্রের ধারে। চলেছিলাম, সুধীশ আর তপতীকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলার জন্য। তা ছাড়া ভিড় ছিল না এই সময়ে, ভালো ঝিনুক কুড়িয়ে পেতাম, কড়ি মিলত কিছু ; আর বলা যায় না, একটা শঙ্খও হয়তো পাওয়া যেতে পারত চক্রতীর্থের ওদিকটায়। কিন্তু একদম বাগড়া দিলেন ভদ্রলোক। তারপর আবার যে ভাবে ভণিতা শুরু করেছেন, কতক্ষণে যে কথা আরম্ভ করবেন তার ঠিক নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা কী ? মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছি। এত ভূমিকা কেন ? এই সাতসকালেই কথা নেই, বার্তা নেই, সটান গোটা কয়েক টাকা ধার চেয়ে বসবেন না তো ? বিদেশে বিপাকে পড়েছি মশাই, একটু সাহায্য করুন ? সেই সঙ্গে জুড়ে দেবেন না তো কপি বুকের বাণী : বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে কে দেখবে ? এ জাতীয় অভিজ্ঞতা আমার আরো দুবার হয়েছে ; একবার আগ্রায় আর একবার রাজগীরে।

মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠলাম।

ভদ্রলোক বললেন, আপনিই তো সুকুমারবাবু ? সুকুমার গুপ্ত ?

মাথা নাড়লাম—আমিই বটে।

—কিন্তু আপনাকে তো—

—না চেনেন না। আপনাকে অবশ্য আমি চিনি—মানে মুখ চিনি। একটা সভায় আপনার বক্তৃতা শুনেছিলাম একবার।

—ওঃ !

এর পরেই সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হবে—ভেবে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। পরশু অনেক রাত পর্যন্ত জ্বালিয়েছেন পঙ্কজ সেন। কাল ইরাকে নিয়ে ভুবনেশ্বরে বেড়াতে গেছেন বলে দু-দিন দম ফেলতে পেরেছি। কিন্তু আজ ঘুম না ভাঙতেই আবার। বাংলা সাহিত্য যেন একান্নবর্তী সংসারের বাপ-মা মরা ছেলে, যার যেমন খুশি কান মলে দিতে পারে, ইচ্ছেমতো দুটো চাঁটি বসিয়ে দিতে পারে গালে।

'এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। কিন্তু দু লাইন লেখবারই দুর্ভাগ্য যার হয়েছে, তাকে সামনে পেলেই সমালোচনার উৎসাহ যাঁদের জাগে, তাঁদের নীরব করবার কোনো উপায় নেই কি? আমার মতো সামান্যের অবস্থাই এই—বাংলা সাহিত্যের যাঁরা দিক্‌পাল তাঁদের অবস্থা ভেবে আমারই হৃৎকম্প হয় মধ্যে মধ্যে।

একটা সাহিত্য-সভার স্মৃতি ভেসে এল। সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নবাণ :

—আচ্ছা মাণিকবাবু বড় না তারাশঙ্কর?

—মার্কসীয় মতবাদ সাহিত্যে চালানো কতটা যুক্তিসঙ্গত?

—সাহিত্যে regimentation-এ আপান কি বিশ্বাস করেন?

—বার্ণার্ড শ প্রগতিশীল না প্রতিক্রিয়াশীল?

—বনফুলের বই সম্বন্ধে কী মনে হয় আপনার? 'জাগরী' আপনার কেমন লাগে?

—অনুরূপা দেবী আজকাল আর লেখেন না কেন?

একেবারে চক্রব্যূহ। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি পালাবার রাস্তা কোথায়।

অথচ, আপাতত সামনে সমুদ্র। ব্রেকারের পর ব্রেকার লুটিয়ে পড়ছে। আদিম পশু-শক্তি প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছে মাটিকে। সেই মাটি—ফুল-ফসল-প্রাণের পশরা সাজিয়ে যে অমৃতময়ী হয়ে আছে, কাব্যে-শিল্পে বিজ্ঞানে দর্শনে মানুষের একান্ত কল্যাণবোধে যে জীবনের পূজাপীঠ। নানা রঙের ফুলের অঞ্জলির মতো ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে বিচিত্র বর্ণের শুক্তি ঝিনুকের অর্ঘ্য : 'সমুদ্র তরঙ্গে সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্রপাঠ করে।' যে সমুদ্রের উদার মুক্তিতে সুধীশের মতো অসংখ্য মানুষ প্রলুব্ধ আকর্ষণে তাকিয়ে আছে!

আমি পা বাড়ালাম, আচ্ছা আসি।

—বেড়াতে চললেন?—কেমন ক্ষুণ্ণ হলেন ভদ্রলোক : আচ্ছা, আসুন। পরে আলাপ হবে ভালো করে।

বীচে গিয়ে নামলাম। প্রায় ফাঁকা। দূরে দূরে দু-একজনকে দেখতে পাচ্ছি। ঝিনুক কুড়িয়ে ফিরছেন। নুলিয়াদের একখানা নৌকার ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন একজন প্রৌঢ়—যেন ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। বিরাটকে প্রত্যক্ষ করছেন এখানে—দেখছেন বিশ্বরূপ।

'অপরূপকে দেখে গেলাম দুটি নয়ন মেলে'—গুন গুন করে গান গাইতে ইচ্ছে করল। সুধীশকে আমার ভুলতেই হবে—ভেবেই বা আমি কী করব?

ঝিনুক কুড়োতে গিয়ে দেখি অফুরন্ত—এর আর শেষ নেই। রুমালটা যখন প্রায় সেরখানেক ভারী হয়ে উঠল, তখনো চক্রতীর্থের অর্ধেক পথ পর্যন্ত আসিনি। দূর হোক ছাই—এ কুড়িয়ে কখনো শেষ করা যাবে না। তার চাইতে বসা যাক একটু পা ছড়িয়ে। উঠুক সূর্য।

উঠল। স্বর্ণরেণুর ওপর পড়ল ফাগের গুঁড়ো—ছোপ লাগল কুঙ্কুমের। ময়ূরকণ্ঠী আঁচল এলিয়ে সূর্যপ্রণাম করল দেবদাসী সাগরিকা। হাতের ধূপাধার থেকে জলের কণা উড়তে লাগল হাওয়ায়। মনে হল: এরই দিকে তাকিয়ে হয়তো নীলাদ্রির নীল জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন মহাপ্রভু; এই বিরাটকে প্রত্যক্ষ করে এর মধ্যে লীন হয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সকালের রঙ্-লাগা এই সমুদ্রের যাদু আছে। ভাসিয়ে নিয়ে যায় মহাপৃথিবীর সীমাহীন সংকেতে—দারুচিনি বন, প্রবালদ্বীপ, কোকোনাট গ্রোভে; তারপরে পেঙ্গুইন গ্রিজলির দেশে, আমুনসেনের শ্লেজ-টানা ট্রেইলে ট্রেইলে—জ্যাক লণ্ডনের অ্যাণ্টার্টিক গল্পের জগতে। নীলাঞ্চলা নটী থেকে হিমবস্ত্রা বৈধব্যের বিবিক্ততায়।

কিন্তু সুধীশ আর তপতী কোথায় এখন? পুরীর নীল-সমুদ্র কোথায় কতদূরে তপতীর জন্যে বৈধব্যের রিক্ততা মেলে রেখেছে? বন্দী দেশের মুক্ত-সৈনিককে সমুদ্র কোন্ অসীমের সন্ধান দেবে?

পায়ের ঠিক নিচে এসে ঢেউ ভেঙে পড়ল একটা। ছোট ছোট একরাশ কাঁকড়া রোদ পোয়াচ্ছিল, কোন্ মন্ত্রে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে গেল কে জানে। পায়ে ঠাণ্ডা জলের ছাট্ লাগল। উত্তর-দক্ষিণ পরিক্রমা করে স্তব্ধ গ্লেশিয়ারের একটি হিমকণা দূরান্তের খবর পৌঁছে দিয়ে গেল।

—মিলল কিছু?

—কী?—ফিরে দেখলাম হাতে মোটা লাঠি—টার্টিল সেলের চশমার আড়ালে জ্বল-জ্বলে চোখ।

দার্শনিক স্বয়ং।

বললাম, কাল কোথায় ছিলেন? দেখা পাইনি যে?—

—গৃহকর্মে, কিন্তু আপনার ব্যাপারটাই বা কী? দিব্যি ফেরারী আসামীর মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছেন?—রামকুমারবাবু হাসলেন: হোটেলে গিয়েই শুনলাম অন্ধকার থাকতেই বেরিয়েছেন নিরুদ্দেশ-যাত্রায়। খানিকটা হাঁটতেই আপনাকে দেখতে পেলাম। একেবারে তপস্যায় বসেছেন। ধ্যানভঙ্গ করা উচিত হবে কিনা ভাবতে ভাবতেই দেখি সোজা কখন এখানে এসে পৌঁছে গেছি। তা কিছু পেলেন?

—ঝিনুক ? হাঁ—অনেকগুলো ।—রুমালটা মেলে দেখালাম ।

—না মশাই, শুক্তি নয়—মুক্তো । কাব্য, কাব্য । গল্প কবিতার খোরাক জুটল কিছু ?

রামকুমারবাবু আমার পাশে বসে পড়লেন ।

—গল্প মিলবে, তবে এখানে নয় ।

—অর্থাৎ ?

—সমুদ্র যখন তার ভালোমন্দ সব কিছু নিয়ে আর থাকবে না—তখন । তখন আমাদের এই মিশ্রিত অনুভূতিগুলোও থাকবে না । তখন দূর থেকে আর এ কথা মনে হবে না—সমুদ্র কী বৈচিত্র্যহীন—কখনো কখনো কী পরিমাণে একঘেয়ে । তখন মনের মধ্যে এই দিনগুলো পুরোনো ক্যালেণ্ডারের কতগুলো তারিখ হয়ে থাকবে । তার ডিটেল্‌স মনে পড়বে না—তাতে রং মাখানো থাকবে ছুটির আর ভাবনার ; তারই থেকে জন্ম নেবে গল্পের সমুদ্র—বলতে পারেন সমুদ্রের ইম্‌প্রেশন । আর সেই ইম্‌-প্রেশনে এমন কি জগন্নাথের পাণ্ডারাও বিভীষিকা হয়ে দেখা দেবে না—; বরং মনে হবে, সত্যিই যারা তীর্থ করতে আসবে, ওরা না থাকলে কী দশা হত তাদের !

—অর্থাৎ, পার্‌স্পেক্‌টিভ ?—রামকুমার হাসলেন : কলকাতায় ফিরে লিখবেন পুরীর গল্প ?

—ঠিক তাই । আর কলকাতার গল্প লিখতে গেলে আসতে হবে পুরীতে—কিংবা আরো কোথাও, অন্তত কলকাতা থেকে দূরে ।

—এ তো রিয়্যালিস্টের কথা হলো না ।

—রিয়্যালিস্ট কি ফোটোগ্রাফার ? ওটা নির্ভর করে ব্যাখ্যার ওপর—তার সং-বেদনায় । ডিটেলের সবটাই কি নিতে পারে রিয়্যালিস্ট ? কিছুটা নেয় আর তারই ওপর ভিত্তি করে প্রমাণ করতে চায় যুগমনের আলোকে । ইম্‌প্রেশনের সঙ্গে ইম্যাজিনেশন মিললেই তা আর্ট হয়ে ওঠে । যখনই কোনো কিছুকে আমরা বেশি কাছ থেকে দেখি তখনই তার ভেতর জড়িয়ে পড়ি—শিল্পীর বিচ্ছিন্নতা আনতে পারি না । আর তাতে সাহিত্যের যোগফল দাঁড়ায় খবরের কাগজ, ইতিহাস আর ভূগোল দিয়ে ।

—তত্ত্ব রাখুন মশাই !—হাতের মোটা লাঠিটা দিয়ে একটা কাঁকড়াকে আঘাত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে রামকুমার বললেন, আপনার ওখানে চা খেতে এসেছিলাম । চায়ের তো দেখাই নেই—এই সকালবেলাতেই সাহিত্য-ব্যাখ্যা শুরু করেছেন । খালি পেটে ভালো লাগে ওসব ?

—তাই তো । আমি লজ্জিত বোধ করলাম : তবে চলুন ।

—ধ্যানভঙ্গ করার জন্যে অভিশাপ দিচ্ছেন তো ?

—অভিশাপ আমি বাজে খরচ করি না—হাসলাম : চলুন ।

আর হোটেলের দিকে ফিরতে ফিরতে আমার মনে পড়ল ইরার কথা। আশ্চর্য—কী ভাবে ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলতেই চেয়েছিলাম হয়তো বা। হলদে রঙের প্রশস্ত হাত পঙ্কজ সেনের। রেখাঙ্কিত মাউণ্ট অব ভেনাস। উদাসীন আর অতৃপ্ত। কিন্তু ইরা?

ছায়ার মতো বসে ছিল। ছায়াই। পঙ্কজ সেনের মডেলের মুখে আলো পড়েছে—কিন্তু সে মডেল ইরা নয়। পেছনে সে নিঃশব্দে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখলেও চলে—না দেখলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু তপতী। ইরা যদি বুদ্বুদ হয়—তপতী সমুদ্র। হঠাৎ মনে হল, ইরার সঙ্গে কোথায় একটা মিল আছে তপতীর। আর্টিস্ট পঙ্কজ সেন ইরাকে ঠকিয়েছে—দেশকর্মী সুধীশ মল্লিকের কাছে তপতীই বা কী পেল? ইরা যদি শিল্পীকে প্রেরণা দিয়ে থাকে—তপতী দেশকে দিয়েছে তার সর্বস্ব। শিল্পীকে কফির পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে ইরা সান্ত্বনা পাবে—তপতীর শূন্য দৃষ্টির সামনে সারা পৃথিবীটা মরুভূমির মতো থাকবে বিকীর্ণ হয়ে।

রামকুমার বললেন, কোনারকে যাবেন?

—কোনারক? সেই সূর্যমন্দির?

—হাঁ, পাথরের রথ থমকে থেমে দাঁড়িয়ে আছে। সারা পূর্ব-ভারতের সব সেরা মন্দির শিল্পসৌন্দর্যের দিক থেকে। যাবেন দেখতে? অবশ্য যদি গোঁড়া পিউরিটান হন, তবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হবার সম্ভাবনা আছে। তবে আমার মনে হয়, কোনারকের পরিবেশের এমন একটা রূপ আছে—যা রুচি-বিকারের সব গ্লানি ঢেকে দিতে পারে।

—যান?

—আদিম। সনাতন গোরুর গাড়ি। বাসে করে যাওয়া যায়, কিন্তু বিস্তর ঝামেলা। কিন্তু খোয়া-ওঠা রাস্তায় ছাপ্পান্ন মাইলের মতো ঝাঁকুনি আর মাইল তিনেক বালিয়াড়ী ঠ্যাঙানো সুখের হবে না। তার চাইতে এ বালির ওপর দিয়ে যাবে—দিব্যি। গোরুর গাড়িতে ঘুমুনোর অভ্যাস আছে তো?

—অভ্যাস?—আমি মনটাকে গুছিয়ে আনতে চাইলাম: জীবনের আঠারো বছর আমার কেটেছে উত্তর-বঙ্গে। হিসেব করে দেখলে কমপক্ষে অন্তত হাজার মাইল গো-যান ভ্রমণের গৌরব আমি দাবি করতে পারি।

—তবে তো আপনার কোনারক যাওয়াই উচিত। যাতায়াতে আরো মাইল পঁয়তাল্লিশ যোগ হবে—একটা নতুন রেকর্ড করে ফেলতে পারেন।

—আপনি যাচ্ছেন বুঝি?

—সঙ্গী পেলে। দিন তিনেক ছুটি মিলছে। কলকাতার চেঞ্জার বাবুরা তো পুরীর হাওয়া খেতে আসেন, উড়িষ্যা দেখতে নয়। গোরুর গাড়ির নামেই আঁতকে ওঠেন তাঁরা। তা ভাবছিলাম, আপনি লেখক মানুষ—রাজী হয়ে যেতেও পারেন।

—সর্বান্তঃকরণে। কিন্তু কবে ?

—কাল সন্ধ্যায়।

—অনার-ব্রাইট ?

—নিশ্চয়।

হোটেলে পৌঁছুতেই দেখি সেই সকালের পরিচিত ভদ্রলোক সামনের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাকে দেখেই চরিতার্থ হাসি হাসলেন।

—আসুন, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

সাহিত্য-আলোচনা ? আমি ঘাবড়ে গেলাম।

—কেন বলুন তো ?

—চা খাব একসঙ্গে।

—সে কী কথা ? তা ছাড়া—রামকুমারবাবুর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললাম, আজ যে উনি আমার চায়ের গেস্ট।

—রামকুমারবাবু ?—ভদ্রলোক হাসলেন: উনি আমার পুরোনো বন্ধু। ওঁর জন্যে ভাববেন না। আসুন—আসুন—আপনার জন্যেই আমরা এখনো চা খাইনি।

ভদ্রলোক বারান্দায় উঠে গিয়ে পাশেই পাঁচ নম্বর ঘরের পর্দা সরালেন: আসুন।

আমি ঘাবড়ে রামকুমারের মুখের দিকে তাকালাম।

রামবাবু অভ্যস্ত সিনিক হাসি হাসলেন। তারপর কানে কানে জানালেন:

ভাববেন না। উনি চাটুয্যে মশাই। কলকাতার একজন অতিকায় হার্ডওয়ার মার্চেন্ট। খাওয়াবেন ভালো।

আট

অর্ধাবগুন্ঠিতা একটি মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন জড়োসড়ো হয়ে। চাটুয্যে মশাই বললেন, এই যে, এঁরা এসে গেছেন।

হাত তুলে নমস্কার জানালেন ভদ্রমহিলা। ঘোমটার ফাঁক থেকে দুটি স্নিগ্ধ কালো চোখ নজরে পড়ল।

—উনিই সুকুমারবাবু। সুকুমার গুপ্ত। এঁর লেখা তো তুমি পড়েছ ?

অপরাধীর মতো মাথা নাড়লেন মহিলা। যেন আমার লেখা পড়ে জ্ঞানকৃত অন্যায় করে ফেলেছেন একটা। মৃদু অথচ আশ্চর্য মধুর গলায় বললেন, বসুন।

—হাঁ, হাঁ, বসুন, বসুন—চাটুয্যে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

বসতে বসতে রামকুমার বললেন, বৌদি, চা-টা একটু তাড়াতাড়ি। তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি অনেকক্ষণ থেকে।

—সব রেডি—ভদ্রমহিলা একটু হাসলেন। তারপর ওদিকের একটা পর্দা সরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

দেখলাম হোটেলের অন্যান্য ঘরগুলোর চাইতে এ ঘরটির স্বাতন্ত্র্য আছে। ঠিক ঘর না বলে ছোটখাটো সুট্ বলাই উচিত। আর সব ঘরগুলির চাইতে এটি আকারেও প্রায় দ্বিগুণ ; মাঝখানে গাঢ় সবুজ পর্দার পার্টিশন দিয়ে দু ভাগ করা। এ অংশটা খাবার এবং বসবার জন্যে ; ওদিকটা চাটুয্যে মশাইয়ের বক্স রুমও হতে পারে, ড্রেসিং রুম হিসেবেও হয়তো ব্যবহার হয়ে থাকে।

প্রথম দর্শনে চাটুয্যে মশাই সম্পর্কে মনে যে ধারণাটা গড়ে উঠেছিল, তার জন্যে এখন অনুতাপ হল। বোঝা গেল, ধার করবার প্রয়োজন ওঁর হবে না, দরকার পড়লে বরং আমিই চাইতে পারব ওঁর কাছে।

রামকুমার বোধ হয় আমার মনের প্রশ্নগুলো খানিকটা আঁচ করেছিলেন। বললেন, ইনিই এ হোটেলের সবচেয়ে বনেদী খদ্দের। ফি-বছরই একবার করে আসেন, দুবারও কোনো কোনো সময়ে। বলতে গেলে, আধা-আধি মালিক।

—তাই নাকি!—শ্রদ্ধাভরা বিস্ময়ে আমি একবার তাকিয়ে দেখলাম চাটুয্যে মশাইয়ের দিকে। রামকুমার বললেন, হোটেলওলাকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়ে গোড়াপত্তন করে উনি দিয়েছেন। তাই ওঁর লাইফ-মেম্বারশিপ্ এখানে।

চাটুয্যে বিব্রত হয়ে উঠলেন।

—না-না, সে কিছুই না। দরকারের সময় সামান্য কিছু ধার দিয়েছিলাম—এই যা। রামকুমারবাবুর কথায় বিশ্বাস করবেন না মশাই। দার্শনিক মানুষ, অতিশয়োক্তি একটু করেন।

বললাম, আতিশয্য থাকলেও উক্তিটা নিশ্চয় সত্য। সমুদ্র বুঝি খুব ভালোবাসেন আপনি?

—সমুদ্র!—চাটুয্যে মশাই হঠাৎ আমার দিকে চোখ দুটো তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন। মনে হল জবাবটা তাঁর নিজেরও জানা নেই—যেন উত্তর খুঁজছেন আমার কাছ থেকেই। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, হাঁ, ভালোই লাগে।

যেন বলতে হয় বলেই বললেন, যেন সমুদ্র কারো ভালো লাগে না এমন নজির কোথাও নেই বলেই সায় দিয়ে গেলেন একটা প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে ; হয়তো সমুদ্র কেমন লাগে এমন একটা জিজ্ঞাসা মনের মধ্যেও কোনোদিন দেখা দেয়নি তাঁর।

রামকুমার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, কই বৌদি, চা হল ?

সবুজ পর্দার ওপার থেকে শান্ত মিষ্টি গলার জবাব এল : আর দেরি নেই।

এতক্ষণে খেয়াল হল সমুদ্রের হু হু করা দীর্ঘশ্বাস ছাপিয়েও ওদিক থেকে শোনা যাচ্ছে স্টোভের আওয়াজ।

—সে কি !—আমি উৎসুক হয়ে বললাম, আপনারা ঘরেই চা করেন বুঝি ?

চাটুয্যে মশাই মাথা নাড়লেন।

—কেন ? হোটেলেই তো সব বন্দোবস্ত রয়েছে।

রামকুমার বললেন, ওই তো লেখকদের দোষ সুকুমারবাবু। সব জিনিসেই কৌতূহল। কেন উনি হোটেলের চা খান না, তার উত্তর একটু পরেই পাবেন—আগে থেকে জিজ্ঞাসা করা চলবে না।

ওপারের সবুজ পর্দাটা সরে গেল। নতুন মূর্তিতে দেখা দিলেন চাটুয্যে-গৃহিণী।

এইটুকু সময়ের ভেতরই বেশ-পরিবর্তন করে ফেলেছেন। পরেছেন লালপাড় গরদের শাড়ি, কপাল থেকে ঘোমটাটা অনেকখানি সরিয়ে দিয়েছেন। দেখলাম শ্যামবর্ণ ললাটে মস্ত একটা সিঁদুরের ফোঁটা—সিঁথিতে যেন মোটা একটা রক্তের রেখা এঁকে নিয়েছেন। এতক্ষণ গৃহবধূ সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে ছিলেন, এবার সীমন্তিনী দেখা দিয়েছেন আত্ম-প্রকাশের অকুণ্ঠ গৌরবে। কিন্তু এত বড় সিঁদুরের ফোঁটা কেন ? কেমন খটকা লাগে।

তাঁর হাতে বারকোশের মতো একটি বড় আকারের থালা। থালায় একটি ডাব, কয়েকটি সন্দেশ, চকচকে একটা নতুন টাকা, একছড়া পৈতে।

রামকুমার 'করেন কি, করেন কি' বলবারও সুযোগ পেলেন না যেন। তার আগেই ভদ্রমহিলা থালাখানা তাঁর পায়ের গোড়ায় রেখে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে ফেলেছেন।

আরক্ত মুখে রামকুমার বললেন, এর কোনো মানে হয় ?

চাটুয্যে বললেন, মানে হবে না কেন ? বয়েসে তো আপনি বড়।

—কিন্তু আপনি তো আমার চাইতেও বড়। সম্পর্কে যিনি বৌদি হন, তিনি যত ছোটই হোন না কেন—তাঁর প্রণাম আমি নিতে পারি ? কতবার তো বলেছি, এরকম করলে আমি আর আসব না।

ভদ্রমহিলা কোনো জবাব দিলেন না। শুধু একবার তাঁর কালো চোখ দুটো তুলে তাকালেন। আর সে দৃষ্টিতে আমি চমকে উঠলাম। স্পষ্ট দেখলাম তার ওপর অশ্রুর ছায়া ঘনিয়ে আসছে।

চাটুয্যে হালকা স্বরে বললেন, প্রণামটা যখন পেয়েই গেলেন, ও নিয়ে তর্ক তুলে লাভ কী ! উপরি-সম্মান খানিকটা যদি জুটেই যায়, তা হলে ছাড়বেন কেন সেটা ?

কিন্তু মুখর রামকুমার মূক হয়ে গেলেন হঠাৎ। আমার মতোই ও চোখ দুটোকে তিনি

দেখতে পেয়েছেন ; এবং আমার কাছে যা বিস্ময়ের কুয়াশা, তার সংকেত উনি সম্পূর্ণ করে বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই।

একটি কথারও জবাব না দিয়েই চাটুয্যে-গৃহিণী পার্টিশানের ওপারে অন্তর্ধান করলেন। চাটুয্যে ডাকলেন, ললিত, ললিত—

খাবারের থালা নিয়ে ছোকরা চাকর এল একটা। টিপয় টেনে সাজিয়ে দিলে আমার সম্মুখে।

পেছনে ভদ্রমহিলা ফিরে এলেন চায়ের ট্রে হাতে।

—বিপুল আয়োজন যে।—আমাকে বলতে হল।

রামকুমার ততক্ষণে একটা পৃথুলকায় সিঙ্গাড়া মুখে পুরেছেন।

—আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে আপনিই বড়লোক করে দেবেন দেখছি!—ভরাট মুখে প্রায় অবোধ্য ভাষায় জানালেন রামকুমার : চাটুয্যে ডায়বেটিসের রুগী। পেটের গোলমালও আছে। নিজে কিছু খেতে পারেন না, তাই বন্ধু-বান্ধবদের খাইয়ে তৃপ্তি পান।

চাটুয্যে-গৃহিণী চা ঢালছিলেন। মুখ তুলে আস্তে আস্তে বললেন, আর নজর দেন।

হাঃ হাঃ করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন চাটুয্যে।

—একদিক থেকে সত্যি। ঘ্রাণেও তো অর্ধভোজন হয়।

আমি সন্তর্পণে দৃষ্টি ফেললাম ভদ্রমহিলার দিকে। লঘু মেঘের ছায়াটা কেটে গেছে নাকি?

ঠিক বুঝতে পারা গেল না—চায়ে চুমুক দিলাম। সত্যি, চমৎকার চা। এত ভালো চা কখনো খেয়েছি বলে মনে পড়ল না।

—বুঝেছি। এইজন্যেই হোটেলের চায়ে আপনার রুচি নেই?

চাটুয্যে হাসলেন : হাঁ, এটাই আমার ফেভারিট্ ব্র্যাণ্ড্।

—কী চা বলুন তো?—আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিষ্ঠাবান্ চা-সেবক, চায়ের ভালোমন্দ সম্বন্ধে রুচি আমার অত্যন্ত সজাগ। বললাম, পেলেন কোথায়?

চাটুয্যে বললেন, বাজারের জিনিস নয়। আমার শ্বশুরের বাগান আছে, সেখানেই এ চা'র স্পেশাল্ প্রিপারেশন হয় একটা।

—ভালো স্ত্রী, ভালো চা এবং ভালো শ্বশুর—এতগুলো যোগাযোগ একসঙ্গে ঘটা ভাগ্যের কথা—রামকুমার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—তার পরে অর্থভাগ্যও আছে—আমি জুড়ে দিলাম।

—কী হবে?—আমাদের সহজ সরস আলোচনার মাঝপথে একটা তীরের মতো তীক্ষ্ণ প্রশ্ন এসে বিঁধল। এত অস্বাভাবিক মনে হল স্বরটা যে আমরা তিনজনেই একসঙ্গে

সবিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, জ্বলন্ত চোখে চাটুয্যে-গৃহিণী তাকিয়ে আছেন স্বামীর দিকে।

সে দৃষ্টিতে একটা অদ্ভুত অমানুষিক ঘৃণা—হঠাৎ অনুভব করলাম, পৃথিবীতে এত ঘৃণা বুঝি কেউ কাউকে কোনোদিন করেনি!

তবু, তারপরেও অনেকক্ষণ একসঙ্গে বসে থেকেছি আমরা—হেসেছি, গল্প করেছি। চাটুয্যে-গৃহিণীও তাতে যোগ দিয়েছেন কখনো। কিন্তু তবু—

খুলে গিয়েছিল জমাট অন্ধকারের একটা দরজা। তার ভেতর দিয়ে ওঁদের পারিবারিক জীবনের একটা তিমির-বিবর চোখে পড়ল, চোখে পড়ল অজানা কোন বিষাক্ত সরীসৃপের ইঙ্গিত। কেমন খারাপ হয়ে গেল মনটা।

ললিতের হাতে ফলদানের থালা চাপিয়ে রামকুমার বাড়ি চলে গেলেন। আমি ফিরে এলাম নিজের ঘরে। ভাগ্যবান, অর্থবান চাটুয্যে। কোথাও কোনো অভাব নেই। তবু তার মধ্যে বিদ্যুতের মতো একটা প্রশ্ন চমক খেয়ে যাচ্ছে : কী হবে?

কোথায় ব্যথা ওঁদের, কী সে আঘাত? কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম। বাইরে থেকে সমুদ্রের অশ্রান্ত আক্রোশ ভেসে আসছে। ইরার কথা মনে এল। কিন্তু চাটুয্যে তো আর্টিস্ট্ পঙ্কজ সেন নয়। অধরার আকর্ষণে তো সে হাতে-পাওয়াকে ফেলে অতৃপ্তির জ্বালায় ছুটে বেড়ায় না। বরং রীতিমতো বস্তুতান্ত্রিক, হিসেবী, সংযত। তবে?

সমুদ্র গর্জন করে চলেছে। অশ্রান্ত, অক্লান্ত আকুলতায়। বিচিত্র মিশ্ররাগিণী। অর্থহীন নয়—যেন সমস্ত অর্থকে ছাপিয়ে উঠেছে; অর্থের যেখানে সীমা, তাকে ছাড়িয়ে তবে তার শুরু। শুধু ধ্বনি, শুধু ব্যঞ্জনা। আদিম প্রভাতে শঙ্খ-শুভ্রা কন্যকা উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে উদাত্ত উদ্‌গীথ; ইউলিসিসের দূরযানী উত্তরঙ্গ যাত্রায় সাইরেনের বাঁশী। তারপরে ইতিহাস। আর্মাডা থেকে ইউ-বোট। হিংসা ক্রোধ লোভের রক্তে রাঙানো ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে হাঙরের ছায়া। হারিকেনের মুখে আসন্ন-মৃত্যু নাবিকের অভিশাপ—কালো জাহাজের গান-টাওয়ার থেকে জলদস্যুর অট্টহাসি।

মিশ্র-রাগিণী বই কি। প্রাগৈতিহাসিক থেকে আজ পর্যন্ত এই এক জীবন-ক্ষেত্র—কোনোদিন যার রূপান্তর হল না। কিছুই হারায়নি। ইউলিসিসের নৌ-বহরের শেষ চিহ্ন আজো সঞ্চিত আছে এর অতল যাদুঘরে, এর গভীরে আদি মানুষের কঙ্কাল আজ প্রবাল হয়ে গেছে—জ্যোতির্ময় হয়ে আছে ফস্‌ফরাসের আলোয়। এর মহা-সঙ্গীতে ঐকতান তুলছে হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর সমস্ত ধ্বনি। মনে হল : এই সমুদ্র স্বরে বাঁধা একটা বিরাট তারযন্ত্র। এর নীল তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রথম পৃথিবীর সমস্ত শব্দ আজো কেঁপে কেঁপে উঠছে। এত ক্ষীণ যে তা বোধের বাইরে চলে গেছে; তবু ফুরিয়ে যায়নি, তবু মিথ্যে হয়ে যায়নি।

আমাদের অনুভূতি যদি কোনোদিন অর্থের গণ্ডী পার হয়ে যায়, তবে সেইদিন হয়তো এই চিরন্তন সুরের জগতে গিয়ে পৌঁছুবে, একটা বিরাট গ্রামোফোন রেকর্ডে ধরে রাখা সমস্ত রাগিণী, সমস্ত জীবন-নাট্য শুনতে পাওয়া যাবে শিলালিপি, তাম্রশাসন আর কিউনিফর্মেরও দূরতম ভাষায়।

প্যালিয়োলিথিক—চাল্‌কোলিথিক। হাজার হাজার ফুট জলের নিচে মজ্জিত মহাদেশ আট্‌লাণ্টা। কল্প-কল্পান্তের এই বিরাট ধ্বনিলোকের ঘূর্ণির মাঝখানে আমি হারিয়ে গেলাম। একটা সামুদ্রিক হাওয়ার ঝাপটায় রাশি রাশি বালি যেমন উড়ে যায়—তেমনি মিলিয়ে গেল ইরা, চাটুয্যে-গৃহিণী—কয়েকটা বালির কণা হারিয়ে গেল বিরাটের একটি মাত্র নিশ্বাসে।

ঘুম ভাঙল পিঠের ওপর একটি মৃদু ছড়ির খোচায়।

—আবার দিবানিদ্রা? আচ্ছা কুঁড়ে লোক তো মশায়!

তার মানে, দার্শনিকের পুনঃপ্রবেশ।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। কখন বিশ্রী রকম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—কটা বেজেছে বলুন তো?

রামকুমার বিছানার ওপরেই বসে পড়েছিলেন। জবাব দিলেন, প্রায় চারটে।

—অ্যাঁ!—করুণ চোখে আমি নিজের চারদিক পর্যবেক্ষণ করলাম। খাম, পোস্টকার্ড, প্যাড আর কলম চারদিকে ছড়ানো। অনেকগুলো চিঠি লেখারই তাগিদ ছিল; কিন্তু একখানা লেফাফায় শিরোনামা লেখা ছাড়া কাজ বেশিদূর এগোয়নি।

—এত ঘুমোন কেন?—রামকুমার অভিভাবকের ধরনে জানতে চাইলেন।

—আগে বরং না ঘুমোনোই আমার বিশেষত্ব ছিল। এখানে এসে বদ্‌-অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে।

—হুঁ। সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় ঘুমটা একটু বেশিই পায় কারো কারো—সিদ্ধান্ত জানালেন রামকুমার। বললেন, যান, হাত মুখ ধুয়ে আসুন। তারপর আমার সঙ্গে বেরুতে হবে।

—কোথায়?

—আমার বাসায়। রোজ এসে আপনার এখানে চা খেয়ে যাই—গরীবের আস্তানাটা একবার দেখবেন না?

—নিশ্চয়—নিশ্চয়। কিন্তু কতদূরে?

—আপনার মতো একটা সম্মানিত লোককে যতদূর পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিলে মর্যাদাহানি করা হয় না—ঠিক ততটা। এই তল্লাটেই—মিনিট ছয়েকের রাস্তা। নিন, তাড়াতাড়ি করুন।

তাগিদে অস্থির করে রামকুমার আমাকে পথে বের করলেন।

কয়েক পা চলবার পরে রামকুমার বললেন, চাটুয্যেকে কেমন লাগল?

ওঁর এই কথাটা শোনবার জন্যেই যেন মনটা অনেকক্ষণ থেকে প্রতীক্ষা করছিল: ভালোই তো।

—হুঁ, তা বটে।—রামকুমার গম্ভীর হয়ে গেলেন। হাতের মোটা লাঠি দিয়ে এক-টুকরো পাথরকে হাত পনেরো দূরে পাঠিয়ে দিলেন গল্‌ফ বলের মতো।

আমি আর প্রশ্ন করলাম না। বুঝতে পারছি, নিজের মনের মধ্যেই কথার ভূমিকা তৈরি করে নিচ্ছেন উনি। আপনা থেকেই শুরু করবেন এরপরে।

করলেনও।

—বাইরে থেকে ওঁরা যতটা সুখী, ভেতরটা সেই পরিমাণে ফোঁপরা।—রামকুমার-বাবুর মুখে বেদনার ছায়া ফুটে উঠল।

এমনি একটা কিছু অনুমান করেছিলাম আগে থেকেই। কিন্তু মন্তব্য না করে ওঁর কথা শোনবার জন্যেই প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

—ওঁরা নিঃসন্তান।

—তাই বটে!—রহস্যের কুয়াশাঘেরা দিকটা স্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। মনে পড়ল, চাটুয্যের সাজানো ঘরে সবই আছে, কিন্তু শিশুর হাতের বিশৃঙ্খল দুরন্তপনার আস্বাদ তো নেই কোথাও। কোথাও চোখে পড়ল না দুটি ছোট ছোট লাল জুতো, টোল-খাওয়া একটা টিনের ঢোল, নাক-থ্যাবড়া ডল পুতুল, কান-ছেঁড়া কাপড়ের খরগোস, চাকা-ভাঙা স্প্রীঙের মোটর, আর চেয়ারের কুশনের ওপরে লালাসিক্ত একটি চকোলেট।

—সেইজন্যেই বুঝি ফলদানের ব্রত?

—ঠিক ধরেছেন। কিন্তু আসল ট্র্যাজেডি কী, জানেন? চাটুয্যের সন্তান হওয়ার কোনো আশা কোনোদিন নেই—আর তার সমস্ত সম্ভাবনা নিজের হাতে ধ্বংস করেছেন ভদ্রলোক।

—কি রকম?

একটা তিক্ত হাসি দেখা দিলে রামকুমারের মুখে।

—সৌখীন লোক চাটুয্যে, টাকার অভাব নেই। বিয়ের পরে ভেবেছিলেন, 'মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে'। সেদিন সন্তানের কল্পনাও একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল। চিরযৌবনকে বেঁধে রাখবার জন্যে আকুলতার অন্ত ছিল না। স্ত্রীকেও কী বুঝিয়েছিলেন তিনিই জানেন—ডাক্তারকে ঘুষ দিয়ে অপারেশন করানো হল। তারপর: রামকুমারের হাসিটা পরিচিত সিনিসিজমে আরো কুটিল হয়ে উঠল: প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। সারা ভারতবর্ষের সমস্ত ডাক্তারের দরজায় দরজায় ঘুরেছেন ভদ্রলোক। ধরে দিতে

চেয়েছেন হাজার হাজার টাকা। কিন্তু ডাক্তারী শাস্ত্র সোজা জানিয়ে দিয়েছে এ তার ক্ষমতার বাইরে।

আপনা থেকেই আমার পা থেমে এল।

রামকুমার বললেন, আজ পরস্পরের অতি-সান্নিধ্যে স্বামী স্ত্রী কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেন না। নিজেদের মাঝখানে এমন কেউ নেই প্রতিদিনের এই অতি-নিকটতার ক্লান্তিকে যে দূর করতে পারে। গভীর রাত্রে এক এক দিন ঘুমের মধ্যে চাটুয্যে চেঁচিয়ে ওঠেন, ডক্টর, গিভ মি এ সান! সেই সঙ্গে স্ত্রী জেগে ওঠেন, পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বামীর ওপরে, আঁচড়ে কামড়ে স্বামীকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেন।

—কী ভয়ানক!

রামকুমার আমার কথা যেন শুনতে পেলেন না। নিজেই বলে চললেন, তাই নাস্তিক, তিনবার ইয়োরোপ-ফেরত চাটুয্যে আজ ঈশ্বরবিশ্বাসী। সমুদ্র রত্নাকর—বার বার ফিরে আসেন তার কাছে। ধর্ণা দেন জগন্নাথের মন্দিরে। স্ত্রী ফলদান করেন ব্রাহ্মণকে, মাঝ-রাতে উঠে সমুদ্রের ধারে আঁচল পেতে বসে থাকেন। আশা আছে, গঙ্গাসাগরে ফেলে দেওয়া কোনো একটি শিশুর আত্মা হয়তো ঢেউয়ের দোলায় দোলায় ওঁর আঁচলে এসে পড়বে!

আমার দিকে ফিরে তাকালেন, হাসলেন।

—আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি সুকুমারবাবু। জানি, এর সমাধান কোথায়। চাটুয্যের রিভলভার আছে, যত্ন করে রোজ চাবি দিয়ে রাখেন। যেদিন চাবি দিয়ে রাখতে ভুলবেন, সেদিন—

—সেদিন?—আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম।

রামকুমার উত্তর দিলেন না। পাশের একটা বাড়ির কাঠের গেটটা এক ধাক্কায় খুলে ফেলে বললেন, এই আমার গরীবখানা—ভেতরে আসুন।

নয়

একটি ভালোমানুষ স্ত্রী, দু'তিনটি ফুটফুটে ছেলেমেয়ে আর হাঁপানিগ্রস্ত বুড়ো বাপ—এই নিয়ে রামকুমারবাবুর সংসার। নিটোল, পরিচ্ছন্ন।

সন্ধ্যেটা কাটল একটা গুরু-গম্ভীর আবহাওয়ার ভেতরে। পি. আর. এস্. রামকুমার মৌআট মেডালের থীসিস্ কমপ্লিট করছেন। তারি একটা খানিক পড়ে শোনালেন। সাইকোলজী অব্ আর্ট নিয়ে কী এক দুরূহ গবেষণা। আর্টের নন্দনরূপ যদি সাহিত্য হয়, তবে তার ক্রন্দনরূপ হল আর্টতত্ত্ব। দার্শনিক রামকুমারের হাতে সে ক্রন্দন আর্তনাদ হয়ে উঠেছে দস্তুরমতো।

ক্ল্যাসিক্যাল গানের আসরে বসে বিন্দুমাত্র না বুঝেও নিরুপায় হয়ে মাথা দোলানোর মতো। থেকে থেকে ঘাড় নাড়তে হল, রামকুমারের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মুখে-চোখে ফোটাতে হল মুগ্ধ কৌতূহল; যতি-পাত করতে হল থেকে থেকে, 'বাঃ' 'কী আশ্চর্য', 'একথা কখনো ভাবিনি'-র সাহায্যে। তারপর যখন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ঘন ঘন হাতের ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে লাগল, তখন রামকুমার বুঝলেন।

—খুব ক্লান্তিকর, না?

—না, না! আশ্চর্য ইণ্টারেস্টিং!

রামকুমার হাসলেন। ভদ্রতার এই সহজ ছলনাটুকুর জাল ইচ্ছে করলেই ছিঁড়তে পারতেন, কিন্তু তা করলেন না।

—হাঁ, ক্রোচেকে কণ্ট্রাডিক্ট করে একটা নতুন কথা বলতে চাইছি। জানি না, কতটা দাঁড়াবে। সে যাক। চলুন—এবার আপনাকে খানিক এগিয়ে দিই।

—আর দরকার নেই। একাই যেতে পারব।

—আপনার দরকার না থাকলেও আমার আছে।—একটা চাদর টেনে নিলেন রামকুমার। তারপর তাঁর সেই মোটা লাঠিটা সংগ্রহ করে বললেন: ক্ষণমিহসজ্জন সঙ্গতিরেকা—বুঝলেন না? ভবার্ণবের একমাত্র পাথেয়। তা ছাড়া অতিথিকে নিয়ে আসা যেমন কর্তব্য, পৌঁছে দেবার দায়িত্বটাও সেই পরিমাণেই। অতএব ছাড়াতে চাইলেও আমাকে ছাড়াতে পারবেন না।

ইলেকট্রিকের ধোঁয়াটে আলোয় আবছায়া পথ। সমুদ্র-সুরভিত রাত্রের মুখর বাতাস। কোথা থেকে রেডিয়োর গান:

"ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে, হল কানায় কানায় কানাকানি এপারে ওই পারে—"

চাঁদ নেই—তবু চোখের জলের জোয়ার হয়তো এই সমুদ্র। উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক্ কবিতার মূর্ত রূপ। অশ্রান্ত কান্না—অবিশ্রান্ত আকুলতা, অতলচারী রহস্য। আমাদের খণ্ড খণ্ড জীবনের ভেতর শূন্যতার অশ্রু-তর্জন। কোথায় যেন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন এ কথা? আর বলেছিলেন অনতি-প্রখ্যাত ইংরেজ কবি:

"In the sea of life enisled,
With echoing straits between us thrown,
Dotting the shore-less, watery wild—
We mortal millions live alone—"

মার্গারেট? মার্গারেট তো শুধু একা নয়। ইরা। চাটুয্যে-গৃহিণী। জীবন। ইতিহাসের পরিক্রমা।

তবু এই যুগ। নতুন প্রেম, নতুন লক্ষ্য, নতুন সূর্য। সমুদ্রের কল্লোলে কান্নার ঢেউ মিশিয়ে দেওয়া নয়। অশ্রুতরঙ্গের ওপর ভাসিয়ে দাও অজানা মহাদেশের যাত্রায় দূরগামী জাহাজ:

"No mark out there, no mainland meets the eye.
Horizon gapes ; and yet must we journey
Beyond the bays peace, pull up our sweet roots
Cut the last cord links us to native shore,
Toil on waters too troubled for the halcyon—"

সমুদ্র জান্তব, সমুদ্র প্রতিদ্বন্দ্বী। এই জান্তব-সমুদ্রকে জয় করেই আজ যাত্রা: 'to strike a new continent!' যুগান্তরের পুরুষ আর নারীর উক্তি—জ্বলন্ত বর্তমানের শপথ! আজ যারা এর দিকে তাকিয়ে শুধুই চোখের জল ফেলবে, ইতিহাসের পাতা থেকে তাদের মুছে যাবার দিন এল! শুধু চরম দুঃখের মধ্য দিয়ে একথা তপতীই শোনাতে পারে—আজ তপতীরই জিত।

—চলতে চলতে ঝিমোন নাকি?—অ্যাঁ?—আচমকা সমুদ্রের ঢেউ এসে ঝাপ্‌টা দেবার মতো প্রশ্ন। ফিরে তাকালাম আবছায়া আলোয় উজ্জ্বল কুয়াশা দিয়ে গড়া রামকুমারের চশমার দিকে।

—কী বলছিলাম, শুনছেন?

—ক্ষমা করবেন, অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।

—হুঁ, কুয়োয় পড়বার অপবাদটা শুধু দার্শনিকদের ওপরেই প্রযোজ্য নয় দেখা যাচ্ছে! এবার অবহিত হয়ে শুনুন। কোনারক যাবেন?

—অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে।

—কিন্তু কোনো লক্ষণ দেখছি না তো তার। আমার কাল-পরশু দুদিন মোটে ছুটি। যেতে হলে আজকালের মধ্যেই।

—বেশ, চলুন তবে।

রামকুমার কী যেন ভেবে নিলেন কয়েক সেকেণ্ড।

—একটা খুব সোজা প্রশ্ন করব—মাপ করবেন। আপনি কি খুব ক্যালকুলেটিভ?

—হঠাৎ একথা কেন?

—মানে, আমি জানতে চাইছিলাম, কোথাও যাওয়ার আগে কি এক মাস ধরে আপনাকে ব্র্যাড্‌শ মুখস্থ করতে হয়? দশবার প্রোগ্রাম বদলাতে হয়? বেডিং বাঁধতে হয় সাতদিন ধরে? কুঁজো, ফ্লাস্ক আর টিফিন-ক্যারিয়ারের গিরি-গোবর্ধন রচনা করতে হয়?

হেসে বললাম, একেবারে না। ঝাঁ করে হাওড়ায় চলে এসে ই-আই-আর বি-এন্-

আর-এর যে কোনো টিকিট কিনে ফেলার অভ্যেস আমার আছে। অবশ্য পকেটে কিছু বাড়তি থাকলেই।

—হ্যাট্স লাইক এ মডার্ন ম্যান! ঠিক আছে—রামকুমার বললেন, এই রিক্শা, থামো থামো।

—রিক্শা দিয়ে কী হবে আবার? হোটেলের কাছে তো এসেই পড়েছি।

—হোটেলে কে যাচ্ছে মশাই?—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রামকুমার বললেন, এখন সোয়া আটটা। অল্‌রাইট। উঠে পড়ুন।

—কিন্তু যেতে হবে কোথায়?

—জগন্নাথের মন্দিরে।

—সে কী মশাই!

—ঘাবড়াবেন না সুকুমারবাবু!—রামকুমার অভয় দিলেন: পুণ্য করতে যাচ্ছি না আমরা। মন্দিরের ওখানেই গোরুর গাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে। এখন যদি ঠিক করে ফেলি, তা হলে রাত বারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়তে পারব।

—কিন্তু যাবেন কোথায়?

—আচ্ছা লোক তো! কোনারকের কথা ভুলে গেলেন?

—আজ রাত্রেই?

—বাঃ, এই না বললেন, আপনি একেবারে ক্যাল্‌কুলেটিভ নন? আর আজ রাতের কথা শুনেই চমকে উঠলেন?—রামকুমারের স্বরে ধিক্কার: কী, রিক্শায় উঠবেন, না হোটেলেই পৌঁছে দিয়ে আসব?

এরপরে আর দ্বিধা করা শুধু আত্মসম্মানের ক্ষতিই নয়, পৌরুষেরও অপমান। রিক্‌শাতেই চেপে বসলাম।

—চলুন—

* * * *

শেষকালে জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে গাড়ি ঠিক করে তবেই আমরা ফিরলাম।

প্রথমে তো যেতেই রাজী হয় না কেউ।

—আজ রাতেই? না বাবু, সে হবে না।

—কেন বাবা?—রামকুমার ভ্রূভঙ্গি করলেন: এমন কোন্ অসুবিধেটা হচ্ছে?

জবাবে যুক্তি ছিল। অনেকখানি রাস্তা যেতে হবে—তার অর্ধেকের ওপর আবার বালির ডাঙা ঠেঙিয়ে। অতটা পথ একটানা যেতে গেলে গোরু দুটোকে বেশ করে খাইয়ে নেওয়া দরকার। রাস্তায় কিছু মিলবে না, ক্ষিদেয় মরে যাবে গোরু। হাজার হোক, জীব তো!

রামকুমার বললেন, সে তো বটেই। কিন্তু এখনও তো বেশি রাত হয়নি। তোমার

গোরুকে কী রাজভোগ খাওয়াবে—এই বেলা থেকে শুরু করো না খাওয়াতে। রাত একটু বেশি হলেও আমাদের আপত্তি নেই।

—তা হলেও মাঝ-পহরের আগে বেরুনো যাবে না।

—বেশ, বেশ, তাতেই হবে।

রফা হয়ে গেল। দুখানা গাড়ি আসবে। রামকুমারকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হোটেলে এসে ডাক দেবে আমাকে। পাঁচটা টাকা আগাম দিয়ে রামকুমার বললেন, চলুন —এবার তবে ফেরা যাক।

রিক্‌শায় আসতে আসতে বললাম, আগাম টাকা তো দিয়ে এলাম। যদি না আসে?

রামকুমার হাসলেন: দেশটা যে ভারতবর্ষ মশাই। মহাপ্রভু জগন্নাথের মন্দিরের তলায় দাঁড়িয়ে বেইমানীটা ওরা আর করবে না। অবশ্য আপনার আমার মতো যারা কস্‌মো-পলিটান হয়ে গেছে তাদের কথা আলাদা। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ এখনো অতটা উন্নত হয়নি। ইণ্টারন্যাশনাল কালচারের সঙ্গে এখনো ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ে অব্‌ চীটিংটা ওরা আয়ত্ত করতে পারেনি। তা ছাড়া এটা উড়িষ্যা। এমন নন্‌-ক্রিমিন্যাল প্রদেশ ভারতবর্ষে আর আছে কিনা জানি না।

—তাই নাকি?

রামকুমার বললেন, পাণ্ডাদের দেখেই উড়িষ্যার মানুষকে চিনতে চাইবেন না। আজ হয়তো এখানকার কিছুই নেই। কিন্তু একদিন সভ্যতা আর সংস্কৃতির যে আলো এখানে জ্বলেছিল তার রেশ এখনো মুছে যায়নি এদের মন থেকে। আজও এরা শান্ত, ভদ্র, নির্বিরোধ। মহৎ হওয়ার স্বাভাবিক অধিকার নিয়েই মানুষ যে জন্মায়—এখানে এসে সে অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে। 'ম্যান্‌ ইজ্‌ বর্ন ফ্রি' না হোক—'ম্যান্‌ ইজ্‌ বর্ন গুড্‌'—এটা মানতেই হবে মশাই।

আমি বললাম, একটু বেশি ইমোশন্যাল্‌ হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু!

—ইমোশন্যাল্‌? না।—রামকুমার একটু দম নিলেন: পুরী দেখে আপনি কখনো বুঝতে পারবেন না যে এই প্রদেশের একাধিক জেলায় বারো মাস দুর্ভিক্ষ লেগে আছে। প্রতি বছর অজস্র লোক এখানে ক্ষিদেয় জ্বলতে জ্বলতে নিঃশব্দে মরে যায়। কিন্তু কোনোদিন তার এতটুকু খবর আপনারা পাবেন না—কখনো তাদের একটি দীর্ঘশ্বাস এসে পুরীর সমুদ্রের বাতাসকে বিষিয়ে দেবে না। বি-এন্‌-আর হোটেলের বীচে রঙীন ছাতার তলায় বিদেশিনীদের কস্টিউম পরা নগ্ন উরুর দিকে তাকিয়ে যখন আপনি রোমাঞ্চিত হবেন, তখন ভাবতেও পারবেন না সম্বলপুর জেলার কতগুলি মেয়ে গাছের পাতা লতা দিয়ে গেঁথে লজ্জা নিবারণ করছে!

পাথর-ওঠা রাস্তায় চলন্ত রিক্‌শা একটা ঝাঁকুনি খেতে রামকুমার থামলেন। তারপর

আবার শুরু করলেন : ভদ্র উড়িষ্যা, শান্ত, নিরীহ উড়িষ্যা। একেবারে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সমর্পিত প্রাণ। এত সহজে মরে যায় যে স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত ওদের ডাক শুনতে পান না। কিন্তু আর কোনো দেশ হলে—আকস্মিকভাবে রামকুমারের গলার স্বরে আগুন ঝরে পড়ল : ওসব রঙীন ছাতা আর চেঙ্গার বাবুদের সখের হোটেল কবে—

আমি আঁতকে উঠলাম : কী বলছেন মশাই ?

রামকুমার হেসে উঠলেন।

—ঠিক—ঠিক! আবোল-তাবোলই বকছি বটে। ইমোশন্যালই হয়ে উঠেছি দেখছি। যেতে দিন ওসব কথা। যতদিন রেল-কোম্পানির গাড়ি আছে, সামুদ্রিক কাব্যের জন্য আমাদের ব্যাকুলতা আছে, ততদিন রঙীন ছাতাকে রুখবে কে মশাই! উড়িষ্যা চুলোয় যাক, বীচের আবছায়া অন্ধকারে হাতে হাত রেখে বসতে বাধা নেই কিছুই।

—আপনি তো দেখছি ভয়ঙ্কর লোক! কথায় কথায় একেবারে প্রলয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন!

রামকুমার ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন : বলবেন না, ও সব কথা আর বলবেন না। যা শুনেছেন একেবারে ফরগিভ্ অ্যাণ্ড ফরগেট্। সরকারী চাকরি করি মশাই! কোন্ কথার কী মানে দাঁড়িয়ে যায় কে জানে! আমার জানাশুনো এক সরকারী চাকুরে তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি লিখতে গিয়ে 'বৌমা'কে ভুলে 'বোমা' লিখেছিলেন। সে চিঠি কী করে গিয়ে পড়ে ভুল ঠিকানায়। 'বোমা এখন কোথায় এবং কেমন আছে—' এ কথার সদুত্তর দেবার জন্যে তিনি আর তাঁর বন্ধুকে অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছিল। শেষকালে প্রি-ম্যাচিয়োর পেন্‌শন নিয়ে ভদ্রলোক পরিত্রাণ পান।

আমি হেসে উঠলাম।

রামকুমার বললেন, অতএব পত্রপাঠ আমার কথাগুলো ভুলে যান। শুধু যা বলছিলাম। গাড়োয়ানদের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। টাকা নিয়ে ওরা পালাবে না—যথাসময়ে গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হবে দেখতে পাবেন।

রিক্‌শা এসে হোটেলের সামনে থামল।

খাওয়া শেষ করে কোনারক যাওয়ার সংক্ষিপ্ত আয়োজন গুছিয়ে নিলাম। একজোড়া জামা-কাপড় আর দাড়ি কামানো ইত্যাদির টুকিটাকি ছাড়া বোঝা বাড়ানোর কিছু নেই।

শুয়ে পড়ব নাকি? না—কোনো লাভ নেই। সেই বারোটা-একটা নাগাদ আবার তো উঠে পড়তেই হবে। তার চাইতে ও প্রলোভন দমন করাই ভালো। ছাতের দিকেই যাওয়া যাক একটু। আর এমনিতেও এখন তো প্রায় এগারোটাই বাজে!

দু পা এগোতেই চমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

স্ত্রী-কণ্ঠের একটা তীব্র চিৎকার অর্ধঘুমন্ত হোটেলের সমস্ত শান্তিকে ভেঙে খান খান করে দিলে।

—খাব না, আমার খুশি আমি খাব না। তুমি কী করতে পারো?

পুরুষের শঙ্কিত মিনতি শোনা গেল: আঃ, কী হচ্ছে এই রাত্রে! থামো—থামো—চুপ করো—

—চুপ করব? কেন চুপ করব? কাকে আমি ভয় করি?—স্ত্রী-কণ্ঠের চিৎকারটা আবার প্রেতিনীর আর্তনাদের মতো অন্ধকারটাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল: খাব না আমি, এক ফোঁটা জলও মুখে দেব না আজ!

পরক্ষণেই ঝন্ ঝন্ করে শব্দ উঠল। একরাশ প্লেট আর কাচের গ্লাস কে যেন মেঝের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে, একটা হিংস্র মত্ততায় সব কিছু সমানে ভাঙচুর করে চলেছে।

একটা তীব্র সন্দেহ আর আতঙ্কে আমার সমস্ত মনটা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। গলার স্বর দুটো যে চেনা চেনা ঠেকছে! চিৎকারে আশেপাশের কয়েকটা ঘুমন্ত ঘরের দরজা খুলে গেছে ততক্ষণে। বেরিয়ে এসেছে কৌতূহলীর দল।

—চোর নাকি মশাই?

—কী হল? খুন-খারাপী নাকি?

পাশ দিয়ে দ্রুত চলে যেতে যেতে ম্যানেজার বললেন, ও কিছু না—ও সবে কান দেবেন না। আপনারা যান, শুয়ে পড়ুন সবাই।

যাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কিন্তু ওই প্রচণ্ড কোলাহলটা মাত্র মিনিটখানেকের জন্যেই রাত্রির শান্তিকে বিঘ্নিত করে আবার অতলস্পর্শ নীরবতায় হারিয়ে গেছে। প্রত্যাশাভরে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ক্ষুণ্ণ মনে তাঁরা আবার যে যাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করলেন।

আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, খেয়াল নেই। সামনে রামানুজ আসতে আমার চটকা ভাঙল।

—এখানে দাঁড়িয়ে আছেন বাবু?—রামানুজ জানতে চাইল।

—ছাতে যাব। কিন্তু ও কিসের শব্দ হল রামানুজ? ঝন্ ঝন্ করে ওসব ভাঙল কী?

—ও তো প্রায়ই হয় বাবু!—রামানুজ তাচ্ছিল্যভরে বললে, তিন নম্বর ঘরের বড়বাবু হোটেলে এলেই এসব কাণ্ড হয়। এখন এ সমস্ত গা-সওয়া হয়ে গেছে আমাদের।

—তিন নম্বর ঘর? চাটুয্যে মশাই?

—হাঁ, ওই বড়বাবু। মাইজীর আবার ফিটের রোগ আছে! যখন সেই রোগটা আসে, তখন এমনি চেঁচিয়ে ওঠেন—হাতের সামনে যা কিছু পান, ভেঙে একেবারে তচনচ করে দেন। এখন বেহুঁশ হয়ে পড়েছেন। সারারাতের মতো নিশ্চিন্ত।

—ওঃ !—আমি জবাব দিলাম। রামকুমারের কথাগুলো শোনার পরে বিস্মিত হওয়ার আর কিছুই নেই। এমনি একটা অনুমানই করেছিলাম। আস্তে আস্তে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে একেবারে ছাতে চলে এলাম। খোলা ন্যাড়া ছাত—একেবারে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসা চলে। আমিও তাই বসলাম।

সামনে কালো সমুদ্র। অন্ধকারে একদল কালনাগিনীর মতো সমানে ছোবল মেরে চলেছে মাটির ওপর, চলেছে অশ্রান্ত আর ক্ষমাহীন ফোঁসানি, মাথার মণির মতো চিকচিক করছে ফেনা। কেমন অস্বস্তিভরে মনে হয়—এত বড় পৃথিবীতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন একটা রাতের জন্যে ও কোনো নিবিড় আরো গভীর ঘুমের মধ্যে এলিয়ে পড়তে পারে না ? বিশ্রাম নিতে পারে না কোনো দুরন্ত দামাল শিশুর নিথর শান্ত নিদ্রার মতো ? নিবিড় সুপ্তিতে কখনো কি স্বপ্ন দেখতে পারে না সমুদ্র ?

আমার মাথার চুলগুলোকে হু হু করে উড়িয়ে দিয়ে প্রবল জোলো হাওয়া বয়ে চলল। বাতাসে কেমন একটা আঁশটে জান্তব গন্ধ—সমুদ্রের গন্ধ। সমুদ্র যে একটা হিংস্র জন্তু সেইটেই যেন মনে করিয়ে দেয়। 'যাদঃপতি।'

—ডক্টর—ডক্টর—গিভ্ মি এ সান্ !

চাটুয্যের গলায় সেই আকুল আর্তি। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষমতা আজ থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই দেবতার কাছে চাটুয্যে-গিন্নীর কাতর প্রার্থনা—সমুদ্রের দিকে আঁচল মেলে দিয়ে বুক-জুড়োনো একটি শিশুর জন্যে মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস ! তাই গভীর রাতে সেই তীক্ষ্ণ চিৎকার—পেয়ালা-পিরিচ-কাচের গ্লাস ভাঙবার শব্দ, হিস্টিরিয়ার আক্রমণ !

জান্তব সমুদ্র—সমুদ্র নিষ্প্রাণ। কী দিতে পারে চাটুয্যে-গিন্নীকে ?

অন্ধকারে কালো ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কালিদাসকে মনে পড়ল। মহাকবির কল্পনায় মহাসাগরের আর এক রূপ :

'তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং
স্থিতং দশব্যাপ্য দিশো মহিম্না,
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়ম্
ঈদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা !'

বিশ্বরূপ বিষ্ণুর মতোই দশ-দিশি ব্যাপ্য সমুদ্রের বিশাল মহিমা—স্বয়ং কালিদাস পর্যন্ত তাঁর সর্বস্পর্শী লেখনীতে তার ইয়ত্তা করতে পারেননি। এই মহাদেবতার কাছে কারুর প্রার্থনাই তো অপূর্ণ থাকবার কথা নয় !

'নৃপা ইবোপপ্লবিনঃ পরেভ্যো
ধর্মোত্তরং মধ্যমমাশ্রয়ন্তে—'

পরাক্রান্ত রাজার মতো বিপন্নকে আশ্রয় দেয় সমুদ্র—ত্রাণ করে শরণাগতকে।

আশ্বাস দিয়েছেন স্বয়ং রামচন্দ্র। সম্রাট সমুদ্রের ভাণ্ডার থেকে একটি সন্তানও কি দুষ্প্রাপ্য চাটুয্যের পক্ষে? বিপন্ন 'মহীধ্রা' পর্যন্ত যাঁর কাছে বরাভয় পায়, তাঁর পক্ষে এতই কি অসম্ভব একটি ক্ষুদ্র শিশুর একবিন্দু করুণা বর্ষণ? একটি কৃপার কণা ছাড়া এ তো আর কিছুই নয়!

তবু এই অন্ধকারে—এই গর্জিত ভয়ঙ্করের দিকে তাকিয়ে কালিদাসের স্বপ্ন-কল্পনায় মন আশ্বস্ত হয় না। একটা ভয়, একটা বিভীষিকার আতঙ্ক যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে আক্রমণ করতে থাকে। মনে পড়তে থাকে টাইডাল ওয়েভের দুঃস্বপ্ন;—মনে পড়তে থাকে, দক্ষিণ-মেরুর তুষারমরুতে লক্ষ কোটি টন বরফ গলতে শুরু হয়েছে—প্রাক্-তুষার যুগের মৃত মহাদেশ তার সমাধির ভেতর থেকে পুনরুত্থিত হচ্ছে প্রলয়-মূর্তিতে!

তবু সমুদ্রই আশা—তবু সমুদ্রই আশ্বাস। দেবতার রূপ ভয়ঙ্কর না হলে তার ওপরে বিশ্বাস যেন আসতে চায় না মানুষের। রুদ্রের প্রসন্ন মুখ দেখলে, তার ওপরে ভক্তি শিথিল হয়ে আসে। তাই শিবপুজোটা অভ্যাস মাত্র, কোনোমতে চোখ কান বুজে কয়েকটা ফুল-বেলপাতা চাপিয়ে দিলেই চলে; কিন্তু কালী-পুজোয় এতটুকু শৈথিল্য ঘটবার উপায় নেই—অমাবস্যার কালো রাত্রে রক্তলুব্ধার বীভৎস মূর্তি মানুষকে স্বাভাবিক ভক্তিরসেই আপ্লুত করে দেয়। তাই ঘণ্টাকর্ণ বা শীতলা পুজোয় শ্রদ্ধার তিলমাত্র অভাব ঘটে না—তাই এক কণা শনির প্রসাদ মাটিতে পড়াও গৃহস্থের পক্ষে এমন ভয়াবহ অমঙ্গলের ইঙ্গিত!

পূর্ণ হোক—চাটুয্যে-গিন্নীর প্রার্থনা পূর্ণ হোক। মুছে যাক এই ঘৃণা, এই অবিশ্বাস, দিনের পর দিন এমনি করে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাওয়া—মুহূর্তে মুহূর্তে এই মর্মান্তিক স্নায়ুযুদ্ধ! অশান্ত-ক্ষুব্ধ কালো তরঙ্গগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমারও যেন চাটুয্যের জন্যে প্রার্থনা করার ইচ্ছে হতে লাগল।

একটি শিশু। গঙ্গাসাগরে ফেলে দেওয়া কোনো একটি অম্লান-নবীন আত্মা। এই মুহূর্তে অতিকায় অজগরের মতো ঢেউ তার ফণায় মণির মতো বয়ে আনুক একটা ইন্দ্রধনু বর্ণের ঝিনুক—অতি সাবধানে এনে নামিয়ে দিক সমুদ্রের বেলাভূমিতে। তারপরে যেমন ভাবে পদ্মের পাপড়ি খুলে যায়, তেমনি করে অতি ধীরে ধীরে উন্মীলিত হোক সে—তার রজতশুভ্র বুকের ভেতর উজ্জ্বল মুক্তোর মতো একটি শিশু আবির্ভূত হোক; মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে যাক আনন্দমুগ্ধ সমুদ্রের সফেন মত্ততা, 'মিউজে'র বন্দনার মতো স্বর-নির্ঝরিত কলধ্বনি বাজতে থাকুক চারদিকে—মাথার ওপরে সপ্তর্ষির প্রসন্ন দৃষ্টি তাকে অভিষিক্ত করুক, স্বাতী-নক্ষত্রের একবিন্দু জল তার কুঞ্চিত স্বর্ণকেশে বর্ষিত হোক আশীর্বাদের মতো। তারপর সমুদ্রের বাতাস প্রজাপতির ডানার মতো প্রসারিত হয়ে তাকে তুলে নিক, নিয়ে যাক সেইখানে—যেখানে—

চিন্তাটা হোঁচট খেল। ডানদিকের রাস্তার ওপারে একটা বাড়িতে কে যেন কাশছে।

একটানা—হৃৎপিণ্ড-ছেঁড়া কাশির শব্দ। যেন যতক্ষণ গলা দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত না উঠে আসে, ততক্ষণ ওটা আর থামবে না।

কিন্তু কী বিশ্রী কাশি! কেমন সন্দেহ হয়। যক্ষ্মা?

যক্ষ্মা! সুধীশ মল্লিক! এই রাত্রে কোথায় সে? এখন কি সে হু হু করে ছুটে চলেছে মাদ্রাজ মেলে—পূর্বঘাট পাহাড়ের কালো ছায়ার পাশ দিয়ে? কালো অরণ্যের চলস্রোত কি হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে চলেছে তাকে? আর অন্ধকারে জানলায় চোখ মেলে বসে আছে তপতী? বিধ্বস্ত টাওয়ার অব্ বেবিলনের পাশে একমাত্র শোকার্থিনী?

হাঁ, সমুদ্র সুধীশকে মুক্তি দেবে। দেশের মুক্তির জন্যে সে মরতে চলেছে: আফ্‌টার অল্ হি ইজ গোয়িং টু ডাই এ ফ্রী ম্যান! কিন্তু তপতী? এই সমুদ্রের দিকে আঁচল মেলে সে বসে থাকবে কোন্ প্রত্যাশায়, কোন্ সম্ভাবনার স্বপ্নে?

চাটুয্যে নিতে এসেছেন, তপতী দিতে এসেছে। চাটুয্যের প্রার্থনা পূর্ণ হবে কি না কে জানে, কিন্তু তপতীর অর্ঘ্য গ্রহণ করবে সমুদ্র। শুধু গ্রহণই করবে না—নিষ্ঠুর লোলুপ হাতেই ছিনিয়ে নেবে হয়তো! আশীর্বাদ করুক আর নাই-ই করুক—নিজের বলি কেড়ে নিতে কোনোদিনই দেবতার এতটুকুও কার্পণ্য নেই কোথাও!

'হে সমুদ্র, চিরকাল কী তোমার ভাষা?'

জান্তব। বুভুক্ষু। নির্মম। আঁশটে নোনাজলের ভেতরে যেন শিকার-লোলুপ ক্ষুধিত বাঘের দুর্গন্ধ।

—সুকুমারবাবু—সুকুমারবাবু!

রামকুমারবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন।

ঘুম-ভাঙার মতো করে আমি সজাগ হয়ে উঠলাম। কখন যে দুখানা গোরুর গাড়ি অন্ধকারে হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তা টেরও পাইনি এতক্ষণ।

—ও মশাই সুকুমারবাবু, ঘুমুচ্ছেন নাকি? গাড়ি এসে গেছে যে!—আবার রামকুমারের হাঁক শুনতে পাওয়া গেল।

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

তারপর দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে গলা চড়িয়ে জবাব দিলাম: ইয়েস্, ইয়েস্—আই অ্যাম্ রেডি!

* * * *

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মনে নেই। হঠাৎ একটা জোরালো ঝাঁকুনিতে আচমকা জাগিয়ে দিলে। মেটে মেটে জ্যোৎস্নায় গাঁয়ের পথে এতক্ষণ যে গাছপালার ছায়ামূর্তি দেখছিলাম, কখন তা মিলিয়ে গেছে রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে। গ্রামগুলো এখন দূরে দূরে সরে গেছে, গোরুর গাড়ির চাকার নিচে নরম বালির পথ। এখন শুধু ছোট ছোট বালিয়াড়ি

আর কেয়াঝোপ। ফণী-মনসাও আছে। দূরে দূরে নিঃসঙ্গ ঝাউবন—আর তাদের মাথার ওপর নতুন-জাগা সূর্যের গায়ে পড়ছে সোনালি গিল্‌টির রঙ্‌।

বালিশটা বুকের নিচে টেনে নিয়ে উঠে বসলাম আধশোয়া হয়ে।

নড়বড়ে দীনহীন ছইয়ের দুদিক খোলা আদিম যান। তাই দেখতে পেলাম, সামনের গাড়িতে বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন রামকুমার—তাকিয়ে আছেন আমার দিকেই।

—কী, ঘুম ভাঙল?

—তা ভাঙল।

—কেমন লাগছে?

—বেশ নতুন।— মুগ্ধ গলায় জবাব দিলাম

—হাঁ, একেবারে নতুন!—হঠাৎ সিনিকের তিক্ত হাসিতে রামকুমারের মুখের চেহারা বিস্বাদ হয়ে গেল: পুরীর সঙ্গে এর কোনো মিলই খুঁজে পাবেন না আপনি, আর এই-ই হল সত্যিকারের উড়িষ্যা।

আমি তাকিয়ে রইলাম।

রামকুমার বললেন, ওই যে বালিয়াড়ি দেখছেন, আপনার চোখে ওটা নিশ্চয় স্বপ্ন! কিন্তু এদের কাছে ও হল মূর্তিমান মৃত্যু! ওর তলায় শুকিয়ে মরে গেছে উড়িষ্যার ফসলের ক্ষেত—তার শ্যামল জীবন! এই ঝাউগাছগুলো সেই শ্মশানে দাঁড়িয়ে প্রেতের দীর্ঘশ্বাস ফেলছে!

তেমনি নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি। আকস্মিক—একেবারে আকস্মিক! মনের একবিন্দু প্রস্তুতি ছিল না এর জন্যে। নতুন একটা আশ্চর্য পরিবেশের মধ্যে ঘুম ভেঙেছিল—রোদের সোনালি রং মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল কাশফুলের দাক্ষিণ্যে ভরা বাংলাদেশের শরৎ—সকালের একটা মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাস এসে রুক্ষ চুলগুলোয় মোহভরা আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছিল—তার ভেতরে এ কী! মনে হতে লাগল, ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলবার সঙ্গে সঙ্গে এই মুহূর্তে রামকুমারবাবুর এ কথাটা না বললেও চলত, এর জন্যে আরো কিছুক্ষণ তিনি অপেক্ষা করতে পারতেন!

—ভারতবর্ষের স্টার্ভিং প্রভিন্স্‌ এই উড়িষ্যা। ক্ষিদেয় জ্বলে-যাওয়া এর মাটি। তবু আশ্চর্য—এই দেশকে একেবারে ভুলে যাই আমরা—পুরীর সী-বীচের অন্ধকারে বসে অরূপের ধ্যান করতে থাকি।

চাবুক। চাবুক মারলেন আমার মুখের ওপর। বি-এন-আর হোটেলের বীচে রঙীন ছাতার তলায় সূর্যস্নান করছে রঙ্গিণী। আর সুধীশ মল্লিক মরতে চলেছে কোন্‌ অপরিচিত সাগরতীরে—ম্লান হয়ে আসছে তপতীর সিঁদুর!

রামকুমার হঠাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন আমার মুখের ওপর থেকে। মনে হল, লজ্জা

পেয়েছেন—সংকোচ বোধ করেছেন নিজের এই আকস্মিক রূঢ়তায়।

বালির ওপর ক্লান্ত রেখা টেনে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। চাকার শব্দ, গোরুর লেজের আওয়াজ, গাড়োয়ানের ধিক্কার। বাঁখারি দিয়ে এলোমেলো অযত্নে বোনা ছইটা ঝর্‌ঝর্‌ করছে থেকে থেকে।

সোনালি গিল্‌টি সরে গিয়ে ইস্পাতের ধার ফুটছে রোদে। একটা শ্রীহীন রুক্ষতা নেমেছে মেঘকৃষ্ণ ঝাউবনের ওপর। তুষারকণার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে বালি। এই সাত-সকালেই একটা ঘূর্ণি উঠল ওদিকে—দ্রুত নাচের তালে কয়েক পাক ঘুরে গেল মস্‌লিনের পেশোয়াজের মতো।

—আর কত দূর রে?—নিজের অস্বস্তিটা ভাঙার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম গাড়োয়ানকেই।

—দুই ক্রোশ হব—বটুয়া থেকে একটা পান মুখে পুরে গাড়োয়ান জবাব দিলে। সাহারার সংকেত যেন।

—মানে চার মাইল?

—হঁ।

উড়িষ্যা। বালিয়াড়ি। প্রাণহীন ঝাউবন। ক্ষিদের জ্বালায় মাটি শুকিয়ে বালি হয়ে গেছে। সুধীশের ক্ষয়িষ্ণু হৃৎপিণ্ড।

—চা খাবেন না মশাই?

রামকুমার আবার তাকিয়েছেন আমার দিকে। হয়তো প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছেন মনে মনে।

—চা? এখানে কোথায় চা?

বাঁ দিকে গ্রাম দেখা যাচ্ছে একটা। রামকুমার সেদিকে আঙুল বাড়ালেন: ওখানে গেলে দুধ মিলবে, গরম জলও পাওয়া যাবে বোধ হয়। আর চা তো সঙ্গেই আছে।

—বেশ তো, ভালোই হয়।

ওড়িয়া ভাষায় রামকুমার নির্দেশ দিলেন গাড়োয়ানদের। গাড়ি রাস্তা ছেড়ে বাঁক নিলে—কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রামের ভেতরে এসে আমরা থামলাম।

মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালায় গড়া খানকয়েক ঘর—পথের দু পাশে দাঁড়িয়ে আছে সার দিয়ে। চালের খড় পচে কালো হয়ে আছে, খুঁটিগুলো ঘুণে জর্জরিত। কয়েকটি শীর্ণদেহ মানুষের বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টি। একটা আটচালার ভেতর থেকে দশ-বারোটি শিশু বেরিয়ে এল চঞ্চল কৌতূহলে—পেছনে এল ছোট একটি কঞ্চি হাতে মাঝ-বয়েসী একজন লোক। খালি গায়ে ধব্‌ধবে একটি শাদা পৈতে, মাথার চারদিক গোল করে চেঁছে ঠিক ব্রহ্মতালুর ওপরে একটি ঝুঁটির মতো বিরাট টিকি।

গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন রামকুমারবাবু। হঠাৎ লোকটির উদ্দেশে দু' হাত জড়ো করে ঠেকালেন কপালে।

—নমস্কার পণ্ডিতমশাই—

—নমস্কার-অ—অনিশ্চিতভাবে জবাব দিলেন দ্বিধাগ্রস্ত পণ্ডিত।

—বেড়াতে এলাম আপনাদের এখানে।

—আইজ্ঞা?—সীমাহীন বিস্ময়ে পণ্ডিত তাকিয়ে রইলেন।

—আপনাদের গ্রাম দেখতে এলাম—অবস্থাটাকে সহজ করে দিলেন রামকুমার।

—ভাল-অ খুব ভাল-অ—পণ্ডিত শুধু এইটুকুই বলতে পারলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি থেকে মনে হল কেমন একটা অনিশ্চিত অবিশ্বাসে তাকিয়ে আছেন তিনি। সে দৃষ্টিতে আতিথ্য নেই—আনন্দ নেই; খানিক অর্থহীন ভয় আর অপ্রীতি জড়িয়ে আছে শুধু। কেন জানি না: একটি ছবি মনে এল। মহাসমুদ্রের কোনো অপরিচিত দ্বীপে এসে ঠেকেছে পথভ্রষ্ট জাহাজ। দ্বীপবাসীদের সমস্ত সাগ্রহ আতিথেয়তার ঋণ যারা শোধ করবে একটু পরেই লুণ্ঠন-পর্ব চালিয়ে, গ্রামে আগুন দিয়ে, বন্দুকের গুলিতে কালো মানুষের বুক থেকে লাল রক্ত ঝরিয়ে, জাহাজের খোলে একরাশ ক্রীতদাস বোঝাই করে। হঠাৎ মনে হল—আমার নিজের হাতেও যেন একটা বন্দুক আছে, আর সেটাকে ওই পণ্ডিতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আমিও দাঁড়িয়ে আছি দস্যুতার নৃশংস ভূমিকায়!

—নামুন মশাই, নামুন—রামকুমার আচমকা একটা তাড়া দিলেন: শুধু পুরী, কোনারক আর ভুবনেশ্বর দেখে পালাবেন তা কি হয়? সত্যিকারের উড়িষ্যাকেও দেখে যান একবার।

দশ

ঘরের মধ্য থেকে কয়েকটা চৌপাই টেনে বের করলেন পণ্ডিত।

—বসতে আইজ্ঞা হয়—

ভাষাটা অবোধ্য নয় পণ্ডিতের। উড়িষ্যায় এসে আর একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করছি। বাংলা ভাষার সঙ্গে ওড়িয়ার পার্থক্য আকৃতি-প্রকৃতিগত ভাবে নিতান্তই নগণ্য। যেটুকু স্বাতন্ত্র্য তা উচ্চারণের; সে উচ্চারণও চট্টগ্রামের মতো দুর্ভেদ্য হীনপ্রাণ ধ্বনিবিন্যাসে দুর্গম নয়। হসন্ত ধ্বনিগুলিকে হলন্ত করে নিলেই অধিকাংশ ওড়িয়া শব্দই নির্ভেজাল বাংলা হয়ে ওঠে। 'আর কত দূর হবে' কথাটা যদি সাধারণ ওড়িয়ার কাছে দুরধিগম্য হয়—'আরো কতদূরো হবো' বললেই সদুত্তর মিলবে তার কাছ থেকে।

রামকুমারবাবু ওড়িয়া ভাষায় বিশারদ। আমিও যথাসাধ্য হসন্তকে হলন্ত করে পণ্ডিতের সঙ্গে বাক্যালাপ জুড়ে দিলাম। রামকুমার মিটিমিটি হাসছিলেন কিন্তু পণ্ডিতের

বিকারহীন স্থির মুখে ব্যঙ্গের লেশমাত্র দেখা দিল না কখনো।

—এরাই বুঝি আপনার ছাত্র পণ্ডিতমশাই?—আমি জানতে চাইলাম।

—হুঁ।

—কী পড়ে এরা?

পণ্ডিত নিজের ভাষায় জানালেন, এরা সব প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগের ছাত্র।

—ইংরেজী পড়ে না?

—হাঁ, তাও পড়ে। মাইনর পাস পণ্ডিত এদের ফার্স্ট বুক পর্যন্ত বিদ্যাদান করে থাকেন। সেটুকু পর্যন্ত তাঁর অধিকারের সীমা বিস্তৃত।

—এর পরে?

এর পরে আর কী। চাষার ছেলে, গরীবের সন্তান। কেউ ক্ষেত-খামার দেখবে, কেউ গাড়ি হাঁকাবে, কেউ কুলি খাটবে; কেউ আধপেটা খাবে, কেউ উপোস করবে। এক-আধজন হয়তো তিন মাইল দূরের মাইনর স্কুল পর্যন্ত গিয়েও পৌঁছুতে পারে। পণ্ডিতের এই সাত বছরের কর্মজীবনের একটি ছেলে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেছে—সগৌরবে পণ্ডিত ঘোষণা করলেন সেটা।

—কী করে সে?

কটকে থাকে। সেখানকার আদালতে চাকরি করে ছোটমতো কী একটা। বছরে একবার করে দেশে আসে রথের সময়। তবে অকৃতজ্ঞ নয়। যখনই আসে তখনই পণ্ডিতের জন্যে নিয়ে আসে একখানা ধুতি, একটি গামছা। বলতে বলতে জল এল পণ্ডিতের চোখে।

ছাত্র তো আমিও পড়াই। কলেজের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছাত্রচারণ আমারও পেশা। এমনি দশ-পনেরোটি নয়—হাজার হাজার। কিন্তু আকস্মিক দুটি-একটি ছাড়া কোনো মুখ কি মনে থাকে? একটা গ্র্যানিটের স্তরের উপর দাঁড়িয়ে থাকি—হাজার হাজার তরুণ উজ্জ্বল মুখ—সংখ্যাতীত ছাত্র-ছাত্রীর দল সমুদ্রের তরঙ্গের মতো দুলে দুলে চলে যায় সামনে দিয়ে। সব একাকার, সব একরকম। আজ উড়িষ্যার এই নগণ্য পাঠশালার পণ্ডিতের সম্মুখে নিজেকে অত্যন্ত হৃদয়হীন বলে বোধ হল। শিক্ষকতার বাঁধা অভ্যাসের মধ্যেও একটি হৃদয়ের অবকাশ আছে—পণ্ডিত সে হৃদয়ের সন্ধান জানেন। পাথরের কলকাতায় অবরুদ্ধ থেকে পাথরের পিণ্ড হয়ে গেছি আমরা। কোন্ ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করে আত্মহত্যা করল—অর্থ এবং পদগৌরবের উচ্চতম চূড়োতেই বা গিয়ে পৌঁছুল কোন্ ভাগ্যবান—এ অবান্তর কৌতূহল আমাদের কখনো পীড়া দেয় না!

—ছেলেদের লেখাপড়ায় খুব ঝোঁক বুঝি?

—ঝোঁক?—পণ্ডিত বিষণ্নভাবে হাসলেন।

উত্তর তিনি দিলেন না—উত্তরের দরকারও ছিল না। নিজের চোখেই তো দেখে

এসেছি ফসলহীন উড়িষ্যার মৃত বালিয়াড়ির স্তূপ—দেখেছি তাদের ওপর কণ্টক-কুটিল ফণীমনসার উল্লাস! শিক্ষা! উপবাস আর দুর্ভিক্ষ যাদের দৃষ্টির সামনে দগ্ধ-বালুর ওপর পিঙ্গল অগ্নিরেখায় কেঁপে কেঁপে উঠছে—সেখানে শিক্ষা! পণ্ডিতও একটা অভ্যাসেরই দাসত্ব করে চলেছেন। পড়াতে হয়, তাই পড়ানো; পড়তে হয়, তাই পড়া।

ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। বলে দেবার দরকার নেই যে এরা পেট ভরে খেতে পায় না। কটক ইউনিভার্সিটি! প্ল্যান করে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন রাজধানী গড়ে উঠছে ভুবনেশ্বরে।

রামকুমার কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক মানুষ; দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে কথাটা নিজেই তুললেন আবার।

—পণ্ডিত মশাই, একটু উপকার করতে হবে যে।

—বলুন আইজ্ঞা।

—চা খাব। আগুনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আর একটু দুধ।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।—পণ্ডিত ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ গলায় কিছু একটা আদেশ করলেন—মুহূর্তে তীরের মতো দিগ্বিদিকে ছুটল তারা।

—ওদের আবার কোথায় পাঠালেন?—রামকুমার জানতে চাইলেন।

—সব আনতে গেল যোগাড় করে।

—আর পড়বে না বুঝি?

—না, আজকের মতো ছুটিই দিয়ে দিলাম।

—আমাদের সম্মানেই নাকি?

পণ্ডিত হাসলেন। বিষণ্ণ, বিমর্ষ। লক্ষ্য করলাম, এতক্ষণ পরে এই প্রথম হাসলেন তিনি।

—তা তো বটেই। মানী লোক আপনারা।

খুব নিরীহ ভাবেই বললেন কিন্তু আমার যেন আঘাতের মতো বাজল কথাটা। ব্যঙ্গ করলেন নাকি পণ্ডিত? এই ভাঙা খড়-ঝরে-যাওয়া পাঠশালায় শিক্ষার নামে মানুষের যে নিরুপায় আকৃতি মাথা কুটে মরে, সেটা যে কত মূল্যহীন—যেন সেই কথাটা প্রমাণ করার জন্যেই আমাদের চা খাওয়াকে উপলক্ষ্য করে পাঠশালার ছুটি ঘোষণা করলেন তিনি।

—তা হলে চায়ের আয়োজন চলুক ততক্ষণ। এই ফাঁকে একবার আপনাদের গ্রাম দেখে আসি পণ্ডিত মশাই?

—গ্রাম? গ্রাম কী দেখবেন?—কেমন ভাসা-ভাসা চোখে তাকালেন পণ্ডিত।

—কেন, কিছু দেখবার নেই এখানে?

—এখানে সব গরীব মানুষ থাকে। ভাঙা ভাঙা কুঁড়েঘর তাদের। অন্ন দশখানা

গাঁয়ে যা, এখানেও ঠিক তাই। নতুন কী দেখবেন আর?

পণ্ডিত আবার হাসলেন। এবার হাসছেন খুব ঘন ঘন। সহজ হতে পেরেছেন এতক্ষণে। কিংবা তাও নয়। অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদের অনুগ্রহের অত্যাচার সহ্য করবার পরে দুটো-একটা মৃদু প্রতিঘাত করতে চেষ্টা করছেন হয়তো।

কিন্তু তাঁর মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। প্রতিঘাত করার শক্তি কি কোথাও অবশিষ্ট আছে পণ্ডিতের? মহাপ্রভু জগন্নাথের পায়েই তুলে দিয়েছেন অনুভূতির যা কিছু ভার: ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন—

রামকুমার নাছোড়বান্দা: না, চলুন।

—চলুন তবে।

দু'পাশে দু'সারি জীর্ণ খোড়ো ঘরের ভেতর দিয়ে বেলেমাটির পথ বেয়ে আমরা এগোলাম। বিনা বাক্যব্যয়ে পুরুষগুলি আমাদের পথ ছেড়ে দিলে, এক-আধজন চাপা গলায় কী যেন জিজ্ঞাসাও করল পণ্ডিতকে। দরজা আর ঝাঁপের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে দেখা দিতে লাগল অন্তঃপুরিকাদের শঙ্কা-সঘন জিজ্ঞাসু কালো চোখ।

—একটু দাঁড়ান।—রামকুমার হঠাৎ বললেন।

দাঁড়ালাম। একটি ঘরের মেটে দেওয়ালের গায়ে আঙুল বাড়িয়ে রামকুমার বললেন, দেখুন।

পণ্ডিত তাচ্ছল্যভরে বললেন, ও কী দেখবেন? ওসব আবোল-তাবোল নিজেরাই এঁকে রেখেছে।

আবোল-তাবোল! পণ্ডিত যত সহজে বললেন, তত সহজেই উপেক্ষা করা গেল না জিনিসটা।

দেওয়াল জুড়ে ছবি। এ রীতি পশ্চিমেও আছে,—উত্তর প্রদেশে পা দিলেই তা চোখে পড়বে। কিন্তু! তার সঙ্গে এর পার্থক্য এক লহমা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এক-পাল মৃত্যুভীত চিতি-হরিণ ছুটেছে, তার পেছনে যমদূতের মতো বাঘের ভয়াল মূর্তি। নিতান্ত সাধারণ কয়েকটা উজ্জ্বল রঙের সাহায্যে পলাতক হরিণের পায়ে যে আশ্চর্য গতির ছন্দ ফুটেছে, তাদের চোখে আতঙ্কের যে বিদ্যুৎ-চমক এবং লাফিয়ে পড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বাঘের দুটি সম্মুখের থাবায় যে নিষ্ঠুর শক্তির আভাস—এগুলিকে এত সহজে ফুটিয়ে তুলতে যে শৈল্পিক সিদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে, তা অনায়াসলভ্য নয়।

আমি শুধু বললাম, চমৎকার!

পণ্ডিত বললেন, এ আর কী! আমাদের ছেলেবেলায় দেওয়ালে যে সব ছবি থাকত, এখন তার আর কিছুই নেই। সবই প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে।

—নষ্ট হয়ে গেছে? কেন?

—ওসব আঁকতে গেলে আনন্দ চাই। রঙের খরচাও কিছু কিছু আছে। লোকে খেতেই পায় না—

খেতেই পায় না! তা বটে। কথাটা স্পষ্ট হয়ে যায় খড়-ঝরা চালাগুলোর দিকে তাকালে।

রামকুমার এক পা এগিয়ে বললেন, এটাও দেখুন।

কৃষ্ণলীলার ছবি। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন—দধির ভার বয়ে আসছেন মঞ্জুচরণা গোপ-বধূর দল। পদাবলী সাহিত্য প্রাণ পেয়ে উঠছে অতিশয় অন্তরঙ্গ কিছু রেখা আর রঙের সমাবেশে। বৈষ্ণব কবিতার পাণ্ডিত্য-কুটিল সমগ্র টীকাভাষ্যের কুয়াশা সরে গিয়ে কত সহজে তার সমগ্র মর্মকথাটি প্রাণ পেয়ে উঠেছে দারিদ্র্যজীর্ণ উড়িষ্যার এই মাটির দেওয়ালে!

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ।

পণ্ডিত বললেন, এখনো কিছু কিছু আঁকে লোকে এসব। দু-দশ বছর পরে আর আঁকবে না।

না, তা আঁকবে না। এতক্ষণে স্পষ্ট বোঝা গেল—মরে যাচ্ছে উড়িষ্যা। হাজার হাজার বছর ধরে পূর্ব-ভারতে যে শিল্পের স্বর্ণদীপ জ্বেলে রেখেছিল উড়িষ্যা—সেই দীপ নিবে আসছে আজ। নিবে আসছে শহর থেকে অনেক দূরে এই জরাজীর্ণ গ্রামের শ্মশানে—এই উপবাসক্ষীণ ভাঙা ঘরের অন্ধকার কোণায় কোণায়। খণ্ডগিরি-উদয়গিরি-কোনারক-শিশুপালগড়-রাবণগুহার শিল্পীরা এই নগণ্য পাঠশালার ফার্স্ট বুকের পাতা থেকে কণায় কণায় আহরণ করে নিচ্ছে মৃত্যু—তিল তিল বিষপ্রয়োগ করে যেভাবে হত্যা করা হয় বিশ্বাসী অসহায়কে।

আরো সামান্য কিছু এগিয়ে পণ্ডিত বললেন, এই তো আমাদের গ্রাম দেখলেন। এই সামান্য ক'খানা ঘর। আর কিছু নেই।

—কেন, ওই যে একটা দীঘি দেখা যাচ্ছে। মন্দিরের মতো কী একটা আছে ওখানে?—রামকুমার আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন।

—ওটা?—পণ্ডিত বললেন, ভাঙা মন্দির।

—ভাঙাই তো আমরা দেখব। চলুন, ওটা আর বাদ থাকে কেন?

—চলুন—পণ্ডিত হাসলেন: গ্রামই যখন ভাঙা, তখন ওতে আর কী আসে যায়?

ধুলোয় ভরা পথের পাশেই দীঘিটি। বেশ বড়ই ছিল এককালে, এখন একটা দিক একেবারেই মজে গেছে, শনের মতো একজাতের কী যেন বড় বড় ঘাস গজিয়েছে তাতে। বাকিটা অরূপণ পদ্মবন। যতটা জল—তার চাইতে বেশি ঘন-শ্যামল পাতা আর তাদের ভেতরে রাশি রাশি শ্বেতপদ্মের অম্লান গৌরব। উড়িষ্যার কলালক্ষ্মীকে কে কবে এই

দীঘির জলে বিসর্জন দিয়ে গেছে কে জানে—শুধু তার শূন্য পদ্মাসনটি শরতের অশ্রু-শিশিরে বিষণ্ণ হয়ে এইখানে ভেসে বেড়াচ্ছে।

ঘাটলা প্রায় নিশ্চিহ্ন—স্মৃতির অবশেষ পড়ে আছে কয়েকখণ্ড শ্যাওলা-ধরা পাথর। তারই ওপরে ফাটল-ধরা পাথরের মন্দির। দেওয়ালের শঙ্খ-পদ্মলতা, মিথুন-মূর্তি, বীণা-বাহী কিন্নর, লীলাকমলধারিণী রূপসী—ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রায় সমতল হয়ে এসেছে। ভেতরে সিঁদুর-চন্দনচর্চিত জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের তিনটি সংক্ষিপ্ত প্রতীক্।

—এতটুকু মন্দির, তবু কারুকার্য দেখেছেন!—বিমুগ্ধ বিস্ময়ে রামকুমার বললেন।

পণ্ডিত একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—কারিগর এখনো আছে দু-চারজন। ছেনি-হাতুড়ি আর নরম পাথর পেলে এখনো তারা—কিন্তু—পণ্ডিত অভ্যাসমতোই অসমাপ্ত কথাটা ছেড়ে দিলেন : খেতেই পায় না!

খেতেই পায় না! হাঁ, পুরীর সমুদ্রের জলে তারা সে ছেনি-হাতুড়ি কবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। জগন্নাথের মন্দিরের সামনে তারা ভিক্ষের জন্যে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে; তাদের দেখি কলকাতার রৌদ্রে-গলা পীচের পথে ঘর্মাক্ত ক্ষুধিত দেহে ঠেলাগাড়ি ঠেলে চলতে, তাদের দেখি খিদিরপুর ডকে ক্রেন থেকে পিছলে-পড়া একরাশ জমাট রক্তের মৃত্যু-শয্যায়!

আর্টিস্ট পঙ্কজ সেন। ঝাউবনে বসে সমুদ্রের ছবি আঁকছেন। অসাধারণ ল্যাণ্ডস্কেপ! আগামী আর্ট এক্‌জিবিশনে ওয়াটার-কালারে আর একটি বিস্ময়কর নেচার স্টাডি!

কিন্তু—!

পণ্ডিত বললেন, এবার ফিরুন। আপনাদের চায়ের আয়োজন হয়ে গেছে এতক্ষণে।

তা হয়ে গেছে। বড় তাড়া আমাদের—সময় কোথায় উড়িষ্যার এই নগণ্য গ্রামে বসে বসে সময় নষ্ট করবার?

আমরা ফিরলাম।

আর ফেরবার মুখে একবার পেছনে তাকিয়ে দেখলাম : মজে-আসা দীঘির বিষণ্ণ কালো জলে ভাসছে উড়িষ্যার শিল্পসরস্বতীর অশ্রুসিক্ত একটি শূন্য পদ্মাসন!

এগার

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রাজা নরসিংহ দেব যুক্তপাণি হয়ে তাকালেন আকাশের দিকে।

নীলাভ্রের ওপারে দেখা দিচ্ছেন হিরণ্যপাণি। তমসো পরস্তাৎ। অগ্নি-কমলের জবা-কুসুমসঙ্কাশ কুঁড়িটি দল মেলছে একটু একটু করে। 'চতুরুদধিমালা ভুবনভর্তা'র মতো পরম পরাক্রান্ত রাজা গর্জিত সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন স্বর্ণ-সাবিত্রীর কাছে।

শাস্ত্রপারঙ্গম ব্রাহ্মণেরা বিধান দিয়েছেন : সবিতৃসাধনায় রাজা মহাব্যাধি থেকে মুক্ত হবেন। নিখিল বিশ্বের তমসা যিনি হরণ করেন, সেই সর্বধ্বান্ত-নাশন—তাঁর ব্যাধি মোচন করবেন।

দক্ষিণাবর্ত-ব্রহ্মাবর্ত-গুর্জর-গৌড়ের চতুঃসীমায় সীমায় ডঙ্কার ধ্বনি শোনা গেল। দিগ্বিদিকের গিরিমালা থেকে খরস্রোতা নদী বয়ে—সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেলায় ভেলায় এল সুনির্বাচিত শিলাখণ্ড। ছুটে এল রূপদক্ষ শিল্পীর দল। প্রতিটি শিলায় কারুশিল্পের অপরূপ স্বাক্ষর রেখে সুদীর্ঘ সাধনার অবসানে গড়ে উঠল রথাকৃতি সূর্য দেউল। পাষাণে গড়া সপ্ত তুরঙ্গ আশ্চর্য গতির ছন্দ বয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, সারথি অরুণের প্রতিটি পেশী ছন্দোময় হয়ে রইল বল্গা-শাসনের দৃঢ়তায়, শিল্প-শোভন রথচক্র যেন চলতে চলতে অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

তারপরে ইতিহাস।

কবে আরো খানিক প্রাণহীন বালুতট বিস্তীর্ণ করে সমুদ্র দূরে সরে গেল—পর্তুগীজদের কামানের গোলায় ধ্বসে পড়ল মন্দিরের খিলান। বিদায় নিলে পূজারী, কেয়াবন আর বালিয়াড়ি পার হয়ে অদৃশ্য হল সর্বশেষ ভক্তের দল। শুধু নিরবধিকালের আঘাতে আঘাতে বিক্ষত মন্দির আর্ত চোখে তাকিয়ে রইল আদিম সূর্যের প্রভাত-সন্ধ্যা পরিক্রমার চক্রপথে।

কোনারক।

রামকুমার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেমন লাগল ?

একটি মাত্র জবাব ছাড়া আর কিছুই মুখে আসেনি : বীভৎস !

চতুর্বর্গ নিয়েই ভারতবর্ষ তা ঠিক ; কিন্তু তার তৃতীয় বর্গটি নিয়ে যে কী কদর্য মাতামাতি করা যায়, কোনারকের মন্দির না দেখলে তা কল্পনা করা অসম্ভব। সূর্যকে আকৃষ্ট করবার পক্ষে এইটেই কি সব চেয়ে লোভনীয় উপকরণ ? শাস্ত্রমতে কুমারীকন্যার অধীশ্বর দিনপতির অকুমারোচিত লীলার ইঙ্গিত ? অথবা, সমসাময়িক ভারতের নৈতিক মেরুদণ্ডে তখন যে অবক্ষয় বাসা বেঁধেছিল শিল্পের এমন চরম ব্যভিচার তারই নির্বাক সাক্ষী ?

রামকুমার একটা ব্যাখ্যা দিলেন।

—অমনভাবে জিনিসটাকে দেখবেন না। ওর একটা তাত্ত্বিক দিকও থাকতে পারে।

—সেটা কী ?

—আপনাকে তো আগেই সে কথা বলেছিলাম একবার। এসব মূর্তিটুর্তি যা কিছু সবই বাইরে। মন্দিরের ভেতরে দেখুন কিছুই নেই। তা থেকে আমার সিদ্ধান্তেই পৌঁছুনো চলে।

—ভুলে গেছি আপনার সিদ্ধান্ত। মনে করিয়ে দিন।

—কথাটা হল—বলা আরম্ভ করতে গিয়ে রামকুমার একবার থামলেন, ধীরেসুস্থে

সিগারেট ধরালেন, তারপর দেশলাইয়ের কাঠিটাকে দু আঙুলের টোকায় উড়িয়ে দিয়ে আবার শুরু করলেন : যেন বলতে চাইছে—তোমার যা কিছু কাম-কামনা মন্দিরের বাইরে রেখে এসে স্তব্ধ শান্ত মনে দেবতাকে প্রণাম করো।

আমি হেসে ফেললাম।

—ব্যাখ্যাটা মুখরোচক সন্দেহ নেই, কিন্তু মুশকিল এই যে ভাষ্য করবার জন্যে সব সময় আপনাকে কাছে পাওয়া যাবে না। ইতিমধ্যে দর্শকের মনে ঠিক উলটো রকমের একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

রামকুমার কপাল কোঁচকালেন।

—আপনার তাই মনে হয়? কিন্তু একটু ভালো করে দেখুন ব্যাপারটা। মানুষের আদিম বৃত্তিকে সুড়্সুড়ি দিতে গেলে উপকরণের চাইতে ইঙ্গিতটাই বোধ হয় বেশি কার্যকরী। নগ্নতায় গ্রীক আর্টের একটা ক্লাসিক সৌন্দর্য আছে—তাকে কোনো নীতি-বাগীশ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু পোশাক পরিয়েও কত অশ্লীল করে তোলা যায় —আমেরিকান্ ফিল্ম থেকেই তার প্রমাণ পাবেন।

—তারপর?

—সোজা চলে আসুন কোনারকের মন্দিরে। মাত্র দুটো-একটা মূর্তি যদি থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি এদের অশ্লীল বলতে পারতেন। কিন্তু এখানে এরা এমনি অজস্র আর brutally frank যে কিছুক্ষণ পরে আপনি যেমন ক্লান্তি, তেমনি বিতৃষ্ণা বোধ করতে থাকবেন। আমার কী মনে হয় জানেন? মানুষের প্রথম প্রবৃত্তিটি যে কত কুৎসিত এবং হাস্যকর—সেইটেকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যে বীভৎসতার এই বিকট সমারোহ। মানুষকে ভোগ-বিমুখ করবার জন্যেই ভোগের রূপটাকে এমন চরম করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—বুঝতে পারছি। ডাক্তারের কথা না শুনে যে পেটুকের মতো গিলতে চায় তাকে রাশ রাশ অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়ে ডিস্পেপসিয়া সৃষ্টি করা। তারপর বাধ্যতামূলক ভাবেই তার খাওয়া বন্ধ হবে—কী বলেন?

রামকুমার হাসলেন : ঠাট্টা নয়—কথাটা প্রায় ওই রকমই। হয়তো রাজা নরসিংহ দেব নিজের সম্বন্ধেই স্বীকারোক্তি করেছেন এখানে। বলতে চাইছেন, ভোগের এইরকম মত্ততার ভেতরে মজে গিয়েছিলাম বলেই আমার এই দুর্গতি। অতএব, সাধু সাবধান। বাইরে এগুলো যা দেখছ—এরা সব সাক্ষাৎ সর্বনাশের ফাঁদ। সুতরাং এসবের মোহ বিষবৎ পরিত্যাগ করে ধাতস্থ হয়ে ওঠো।

—হয়তো তাই।

তর্ক করতে ইচ্ছে করছিল না বলেই থেমে যেতে চাইলাম। একথা ঠিক—কিছুক্ষণ

মন্দিরের চারপাশে ঘুরে বেড়ালে মন অস্বস্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। আমাদের শিল্প-সভ্যতা-বিজ্ঞান-দর্শন—আমাদের অমরতার সাধনা—আমাদের অতি-মানব হয়ে ওঠবার দুরূহ তপস্যা, সব কিছু সত্ত্বেও আমরা যে কী অসঙ্গত পরিমাণে ইতিহাসপূর্ব আদিম যুগে বাস করছি—এরা যেন সেইটেই বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চায়।

এর উদ্দেশ্য কি মোহমুদ্গর? রামকুমার অবশ্য সেই রকমই একটা যুক্তি দাঁড় করালেন। হতেও পারে। মহাভারতে বিচিত্রবীর্যের ইতিহাসে সে কথা বলা আছে, বলা আছে রঘুবংশের শেষ রাজা অগ্নিবর্ণের উপাখ্যানে। কিন্তু তবুও ঐতিহাসিকের মনে পড়বে পূর্ব-ভারতে মুসলমান আসবার আগে ধর্মে সমাজে সেই অবিশ্বাস্য বিকার—তাম্রশাসনে, শিলা-ফলকে, শিল্পে আর সাহিত্যে তার প্রমাণের অভাব নেই; বৌদ্ধ তন্ত্রবাদের সেই শেষযাম ভারতবর্ষের আত্মার শ্মশানে বামাচারের দুঃস্বপ্ন দিয়ে ছাওয়া।

রামকুমার বললেন, কিন্তু এর উৎকর্ষের দিকটাও দেখুন। পূর্ব ভারতের কোনো মন্দিরেই ভাস্কর্যের এমন সাফল্য আর দেখতে পাবেন না—সারা ভারতবর্ষেও এর জুড়ি আছে কিনা সন্দেহ। সেটা কি আপনার চোখে পড়ছে না?

—তা পড়ছে। সে নিয়ে আমার প্রতিবাদ নেই।

মাথার ওপর বেলা বাড়ছে। হালকা হালকা কয়েক টুকরো মেঘের ভেতরে সূর্য এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল, এইবারে তার এক ঝলক ধারালো রোদ আমাদের ওপর এসে পড়ল। যেন তাঁর মন্দির নিয়ে এই অনধিকার চর্চায় ক্রুদ্ধ কটাক্ষ ফেললেন সবিতৃদেব। সে রোদে বিঘ্নিত-নিদ্রা শ্রান্ত চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল—খিদের অস্তিত্বটাও টের পাওয়া গেল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, সাড়ে বারোটা বাজে।

রামকুমার বললেন, তা হলে চলুন, চট্‌পট্ মিউজিয়ামটা ঘুরে দেখে নিই।

—মিউজিয়াম?

—ওই তো ওপাশে। ছোটখাটো ব্যাপার—আধঘণ্টার মধ্যেই চুকে যাবে। তারপর ডাক-বাংলোয় ফিরে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম। আবার তো সন্ধ্যে নাগাদ গোরুর গাড়িতে চাপতে হবে।

—তাই চলুন।

দু পা এগিয়েছি—মাথার ওপর নিমগাছে কিচ্ কিচ্ করে একটা শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি দাঁত খিঁচোচ্ছে একটি তরুণ হনুমান। অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে মনে হল। হাত তুলে ভয় দেখাতেই দ্বিগুণ উৎসাহে মুখ খিঁচিয়ে একেবারে মগডালে চেপে বসল।

—ওটা কী, চেনেন?—রামকুমার জিজ্ঞাসা করলেন।

—কী আশ্চর্য, হনুমান চিনব না!

—ওটা হনুমান নয়।

—কী তবে ?—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

গম্ভীর মুখে রামকুমার বললেন, খুব সম্ভব রাজা নরসিংহ দেব। এবারে হনুমান জন্ম নিয়েছেন। দাঁত খিঁচিয়ে বলতে চাইছেন, মানুষ হয়ে জন্মেছো তো ? বোঝো ঠ্যালা কাকে বলে—আমার মতো অবস্থা হবে শেষে। মন্দির দেখে আক্কেল নিয়ে ঘরে ফিরে যাও—প্রার্থনা করো যেন মানুষ হয়ে আর ফিরতে না হয়। আমাকেই ছাখো না। হনুমান হয়ে কেমন সুখে আছি—কোনো দুর্ভাবনার বালাই নেই আর।

রসিকতাটা বেয়াড়া। কোনারক মন্দিরের স্রষ্টার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁকে হনুমান বলতে আমার রুচিতে বাধে।

দুপুরে দুজনে দুখানা চেয়ার নিয়ে বসেছি ডাক-বাংলোর বারান্দায়।

মনোরম জায়গাটি। চারদিকে ঝাউবনের ছায়া কোমল স্নিগ্ধতায় আকীর্ণ। মাঝে মাঝে কিং কোকোনাটের গাছ—পুরন্ত রাঙা ডাবের কাঁদির ভারে যেন নুয়ে পড়ছে তারা, ঝুঁটিওলা বুলবুল আর মুনিয়া পাখির দল নেচে ফিরছে ছায়ার তলায়।

দূরে গাঢ় নীল সমুদ্রের রেখা।

কীপারের রান্না খিঁচুড়ি আর ডিমসেদ্ধ খেয়ে আরামে ঝিমুচ্ছিলেন রামকুমার, চোখ মেললেন।

—একটা সিগারেট দিন মশাই।

দিলাম। ধরিয়ে আবার তৃপ্তিতে চোখ বুজলেন। মিনিট তিনেক চুপচাপ কেটে গেল। কয়েকদিন ধরে সমুদ্রের অশ্রান্ত গজরানি শুনতে শুনতে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম—সেই একঘেয়ে একটানা শব্দের শ্রান্তিকর বেষ্টনীর বাইরে এসে যেন মুক্তি পেয়েছি এখানকার ছায়াভরা স্তব্ধতায়, বুলবুল আর মুনিয়ার কলকূজিত তন্দ্রাতুর অবসরে।

রামকুমার আচমকা বললেন, পাওয়া গেছে।

—কী পাওয়া গেছে ?—কথাটা এমন বেখাপ্পা ভাবে কানে এসে লাগল যে আমি চমকে উঠলাম।

—আপনার একটা প্রশ্নের জবাব।

—কী রকম ?

—আপনি জানতে চাইছিলেন দেওয়ালে যারা আজো অমন সুন্দর ছবি আঁকে, দীঘির পাড়ে মন্দিরের গায়ে যাদের হাতের ছাপ, এই কোনারকের মন্দির যাদের তৈরি—তারা এমন করে ফুরিয়ে গেল কেন ?

—কী তার জবাব ?

রামকুমার হাসলেন : কোনারকের মন্দিরে তাদের কীর্তি দেখে তারা নিজেরাই থমকে

গেল। এক মুহূর্তেই কামের ওপর তাদের ধিক্কার লেগে গেল, সংসারকে মনে হল বিশুদ্ধ মরীচিকা; সুতরাং মন্দিরের দোরগোড়াতেই তারা হাতুড়ি-বাটালি ফেলে দিয়ে কৌপীন ধরল, তারপর দল বেঁধে চলে গেল তপস্যা করতে—হরিদ্বারে কিংবা বদ্রীনাথে। কাজে কাজেই নির্বংশ হল তারা। দু-চারজন যারা রইল, তাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য বলেই—

আমি বললাম, ডক্টরেট আপনি আগেই পেয়েছেন তাই এ রিসার্চ আপনার কাজে লাগল না। তবে ফরেন ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়ে দেখতে পারেন।

রামকুমার বললেন, হাঁ বুয়েনোস্ এয়ারেস্ কিংবা ভেনিজুয়েলা ইউনিভার্সিটিতে পাঠাব। একেবারে খাস বাংলা ভাষায় লিখে।

—বাংলা ভাষায় কেন ?

—কেউ পড়তে পারবে না বলে। আরে, ওইটেই তো আর্ট। বিদেশী ডিগ্রি পাবার পক্ষে ওটা একটা মস্ত সিক্রেট। মেক্সিকো ইউনিভার্সিটিতে যদি "পাখী সব করে রব"-কে ব্যাখ্যা করে থীসিস্ দিই—তবে কার সাহস আছে আমাকে ডক্টরেট্ না দিয়ে পারে ? পড়বার তো আর সাধ্য নেই, কাজেই বোঝবার কথাও ওঠে না।

—তা নেহাৎ মন্দ বলেননি! আমি হাসলাম: কিন্তু জবাব হয়তো একটা সত্যিই পাওয়া যায়।

—এবার বলুন তবে আপনার থীসিস্।—রামকুমার চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

—ওই কোনারক মন্দির যাদের প্রতিভার স্বর্গ—সেই সঙ্গে তাদের শ্মশানও বটে।

—যথা ?

—ওই ভাস্কর্যের রুচিই প্রমাণ করে, জাতির নৈতিক জীবনের নাভিশ্বাস ঘনিয়েছে। পুরীর মন্দির সম্বন্ধে যা আপনি বলেছিলেন, তাই। বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে প্রাণের যোগ হারিয়েছে বলেই দেশ এই পাঁকে এসে পাক খাচ্ছে। এর পরে বাইরে থেকে যখন শক্তির বন্যা আসবে, তখন এক মুহূর্তে কুটোর মতো ভেসে যাবে সমস্ত। অনঙ্গ-সংগ্রামে দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার দল মুসলমানের তলোয়ারের মুখে পলকের জন্যও দাঁড়াতে পারবে না। আর হয়েছেও তাই।

রামকুমার এবার হাসলেন না।

আমি বললাম, ওই কোনারকের মন্দিরই প্রমাণ করে—হিন্দু সভ্যতার আর বাঁচবার অধিকার ছিল না। মুসলমান এদেশে হঠাৎ এসে পড়েনি—এসেছিল প্রাকৃতিক নিয়মেই। আমাদের মনের ভেতরেই আমরা তাদের আসবার পথ তৈরি করে দিয়েছিলাম। কী বলেন ?

রামকুমার মাথা নাড়লেন। সেটা সম্মতির বা অসম্মতির বোঝা গেল না। শুধু তাঁর চোখ দুটো দূর সমুদ্রের গাঢ় নীল রেখার ওপর মগ্ন হয়ে রইল।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু-ধূসর নির্জন কোনারকের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। শুধু বহুদূর পর্যন্ত পেছনে ঝাউবনের দীর্ঘশ্বাস শোনা যেতে লাগল—আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম—কালো অন্ধকারে কোনারক ক্রমে চোখের বাইরে হারিয়ে যাচ্ছে।

* * * *

এইখানেই, হঠাৎ আমাকে 'সাগরিকে'র ডায়েরী শেষ করতে হল।

কারণ, সকালে হোটেলে পৌছুতেই হাতে এসে পড়ল কলকাতার টেলিগ্রাম। গৃহিণী জানিয়েছেন অনিবার্য কারণে আমার চলে আসতে হবে—একদিনও দেরি না হয়।

সুতরাং ইরার দুঃখ, সুধীশের মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখ, রামকুমারবাবুর বন্ধুত্ব এবং চাটুয্যে-পরিবারের ট্র্যাজেডি—সব কিছুর ওপর আকস্মিক যবনিকা পড়ল, সব প্রবাস-বাসেই যা পড়ে। উড়িষ্যার সমস্যার চাইতেও অস্পষ্ট টেলিগ্রামটাকে নিয়ে মন নানা দুশ্চিন্তার জাল বুনতে লাগল।

সন্ধ্যার ট্রেনেই ফিরলাম কলকাতায়।

দু বছর পরে সেদিন ইরার চিঠি পেয়েছি হঠাৎ। সে চিঠিতে একটা সুখবর আছে। তার ছেলের অন্নপ্রাশন। আগামী পনেরো তারিখে ল্যান্সডাউন টেরাসে তাদের বাড়িতে আমার আসাই চাই। সেই সঙ্গে পঙ্কজ সেনের পুনশ্চ :—না এলে খুব রাগ করব।

মনটা প্রসন্ন হতে যাচ্ছিল—কিন্তু সুর কেটে যাচ্ছে। সংশয়ে, ভয়ে, তীক্ষ্ণ একটা অস্বস্তিতে।

এই মুহূর্তে আমার সামনে খবরের কাগজ খোলা আছে। তাতে দেখছি : দক্ষিণ ভারতের একটা হোটেলে কলকাতার বিশিষ্ট হার্ডওয়ার মার্চেন্ট চাটুয্যে নিজের রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেছেন।

আত্মহত্যা ?

ঠিক বুঝতে পারছি না। নিজের সংশয় যেন আমার নিজেরই গলা টিপে ধরেছে।

উপনিবেশ

তৃতীয় পর্ব

সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী

বন্ধুবরেষু

সূর্য স্বপ্ন

এক

চর ইস্‌মাইল।

চারশো মাইল দূরে বসিয়া আজ স্বপ্ন দেখিতেছি। ছবির মতো মনের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে একটা অপরিণত তটরেখা—নারিকেল আর সুপারীবনের ঠিক নিচেই যেখানে তেঁতুলিয়ার জল মাথা কুটিয়া মরিতেছে। যেখানে বোম্বেটে পর্তুগীজের শেষ চিহ্নও দিনের পর দিন অবলুপ্ত হইয়া আসিতেছে—জলের তলায় ছয় ফুট উঁচু মানুষগুলির শাদা কঙ্কালের পঞ্জরে জমিতেছে জলজ শৈবাল, মোটা মোটা হাড়ের রন্ধ্রগুলির মধ্যে কুচো চিংড়িরা নিরাপদ বাসা বাঁধিয়াছে। আর করোটির মাঝখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার আস্তানা—নীল রঙের দাড়াগুলি দিয়া যাহারা সন্ধানী বৈজ্ঞানিকের মতো দিগ্বিজয়ী জলদস্যুদের মস্তিষ্কে ছিদ্র করিতেছে। চর ইস্‌মাইলের বর্বর জীবনের উপর দিয়া যেমন করিয়া নামিয়াছে স্তিমিত আর নিরুত্তেজ সভ্যতা—আর যেমন করিয়া চারশো মাইল দূরের নাগরিক শান্তির নিরাপদ পরিবেষ্টনীতে বসিয়া আমি চর ইস্‌মাইলের গল্প লিখিতেছি। আমারই সিগারেটের ধোঁয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিতেছে চক্রাকারে, নানা সম্ভব অসম্ভব মুখ সেই ধোঁয়ায় রেখায়িত হইয়া উঠিতেছে—ডি-সুজা, ডি-সিল্‌ভা, পোস্টমাস্টার—আরো কত কে?

একটা উপমা মনে পড়িতেছে। ছায়াছবির পর্দায় মৃত্যু-তরঙ্গিত রণক্ষেত্রের ছবি দেখিয়া যেন নিশ্চিন্তে রোমাঞ্চিত হইতেছি। কিন্তু ছায়াছবির আলোকে ছাড়া যাহারা বৃহত্তর জীবনের রূপ দেখিতে পায় না, স্বপ্ন ছাড়া তাহাদের আর সান্ত্বনা কোথায়।

*　　　*　　　*

চর ইস্‌মাইলের উপর দিয়া কাটিয়া গেল দশটা বছর।

আদিম সমাজের গলিত লাক্ষাস্তূপের উপরে আরো ঘন হইয়া নামিতেছে সর্বগ্রাসী মৃত্তিকার আবরণ। জল আর মাটি—জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি যাহারা মূলহীন স্রোতের শ্যাওলার মতো ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের শিকড় আরো নিবিড় হইয়া মাটির মধ্যে থিতাইয়া বসিয়াছে। পলিমাটি, মাখনের মতো কোমল আর স্নিগ্ধ মাটি—নদীমাতৃক বাংলাদেশের সকরুণ ভালোবাসার মধু লইতেছে নির্যাস দিনের পর দিন বিদ্রোহীদের জীর্ণ করিয়া। রক্তের ফসল নয়—শস্যক্ষেত্রের সোনার ফসল। বোম্বেটে জাহাজের অভিযানস্বপ্ন নয়—আশু, আমন আর বোরো ধানের স্বপ্ন-কামনা। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মধ্যে অস্পষ্ট রূপ লইয়া যে মানুষগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, বাংলাদেশের একটা পরিপূর্ণ রূপ আজ তাহাদের গ্রাস করিয়া লইতেছে।

দশ বৎসর।

কয়টাই বা পাতা ক্যালেণ্ডারের পাতায়! তবু এর মধ্যে অনেক নতুন তারার আলো আসিয়া পড়িয়াছে দূর আকাশের জ্যোতির্লোক হইতে, বহু সাইক্লোন বহিয়া গেছে পরমাণুর জগতে, আর চিড় খাইয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে বহুদিনের অনড় বনিয়াদ, সমাজ, রাষ্ট্র এবং জীবনের যাহা কিছু অসঙ্গতি—স্তরে স্তরে স্তূপাকারে সঞ্চিত হইয়া তাহারা গলিতেছে। বিস্ফোরণের কোনো ভয়ঙ্কর লগ্ন। মাটির ফাটলে ফাটলে উঁকি মারিতেছে ধরিত্রীর গর্ভ-প্রবাহী ধাতব বহ্নির নীলিম দীপ্তি।

পৃথিবী জুড়িয়া জ্বলিতেছে যুদ্ধের আগুন। আর তাহারই ছোঁয়া লাগিয়া ক্ষুধার আগুন লেলিহ হইয়া শিখা মেলিয়াছে বাংলা দেশে।

দশ বৎসর বয়স বাড়িয়াছে বলরাম ভিষকরত্নের। টাকের আশেপাশে স্বল্লাবশিষ্ট চুলগুলিতে সাদা রঙ্ ধরিয়াছে। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়িয়াছে—চোখের দৃষ্টি আসিয়াছে কিছুটা ক্ষীণ হইয়া। গত বছর শহরে গিয়া বলরাম বাঁ চোখের ছানি কাটাইয়া আসিয়াছেন, চশমাও লইয়াছেন। তবু চোখ দিয়া মধ্যে মধ্যে জল পড়ে, আশংকা হয় দৃষ্টি হয় তো একদিন নিবিয়াই যাইবে চিরকালের মতো। ভাবিয়া বলরামের কান্না পায়। সংসারে আপন বলিতে কেহ নাই, সুদূর ফরিদপুরে আত্মীয়-বান্ধব যাহা আছে, তাহারা দুঃসময়ে আসিয়া পাশে দাঁড়াইবে, আশ্রয় দিবে, এমন ভরসাও নাই বড়। তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য বলরামের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি—কিছু সুযোগ পাইলেই দু হাতে লুটিয়া-পুটিয়া লইবার সাধু-চেষ্টাতে ত্রুটি করিবে না এতটুকু। তাহাদের প্রতি বলরামের কোনো আশা বা বিশ্বাস নাই। কেমন করিয়া যে এই দূর বিদেশে এতগুলি বৎসর তাঁহার কাটিয়া গেল, কখনো কখনো ভারী বিস্ময় লাগে সে সব কথা ভাবিতে। আত্মীয়হীন, বান্ধবহীন। নিজের কবিরাজী, ধান-চাল-সুপারীর ব্যবসা—মহিসের বাথান, নোনা জলের পুকুর। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব দু-চারজন কি একেবারেই মেলে নাই? মিলিয়াছিল বৈকি। খাসমহলের যোগেশবাবু, সেই সরকারীবাবু মণিমোহন, আর সেই খেয়াল-ক্ষ্যাপা পোস্টমাস্টারটা—

পোস্টমাস্টার! মনের মধ্যে চমক লাগিল বলরামের। কী অদ্ভুত লোক—কী আশ্চর্য-ভাবেই যে বলরাম তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন! কালো কুশ্রী চেহারার মানুষটা, জিলজিলে বুকের চামড়ার নিচে হাড়গুলি যেন উজ্জ্বল হইয়া উঁকি মারে, হাতে গলায় একরাশি তাবিজ। হাঁপানির টান উঠিলে মুমূর্ষু কাত্‌লা মাছের মতো হাঁ করিয়া হাঁপাইত লোকটা। আর কত দেশ-বিদেশই না ঘুরিয়াছে। অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলিত—শুনিয়া কখনো ভয়ে ছম্‌ছম করিয়া উঠিত বুকের ভিতরটা। কত ঠাট্টাই যে করিত মুক্তোকে লইয়া!

সেই মুক্তো! আবার একটা চমক খাইলেন বলরাম। সমস্ত চেতনায় অন্তরাল হইতে উদ্গত হইয়া যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল একটা তীব্র গ্লানি আর বেদনার

তরঙ্গ। হাঁ, একদিন বলরাম ঘর বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন—নিজের এলোমেলো, ছত্রিশভাবে ছড়াইয়া পড়া জীবনটাকে স্থির ও নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন এক মুক্তোকে কেন্দ্র করিয়াই। কিন্তু কি ফল হইয়াছিল তার? সেই ঝড়ের রাত্রি—সেই অবাঞ্ছিত সন্তান—দুজনের মাঝখানে ভাঙন ধরিল সেই প্রথম। তারপরের দিনগুলি ভালো করিয়া মনে পড়ে না, দুঃস্বপ্ন এবং অপমানের রাশি রাশি বিষাক্ত অন্ধকারে সেই সব দিনগুলি যেন ঘনীভূত আর ভারমন্থর হইয়া স্মৃতির উপরে চাপিয়া বসিয়া আছে।

বাঁধিবার আগেই ঘর ভাঙিল। কোথায় গিয়াছে মুক্তো? বলরাম জানেন না। নোনা জল নোনা মাটির দেশ, নদী প্রত্যেকদিন নতুন করিয়া পাড় ভাঙিতেছে, নতুন চড়া জাগাইয়া তুলিতেছে দিকে-দিগন্তে। সেই নদীর ভাঙন একদিন মুক্তোকেও ছিনাইয়া লইয়া গেছে, বলরামের বুকে ভাঙা গাড়ির মতোই রাখিয়া গেছে খাঁ-খাঁ করা একটা শূন্যতা। নতুন চড়ার মতো কোথায় গিয়া যে নতুন ঘর বাঁধিয়াছে মুক্তো বলরাম তাহা জানেন না। জানিবার কৌতূহলও তাঁহার নাই, কেবল—

বলরাম জোর করিয়া ভুলিবার চেষ্টা করিলেন প্রসঙ্গটা। বুকের মধ্যে যে ক্ষতচিহ্নটা জাগিয়া আছে, কী লাভ সেটাকে আঘাত করিয়া, নিষ্ঠুরভাবে রক্তাক্ত করিয়া। অন্য-মনস্ক হইবার একান্ত প্রয়াসে দেয়ালের দিকে তাকাইলেন বলরাম। সমস্ত ঘরটার চেহারাই বদলাইয়া গেছে বিস্ময়কর ভাবে। দেওয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটা প্রায় দু বৎসর যাবৎ স্তব্ধ হইয়া আছে—চলে না। কাচের উপর ধূলা জমিয়াছে, মাকড়সারা জাল বাঁধিয়াছে কায়েমী স্বত্বের মতো। দেওয়ালের গায়ে গ্রুপ ফটোগ্রাফখানির একটি মানুষকেও আর চিনিতে পারা যায় না। সেই রঙীন চীনা ছবিগুলি কবে ধূলার সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গেছে—শুধু গুপ্তপ্রেস কোম্পানির একখানি দেওয়াল-পঞ্জী দুলিয়া দুলিয়া চর ইস্‌মাইলের দিন-গুলিকে গণিয়া চলিয়াছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলরাম গড়গড়ার নলটা টানিয়া লইলেন। রাধানাথ ধরিয়া দিয়া গিয়াছে বহুক্ষণ আগেই, বলরামের খেয়াল ছিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনা-আপনি পুড়িতে পুড়িতে তামাকটা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। জোরে জোরে গোটাকয়েক ব্যর্থ টান দিয়া বলরাম নলটাকে বিরক্তভাবে দূরে সরাইয়া দিলেন। সময় পাইলে পৃথিবীর যা কিছু একসঙ্গে চক্রান্ত করিয়া শত্রুতা সাধে নাকি!

আবার রাধানাথ ঘরে ঢুকিল। দশ বছরেও তেমনি আছে লোকটা, উল্লেখযোগ্য ভাবে এমন কিছুই বদলায় নাই। শুধু মাথার চুলগুলি এখানে ওখানে বিশৃঙ্খলভাবে এক একটি শাদা গুচ্ছে পাকিয়া উঠিয়াছে, যেন কেউ একরাশ খড়ির গুঁড়া ছড়াইয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টি তেমনি কৌতুক আর ধূর্ততায় উজ্জ্বল, শুধু চোখ দুইটার নিচে চামড়ায় দুই তিনটা করিয়া ভাঁজ পড়িয়াছে মাত্র।

রাধানাথ আসিয়া কহিল, বাবু ?

—কী খবর ?

—কালুপাড়ার মজঃফর মিঞা দেখা করতে এসেছে।

বলরাম নিজের মধ্যে, বর্তমানের মধ্যে যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিলেন। মনের সামনে হইতে যেন খানিকটা দুঃস্বপ্নের কুয়াশা আকস্মিক ভাবে মিলাইয়া গেল। বলরাম বলিলেন, ডেকে নিয়ে আয় এখানে।

মজঃফর মিঞা একটা লাঠি ভর দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মণিমোহনের সেই মজঃফর, বেহেস্ত্‌নিবাসী আস্রাফ্‌ মিঞার পুত্র। এখন সত্তরের সীমা ডিঙাইয়াছে। মেহেদী-রাঙানো দাড়ির বাহার আর নাই। অবিমিশ্র শুভ্রতা বুক পর্যন্ত নামিয়াছে। আর সোজা হইয়া হাঁটিতে পারে না সে ; চলিতে চলিতে মুখ থুবড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করে, হাত-পাগুলি কাঁপিতে থাকে শিশুর মতো অক্ষম অসহায়তায়। হাতের মধ্যে কম্পিত লাঠিটা, মেজেতে খট্‌ খট্‌ শব্দ হইতেছে, মুখটা নড়িতেছে অনবরত, মনে হয় গালের মধ্যে কী একটা পুরিয়া দিয়া সে প্রাণপণ চেষ্টায় সেটাকে চুষিয়া চলিয়াছে।

বলরাম বলিলেন, বোসো মিঞাসাহেব, বোসো।

লাঠির উপর সমস্ত শরীরের ভর দিয়া, বাঁকা পিঠটাকে অতি কষ্টে সোজা করিয়া অষ্টাবক্র ভঙ্গিতে মজঃফর মিঞা আসন গ্রহণ করিল। বলিল, আদাব। কিন্তু দন্তহীন মুখের ভিতর হইতে শব্দটা স্পষ্ট ফুটিয়া বাহির হইল না—খানিকটা অর্থহীন ধ্বনির রূপ হইল শুধু। অভ্যস্ত কান বলিয়াই বলরাম মজঃফর মিঞার কথাগুলি বুঝিতে পারেন ; সাধারণ লোকের কাছে সেগুলি আত্মপ্রকাশের খানিকটা জৈবিক কাকুতি ছাড়া আর কিছুই নয়—অনেকটা বোবার মর্মান্তিক বো-বো করার মতো !

বলরাম ভালো করিয়া একবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন মজঃফর মিঞার।—প্রথমেই চোখে পড়িল অশোভন আকারের সুদীর্ঘ পায়ের পাতা দুইটার দিকে। বাদুড়ের ডানার মতো কালো কালো কুঞ্চিত চামড়া—ক্ষয় হইয়া আসা নখগুলির আগায় আগায় লাল মাটি শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। গায়ের ময়লা জামাটা হইতে ঘামের একটা দুর্গন্ধ উঠিয়া আসিয়া ঘরটাকে ভরিয়া দিল।

বলরাম বলিলেন, ব্যাপার কী মিঞাসাহেব ?

—ধানের দর তো খুব চড়েছে। এইবেলা সব বিক্রি করে দেব নাকি ?

—কত চড়েছে ?

—পনেরো।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলরাম চিন্তা করিলেন খানিকক্ষণ। এবারের ধানগুলি যেন লক্ষ্মীর হাতের ছোঁয়া বহিয়া আসিয়াছে। দর বাড়িতেছে—অবিশ্রান্ত আর অবিশ্বাস্য ভাবে বাড়িয়া

চলিতেছে। গোলার মহাজনেরা প্রত্যেক দিন নতুন দর দিতেছে, চাহিদার আর বিরাম নাই। বাহিরের পৃথিবীতে কী যে ঘটিতেছে বলরাম তাহা ভালো করিয়া জানেন না, খবরের কাগজ মধ্যে মধ্যে কিসের যে বার্তা লইয়া আসে, তাহাও খুব স্পষ্ট হইয়া ওঠে না তাঁহার কাছে। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার তিনি গ্রাহক, তাহাতে আরও দশটা খবরের সঙ্গে বলরাম জানিতে পারিয়াছেন—পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধিয়াছে। আর এবারে যুদ্ধটা কেবল সুদূর ইংলণ্ড আর জার্মানীতেই সীমাবদ্ধ হইয়া নাই, তাহার তরঙ্গটা ভারতবর্ষের কূল-উপকূলেও আসিয়া ঘা মারিয়াছে। বার্মা নাকি বেদখল হইয়া গিয়াছে—কলিকাতায় বোমা পড়িতেছে। চর ইস্‌মাইলের উপর দিয়াই আজকাল পাখির মতো ডানা মেলিয়া দিয়া সারে সারে বিমান উড়িয়া যায়—গুরুগর্জনে চর ইস্‌মাইলের নারিকেল আর সুপারীর বন চমকাইয়া মর্মরিত হইয়া ওঠে। যুদ্ধ বাধিয়াছে বই কি। তেল পাওয়া যায় না, লবণ পাওয়া যায় না, কাপড়ের জোড়া দুই টাকা হইতে ছয় টাকায় উঠিয়াছে। চারিদিকে কিসের একটা সুনিশ্চিত সংকেত। দূরের নদী দিয়া সৈন্যবাহী স্টিমার চলিয়া যায়—ইহাও বলরামের চোখে পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে অত্যন্ত ভয় করে, যেন অনাগত বিপদের একটা মহাকায় কৃষ্ণচ্ছায়া সমস্ত চর ইস্‌মাইলের উপর দিয়া বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে ধানের দর। অসম্ভব ভাবে বাড়িতেছে—অশুভ ভাবে বাড়িতেছে। বলরামের অচেতন মন হইতে কী একটা যেন সাড়া দিয়া বলে, এ লক্ষণ ভালো নয়; এ যেন মরিবার আগে সান্নিপাতিক জ্বরের রোগীর হঠাৎ ভালো হইয়া ওঠা—নিভিবার পূর্বে প্রদীপের একটা আকস্মিক অগ্নিময় অন্তিম উচ্ছ্বাস।

বলরামের চিন্তাকুল মুখের দিকে চাহিয়া মজঃফর মিঞা প্রশ্ন করিল, কী করা যাবে বাবু?

অভিনিবেশ সহকারে আবার খানিকটা ধূমপান করিয়া লইলেন বলরাম। ভয়টাকে অতিক্রম করিয়া মনের মধ্যে লোভ আসিয়া উঁকি মারিতেছে। যাহা হইবার তাহা পরে হইবে, আপাতত সেজন্য আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছু লাভ নাই। আরো কিছুদিন দেখাই যাক না! ধান উঠিতে না উঠিতেই এই—গোটা বর্ষাকাল তো এখনো সম্মুখেই পড়িয়া আছে। ধৈর্য কিছুটা ধারণ করাই ভালো, ভবিষ্যতে অন্তত ঠকিতে হইবে না।

বলরাম বলিলেন, যাক না আর কদিন?

মজঃফর মিঞা যেন কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইল—বলরামের কথাটা যেন তার ভালো লাগিল না। কম্পিত আঙুলগুলিতে দাড়িটা আঁচড়াইয়া লইল একবার—নখের খড়ি-ওড়া দাগ টানিয়া টানিয়া চুলকাইয়া লইল বাদুড়ের ডানার মতো কালো কালো পা দুখানা। তারপর বলিল, কিন্তু কাজটা বোধ হয় ভালো হচ্ছে না বাবু। যাদের ক্ষেত-খামার আছে তাদের ভাবনা নেই, কিন্তু মুশকিলে পড়েছে জন-মজুর আর ছোট ছোট আধিয়ারেরা। চালের দর

অত বাড়লে ওরা খায় কি? তা ছাড়া শুনলাম জেলেরা নাকি এর মধ্যেই উপোস করতে শুরু করেছে। এমন চললে দেশে যে আকাল দেখা দেবে।

বলরাম উষ্ণ হইয়া কহিলেন, তার আমরা কী করব? আমরা তো দর বাড়াইনি। এখন অল্প দামে যদি গোলা খুলে সব ছেড়ে দিই, তা হলে শেষ নাগাদ নির্ঘাত পস্তাতে হবে এ তোমাকে বলে রাখলাম বড় মিঞা। তা ছাড়া অসুবিধে কি আমাদের নেই? তেল, নুন, চিনি কিছু পাওয়া যায় না—যা মেলে তার দাম পাঁচগুণ। কিছু বেশি পয়সা যদি না পাই, তা হলে কী খেয়ে বাঁচব, বলতে পারো?

—তা ঠিক।—কিছুক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল মজঃফর মিঞা। বলরামের প্রজা সে, তাঁহারই জোত-জমার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং কর্তার ইচ্ছার উপরে কথা কহিয়া লাভ নাই, সে ক্ষেত্রে তাহার নিজের স্বার্থও জড়াইয়া আছে। যা দিন আসিতেছে, কিছুই যে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

আর এই তো, এতখানি বয়স হইল মজঃফর মিঞার। কিন্তু এবারের মতো এমন একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তি সে আর কোনোদিন অনুভব করে নাই। গতবার যে লড়াই লাগিয়াছিল—সেও খুব বেশিদিনের কথা নয়, তাহার বড় নাতির বয়স হইবে—তখনকার কথা তাহার ভালো করিয়াই মনে আছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়াছিল, ধান-চালের দর বাড়িয়াছিল। কিন্তু এবারের মতো এমন একটা অশুভ সম্ভাবনা যেন আসিয়া দেখা দেয় নাই। এবারে কলিকাতায় বোমা পড়িয়াছে, মাথার উপর দিয়া বিমান উড়িয়া যায়, ধরন-ধারণ সব কিছুই আলাদা। কাজেই আগে হইতে হুঁশিয়ার থাকা ভালো—যা পাওয়া যায় দুই হাতে কুড়াইয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ! কী হইবে জেলে আর জন-মজুরের জন্য দুর্ভাবনা করিয়া? যাহার কপালে যাহা আছে তাই ঘটিবে—মাঝ হইতে নিজেরা ফাঁক পড়িলে কোনো লাভ নাই।

মজঃফর মিঞা জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে?

—তা হলে আর কি। যাক আরো কটা দিন!

তবুও মজঃফর মিঞা একটু ইতস্তত: করিতে লাগিল: জমিরকে চেনেন বাবু, জমির?

—কে জমির? কাসেম খাঁর ব্যাটা?

—হ্যাঁ, তার কথাই বলছি। বাঁদির বাচ্ছা বড়ো গোলমাল শুরু করেছে।

—গোলমাল?—বলরাম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কিসের গোলমাল?

—ভয় দেখাচ্ছে! বলছে এখন ধান চাল সব ছেড়ে না দিলে লুটপাট হয়ে যাবে। লোক ক্ষেপে উঠেছে—খেতে না পেলে—

তাকিয়া ছাড়িয়া সোজা উঠিয়া বসিলেন বলরাম: লুটপাট হয়ে যাবে! গায়ের জোরের কথা আর কি! সে সব দিনকাল ছিল দশ বছর আগে, যখন চোত মাস পড়লে আর

নৌকো আসত না এ তল্লাটে। এখন শহরে খবর দিলে দু ঘণ্টার মধ্যে ঠাণ্ডা মেরে যাবে সমস্ত। তুমি যাও বড় মিঞা, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, শেষ পর্যন্ত আমি তো আছিই।

--সেলাম।

লাঠিটায় ভর দিয়া ক্লিষ্ট ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইল মজঃফর মিঞা। তারপর খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আরো কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া দূরে চাহিয়া রহিলেন বলরাম। মজঃফর মিঞার কথা মুছিয়া গেল মন হইতে, মুছিয়া গেল চারদিকে ঘনাইয়া আসা কী একটা অভিশাপের অনিবার্য সংকেত-বাণী। নারিকেলবীথি দুলিতেছে বাতাসে, সুপারীর সারি চামরের মতো মাথা দুলাইতেছে, নিবিড় নীলিমার বুক জুড়িয়া অভিসার চলিয়াছে লক্ষ্যহীন মেঘে—শরতের শুভ্র হংসবলাকার মতো। নিচে নদীর ধূসর বিস্তারটা আবছায়া হইয়া চোখে পড়িতেছে। এই নদী, ঝোড়ো-হাওয়ায় সিংহের মতো গর্জাইয়া ওঠা দুরন্ত নদী! শান্ত হইয়া গিয়াছে—মৃত্যুর মতো ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া নিশ্চুপ মারিয়া পড়িয়া আছে। বছর তিনেক আগে মস্ত বান ডাকিয়াছিল একবার। দৌলত খাঁর বানের পরে এমন ভয়ংকর কাণ্ড আর দেখেন নাই বলরাম। এই চর ইস্‌মাইলেই কমসে কম দুশো মানুষ বেমালুম সাবাড় হইয়া গেল, জেলে-পাড়াটাকে মাটির বুক হইতে একেবারে মুছিয়া নিয়াছিল বলিলেই হয়।

সে কী দুঃস্বপ্ন!

মনে পড়িতেই বলরাম আতঙ্কে চমকাইয়া উঠিলেন। কে ভাবিয়াছিল এমন হঠাৎ ওই রকম একটা মৃত্যুর তরঙ্গ আসিয়া সব কিছু ভাসাইয়া দিবে—নিশ্চিন্ত মানুষের উপর প্রলয়ের মূর্তি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে! মেঘলা ভোরে মানুষগুলি টোকা মাথায় পরিয়া যখন জাল লইয়া নামিল, অথবা এক মাইল নৌকা ভাসাইয়া বিড়ি টানিতে টানিতে দূরের চরে কাজ করিতে গেল, তখন কে জানিত তাহারা আর ফিরিবে না? সেদিন সকাল হইতেই আকাশ মেঘে ঢাকা, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাস বহিতেছে অল্প অল্প। আর মেঘের ছায়ায় নদীর জল মেঘের রঙ মাখিয়াছে। দিনটা এমনি করিয়াই কাটিল! তারপর সন্ধ্যা যেই ঘনাইল অমনি সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির বেগ বাড়িতে লাগিল, বাতাস চঞ্চল হইয়া উঠিল, নদীর জল মাতলামি শুরু করিল। তারপরই পূর্ণ মূর্তি ধরিয়া ভাঙিয়া পড়িল সাইক্লোন। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ—বাতাসের কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া একটা প্রচণ্ড দমকা আসে, চাল উড়াইয়া দেয়, গাছ উপড়াইয়া ছুটিয়া যায় দিগন্তের দিকে। ভয়ার্ত মানুষ কল্পনা করিতে থাকে এইটাই শেষ দমকা, এইবার বুঝি বাতাস মন্দা হইয়া আসিবে। কিন্তু বৃথা আশা—বিলীয়মান গোঁ গোঁ শব্দটা সম্পূর্ণ

মিলাইয়া যাওয়ার আগেই আবার দূরের নারিকেল বন হাহাকার করিয়া ওঠে, মানুষ চোখ বুজিয়া কান চাপিয়া বসিয়া থাকে—আর একটা। তারপরে আর একটা, আরো একটা—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। কত মানুষ যে ঘর চাপা পড়িয়া মরিল, তাহার হিসাব কে রাখে।

কিন্তু দেবতার অনুগ্রহ ওইখানেই থামিলে তবু কথা ছিল। রাত তখন কয়টা হইবে বলরামের খেয়াল নাই, হয়তো দুইটা হয়তো আরো বেশি। লোকে বলে: নদীর দিক হইতে অমানুষিক ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া আকাশটাতে যেন চিড় ফেলিয়া দিয়া গর্জন করিল বরিশাল 'গান'। দক্ষিণের দিগন্তটা একটা বিচিত্র অগ্নিলেখায় মুহূর্তে ঝলকাইয়া উঠিল। তারপর মেঘাচ্ছন্ন আকাশটাতে হাজার হাজার ফেনার শুঁড় ছোঁয়াইয়া হাজার হাজার পাগলা হাতীর মতো ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে 'শরের' জল ছুটিয়া আসিল। কোথায় রহিল নদীর কূল, কোথায় বা রহিল গ্রাম, কালো আকাশের তলায় কালো জল যেন বিশ্ব-সংসারকে একেবারে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল।

উপরে ঝড়—ঘর ভাঙিতেছে, মড় মড় করিয়া গাছ নামিতেছে মাথার উপরে, নিচে বন্যা—দশ হাত প্রমাণ জলোচ্ছ্বাস মানুষকে ভাসাইবার জন্য কল্পনাতীত বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। চর ইস্‌মাইল কিছুটা উঁচু—এদিকের ভদ্রপাড়া পর্যন্ত সে জলটা পৌছিতে পারে নাই। কিন্তু নিচের দিকে বন্যা কোনো কিছুকে এতটুকুও ক্ষমা করিল না। দুদিন পরে যখন জল নামিল, তখন দেখা গেল হাজিয়া-যাওয়া ধানক্ষেতের রাশি রাশি কাদার মধ্যে ঢোলের মতো ফুলিয়া আছে মরা গোরু, মাথাভাঙা সুপারী গাছের আগায় বিকট-গন্ধ গলিত মানুষের দেহ আটকাইয়া আছে। তারপর তিন মাস ধরিয়া চলিল রিলিফ, চলিল কত কী। দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর মধ্যে কতগুলা অমানুষিক দুঃস্বপ্নের দিন কাটাইয়া মানুষ আবার সুস্থ আর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল।

বন্যা নাই, কিন্তু এ আবার কী! এ আবার কোন্ কালযুদ্ধ ঘনাইয়া আসিল! ঝড় নাই, দেবতাদের কোনো নিষ্ঠুর অকৃপা নাই এবারে। বরং অন্যান্য বছর যেমন হয় তেমনিই ক্ষেত ভরিয়া সোনার বরণ ধান ফলিয়াছে। তবু ভয় করে। মনে হয় কিছু একটা ঘটিবে—তেমনি দুর্যোগের মতো—তেমনি ভয়ংকর মৃত্যু-উৎসবের মতো। কিন্তু কী ঘটিবে? বলরাম বুঝিতে পারেন না, কেবল থাকিয়া থাকিয়া সমস্ত চেতনাটা সন্ত্রস্ত আর সংশয়-ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

না, না, ওসব কিছু নয়। কত আশা করিয়া কত স্বপ্ন দিয়া ঘর বাঁধিয়াছে মানুষ। চর ইস্‌মাইলের বর্বর জীবনের উপর নামিয়াছে মন্থর শান্তি—মধুর বিশ্রান্তি! দশ-পনেরো বছর আগে এরা মারামারি করিত, খুনোখুনি করিত—জমি লইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবধি ছিল না। কিন্তু নদী মরিয়াছে, মানুষগুলিও বদলাইয়া গেছে আমূল। এখন দাঙ্গা করিবার

আগে গ্রামের লোকে আদালতে মামলা করিতে ছোটে। আগে প্রতিপক্ষকে ল্যাজা দিয়া ফুঁড়িয়া ফেলিয়া লাশ নদীর জলে ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত হইত, এখন খুনোখুনির আগেই উকিলের পরামর্শ যোগাড় করিয়া আনে। তিন বছর আগে সেই যে ঝড় হইয়া নদী নিঝুম মারিয়াছে, তার পর হইতেই একটা জুতসই 'কাইতান' (কার্তিক মাসের তরঙ্গ-তাণ্ডব) আজ অবধি চোখে পড়িল না। এমন শান্তির রাজ্যে মানুষ সুখে থাকুক স্বস্তিতে থাকুক, আর দুর্বিপাকে কাজ নাই। বলরাম আবার তাকিয়ায় গা এলাইয়া দিলেন।

ডাকিলেন, রাধানাথ?

বাঁ হাত দিয়া মুখটা মুছিতে মুছিতে রাধানাথ অপ্রস্তুতভাবে আসিয়া দেখা দিল। রাঁধিতে রাঁধিতে ঝোলটা চাখিতেছিল সে—ডাক পড়াতে চটপট উঠিয়া আসিয়াছে এবং অনুভব করিয়াছে গোঁফে কিছু ঝোল লাগিয়াছে। হাত দিয়া মুখ মুছিয়া আবার হাতটাকে সে কাপড়ে মুছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, ডাকছিলেন নাকি, বাবু?

—হাঁ, তামাক দে আর একটু। বেরুতে হবে—ওপাড়ার দিকে রোগী দেখবার তাগিদ। আর কী ম্যালেরিয়াই লেগেছে এবারে, দশ বছরে এমন জ্বর তো দেখি নি এখানে। এবারে জ্বরেই দেশ সাবড়ে যাবে দেখছি।

—আজ্ঞে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে? আপনি ভেবে আর কী করবেন?—অযাচিতভাবে খানিকটা ধর্মকথা আর সান্ত্বনাবাক্য শোনাইয়া রাধানাথ তামাক আনিতে গেল।

দুই

ম্যালেরিয়া!

বাস্তবিক এ দুগ্রহ যে কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল একমাত্র ভগবানই বলিতে পারেন সে কথা। এই চর ইস্‌মাইল, সমাজ সভ্যতার বাহিরে এই দুর্গম দেশ—এখানে এসব বালাই তো ছিল না কোনোকালেই। বিদ্রোহী মানুষ। পাশব বন্যতা, বলিষ্ঠ বর্বরতা—প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর মতো যোগ্যতমের উদ্বর্তন। কিন্তু নতুন পৃথিবী আর নতুন মাটি পুরানো হইয়া আসিল—নোনাধরা জমিতে ক্রমে পলিমাটির মিঠা ছোঁয়াচ লাগিয়া শস্যের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। বাহু বাড়াইতে লাগিল সভ্যতা, আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে সেই সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তাহার ব্যাধিগুলিও যেন এখানকার জীবনের বিষ ছড়াইতে লাগিল—ঘুণ ধরাইয়া দিল। নদী মরিয়াছে—নানা কৌশলে সরীসৃপ গতিতে চড়া এড়াইয়া আর বাঁশের সংকেত লক্ষ্য করিয়া স্টিমারকে পথ চলিতে হয়। আজকাল প্রায় বারো মাসই শহর হইতে নৌকা আসে—যোগাযোগ সরল এবং নির্বাধ হইয়া আসিয়াছে। আর সেই সব নৌকাগুলিতে বোঝাই দিয়া নির্বিঘ্ন শান্তি আর সর্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া আসিয়া

এখানে যেন বসিয়াছে কায়েমী হইয়া।

পর্তুগীজদের বংশধর ডি-সিল্‌ভা ঘরের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া ছিল। জ্বরের উপর জ্বর আসিয়াছে আবার! সরকারী ডাক্তারখানার পাঁচ-ছয় শিশি ওষুধ গিলিয়াও কোনো লাভ হয় নাই—দশ-বারো দিন হইতে টানা জ্বর চলিতেছে সমানে।

ছেলে ডি-ক্রুজা ওরফে ক্রুজা ডাক্তারখানায় গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া ঠক্‌ করিয়া শূন্য শিশিটা রাখিল কুলুঙ্গির উপরে। কম্বলের মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া কাঁপা গলায় ডি-সিল্‌ভা বলিল, ওষুধ আনলি নে?

ক্রুজা বিরক্ত গলায় বলিল, না।

—না? না কেন? জ্বরে ভুগে ভুগে মরে যাব নাকি?

—আমি কী করব?

—আমি কী করব! তার মানে?—জ্বরের উপরে ক্রুদ্ধ ডি-সিল্‌ভার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল, উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে এখনি বেয়াদব ছেলেটাকে ঘা-কতক লাথি মারিত। কিন্তু উপায় যখন নাই, তখন কম্বলের তলা হইতেই যথাসাধ্য গর্জন করিয়া বলিল, ওষুধ আনলি নে কেন বদমাস?

—খালি খালি গাল দিয়ো না। ওষুধ নেই।

—নেই?

—না। সব শিশিধোয়া জল। কম্পাউণ্ডার বললে, যুদ্ধ লেগেছে, আর ওষুধ আসবে না। চুপচাপ কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকো এখন। আর যদি শিশিধোয়া জলই খেতে চাও তা হলে কষ্ট করে আর ডাক্তারখানায় যেতে হবে কেন? আমি তিন বালতি নদীর জল এনে দিচ্ছি, বাড়িতে যত শিশি বোতল আছে সব তার মধ্যে চুবোও আর খাও।

ছেলেটা দুর্বিনীত আর দুর্মুখ। বছর ষোল-সতেরো বয়স হইয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে না অর্জন করিয়াছে এমন বিদ্যাই নাই। মা-মরা ছেলে, অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়াই বড় করিয়া তুলিয়াছে ডি-সিল্‌ভা। ফলে যা হইবার তাহাই হইয়াছে—চূড়ান্ত ভাবে বখিয়া গিয়াছে হতভাগা। বাপ যতদিন এম্‌নি পড়িয়া থাকিবে ততদিনই তাহার সুবিধা—সের খানেক ভালো তামাক আছে বাড়িতে—নিশ্চিন্তভাবে সেইটাই সে টানিয়া টানিয়া শেষ করিয়া দিবে।

অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ডি-সিল্‌ভা বলিল, সামনে থেকে দূর হয়ে যা শূয়োরের বাচ্চা।

—নিজেকেই শূয়োর বললে তো?

—হারামজাদা, উল্লুক, গেলি এখান থেকে?

—ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে গালাগালি করলেই কি ওষুধ আসবে নাকি? এদিকে জ্বরে

ভুগছ অথচ গলার জোরে তো কিছু কমতি নেই দেখছি!

শিস্ দিয়া জুজা চলিয়া গেল।

ছেলের উপর রাগ করিয়া লাভ নাই। শরীরটা একটু সারিলে হয়—ধরিয়া কিছু লাগাইয়া দিলেই শায়েস্তা হইয়া যাইবে। দোষ যা অদৃষ্টের। তিন বছর ধরিয়া কী দুর্দিনই যে আসিয়াছে! সেই বন্যা—সেই ভয়ংকর দুর্যোগ। রাশি রাশি মানুষ মরিল—ডি-সিল্‌ভার দশ-দশটা মহিষ বানের জলে ভাসিয়া গেল। তারপর হইতেই এই চলিতেছে। দুই বছরে তবুও মানুষ যদিবা কিছুটা সামলাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু আবার যুদ্ধ বাধিল, জিনিসপত্রের দাম চড়িল পাঁচগুণ। সর্বোপরি বিষফোড়ার মতো দেখা দিল ম্যালেরিয়া। মানুষ দাঁড়াইবে কোন্‌খানে?

কী হইবে একমাত্র মাদার মেরীই বলিতে পারেন সে কথা। কী অপরাধ করিয়াছে পৃথিবীর মানুষ—তিনিই জানেন, কিন্তু মনে হইতেছে কাহারো আর বাঁচিয়া থাকিবার উপায় থাকিবে না কিছুদিন পরে। দিনের পর দিন অবস্থা দুঃসহ হইতে দুঃসহতর হইয়া উঠিতেছে—ভবিষ্যৎটা অমাবস্যা রাত্রির মতো অন্ধকার।

অসহায় ভাবে হাত্‌ড়াইয়া হাত্‌ড়াইয়া ডি-সিল্‌ভা গলায় কালো কারে বাঁধা ক্রশটা চাপিয়া ধরিল। মাদার অব্ মার্সি! সন্তানদের এ বিপদ হইতে উদ্ধার করো।

চিৎ হইয়া ডি-সিল্‌ভা উপরের চালটার দিকে চাহিল। টিনের এখানে ওখানে বড় বড় ছিদ্র দেখা দিয়াছে, তাহারই ভিতর দিয়া সূর্যালোক যেন এক একটা সোনার টুকরার মতো ঘরের মেঝেয় আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। রোদের আলোয় চালের এখানে ওখানে সিল্কের মতো উজ্জ্বল হইয়া চিক্‌চিক্ করিতেছে মাকড়শার জাল। বর্ষা নামিলেই ওখানকার রন্ধ্রপথগুলি দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িবে। সারাইবার উপায় নাই। করোগেটেড্ টিন পাওয়াই যায় না, যাও বা পাওয়া যায় তাহার দাম এম্‌নি আগুন যে ঘর সারাইতে গেলে ঘর-বাড়ি নীলামে চড়াইতে হয়। সব টিন যুদ্ধ করিতে গিয়াছে। অতএব যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত চালটা সারানোর কথা কল্পনাই করা চলে না—অবশ্য ততদিন বাঁচিয়া থাকিলে তবেই।

আচ্ছা: একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ডি-সিল্‌ভা ভাবিতে লাগিল: টিন দিয়া কী হয় যুদ্ধে? বন্দুক, কামান, না তরোয়াল? টিনের তরোয়াল দিয়া মানুষের কি গলা কাটিয়া ফেলা যায়? মাথার উপর দিয়া যে-সব এরোপ্লেন উড়িয়া যায় ওগুলি কিসের তৈরি? কে জানে?

পায়ের দিক হইতে বরফের মতোই একটা শীতলতা সমস্ত শরীরের মধ্যে শির্‌শির্ করিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে। হৃৎপিণ্ডটাতে সজোরে কাঁপুনি জাগাইয়া সেই ঠাণ্ডাটা গলায় আসিয়া পৌঁছিল। দাঁতে দাঁত বাজিতেছে ঠক্‌ঠক্ করিয়া। জ্বরটা একটু কমিয়াছিল

—আবার বাড়িল। একটা অসহায় নিশ্বাস ফেলিয়া কম্বলের মধ্যে আত্মগোপন করিল ডি-সিল্‌ভা। সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপাইতে কাঁপাইতে ম্যালেরিয়ার তরঙ্গ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল—ডি-সিল্‌ভা মূর্ছিতের মতো পড়িয়া রহিল।

চোখের সামনে এলোমেলো ছায়ার মতো কী কতগুলা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে সে। কোথায় যেন ভয়ংকর যুদ্ধ চলিতেছে একটা। কিন্তু এটা কেমন যুদ্ধ? ভারী বিস্ময় লাগিল ডি-সিল্‌ভার। কামান, বন্দুক, এরোপ্লেন কিছু নয়—খালি ঝনঝন করিয়া শব্দ হইতেছে। চোখ মেলিয়া সে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল, কতকগুলো করোগেটেড্ টিন। হাত পা কিছু নাই—কিন্তু কী যেন একটা মন্ত্র-বলে তাহারা সবাই অদ্ভুতভাবে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রখর রৌদ্রে টিনগুলি জ্বলিতেছে, তাহাদের দিকে তাকাইতে গেলে চোখে ধাঁধা লাগে। একটা টিন আর একটার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—যেটা পড়িল সেটা আবার লাফ মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে—ধুলায় যেন দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দড়াম করিয়া বিকট শব্দে কি একটা ফাটিয়া গেল—বুকের মধ্যে চমক দিয়া উঠিল ডি-সিল্‌ভার। হাওয়ায় পাখা মেলিয়া ওগুলি কী উড়িতেছে? একটা নয়, দুইটা নয়, একশো, দুশো, হাজার। কুইনাইনের পিল নাকি? হ্যাঁ—আশ্চর্য ব্যাপার, কুইনাইনের পিলই তো বটে!

বিকারের ঘোরে ডি-সিল্‌ভা খেয়াল দেখিতে লাগিল।

*   *   *

কিন্তু কুঞ্জাকে সে যতটা অকৃতজ্ঞ আর পিতৃভক্তিহীন ভাবিয়াছিল আসলে সে তাহা নয়। মুখে যাহাই বলুক, কুঞ্জা বাপকে ভালোবাসে। পথে বাহির হইতেই বলরামের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছে এবং বাপকে দেখাইবার জন্য টানিয়া লইয়া আসিয়াছে তাঁহাকে।

বলরাম ডি-সিল্‌ভার বিছানার পাশে আসিয়া বসিলেন। নাড়ী দেখিলেন অনেকক্ষণ। ময়লা গেঞ্জির উপরে কাঠের একটা স্টেথিস্কোপ লাগাইয়া হৃৎস্পন্দনটা পরীক্ষা করিলেন। কবিরাজী করিলেও কিছু কিছু আধুনিকতা বলরামের আছে। তারপরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, জ্বর ছাড়ে?

কুঞ্জা খানিকটা ভাবিয়া লইয়া বলিল, বোধ হয় না।

—বোধ হয় না? বেশ ছেলে যা হোক। বাপের জ্বর ছাড়ে কি না সে খবরটাও নিতে পারো নি?

লজ্জিত হইয়া কুঞ্জা মাথা নিচু করিয়া রহিল।

—কি খাচ্ছে?

—মুরগীর ঝোল।

—সর্বনাশ!—বলরাম শিহরিয়া উঠিলেন: এত জ্বরের ওপর মুরগীর ঝোল খাচ্ছে!

মরে যাবে যে! কেন, সাবু খাওয়াতে পারো না?

—কোথায় পাওয়া যাবে?

কোথায় পাওয়া যাইবে? সে কথা ঠিক। কিছুই তো পাওয়া যায় না। আরো বিশেষ করিয়া সাবু। এ বস্তুটাও যে সময়বিশেষে সোনার দানা হইয়া উঠিতে পারে, এমন কথা কি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল কেউ? মহাজন আর দোকানদারেরা তো স্রেফ হাত গুটাইয়া বসিয়াছে। চাউলের দাম বাড়িয়াছে—চিনি পাওয়া যায় না, কেরোসিন মেলে না, ডাল বাজারে নাই। জীবনধারণের সমস্ত জিনিসগুলিই যখন দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেছে, তখন সাবুদানার জন্য দুশ্চিন্তা করিবার মতো মাথাব্যথা কাহারো নাই।

কিন্তু অত কথা ভাবিতে গেলে তো আর ডাক্তার কবিরাজের চলে না। পৃথিবীর উপরে চটিতে গিয়া বলরাম কুজার উপরেই চটিয়া উঠিলেন।

—যোগাড় করো যেখান থেকে হোক। এত বড় ছেলে হয়েছ, এতটুকু করতে পারো না বাপের জন্যে।

একটা বিষণ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া কুজা বলিল, আচ্ছা।

—আর ওষুধ—একটা পাঁচন দেব—তৈরি করে রাখব দুপুরবেলা। আর মুরগীর ঝোলটোল খাইয়ো না, তা হলে কিন্তু বাপের চোখ উল্‌টে যাবে। মনে থাকে যেন।

বিবর্ণ মুখে কুজা আবাব বলিল, আচ্ছা।

বলরাম উঠিয়া পড়িলেন। মস্ত বড় একটা কাজ আছে হাতে—দেরি করিলে চলিবে না। কাল এখানে সস্ত্রীক আসিয়াছেন শহরের সার্কেল অফিসার। ডাকবাংলোতে বাসা বাঁধিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীর শরীরটা নাকি একটু খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাঁহাকে একবার দেখিয়া আসিবার জন্য তিনি লোক পাঠাইয়া বলরামকে খবর দিয়াছেন। মনে মনে গর্বিত বোধ করিয়াছেন বলরাম। তাঁহার কদর বাড়িয়াছে এখন, সাহেব-সুবোরা এখানে আসিলেও তাঁহার ডাক পড়ে আজকাল। আর না পড়িয়াও উপায় নাই। সরকারী ডাক্তারখানা বছর দুই আগে একটা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেখানকার নতুন গোঁফ-ওঠা ছোকরা ডাক্তারকে লোকে বড় আমল দিতে চায় না—তাঁহার প্রবীণ অভিজ্ঞতাকেই বিশ্বাস করে বেশি।

নদীর ধার দিয়া বলরাম হাঁটিয়া চলিলেন। একটু দূরেই সার্কেল অফিসারের সাদা বোটখানা বাঁধা। শান্ত আকাশে গাংচিল উড়িতেছে—মাছরাঙারা ঝপাং ঝপাং করিয়া ছোঁ মারিতেছে জলে। পর্তুগীজদের বিলুপ্ত গীর্জাটার ওখানে খাড়া পাড়ির চূর্ণ-বিচূর্ণ বুকের মধ্যে নারিকেলের শিকড় নিরবলম্ব হইয়া দুলিতেছে। ইলিশ মাছের নৌকা দূরে দূরে ভাসিতেছে মন্থর গতিতে—বেড়াজালের কালো কালো খুঁটিগুলি জলের বুকে অনেকটা জুড়িয়া কতগুলা মানুষের মাথার মতো বৃত্তাকারে ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচিতেছে।

এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে বলরাম সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন : কী দ্রুতবেগেই না বড় হইতেছে চর ইস্‌মাইল। একটা ছোট ইস্কুল হইয়াছে, হইয়াছে সরকারী ডাক্তারখানা, ডাকবাংলো। ছোট একটি বাজার গড়িয়া উঠিয়াছে, মানুষ যে কত বাড়িয়াছে তাহার আর সীমা সংখ্যাই নাই।

অথচ!

এই তো সেদিনের কথা। সমুদ্রের মত নদী। শহর হইতে যাহারা আসিত, আসিত হাতে প্রাণ লইয়া। যে কয়জন মানুষ ছিল, মুখচেনা ছিল তাহাদের সকলের, ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশির ভাগের সঙ্গেই। আর আজ!

এই চর ইস্‌মাইল যেন শহর হইয়া উঠিতেছে।

নদীর তীর ছাড়াইয়া আর একটু আগাইতেই লাল ইটের তৈরি সরকারী ডাকবাংলো। একটা উঁচু টিলার উপরে চমৎকার সুন্দর বাড়িটা—বহুদূর হইতেই চোখে পড়ে। বছর দুই আগে মাত্র তৈরি হইয়াছে বাড়িটা—এখনো নতুন। দ্বিধা-কম্পিত পায়ে বলরাম আগাইতে লাগিলেন।

বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসিয়া সাহেব খবরের কাগজ পড়িতেছেন। কাগজের বিপুল ব্যাসের অন্তরালে মুখটা ঢাকা। খাকী প্যান্টের নিচে দুখানা কালো কালো পা দেখা গেল—যাক, বদমেজাজী গোরাচাঁদ নয় তাহা হইলে। খানিকটা নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন বলরাম।

ডাকিলেন, হুজুর?

সাহেব মুখের উপর হইতে খবরের কাগজ সরাইয়া হাসিলেন। নমস্কার করিয়া কহিলেন, আসুন, আসুন, কবিরাজমশাই। চিনতে পারলেন?

বলরাম হকচকিয়া গেলেন। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিলেন, কই আমি তো—

—কী আশ্চর্য, ভুলে গেলেন এরই মধ্যে! হাকিম প্রাণখোলা ভাবে হাসিয়া উঠিলেন : আপনার চেহারা তো প্রায় একই রকম আছে, আমি দেখেই চিনেছি। কিন্তু আমি কি এর মধ্যে এতই বদলে গেলাম নাকি! সেই খাসমহল কাছারির তশীলদার মণিমোহন বাঁড়ুয্যেকে ভুলে গেলেন! আমিই মণিমোহন।

—তাই তো, তাই তো। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বলরাম চাহিয়াই রহিলেন।

তিন

বিস্ময়ের ভাবটা কিছু পরিমাণে কাটিলে আত্মস্থ হইয়া বলরাম বসিলেন। খাসমহল কাছারির সেই তরুণ তহশীলদার মণিমোহনই বটে। এতটা আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

জীবনটা ঘুরিয়া চলিয়াছে চক্রবৎ গতিতে—মণিমোহনেরও পদোন্নতি হইয়াছে। বলরামের মনটা অকস্মাৎ অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল। আহা, উন্নতি হোক, সব দিক দিয়াই উন্নতি হোক। বড় ভালো ছেলেটি। সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে একটা অবচেতন গর্বের অনুভূতি আসিয়া তাঁহাকে দোলা দিয়া গেল। মণিমোহন—সাধারণের চোখে আজ সে হাকিম, অসংখ্য লোকের দণ্ডমুণ্ডের সে বিধাতা। কিন্তু বলরামের কাছে দশ বছর আগেকার সেই ছেলেমানুষ সরকারী বাবুটি ঠিক তেমনিই রহিয়া গিয়াছে—এতটুকু ইতর-বিশেষ হয় নাই, একবিন্দু রূপান্তর ঘটে নাই। কেশীকংসজয়ী সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধেও কি যশোদা এমনি করিয়াই ভাবিতেন?

প্রশান্ত উজ্জ্বল চোখে বলরাম মণিমোহনের দিকে নির্নিমেষ ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

—কবিরাজমশাই, একটু চা খাবেন নাকি?

বলরাম ভাবিতে লাগিলেন—হাঁ, বয়স একটু বাড়িয়াছে বইকি মণিমোহনের। গলার আওয়াজটা বেশ গভীর আর গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে—জাঁদরেল একটা হাকিম হইতে গেলে যা দরকার হয়। গায়ের রঙ আরো একটু কালো হইয়াছে—লাবণ্য শুকাইয়া গিয়া যেন একটা রুক্ষ বাস্তবতার ছাপ পড়িয়াছে সর্বাঙ্গে; চোখের দৃষ্টিতে আজ যেন খানিকটা দাম্ভিকতা আর আলস্যের স্তিমিত ছায়া; অথচ সেদিন এই চোখ দুটি মধ্যে মধ্যে যেন স্বপ্নের ঘোরে পিছাইয়া পড়িত, শাণিত বুদ্ধিতে চিকচিক করিত। হাঁ, বয়স নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে মণিমোহনের। একটা দশাসই দস্তুরমাফিক হাকিম হইতে গেলে যা দরকার সবই।

—কবিরাজমশাই, একটু চা দিতে বলি?

কবিরাজ ভাবনার অতলতা হইতে ভাসিয়া উঠিলেন। গর্বে গৌরবে মনটা ভরিয়া উঠিতেছে। বড় ভালো ছেলে মণিমোহন, নহিলে এতদিন পরে, এতটা বড় হইয়াও তাঁহাকে কেমন মনে রাখিয়াছে! আদর অভ্যর্থনা করিতে এতটুকু ত্রুটি নাই কোথাও। বলিলেন, চা? না, চা তো বিশেষ—

—খান না এক পেয়ালা। চায়ের মতো কী আর জিনিস আছে? গ্রীষ্মকালের শীতল পানীয়, আর শীতের দিনে গরম পানীয়—বিজ্ঞাপনে পড়েন নি? আপনার মৃত-সঞ্জীবনী সুরার চাইতে অনেক বেশি ফলদায়ক, কী বলেন?

—যা বলেছেন।

ভারী খুশি হইয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন। মাথার তৈল-মসৃণ সুডোল ইন্দ্রলুপ্তটির উপরে রোদের একটি ফালি পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল; বলরাম যদি গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী হইতেন, তাহা হইলে শিষ্য-সামন্তেরা অনায়াসেই মনে করিতে পারিত যে একটা অশরীরী জ্যোতির্ময়তা বলরামের মাথা হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে বাহিরে।

—ওরে, দু পেয়ালা চা দিয়ে যাস্ এখানে—হাঁকিয়া চাকরকে বলিয়া দিল মণিমোহন।

সত্যিই হুকুম করিবার মতো গলার আওয়াজটা বটে। পদমর্যাদার চাপে যথোচিত ভারিক্কী আর গুরুতার যে হইয়া উঠিয়াছে, এ সম্বন্ধে এতটুকু সংশয় পোষণ করিবার কারণ নাই কোনোদিক হইতে। সেদিনের তরলোজ্জল কণ্ঠস্বর দশ বছর আগেকার খরস্রোতে তেঁতুলিয়ার জলপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই কালের দিগন্তে ভাসিয়া গেছে। তা যাক, সবই তো যায়, কিছুই কাহারো জন্তে অপেক্ষা করিয়া পড়িয়া থাকে না। কত লোকই তো এমন করিয়া চলিয়া গেল। সেই ডি-সুজা—বাঘের মতো দুঃসাহসী মানুষটা, সেই হরিদাস—যাযাবর আপনভোলা একটা বিশৃঙ্খল মানুষ, সেই জোহান—বর্মীয়া যাহার গলা কাটিয়া নদীর ধারে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল; সেই লিসি—যাহার শোকে পাগল হইয়া গিয়াছিল ডি-সুজা; সেই মুক্তো—

নামটা মনে করিতেই বলরাম আবার চমকিয়া উঠিলেন, মুখের উপর বেদনার কতগুলি রেখা বিকীর্ণ হইয়া গেল নিজের অজ্ঞাতেই। দশ বছর সময়টা কি এতই দীর্ঘ দূরান্তব্যাপী? যদি তাহাই হয়, তবে এতদিনে কেন সেই দুঃস্বপ্নটাকে তিনি ভুলিতে পারিলেন না? কেন এখনো মুক্তোর কথাটা বুকের মধ্যে আঘাত করিয়া করিয়া তাঁহাকে এমন ভাবে আক্রান্ত করিয়া দেয়?

—তারপরে কবিরাজমশাই, দেশের খবর কী আপনাদের?

কবিরাজ আপাদমস্তক শিহরিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মণিমোহন মুক্তোর কথাটা ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে নাকি? কিন্তু মুক্তোর সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু একটা সে তো জানিত বলিয়া মনে পড়ে না। তবু অপরাধী মনে আশংকাটা সব সময়ে উদ্যত হইয়া আছে—ব্যথার জায়গাটাতে পাছে ঘা লাগিয়া বসে, সেই জন্ত সদাসর্বদা সেটাকে দুহাতে আগলাইয়া রাখিতে চান বলরাম।—অ্যাঁ, খবর? কী খবর জিজ্ঞেস করছিলেন?

মণিমোহন খবরের কাগজটা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে প্রশ্ন করিয়াছিল—কিছু একটা জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়াই। তাই বলরামের এই চমকটা তাহার চোখে পড়িল না। একটা কোণে দৃষ্টি রাখিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল, এই দেশের গাঁয়ের।

—ওঃ। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন বলরাম: দেশের খবর তো নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। ধান-চালের বাজার বড় খারাপ। তা ছাড়া ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া এসেছে এবারে। দশ বছর আগে তো লোকে এসব বালাইয়ের কথা ভাবতেই পারে নি। হালে দু-চারটে করে জ্বরে ধরেছিল বটে, কিন্তু এবারে একেবারে মড়কের মতো জাঁকিয়ে বসেছে।

—লোক মরছে নাকি?

—মরেছেই তো দু-দশটা। এক জেলেপাড়াতেই তিন-চারটে সাবড়ে গেল কদিনের মধ্যে।

—হুঁ; কুইনাইন আসছে না।—গম্ভীর মুখে কাগজটা ভাঁজ করিয়া পাশের টিপয়টার

উপর নামাইয়া রাখিল মণিমোহন : ওষুধ-বিষুধের চালান সব বন্ধ। যা যুদ্ধ লেগেছে।

—যা বলেছেন, যুদ্ধ !—আগ্রহে বলরামের চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইতে কৌতূহলী মনের খোরাকটা পুরোপুরি মিটিতে চায় না—লোভ বাড়াইয়া দেয়। সাগ্রহে বলরাম বলিলেন : এই যুদ্ধই যত গণ্ডগোল পাকিয়েছে। আচ্ছা, যুদ্ধের ব্যাপারটা কী, বলুন তো ? জার্মানী এবার লড়াই জিতে নেবে, তাই নয় ?

—কী বললেন, জার্মানী লড়াই জিতে নেবে ?—মণিমোহন হাসিয়া বলরামের দিকে তাকাইল : খবরদার, ওসব কথা আর ভুলেও মুখ দিয়ে বের করবেন না কোনোদিন। যুদ্ধের সময়, কোন্ দিকে যে কার কান খাড়া হয়ে আছে ঠিক নেই। গভর্ণমেণ্ট এসব কথা জানতে পারলে আপনাকে ডিফেন্স্ অফ ইণ্ডিয়া আইনে ধরে নিয়ে যাবে।

—সর্বনাশ ! সভয়ে বলরাম বলিলেন, না, না, ওসব কথা আমি বলতে যাব কেন ? কী দরকারটা পড়েছে আমার ? ওই ওরা সব আলোচনা করছিল—

—ওরা কারা ?

মণিমোহন অনেকটা যেন ধম্‌কাইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি কঠোর হইয়া আসিল খানিকটা। বলরাম আবার অনুভব করিলেন মণিমোহন এখন অনেকটা বদলাইয়া গেছে, আজ অনেকটা দূরত্ব রাখিয়া এবং অনেকখানি সতর্ক হইয়াই কথা বলিতে হইবে তাহার সঙ্গে। গর্ব ও আনন্দের যে তরঙ্গটা একটু আগেই মনের মধ্যে উচ্ছলাইয়া উঠিতেছিল, মুহূর্তে সেটা স্তিমিত সংকোচে শান্ত হইয়া আসিল।

জ্যোতির্ময় টাকটা একটুখানি চুলকাইয়া লইয়া বলরাম কহিলেন, এই খাসমহলের যোগেশবাবু, হালদার মিঞা, গালু বিশ্বাস—

—নিষেধ করে দেবেন, সবাইকে নিষেধ করে দেবেন। সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে, তাই না ? শুধু জেনে রাখবেন আমরা জিতছি, আমরা জিতবই। বেশি কৌতূহল ভালো নয়, সময়বিশেষে সেটা দস্তুরমতো মারাত্মকও হয়ে উঠতে পারে—জানেন তো ?

মণিমোহন আবার বলরামের দিকে চাহিয়া হাসিল। কিন্তু এবারে তাহার হাসিটা আর তেমন করিয়া বলরামের ভালো লাগিল না। কোথায় কী একটা যেন খচ্‌খচ্ করিয়া বিঁধিতেছে, একটা অকারণ বেদনার বোঝায় সমস্ত মনটা ভারী হইয়া রহিল।

—যা বলেছেন।

বলরামের তরফ হইতে হাসিবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিতেছে সমস্ত মনটা। যে দিনগুলি যায় তাহারা আর ফিরিয়া আসে না নতুন করিয়া। কাল বদলায়, পৃথিবী বদলায় ; চর পড়িয়া তেঁতুলিয়ার উদ্দাম কল্লোল স্রোত মন্থর হইয়া আসে। সেদিনের সেই তরুণ শান্ত মণিমোহন আজ রাশভারী একটা হাকিম হইয়া ফিরিয়াছে চর ইস্‌মাইলে।

চা আসিল।

মণিমোহন একটা পেয়ালা আগাইয়া দিয়া কহিল, খান কবিরাজমশাই।

সোনালি ফুল-কাটা পেয়ালাটায় সোনালি রঙের চা কবিরাজ মুখের সামনে তুলিয়া লইলেন। অত্যন্ত গরম। খানিকটা চা ডিসে ঢালিয়া বলরাম একমনে চুমুক দিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন শুধু এই জন্যেই তিনি এখানে আসিয়াছেন—হাকিমের সঙ্গে বসিয়া এক পেয়ালা চা খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যই তাঁহার নাই। সোনালি পেয়ালার সোনালি চা-টা বেশ ভালো লাগিতেছে, ঘরের মধ্যে জমিয়া থাকা অস্বস্তিকর বোঝাটা যেন সরিয়া যাইতেছে একটু একটু করিয়া।

মণিমোহন বলিল, হাঁ, যে জন্যে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমার স্ত্রীর ভারী সখ, এই সব নদীনালার দেশে একটু বেড়িয়ে যাবেন। তাই তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু কী বিভ্রাট দেখুন, পথে আসতে আসতেই ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধিয়েছেন। আপনি একটু দেখে যান তাঁকে। ডাক্তারখানায় খবর পাঠিয়েছিলাম, ওষুধ-বিষুধ কিছু নেই সেখানে। মহা মুশকিলেই পড়া গেছে। আপনার কথা শুনে তো আরো বেশি ভয় ধরে গেল। আপনি একটু দেখুন দিকি।

—বেশ তো—চায়ের ডিসে শেষ চুমুক দিয়া বলরাম বলিলেন, বেশ তো।

চাকরটা সামনেই দাঁড়াইয়া ছিল। মণিমোহন বলিলেন, মেমসাহেবকে তৈরি হতে বল, কবিরাজমশাই তাঁকে দেখতে যাচ্ছেন ভেতরে।

মেমসাহেব! আর একটা অপরিচিত শব্দ বলরামের কানে আঘাত করিল। চাকরটা চলিয়া গেল খবর দিতে।

বলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্বরটা বেশি নাকি?

—না, তেমন বেশি নয়। তবে যা দিনকাল—বোঝেন তো।

—তা তো বটেই।

চাকর আসিয়া জানাইল মেমসাহেব তৈরি হইয়াই আছেন, কবিরাজমশাই স্বচ্ছন্দে ভেতরে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতে পারেন। মণিমোহন কহিল, চলুন। সংশয়গ্রস্ত পা দুইটাকে টানিয়া বলরাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘরের মধ্যে একখানা ডেক-চেয়ারে গলা পর্যন্ত শাল টানিয়া দিয়া মেমসাহেব চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হইবে, শ্যামবর্ণ সুশ্রী মুখখানি দেখিলে তাঁহাকে কিছুতেই হাকিমের গৃহিণী বলিয়া কল্পনা করা চলে না, অথবা মেমসাহেব বলিয়া ডাকিতেই ইচ্ছা হয় না। অসুস্থতার ছোঁয়াচ আসিয়া মুখের উপর বিষণ্ণ ক্লান্তির পাণ্ডুর একটা ছায়া পড়িয়াছে। ডেক-চেয়ারের হাতলের উপরে উঠিয়া বছর চারেকের একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর ছেলে বসিয়া আছে; অত্যন্ত গম্ভীর মুখ—যেন মায়ের অসুখ দেখিয়া নিতান্ত

দুর্ভাবনায় পড়িয়াছে এবং এ অবস্থায় কী যে করিবে স্থির করিতে না পারিয়া আমসত্বর টুকরোর মতো কী একটা কালো জিনিস দুই হাতে প্রাণপণে চাটিতেছে, কনুই পর্যন্ত আঠা আর লালা জমিয়াছে।

—আমার স্ত্রী। আর ইনি আমার পুরোনো বন্ধু—এখানকার কবিরাজমশাই।

মেমসাহেব দু হাত তুলিয়া কবিরাজকে নমস্কার জানাইলেন। চেয়ারের হাতলে বসিয়া থাকা ছেলেটি কী ভাবিল কে জানে, সেও মা'র সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করিল। খাদ্যের টুকরাটা হাত হইতে পড়িয়া গেল মেঝের উপরে।

—দ্যাখো, দ্যাখো, কাণ্ড দ্যাখো ছেলের! কী রকম অসভ্য একটা চাষার মতো চকোলেট খেয়েছে। রাগ করিতে গিয়া মণিমোহন হাসিয়া ফেলিল।—ওরে পিয়ারী, বাইরে নিয়ে গিয়ে ঝিণ্টুর হাতমুখ ভালো করে ধুইয়ে দে তো।

মেমসাহেব মৃদু সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন, ওর কাণ্ডই তো এই।

চাকর আসিয়া ঝিণ্টুকে কোলে তুলিয়া লইয়া গেল। একটা তীব্র প্রতিবাদ জানাইবার ইচ্ছা ছিল ঝিণ্টুর, কিন্তু সামনে অপরিচিত লোক দেখিয়া সে আত্মসংবরণ করিল।

—হাতটা দেখাও রাণী।

মেমসাহেব হাত বাহির করিয়া দিলেন। সুডোল আঙুলে লাল পাথরের একটি আংটি। মুখের তুলনায় হাতখানির রঙ্ যেন বেশি ফর্সা, যেন আংটির সোনার রঙ্‌টা দেহের রঙের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া গেছে, আর লাল পাথরটা দীপ্তি পাইতেছে একবিন্দু রক্তের মতো। চারগাছি চুড়ি একসঙ্গে ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিয়া মিষ্টি খানিকটা আওয়াজ দিল।

নরম সুডোল হাতখানি মুঠোর মধ্যে টানিয়া লইলেন বলরাম। মনের মধ্যে একটা অলক্ষ্য তন্ত্রী কী যেন মীড়মূর্ছনায় থাকিয়া থাকিয়া অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে। এই রকম একখানি হাতের স্পর্শ একদিন তাঁহারও জীবনকে মধুময় সম্পূর্ণতার ইঙ্গিত জানাইয়াছিল, কিন্তু—সে স্পর্শ কার? সে-ই বা আজ কোথায়?

নিজের ভাবনার মধ্যে তলাইয়া থাকিয়াই বলরাম কিছুক্ষণ অনুভব করিলেন নাড়ীর স্পন্দনটা। তারপর হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, কিছু ভয় নেই, সামান্য কফাশ্রিত জ্বর। আমি গিয়ে একটা পাঁচন পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—তাড়াতাড়ি সেরে যাবে তো? যা চারদিকের অবস্থা, তাতে—

—না, না, কোনো ভয় নেই। কালই ছেড়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আমি বরং এখন আসি তা হ'লে—নমস্কার করিয়া কবিরাজ বাহির হইয়া পড়িলেন: বিকেলেই আবার না হয় খবর নেবো এসে।

মণিমোহনও কবিরাজের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা বাহির হইয়া আসিল।

—আচ্ছা কবিরাজমশাই !

—বলুন !

—এখানকার পোস্ট্‌মাস্টারটিকে মনে নেই আপনার ? সেই যে কী রকম একটা পাগল লোক—কী নাম ?

—হরিদাস সাহা।

—হাঁ, হাঁ, হরিদাস সাহা। এখানে আছেন তিনি ?

—নাঃ।—বলরাম একটা দৃষ্টি মেলিয়া আকাশের দিকে তাকাইলেন। উজ্জ্বল নীল আকাশে সাদা মেঘ যাযাবরের মতো ভাসিয়া বেড়াইতেছে, অমনি করিয়াই একদিন দূর-বিস্তৃত পৃথিবীর উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে কোন শূন্য দিগন্তে মিলাইয়া গেছে সেই ঘরছাড়া ক্ষ্যাপা খেয়ালী লোকটা !

হরিদাস—বলরাম আবার বলিলেন, নাঃ, অনেকদিন আগেই চলে গেছে।

—বেশ লোকটা ছিল, তাই নয় ? ভারী অদ্ভুত।

—হুঁ।—হরিদাসের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যেন বলরামের ভালো লাগিতেছিল না। অত্যন্ত অকারণে মনটা ব্যথাতুর আর পীড়িত হইয়া উঠিতেছে—ওই যোগাযোগে বড় বেশি করিয়া মনে পড়িতেছে মুক্তোকে—বড় বেশি করিয়া যন্ত্রণা জাগাইয়া তুলিতেছে দশ বৎসরের পুরোনো ক্ষতটাতে।

বলরাম বলিলেন, তা হলে আমি যাই। অনেক কাজ আছে। চারদিকে জ্বর-ব্যারামের জন্যে ডাকের আর কামাই নেই কি না।

—আচ্ছা আসুন। বিকেলে মনে করে একবারটি খবর নেবেন কিন্তু। আর একটা কথা। নাঃ, থাক, আসুন আপনি।

টাকের উপরে রৌদ্রের আলোটা জ্বালা করিতেছে। ছাতাটা খুলিবার জন্য দাঁড়াইতেই বলরামের কানে ভাসিয়া আসিল মায়ের গলায় সস্নেহ তিরস্কার : ছিঃ ঝিন্টু, এখন কোলে উঠবার জন্যে দুষ্টুমি করতে নেই। আর ওই ভদ্রলোকের সামনে কী অভদ্র ভাবে তুমি চকোলেট খাচ্ছিলে বলো তো ? উনি কী যে ভাবলেন—

পলকের জন্যে কী একটা অর্থহীন আকর্ষণে দাঁড়াইয়া পড়িয়া আবার দ্বিগুণ বেগে চলিতে শুরু করিলেন বলরাম। এ একটা স্বতন্ত্র জীবন—এ একটা প্রেম এবং আনন্দের নতুন অমৃতলোক। এখানে বলরামের অধিকার নেই, এই স্বর্গ হইতে তিনি নির্বাসিত। কিন্তু কেন ? কেন এমন হইল ? কেন আজ রাধানাথকে আশ্রয় করিয়া নিঃসঙ্গ দিন তাঁহাকে কাটাইতে হয় ? মরিয়া গেলে মুখে একটুখানি আগুন ছোঁয়াইবে এমন লোকও তো আশেপাশে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এ অধিকার হইতে কে তাঁহাকে বঞ্চিত করিল ? ইচ্ছা করিলে একটার জায়গাতে তিনটা বিবাহ অত্যন্ত অনায়াসেই কি

তিনি করিতে পারিতেন না ? আর তাহা হইলে এমনি করিয়াই তাঁহার ঘর ভরিয়া সন্তান দেখা দিত, এমনি করিয়াই সব কিছু—

—কিন্তু ! কিন্তু বলরাম আলেয়ার পেছনে ছুটিয়াছিলেন। ঘর বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন মিথ্যার উপরে। তাহার শাস্তি তিনি পাইয়াছেন। এই শূন্যতা, এই নিঃসঙ্গতা, এগুলি তাঁহার অপরিহার্য কর্মফল। অকস্মাৎ নিজের উপরে একটা সুতীব্র অর্থহীন বিদ্বেষে আচ্ছন্ন হইয়া গেল বলরামের মনটা। দ্রুতবেগে তিনি চলিতে লাগিলেন—অনেকগুলি রোগী পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, এসব অবান্তর ভাবনায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সময় কাটাইলে তাঁহার চলিবে না।

আর ওদিকে মণিমোহনও তাঁহার গন্তব্য পথের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ।

একটা কথা তাহার মনে পড়িতেছিল, ভাবিতেছিল একবার বলরামকে জিজ্ঞাসা করিয়া লয় ব্যাপারটা। কিন্তু প্রশ্ন করিতে গিয়াই খেয়াল হইল সে সব বলরামের জানিবার কথা নয়। কিন্তু কথাটাকে ভোলা যাইতেছে না কিছুতেই।

সে কি ভুলিবার ! দশ বছর আগেকার কথা—কিন্তু মনের দিকে চাহিলে মনে হয়, এই তো সেদিন। কষ্টিপাথরে সোনার দাগ পড়িয়া যেমন জ্বলজ্বল্ করিতে থাকে, তেমনি করিয়া স্মৃতি-বিস্মৃতির পটভূমিকার উপরে সেই লেখাটা ক্ষয়হীন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে।

…সেই ঝড়ের রাত্রি। দুটি নীলার মতো চোখ হইতে বিষাক্ত কামনার আলো যেন ছুরির ফলার মতো বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। বাহিরে গর্জন করিতেছে ঝড়। ধূলার ঘূর্ণিতে বাগানটা অন্ধকার হইয়া গেল। মড় মড় শব্দ করিয়া কী একটা ভাঙিয়া পড়িল—একখানা ডাল অথবা আস্ত গাছই একটা। তার ঝাপ্‌টায় জানালার পাল্লা দুইটা হতাশ ভাবে বারে বারে আছড়াইয়া পড়িতেছে। বড় বড় ফোঁটায় শব্দ করিয়া ডানায় বৃষ্টি উড়িয়া আসিতেছে—চড়বড় চড়বড়—যেন একদল ঘোড়সোয়ার আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া ছুটিয়া গেল। তারপর দুইটা কঠিন আর কোমল বাহুবন্ধন—যেন সাপের আলিঙ্গনের মতো। চুলের গন্ধটা ক্লোরোফর্মের কাজ করিয়া তাহাকে যেন ঘুম পাড়াইয়া ফেলিয়াছিল। ছোরা দেখাইয়া সেদিন সেই ভালোবাসা আদায় করিয়া নেওয়া। প্রেম নয়—কামনা। সুধা নয়—মদিরা।

তারপরে আর একটি রাত। সেদিনকার সেই বিজয়িনীই সেই রাত্রে আসিয়াছিল আশ্রয়প্রার্থিনী হইয়া। বোটের মধ্যে আরো নিবিড় অন্ধকার। নিচে নদীর জল যেন কল কল করিয়া কাঁদিতেছে—কোথায় চিৎকার করিয়া উড়িয়া গেল নিশাচর পাখী ; হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে মেয়েটি, তাহাকে ভালো করিয়া দেখা যায় না,

চেনাও যায় না। অসংলগ্ন মন লইয়া সেদিন কত কী ভাবিয়াছিল মণিমোহন—কত কী বলিয়াছিল। নিজের জীবনের সঙ্গে ওই বিচিত্ররূপা বিদেশিনীকে সে জড়াইয়া লইতে চাহিয়াছিল একান্ত করিয়া। কিন্তু মেয়েটি কর্ণপাত করে নাই সে কথায়। অন্ধকারের মধ্যে যেমন রহস্যময়ী হইয়া সে দেখা দিয়াছিল, তেমনি রহস্যময়ীর মতোই মিলাইয়া গেছে।

যদি সেদিন সে রাজী হইয়া যাইত মণিমোহনের প্রস্তাবে? যদি সেদিন সত্যিই বাস্তবী রূপে আসিয়া তাহার জীবনকে অধিকার করিয়া বসিত, তাহা হইলে? তাহা হইলে আজকের এই মণিমোহন সম্পূর্ণ নতুন রূপ লইয়া দেখা দিত। সংগ্রাম আসিত, সংঘাত আসিত। কর্মজীবনের ধারা উল্‌টা দিকে বহিত, বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে হইত অভ্যস্ত সংসার হইতে, কোন্ একটা অনিশ্চয়তার কণ্টকাকীর্ণ অলক্ষ্যে কোথায় সে ভাসিয়া যাইত কে জানে। তার চাইতে এই তো ভালো। উন্নতির বাঁধা পথ—জীবনের সুনিশ্চিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরিসমাপ্তি। নিঃশঙ্ক, নিরুপদ্রব, নির্ধারিত।

ঘরের মধ্যে ঝিণ্টু হাসিতেছে—রাণী হাসিতেছে। সুখের জীবন, পরিতৃপ্তির জীবন। এই ভালো, এই ভালো। রাণী সুখী হইয়াছে, সবাই সুখী হইয়াছে।

সে সুখী হইয়াছে?

এই নদীর দেশ—প্রাগৈতিহাসিক দেশ। এখানে আসিয়া মনের সুরটা যেন অন্যভাবে বাজিয়া উঠিতে চায়। সৃষ্টিছাড়া দেশে আসিয়া সৃষ্টির নিয়মটাকে যেন বদলাইয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। ভালোমন্দের সংজ্ঞাটা নতুন করিয়া বিচার করিতে ইচ্ছা হয় একবার।

মণিমোহনের ডায়েরী হইতে

"বহুদিন পরে ডায়েরীর পাতা খুলিলাম।

মলাটের উপরে ধুলা জমিয়াছে, পাতাগুলির রঙ্ ক্রমশ হলদে হইয়া আসিয়াছে। লিখিতে গেলে অক্ষরগুলি জাবড়াইয়া যায়; যেন বলিতে চায়, ওর কাজ ফুরাইয়াছে, এত দিন পরে আবার ওকে আলোতে টানিয়া আনা ওর নিশ্চিন্ত বিশ্রামের উপরে খানিকটা উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই নয়। মনটাও আজ কিছু ভাবিতে চায় না—নিরুত্তাপ ও নিরুত্তেজ শান্তিতে ঝিমাইয়া পড়িতে ভালোবাসে—মনের প্রতিলিপিও বুঝি তেমনি করিয়া মুছিয়া যাইতে চায় স্মৃতির পাণ্ডুলিপি হইতে। যা গিয়াছে, তাহাকে যাইতে দাও। যে তুমি আজ বাঁচিয়া নাই, নতুন করিয়া ডায়েরী লিখিতে বসিলেই কি আজ আবার তাহাকে পুনর্জীবন দিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিবে? কোনো লাভ হইবে না, কেবল অনর্থক হতাশায় ভরিয়া যাইবে সমস্ত।

ডায়েরীর পাতা খুলিয়া লেখাগুলি পড়িতেছি। সেই আমি, পশ্চাতের আমি। কত কল্পনা, কত আশা, কত আত্মবিশ্লেষণ। এই ডায়েরীর পাতায় নিজের মধ্যে যেন একটা আলাদা জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলাম। সেই জগতে আমি স্রষ্টা, আমি সর্বময়, সেখানে আমার একচ্ছত্র রাজত্ব। কত সহস্র রূপে নিজেকে বিচার করিয়াছি, রচনা করিয়াছি, ভাঙিয়া ফেলিয়াছি। সেই আমি কি এই? আজ আমার সমস্ত কিছু সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বৃহত্তর ভাবনা নাই, মহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া মনের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শনের প্রয়াস নাই। আমার মধ্যে সেদিন কত অসংখ্য কাহিনীর নায়ককে পাইয়াছিলাম, কত অগণ্য সত্তাকে উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সেদিনের আমি আজ কী হইয়া দাঁড়াইয়াছি ভাবিতে ভয় পাই। জীবনের এই নির্দিষ্ট গতিপথ ছাড়া চলার যে আর কোনো দিক আছে, একথা কল্পনা করিতেই মন আতঙ্ক এবং আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া ওঠে।

মপাসাঁর একটা উপদেশ মনে পড়িতেছে: No man should read his old letters; পুরোনো চিঠি পড়িলে একান্ত সার্থক জীবনকেও মূল্যহীন এবং মিথ্যা বলিয়া মনে হয়, সমগ্রব্যাপী একটা শোচনীয় ব্যর্থতার সুস্পষ্ট রূপ তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় আত্মহত্যার পথে। কিন্তু আত্মহত্যা আমি করিব না—অতখানি মনোবিলাস বা মনের প্রবণতা আমার নাই। আমি বাঁচিতে চাই, জীবনকে আমি ভালোবাসিয়াছি। শুধু পিছনে ফেলিয়া আসা দিনগুলির দিকে চাহিয়া কৌতূহল আর বিস্ময়বোধ হইতেছে। আমি কী হইতে পারিতাম—কী হইয়াছি।

কেন এত সব কথা মনে পড়িল? মনে পড়িল এই চর ইস্‌মাইলে আসিয়া। জীবনের সব চাইতে মূল্যবান অভিজ্ঞতা আর সব চাইতে বিস্ময়কর অনুভূতি আমি এখানেই লাভ করিয়াছি। সেই মেয়েটি—সেই বর্মী মেয়েটি। নাম ভুলিয়া গিয়াছি। কী হইবে তাহার নাম দিয়া? নাম তাহার পরিচয় নয়, তাহার পরিচয় রুদ্র-মধুরে অপরূপ এই চর ইস্‌মাইল। সে যেন এখানকার আদিম প্রকৃতির মূর্ত প্রতীক। এখানকার ঝড় আর হিংস্র সৌন্দর্যের উচ্ছল তরঙ্গ লইয়া আমাকে গ্রাস করিয়াছিল, আবার তেমনি ভাবেই রিক্ত গম্ভীর ঔদাসীন্যে আমাকে পিছনে ফেলিয়া সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

কী হইত সেদিনের স্রোতে ভাসিয়া পড়িলে? কী হইত সেদিন সেই বন্য সৌন্দর্যের করাল গ্রাসে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া দিলে? পশ্চাতের আমি লোভ দেখাইতেছে। বলিতেছে: তাহা হইলে সহস্র সংঘাতের মধ্য দিয়া তুমি বাঁচিয়া থাকিতে —নিজেকে সহস্র সত্তায় বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিতে, অসংখ্য বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়া সার্থক হইতে পারিতে। এমন করিয়া জীবনের একমুখী আলস্যমন্থর গতির মধ্য দিয়া তোমার সমস্ত সত্তার মৃত্যু ঘটিত না।

না, না, এভাবে নিজেকে লোভ দেখাইয়া লাভ নাই। দশ বছর বয়স বাড়িয়াছে,

পদোন্নতি হইয়াছে, উন্নতির শীর্ষশিখর তো এখন সম্মুখেই পড়িয়া ; তা ছাড়া পাশেই রাণী ঘুমাইতেছে। ওর শান্ত কোমল মুখের উপরে আলো পড়িয়া অপরূপ শ্রীতে ওকে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। ও যেন পূর্ণ বিশ্রাম—সমস্ত সংগ্রাম ও ক্লান্তির একান্ত শান্তিময় অবসান। নীড় আর ভালোবাসা। ঝিণ্টুর মুখখানা ওর মায়ের বুকের মধ্যে লুকাইয়া আছে। আমার সন্তান, আমার সজীব দেহ ও মনের ধারাবাহক। এই ভালো। যা পথে ফেলিয়া আসিয়াছি, পথের ধুলাতেই তাহার শেষ চিহ্নটুকু মিলাইয়া যাক। চর ইস্‌মাইল আজ আর আমার রক্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না—তাহার ডাকিনী মন্ত্রকে আমি জয় করিয়াছি।"

চার

চর ইস্‌মাইলের বাহিরে বৃহত্তর পৃথিবী ঘুরিয়া চলিয়াছে।

দিগ্‌দিগন্ত জুড়িয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মানচিত্রে রেখাগুলি প্রত্যেক দিন বদলাইয়া চলিয়াছে নূতন করিয়া—ইয়োরোপে, চীনে, প্রশান্ত মহাসাগরে, ভারতবর্ষে। চর ইস্‌মাইল কি তাহার স্পর্শ পায় নাই ? পাইয়াছে বই কি। মাথার উপর দিয়া বিমান ওড়ে—নদীর জলে ফেনিল তরঙ্গ জাগাইয়া সৈন্যবাহী জাহাজ ভাসিয়া যায়। ভারত মহাসাগরে জাপানী মানোয়ার হানা দিয়া ফিরিতেছে, বর্মা, আরাকান শত্রুপক্ষ গ্রাস করিয়া চলিয়াছে। আসামের সীমান্তে কামানগর্জন—খাসিয়া, জয়ন্তী, লুসাই পাহাড়ের চূড়াগুলি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কাঁপিয়া উঠিতেছে। চট্টগ্রামে বোমা পড়িতেছে।

উন্মাদ ডি-সুজাকে লইয়া গিয়াছিল গঞ্জালেস্‌। লিসিকে তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিবে—উদ্ধার করিবে। যেমন করিয়া হোক, যতদিনেই হোক। কতটুকু এই পৃথিবী, কতখানিই বা এই মহাসাগরের ব্যাস ? তাহাদের দিগ্বিজয়ী জলদস্যু পূর্বপুরুষেরা একদিন সাতটি সাগর চষিয়া বেড়াইত, তাহাদের ড্রাগন আঁকা রক্তপতাকা সমুদ্রের নীল জলে রক্তের ছায়া ফেলিত। সন্ধান শুরু হইল। চট্টগ্রাম হইতে আরাকান খুব বেশি দিনের পথ নয়—ডি-সুজাকে লইয়া গঞ্জালেস্‌ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইল সমস্ত। কিন্তু লিসির সন্ধান পাওয়া গেল না—না পাওয়া গেল বর্মীদের কাহাকেও। তারপর একদিন সকালে উঠিয়া গঞ্জালেস্‌ দেখিল ঘরের চালে একটা দড়ি ঝুলাইয়া তাহার সঙ্গে ডি-সুজাও ঝুলিতেছে। গলাটা সারসের গলার মতো লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, মানুষের জিভ যে অতখানি বড় হইতে পারে, এর আগে সেটা কোনোদিন কল্পনাই করিতে পারে নাই গঞ্জালেস্‌। নাকের ফাঁক দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়িয়া বুকের উপরে কালো হইয়া জমিয়া আছে। আত্মহত্যা করিয়াছে ডি-সুজা। এত বড় বীর, এমন দুঃসাহসী পুরুষ। তাহার অমিত শক্তিমান জীবনকে সে আর কাহারো হাতেই শেষ করিতে দেয় নাই, স্বাভাবিক মৃত্যুকেও মানিয়া

লয় নাই। যে আলো সমস্ত জীবন ধরিয়া সে সহস্র ছটায় জ্বালাইয়া দিয়াছিল—নিজের হাতেই সে আলোক সে নিবাইয়া দিয়া গিয়াছে।

তারপরেই ক্রমে কেমন একটা প্রতিক্রিয়া আসিয়া দেখা দিল গঞ্জালেসের মনে! লিসির জন্য সে উদ্দামতাটা যেন আস্তে আস্তে শান্ত হইয়া আসিল। ডি-সুজার মৃত্যুটা একখণ্ড পাথরের মতো হইয়া চাপিয়া বসিল তাহার চেতনায়। মনে হইল, তাহারও শেষ পরিণতি হয়তো বা এমনি করিয়াই ঘনাইয়া আসিবে। তাহার শিরায় শিরায় অতীতের সেই সংস্কারবাদী হিন্দুরক্ত ক্রিয়া করিল।

গঞ্জালেস্ ফিরিয়া আসিল বাড়িতে।

কাজকারবারে মন দিল, কিন্তু মন বসিল না। জীবনটা যেন অদ্ভুতভাবে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেছে। যে বিদ্রোহী বহু দিনের ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, সে কিছুই করিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই অস্বস্তির একটা তীব্র জ্বালায় নিজেকে যেন জ্বালাইতে থাকে। অথচ, কাজকারবারও দেখিতে হইবে। জোর করিয়া মনটাকে বাঁধিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে পুরানো অভ্যাসগুলিকে ঝালাইয়া লইতে শুরু করিল সে। তারপরে মদ টানিতে লাগিল অশ্রান্তভাবে। ডেভিড্ গঞ্জালেসের মতো বেপরোয়া হইবার ক্ষমতা তাহার নাই, কিন্তু কপালে বাপের দেওয়া সেই কাটা চিহ্নটার জয়-তিলক বহন করিয়া সে পূর্ণ উদ্যমে নেশার সেবায় লাগিয়া গেল। ভাব-সাব দেখিয়া পাকা হুইস্কিখোর বন্ধু পেরিরাও তাহার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

একদিন পেরিরা ঠাট্টা করিয়া মন্তব্য করিল : হ্যাঁ, বাপের নাম রাখতে পারবে বলেই ভরসা হচ্ছে।

আরক্ত চোখ দুইটা পাকাইয়া গঞ্জালেস্ পেরিরার দিকে তাকাইল : বাপের নাম? বাপকে ছাড়িয়ে যদি যেতে না পারি, তা হলে আমার নাম স্যামুয়েলই নয়। সে ব্যাটা ধেনো পেলে ধেনোই টানত, আমি হুইস্কির নিচে নামব না—এ তোমাকে বলে রাখলাম।

পেরিরা খুশি হইয়া গঞ্জালেসের পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া কহিল, সাবাস ভাই, সাবাস। বুকের পাটা আছে তোমার।

অবশ্য খুশি হইবার কারণ আছে তাহার যথেষ্টই। নেশার জন্যে অনেকগুলা কাঁচা পয়সা তাহার বাহির হইয়া যাইত, সেগুলি বাঁচিয়া গেল আপাতত। তা ছাড়া গঞ্জালেসের কারবারে সেও অংশীদার; লোকটা যতদিন নেশার মধ্যে তলাইয়া থাকিবে, ততদিনই সে নিজের জন্য কিছু করিয়া লইবার সুযোগ পাইবে। অবশ্য, কৃতঘ্নতা বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু ব্যবসা করিতে বসিয়া যখন দুনিয়াসুদ্ধ লোককেই ঠকানো চলিতেছে, তখন অংশীদারকেও কিছু ঠকাইলে তাহাতে পাপের মাত্রাটা এমন ভয়ঙ্কর বাড়িয়া উঠিবে না। মাতা মেরী তো আর একেবারে হৃদয়হীনা নন, একটা গতিও তিনি করিয়া দিবেনই

পেরিরার। সংসারে নিজের কাজ নিজে গুছাইয়া না নিলে তোমার জন্তে কে আর হাত বাড়াইয়া বসিয়া আছে বলো।

গঞ্জালেস্ তলাইয়া গেল মদের বোতলের মধ্যে, তলাইয়া গেল তাহার রক্ষিতা সেই মেয়েমানুষটার মধ্যে। বাহিরের ব্যর্থ সন্ধান যেন অন্তরের মধ্যে আসিয়া তাহার অবলম্বন খোঁজে। মদের বোতলের মধ্যেই কি সে তাহার উদগ্র জ্বালাকে নির্বাপিত করিতে চায়? পণ্য নারীর ভ্রূভঙ্গির মধ্য দিয়াই কি গঞ্জালেস্ খুঁজিয়া পায় লিসিকে।

আর তাহারই আড়ালে আড়ালে স্রোতের মতো দিন বহিয়া চলে—বয়স বাড়িয়া চলে গঞ্জালেসের। ছয়—সাত—আট—নয়—দশ বৎসর।

স্রোতের মতো দিন বহিয়া চলে—বহিয়া চলে বৃহত্তর পৃথিবীর বিবর্তনশীল দিনগুলি। তারপর শোনা গেল বোমা পড়িয়াছে রেঙ্গুনে। তারপর একদিন চট্টগ্রামের আলো নিভিল। অজানা আশংকা এবং ভবিষ্যতের একটা অনিবার্য মৃত্যুতরঙ্গ যেন দিকে দিগন্তে তাহার সুনিশ্চিত আবির্ভাবের সংকেত জানাইল। পালাও—পালাও। উদীয়মান সূর্যের পাখা মেলিয়া জাপানী বোমারু আসিতেছে। আরাকানের পাহাড় হইতে তাহাদের কামানের বজ্র-গর্জন।

মুহূর্তে পৃথিবীর রঙ বদলাইয়া গেল। শহরে মিলিটারী আসিয়া বাঁধিয়াছে আস্তানা; বিমানধ্বংসী কামানগুলি ডকে, পাহাড়ের টিলায় মাথা উঁচু করিয়া শত্রুর জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছে। মাথার উপর দিয়া বিমান ঘুরিতেছে চক্রাকারে। এ-আর-পির অসংখ্য সতর্ক-বাণী। স্লিট-ট্রেঞ্চের সমারোহ। বাংলার ফ্রন্ট লাইন।

সমস্ত মানুষগুলির মুখ লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। আশা নাই, আনন্দ নাই, একটা আতঙ্কের কালো ছায়া আসিয়া ভিড় করিয়াছে সকলের মুখে। যখন-তখন তীব্র স্বরে কাঁদিয়া ওঠে সাইরেন। ট্রেনে স্টিমারে আশ্রয় লইয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলাইতেছে মানুষ। সময় নাই—সময় নাই। তাহারা আসিয়া পড়িল।

সারাটা রাত নেশা করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া ছিল গঞ্জালেস্। পেরিরা আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল।

—এখনো চুপ করে পড়ে আছো যে?

গঞ্জালেস্ পাশ ফিরিয়া বলিল, কী করতে হবে?

—প্রাণে বাঁচতে হলে এইবেলাই সরে পড়তে হবে। চাটি-বাটি এবারে তোলো।

গঞ্জালেস্ যেন এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিল কথাটা। কেন, কী হয়েছে?

পেরিরা চটিয়া উঠিল: হয়েছে মাথা আর মুণ্ডু। আচ্ছা লোক তো তুমি। ওদিকে যে কী কাণ্ড ঘটেছে, খেয়াল নেই বুঝি? জাপানীরা যে এসে পড়ল।

—বেশ তো, আসুক না।

—আসুক না ?—বিস্ফারিত চোখে পেরিরা বলিল, ভেবেছ কি তুমি ? ওরা কি তোমার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে আসছে নাকি ? বোমা দিয়ে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। শোনোনি, বর্মা যে বেহাত হয়ে গেল। এখনও সময় আছে, চলো—কলকাতার দিকে সরে পড়ি।

—আর কাজকারবার ?

—কাজকারবার ? প্রাণে বাঁচলে ওসব ঢের হবে। এখন মানে মানে তো প্রাণ নিয়ে সরে পড়ো আগে।

—ধ্যাৎ—ধ্যাৎ ! অত্যন্ত বিরক্ত কণ্ঠে গঞ্জালেস্ বলিল, এইজন্যে তুমি আমার নেশাটা চটিয়ে দিলে ! যে জাহান্নামে খুশি তুমি যেতে পারো, আমি এখান থেকে নড়ব না।

—মরবার বুদ্ধি হয়েছে, তাই না ?

—তাতে তোমার কী ? আমি মরলে তো আর তোমাকে চ্যাংদোলা করে কবর দিয়ে আসতে হবে না। যে চুলোয় ইচ্ছে যাও, আমাকে খামকা জ্বালাতন কোরো না।

—বটে বটে ? পেরিরা চটিয়া আগুন হইয়া গেল : ভালো কথা বললে মন্দ হয় কিনা। আচ্ছা, তুমি থাকো এখানে ! বোমা খেয়ে যদি উড়ে না যাও তো—

—হুইস্কি খেয়ে তো খুব উড়লাম, একবার বোমা খেয়েই দেখি না—গঞ্জালেস্ বোকার মতো দাঁত বাহির করিয়া হাসিল : একটা নতুন রকমের নেশার স্বাদ অন্তত পাওয়া যাবে। শুনেছি হুইস্কির চাইতে বোমার ঝাঁজটা অনেক বেশি, নয় কি ?

—চুলোয় যাও। তোমার আত্মাটা শয়তানে একেবারেই খেয়ে ফেলেছে দেখছি—পাদরী সাহেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া এবং সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পেরিরা বাহির হইয়া গেল। এমন একটা পাঁড় মাতালের সঙ্গে বসিয়া বসিয়া তর্ক করা নিছক সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

পিছন হইতে গঞ্জালেস্ ডাকিয়া বলিল, পারো তো যাওয়ার আগে বোতল তিনেক হুইস্কি বিদায়ের উপহার দিয়ে যেয়ো বন্ধু। আমার তো ঢের খেয়েছ, এখন—

পেরিরা জবাব দিল না, বাকিটা শুনিবার জন্যে দাঁড়াইলও না। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা নিজের যথাসর্বস্ব গুছাইয়া লইয়া সে কলিকাতার ট্রেন ধরিল।

কিন্তু গঞ্জালেস্ও আর বেশিদিন নিজের নির্বিকার ঔদাসীন্যের মধ্যে ঘুমাইয়া থাকিতে পারিল না।

বাহিরের অতি বাস্তব পৃথিবীর স্পর্শও সে অনুভব করিল একদিন। দোকানে গিয়া মদ পাওয়া গেল না—চালান বন্ধ। প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়া এক বোতল ধেনো সে সংগ্রহ করিল, তারপর চলিল তাহার প্রিয়তমার সন্ধানে। কিন্তু সেখানে গিয়াও আজ তাহাকে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। শুধু তাহার প্রিয়তমাই নয়, সমস্ত ঘরের দরজাই বন্ধ।

সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যাহারা এই দূর বিদেশের রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে আসিয়াছে, তাহাদের প্রয়োজনটা সকলের চাইতে বেশি এবং এ ক্ষেত্রেও তাহাদের দাবি অগ্রগণ্য। গঙ্গালেস্ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সব কিছু বিস্বাদ আর নিরর্থক হইয়া গেছে। আজ সে প্রথম অনুভব করিল যুদ্ধ আসিয়াছে—দিকে দিকে তাহার বাহু বাড়াইয়া দিয়াছে। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করিয়া খানিকটা আগুন জ্বলিয়া গেল। মদের বোতলটা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, তারপর লক্ষ্যহীনের মতো হাঁটিয়া চলিল।

যুদ্ধ আসিয়াছে। সমস্ত শহরটা অন্ধকার। শুধু মাথার উপরে অনেকগুলি লাল নীল আলো মৃদু গর্জনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বিমান।

গঙ্গালেস্ চলিতে লাগিল। অন্যমনস্কভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে একটা ল্যাম্প পোস্টে ধাক্কা খাইল সে, একটা নেড়ী কুকুরের লেজ মাড়াইয়া দিল—কুকুরটা আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া সমস্ত শহরটা যেন মাথায় করিয়া তুলিল। তীব্র আলোর জোয়ারে চারিদিক ভাসাইয়া দিয়া ছোটখাটো একটা লোহার ঝড়ের মতো মিলিটারি ট্রাক নক্ষত্রবেগে বাহির হইয়া গেল—একটুর জন্যে চাপা পড়িল না গঙ্গালেস্।

চলিতে চলিতে কখন যে পথ শেষ হইয়া আসিয়াছে সে নিজেও টের পাইল না। যখন টের পাইল তখন আর আগাইয়া আসিবার উপায় নাই। কালো অন্ধকারে টানা স্রোতের মতো সামনে কর্ণফুলী বহিয়া চলিয়াছে অবিশ্রাম কলচ্ছন্দে। হাওয়ায় তীরের নারিকেল-বীথি মর্মরিত হইতেছে। অনেক দূরে ডকের একরাশ অস্পষ্ট আলো। জাহাজ নোঙর করিয়া আছে। গঙ্গালেস্ চুপ করিয়া নদীর ধারে বসিয়া রহিল।

সত্যিই যুদ্ধ দেখা দিয়াছে—যুদ্ধ প্রবেশ করিয়াছে রক্তে। কোনোদিক হইতেই তাহার হাত হইতে আর নিষ্কৃতি নাই। সব কিছুতেই সে তাহার দাবি জানাইতেছে নিষ্ঠুর ভাবে, মর্মান্তিক ভাবে। নদীর বাতাসে অনেকদিন পরে যেন গঙ্গালেসের উত্তপ্ত মাথাটা প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিল। মনে পড়িয়া গেল : গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। শহরের পথে দুটি একটি করিয়া মড়া ছড়াইয়া থাকে আজকাল। শুধু মদ নয়, চাল-ডাল-আটা-নুন-তেল সব কিছুই দিনের পর দিন হাওয়া হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। আজ একমাত্র যুদ্ধটাই সত্য এবং তাহার চাইতেও কঠিনতর সত্য যুদ্ধের নির্মম দাবি, অনিবার্য প্রয়োজন।

গঙ্গালেসের চেতনা নিজের মধ্যে নাড়া খাইয়া যেন জাগিয়া উঠিতেছে। এতদিন কোথায় ছিল, কিসের মধ্যে তলাইয়া ছিল সে? সে তো এমন ছিল না। ডেভিড্ গঙ্গা-লেস্‌কে তাহার মধ্যে কে জাগাইয়া দিল? বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে পড়িল ডি-সুজাকে, মনে পড়িল লিসিকে। ডি-সুজা। গলায় দড়ি আঁটিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছিল—তাহার জিভটা দু হাত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। আর লিসি? কোথায় সে? কোন্ সাতসমুদ্রের ওপারে সে চিরদিনের মতো হারাইয়া গেছে?

ঘাসের জমির সামান্য নিচেই কর্ণফুলীর কালো জল কলকল করিয়া বহিতেছে। মৃত্যুর প্রবহমাণ করাল ধারার মতো কালো। নারিকেল-বীথি যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। ওখানে বনের মাথায় খানিকটা রক্ত মাখাইয়া দিল কে? চাঁদ উঠিতেছে নাকি ওখানে? সমস্ত পৃথিবীটা যেন মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।

অসহ্য তৃষ্ণায় যেন পুড়িয়া যাইতেছে গলাটা। গঞ্জালেস্ জলের কাছে নামিয়া গেল। আঁজলা আঁজলা জল খাইতে শুরু করিল। কী ঠাণ্ডা জলটা—নেশা হয় না, জুড়াইয়া যায় শরীরটা।

হঠাৎ কান্নার মতো একটা তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক আর্তনাদ উঠিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে সমস্ত শহরটাকে যেন চকিত করিয়া দিল। নদীর জল শিহরিয়া উঠিল। এখানে ওখানে যা দু'একটা ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছিল দপ্ দপ্ করিয়া, অতল অন্ধকারে তাহারা নিবিয়া গেল। বনের প্রান্তে যেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল চাঁদটা।

এর আগে আরো অনেকবার বাজিয়াছে, কিন্তু আজকের এই দীর্ঘায়ত অবিশ্রাম কান্নার মধ্যে কিসের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যেন আছে। গঞ্জালেস্ ঘাসের মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিয়া পড়িয়া রহিল নিঃসাড় হইয়া। কতক্ষণ? এক মিনিট, দুই মিনিট, হয়তো বা পাঁচ মিনিট। তারপরেই শোনা গেল দূরের আকাশে একঝাঁক মৌমাছির গুঞ্জন। উপরের তারকা-খচিত পটভূমির নিচে লাল আলোকবিন্দু দিয়া গড়া একটা তীরের ফলার মতো 'ভি' রচনা করিয়া শত্রু-বিমান উড়িয়া আসিতেছে।

সার্চলাইটের তীব্র আলো আকাশের তামসচক্র উদ্ভাসিত করিয়া ছিল—পাহাড়ের টিলা হইতে গর্জন করিল অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্ট। অন্ধকারের শূন্যতায় আলোর ফুলঝুরি ছড়াইয়া দিয়া শেল্ ফাটিয়া পড়িল। বোঁ-ও-ও। মৌমাছির ঝাঁকটা বাজপাখীর মতো ছোঁ দিয়া নামিল, আবার সার্চলাইটের তীব্র আলো প্রলয়ের বিদ্যুৎ-চমকের মতো উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল সমস্ত।

—বুম্ বুম্—কট্-কট্-কট্—

বিদ্যুৎ-চমক—মাথার উপরে আলোকের ফুলঝুরি। অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্ট অবিশ্রান্ত গর্জন করিতেছে। পেটের নিচে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে মাটিটা—যেন মুহূর্তে দু ফাঁক হইয়া গিয়া গোটা শহরটাকেই তলায় টানিয়া লইবে। কর্ণফুলীর জলে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ—অন্ধকারের মধ্যেও দেখা গেল অনেকটা জুড়িয়া একটা সাদা ফেনার বিশাল ঘূর্ণি জলস্তম্ভের মতো দাঁড়াইয়া উঠিল। কট্ কট্ বুম্ বুম্। মাটিটা কি চড়্ চড়্ করিয়া ফাটিতেছে নাকি? হঠাৎ ডকের দিক হইতে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিয়া সব কিছুকে যেন ডুবাইয়া দিল। একটা বিরাট আগুনের শিখা আকাশকে ছাড়াইয়া আরো উপরে লক্-লক্ করিয়া উড়িয়া গেল—গঞ্জালেসের চোখের সামনে নামিল মূর্ছার অন্ধকার।

টলিতে টলিতে সে বাড়ি ফিরিল—সে একটা নরকের মধ্য দিয়া। আগুন—রক্ত। ধ্বংসস্তূপ। এই জাপানী বোমা! হুইস্কির চাইতে কড়াই বটে, একটু বেশি পরিমাণেই কড়া। গঞ্জালেসের মতো পাঁড় মাতালেরও অতটা বরদাস্ত হইবে না।

একবার—দুইবার—তিনবার। শহরে আর মানুষ নাই। দোকানপাট প্রায় বন্ধ—খাবার মেলে না। চাকরটা পালাইয়া বাঁচিয়াছে। শ্মশানের একটা প্রেতের মতো এভাবে আর ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালো লাগে না। গঞ্জালেস্ ভাবিল, এইবার এখান হইতে সত্যিই সরিয়া পড়া দরকার।

কিন্তু কোথায় যাইবে সে? কলিকাতায়?

না, কলিকাতায় নয়। চোখের সামনে একটা অপরিণত তটরেখা ভাসিয়া উঠিতেছে। যেখানে পর্তুগীজদের ভাঙা গীর্জাটার তলা দিয়া খরস্রোতে নোনা গাঙের জল বহিয়া চলিয়াছে; বালির মধ্যে পুঁতিয়া থাকা লোহার কামান আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তিনশো বছর আগেকার স্বপ্ন দেখিতেছে; জোয়ার-ভাঁটার সন্ধিক্ষণে গাঙের জল যেখানে জ্যোৎস্নারাত্রিতে থামিয়া থম্‌থম্ করিতেছে আর তাহার উপর চিত্র-বিচিত্র ডানার ছায়া ফেলিয়া বুনো হাঁসের দল উড়িয়া চলিতেছে—সেইখানে।

সে চর ইস্‌মাইল।

পাঁচ

খুব ভোরে ওঠাই মণিমোহনের অভ্যাস। আজও যখন তার ঘুম ভাঙিল, ঘড়িতে পাঁচটা বাজে নাই তখনও। কাঁচের জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অনুজ্জ্বল আলো ঘরে ঢুকিয়া অন্ধকারটাকে যেন সবুজ আর স্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। পাশে রাণী ঘুমাইয়া আছে, ঝিণ্টু দু হাত দিয়া একান্ত করিয়া আঁকড়াইয়া আছে মাকে। রাণীর বিস্রস্ত চুল হইতে একটি স্তবক আসিয়া ঝিণ্টুর নিদ্রিত মুখের উপরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—মায়ের উপর স্পর্শ সুগভীর ভালোবাসার মতো।

এই তো জীবন! পরিপূর্ণ—সমস্যাহীন, সংঘাতহীন। বংশচক্র ঘুরিয়া চলিয়াছে, মানুষের বিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে—বিস্তার ঘটিয়া চলিয়াছে জৈব-প্রবাহে। প্রাণ হইতে প্রাণে, রূপ হইতে রূপে। কী প্রয়োজন বিপ্লব ঘটাইয়া, উল্কার আলোকে জীবনে আহ্বান করিয়া? যা কখনো সত্য হইয়া উঠিবে না—একটা প্রখর আলোর বিচ্ছুরিত রশ্মিধারায় জ্বালাইয়া দিয়া যাইবে শুধু?

স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিল মণিমোহন। ভোরের আলোয় তন্দ্রাচ্ছন্ন পৃথিবী। চর ইস্‌মাইলের নোনা মাটিতে প্রাণের অঙ্কুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই তো পরিণতি। অসীম

উন্মুক্ততার যাযাবর বৃত্তি হইতে নীড়ের সংকীর্ণ সীমানাতে—সংঘাত হইতে সন্ধিতে।

রাণী ঘুমাইতেছে—ঝিণ্টু ঘুমাইতেছে। পায়ের কাছ হইতে রাগটা তুলিয়া আনিয়া দুজনকেই সযত্নে ঢাকিয়া দিল মণিমোহন। এপাশের জানালা দিয়া ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। এই ঠাণ্ডাটা ভালো নয়, রাণীর জ্বর আবার বাড়িতে পারে। টেবিলের উপরে ম্লানাভ লাল আভা বিকীর্ণ করিয়া একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে, পোড়া কেরোসিনের লঘু বিস্বাদ গন্ধ ঘরময় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মণিমোহন লণ্ঠনটা নিবাইয়া দিল।

পায়ের মধ্যে চটিটা টানিয়া আনিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল সে। আবছায়া আলোয় গ্রাম এবং অরণ্য যেন অবসিত স্বপ্নের রেশ হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। সামনের বাব্‌লা গাছটায় দু-তিনটা কাক একসঙ্গে পাখা ঝাড়া দিয়া কা কা-করিয়া প্রভাতী ঘোষণা করিল, বৈতালিক মুরগীর উদাত্ত আহ্বান ভাসিয়া আসিল গ্রামের দিক হইতে। ওপাশে নদীর উপরে খানিকটা হালকা কুয়াশা জমিয়া আছে, ভালো করিয়া নজর চলে না, শুধু কতগুলি নৌকার দীর্ঘ মাস্তুলকে অনুমান করিয়া লওয়া চলে মাত্র।

বারান্দায় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে। ভারী ভালো লাগিতেছে—এই অপূর্ব ব্রাহ্মমুহূর্তে মনের উপর হইতে সমস্ত দ্বন্দ্ব—সমস্ত সংশয়ের জালটা যেন সরিয়া গিয়াছে। ঝির ঝির করিয়া হাওয়া আসিয়া যেন উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে রাত্রির সমস্ত জড়তা—সমস্ত ক্লান্তি।

একটা দাঁতন করিতে করিতে পিয়ারী দেখা দিল। মণিমোহন বলিল, কোটটা বার করে দে তো, দু পা হেঁটে আসা যাক।

নদীর ধার দিয়া মেটে পথটায় সে চলিতে লাগিল। একটু একটু করিয়া প্রসন্ন উজ্জ্বল দিন দিগন্তে ফুটিয়া উঠিতেছে। আকাশের নীলিমা এখানে স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই—ধূসরতার একটা আচ্ছাদন পূর্বাচলকে সমাবৃত করিয়া আছে। তাহারই মধ্য দিয়া উজ্জ্বল রক্তবিন্দুর মতো সূর্য দেখা দিল—সেদিকে তাকাইয়া মণিমোহনের মনে হইল যেন ভস্মভূষণা গৌরীর সীমন্তে সিন্দুরের একটি বিন্দু জ্বলিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন একনিষ্ঠ হইয়া তপস্যা করিতেছে —যেন স্থিরব্রতা পার্বতীর মতো বরাভয় কামনা করিতেছে জীবনের জন্য, কল্যাণের জন্য, সন্তানের জন্য।

পায়ের নিচে ঘাসের উপর শিশিরবিন্দু চিকচিক করিতেছে। নদীর গেরিমাটিরঙা জল লাল হইয়া উঠিল। এক একটি করিয়া নৌকা ভাসিয়া পড়িল—পূবের কোনো চরে কাজ করিতে চলিল হয়তো।

—সেলাম হুজুর।

সামনে একটি মুসলমান যুবক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতে একটা কালো ভাঁড়ের মধ্যে খানিকটা দুধ। বলিষ্ঠ বুক, বলিষ্ঠ পেশী। হাতটা আর একবার কপালে তুলিয়া

বলিল, হুজুর, সেলাম।

মণিমোহন দাঁড়াইয়া পড়িল।

—কী চাই তোমার?

—একটা কথা বলব হুজুর।

—বলো।

রূপার সিগারেট কেস্ বাহির করিয়া মণিমোহন সিগারেট ধরাইল, তারপর লোকটির মুখের দিকে তাকাইল। ঠিক মুখের দিকে নয়—মুখের পাশ দিয়া তির্যক ভঙ্গিতে আকাশের এক প্রান্তে একখণ্ড শাদা মেঘের দিকে। অধস্তনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার ইহাই আভিজাত্যসম্মত প্রথা—বহুদিনের অভ্যাসে এই আর্টটা মণিমোহন আয়ত্ত করিয়াছে। নিচের দিকে চাহিলে দীনতা, পাশের দিকে তাকাইলে অন্যমনস্কতা, ঠিক মুখোমুখি তাকাইলে একটা অবাঞ্ছিত সাম্যবোধ। অতএব ঠিক কানের পাশ দিয়া এমনভাবে উপরের দিকে চোখ তুলিয়া রাখিবে যে তোমার মুখের পানে চাহিলেই মনে হইবে তুমি নিতান্তই এই পৃথিবীর গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নও—তোমার সহিত ঊর্ধ্বের কোনো একটা স্বর্গলোকের নিবিড় আত্মীয়তা আছে। একজন সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এই সমস্ত মূল্যবান মনস্তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক উপদেশ দিয়া মণিমোহনকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করিল—নিজের মনের সংকোচ ও সংশয়টাকে জয় করিবার চেষ্টা করিল বার কয়েক। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলিল, আপনি হাকিম, আপনাদের হাতেই সব। জুলুমবাজি বন্ধ করার একটা ব্যবস্থা করুন হুজুর।

—জুলুমবাজি? কিসের জুলুমবাজি?

—মহাজনের, আড়তদারের।

কথাটা তীরের মতো তীক্ষ্ণ হইয়া মণিমোহনের কানে আসিয়া আঘাত করিল। এই সুরটা ভালো নয়—সাধারণ একজন মুসলমান চাষা প্রজার মুখ হইতে কথাগুলি যেমন অবাঞ্ছিত তেমনি অস্বস্তিকর। জমি লইয়া ঝামেলা নয়, নারীঘটিত ব্যাপারও কিছু নয়, নজরটা সোজা গিয়া পড়িয়াছে মহাজন আর আড়তদারদের উপরে। অবচেতন চিন্তাকে চকিত করিয়া দিয়া মনে হইল, লোকটা যাহা বলিতেছে, এইখানেই তাহার শেষ নয়—ইহার মূল দূরদূরান্তব্যাপী—ইহার জটিল শিকড়ের জাল আরো অনেকখানি গভীরে গিয়াই ঠেকিয়াছে। শহরের পথেঘাটে বজ্রকণ্ঠে 'শ্লোগান' শুনিলে ভয় করে না—পতাকাবাহী জনতার চলন্ত মিছিলটা দাঁড়াইয়া দেখিতে ভালোই লাগে একরকম। কিন্তু চর ইস্‌মাইলের এই প্রত্যন্তে এমনি একটা সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যেই যেন আসন্ন বৈশাখী ঝড়ের সংকেত লুকাইয়া থাকে।

ঊর্ধ্বচারী দৃষ্টিটা আকাশ হইতে নামিয়া আসিল—সোজা আসিয়া পড়িল লোকটির

মুখের উপরে। যেন তাহার ভিতরের সবটাই মণিমোহন দেখিয়া ফেলিতে চায়। খানিকটা সিগারেটের ধোঁয়া নিঃশব্দে নদীর হুহু বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে জমির। কলুপাড়ায় আমার বাড়ি—হাটবাজার করতে প্রায়ই এখানে আসতে হয় আমাকে। কাসেম খাঁর ব্যাটা বললেই লোকে চিনবে আমাকে।

—হুঁ। তা আড়তদার মহাজনের ওপরে এত চটেছ কেন?

—তা ছাড়া আর কার ওপরে চটব হুজুর? আপনি তো হাকিম—প্রজার মা বাপ, নিজের চোখেই সব দেখতে পাচ্ছেন। যুদ্ধের জন্যে আকাল দেখা দিয়েছে চারভিতে। কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না—আধপেটা খেয়ে কোনোমতে দিন কাটাচ্ছে মানুষ। ওদিকে অসুখ-বিসুখ—সরকারী দাওয়াইখানাতে এক ফোঁটা ওষুধ নেই যে—

যেমন অস্বস্তি, তেমনি বিরক্তি বোধ করিল মণিমোহন। যেন বক্তৃতায় পাইয়াছে লোকটাকে। কখন যে সংকোচ আর ছায়ার আবরণটা তাহার সরিয়া গেছে—একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রেখা পড়িয়াছে চোখে মুখে—কঠিন হইয়া উঠিয়াছে খাড়া চোয়ালে, হ্রস্ব ভ্রূ-রেখাতে। প্রসারিত বুক আর সুগঠিত মাংসপেশীতে যেন শক্তির তরঙ্গ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। চকিতে একটা তীব্র সন্দেহে মনটা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। লোকটা পলিটিক্স করিয়া বেড়ায় না তো? গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি গড়িয়া যাহারা—

হাতের সিগারেটটাকে জুতার নিচে মাড়াইয়া সে অসহিষ্ণুভাবে বলিল, আমার সময় নেই, সংক্ষেপে বলো।

—আজ্ঞে, সংক্ষেপেই বলব। আপনি হাকিম—কত কাজ, কত ভাবনা আপনার—সে কি আর জানি না। যেন বিনয়ে গলিয়া গেল জমির।

কিন্তু এই বিনয়টাও তেমন প্রীতিকর লাগিল না। ইহার মধ্যে কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাস আছে—একটা বিদ্রূপের খোঁচা আছে। হঠাৎ মনে হইল সরকারী বাবু কিংবা হাকিমদের সে সব দিন যেন আর নাই। মাটির তলায় কোথায় বাসুকীর ফণা আর ভার বহিতে পারিতেছে না—বহুদিনের আদায় করিয়া লওয়া সম্মান আর আভিজাত্যের সিংহাসনটা যেন কিসের স্পর্শে টলমল করিয়া নড়িতেছে।

—বলো, বলো, কী বলছিলে বলো।

—আজ্ঞে চাল তো ক্রমেই আক্রা হয়ে উঠছে। বেশি দর পেয়ে যারা ধান বেচে দিয়েছিল, তাদের ঘরের খোরাক ফুরিয়ে গেছে। আধিয়ার আর জনমজুরদের তো কথাই নেই। চাল কিনতে পারছে না কেউ। সব গিয়ে জমেছে আড়তদার আর মহাজনের গোলায়। ধান কিনতে গেলে পনেরো ষোলো টাকা দর হাঁকে তারা। অথচ হুজুর—বোঝেন তো—

—বুঝি।—মণিমোহনের গলার স্বরে এবারে আর স্বচ্ছন্দ ঔদার্য প্রকাশ পাইল না : তা আমাকে কী করতে হবে ?

জমির কিন্তু দমিল না : আপনিই তো সব করবেন হুজুর। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সকলকে চাল ছাড়তে বলে দিন, নইলে মানুষ না খেয়ে মরে যাবে।

লোকটা যেন হুকুম করিতেছে !

চড়া গলায় মণিমোহন বলিল, চাল ছাড়তে বলব ? আমার কথা কেন শুনতে যাবে ওরা ? মহাজনের ধান—সে যদি বিক্রি করতে না চায়, তা হলে কার কী বলবার আছে ?

জমির আবার হাসিল : আপনার কথা শুনবে না ? এও কি একটা কথা হল হুজুর ? আপনি যা বলবেন তাই হবে। আপনাকে মানবে না—কার ঘাড়ে এমন কটা মাথা গজিয়েছে ?

শেষ কথাগুলির মধ্যে কিছুটা সান্ত্বনা আছে, তবু মণিমোহন খুশি হইয়া উঠিতে পারিল না। বলিল, আমি তো বললাম তবু ওরা যদি চাল ছেড়ে না দেয় ?

জমিরের চোখ ঝকঝক করিয়া উঠিল : তা হলে বাকিটা আমাদের ওপরেই ছেড়ে দেবেন। আমরাই দেখব কিছু করতে পারি কি না ! বড়লোক হলেই গরীবকে মারবার এক্তিয়ার কারো জন্মায় না হুজুর।

কিন্তু মণিমোহনের প্রসঙ্গটা আর ভালো লাগিতেছে না। প্রসন্ন সকাল—নদীর জলে প্রথম সূর্যের আলো পড়িয়াছে। ভিজা বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে মাটির মিষ্টি গন্ধ। সমস্ত পৃথিবীটার যেন সুর কাটিয়া গেছে—আকাশ বাতাস ঘিরিয়া একটা আসন্ন দুর্যোগের কালো ইঙ্গিত যেন ছায়া ফেলিয়াছে লোকটার সর্বাঙ্গে। অধীরভাবে মণিমোহন বলিল, আচ্ছা, পরে আবার দেখা কোরো। এখন সময় নেই আমার।

—সেলাম হুজুর।

জমির আর দাঁড়াইল না। দুধের ভাঁড়টা মাটি হইতে তুলিয়া লইয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

মণিমোহন যখন ডাকবাংলোয় ফিরিয়া আসিল—তখন রোদ বেশ চড়িয়াছে। চারিদিকের জীবন জাগিয়া উঠিয়াছে প্রতিদিনের চিরন্তন কর্মকুশলতা লইয়া। জেলেপাড়ায় কালো প্রকাণ্ড কড়াইগুলিতে গাবের রস জ্বাল দেওয়া হইতেছে—রৌদ্রে মেলিয়া দেওয়া অতিকায় বেড়াজাল শান্ত রোদে শুকাইতেছে—ফাঁসের এখানে ওখানে রূপোর টুকরোর মতো চিক চিক করিতেছে মাছের আঁশ। নেংটি পরা এবং উলঙ্গ একপাল ছেলেমেয়ে বিহ্বল ভীত চোখে মণিমোহনকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কতকগুলি মাথা-ভাঙা সুপারির গাছ এখানে ওখানে দাঁড়াইয়া, তিন বছর আগে যে সাইক্লোন বহিয়া গেছে তাহারই চিহ্ন বহন করিতেছে যেন। আদিম বর্বরদের উত্তর পুরুষেরা মাথায় টোকা পরিয়া, হাতে হাঁসুয়া

লইয়া এবং কাঁধে লাঙ্গল তুলিয়া নিরীহের মতো কাজ করিতে চলিয়াছে। একজনের হাতে একটা হুঁকা, চলিতে চলিতেই সে তাহাতে গোটাকতক টান মারিল। সব যেন নিজের চক্রপথে ঘুরিতেছে নির্ভুল নিয়মে, এতটুকু ছন্দোপতন হইবার আশংকা বা সম্ভাবনা নাই কোনখানে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ছয় ফুট উঁচু যে সমস্ত মানুষের পায়ের চাপে মাটি টলমল করিত, আজ তাহারা কোথায় গেল?

তাহারা নাই—কিন্তু একেবারেই কি নাই? সময় যখন আসে, তখন তাহারাও কি ধূলা-হইয়া-যাওয়া কবরের তলা হইতে ঠেলিয়া ওঠে না নতুন সাড়া লইয়া, নতুন মত্ততা লইয়া? তাহা হইলে জমিরের চোখে কিসের আগুন দেখিল সে? ওই যে মানুষগুলি অহিংস অনাসক্তভাবে মন্থরগতিতে পথ চলিতেছে—সময় আসিলে ওরা কি অমনি প্রশান্ত স্তিমিত চোখ মেলিয়াই তাকাইয়া থাকিবে? ইহাদের সকলের কাছ হইতেই কি বিন্দু বিন্দু করিয়া আগুন লইয়া জমিরের চোখ অমন দপ দপ করিয়া শিখায়িত হইয়া ওঠে নাই?

ডাকবাংলোর বারান্দায় রাণী বসিয়া আছে। রোগক্লান্ত মুখশ্রীতে একটা শান্ত কমনীয়তা—একটা অপরূপ মাধুর্য। এই তো বাংলা দেশ—করুণ আর স্নিগ্ধ। বর্ধমানের ধানক্ষেতের পাশ দিয়া দ্রুতগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চলিবার সময় চারদিকের পৃথিবীকে যেমনটা মন হয়, ঠিক তেমনই। এখানে ওখানে বিল আর মরা-নদীর জল ঝলমল করিতেছে, তাহার উপরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে খণ্ড চন্দ্রের মধু-জ্যোৎস্না। ছোট ছোট গ্রামগুলি আমবাগানের অন্ধকারে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া আছে। কতগুলি লাল নীল আলো হাতছানি দিয়া ডাকিল—কালো-কাঁকর-ফেলা টিনের-শেড-দেওয়া নগণ্য একটি স্টেশনে আসিয়া দম লইল রেলগাড়ি। সেখান হইতে একফালি মেটে পথ দিয়া বাজারটি পার হইলে ডেলি-প্যাসেঞ্জারের আশ্রয় মিলিবে। পথের ধারে ভাঁটি ফুল ফুটিয়া গন্ধ ছড়াইতেছে—সান্ধ্য-শৃঙ্গারকে উপলক্ষ করিয়া বৈরাগীর আখড়া হইতে উঠিতেছে কীর্তনের সুর। বাড়ির সদর-দরজায় একটুখানি ধাক্কা দিতেই খুলিয়া গেল দরজাটা। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গলবস্ত্রে একটি মেয়ে প্রণাম করিতেছে—তাহার সীমন্তে এয়োতির চিহ্ন গৃহস্থের মঙ্গল আর কল্যাণের বার্তার মতো জাগিয়া আছে। এই রাণী, আর এই বাংলা দেশ।

সপ্রেমে মণিমোহন রাণীর দিকে তাকাইল: এই সকালে উঠেই বাইরে এসে বসেছ যে! ঠাণ্ডা লাগবে না?

রাণী হাসিল: এত রোদ—সকাল কোথায়? ঠাণ্ডা লাগবে না—ভয় নেই তোমার! কী সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে দেখেছ? ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে?

—জ্বর নেই তো?

—না।

রাণীর হাতটা টানিয়া লইয়া মণিমোহন নাড়ী পরীক্ষা করিল, হুঁ, ছেড়ে গেছে। কবিরাজ চিকিৎসা করে ভালো, পাঁচনের গুণ আছে দেখছি। ঝিণ্টু কোথায় ?

—ওই তো।

একটু দূরেই একটা ঝোপ। নাম-না-জানা একরাশ বেগুনী-রঙের ফুলে আকীর্ণ হইয়া আছে। ছোট বড় কতগুলি প্রজাপতি সকালের আলোয় উল্লসিত পাখা কাঁপাইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহাদেরই দু-একটাকে ধরিবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করিতেছে ঝিণ্টু।

—প্রজাপতির সন্ধানে আছে বুঝি ? কিন্তু এদিককার ঝোপজঙ্গল বড় খারাপ, সাপ-খোপ থাকতে পারে। আর ছিনেজোঁক তো লি লি করছেই। ঝিণ্টু, ঝিণ্টু !

—আসছি বাপী !

—না, এক্ষুণি চলে এসো।

অপ্রসন্ন হইয়া ঝিণ্টু ফিরিয়া আসিল—একেবারে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল বাবার কোলের কাছে। ছোট মাথাটির চুলগুলি আঙুল দিয়া আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল—শিকার মিলল ? ধরতে পারলে প্রজাপতি ?

—না বাপী, ভারী দুষ্টু ওরা। ধরা যায় না।

—ধরতে নেই ওদের। ঝিণ্টুকে দু হাত দিয়া হাঁটুর উপর তুলিয়া আনিয়া মণিমোহন বলিল, আমি তোমাকে খুব মস্ত একটা ঘোড়া কিনে দেব, আর একটা মোটর। কেমন, তা হলে তো হবে ?

পিয়ারা চা আর টোস্ট্ লইয়া দর্শন দিল। বিনা বাক্যব্যয়ে একটা টোস্ট্ অধিকার করিল ঝিণ্টু। রাণী হাসিয়া বলিল, ঝিণ্টু কী বলেছে জানো না বুঝি ? ও আর মোটর কিংবা ঘোড়ায় চড়বে না। একেবারে এরোপ্লেনে উঠে কোথায় যেন যুদ্ধ করতে যাবে।

—সত্যি নাকি ? তা হলে পুরোদস্তুর পাইলট ?

ঝিণ্টুর সমস্ত মনোযোগ হাতের পাঁউরুটির টুকরোতেই সীমাবদ্ধ। সংক্ষেপে জবাব দিল, হুঁ। রাণী বলিল, বেশ, তাহলে এই কথাই ঠিক রইল। কালই তোমার জন্যে এরোপ্লেন আনা হবে, তাইতে চড়ে তুমি যুদ্ধ করতে যেয়ো। কিন্তু একটা কথা আছে। সেখানে মাও থাকবে না, বাপীও থাকবে না। কার কোলে উঠবে, কার বুকের মধ্যে ঘুমোবে, শুনি ? আর পিয়ারীও যাবে না—আমাদের চা করে দিতে হবে তো। তা হলে যুদ্ধটা কার সঙ্গে হবে ?

ঝিণ্টু বিশ্বাস করিল না, ভয়ও পাইল না। কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিল, তারপরে বলিল, ঈস্ !

রাণী ছেলেকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিল, দুষ্টু !

মণিমোহন সস্নেহে গভীর দৃষ্টিতে ঝিণ্টুর কচি কোমল মুখের দিকে তাকাইল, তাকাইল রাণীর স্নেহ-সুকুমার নিবিড় দুইটি কালো চোখের দিকে। তাহার সন্তান, তাহার স্ত্রী, তাহার সংসার। বর্ধমানের পল্লীপ্রান্তে সেই শঙ্খধ্বনিমুখরিত বিরামমধুর সন্ধ্যাটির বার্তা যেন ইহারা বহন করিয়া আসিয়াছে। এই চর ইস্‌মাইলে ইহাদের মানায় না—এই খাপ-ছাড়া জগতের বন্যতার মাঝখানে একান্তভাবেই অনাহূত আগন্তুক।

—আর না রাণী, চলো, এখান থেকে ফিরে যাই।

—কেন, কাজ কি শেষ হয়ে গেছে তোমার?

—কাজ তো শেষ করলেই শেষ হয়ে যায়, আবার বাড়ালেই বাড়ে। আরো পাঁচ-সাতদিন থাকতে পারলে অবশ্য ভালো হত, কিন্তু তোমার শরীর টিকছে না এখানে। যা হতভাগা দেশ, একটু ওষুধবিষুধের ব্যবস্থাও তো করা যায় না দরকার হলে। তা ছাড়া আমারও ভালো লাগছে না।

—বেশ তো, তোমার ভাল না লাগে চলো।

—হুঁ, তাই ভাবছি। দেখি, কাল-পরশুর মধ্যেই—

বাংলোর কম্পাউণ্ডের বাহিরে একটা সাইকেল দ্রুতগতিতে আসিয়া থামিল। নামিল ইউনিফর্ম-পরা একটি মূর্তি—পুলিসের লোক নিঃসন্দেহ। চোখেমুখে তাহার একটা জলন্ত ব্যস্ততা। কিন্তু বাংলোর বারান্দায় রাণীকে দেখিয়াই সে চমকিয়া থামিয়া গেল।

—কে আবার এল এই সময়? একটু বিশ্রাম করতেও এরা দেবে না নাকি? ভেতরে যাও তো রাণী। লোকগুলো জ্বালাতন করে মারলে একেবারে। নাঃ, কালই পালাতে হল এখান থেকে। ঝিণ্টুকে টানিয়া লইয়া রাণী ভিতরে চলিয়া গেল।

—পিয়ারী, ছাখ্‌ তো কে এসেছে। ডেকে নিয়ে আয়।

যিনি আসিলেন, তিনি পুলিসের দারোগা। সশ্রদ্ধভাবে একটা নমস্কার করিয়া সবিনয়ে বলিলেন, একটু জরুরী তাগিদেই আপনাকে বিরক্ত করতে হল স্যার, কিছু মনে করবেন না।

পলকের জন্য জমিরের আগ্নেয় দৃষ্টিটা মণিমোহনের চেতনার উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। নতুন প্রাণ, নতুন অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বলিষ্ঠ বুকের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কোন্ অনাগত কালের সুনিশ্চিত পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছে যেন। আর দারোগার মুখে যা প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তা কি রাশীকৃত ক্লান্তি আর অবসাদ? যেন বোঝা টানিতে টানিতে নিজের সম্পর্কে বিস্ময়করভাবে অনাসক্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া যাক, পৃথিবী যেমন করিয়া চলিতেছে তেমনি ভাবেই চলুক। তাহার জীবনটা যেন নিমিত্ত মাত্র—তাহার বেশি এতটুকু কোথাও কিছুই নাই। পুলিসের চাকুরি আর ফকিরিটা তাহার কাছে একই পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রয়োজন হইলেই সব ছাড়িয়া-

ছুড়িয়া কংল অবলম্বন করিতে পারে।

মণিমোহন বলিল, বলুন, কী দরকার ?

অত্যন্ত সংকোচে দারোগা বসিলেন। ঘর্মাক্ত মলিন টুপিটা রাখিলেন টেবিলের উপরে —শ্রান্তস্বরে বলিলেন, আমি মামুদপুর থানার দারোগা।

—চা খাবেন এক পেয়ালা ?

—না, থ্যাঙ্কস স্যার। চা আমি খাই না।

—তা হলে কী বলছিলেন বলুন।

দারোগা বড় করিয়া একটা নিশ্বাস টানিলেন—যেন বাতাস হইতে খানিক অক্সিজেন আকর্ষণ করিয়া নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করিয়া লইতে চান। আবার জমিরের ছায়ামূর্তিটা মণিমোহনের চেতনার উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। ইহারা দুইজন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমানে সমানেই তো ? একজন নতুন জীবনের আলোকে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, আর একজনের সর্বাঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু শ্রান্তির দ্যোতনা। জয় হইবে কার ?

দারোগা বলিলেন, আগস্ট্ মুভমেণ্টের ব্যাপার আশা করি জানেন স্যার।

—জানব না কেন, ভারতবর্ষের মানুষ তো। কিন্তু কী হয়েছে, এখানে আবার নতুন করে একটা ওইরকম আন্দোলন দেখা দেবে নাকি ?

—কী যে বলেন স্যার।—গর্বে গৌরবে দারোগা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের সুর লাগিল : আমার এলাকায় ট্যাঁ ফোঁ করতে আমি দেব না, সেদিক দিয়ে শক্ত আছে বনোয়ারী দারোগা।

অকারণেই মণিমোহনের ঠোঁটের আগায় সূক্ষ্ম একটুকরা হাসি খেলিয়া গেল : তা হলে তো আর কথাই নেই ; কিন্তু আপনার সমস্যাটা কোথায় ?

—তাই বলছিলাম স্যার। আমার এলাকায় না হলেও আমাদের জেলাতে নানারকম ট্রাবল্স হয়ে গেছে, আপনি বোধ হয় সবই জানেন। খবর পেয়েছি, ওখান থেকে জনকয়েক অ্যাবস্কণ্ডার এসে কলুপাড়ায় লুকিয়ে আছে। সদরে খবর দেওয়ার সময় নেই, তার আগেই হয়তো পালাবে। তাই আপনি একটু হেল্প করবেন, মানে লীড্ করবেন আমাদের। একজন রেস্পন্সিব্ল অফিসার যখন আছেন—

মণিমোহন অপ্রসন্ন হইয়া গেল। বড় ঝামেলা—অত্যন্ত বিরক্তিকর। তা ছাড়া এ তার কাজও নয়। বলিল, আপনারাই যান না। আমাকে আবার এর ভেতরে কেন ?

—বুঝতে পারছেন না স্যার। রিস্কি ব্যাপার তো—হয়তো ফায়ার করতে হবে। আপনি থাকলে আমার দায়িত্বটা কমে, সব দিক দিয়েই সুবিধে হয়।

—আচ্ছা বেশ, যাব আমি।—মণিমোহনের মুখের উপর দিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিল : কখন যেতে চান ?

—শুভস্য শীঘ্রম্ স্যার—একসারি দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন দারোগা : একটা পাকা খবরের জন্য অপেক্ষা করে আছি। লোকও পাঠিয়েছি। যদি ডেফিনিট্ হতে পারি, তা হলে কাল রাত্রেই রেইড্ করব। আজ আমি সদরে একটা টেলিগ্রাফ করে দিচ্ছি—দেখি কী জবাব আসে। ওখান থেকে লোক পাই ভালোই, নইলে যা করবার আমাদেরই করতে হবে।

—তা হলে আগেই আমাকে খবর দেবেন।

—দেব স্যার, নিশ্চয় দেব। সে আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আর আপনার কোনো অসুবিধেই হবে না—সমস্ত বন্দোবস্ত আগে থেকেই ঠিক করে রাখব আমরা। আপনি শুধু আমাদের সঙ্গে থাকবেন, তা হলেই জোর পাবো আমরা—বুঝতে পারছেন না?

—বুঝতে পারছি।—ক্লান্তি-তিক্ত মণিমোহন প্রসঙ্গটা থামাইয়া দিবার জন্যই যেন উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, তাই হবে।

দারোগা টুপিটা তুলিয়া লইলেন টেবিলের উপর হইতে। এত উৎসাহ উদ্দীপনা সত্ত্বেও মণিমোহনের মনে হইল দারোগার চোখের কোণায় ক্লান্তির মসীরেখাটা যেন গাঢ়তর হইয়া পড়িতেছে।

—তা হলে আসি স্যার, নমস্কার। কিছু মনে করবেন না।

—না, না, মনে করবার কী আছে। এ তো আপনার ডিউটি—আমারও। আচ্ছা, নমস্কার।

প্রত্যুত্তরে দারোগা আবার খানিকটা বিগলিত হাসি হাসিলেন, তারপরে সাইকেলে উঠিয়া বেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহার অনেক কাজ—এতটুকু সময় নাই।

রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া শূন্য চোখে নদী আর দিগন্তের দিকে তাকাইল মণিমোহন। আবার এক নতুন বিড়ম্বনা দেখা দিল—ফেরারী ধরিয়া বেড়াইতে হইবে তাহাকে। যাহারা দেশে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে, যুদ্ধকালীন নিরাপত্তায় বিঘ্ন সঞ্চার করিয়াছে—অপরাধী তাহারা নিশ্চয়ই—শাস্তি তাহাদের পাইতেই হইবে।

কিন্তু ইহারা কাহারা? পলকের জন্য তাহার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল : কী ধাতু দিয়া এই ছেলেগুলি তৈরি হইয়াছে? ঘর থাকিতেও ঘর ভাঙিয়া মৃত্যু এবং রাজরোষের অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল কী কারণে এবং এই সর্বনাশা প্রেরণাই বা পাইল কোথা হইতে?

মানস-দৃষ্টির সামনে ভাসিয়া গেল আগা খাঁ প্রাসাদের বন্দীশিবির। রুগ্না পত্নীর মৃত্যু-শয্যার পাশে ধ্যান-স্তিমিত নেত্র মেলিয়া বসিয়া আছে **Half-naked Fakir of India**—তাহার মুখের উপরে প্রসন্ন সূর্যালোক স্বর্ণ-কিরণের মতো বিচ্ছুরিত হইতেছে।

ছয়

অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া বলরাম ঘরে ফিরিলেন। কিছুই বোঝা যাইতেছে না—কেমন একটা অনিশ্চয়তায় ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে মন। কেন এই যুদ্ধ? মানুষ এমনভাবে কিসের জন্য লড়াই করিয়া মরে? বোমা আর কামানের মুখে ঘরবাড়ি উড়াইয়া দেয়, রক্তে ভাসাইয়া দেয় মাটি? দেশ আর গ্রাম শ্মশান হইয়া যায়? কীই বা হয় যুদ্ধে একটা বিরাট জয়লাভ করিয়া? যে জিতিল, মড়ার হাড়ের উপরে সিংহাসন বসাইয়া এমন কোন্ অপূর্ব স্বর্গসুখটা সে ভোগ করে?

কে যুদ্ধ চায়? বলরাম চান না—মণিমোহন চায় না, চর ইস্‌মাইলের কেউ চায় না, এমন কি নির্বোধ রাধানাথ পর্যন্ত চায় না। তবু কেন এই যুদ্ধ?

সমস্ত ব্যাপারটাকে সমাধানহীন একটা বিরাট গোলকধাঁধার মতো মনে হয় তাঁহার! কিছুদিন আগে এই প্রশ্নটাই তিনি করিয়াছিলেন মণিমোহনকে।

অত্যন্ত করুণাভরে মণিমোহন হাসিয়াছিল। অনেকগুলি কথাই সে বলিয়াছিল—উপনিবেশ, বাণিজ্য-বিস্তার, আর্থিক একচেটিয়া সুবিধা—বলশেভিক বিনাশ, গণতন্ত্রের প্রসার ও রক্ষা এবং আরো অনেক কঠিন কঠিন ব্যাপার!

বলা বাহুল্য, বলরাম কিছু বুঝিতে পারেন নাই। চরক-সংহিতা, ভেষজ-বিজ্ঞান, নাড়ী-জ্ঞান-প্রদীপিকা অথবা নিদান-তত্ত্বে এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ছাগলাদ্য ঘৃত তিনি নির্ভুলভাবে তৈরি করিতে পারেন, সহস্রবার পারদকে জারিত করিয়া লইবার প্রক্রিয়া তাঁহার জানা আছে, রস-সিন্দূর আর মকরধ্বজের তফাতটা বলিয়া দিতে পারেন একবার চোখ দিয়া দেখা মাত্র। কিন্তু যুদ্ধ-বিজ্ঞান নিদান-তত্ত্বের চাইতেও কঠিন বলিয়া তাঁহার মনে হইল।—তা ছাড়া, মণিমোহন হাসিয়া শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করিয়াছিল, যুদ্ধটা হচ্ছে একটা জৈবিক প্রয়োজন—দার্শনিকদের এই মত।

বলরাম হাঁ করিয়াই ছিলেন। বলিলেন, তাই নাকি? তা বেশ। কিন্তু যারা যুদ্ধ করছে না তাদের এত কষ্ট দেওয়া কেন? ভাত নেই, কাপড় নেই—

—তারও দরকার আছে। একজন ডাচ্ দার্শনিক—ডাচ্ বোঝেন, ওলন্দাজ?

বলরাম বোঝেন না। তবু মাথা নাড়িতে হইল।

—স্টিন্‌মেৎস্ তাঁর নাম। তাঁর বই আছে একটা—ফিলসফি অব্ ওয়ার! তাতে তিনি বলেছেন, যুদ্ধের সময় অসামরিকদের খুব বেশি করে কষ্ট দাও—খেতে দিও না—শুধু চোখ দুটো রেখে দাও জল ফেলবার জন্যে। কেন জানেন?

—কেন?

—যাতে তারা মনে করতে পারে যে তাদের এই দুর্গতির জন্তে শত্রুরাই দায়ী। ফলে শত্রুপক্ষের প্রতি তাদের মন বিদ্বেষ ও হিংসায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। আর তা হলেই যুদ্ধ-জয় অনিবার্য। মুসোলিনীও এই কথাই বলেছেন। বুঝলেন তো?

বলরাম বুঝিলেন না। বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও লাভ নাই। যাহারা পণ্ডিত, তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব অনুকূল নয়। কোনো একটা জিনিসকে তাহারা সহজ করিয়া বুঝাইতে পারে না। কোথা হইতে শক্ত শক্ত ব্যাপার আমদানি করিয়া আগাগোড়া সব কিছুকে দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য করিয়া তোলে। যুদ্ধ কেন হয়, তাহার পিছনে এই যে বিরাট তত্ত্ব আর তথ্যের অরণ্য লুকাইয়া আছে একথা কোনোদিন বলরামের কল্পনাতেই আসিয়াছিল নাকি!

কিন্তু সেই হইতে মণিমোহনকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা তিনি ছাড়িয়াই দিয়াছেন।

সাপ্তাহিক যে কাগজটা তিনি পড়েন, তাহার পাতায় পাতায় প্রতিদিন দেখা দেয় অস্পষ্ট আর রহস্যময় রাশীকৃত খবর। পৃথিবীতে এত জায়গা, এত বিচিত্র রকমের নাম আছে, এও কি কোনোদিন কল্পনায় আসিয়াছিল! কোনো-কোনো নাম এমন উৎকট যে উচ্চারণ করিতে গেলে মানুষের আক্কেল-দাঁত অবধি খট খট শব্দে নড়িয়া ওঠে। অথচ এই দুইটা বছরে বিরাট দুনিয়ার ভূগোল বলরামের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে। জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানভাণ্ডার যে পুরাদমেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবে কে?

কিন্তু কী হবে! জ্ঞান বাড়িতেছে বাড়ুক, দৈনন্দিন সমস্যার কোনো সমাধানই তো চোখে পড়িতেছে না। যুদ্ধটা যেন বাধিয়াছে প্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিসপত্রের সঙ্গে। কামানে বন্দুকে মানুষ মরিতেছে, মরিতেছে চাল, ডাল, নুন, আটা, তেল, কয়লা আর কুইনিন।

ভাবিয়া বলরাম আর থই পান না। চুলকাইতে চুলকাইতে টাকের উপরে খানিকটা রক্তপাতই করিয়া ফেলিলেন তিনি। অত্যন্ত বিব্রত আর বিপন্ন মুখে তাকিয়াটায় তিনি ঠেসান দিয়া বসিলেন। দেওয়ালের গায়ে কাঁচভাঙা ঘড়িটা স্তব্ধ হইয়া আছে—একটা বড়সড় টিকটিকি পোকার সন্ধানে পেণ্ডুলামটার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই সেটা যেন কুম্ভকর্ণের মতো অকস্মাৎ যুগনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। অত্যন্ত বিরক্তভাবে মিনিট খানেক কটাকট শব্দ করিয়া এলোমেলো খানিকটা সময় জানাইয়া দিয়া আবার অনন্ত নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িল ঘড়িটা।

অন্যমনস্কভাবে সেদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন বলরাম। বড় একটা হাই তুলিয়া তাকিয়া হইতে পিঠ খাড়া করিয়া উঠিয়া বসিলেন। যেন কী একটা ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হইয়া হাঁক দিলেন, রাধানাথ ?

—যাই বাবু—বাহির হইতে সাড়া দিয়া রাধানাথ প্রবেশ করিল। বৃহদাকার একটা কাদামাখা মাগুর মাছ তাহার হাতের মধ্যে ছটফট করিতেছে। মুখটা বিকৃত করিয়া কহিল, উঃ, কাঁটা দিয়েছে শালার মাছ।

—মাছ ধরছিলি বুঝি ? বাঃ বেশ, বেশ।—বলরাম খুশি হইয়া উঠিলেন : খুব বড় মাগুর মাছ তো ! পেলি কোথায় রে ?

রাধানাথ বলিল, কাঁঠাল গাছে।

—কাঁঠাল গাছে !

—তা ছাড়া আবার কি ? শালারা কি এমন জাত যে ধরা দেবার জন্যে হাঁ করে বসে আছে ? এ ঘরের মাছ।

দপ করিয়া বলরামের উৎসাহটা নিবিয়া গেল।

—ঘরের মাছ ? তা হলে বাইরে গেল কেমন করে ?

—তা আমি কী করব বাবু ? রাধানাথ নিজেকে সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইল একটা : আমার কী দোষ ? পরশু দিন এককুড়ি কিনে হাঁড়িতে জীইয়ে রেখেছিলাম, আজ সকালে উঠে দেখি দুটো না তিনটে রয়েছে। হাঁড়ির ঢাকা উল্টে ফেলে রাতারাতি চম্পট দিয়েছে সব। তারই একটাকে অনেক খুঁজেপেতে ধরে আনলাম।

—বটে, বটে !—রোষে বলরাম বিকচ্ছ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন : মাছগুলো আকাশ থেকে পড়ে, তাই না ? পয়সা দিয়ে ওগুলোকে কিনতে হয় না, না ? দেখছি তুই ব্যাটাই আমাকে ফতুর করবি।

—তা কী হবে ! বকবক করলে তো মাছ আসবে না।—নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে প্রস্থানের উপক্রম করিল রাধানাথ।

—যাচ্ছিস কোথায় ? সর্বনাশ যা করবার তা তো করেছিস, এখন এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা হতভাগা।

—গালমন্দ করবেন না, সেজে এনে দিচ্ছি—গজেন্দ্র-গমনে রাধানাথ বাহির হইয়া গেল। পাজী, বদমাস। নিজের মনে গালিবর্ষণ করিয়া বলরাম ক্রোধটাকে প্রশান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোনো লাভ নাই ওকে গালিমন্দ করিয়া। চাকরবাকর লইয়া ঘর-সংসার করিতে গেলে এ সমস্ত ক্ষতি অপরিহার্য। কোনো জিনিসের জন্ম দরদ নাই, গৃহস্থের জন্য মায়া নাই এতটুকুও। প্রাণ ভরিয়া চুরি-চামারি করিতেছে নিশ্চয়।

তবু রাধানাথ না থাকার অবস্থাটাও কল্পনা করা চলে না। বিশ বছর ধরিয়া ওরই সঙ্গে সংসার করিয়া আসিতেছেন, মানাইয়াও লইয়াছেন একরকম। মুখে মুখে উত্তর করে—ওই ওর দোষ; তবু বলরামের ধাতটা একরকম চিনিয়াছে, যেমন করিয়া হোক

চালাইয়া নয়। মাঝখানে শুধু ছেদ পড়িয়াছিল দিন কয়েক, শুধু কয়েকটা মাস পারিবারিক জীবনের একটা স্নেহ-মধুর আস্বাদ পাইয়াছিলেন তিনি। তার পরেই—

বুকের মধ্যে একটা ব্যথার চমক টনটন করিয়া উঠিল। শুধু মানসিক নয়—শারীরিক-ভাবেও কয়েক বছর ধরিয়া এই একটা নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। এ কি আসন্ন মৃত্যুর সংকেত? বয়স বাড়িয়াছে, তাই কি অন্তিমের আহ্বান আসিয়া বুকের মধ্যে তাহার দাবিটাকে জানাইয়া দিয়া যায়?

—বাবু তামাক।

—রেখে যা।

ফরসিতে তামাক পুড়িতেছে। নলটা মুখে করিয়া বলরাম ভাবিতে লাগিলেন একটা কথা। এতদিন ভাবিয়াও সে কথার কোনো উত্তর মেলে নাই তাঁহার কাছে। কেন চলিয়া গেল মুক্তো? সজ্ঞানে কি অপরাধ তিনি করিয়াছিলেন যাহার জন্য সমাজ-ধর্ম সব ছাড়িয়া মুক্তো এমন একটা অস্বাভাবিক জীবনকে বাছিয়া লইল? জাতি ছাড়িল, সমাজ ছাড়িল, বিগত-যৌবন নুরুল গাজীর সঙ্গে বাহির হইয়া গেল? অপরাধ তিনি হয়তো করিয়াছিলেন, কিন্তু সেজন্য কোনো দায়িত্বই কি মুক্তোর ছিল না? তা ছাড়া সে অপরাধের এমনি করিয়া কি প্রায়শ্চিত্ত হইল? মুক্তোই কি সুখী হইতে পারিয়াছে?

ডি-সিল্‌ভার ছেলে ডি-ক্রুজা সংকুচিত হইয়া ঘরে ঢুকিল। ভাবনার জালটা ছিঁড়িয়া বলরাম তাহার দিকে তাকাইলেন।

—কি রে, কী খবর?

—আজ বাবাকে দেখতে যাবেন না একবার?

—কেন, কী হয়েছে আবার! জ্বর ছাড়ে নি?

ম্লানমুখে মাথা নাড়িয়া ক্রুজা বলিল, না।

ফরসির নল দিয়া পেশাদারী ভঙ্গিতে খানিকটা ধূমোদ্গীরণ করিলেন বলরাম: জ্বর ছাড়ল না, তাই তো! তা পাঁচনটা খাইয়েছিলি ঠিকমতো?

—হুঁ।

—আর পথ্য? সাবু?

—না, সাবু পাই নি।

—তা তো পাবিই না—নিরীহ ডি-ক্রুজার উপরে বলরাম সমস্ত ক্রোধ এবং বিরক্তি একেবারে বর্ষণ করিয়া দিলেন: বাপের জন্য এতটুকু দরদ বা মায়া আছে তোর! মরে যাবে নাকি লোকটা?

—কী করব, কোথাও তো পাচ্ছি না!

—যা, আবার খোঁজ গিয়ে। পথ্য নেই, কিছু নেই, খালি খালি ওষুধেই কারো জ্বর

পারে নাকি কখনো ? যা, আমি যাবো বিকেলবেলায়। আর সাবধান, মুরগীর ঝোলটোল খাওয়াসনি, তা হলে বাপ কিন্তু সোজা মেরীর পাদপদ্মে গিয়ে পৌঁছুবে, এই বলে রাখলাম।

*　　　*　　　*　　　*

নৌকাটা থামিতেই গঞ্জালেস্ তীরে নামিয়া পড়িল। তারপর গ্রামের দিকে আগাইতে গিয়াই সে চমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

এই তো চর ইস্‌মাইল। দশ বছর আগে সে যাহাকে পেছনে ফেলিয়া গিয়াছিল—একটা তীব্র অপমান-বোধ এবং প্রতিশোধের কঠিন সংকল্প লইয়া। মরা রক্তে সেদিন বিদ্রোহী প্রাণের বান ডাকিয়া গিয়াছিল। পর্তুগীজদের মেয়েকে, তাহার ভাবী স্ত্রীকে কতকগুলা বর্মী আসিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল ! কিছু করিতে পারে নাই গঞ্জালেস্, শুধু পাথরের মূর্তির মতো চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আর চিত্র করা পুতুলের মতো দুইটা বিস্ময়-বিহ্বল চোখ মেলিয়া শুনিয়াছিল সেই অসহ্য লজ্জা আর অপমান-মেশানো পরাজয়ের কাহিনী।

ডি-সুজা পাগলা হইয়া গিয়াছিল ! তাহার ঘোলা চোখ যেন রক্ত দিয়া মাখানো, বন্য জন্তুর মতো দুর্গন্ধ নিশ্বাস ফেলিতেছে। অকারণে হা হা করিয়া উঠিয়াছিল খানিকটা। জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এর শোধ দিতে পারবে, লিসিকে ফিরিয়ে আনতে পারবে তুমি ?

তাহার চোখের দিকে চাহিয়া শরীরের মধ্য দিয়া যেন বিদ্যুতের তীব্র চমক খেলা করিয়া গিয়াছিল গঞ্জালেসের। এক চুমুক বিষাক্ত হুইস্কি পান করিলে যেমনটা হয় ঠিক তেমনই। মনে পড়িয়া গিয়াছিল দিগ্বিজয়ী পূর্ব-পুরুষদের কথা। যাহাদের পায়ের নিচে হাজার বুনো ঘোড়ার মতো সমুদ্র গর্জাইয়া উঠিতেছে—নোনা ফেনার রাশি গড়াইতেছে তাহাদের মুখ হইতে ; আর সেই ঘোড়ার যাহারা আসোয়ার, তাহাদের মাথায় কালো চামড়ার টুপি, তাহাদের চোখের দৃষ্টি শকুনের চাইতেও তীক্ষ্ণ এবং দূরগামী। বজ্র-কঠিন হাতের মধ্যে ক্ষুধার্ত বন্দুক শিকারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কবে দূর সীমান্তরেখায় বকের মতো পালের সারি উড়াইয়া বাণিজ্যবহর দেখা দিবে। তাহাদের জাহাজের ডেকের উপরে লোহার কামান গলা বাড়াইয়া আছে—বাঘের জিভের মতো টকটকে লাল তাহাদের পালে বিকট নরমুণ্ড আর অস্থিচিহ্ন।

ঠিক তাহাদের মতোই সংকল্প লইয়া, মনের মধ্যে তাহাদের মতোই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া গঞ্জালেস্ ভাসিয়া পড়িল লিসির সন্ধানে। চট্টগ্রাম, আরাকান, বর্মা। কিন্তু সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীতে এত অসংখ্য মানুষ, এত অসম্ভব কোলাহল আর কলরব ; যে একবার হারাইয়া যায় ডাকিলে সে আর শুনিতে পায় না—কলরবমুখর জনতায় লিসিও হারাইয়া গিয়াছে।

চেষ্টা সার্থক হয় নাই। আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইয়াছিল ডি-সুজা। কিন্তু গঞ্জালেসের মনের মধ্যে যে আঘাত বাজিয়াছিল সেটাকে তো সে ভুলিতে পারিল না! জীবন যে পথে চলিতেছিল, তাহাতে সুর কাটিয়া গেছে। কী যেন নাই, কিসের অভাবে নিজেকে একান্তভাবে ব্যর্থ আর অভিশপ্ত বলিয়া মনে হয়। সেই মানসিক অস্বস্তিটার হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্যই যেন গঞ্জালেস্ প্রাণপণে মদ ধরিল—একান্তভাবে তলাইয়া গেল উদ্দাম একটা মত্ততার মধ্যে। তার পরের দিনগুলি সব অস্পষ্ট—কিছু দেখা যায়, কিছু দেখা যায় না—যেন একসারি ছায়ামূর্তির মিছিল চলিয়াছে। যুদ্ধ আসিল, বোমা পড়িল, গঞ্জালেস্ চোখের সামনেই দেখিল রক্ত আর আগুনের বীভৎস লীলা। তারপরে হঠাৎ কী যে হইয়া গেল, কথা নাই, বার্তা নাই, হঠাৎ একদিন নৌকা ভাসাইয়া গঞ্জালেস্ আসিয়া দর্শন দিল চর ইস্‌মাইলে।

কিন্তু চর ইস্‌মাইলে কেন আসিল সে? দশ বছর পরে দিগন্তবিস্তীর্ণ নদীর পঙ্কস্তরের উপর দাঁড়াইয়া গঞ্জালেস্ এই কথাটাই ভাবিতে লাগিল: কোন্ খেয়ালে সে দূর সমুদ্রের মোহানার মুখে এই অখ্যাত-অজ্ঞাত দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল? অথচ যদি সে কলিকাতায় যাইত, তাহা হইলে একটা আশাভরসা ছিল। এখানে আশ্রয় পাইবে কোথায়, চলিবেই বা কেমন করিয়া? আর সব চাইতে দরকারী কথা এই: হুইস্কির সদাব্রত এখানে মিলিবে কোথা হইতে?

এখানে আসিবার কী দরকার ছিল তাহার? লিসির স্মৃতি? সে স্মৃতি কী এতই মনোরম—যে জন্যে এখানে না আসিলে রাত্রে তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছিল? আসল কথা—সেই রাত্রের বিভীষিকা আর নেশার মাদকতা একটা অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত করিয়াছিল তাহার স্নায়ুতে, তাই অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই সে সোজা চর ইস্‌মাইলের উদ্দেশেই নৌকা ভাসাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এখন কোথায় যাইবে সে, কী করিবে?

গঞ্জালেস্ নিজের মনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শিস্ দিতে লাগিল।

এমন সময় তাহার দেখা হইল ডি-ক্রুজার সঙ্গে।

চোখের দৃষ্টি সংকুচিত করিয়া গঞ্জালেস্ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিল ডি-ক্রুজাকে। তারপর ডাকিল, এই ছোকরা, শুনে যা, আয় ইদিকে।

বিচিত্র সম্ভাষণে ক্রুজা চমকিয়া দাঁড়াইল। মুখের উপরে বিদ্রোহ ঘনাইয়া তুলিয়া বলিল, আমাকে ডাকছ?

—তা ছাড়া কাকে ডাকব? ওই সুপুরি গাছটাকে নাকি?

—কেন, কী দরকার?

—তোদের বাড়ি কোথায়?

—জানি না—উদ্ধত ভাবে কুজা ফিরিবার উপক্রম করিল।

—এই, দাঁড়া—খপ করিয়া একটা থাবা মারিয়া তাহার কাঁধটা চাপিয়া ধরিল গঞ্জালেস্ঃ বেশি বখামি করিস্ তো এক চাঁটিতে চোয়াল উড়িয়ে দেব। চিনিস আমাকে?

উঁ-কুজা চেনে না। কিন্তু গঞ্জালেসের আরক্ত চোখ এবং প্রকাণ্ড একখানা হাতের স্পর্শে চিনিতে তাহার বেশিক্ষণ সময় লাগিল না। ক্ষীণস্বরে বলিল, কী করতে হবে?

—আমি তোর মামা, বুঝলি? তোদের বাড়িতে বেড়াতে এলাম।

কুজা হাঁ করিয়া রহিল।

—অমন করে তাকিয়ে আছিস কি? নে, নৌকা থেকে জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে ফেল্ সব, তারপর নিয়ে চল তোদের বাড়িতে। ভয় নেই, তুইও বাদ পড়বি না।

পকেট হইতে একটা চকচকে নতুন টাকা বাহির করিল গঞ্জালেস্। আঙুলের উপর সেটাকে বার কয়েক নাচাইয়া টং টং করিয়া বাজাইল। বলিল, দেখছিস?

কুজা কী ভাবিল কে জানে, তারপর নিঃশব্দে নৌকার দিকে অগ্রসর হইল।

দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রে নদীর বিশাল জলরাশি তখন জ্বলিতেছে। আর তেমনি একটা উন্মত্ততার খরদাহ জ্বলিতেছিল গঞ্জালেসের চোখেও।

সাত

দুপুরবেলা আকাশ কালো করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল।

নদীর জলে মেঘের ছায়া বিকীর্ণ করিয়া, তাল-নারিকেলের বীথিকে ধারা-বর্ষণে স্নিগ্ধ করিয়া এবং তেঁতুলিয়ার কলতরঙ্গে উদ্দামতা জাগাইয়া ঘণ্টা দু-তিন বেশ একপসলা ঝরিয়া গেল। কিন্তু আকাশের কান্না থামিল না—থাকিয়া থাকিয়া এক একটা দমকা বহিতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে ঝরিতে লাগিল ঝির-ঝির-ঝির—

সন্ধ্যা ঘনাইতেছে অসময়ে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া বিভ্রান্ত বিহ্বল একদল কাক নারিকেল-পুঞ্জের ওপর তারস্বরে চিৎকার করিতে করিতে গোল হইয়া উড়িতেছে—বাতাসের ঝাপ্টায় ওদের কারো বাচ্চা নিচে পড়িয়া গেছে বোধ হয়। তাণ্ডব-তালে ব্যাঙের কনসার্ট বাজিতেছে—যেন পৃথিবীর সমস্ত কলরব-কোলাহলকে যেমন করিয়া হোক ছাপাইয়া উঠিবার সংকল্প করিয়াছে ওরা।

কর্মহীন অলস দিন। মাসটা যদিও আষাঢ় নয়—তবু এই আশ্চর্য জগৎ, সীমাহীন অন্ধ আকাশ, বিশৃঙ্খল একটা বিরাট নদী, সব মিলাইয়া নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ নির্বাসিত মনে হয়। কবিরা কল্পনা করিতে পারে শাশ্বত বিরহের স্মৃতি-মধুর একটা মীড়মূর্ছনা। যেন। রাণী তো কাছেই, তবু ভাবিতে ভালো লাগে: চঞ্চল ভ্রমরের মতো দুটি চোখের উৎসুক

দৃষ্টি দিগন্তে মেলিয়া দিয়া কে দেখিতেছে নবঘন শ্যামশোভাকে—কোনো রত্নপুরীতে কে যেন 'মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতু কামা—' কিন্তু 'তন্ত্রীমার্দ্রা নয়ন সলিলৈঃ—'। কালিদাস কখনো চর ইস্মাইলে আসিবার সুযোগ পান নাই, যদি আসিতেন তাহা হইলে রামগিরির চাইতে এটাকে ঢের বেশি অনুকূল পরিবেশ বলিয়াই তাঁহার মনে হইত। কুর্চি ফুল নাই-ই থাকিল, কিন্তু নাম-না-জানা যে মিষ্টি একটা বুনো ফুলের গন্ধ বাতাসে আসিতেছে—

কোথায় রামগিরি—কোথায় কুর্চি—কোথায় বা 'প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিক বনিতা।' তৈলাক্ত হ্যাট, বিবর্ণ ওয়াটারপ্রুফ্ এবং জুতার ওপরে একরাশ কাদা লইয়া মামুদপুর থানার দারোগার ঘটনাস্থলে প্রবেশ। অলকা হইতে যক্ষ নয়, পাতাল হইতে রক্ষ আসিয়া দর্শন দান করিল।

মণিমোহন বলিল, বসুন।

—না স্যার, বসব না। অনেক কাজ, বসবার সময় হবে না। শুধু আপনাকে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিতে এলাম।

—কোন্ কথাটা?

—সেই রেইডের ব্যাপারটা।

—ওঃ—মণিমোহনের মনটা চমকাইয়া উঠিল। আর কি দিন ছিল না! আকাশ বাতাস ঘিরিয়া এখন স্বপ্ন ঘনাইতেছিল, এখন সমস্ত শিরা-গ্রন্থিকে শিথিল করিয়া দিয়া আশ্চর্য একটা অনুভূতির মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে তলাইয়া যাইতে ভালো লাগিতেছিল—বাতাসে নাম-না-জানা ফুলের মৃদু মধুর অলস সুরভির মতো মনে পড়িতেছিল কাকে? এম্নি একটা সন্ধ্যায় দুটি বাহুর নির্মম পেষণে কোমল বুকের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল কে, কার সুগন্ধি নিশ্বাস মুখের ওপরে ছড়াইয়া পড়িয়া নেশায় যেন আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল?

দারোগা বলিলেন, জল বৃষ্টি, আপনার একটু কষ্টই হবে স্যার। কিন্তু কী করা যায়—এর চাইতে ভালো দিন আর হবে না।

—হুঁ।

—অ্যাবস্‌কণ্ডার, ঠিক তো নেই, কখন কোন্ দিকে রাতারাতি সটকে পড়ে। আমরা অবশ্যি কড়া নজর রাখছি, কিন্তু যা দেশ—বোঝেনই তো সব। কোনো নদীনালা দিয়ে একবার ছটকে বেরুতে পারলেই গেল। তারপর সমুদ্রের মোহানায় কে কাকে খুঁজে বেড়াবে বলুন। এ তো আর ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের রাস্তা কিংবা ই-বি-আরের রেলগাড়ি নয় যে চারদিকে নজর দিলেই—

—বুঝেছি। কথাটাকে মাঝখানেই মণিমোহন থামাইয়া দিল। হঠাৎ আশ্চর্যভাবে মনে

পড়িল ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতার উক্তি : আমার দেহ শুধু শহর নয়, আমার দেহ শুধু নাগরিক-সমষ্টিও নয় ; ভারতবর্ষের প্রাণ ছড়াইয়া আছে অজ্ঞাত অখ্যাত অগণ্য পল্লী-জনপদের প্রান্তে প্রান্তে, সেখান হইতে একদিন বৃহত্তর মহাজীবনের উদ্বেল তরঙ্গ আসিয়া ভাসাইয়া দিবে এই—

চকিতে মণিমোহন অনুভব করিল একটা জিনিস—যা এতদিন সে ভাবিতেও পারে নাই। চর ইস্‌মাইল শুধুই কি একটা পাণ্ডববর্জিত দেশ—ভদ্রলোকের কল্পনার বাহিরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপমালার ন্যায় আশ্চর্য রহস্যপুরী ? অথবা বিরাট এই বাংলা দেশের একটা অলক্ষ্য প্রাণকেন্দ্র—যেখান হইতে একদিন উজান স্রোত বহিয়া জীবনে এবং চিন্তায়, রাষ্ট্রে এবং সভ্যতায় নতুন প্লাবন বহাইয়া দিবে ? এতদিন তো শহরই দু'হাতে দান করিয়া আসিতেছে, এবার কি পল্লীর সেই ঋণ পরিশোধের পালা দেখা দিল ?

নিঃশব্দে একটা সিগারেট বাহির করিয়া মণিমোহন ধরাইল, ধোঁয়ার জাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া চলিল, মেঘম্লান আকাশের দিকে।

—তা হলে আজকেই ঠিক ?

—আজকেই।

—শহরের কোনো খবর পেলেন ?

—এখনো পাইনি। টেলিগ্রাম অফিস সেই ওপারে—মানে একবেলার পথ। তা ছাড়া যুদ্ধের চাপে লাইন এমন এন্‌গেজড যে, কখন গিয়ে তার পৌঁছুবে তার ঠিকঠিকানা নেই। অথচ আর দেরি করাও ঠিক নয়—কখন যে ফসকে হাত থেকে পিছলে যাবে বলা যায় না। তাই বলছিলাম আর দেরি না করে যা পারি আমরাই করে ফেলি।

পিয়ারী আসিয়া আলো জ্বালাইয়া দিয়া গেল। বর্ষার দিনে রাণী নিশ্চয় খিচুড়ির বন্দোবস্ত করিয়াছে—পেঁয়াজ আর আধসেদ্ধ মুগের ডালের একটা রোমাঞ্চকর গন্ধ আসিতেছে। আর টেবিলের ওপরে রাখা দারোগার তৈল-মলিন টুপিটা হইতে ভাসিতেছে ঘামের দুর্গন্ধ। লণ্ঠনের আলোয় দারোগার চোখের নিচে অত্যন্ত গাঢ় একটা কালিমার রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—ক্লান্ত অবসাদ, জোয়াল-টানিয়া-চলা নির্বোধ পশুবিশেষের অবসন্ন প্রতিচ্ছবি।

মণিমোহন কহিল, ধরতে পারলে আপনার নিশ্চয় কিছু আশা আছে।

—তা তো আছেই।—অত্যন্ত খুশি হইবার চেষ্টা করিয়া দারোগা হাসিলেন : ইন্সপেক্টরী তাহলে এবার হয়ে যেতে পারে স্যার। আর সাত-আট বছরের মধ্যেই তো রিটায়ার করতে হবে, এখনো যদি চান্স না পাই তা হলে আর—

—অনেক দিন সার্ভিস তো হয়ে গেল আপনার, এত দিন চান্স্ পেলেন না কেন ?

—কপাল স্যার, কপাল।—দারোগা ললাটে করাঘাত করিলেন : কত জুনিয়ার চোখের

সামনে দিয়ে টপাটপ্ টপকে গেল, আমি বসে বসে দেখলাম। কবার তো নমিনেশনও গেল কিন্তু ধোপে টিঁকল না। আসল ব্যাপার কী জানেন? হিন্দুর আজকাল আর কোনো আশাভরসা নেই—পীরের দরগায় জাত-জন্ম জবাই দিতে না পারলে সরকারী চাকরিতে সুবিধে হবে না। পাকিস্তান পাকিস্তান কী ওরা বলছে স্যার, পাকিস্তান তো হয়েই আছে অনেককাল আগে।

মণিমোহন হাসিল: দেখুন, এই ফাঁকে যদি কিছু করে নিতে পারেন।

—সেই জন্যেই তো এমন করে লেগে পড়েছি স্যার। ঠেলে দিলে ক্রিমিন্যাল এলাকায়, ভাবলাম প্রচুর স্কোপ্ পাব—গ্যাংকে গ্যাং ধরে একটা পাকাপোক্ত রেকর্ড করে রাখব। কিন্তু এসে যা নমুনা দেখলাম তাতে গ্যাং তো দূরের কথা, এখন পৈতৃক প্রাণটা টিঁকিয়ে রাখতে পারলে হয়। এগুলো তো মানুষ নয়, জানোয়ার।

সত্যিই ইহারা মানুষ নয়। মণিমোহনের মনে হইল: মানুষ নয় বলিয়াই এখনো বাঁচিয়া আছে। পঞ্চাশ-ইঞ্চি ধুতির কোঁচা পায়ে জড়াইয়া, ট্রামে বাসে মারামারি করিয়া এবং ডায়েবিটিজ ও ডিস্‌পেপসিয়ার নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়িয়া যাহারা অতি-মানুষ হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের চাইতে ইহারা একটু আলাদা বই কি। হিংস্র উন্মত্ত যে পশুশক্তি নিজের প্রচণ্ড বলশালিতায় সমস্ত পৃথিবীর উপর জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠা লইতে পারে—ইহারা তাহাদেরই দলে। ধুতিচাদরে বিড়ম্বিত মানুষ যেখানে হিসাবনিকাশ চুকাইয়া দিয়া তুলসীর মালা হাতে করিয়া পারত্রিক নিষ্কৃতির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে—তখন দেহে মনে অমিত পাশব-শক্তি সঞ্চয় করিয়া ইহারা জীবন অভিযানের স্বপ্ন দেখিতেছে। জমিরের চোখের আগুনের সেই দীপ্তিটা মণিমোহন কোনোমতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

দারোগা কহিলেন, যাক—ও নিয়ে আর দুঃখ করে কী হবে। আমিও বামুন স্যার, শাস্ত্র বলে পাতা চাপা কপাল। পাতা উড়েই যাবে একদিন—কে জানে এবারেই সে সুযোগটা পেয়ে গেলাম কিনা।

—পাবেন বলেই তো মনে হচ্ছে।

পুলকিত হইয়া ব্রাহ্মণ দারোগা দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন, আপনাদের আশীর্বাদ। কিন্তু আজকে রাত্রেই স্যার। আন্দাজ নটা সাড়ে নটা আপনাদের নেবার জন্যে নৌকো পাঠিয়ে দেব। ভালো পান্‌সী নৌকো—আরাম করে যেতে পারবেন, পুরু গদিও দিয়ে দেব।

—তাই দেবেন।

দারোগা উঠিয়া পড়িলেন: নমস্কার স্যার! আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম—

—সে তো দিলেনই, সেজন্যে আর বিনয় করে কী করবেন! আচ্ছা, আসুন আপনি তা হলে—

থতমত খাইয়া জুতার তলায় কাদার ছপাছপ শব্দ তুলিয়া দারোগা বাহির হইয়া গেলেন।

বাহিরে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি ঝরিয়া চলিয়াছে; ভিজা মাটির গন্ধ বহিয়া 'বায়ু বহত পূরবৈঁয়া'। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িতেছে কাজরী গানের একটা পংক্তি: "আয়ি রে গগন মে কারী বদরিয়া—"

কিন্তু কোথায় বা কাজরী গান, কোথায় নীপ-শাখায় দোলনা দুলিতেছে—কদমের রেণু উড়িয়া পড়িতেছে। দুলিতে দুলিতে অধরে অধর মিশিতেছে—মৃদঙ্গ আর খঞ্জনীতে বাজিতেছে মল্লারের সুর। স্বপ্ন নয়—স্বপ্নের চাইতেও দূরে—ভাবনা-কামনা-কল্পনার অতীত জগতে।

নিশীথের চর ইস্মাইল। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার নামিয়াছে। এপারে সুপারি-নারিকেল-বীথিতে অশ্রান্ত উদ্দাম সঙ্গীত—ওদিকে নদীতে প্রখর কলোল্লাস। কূলভাঙা জোয়ার আসিয়াছে বোধ হয়।

রাত্রি বাড়িতেছে। যাহাকে (অথবা যাহাদের) ধরিবার জন্য আজ রাত্রিতে তাহাদের অভিযান—সে এখন কী করিতেছে? হয়তো অন্ধকারের মধ্যে নির্নিমেষ চোখ মেলিয়া জাগিয়া বসিয়া আছে। শৃঙ্খলিত সমস্ত দেশের বেদনা আর জমাট অশ্রু তাহার দৃষ্টির সামনে এমনি করিয়া নিজেকে মেলিয়া ধরিয়াছে বর্ষাকরুণ তমস্বিনী রাত্রির মতো। থাকিয়া থাকিয়া খর-বিদ্যুতের চমকে তাহার দৃষ্টির সামনে ফুটিয়া উঠিতেছে—ভাবী স্বাধীন ভারতবর্ষের একটা অনাগত রূপ—জ্বালাময়, আগ্নেয়।

আর এম্‌নি করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে কোথায়? আগা খাঁ প্রাসাদের চারদিকে কি বর্ষার মল্লার গানে নিপীড়িত দেশের কান্না বাজিয়া উঠিতেছে? ভারতের অর্ধনগ্ন মৌনব্রতী ফকিরও কি কালো আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে—এই রাত্রি সত্য নয়, এই অন্ধকারের পরপারে—

ঘর্-র্-র্—

রূঢ় কর্কশ শব্দ। মাথার উপর দিয়া এই বর্ষারাত্রেও বিমান উড়িয়া চলিয়াছে—আসমুদ্রহিমালয় অতিক্রম করিয়া—অতলান্তিক, প্রশান্ত মহাসাগর, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বাধা-বন্ধনকে অসঙ্কোচে পার হইয়া বিজয়ের অভিযানে? ভারতবর্ষের অশ্রু-ভারাচ্ছন্ন আকাশ কি সে গতিকে বাধা দিতে পারে?

বিদ্যুতের আগুনে দিগ্‌দিগন্ত চকিতে যেন জ্বলিয়া গেল। শুধু অশ্রুভার নয়, বজ্রও বটে। একদিন জ্বলন্ত অগ্নি-বর্ষণে সেও নিজের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবে। কিন্তু সে কবে! এই সরকারী চাকরি, এই নিশ্চিন্ত জীবন—মণিমোহনের পক্ষেও কি সে দিনটি একান্তই বাঞ্ছনীয়?

লঘু পায়ের শব্দ। রাণী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

—খিচুড়ি হয়ে গেছে। গরম গরম খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

—না, শুয়ে পড়া চলবে না রাণু। বেরোতে হবে।

—বেরোতে হবে? এই রাত্তিরে কোথায়?

—সাম্রাজ্য রক্ষা করতে। সরকারী চাকরি, দায়িত্ব বোঝো না?

বিষণ্ণভাবে হাসিয়া মণিমোহন উঠিল। রাণী কাতর দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইল মেঘমন্থর দিগন্তের দিকে—তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

রাত বাড়িতেছে—তেমনি ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়া পড়িতেছে কালো আকাশ। পৃথিবীর অশ্রান্ত কান্না। চর ইস্মাইল ঘুমের চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে আচ্ছন্ন আবিষ্ট হইয়া। অবিরাম ঝিঁঝির ঐকতান—ব্যাঙের আনন্দ-মুখর কলধ্বনি।

অন্ধকারের মধ্য দিয়া পর পর তিনখানা নৌকা চলিয়াছে। গাজীতলার পাশ হাট-খোলার মধ্য দিয়া, জেলে আর চাষীদের বস্তিকে পাশে ফেলিয়া খাল আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—ভাদ্রের ভরা উজানের স্রোত তাহারি মধ্যে বহিতেছে প্রচণ্ড কল্লোল তুলিয়া—কুটা ফেলিলে উড়াইয়া নিয়া যায়।

ভরা খালের তীক্ষ্ণ জোয়ারে তীরের মতো ছুটিয়াছে নৌকা। একটানা জলের শব্দ—মাঝে মাঝে আকস্মিক এক একটা বিরাম-যতির মতো কাদার মধ্যে লগি ঝপাস ঝপাস করিয়া পড়িতেছে—নৌকার ছইকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াই আবার একটা বিশ্রী ছর্ ছর্ ধ্বনিতে পেছনে ছিটকাইয়া পড়িতেছে বেতকাঁটা, নলখুরি ফুলের লতা। সুপারির কাঠ ফেলা ছোট ছোট গ্রাম্য ঘাটে ঘূর্ণি বাজিতেছে।

দিগ্‌দিগন্তে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া চলিয়াছে। আকাশটা যে অমন সহস্রভাবে ফুটিফাটা হইয়া আছে—বজ্রের আলোয় সেটা যেন স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িতেছে। রাত্রে আবার প্রবল খানিক বর্ষণ নামিবে বলিয়া মনে হয়। এই দেশটা আশ্চর্য। বৈশাখ বলো, জ্যৈষ্ঠ বলো, যে মাসই হোক একবার বৃষ্টি নামিলেই হইল। তারপর আর কথাবার্তা নাই—হয় তো পর পর সাত দিন ধরিয়াই এতটুকু আলো ফুটিল না—রাশি রাশি মেঘ আর অসংলগ্ন বৃষ্টি চলিতে লাগিল সময় ও সীমাহীন ছন্দে।

মণিমোহন ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বসিয়া ঝিমাইতেছিল। বাহিরের জলকল্লোলে আর রাত্রির এই অনন্ত সজল তমসায় সে যেন হঠাৎ দশ বছর আগে ফিরিয়া গেছে। সেই যে-দিন নদীতে অতিকায় জেলেডিঙির মতো বড়ো বড়ো বালির চড়া ঠেলিয়া ওঠে নাই, সেদিন তেঁতুলিয়ার রোলিংকে সমুদ্রের তাণ্ডব বলিয়া মনে হইত; যেদিন মনে হইত পৃথিবীটা এখানে এখনো বিশ্বকর্মার কর্মশালার খানিকটা অবিন্যস্ত উপচার—সবটা মিলিয়া কিছুই গড়িয়া উঠে নাই—আদিম জগতের গলিত লাক্ষাস্তূপের উপরে সামান্য এতটুকু

আবরণ পড়িয়াছে মাত্র। তারপর নদীতে চড়া পড়িল—চর ইস্মাইল আগাইয়া আসিল মানুষের কাছাকাছি—সভ্যতার নিকটসান্নিধ্যে। কী ঘটিল এবং কী যে ঘটিল না! এই অন্ধকার রাত্রে বিশাল নদী বাহিয়া এম্‌নিই একটা যাত্রা মনে পড়িতেছে—সেই যেদিন—সীমাহীন চিহ্নহীন আকাশ-বাতাসে আজকের চর ইস্মাইল দশ বছর আগেই আবার ফিরিয়া গেল নাকি!

চোখ দুইটা ঝিমাইয়া আসিতেছে—মনে হইতেছে ডাকবাংলোয় পাতলা একখানা লেপ মুড়ি দিয়া রাণী এখন ঘুমাইতেছে বোধ হয়। আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে অচেতন স্বপ্ন-চ্ছায়ার মতো থাকিয়া থাকিয়া দুইটা রাইফেলের নল চকচক করিয়া উঠিতেছে। নাঃ—সেদিন আর এদিনের পৃথিবী এক নয়।

ঘস্-স্ করিয়া নৌকা ভিড়িয়া গেল হঠাৎ। একটা টর্চের আলো মণিমোহনের মুখের ওপর ঝল্সাইয়া উঠিল—নিদ্রার আমেজটা ভাঙিয়া গেছে।

চাপা গলায় দারোগা ডাকিতেছে: স্যার?

—কী খবর?

—এসে পড়েছি—উত্তেজনায় দারোগার গলা কাঁপিতেছে।

অনিচ্ছুক শরীরটাকে নাড়াচাড়া দিয়া মণিমোহন উঠিয়া বসিল।—নামতে হবে?

—আপনি একটু ওয়েট করুন স্যার। ওদিকের ব্যবস্থা করে আমরা আপনাকে নিয়ে যাব।

—আচ্ছা—মণিমোহন আবার গা এলাইয়া দিয়া ক্লান্তভাবে চোখ বুজিল। কাদার উপর আট-দশ জোড়া বুটের ছপাছপ শব্দ এবং তিন-চারটি টর্চের জোরালো আলো সুপারি-বনের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

রাত বোধ হয় দেড়টার কাছাকাছি। চোখ হইতে ঘুমের জড়তাটা কিছুতেই কাটিতেছে না; বোটের মাঝিরা ফিসফিস করিয়া কী বলিতেছে শোনাও যায় না—বোঝাও যায় না। নৌকার তলা দিয়া জলের সুতীব্র শব্দ। এতক্ষণ যার অস্তিত্ব কিছু আছে বলিয়াই মনে হয় নাই, সুযোগ পাইয়া সেই মশার ঝাঁক আসিয়া চারদিক হইতে গুঞ্জন তুলিয়াছে, কিন্তু সব কিছুকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত চেতনা যেন একটা অস্পষ্ট স্বপ্নের পাখায় ভাসিয়া চলিয়াছে; ঝিণ্টু, রাণী—কলিকাতার চৌরঙ্গী—সাউদার্ন অ্যাভেনিউয়ের কৃত্রিম চন্দ্রালোক; হা হা করিয়া বিশ্রী চেহারার একটা রোগা হাড়জিরজিরে লোক প্রবল ভাবে হাসিয়া উঠিল: কে, সেই পাগলা পোস্টমাস্টারটা? এখনো বাঁচিয়া আছে নাকি—এই দশ বৎসর পরেও?

আবার চমক ভাঙিল। পোস্টমাস্টার নয়—শেয়াল ডাকিতেছে। যামঘোষ। প্রহর ঘোষণা করিতেছে তারস্বরে। জলের শব্দ, ব্যাঙের ডাক—মাঝিরা তামাক খাইতেছে।

পকেট হইতে সিগারেটের টিনটা বাহির করিতে গিয়া মণিমোহন আবার ঝিমাইয়া পড়িল। স্বপ্নের মধ্য দিয়া একটা ঝড়ের রাত বহিয়া চলিয়াছে। অন্তরে ঝড়, বাহিরে ঝড়। আরণ্য আর উদ্দাম ভালোবাসা। মশার গুঞ্জন নয়—গুন গুন করিয়া কে যেন কাঁদিতেছে—কাঁদিতেছেই—নৌকার ছইয়ের উপর টপ টপ করিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছে—রাণী ?

—স্যার ?

এবার আর ডাক নয়—কানের কাছে ব্যাকুল আর্তনাদের মতো স্বরটা ঝনাৎ করিয়া হঠাৎ ছিঁড়িয়া যাওয়া সেতারের তারের মতো বাজিয়া উঠিল। ছন্দোপতন।

—স্যার, ঘুমুচ্ছেন ?

ইহার পর আর ঘুমানো চলে না। বিস্ফারিত বিহ্বল চোখ দুইটাকে মণিমোহন এক-সঙ্গেই মেলিয়া দিল: কী হয়েছে—অমন হাঁকডাক কেন ?

—সর্বনাশ হয়েছে স্যার !

—সর্বনাশ ? কিসের সর্বনাশ ? ডাকাত পড়েছে নাকি ?

—ডাকাত পড়লেও ভাল হত স্যার—মণিমোহনের মনে হইল দারোগা যেন বুক ফাটিয়া একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন: সব মাটি স্যার—কিছু হল না। পাখী পালিয়েছে। একেবারে ফুড্ডুৎ।

যাক—আপদ গিয়াছে। বড় করিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে যাইতেছিল মণিমোহন, কিন্তু দারোগার ব্যাকুল চোখমুখের দিকে তাকাইয়া মায়া হইল অত্যন্ত।

—তাই তো! পালালো কী করে ?

—আর বলবেন না। যোগসাজস ছিল ভেতরে ভেতরে—আমাদেরই কোনো এক ব্যাটা ইন্‌ফর্মার কিংবা চৌকিদার ফাঁস করে দিয়েছে নিশ্চয়। গিয়ে দেখি শূন্য পুরী খাঁ খাঁ করছে—কারো কোনো পাত্তা নেই।

—তারপর ?

—তারপর আর কী। তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম—গাঁয়ের তিন-চার জায়গায় হানা দিয়ে এলাম—উঁহু। কোথায় কে! তারা এতক্ষণে বে-অব-বেঙ্গল ছাড়িয়ে প্রায় জাভা-সুমাত্রার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছে বোধ হয়। তারপর সিঙ্গাপুর কিংবা সাংহাই।

—কিছুই হল না তা হলে ?

—হল না কি স্যার, হওয়াতে হবে।—ক্ষিপ্ত দারোগার দাঁতের ভেতর কড়মড় করিয়া একটা হিংস্র শব্দ উঠিল: যেটা আশ্রয় দিয়েছিল—তাকে অ্যারেস্ট্ করে নিয়ে এসেছি। এই মাগীই সমস্ত গণ্ডগোলের মূলে—ঘা কতক কষে লাগালেই মুখ দিয়ে আপনা থেকে কথা বেরিয়ে আসবে।

—মাগী! মেয়েমানুষ!

—মেয়েমানুষ বই কি। হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। আর সাধারণ মেয়েমানুষ তো নয় স্যার—বাঘিনীর জাত একেবারে। দেখুন না শ্রীমতীর চেহারাখানা—

টর্চের আলো দারোগার পেছনে বন্দিনীর মুখের উপরে উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল।

মুহূর্তে পাথর হইয়া গেল মণিমোহন। দশ বছর পরেও সে মেয়েটাকে চিনিতে পারিয়াছে। নীলার মতো চোখ, আগুনের মতো রঙ। বর্মার বুদ্ধমূর্তির মতো চিত্র-করা দৃষ্টি মেলিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দশ বছর আগে যেমন করিয়া প্রথম আসিয়াছিল, আজো ঠিক তেম্‌নি ভাবেই তাহার দরবারে বিচারপ্রার্থী।

টর্চের আলোটা জীবন্ত বুদ্ধমূর্তির মর্মরশুভ্র পাংশু মুখের উপর জ্বলিতে লাগিল, আর তাহারি সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিতে লাগিল নীলার মতো দুটি আশ্চর্য চোখ। বহুদিন পরে মণিমোহন আবার সম্মোহিত হইতেছে।

আট

ঠিক সেই সময়েই আর একটি বিচিত্র নাটকের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিলেন বলরাম ভিষকরত্ন।

বাইরে বৃষ্টি পড়িতেছে—ঘরের মধ্যে মিটমিটে একটা লণ্ঠন, লাল তেল বলিয়া আলোর চাইতে ধূম্রজালই বিকীর্ণ করিতেছে বেশি। সামনে একখানা 'সর্বজ্বর সংগ্রহ' খুলিয়া লইয়া বলরাম হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছেন এবং টাকের উপর মশার হুল ব্যর্থ চেষ্টায় শুদ্ধমাত্র সুড়সুড়ি দিয়া চলিয়াছে।

সামনে গড়গড়ায় কল্‌কেটা অনাদরে আপনিই পুড়িয়া পুড়িয়া শেষ হইতেছে। তামাকের তীব্র গন্ধে আমন্ত্রিত হইয়া রাধানাথ দরজার ফাঁকে মুখ বাহির করিল। অমন ভালো তামাকের এমন অপচয়টা তাহার পছন্দ হইল না। ইঁদুরের মতো হুঁশিয়ার পা ফেলিয়া রাধানাথ ঘরে ঢুকিল, তারপরেই গড়গড়ার মাথা হইতে কল্‌কেটা তুলিয়া লইয়া আবার নেপথ্যে তিরোহিত হইল।

—কবিরাজমশাই, কবিরাজমশাই!

ডি-ক্রুজার আকুল কণ্ঠ।

—কী রে, এমন অসময়ে কী ব্যাপার?

—শীগ্‌গির আসুন।

—কী হয়েছে?

—বাবার অবস্থা ভারী খারাপ।

—ভারী খারাপ ? কেন কী হয়েছে ? বিকেলে দেখে এলাম, জর নেই—এর মধ্যে আবার কী হল ?

—আমি জানি না, আপনি আসুন।

—আঃ—এই রাত্তিরে জল-কাদার মধ্যে হাড় জালিয়ে মারলি ! আচ্ছা, চল্। কিন্তু ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমিও না।—ক্রুজা কাঁদিয়া ফেলিল : আপনি চলুন। শীগ্‌গির চলুন।

চটি পরিয়া এবং মসীম্লান লণ্ঠনটি হাতে করিয়া বলরাম বাহির হইয়া পড়িলেন। এমন রাত্রে ঘর হইতে বাহির হইয়া রোগীর নাড়ী ধরিয়া বসিয়া থাকিতে কাহার ইচ্ছা করে ? অন্ধকার বনবীথিকে আলোড়িত করিয়া এলোমেলো বাতাস বহিতেছে। টিপ টিপ করিয়া বর্ষাধারার ক্ষণবর্ষণ। পায়ের নিচে জল আর কাদা ছপছপ করিতেছে, ঘাসে ঘাসে জোঁক নড়িতেছে। চর ইস্‌মাইল নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে, বলরামও নিঃসংশয় হইয়াই ঘুমাইতেছিলেন। কিন্তু কী এ বিড়ম্বনা আসিয়া দেখা দিল !

মনে মনে বলরাম সমস্ত পৃথিবীটাকে গালাগালি করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। আরো বেশি করিয়া রাগ হইতেছে ভুঁড়ো ডি-সিল্‌ভার উপরে। সুস্থ থাকিয়া লোকটা পৃথিবীসুদ্ধ লোককে জ্বালাইয়া বেড়ায়, অসুস্থ অবস্থাতেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। মরিতে হয় তো সোজাসুজিই চোখ দুইটা উল্‌টাইয়া বসিয়া থাক বাপু, এমন ভাবে মানুষকে উদ্ব্যস্ত করা কেন ? এই পর্তুগীজগুলাই দুনিয়ার অনাসৃষ্টি জীব—যেমন নাম, তেমনি আকারপ্রকার, আর তেমনিই ব্যবহার। মরিয়া মরিয়া তো প্রায় ফুরাইয়া আসিল, দু-চার ঘর যা আছে সেগুলি গেলেই আপদের শান্তি হয়। নিজের মনেই গজ্‌রাইতে গজ্‌রাইতে বলরাম ডি-সিল্‌ভার বাড়িতে আসিয়া পা দিলেন। আর আসিয়া যে কাণ্ডটা চোখে পড়িল তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

—এ কী রে ! কেমন করে হল ?

—আমিও জানি না। বাড়িতে এসেই দেখি—

—এত রাত কোথায় ছিলি ?

ক্রুজা নিরুত্তর। কোথায় বদমায়েসী করিতে গিয়াছিল নিশ্চয়—একেবারে পুরাপুরি বখিয়া গিয়াছে হতভাগা ছেলে। কিন্তু এ কী ব্যাপার !

মেঝেতে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে ডি-সিল্‌ভা। চারদিকে রাশি রাশি ভাঙা শিশি-বোতল, ঘরময় কাঁচের টুকরা। কতগুলা বাক্সপ্যাটরা খোলা—এলোমেলো আর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আছে সমস্ত। সর্বাঙ্গ ভাসাইয়া, মেঝে একাকার করিয়া ডি-সিল্‌ভা বমির বন্যা বহাইয়া দিয়াছে। সে বমি রোগীর নয়—মাতালের। মদের এবং ক্লেদের একটা দুর্গন্ধে পেটের নাড়ী যেন উল্টাইয়া আসিবার উপক্রম করে। বড় বড় হিক্কা উঠিয়া ডি-সিল্‌ভার

আপাদমস্তক ঝাঁকিয়া দিতেছে—মনে হইতেছে আর দেরি নাই, বড় জোর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ঝামেলা বেমালুম মিটিয়া যাইবে।

ঘৃণা-কুঞ্চিত মুখে বলরাম ঝুঁকিয়া পড়িলেন রোগীর উপরে। নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। পিছনে আশঙ্কা-পাণ্ডুর মুখে কুব্জা নীরব আর নিষ্কম্প হইয়া দাঁড়াইয়া।

—কিচ্ছু হয়নি। খালি পেটে একরাশ কড়া মদ টেনে এই অবস্থা হয়েছে।

—মদ!

—নিশ্চয় মদ। কেন মদ দিলি এনে?—বলরাম ফাটিয়া পড়িলেন: এই রোগী মানুষকে মদ খাওয়ালি কোন্ আক্কেলে? এখন যে বাপ মেরীর পাদপদ্মের দিকে রওনা হয়েছে, সেটা বুঝতে পারছিস হতভাগা বেকুব কোথাকার?

—আমি—আমি তো মদ আনিনি!

—তবে? মদ এলো কোত্থেকে? আশমান থেকে পাখা মেলে উড়ে আসতে পারে না তো।

—বোধ হয় মামা।

—মামা!—বলরাম সবিস্ময়ে বলিলেন, তোর আবার মামা কে?

—তা তো জানি না। আজই এসেছে—

—চুলোয় যাক। যেমন হতভাগা ভাগনে, তেমনি হতভাগা তার মামা। যা, এখন জল আন্—দৌড়ো দৌড়ো। মাথায় জল দে—

তারপর আধঘণ্টা ধরিয়া পরিচর্যা চলিল। মাথায় জল, পাখার বাতাস। আস্তে আস্তে ডি-সিল্‌ভার নিশ্বাস সহজ আর স্বাভাবিক হইয়া আসিল—মনে হইল এইবারে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

—নে, এইবারে বুড়োকে খাটের ওপরে তুলে ফেল্। এর পরে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।—ধরাধরি করিয়া দুজনে ডি-সিল্‌ভাকে খাটে তুলিল। ক্যাম্বিসের ব্যাগ হইতে একটা বড়ি বাহির করিয়া বলরাম বলিলেন, জ্ঞান হলে এটা খাইয়ে দিস। আর ভালো কথা, তোর মামা ধুরন্ধরটি গেলেন কোথায়?

—জানি না তো।

—বেশ মামাটি বটে। বোনাইকে একপেট মদ গিলিয়ে চম্পট দিয়েছে। কিন্তু ঘরের এমন অবস্থা কেন রে? বাক্সপ্যাটরা ভাঙা—জিনিসপত্র তছনছ—

—অ্যাঁ!

কুব্জা এতক্ষণে চমকিয়া উঠিল: তাই তো! চোর এসেছিল নাকি? মামাই বা গেল কোথায়?

বলরাম বলিলেন, হুঁ। চোর যে কে সে তো বোঝাই যাচ্ছে। বেশ মামাটি জুটিয়েছিলে

ধাবমানা। বাপটিকে বারবার বজ্জাত করে জিনিসপত্র গুটিয়ে সে নিরাপদে একদম পলায়মানঃ।

ক্রুজা আবার বলিল, অ্যাঃ!

—হ্যাঁ। কোনো সন্দেহ নেই। পারিস তো পুলিসে খবর দে—আমি আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে কী করব। যত সব—হুঁ!

ব্যাগটি তুলিয়া লইয়া বলরাম বাহির হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, আর আমাকে সাক্ষী-টাক্ষী মানিস্‌নি বাপু, পুলিসের হাঙ্গামা আমি বরদাস্ত করতে পারব না।

বলরাম লণ্ঠন হাতে অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া গেলেন।

মড়ার মতো মুখ লইয়া ক্রুজা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। উঃ মামা—মামার পেটে পেটে এই মতলবই ছিল তাহা হইলে—অত করিয়া একটা টাকার ঘুষ তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়াছিল তবে এই জন্যই। আর ওদিকে ডি-সিল্‌ভা অঘোরে ঘুমাইতেছে। যেন কিছুই হয় নাই—ঠিক [illegible] তাহার নিশ্চিন্ত ও নিদ্রিত বড় বড় শ্বাস বহিতেছে।

অকারণ একটা হিংসায় ক্রুজার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল [illegible] সে ঝাঁপ দিয়া ডি-সিল্‌ভার ঘাড়ের উপরে গিয়া পড়ে—কামড়াইয়া, আঁচড়াইয়া, খামচাইয়া তাহাকে একাকার করিয়া দেয়। ক্রুজার পায়ের গুঁতা লাগিয়া একটা [illegible] বোতল ঘরময় গড়াইয়া গেল।

কিন্তু গঞ্জালেস্ তো ঠিকই করিয়াছে। কালো অন্ধকারে—বৃষ্টির অশ্রান্ত কান্নার ভিতর দিয়া তাহার নৌকা নদীতে পাড়ি ধরিয়াছে। তীব্র নেশায় উদার এবং উদাস হইয়া হেঁড়ে গলায় গান জুড়িয়াছে গঞ্জালেস্। আশ্চর্য—সে তো গান নয়, প্রার্থনা। মাতা মেরীর পবিত্র নাম কীর্তনে নদীর বুক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে পুলকে এবং আধ্যাত্মিক আনন্দের প্রেরণায়।

নেশার ঝোঁকে সে চর ইস্‌মাইলে আসিয়াছিল এবং নেশার ঝোঁকেই আবার নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ডেভিড গঞ্জালেস্ জাগিয়াছে তাহার রক্তে। কী হইবে একটা মেয়ের জন্য অকারণে বিলাপ করিয়া, নিজের সমস্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়া? পৃথিবী অনেক বড়—পৃথিবীতে অনেক মেয়ে। একজনকে যদি নাই পাও, তাহার প্রতিনিধি হিসাবে আরো দশজনকে আয়ত্ত করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া আনা এমন কিছু কঠিন কথা নয়। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে—নির্মমভাবে ভোগ করিয়া যাও—নিষ্ঠুরভাবে আদায় করিয়া লও। এই অত্যন্ত সার কথাটা তাহার বাবাই খুব ভালো করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। সে কাহারও জন্য প্রতীক্ষা করে নাই—ইনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করে নাই—একটি নারীর জন্যে কাজকর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত মাতালের মতো দিগ্‌বিদিকে

ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় নয়। অক্লেশে ডাকাতি করিয়াছে, রক্ত-লোকেকে ক্রীতদাস করিয়াছে—খুন করিয়াছে, বীরের মতো বাঁচিয়াছে এবং বীরের মতো মরিয়াছে। সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের আদর্শ সন্তান।

তবে সেই বা পিছাইয়া থাকিবে কেন? পর্তুগীজ চিরদিনই পর্তুগীজ—চিরকালই সে যুদ্ধ করিয়াছে এবং জয় করিয়াছে। পেরিরা নয়—অনুগৃহীত সেই বাঙালি মেয়েটা নয়—ঘুমন্ত শান্ত কর্ণফুলীর তীরে নারিকেল-বীথির মৃদু মর্মরও নয়। অন্তহীন নীল সমুদ্র, তুফান আর মড়ার মাথা আঁকা কৃষ্ণ পতাকা। কামানের অগ্নিপিণ্ড দিয়া বাণিজ্য-জাহাজকে অভ্যর্থনা। জলদস্যু সপ্তগ্রাম—দ্বীপময় দুর্গ। যোগ্যতমের উদ্বর্তন।

পরস্বাপহরণে এই প্রথম হাতেখড়ি। নতুন করিয়া জীবন শুরু হইল গঞ্জালেসের কোনোখানে বাঁধা পড়িয়া নয়—পৃথিবীময় ছড়াইয়া। নিজের মধ্যে আশ্চর্য একটা উল্লাস তাহার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—কালো রাত্রির কালো স্রোত দৃষ্টির অগোচরে বিশাল পৃথিবীর মহা আবর্তে তাহাকে লীন করিয়া দিল—আরো অনেক বিদ্রোহী শিশুর মতোই চর ইসমাইল আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না কোনোদিন।

নয়

চর ইসমাইলের উপর দিয়া সূর্য উঠিল।

এক একটি রাত্রির কালো অন্ধকার দিগন্ত-প্রসারিত নদীর বুক হইতে নিজেকে বিকীর্ণ করিয়া দেয়—আবার প্রভাতের প্রথম আভাসে রহস্যময় অতলস্পর্শ জলের তলায় বিলীন হইয়া যায়। রক্ত-সমুদ্রে স্নান করিয়া নিজেকে প্রকাশিত করে প্রতিদিনের সূর্য—নবজাতক সূর্য। বিস্ময়-ব্যাকুল চোখ মেলিয়া সেই সূর্য যেন নতুন করিয়া দেখিতে চায় পৃথিবীকে, যেন সত্তার মধ্যে অনুভব করিতে চায় বিস্মৃত আদিম কালের সেই প্রথম অগ্নিস্রাবী দিন-গুলি, যেদিন মাটি ছিল না, জল ছিল না, শ্যামশ্রীর আনন্দিত বিস্তার ছিল না—প্রাণে-শস্যে সমুজ্জ্বল মানুষের উপনিবেশ ছিল না। আকাশ বাতাস, পঞ্চভূতের বুকের মধ্যে শুধু ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল সোনা, লোহা, গন্ধক, সোরা, লাক্ষা, লাভা, হাইড্রোজেন, কার্বন—আরো কত কী।

সূর্য স্বপ্ন দেখে, কিন্তু পৃথিবী সে স্বপ্ন ভুলিয়া গেছে বহুদিন আগে। তার মুগ্ধ চোখে আবিষ্ট হইয়া আছে আকাশের নীলাঞ্জন মায়া—তার সর্বাঙ্গে শ্যামলতায় স্নিগ্ধ সৌকুমার্য উঠিতেছে হিল্লোলিত হইয়া, তার চেতনায় নব নব সৃষ্টির রোমাঞ্চকর স্বপ্নমাধুর্য। সূর্যের দিকে পৃথিবী আর ফিরিবে না, অগ্নির আগুনের নীল তাণ্ডব শিখায় নিজেকে আর জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিবে না সে। তার ভবিষ্যৎ-বিকাশমণ্ডিত কোন্ লক্ষ লক্ষ

বৎসরান্তের শীতার্ত তুষার-শয্যায়, সুদীর্ঘ অন্ধকারে,—আর্জিয়ায়-ইউরেশিয়ানের কবরখানার অন্তর্দীপ্তিতে।

উদ্ভ্রান্ত সূর্য ওঠে—সর্বহারাতক সূর্য। সদ্যোজাগ্রত চোখ মেলিয়া তাকায় পৃথিবীর দিকে, তাকায় চর ইস্মাইলের দিকে। আর উপনিবেশের অর্থ-পরিণত মৃৎস্তরের নিচে আদিম লাভা ফুটিয়া, ফুলিয়া, ফুঁসিয়া ওঠে—প্রেতাত্মা-চকিত, বিরোধ-জর্জরিত অলস মাটির তলা হইতে একটা উত্তাল আগ্নেয় আক্ষেপ যেন অমার্জিত মানুষগুলির শিরা-স্নায়ুতে নিজেকে সঞ্চার করিতে চায়।

উপনিবেশের বুকে মন্বন্তর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পদপাত। ঊনিশশো বিয়াল্লিশের আত্মঘাতী বিস্ফোরণ। অকাল-বোধনের পূজায় ব্যর্থ-বলির রক্তপাত। শতধাবিচ্ছিন্ন বিক্ষুব্ধ প্রাণশক্তি পথ খুঁজিয়া পায় না, পাষাণপ্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া নিজকেই ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলে।

বিস্ময়-ব্যাকুল চোখ মেলিয়া তাকায় রক্তাক্ত সূর্য। আগ্নেয় অতীত আবার কি নিজেকে সঞ্চারিত করে ভবিষ্যতের মধ্যে, উপনিবেশের পেশীতে শ্রেণীতে মত্ততার জোয়ার আসে। পর্তুগীজ জলদস্যুদের রক্তে ডাক আসে নতুন কালের ধারা বাহিয়া—কিন্তু সে কি দস্যুতার, না দস্যুর মতো সঞ্চিত মিথ্যাকে লুঠ করিয়া নিতে? আরাকানীর অত্যাচার আবার মাটির তলা হইতে ফিরিয়া আসে কি অত্যাচার করিবার জন্য, না অত্যাচারীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য?

সূর্য প্রতীক্ষা করে।

* * * *

—বড়মিঞা, ও বড়মিঞা?

বড়মিঞার কাছারি বাড়ির টিনের দরজাটা বাহির হইতে শক্ত করিয়া তালা আঁটা। ধুলা জমিয়াছে, মাকড়সার জাল ছড়াইয়া আছে। লোহার তালাটা বহুদিন খোলা হয় না, অনেক রোদে পুড়িয়া এবং অনেক জলে ভিজিয়া সেটা যেন স্বর্গের তালার মতো কঠিন এবং সুদৃঢ় হইয়া আছে, তাহার অভ্যন্তরে নিহিত রহস্যের আবরণ ভেদ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। ভাবটা এই রকম, এখানে মানুষ নাই, এখানে কাহারো থাকিবারও কোনো প্রয়োজন নাই। যে জন্য তোমরা এখানে মাথা কুটিয়া মরিতেছ তাহা বৃথা—ধান-চালের ব্যাপার বড়মিঞা বহুকাল আগেই ছাড়িয়া দিয়াছে, সুতরাং তাহা লইয়া এখানে দরবার করিতে আসা যেমন অনাবশ্যক তেমনই অবান্তর।

কিন্তু মানুষগুলিও নাছোড়বান্দা।

—বড়মিঞা, ও বড়মিঞা?

বন্ধ কাছারি বাড়িটার ভিতর কেমন যেন রহস্যময় একটা শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন

ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে। মানুষ?—না, শেয়াল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

বাহিরে প্রায় পঞ্চাশজন লোক জুটিয়াছে। তাহাদের হাতে লাঠি এবং ধারালো নিড়ানি। চর ইস্‌মাইল, কালুপাড়া এবং অন্যান্য আরো দশখানা গ্রামের একত্র মুসলমান চাষা। দেশের চাল লোপাট হইয়া গিয়াছে—একটি দানাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না কোনোখানে। অথচ শোনা যায় রাত্রে যখন অন্ধকারে গাঢ় থমথম করে, গ্রামের মানুষগুলি তো দূরে থাক, সদাসতর্ক প্রহরী কুকুরদের চোখও ঘুমে এলাইয়া আসে—তখন, ঠিক তখন—কাকপক্ষীও যখন টের পায় না, আর সুপারির পাতাগুলি পর্যন্ত নড়ে না একবিন্দুও, ঠিক সেই সময় দশ দাঁড়, পনেরো দাঁড, বিশ দাঁড়ের পান্‌সি গাজীতলার হাট হইতে বাহির হইয়া গির্জাঘাটের নিচ দিয়া বড নদীতে পডিয়া শাঁ শাঁ শব্দে তীরের মতো অদৃশ্য হইয়া যায়। কোথায় যায়? যায় ওপারের গঞ্জে। কেন যায়? লুকাইয়া লুকাইয়া দেশের প্রাণ, মানুষের পেটের খাবার বিক্রি করিয়া আসিতে।

এই কাজের চক্রী হইতেছে বলরাম ভিষক্‌রত্ন এবং তাহার দক্ষিণ হাত মজঃফর মিঞা। সুতরাং চর ইস্‌মাইলের রক্তে আগুন ধরিয়াছে। এ কলিকাতা নয় যে এখানকার মানুষ নির্বিবাদে ফুটপাথে পডিয়া তিলে তিলে শুকাইয়া মরিবে, মাটির মালসা হাতে লইয়া দরজায় দরজায় 'ফ্যান' 'ফ্যান' করিয়া কাঁদিবে এবং ককাইবে, ডাস্টবিনে হাত ডুবাইয়া পচা শস্যের কণিকার ব্যর্থ সন্ধান করিবে, অথবা সরকারী লরির তলায় পড়িয়া দিব্যগতি লাভ করিবে। এরা দাবি করিতে জানে, নিজেদের প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা করিতে জানে। এরা আইন গড়ে, আইন ভাঙে। আজ অবশ্য শহরের তৈরি অনেক বিষবাষ্প আসিয়া এদের শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলিতে পারে নাই—সহজ, স্বাভাবিক, জটিলতাহীন সমবায় ও সাম্যবাদ এখনো ইহাদের সুস্থ কর্তব্যবোধকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে।

টিনের দরজায় ঠক ঠক করিয়া তাহারা লাঠি ঠুকিতে লাগিল।

—বডমিঞা, বডমিঞা—শুনছ?

তবু সাডা নাই। মৃত্যুপুরীর মতো সব স্তব্ধ। শুধু সামনে নদীর সাদা জলে জোয়ার আসিয়াছে—উদ্দাম বাতাসে একটা তীব্র কলধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে।

—ও জমির ভাই, ব্যাপার কী?

—এখানে তো কেউ নেই মনে হচ্ছে।

জমিরের চোখে আগুন জ্বলিতেছিল।

—নেই মানে? সব চালাকি। এমন করে রেখেছে যে লোকে ভাববে ভেতরে কিছু নেই। আসলে সব লুকিয়ে রেখেছে এই গোলার মধ্যেই—রাতের বেলায় এর ভেতর দিয়ে ধান বেরিয়ে যায়।

—কিন্তু বড়মিঞা গেল কোথায় ?

—আছে ভেতরেই। নিজের চোখে আসতে দেখেছি লাঠি ধরে, বাঁকা বাঁকা পা ফেলে। জিন-পরী তো আর নয়—জলজ্যান্ত একটা মানুষ হাওয়ায় নিশ্চয় উড়ে যায় নি।

একজন গর্জন করিয়া কহিল, ভাঙো দরজা।

—সে কি। বেআইনী হবে যে।

—আইন !—জনতার মধ্য হইতে অনেকগুলি গ্রোখ্রো সাপের রোষধ্বনির মতো একটা চাপা শব্দ উঠিল। আইন !

জমির আগাইয়া আসিয়া দরজায় প্রকাণ্ড একটা ঘা দিল : রেখে দাও আইন। ওই তো সার্কেল-অফিসারবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। কী করলে ? কিছুই না। ও সব এক-দলের। যা করবার আমাদেরই করতে হবে ভাই, কারো মুখের দিকে তাকিয়ে হাত পেতে পড়ে থাকলে হা-পিত্যেশ করাই সার হবে।

—ভাঙো দরজা।

দু-একজন লাঠি উদ্যত করিল, কিন্তু বেশির ভাগই দাঁড়াইয়া রহিল দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া। ঘুণ ধরিয়াছে চর ইস্মাইলের বিদ্রোহী শরীরে। সংশয় দেখা দিয়াছে, আইনের তর্ক উঠিয়াছে। অনর্থক ফ্যাসাদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে কোথায় যেন বাধে।

জমির ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

—তোমরা মানুষ না ?

জনতা শক্ত হইয়া উঠিল। চোখে আগুন চমকাইয়া গেল। কিন্তু এখনো মন তৈরি হয় নাই, চেতনার উপর হইতে নতুন শেখা ন্যায়-অন্যায়ের ভারমন্থর সংশয়টা কিছুতেই নামিয়া যাইতেছে না।

জমির বলিল, সামনে কী হচ্ছে দেখেও কি দেখতে পাও না ? খাদেমালি মোল্লার পরিবার তিনদিন ধরে উপোস দিচ্ছে। মনিরুদ্দিনের ছেলেবউ বিনা চিকিৎসায় না খেয়ে মরে গেল। জেলেপাড়ায় মানুষ মরছে টপাটপ করে। কেন ? দেশে কি চাল নেই ? এত ধান হয়েছে আমাদের চরের জমিতে, আঁচলভরা সোনা ফলেছে। কোথায় গেল সে-সব, কারা নিলে ?

জনতা নড়িয়া উঠিল।

—ওই কবিরাজ, এই মজঃফর মিঞা, ওই ওপাড়ার নুরুল গাজীর ব্যাটারা, জয়নাল ব্যাপারী। সব খবর এরাই জানে। দেশের লোককে প্রাণে মেরে পেট বোঝাই করছে। মাটির তলায় তলায় ধান, অন্ধকার গোলাঘরে ধান। রাতে ছিপ্ নৌকোতে চালান দেওয়া ধান। আর তোমরা পড়ে পড়ে মরবে ? মানুষ না গোরুর দল ?

—কড়্—ঝনাৎ—ঝনাৎ—

টিনের দরজাটা যেন একটা বিরাট ভূমিকম্প অথবা প্রলয়ের আঘাতে নড়িয়া উঠিল। চর ইস্মাইলের আকাশ কাটাইয়া রণধ্বনি মুখরিত হইল : আল্লা—হু—আকবর। ভাঙো দরজা।

কাছে দূরে লোক জমিতে শুরু হইয়াছে। কতক বা ভীত বিহ্বল চোখে চাহিয়া আছে, কতক বা লাঠিসোঁটা লইয়া ছুটিয়া আসিয়া এদের দলে যোগ দিল। অভাব সকলের, দুঃখ সকলের, নির্যাতনের অংশও সকলের সমান। তাই প্রতিকারের দায়িত্বও সকলেই একসঙ্গে ভাগ করিয়া নিতে চায়।

—আল্লা হু আকবর—দরজা ভাঙো—

আকাশ কাঁপিতেছে, পায়ের তলায় মাটি কাঁপিতেছে, চর ইস্মাইলের নিভৃত নিম্নলোকে প্রচ্ছন্ন অগ্নিগিরির লাভা-স্রোত ফেনাইতেছে। ধান কাটা লইয়া, জমি লইয়া লাঠালাঠি করা, রক্তের ধারা বহাইয়া দেওয়া ইহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ইতিহাস, কিন্তু এমন করিয়া এক হইয়া দাঁড়ানো, এমন করিয়া মাথা তুলিয়া সমস্ত অন্যায়কে চুরমার করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা—কোন্ নতুন যুগের হাওয়া আজ চর ইস্মাইলের বুকে বহিয়া আনিল!

দূরে কাছে লোকগুলির মধ্যে নেশা লাগিতেছে। তাহারা আর নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র নয়, নিজেদের ভাগ্যও যে এর সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত, সেই সত্যটাকেও অনুভব করিতেছে যেন।

—ভাঙো—ভাঙো—সাবাস্—

—মড়্—মড়্—মড়াৎ—

একটা প্রচণ্ড লাথিতে শক্ত হুড়কাটা দু'টুকরা হইয়া গেল—কপাটটা হাট-আদুড় হইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। সামনের লোকটি মুখ থুবড়াইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল, তারপর হু হু করিয়া ওরা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল জলস্রোতের মতো।

কাছারি ঘরে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। কতগুলি বেঞ্চি এদিকে ওদিকে পাতা, একটা পুরানো ভাঙা খাট। লাঠির মুখে সেগুলিকে চুরমার করিয়া তাহারা উঠোনে নামিয়া আসিল।

সামনে চার-পাঁচটি গোলা সাজানো। মসৃণ করিয়া মাটি দিয়া তাহাদের দেওয়াল লেপা, তাহাদের মাথায় নতুন খড়ের সোনালি ছাউনি। সামনে দিয়া ধানের সরু সরু বিশৃঙ্খল রেখা পিছন দিকের ছোট দরজা বরাবর চলিয়া গেছে। ওই পথ দিয়াই তাহা বাহির হইয়া যায়!

কিন্তু বিস্ময়ের বাকি ছিল তখনো।

ক্ষিপ্তের মত মানুষগুলি ধানের গোলায় গিয়া চড়াও হইল। সেখানে যাহা চোখে পড়িল তাহাতে বাক্‌স্ফূর্তি হইল না কাহারো। ধান তো দূরের কথা, একটি তুষের দানাও

পড়িয়া আছে সেখানে। পরিষ্কার করিয়া ঝাঁট দিয়া কে যেন শেষ শস্যকণাটি অবধি কুড়াইয়া লইয়া গেছে। শুধু একটি গোলাই নয়—সব কয়টিরই এক অবস্থা।

কয়েক মুহূর্ত অখণ্ড নীরবতা। কাহারো মুখে একটি মাত্রও শব্দ নাই।

যে অলক্ষ্য ইঁদুর মাটির তলায় থাকিয়া নীরবে দিনের পর দিন তাহাদের প্রাণভাণ্ডার উজাড় করিয়া লুটিয়া খাইয়াছে, এ যাত্রাও তাহার হিসাবে ভুল হয় নাই। সময় বুঝিয়াই সে নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে তাহার কাজ গুছাইয়া লইয়াছে।

লোকগুলি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পরে আবার যেন প্রচণ্ড বাঁধ ভাঙিল। হতাশার হাহাকার—নিরুপায় ক্ষোভের উন্মাদ গর্জন।

—ধান কই, ও জমির মিঞা, ধান কই?

—ফাঁকি দিয়েছে বুড়োমিঞা, রাতারাতি সব সরিয়েছে।

—ধান লুকিয়েছে—সব চালাকি।

—ধান কই, আমাদের ধান?

মার্ মার্ শব্দে সব তছনছ করিয়া গোলাগুলি সমস্ত গুঁড়াগুঁড়া করিয়া দিল জনতা। টিন, কাঠ, বাঁশ—যেখানে যে যা পাইল তুলিয়া লইল। তারপরে যেটুকু বাকি পড়িয়া ছিল, একত্র করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল।

শুধু মজঃফর মিঞার কাছারি বাড়িতেই আগুন লাগিল না। চর ইস্মাইলেও আগুন জ্বলিল। আদিম পৃথিবীর আত্মগ্রাসী আগুন নয়, নতুন যুগের হোমাগ্নি। মাথার উপরে চর ইস্মাইলের রক্তাক্ত সূর্য চাহিয়া রহিল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে।

*   *   *   *

গতিকটা অবশ্য আগেই বুঝিতে পারিয়াছিল মজঃফর মিঞা।

রাতারাতি ধান সে সরাইয়াছিল—পাকা খবর যথাসময় পাইয়াই। কিন্তু এতটা ঘটিবে তা সে অনুমান করিতে পারে নাই। বাহিরের দরজা যখন প্রচণ্ড শব্দে ভাঙিয়া পড়িল, তখন প্রমাদ গণিযা সে হামাগুড়ি দিয়া খিড়কির পথে বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু পালানোর পথ নাই। মারমূর্তি মানুষ চারদিক হইতেই অন্ধ বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহাকে হাতে পাইলে আর আস্ত রাখিবে না। গুঁড়ি মারিয়া সে একটা ভাঁটফুলের ঝোপের মধ্যে বসিয়া পড়িল, তারপর ভয়ার্ত বন্যজন্তুর মতো চোখ মিটমিট করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল প্রায় কতদূর পর্যন্ত গড়ায়। বুকের মধ্যে ভয়ে সন্দেহে প্রাণ-পিণ্ড দুইটা হাপরের মতো শব্দ করিতে লাগিল, যদি একবার ওরা তাহাকে ধরিতে পারে—

কিন্তু ধরিতে পারিল না। মানুষগুলির নজর তখন মজঃফর মিঞার দিকে নয়, ধানের দিকে। ব্যর্থ ক্ষোভে আর ক্রোধে গর্জন করিয়া তাহারা সব ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার

করিল, তারপর মজঃফর মিঞার চোখের সামনেই তাহার এত সাধের কাছারি বাড়িতে—

মজঃফর মিঞার সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই। সত্তর বছরের সীমানা ছাড়াইয়া পাড়ি দিয়াছে বয়েস। চলিতে পা কাঁপে, সর্বাঙ্গ টলিয়া ওঠে—নিজের উপরে নিজের কর্তৃত্ব নাই। দন্তহীন মুখের মাংসপেশীগুলি অনবরত নড়িয়া নড়িয়া যেন সে যা বলিতে চায় তাহারই প্রতিবাদ করে। সুতরাং ভাঁটফুলের জঙ্গলের মধ্যে সদ্য খোলস ছাড়া একটা বিষধর সাপের মতো বুক পাতিয়া সে স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল। শুধু মনে হইতে লাগিল, যদি আর দশ বছর আগে হইত, তাহা হইলে—

আগুন জ্বলিতেছে, মাটির দেওয়াল ধ্বসিতেছে—শোঁ শোঁ করিয়া উড়িতেছে জ্বলন্ত টিন। সঙ্গে সঙ্গে জনতার উৎকট উল্লাস। সমস্ত চর ইস্‌মাইল আজ এক হইয়াছে—এক হইয়াছে আজ মজঃফর মিঞার বিরুদ্ধে, মজঃফর মিঞার মতো আরো যাহারা আছে, তাহাদের সম্মিলিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে।

জ্বলন্ত টিন উড়িতেছে—শাঁ শাঁ করিয়া উড়িতেছে বল্টু। আর সেই সঙ্গে যেন মজঃফর মিঞার বুকের মধ্যেও কী একটা উড়িয়া যাইতে লাগিল। দাঁতে দাঁতে তাহা নিষ্ঠুর হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে। শোধ লইবে, ইহার শোধ লইবে সে। এখন আর সেদিন নাই। থানা আছে, আইন আছে, সরকারের কঠিন শৃঙ্খলের শৃঙ্খলা আছে। সব কিছুর বিচার সেখানে হইবেই—কেহ তাহা রোধ করিতে পারিবে না।

মজঃফর মিঞা বাহির হইয়া আসিল। জনতা এতক্ষণে দূরে চলিয়া গেছে—অন্য কোথাও কিছু—একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটাইবার জন্যই বোধ হয়। হাতের লাঠিটা তুলিয়া লইয়া ঠুকঠুক করিতে করিতে সে অগ্রসর হইল—তাহার মাথার মধ্যে আকাশটা তখন এতটুকু হইয়া গিয়া গোলাকার একটা অগ্নিচক্রের মতো ঘুরিতেছে।

দশ

মণিমোহন তখনও যেন সম্মোহিত হইয়াই আছে।

স্বপ্ন দেখিতেছে নাকি? দেখিতেছে অসংলগ্ন খেয়াল? দশ বছর আগে যা একেবারেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, যা নিশ্চিহ্ন ও নিঃশেষ হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল তেঁতুলিয়া নদীর কূল-ভাঙা প্রচণ্ড জোয়ারের তরঙ্গে উন্মাদ স্রোতধারার সঙ্গে, তাহা কি আবার এমনভাবে ফিরিয়া দেখা দিতে পারে কোনো উপায়ে, কোনো সম্ভব বা অসম্ভব স্বপ্নেও?

কিন্তু স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, কিছুই নয়। যাহা দেখিবার তাহা তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অত্যন্ত সত্য এবং বাস্তব এই পৃথিবী। নৌকার নিচে তীব্রধারায় খালের জল বহিতেছে—নৌকা দুলিতেছে ক্রমাগত। মশাগুলি কানের কাছে তেমনি গুঞ্জন করিয়া

কিরিতেছে। খাল হইতে পচা কচুরি এবং সর্পবর্ষণের পর পৃথিবী হইতে পিছল কাদার গন্ধ বাতাসে ভাসিতেছে। মাঝিদের লণ্ঠনের আলোয় চারিদিকে একটা প্রায়ান্ধকার অস্পষ্টতার সৃষ্টি হইয়াছে; দারোগা বেদনা-বিবর্ণ মুখে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শিকার জাল হইতে চম্পট দিয়াছে এবং তাঁহার ইন্‌স্পেক্টর হইবার সযত্ন-লালিত স্বপ্নও সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে কৈবল্যধাম লাভ করিয়া বসিয়া আছে। আশাহত বনোয়ারী দারোগার মুখের দিকে চাহিয়া পাষাণেরও করুণা বোধ হইবে।

আর দারোগার টর্চের আলো যাহার মুখে পড়িয়াছে—সে কে, সে কী?

শাদা পাথরে খোদাই করা বুদ্ধমূর্তি। জীবনে কত কীর্তিই সে করিল তাহার শেষ নাই। সে কীর্তির একটা অধ্যায়ের সঙ্গে মণিমোহন নিজেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। সাধারণ দৃষ্টির বিচারে, সমাজের চোখে তাহার স্থান কোথাও নাই। একটা উচ্ছৃঙ্খল বন্য জীবন—একটা আগুনের মতো তীব্র তপ্ত লালসা। কিন্তু এই মুখখানা দেখিলে সে কথা কাহার মনে হইবে? নির্মল, পবিত্র, কোনোখানে মলিনতার একবিন্দু চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে কথা কহিল। বলিল, থাক, আলো নিবিয়ে দিন। আমি দেখেছি দারোগাবাবু।

মেয়েটি তাহাকে চিনিল কি? তাহার নীলার মতো চোখে পরিচয়ের কোনো আভাস কি ঝলক দিয়া উঠিল? কিন্তু সে সব স্পষ্ট করিয়া কিছু মনে হইবার আগেই দারোগার টর্চের আলোটা নিবিয়া গেল। শুধু মাঝিদের লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল শিখার যে রক্তাভাটুকু জাগিয়া রহিল, তাহাতে মনে হইতে লাগিল যেন কোনো জনহীন নিবিড় বনের মধ্যে শান্ত সমাহিত ভাঙা একটি দেবমূর্তির ওপরে বনের পাতার ফাঁক দিয়া খানিকটা আলোকের দীপ্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মণিমোহন বলিল, আমি কাল ওর সঙ্গে কথা বলব। আজ থাক। আপনি কি ওকে থানায় নিয়ে যেতে চান?

নৈরাশ্যক্ষুব্ধ দারোগা যে চিৎকার করিয়া উঠিলেন না, সে শুধু মণিমোহন সম্মুখে ছিল বলিয়াই। বলিলেন, থানায় নিয়ে যাব না মানে? চালান দেব। কী যে আপনি বলেন স্যার? এই বেটিই সব জানে, সব গণ্ডগোলের গোড়াতেই—

—প্রমাণ করতে পারবেন তো?

—নিশ্চয়। সাক্ষীর অভাব হবে না। বলেন কি মশাই, আমার এতদিনের আশা, বুড়ো বয়সে কোথায় একটু ভালো রকম পেন্সন পাবো তা নয়—

গলার সুরে মনে হইল যেন কান্না উছলাইয়া পড়িতেছে।

—বেশ, যা ভালো বোঝেন করুন। তবে আমি একবার কাল আপনার আসামীর

সঙ্গে একটু আলোচনা করে দেখব। হয়তো আপনার তাতে সুবিধেই হবে।

—বেশ তো, বেশ তো স্যার। দারোগা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন : তাহলে কালই আপনার কাছে হাজির করব সকালে। কখন নিয়ে যাব? আটটা—নটা?

—আচ্ছা।

মণিমোহন চোখ বুজিয়া বিছানার উপরে শুইয়া পড়িল। তাহার আর ভালো লাগিতেছে না, কথা বলিতেও যেন সে শ্রান্তি বোধ করিতেছে।

দারোগা কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, স্যার, বোঝেন তো, আমাদের সবাই আপনাদের দয়ার ওপর নির্ভর করছে। দু-চারটে কথা যদি বার করে দিতে পারেন, তাহলে কেনা গোলাম হয়ে থাকব। অবশ্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করব না, তবুও—

—আচ্ছা—আচ্ছা—মণিমোহন যেন ধমক দিল একটু : সে আপনার ভাবতে হবে না। আমি যতটুকু ভালো বুঝি করব—

—না, তাই বলছিলাম আর কি স্যার। আচ্ছা আপনি ঘুমোন—সন্ত্রস্ত দারোগা নৌকা হইতে নামিয়া গেলেন।

রাত্রি শেষ যাম। নৌকা ছাড়িয়া দিল। কালকের মতো আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে অস্ত-চাঁদের উপরে, ভোরের দিকে বৃষ্টি নামিবে কিনা কে জানে। নৌকার গায়ে বেত-কাঁটার আঁচড়, দূরে শিয়ালের ডাক—কোথা হইতে হিস্‌হিস্ করিয়া একটানা অদ্ভুত শব্দ। যেন নৌকার আকস্মিক উপদ্রবে বিব্রত হইয়া কতকগুলি সদ্য ঘুম-ভাঙা সাপ একসঙ্গে ফণা তুলিয়াছে—শত্রুকে ছোবল মারিবে।

মণিমোহন ঘুমাইবার জন্য চোখ বুজিল কিন্তু ঘুম আসিল না। চোখের পাতায় যেন হাজার হাজার পিন ফুটিতেছে—মাথার মধ্যে ফুলঝুরির মতো অবিশ্রান্ত কতকগুলি আগুনের তারা ঝরিয়া চলিয়াছে। কাকে দেখিল সে—কী দেখিল! দশ বছর ধরিয়া যাহার জন্য সে স্বপ্ন রচনা করিয়াছে, অনেক শান্ত কোমল রাত্রে, চাঁদ-ডুবিয়া-যাওয়া স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে যখন শুধু দূরের রেল লাইনের কলিকাতাগামী ট্রেনের চাকার তলায় ময়ানদীর ব্রীজ হইতে ঝমঝম করিয়া একটা অদ্ভুত শব্দ ভাসিয়া আসিয়াছে, আর ঘুমন্ত রাণীর বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে বালিশের উপরে উঠিয়া বসিয়াছে—সেই সময় চলন্ত একটা অন্ধকার ট্রেনের জানালা হইতে একখানি উজ্জ্বল সুন্দর আভাসের মতো মনের সামনে প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে কাহার মুখ? এবং সেই মুখকে এখানে এইভাবে যে দেখিবে এমন কল্পনা সে কি করিয়াছিল কখনো?

আশ্চর্য মুখখানি! এত ঝড়, এত ঝাপটা যে বহিয়া গেছে, সর্বোপরি বহিয়া গেছে সময়—তেঁতুলিয়ার স্রোতে নতুন ভাঙা, নতুন উপনিবেশ জাগাইয়া তোলা সময়। অথচ সে স্রোত এতটুকুও দাগ কাটে নাই, একটি শামুক ঝিনুকের চলার দাগেও সে মুখ এতটুকু

রেখাঙ্কিত হইয়া উঠে নাই। আশ্চর্য!

কাল দেখা হইবে। দশ বছর আগেকার ঝড়ের সন্ধ্যা কি ফিরিয়া আসে? আর কি ফিরিয়া আসে কখনো? জীবনের গতি বৃত্তাকার নয়, কখনো সরল, কখনো সরীসৃপ। সেদিনও মনটা নিজের বাঁধা পথ খুঁজিয়া পায় নাই—মনে রোমান্সের নেশা ছিল—এই নতুন দেশ, অদ্ভুত নদী সেদিন বিচিত্র রোমাঞ্চ-কল্পনা আর স্বপ্ন-কামনা জাগাইয়া তুলিত। সেদিন আজ আর নাই। সব চেনা হইয়া গেছে, জানা হইয়া গেছে, প্রতিদিনের অতি পরিচয়ের নেশা কাটিয়া গেছে। দীর্ঘ নদীপথ ক্লান্তিকর মনে হয়,—নতুন-জাগা বালির চর দেখিয়া তিনশো বছর আগেকার পর্তুগীজদের স্বপ্ন ফিরিয়া আসে না—দুপুরের রোদে ঝিকমিক বালির তাপে চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

সর্বোপরি রাণী। সেদিনও উজ্জ্বল মন তাকে মানিয়া লয় নাই—সেদিনের প্রেম ছিল আকারহীন একটা অর্ধতরল পিণ্ডের মতো, যেমন খুশি তাহাকে রূপ দেওয়া চলিত, আকার দেওয়া চলিত। আজ অনেক সূর্যের তাপে সেই তরলটা জমাট বাঁধিয়াছে—জীবনের যাহা কিছু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে সমান একটা কঠিন ভিত্তির উপর। আজ সেখানে আলোড়ন জাগাইতে গেলে ভূমিকম্প ঘটিয়া যাইবে—সব ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার হইয়া যাইবে। সে ভাঙন আজ আর মণিমোহন কামনা করে না—সে ভাঙনকে মনের মধ্যে মানিয়া লইবার স্পৃহা বা দুঃসাহস কোনোটাই তাহার নাই। আজ রাণীই ভালো—আজ ঝিণ্টুর মধ্যেই তাহার ভবিষ্যতের রূপায়ণ। তাহার চাকরির ভবিষ্যৎ একটা স্পষ্ট উজ্জ্বল দিগন্তের দিকে আঙুল বাড়াইয়া দিয়াছে।

না—দশ বছর আগেকার ঝড়ের সন্ধ্যা আর ফিরিবে না। ফেরাটাও আজ আর কাম্য নয় তাহার।

*　　　　*　　　　*　　　　*

কিন্তু সুখ ছিল না বলরাম ভিষক্‌রত্নের। ভগবান তাঁহার কপালে একবিন্দু সুখ লেখেন নাই, প্রাণপণ চেষ্টা করিলেই কি আর তাহাতে কিছুমাত্র সুবিধা হইবে।

মনে মনে ডি-সিল্‌ভা আর ক্রুজার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে বলরাম ফিরিলেন। জননী মেরীর এত দয়া, আর এই সন্তানগুলিকে তিনি কি মর্ত্যলোক হইতে তুলিয়া তাঁহার স্নেহময় স্বর্গীয় কোলে স্থান দিতে পারেন না? তাহা হইলে পৃথিবীর না হোক, অন্তত বলরামের ভাজা-ভাজা হাড়গুলি তো জুড়াইয়া যায়।

রাধানাথ তাঁহার খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া ঘুমাইতেছে। পড়িয়াছে কুম্ভকর্ণের মতো, কানের কাছে এখন তাহার প্রবল বেগে কাড়া-নাকাড়া বাজাইলেও সে টঁ্যাফোঁ করিবে না। বলরামের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, নিরিবিলিতে এবং নিভৃতে তাঁহার মদনানন্দ মোদক কিছু কিছু উদরস্থ করিয়া থাকে সে।

হাত পা ধুইয়া বলরাম খাইতে বসিলেন। রাত্রে তিনি ভাত খান না—খান সামান্ত রুটি আর তরকারি। কিন্তু রুটি মুখে দিয়াই মনে হইল, ইহার চাইতে জুতোর সুখতলা চিবাইয়া হজম করা সহজ। টানের চোটে মুখের বাঁধানো গোটাকয়েক দাঁত একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিবার বাসনা করিল।

—ত্তুত্তোর—

জোর করিয়া কয়েক টুকরা রুটি দাঁতে ছিঁড়িয়া বলরাম উঠিয়া পড়িলেন। হতভাগা দিনের পর দিন কী রান্নাই যে রাঁধিতেছে আজকাল! গৃহিণীহীন সংসারে চিরকাল যা হইয়া থাকে ঠিক তাই, এজন্যে আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই, রাগ করাটাও সমান মূল্যহীন এবং অবান্তর।

কিন্তু দোষ শুধু রাধানাথেরই নয়। সাবাস একখানা যুদ্ধ বাধিয়াছে বটে। মানুষকে একেবারে বেহদ্দ করিল, ত্রিভুবন দেখাইয়া ছাড়িল বলিলেই চলে। ধানচালের যাহা হইবার তাহা তো ষোলো আনাই হইয়াছে, আর আটা যা আমদানি হইতেছে ইদানীং তাহার তুলনা ভূ-ভারতে কোথাও মিলিবে না। করাতের গুঁড়া এবং ধানের তুঁষ মিলাইয়া যে কোনোদিন আটা নামক একটি খাদ্য হইয়া উঠিতে পারে, আর তাহা মানুষের পেটে ঢুকিয়া তাহার ক্ষুধা দূর করিতে পারে, কবিরাজী শাস্ত্রের কোনো পুঁথিতেই তাহার উল্লেখ নাই। এ কী ব্যাপার এবং কী এ বস্তু ?

বলরাম নিজেই উঠিয়া গড়গড়াটা ধরাইলেন। তারপর আসিয়া বসিলেন বাহিরের ঘরটাতে। বয়েস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটাও আজকাল অত্যন্ত হালকা হইয়া উঠিয়াছে। ছানি কাটানো চোখ দুইটা মাঝে মাঝে জ্বালা করে, এক-একদিন মাথার মধ্যে রক্ত চড়িয়া যায়, কপালের দুপাশের রগগুলি রক্তের চাঞ্চল্যে লাফাইতে থাকে—ঘুম আসে না। আজও ঘুম আসিবে বলিয়া মনে হয় না। বলরাম বসিয়া বসিয়া গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

কিছু কিছু মশার উপদ্রব বোধ হইতেছিল, দু'হাতে সেগুলি মারিতে মারিতে কখন যে তন্দ্রার আবেশ আসিয়াছে বলরাম ভালো করিয়া তাহা টের পান নাই। অস্পষ্ট হইয়া আসা চেতনার মধ্যে তিনি দেখিতেছিলেন—ডি-সিল্‌ভা মেজের উপরে উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে, দুর্গন্ধ বমিতে তাহার সর্বাঙ্গ ভাসিয়া গেছে, আর—

কড়াং—কড়াং—

দরজার কড়া নড়িল। কড়—কড়াং—

তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। তাকিয়ায় পিঠ খাড়া করিয়া ক্রুদ্ধ বিরক্ত বলরাম উঠিয়া বসিলেন —আঃ, এই রাত্রে আবার জালাইতে আসিল কে ? অসুখবিসুখ কী দিনই যে পাইয়াছে— রোগীদের অত্যাচারেই এবারে বলরামকে চর ইসমাইল ছাড়িয়া তল্পি-তল্পা গুটাইতে হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। ডাক্তারখানার শিশিতে তো খানিকটা লাল-নীল জল, অতএব—

কিন্তু দরজায় কড়া নাড়িতেছে অধৈর্য ভাবে।—কে ?

কোনো সাড়া আসিল না।

—কে ডাকে এখন ?

তবুও সাড়া নাই। সহসা একটা আশঙ্কায় বলরামের মন ভরিয়া গেল। চারদিকে যে একটা অশান্তি এবং বিক্ষোভের চাপা আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে এ সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। ধান নাই, চাল নাই। চর ইস্মাইলের মানুষগুলির রক্তে বিদ্রোহ জাগিতেছে। তাহারা এখানে ওখানে জমায়েত করিয়া স্থির করিয়াছে যেমন ভাবে হোক ধানচাল সংগ্রহ করিবেই। মহাজনের গোলা কিংবা আড়তদারের গুদাম—দরকার হইলে লুটতরাজ করিয়া লইতেও তাহাদের আপত্তি নাই। তাহাদের লক্ষ্যবস্তুর ভিতরে তিনিও যে একজন আছেন, একথাও বলরাম ভালো করিয়াই জানেন।

সুতরাং আতঙ্কে তাঁহার বুকের ভেতরটা বাঁশপাতার মতো কাঁপিতে লাগিল। উঠিয়া দরজা যে খুলিয়া দিবেন এমন শক্তি রহিল না, শুধু বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দুর্গানাম জপ করিয়া চলিলেন।

কিন্তু কড়—কড়াং। কড—কড়—কড়াং—

কড়া নাড়া চলিতেছে তো চলিতেছেই। বলরাম কান পাতিয়া শব্দটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। যে নাড়িতেছে সে খানিকটা সংশয়গ্রস্ত এবং ভীত। খুব সম্ভব ভিক্ষুক বলিয়া মনে হইতেছে। তবু বিশ্বাস নাই—সাড়া দেয় না কেন ?

মরীয়া হইয়া বলরাম হাঁকিলেন : কে ?

একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন পাওয়া গেল। কিন্তু কী শব্দ ? বলরাম কান পাতিলেন। একটা চাপা কান্না—কেউ যেন ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। হ্যাঁ—কোনো ভুল নাই, কান্নার শব্দই বটে। কিন্তু কার কান্না, কিসের কান্না ?

আর বসিয়া থাকা অসম্ভব।

—দাঁড়াও—দাঁড়াও—খুলছি—মরীয়া হইয়া একটা হাঁক দিয়া বলরাম উঠিয়া পড়িলেন। যা হওয়ার হোক। এই অশ্রান্ত কড়া নাড়া, রহস্যময় নীরবতার সঙ্গে কান্নার শব্দটা তাঁহাকে পাগল করিয়া দিতেছে। বলরাম আলোটার তেজ বাড়াইয়া দিলেন, তারপরে অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া দ্বিধা-কম্পিত হাতে দরজার হুড়কাটা টানিয়া খুলিয়া দিলেন। কে জানে, কোন্ ভয়ানক একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার বাহিরে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে !

কিন্তু বাস্তবিকই একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার বাহিরে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে যাহা ঘটিল অন্তত সে সম্ভাবনার জন্য মনের দিক হইতে

তিনি এতটুকু প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহাকে নির্বাক স্থবির করিয়া দিয়া একটি লোক ছুটিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। কিন্তু সে কী এবং কে বলরাম বুঝিতে পারিলেন না।

তাহার সর্বাঙ্গ বোরখায় ঢাকা। সেই বোরখার এখানে ওখানে কাঁচা রক্ত চাপ বাঁধিয়া আছে। ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া সে মাতালের মতো টলিতেছে।

ব্যাপার কী? ভৌতিক ঘটনা নাকি? না বলরাম ঘুমাইয়া আছেন এখনো?

কিন্তু বোরখায় ঢাকা রহস্যময় মূর্তিটি তাঁহার সামনেই তো দাঁড়াইয়া আছে। রক্তের দাগগুলি সম্বন্ধে সংশয়ের কোনো অবকাশই নাই। হায় ভগবান—এ কি সমস্যার মধ্যে তুমি নিরীহ গোবেচারী বলরাম শিবকূরকে টানিয়া আনিলে! শেষ পর্যন্ত খুনের মামলায় পড়িবেন নাকি তিনি?

—তুমি কে—কী চাও?

উত্তরে তেমনি বোরখার ভিতর হইতে চাপা কান্নার শব্দ। একটি মেয়ে—মুসলমানের মেয়ে আকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

বলরামের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া গেল। সমস্ত চৈতন্য সহ্যের শক্তিকে অতিক্রম করিয়া গেছে। পাগলের মতো তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন: কে তুমি, কী চাও?

মেয়েটি এবারেও জবাব দিল না। তার পরেই সোজা একেবারে বলরামের পায়ের উপরে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত বলরাম থ হইয়া রহিলেন। তারপর কী ভাবিয়া মেয়েটির মুখের উপর হইতে টানিয়া বোরখাটা সরাইয়া লইলেন।

গাল কপাল দিয়া রক্ত গড়াইয়া নামিয়াছে—একখানা সুন্দর মুখ সেই রক্ত মাখিয়া একটি পদ্মের মতো পড়িয়া আছে। অজ্ঞান হইয়া গেছে মেয়েটি, দাঁতে দাঁত লাগিয়াছে—বুকের ভিতর হইতে এক-একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন পাঁজর ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

দশ বছর পার হইয়া গেছে। তবু লণ্ঠনের আলোয় বলরাম তাহাকে চিনিলেন। শিরায় শিরায় রক্তে মাংসে কামনা কল্পনায় যে এতদিন ধরিয়া এমন ভাবে একান্ত হইয়া আছে তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া কি এতই সহজ! শুধু দশ বছর কেন, একশো বছরের বেশি হইয়া গেলেও বলরাম তাহাকে চিনিতে পারিতেন।

রক্তমাখা রক্তপদ্মের মতো যাহার মুখখানি, সেই মেয়েটি মুক্তো। দশ বছর আগে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ আবার তেমনি না বলিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে।

এগারো

কিছুক্ষণ বলরাম কোনো কথাই কহিতে পারিলেন না। যেন কী একটা যাদুমন্ত্রে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে শুরু করিয়া জিহ্বা পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গেছে। এ কি কখনো সম্ভব, এমন কি হইতে পারে কোনোদিন? তিন-তিলতার ঘর হইতে সেই উগ্র মদের গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকেও কি মাতাল এবং বিহ্বল করিয়া দিয়াছে?

বলরাম দাঁড়াইয়া রহিলেন। পা কাঁপিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে—বুকের দুদিক হইতে দুইটা প্রাণপিণ্ড ছুটিয়া আসিয়া যেন একসঙ্গে ঠোকাঠুকি করিতেছে। কিন্তু বিহ্বল নির্বোধ হইয়াও বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না তিনি। পায়ের নিচে ধরণী যেন রক্তাক্ত দেহটা নড়িতেছে—ঢেউয়ের মতো নিশ্বাস পড়িতেছে। বলরামের মনে পড়িল এমনিভাবে আর একবার তিনি টর্চের আলো ফেলিয়া দেখিয়াছিলেন: সিঁড়ির নিচে উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে একটি নারীমূর্তি, গল্‌গল্‌ করিয়া তাজা রক্তের ধারা নামিয়া তাহার সর্বাঙ্গ ভাসাইয়া দিতেছে। সে দশ বৎসর আগেকার কথা, আর আজ—

পায়ের তলায় পড়িয়া গোঙাইতেছে মুক্তো। মুক্তো—দশ বছর আগে একদিন যে বলরামের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল—যাহার বুকের মধ্যে অসহায় মাথাটা গুঁজিয়া তিনি শিশুর মতো ঘুমাইয়া পড়িতেন—তাহার সেই মুক্তো! মুহূর্তে যেন বিদ্যুতের চমকে বলরামের সর্বাঙ্গ নড়িয়া উঠিল।

—রাধানাথ, জল আন্, জল—

মণিমোহনের বোট যখন চর ইস্‌মাইলে বাংলোর ঘাটে আসিল, তখন রাত্রির শেষ প্রহর। ঝিমঝিম ঝিরঝির করিয়া সেতারের একটানা সুরের মতো যে বৃষ্টিধারাটা ঝরিয়া পড়িতেছিল, সেটা থামিয়া গেছে ঘণ্টাখানেক আগে। বৃষ্টির জলে উজ্জ্বল হইয়া অস্তপথিক নক্ষত্র-চক্র আসন্ন-প্রভাত পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া আছে শান্ত আর কোমল দৃষ্টিতে। ব্যাঙের অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-গান উঠিতেছে, ঝোপের মধ্যে পোকা ডাকিতেছে। কোথা হইতে বাসা-ভাঙা একটা কাক থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—যেমন আর্ত, তেমনই করুণ তাহার অসহায় স্বর।

মণিমোহনের সমস্ত চৈতন্যটা আগুনের মতো জ্বলিতেছে। দৃষ্টির সামনে অগ্নিশিখার মতো প্রখর ও ভাস্বর হইয়া শোভা পাইতেছে একখানা জীবন্ত বুদ্ধমূর্তি। সে মূর্তির চোখে দুইখানি নীলা বসানো। তাহা উপনিবেশের কোনো কালবৈশাখীতে ঝড়ের পিঙ্গল আলোর দীপ্তি বিকীরণ করিতে থাকে, তাহার পশ্চাতে কামনার শাণিত তীক্ষ্ণাগ্র একখানা

ছোয়া ঝলক জাগাইয়া যায়।

নৌকার মাঝি ঝপ করিয়া লগিটাকে ফেলিল। জল-কাদার মধ্য হইতে আকস্মিক শব্দ উঠিল একটা, যেন শেষ রাত্রির রহস্যময়ী নদীটা সেই বর্মী মেয়ে মা-কুনের মতো একটা কৌতুকের আনন্দে খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাঝি বলিল, হুজুর, উঠবেন না?

মণিমোহন জবাব দিল, নাঃ, থাক। এত রাত্রে আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘণ্টা তিনেক রাত আছে, নৌকোতেই ঘুম দিয়ে নেব এখন।

—সে কি হুজুর, কষ্ট হবে যে। ভালো বিছানা নেই, কিছু নেই—

—তা হোক, তা হোক।

মাঝিরা আর কথা কহিল না। হাকিমের মর্জির উপরে বলিবার কথা কিছুই তাহাদের নাই। মালসা হইতে আগুন লইয়া তাহারা হুঁকা ধরাইয়া আরাম করিয়া বসিল, দশ-পনেরো মিনিট ধরিয়া তামাক টানিল, মণিমোহনের দুর্বোধ্য চট্টগ্রামের ভাষায় খানিকক্ষণ কী গল্প করিল, তারপব একখানা কাপড় মুড়ি দিয়া যে যেখানে পারিল গুটিসুটি হইয়া পড়িল। আর শোয়া মানেই ঘুমাইয়া পড়িতে যা দেরি।

নদীর বুক হইতে শেষ বাত্রির হাওয়া নৌকার এখান ওখান দিয়া ভিতরে ঢুকিতেছে। কম্বলের মধ্যেও অল্প অল্প শীতের শিহরণ লাগিতেছে মণিমোহনের। তবে এ ঠাণ্ডাটা পীড়াদায়ক নয়—শরীরের ভিতর কেমন বিচিত্র একটা অনুভূতিকে জাগাইয়া তোলে মাত্র।

ইচ্ছা করিয়াই রাতটা সে বোটে কাটাইয়া দিতে চায। আজ দশ বৎসর পরে বর্মী মেয়েকে দেখিযা তাহার সমস্ত চিন্তা-চেতনাই যেন বিচিত্রভাবে বিশৃঙ্খল হইয়া গেছে। ঠিক সেই সব দিন যেন রক্তের মধ্যে সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে—যে-সব দিনে তাহার রক্তে প্রবেশ করিয়াছিল উপনিবেশের নির্মম রুদ্র-বসন্ত, উন্মত্ত বর্বর যৌবন! বাহিরের গর্জন-মুখর অকাল-অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দুইটি দেহের অণুতে অণুতে মশাল জ্বলিতেছিল, রাণীর মুখখানা ছায়াছবি হইয়া মিলাইয়া গিয়াছিল দৃষ্টির বাহিরে।

গায়ের মধ্যে জ্বালা করিতেছে, মাথাটা যেমন ভারী তেমনি গরম হইয়া উঠিয়াছে। মণিমোহন উঠিয়া বসিল। তাহার আবার নেশা ধরিতেছে নাকি? কাল দারোগা মেয়েটাকে লইয়া আসিবেন নিশ্চয়। সে কী বলিবে কে জানে!

কী বলিবে।

হঠাৎ মণিমোহনের চমক ভাঙিয়া গেল।

এ সে করিতেছে কী? সে কি পাগল হইয়া গেল? ওই অসচ্চরিত্র একটা মগের মেয়ে, নিজের স্বামীকে যে ইচ্ছা হইলেই খুন করিতে পারে, কামনার তাগিদে যে-কোনো লোককে আত্মসমর্পণ করিতে যাহার বাধা নাই এবং যে একসময় মণিমোহনকে নির্বোধের মতো

নাকে দড়ি দিয়া নাচাইয়াছিল, তাহার সঙ্গে সে আবার কথা কহিতে চায় কোন্ সাহসে এবং কোন্ লজ্জায়!

বর্মী মেয়েকে তো বিশ্বাস নাই। সেদিন যে ঝড়ের সন্ধ্যা তাহার জীবনে আসিয়াছিল, মণিমোহনের কাছে সেই বিস্ময়কর ভয়ানক মুহূর্তটির মূল্য যাহাই থাক, এ মেয়েটার কাছে তাহার দাম কতটুকু! ইহার এই-ই তো পেশা—যখন যাকে পায় কাছে টানিয়া লয়, দুদিনের জন্য তাহাকে মদের নেশায় আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তারপর একটা ভাঙা পুঁতুলের মতো ফেলিয়া চলিয়া যায়। মণিমোহনও একদিন তাহার পুতুল-খেলার সঙ্গী হইয়াছিল—তার বেশি কিছুই নয়।

মনে করো—কাল মেয়েটি হঠাৎ বলিয়া বসিল, একদিন মণিমোহনের সঙ্গে তাহার একটা অশোভন সম্পর্ক ছিল, একদিন মণিমোহন—

কথাটা ভাবিতেই অন্তরাত্মা তাহার চমক খাইয়া উঠিল। কী সর্বনাশ! সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টির সামনে কতখানি নামিয়া যাইবে সে! দারোগা জানিবেন, চর ইস্‌মাইলের সবাই জানিবে, রাণী জানিবে, কে জানিবে এবং কে জানিবে না! আর ব্যাপারটা হয়তো ওখানেই শেষ হইবে না, শ্রাদ্ধ আদালত পর্যন্তও হয়তো গড়াইবে এবং ওই নির্লজ্জ, ওই ভয়ঙ্কর নীলার মতো জলন্ত দুইটি শাণিত-নয়না মেয়েটি আদালতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া বসিবে—

তাহা হইলে? মণিমোহনের আচ্ছন্ন সত্তার মধ্যে বাস্তব পৃথিবীর তীব্র রূঢ় আলো আসিয়া পড়িল। দশ বছর আগে যাহা ঘটিয়াছিল আজ আর তাহা সত্য নাই—আজ আর সত্য হইতে পারে না। সেদিন দায়িত্ব ছিল না—জীবনের কোনো পরিপূর্ণ ভবিষ্যৎ রূপ ছিল না, শুধু রোমান্স্ ছিল, শুধু উদগ্র খানিকটা মাদকতা ছিল। কিন্তু আজ সে গেজেটেড অফিসার হইয়াছে, সরকারী চাকরির ক্রমোন্নতির পথ ধরিয়া চলিয়াছে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব সম্ভাবনার দিকে। রাণীকে সে ভালবাসে, ঝিণ্টুর মধ্য দিয়া তাহার নিজের মৃত্যু-হীন প্রাণ-প্রবাহকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। খ্যাতি, অর্থ ও আরাম। অফিসে আদালতে দশ বছর আগেকার এই কেলেঙ্কারিটা জানাজানি হইলে মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না, রাণীর কানে গেলে যেমন দুর্বহ, তেমনই বিড়ম্বিত হইয়া উঠিবে সমস্ত পারিবারিক জীবনটা। তাহার চাইতে—

কাল দারোগা আসিবার আগেই সে পালাইবে। পালাইবে এই চর ইস্‌মাইল হইতে। আগস্ট আন্দোলনের ফেরারী ধরা তাহার দায়িত্ব নয়, ও সম্বন্ধে মামুদপুরের দারোগা যাহা ভালো বোঝেন করিবেন। যে কাজে সে এখানে আসিয়াছিল, তাহা একরকম শেষ হইয়াছে, যাহা হয় নাই, তাহা সদর অফিসে ফিরিয়া গিয়া কাগজপত্র মারফৎ সারিয়া দিলেই চলিবে।

সে পালাইবে। আজ তাহার জীবন বদলাইয়াছে, তাহার যৌবন নাই। চর ইস্‌মাইলকে সে রক্তের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না, মানিয়া নিতে পারে না কালবৈশাখীর তরঙ্গ-তাণ্ডবে উন্মত্ত এই ভয়ানক নদীর দিগন্ত-বিস্তারকে, এখানকার বর্বর প্রাণোল্লাসকে। আজ তাহার মনের মধ্যে একদিকে দেখা দিতেছে লাল-কাঁকর-ফেলা সেই ছোট প্ল্যাটফর্ম, বাতাসে ভাঁটফুল আর আমের মুকুলের গন্ধ, পারুল-বনের মধ্যে প্রেমদাস বৈরাগীর আখড়া হইতে খোল করতাল আর কীর্তনের সেই ঐকতান। আর একদিকে রাত্রির অপ্সরী কলিকাতা—ফ্লাওয়ার মার্কেট, মেট্রো সিনেমা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের গা হইতে পাউডারের গন্ধ, আর অফিসারদের ক্লাবে বিলিয়ার্ড টেবিলে স্টিকের শব্দ, তকমা আঁটা বেয়ারার হাতে রুপার ট্রেতে বিলাতী মদের পাত্র। ঘরে রেডিয়ো খুলিয়া বসিয়া আছে রাণী, ঝিণ্টু তাহার খেলার মোটর লইয়া পিয়ারীর সঙ্গে অকারণ কলহাসিতে সমস্ত বারান্দাটা মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

নাঃ—সে পালাইবে। কাল সকালেই এবং যেমন করিয়া হোক। যৌবনের আত্ম-বিস্মৃত একটি বিহ্বল তরুণের সঙ্গে আজকের হাকিম মণিমোহনের কোনো মিল নাই, কোনো মিল থাকা অসম্ভব।

* * * *

ওদিকে কালুপাড়ার দিক হইতে জনতার উত্তাল তরঙ্গ চর ইস্‌মাইলের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

মজঃফর মিঞার গোলা পোড়াইয়া দিয়া তাহাদের রক্তেও আগুন ধরিয়াছে। এতদিন ধরিয়া যে ভয় এবং দ্বিধার ভাব তাহাদের চাপিয়া রাখিয়াছিল, সেটা সরিয়া গেছে। এখন তাহাদের ভয় নাই, সংশয় নাই, যুদ্ধ এবং মহাজনের পীড়নে যে জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল—তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে উপনিবেশের অমার্জিত উদ্বেল শক্তি। মরিতে যদি হয় তো সোজা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মরিবে না—যা হয় একটা কিছু করিয়া তবে ছাড়িবে।

সারা রাত টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি—বাদলের দমকা বাতাস বহিতেছে। তাহারই মধ্যে, সেই জল-বাতাস মাথায় করিয়া তাহারা মসজিদের মাঠে সভা করিল। মহাজনদের সকলকে দেখিয়া লইতে হইবে। চাল না পাওয়া যায়, তাহারা যেমন করিয়া হোক আদায় করিয়া লইবে। দিনের পর দিন এই যে একটা দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে, গায়ে রক্ত থাকিতে, হাতে লাঠি থাকিতে তাহারা কিছুতেই সেটা মানিয়া লইবে না।

সভায় জোর করিরা বক্তৃতা দিল জমির।

—ভাই সব, নিজের বরাত নিজের হাতে। কুকুরের মতো না খেয়ে মরব কেন আমরা? চলে এসো, যে ব্যবস্থা পারি আমরাই করব। আমরা জোয়ান—মরি তো

লড়াই করে মরব—

—আল্লা হো আকবর—

রাতের অন্ধকার ফিকে হইবার আগেই পাঁচশো লাঠিয়াল অগ্রসর হইল চর ইস্মাইলের দিকে। মামুদপুরের বনোয়ারী দারোগা তখন সুখ-শয্যায় পড়িয়া অচির ভবিষ্যতে ইন্‌স্পেক্টার হইবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন।

মণিমোহন বলিয়াছিল, রাণী, আজই সদরে ফিরতে হবে—এখনি। খুব জরুরী দরকার, খবর পেলাম।

ঘাটে বোট তৈরি হইতেছে। জিনিসপত্র সব তোলা হইয়া গেল। রাণীর শরীরটা এখনো দুর্বল—বোটের মধ্যে বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে। খিণ্টু মায়ের কাছে বসিয়া একমনে চকোলেট চুষিতেছে, পিয়ারী মাঝিদের ধমক দিয়া নিজের পদ-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

মণিমোহন পালাইতেছে। দারোগা আসিয়া কী ভাবিবেন কে জানে। কিন্তু সে কথা ভাবিলে তো মণিমোহনের চলিবে না। যাহা নিশ্চয় আর নির্ধারিত হইয়া গেছে—সেখানে নতুন করিয়া ঝড় আনিতে আর সে চায় না। জীবন্ত বুদ্ধমূর্তির মতো চোখ দুটির সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইতে আজ আর তাহার সাহস নাই।

ঠিক এমনি সময় আর একখানা নৌকা আসিয়া পাশে লাগিল। মণিমোহন চাহিয়া দেখিল, সামনে গলুইয়ে কবিরাজ বসিয়া।

—এ কি, কবিরাজ মশাই যে!

কবিরাজ ম্লানভাবে হাসিলেন।

—কোথায় চললেন?

—শহরে।

—নৌকোর ভেতরে কে?

কবিরাজ মুহূর্তে কেমন হইয়া গেলেন, পরক্ষণেই তাঁহার মুখ কঠিন ও দৃঢ় হইয়া উঠিল। স্থির শান্ত গলায় বলরাম জবাব দিলেন, আমার স্ত্রী।

দশ বছর আগেকার কথা ভুলিয়া গেছে মণিমোহন। শুধু বলিল, আপনার স্ত্রী? ওঃ!

মণিমোহনের মাঝিরা নৌকার নোঙর তুলিয়াছে। পাঁচ পীর বদর—বদর। সামনে সকালের নদী শান্ত ও উজ্জ্বল বিস্তারে যেন ঘুমাইয়া আছে। ঝড়ের গর্জন নয়—রাক্ষসী ভৈরবী মূর্তি নয়। জলের মৃদু কলধ্বনি যেন সঙ্গীতের মতো বাজিতেছে। ওপারে দিকচক্রবালে শ্যামল বনরেখার ধূ ধূ আভাস দেখা যাইতেছে—মাথার উপর নির্ভাবনায় উড়িয়া চলিয়াছে মাছরাঙা আর গাং শালিকের ঝাঁক।

মণিমোহন বলিল, আচ্ছা কবিরাজ মশাই, নমস্কার।

—নমস্কার।

ভাঁটার প্রখর টানে সরকারী বোটখানা ভাসিয়া গেল।

বলরামের নৌকাও এখনি ছাড়িবে। মাঝিরা বেশ করিয়া তামাক টানিয়া লইতেছে—অনেকখানি পথ পাড়ি জমাইতে হইবে। বলরাম অন্যমনস্কের মতো বিড়ি ধরাইলেন।

মুক্তোর সর্বাঙ্গে গভীর ক্ষত। বেশ বোঝা যায়, ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়া তাহাকে কোপাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার জ্ঞান এখনো ফেরে নাই, শহরে গিয়া ফিরিবে কি না কে জানে! বোধ হয় সম্পত্তির গোলমালেই নুরুল গাজীর সুযোগ্য পুত্রেরা তাহার এই অবস্থা করিয়া ছাড়িয়াছে।

কিন্তু ওসব ভাবিবার দরকার তাঁহার নাই। আজ মুক্তো তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে—আজ আবার তাহাকে তিনি গ্রহণ করিবেন। এই চর ইস্‌মাইলে যেখানে সমাজ নাই, মানুষের বাঁধাধরা নিয়মের দোহাই মানিয়া যেখানে জীবন সরল রেখাতেই বহিয়া যায় না—সেখানে মুক্তোকে নতুন করিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার দ্বিধা নাই, সংশয়ও নাই। তাই বোরখা খুলিয়া তিনি তাহাকে শাড়ি পরাইয়া দিয়াছেন—পরাইয়া দিয়াছেন দশ বছর আগেকার তুলিয়া রাখা অতি-যত্নের ময়ূরকণ্ঠী শাড়িখানা। শহরে গিয়া মুক্তো যদি বাঁচে, তাহা হইলে এই শাড়ি পরাইয়া মুক্তোকে তিনি নতুন করিয়া ঘরে তুলিবেন, নতুন করিয়াই তাঁহার মিলন-বাসর রচনা হইবে।

মুক্তো ঘুমাইয়া আছে। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন নাই, পরম নিশ্চিন্ত, পরম আশ্বস্ত। যেন সারা রাত ঝড়ের মধ্যে ঘুরিয়া ক্লান্ত ভীত একটা পাখী নীড়ে আসিয়া তাহার আপনার জনের বুকের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে। বলরাম নাড়ী দেখিলেন। দুর্বল, কিন্তু স্বাভাবিক। এ পর্যন্ত আশঙ্কার কারণ নাই।

মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিয়াছে, এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে পাগলের মতো রাধানাথ আসিয়া উপস্থিত হইল।

—বাবু, বাবু, সর্বনাশ!

—কী হয়েছে?

—পাঁচশো লোক এসে চড়াও হয়েছে—ধান লুঠ করে নিয়ে গেল! এখানে ওখানে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে—সব যে গেল!

—যাক।

—সে কি! আমি কী করব বাবু?

—যা খুশি! মাঝি, নৌকো খোলো।

চর ইস্‌মাইলে বলরামের আর আকর্ষণ নাই। যদি কখনো ইচ্ছা হয় ফিরিবেন, নতুবা

নয়। যাক—সব যাক। আজ মৃত্যুকে ফিরিয়া পাইয়াছেন, সব পূর্ণ হইয়া গেছে। চর ইস্‌মাইলে না হোক—এত বড় পৃথিবী, এত বিরাট, এর কোথাও কি তাঁহারা স্থান করিয়া নিতে পারিবেন না? সারা জীবন ঘর বাঁধিবার যে ব্যর্থ বাসনা লইয়া তিনি শুধু বিষয়-সম্পত্তির মূল্যহীন বোঝাটাকেই ছানিয়া চলিয়াছেন—আজ সেই বোঝা নামাইয়া দিয়া একটিমাত্র প্রেমকেই স্বীকার করিতে চান তিনি।

রাধানাথ কথা কহিল না। সে শুধু বালির উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

* * * *

চর ইস্‌মাইলের দুরন্ত যৌবন জাগিয়াছে। নতুন কালে, নতুন রূপে। ইহার কাছ হইতে মণিমোহনেরা পালাইতে চায়, বলরামরা ইহার বিচিত্র বিপুল সংঘাতকে সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে কতটুকু ক্ষতি! মৃত্যুঞ্জয় অমার্জিত মানবসত্তা এখানে নিঃশব্দ ও নিভৃত আয়োজনে দিনের পর দিন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে নিজেকে। এই বিশাল-ব্যাপ্ত জলরাশি হইতে—এই ঝড়ের আকাশ হইতে—বিলুপ্ত পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভাঙা পঞ্জর হইতে—এখানকার অসংযত আরণ্য-কামনা হইতে। সেদিন হয়তো দূরে নয়—যেদিন এখান হইতেই নিজেকে প্রকাশিত করিবে বাংলার গণশক্তি—বাংলার প্রচণ্ড ও বিপুল প্রাণশক্তি।

সে ইতিহাস—দৈনন্দিন, সে ইতিহাস—ধারাবাহিক। তাহার সমাপ্তি নাই, উপসংহারও নাই। আজ উপনিবেশ হইতে চারশো মাইল দূরে বসিয়া সে অনাগত বিপুল কাহিনীর আমি ভূমিকা মাত্র রচনা করিয়া গেলাম, নতুন যুগের মানুষ আসিয়া তাহাকে সমাপ্ত করিবে।

সূর্য-সারথি

অগ্রণী কথাকার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রজপ্রতিমেষু

এক

বাড়িটা নিকুঞ্জ ঘোষ কিনেছিলেন যুদ্ধের হিড়িকে।

সে একটা আশ্চর্য সময়। রেঙ্গুনে জাপানী বোমা পড়েছে। তার স্প্লিন্টার অবশ্য কালাপানি পেরিয়ে হুগলী নদীর তীর পর্যন্ত এসে পৌঁছোয়নি—কিন্তু দানবীয় একটা আতঙ্কের বিভীষিকা এসে নেমেছে নিষ্প্রদীপ কলকাতার ওপরে। প্রতিবেশী শহর রেঙ্গুন। আউটরাম ঘাট থেকে জাহাজে উঠলে চোখ বুজে সেখানে গিয়ে পৌঁছুনো চলে। সেখান থেকে খোলা আকাশ বেয়ে বোমারুবহরের কলকাতায় আসতে আর কতক্ষণ?

গড্ডলিকা প্রবাহের পেছনে তাড়া করলে নেকড়ে বাঘ।

হাওড়ায় শেয়ালদায় মানুষের উন্মত্ততা। ব্যবসা, চাকরি, দেশসেবা, সাহিত্য আপাতত একটি মাত্র জৈবিক তাগিদে রূপায়িত হয়েছে। যঃ পলায়তি। নিত্য নতুন গুজবের হিড়িক, পাড়ায় পাড়ায় রয়টারের নিজস্ব সংবাদদাতাদের যুদ্ধ-সংবাদ পরিবেশন। ১৯৪৩ সালের অবিশ্রান্ত জনসমুদ্র এই কলকাতা, সেদিন যেন মজা নদীর চড়া। ছত্রিশ ফ্ল্যাটের শূন্য বাড়িতে দু'ঘর নিরুপায় ভাড়াটে অসহায় ভয়ে থরহরি কম্পমান।

মেদিনীপুরের ঝি মেদিনীপুরে পলাতকা, উৎকলের ঠাকুর পুরী প্যাসেঞ্জারে ওঠবার জন্যে হাইকোর্ট থেকে হাওড়া পর্যন্ত কিউ করেছে। আজমীরের আগরওয়ালা আর বোম্বাইয়ের বাটলিওয়ালা ফার্স্ট ক্লাস কাউণ্টারের সামনে মল্লযুদ্ধ করছে। বি. এ. আরের কেরানীরা পিতামহ থেকে পৌত্র পর্যন্ত পরিবৃত বিরাট সংসারের হাঁড়ি কলসী সিঙ্গার মেসিন নিয়ে স্টেশনের কল্পনাতীত ভিড়ে অনন্ত প্রতীক্ষায় সমাসীন। ছাপরা মজঃফরপুর লাহেরিয়া সারাইয়ের কুলিকামিন, রিকশওয়ালা আর গোয়ালার দল গঙ্গা পেরিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরেছে—ককেশাসের পাদমূল থেকে আদিমযাত্রী আর্য পূর্বপুরুষদের মতো।

হোটেল তালাবন্ধ—চায়ের দোকান সাহারা মরুভূমির মতো নীরস আর নির্জন। বারো আনা সেরের মাছ বাজারে চার আনায় নেমেছে—কেনবার লোক নেই। টাকায় বত্রিশটা দরের ফুলকপি পচে স্তূপাকার হয়ে আছে। চীপ মীড ডে'র প্রায় শূন্য ট্রামগাড়ি বিষণ্ণ শীতের রৌদ্রে নিষ্প্রাণ পথের ওপর দিয়ে ঢনঢন করে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে যায়। দূর নিঃশব্দ গলির মধ্যে ওই শব্দটা যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত বহন করে আনে। শুধু ছায়া-চিত্রের প্রেক্ষাগারগুলো দিনান্তে এখনো কিছু পরিমাণে জনসঙ্কুল হয়ে উঠে; প্রতিমুহূর্তের দুঃস্বপ্নকে মানুষ এখানে ভুলে থাকতে চায় অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে, সস্তা হাসিতে, সুলভ কান্নায়।

কিন্তু সেখানেই কি নিষ্কৃতি আছে? রূপালী পর্দার ওপরে প্রথমেই সেই দুঃস্বপ্নকে

সজাগ করে দিয়ে আলোর লেখন ফুটে ওঠে : যদি সাইরেন বাজে তাহা হইলে—

তারপরেই নিউজ রীল। আকাশে বোমারুর গর্জন, শিঁ-ই-ই স্ক্রীমিং বোমার আর্তনাদ, তাসের ঘরের মতো ধ্বসে পড়েছে অভ্রবিলেহী সৌধমালা। ট্যাঙ্ক টমিগান আর রাইফেল নিয়ে হেলমেট-পরা অগণিত অমানুষিক ছায়ামূর্তি বোমা-বিধ্বস্ত প্রতীচ্যের রণাঙ্গন বেয়ে মার্চ করে চলেছে।

পথেঘাটে দেখা হলে একটিমাত্র প্রসঙ্গ।

—কী মশাই, পালাননি এখনো ?

—পালাবো আর কোথায় বলুন ? থাকতেই হবে এখানে।

—নিতান্তই তাহলে মরবার ইচ্ছে হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

সম্বোধিত ব্যক্তিটি জোর করে সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করে। বলে, আরে মশাই, এত বড় কলকাতা। চারদিকে এত মিলিটারী টার্গেট। সে সব ছেড়ে কি এই পটলডাঙা স্ট্রীটে আমার ঘাড়েই বোমা এসে ছিটকে পড়বে ?

—তা না হয় না পড়ল। কিন্তু কনসক্রীপশন হবে যে।

—কনসক্রীপশন ? সে আবার কী ?

—কনসক্রীপশন বোঝেন না ? বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে যোগদান করাবে। বেকায়দা দেখলে নিজেরা ঘটিবাটি তুলে চম্পট দেবে ইংলিশ চ্যানেল ডিঙিয়ে আর কলকাতাকে ডিক্লেয়ার করে যাবে 'ওপন সিটি' বলে। তারপর কী হবে বলুন তো ?

অপরপক্ষ নীরব।

তারপর এসে ঢুকবে জাপানীরা। আপনারা যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করেছেন, সবাইকে গড়ের মাঠে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিপ্পনী কায়দায় বেয়নেট প্র্যাকটিশ চালাবে।

শ্রোতার মুখের ভাব অবর্ণনীয়। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে—হাঁটু কাঁপছে ঠকঠক করে। ক্ষীণ দুর্বল গলায় প্রশ্ন আসে : আর আপনি কী করছেন ?

—আমি ? আমি আজ বাড়ির সবাইকে নিয়ে দেওঘরে পাড়ি দিচ্ছি। তিনশো টাকা ঘুষ দিয়ে বার্থের ব্যবস্থা করা গেছে—আমার এক ভায়রাভাই আবার হাওড়া স্টেশনে কাজ করে কিনা।

—কিন্তু চাকরি ?

—চুলোয় যাক। প্রাণে বাঁচলে অমন চাকরি ঢের মিলবে মশায়।

—দেওঘরে থাকবার বন্দোবস্ত করেছেন বুঝি ?

—না, এখনো কিছু হয়নি। নইলে যেখানে জায়গা হয়—গিরিডি, মধুপুর, কার্মাটার, শিমুলতলা। আর কিছুই যদি না পারি তো যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকব।

বোমার ঘায়ে ছুঁচো জখম হয়ে থাকার চাইতে দিন কয়েক [illegible] সেও ভালো।

বক্তা একটা সিগারেট বাড়িয়ে দেয় শ্রোতার দিকে। কিন্তু শ্রোতার মানসিক অবস্থা সিগারেট খাওয়ার মতো নয়। শুকনো গলায় শুধু জবাব দেয়, নোঃ, থ্যাঙ্কস!

ঠিক এই সময়ে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ওপরে বাড়িখানা কিনেছিলেন নিকুঞ্জ ঘোষ।

ঝকঝকে নতুন বাড়ি। চারতলা মিলিয়ে চব্বিশখানা ঘর, দুটো গ্যারেজ, গোটা আটেক কল আর বাথরুম। পূব দক্ষিণের পথে অবাধ আলোবাতাস। নিচে বিস্তৃত উজ্জ্বল উত্তর কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপথ।

বাড়ির মালিক ছিল এক বুড়ো ভাটিয়া। সংসারে থাকবার মধ্যে তার একমাত্র ছেলে —মস্ত বড কারবারী করাচীতে। বুড়ো চন্দনদাস কলকাতার ব্যবসা দেখাশোনা করত। হৈ-চৈ হাঙ্গামার খবর পেয়ে ছেলে চিঠি লিখল: শুনছি কলকাতা নাকি বোমা পড়ে অর্ধেক উডে গেছে। ওখানে আর মরবার জন্যে পড়ে আছ কেন? ঘর-বাড়ি-গদী যে দামে পাও ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসো এখানে। তোমার ছেলে কেশবদাস-চন্দনদাস বেঁচে থাকতে কোনো ভাবনা নেই।

চায়ের ব্যবসায় নিকুঞ্জ ঘোষের সঙ্গে চন্দনদাসের বিশ বছরের বন্ধুত্ব। সুতরাং বাঙলা দেশের বাড়ি বাঙালীর হাতে তুলে দিয়েই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল চন্দনদাস। নামমাত্র দামে বাড়ি কেনা হল। কিন্তু কেনাই হল, কাজে আর লাগল না। নিকুঞ্জ ঘোষ ও সম্বন্ধে সব আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত জানতেন, বোমার মুখে ও বাড়ি গুঁড়িয়ে যাবে, দু-চার টুকরো ইটপাথর ছাড়া ওর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। চন্দনদাস কিন্তু ভরসা দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, ভাই, তুমি যে কতখানি জিতলে তা তুমি নিজেই জানো না। যে গুজব আর হুজুগের হিড়িক আজ দেখতে পাচ্ছ, দুদিন বাদে তার কিছুই থাকবে না। আমি যে ভয় পেয়ে পালাচ্ছি তা নয়। তবে বয়েস হয়ে গেছে, কলকাতার কারবার নিজে ভালো করে দেখতে পারছি না—বেধড়ক চুরি বাটপাড়ি হচ্ছে। তা ছাড়া দেশের জন্য বড মন কাঁদছে—শেষ কটা দিন আরামেই কাটাতে চাই। তাই দোস্ত তুমি, —বাড়িটা তোমাকে দিয়েই দিলাম একরকম।

নিকুঞ্জ ঘোষ হেসে বলেছিলেন, দিয়েই যখন দিচ্ছ, তখন এ কয়টা টাকা আর হাতে করে নিচ্ছ কেন?

চন্দনদাসও হেসেছিল—শাদা-শাদা বাঁধানো দাঁতগুলো বার করে ভারী মিষ্ট সে হাসি। জবাব দিয়েছিল: জাত বানিয়ার বাচ্ছা আমি। বিনাদামে কাউকে কিছু দিলে আমাদের ধর্মকে অপমান করা হয়। তাই কিছু নিলাম। কিন্তু তুমি তো জানো ভাই, যে টাকা তুমি দিয়েছ, ওতে বাড়ির কড়ি-বরগারও দাম হয় না।

নিকুঞ্জ ঘোষ আর কিছু বলেননি। কিন্তু তিনি মনে মনে স্থির জানতেন ও বাড়ি

বোমায় উড়বেই, আর ভাঙা আবর্জনার স্তূপ বিক্রি করে সে ছুর্দিনে হয়তো পঞ্চাশটা টাকাও ঘরে আসবে না। কিন্তু চন্দনদাসকে সে কথাটা বলতে মনের কোণে কোথায় যেন বাধল।

বাড়ি তো কেনা হল, এখন দেখাশোনা করে কে? একটা দারোয়ান কিংবা চাকর পাওয়া ছুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিকুঞ্জ ঘোষ গোটাকয়েক তালা মারলেন এখানে ওখানে। ওদিকে মাঝে মাঝে মহলা সাইরেন বাজছে। তার ককিয়ে কান্নার মতো কাঁপা একটানা শব্দটা কানে ভালো লাগে না, মনে তো নয়ই। বড়বাজারের ভাঙা বাজার থেকে কিছু কেনা-কাটা সেরে হ্যারিসন রোডের একটা নির্জন-প্রায় হোটেলে তিনি ফিরে এলেন। দার্জিলিং মেলে ওঠবার জন্তে যখন জিনিসপত্র বাঁধছেন এমন সময় পেছনে শুনতে পেলেন লঘু পায়ের শব্দ।

বিস্মিত হয়ে নিকুঞ্জ ঘোষ পেছনে ফিরে তাকালেন।

একটি তরুণী মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্যামবর্ণ, ছোটখাটো চেহারা। এক হাতে প্যারাসোল, আর এক হাতে বইপত্র। বড় একটা চামড়ার ব্যাগ, যে জাতীয় ব্যাগ মেয়েরা সাধারণত ব্যবহার করে না—মোটা চামড়ার স্ট্র্যাপের সঙ্গে কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

নিকুঞ্জ ঘোষ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এমন জায়গায় মেয়েটিকে তিনি আশা করেননি—কেউ করেও না।

বড় স্যুটকেসটার বেল্ট বাঁধা স্থগিত রইল। বললেন, আরে এ কে? সুস্মিতা নয়?

—কেন কাকাবাবু, এর মধ্যে এতই কি বদলে গিয়েছি আমি? চিনতে কষ্ট হচ্ছে?

—না, না—তা নয়। তারপর, ভালো আছো তো? এখানে এলেই বা কী করে?

—ভালোই আছি। আপনার এখানকার ঠিকানা বাবার চিঠিতে জেনেছিলাম। এ পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম—ভাবলাম যদি পাই তো দেখাটা করে যাবো।

—বেশ করেছ। আজই চলে যাচ্ছি আমি, পরে এলে দেখা হত না—

নিকুঞ্জ ঘোষ চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত: যাচ্ছ কবে?

—যাব? কেন?

নিকুঞ্জ ঘোষ চমকে গেলেন: কেন কী? কলকাতার অবস্থা তো দেখতে পাচ্ছ। কোন্ দিন কী হয় ঠিক নেই। তোমার বাবা লিখেছিলেন তোমাকে নিয়ে যেতে। আমার সঙ্গেই চলো না হয়।

—না কাকাবাবু, সে হয় না। এখন আমি যেতে পারব না।

—যেতে পারবে না? এখানে এখন কী কাজ তোমার?

সুস্মিতা হাসল, জবাব দিল না।

—তোমার ইউনিভার্সিটি তো বন্ধ হয়ে গেছে। এখন এখানে থেকে আর—

—না কাকাবাবু, যাওয়ার উপায় নেই। জলপাইগুড়িতে আপনি তো নামবেনই, বাবাকে বলে যাবেন আমার জন্যে ভয়ের কিছু নেই, আমি ঠিক আছি।

—কিন্তু এ কি ভালো করছ? নিকুঞ্জ ঘোষের গলায় অভিভাবকতার স্বর: কোন্ দিন যে কী হয়ে যায়!

—সেইটে দেখবার জন্তেই তো আরো থাকতে ইচ্ছে করছে: স্থমিতার গলায় মধুর আবদার: যুদ্ধের খবর কাগজেই পড়লাম, চোখে কখনো কিচ্ছু দেখতে পাইনি তো। এই স্থযোগে যদি পাওয়া যায়—

বিস্ময়ে খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলেন নিকুঞ্জ। কী আশ্চর্য এই একফোঁটা মেয়ের সাহস! বড় বড় পালোয়ান আর জাঁদরেল লোক যখন ভয়ে ইঁদুরের মতো চিঁ চিঁ করছে, আর পালাবার জন্যে আঁদাড়পাঁদাড় খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন এই মেয়েটার প্রাণে বিন্দুমাত্র ভয় নেই!

—বড্ড হঠকারিতা করছ মা। কখন কী হয়—

—সে ভাবনা ভাবছি না কাকাবাবু, মুশকিল হয়েছে থাকবার জায়গা নিয়ে। হস্টেলে তো তালাবন্ধ। কোথায় যে থাকি—

চট করে নিকুঞ্জ ঘোষের একটা কথা মনে পড়ে গেল। মেয়েটা তো বেপরোয়া, বোমাই পড়ুক আর যাই পড়ুক, এখান থেকে নড়বে না। তা হলে তাঁর অত বড় বাড়িটাই বা এমন রক্ষকহীনভাবে অনাথ হয়ে পড়ে থাকে কেন? স্থমিতা বরাবরই চালাক আর চটপটে মেয়ে, সে সব দিকই যোটামুটি বজায় রাখতে পারবে, অবশ্য যতদিন না বোমার মুখে হাওয়ায় উড়ে যায়।

প্রস্তাবটা শোনবামাত্র স্থমিতা যেন আনন্দে নেচে উঠল।

—বেশ তো, বেশ তো কাকাবাবু। আমি তা হলে বাঁচি, মস্ত একটা দুর্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

—কিন্তু অত বড় বাড়ি একা একা—

—সে সব ঠিক করে নেব কাকাবাবু, আপনি ভাববেন না।

—তবু তুমি আমার সঙ্গে চলে এলেই বোধ হয় ভালো করতে।

—কে জানে কী ভালো হচ্ছে।—স্থমিতা চাবির গোছা তুলে নিয়ে নিকুঞ্জ ঘোষের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিকুঞ্জ তাকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানালেন। তাঁর বাড়ি যায় যাক, কিন্তু মেয়েটা যেন না মরে, বেঁচেবর্তে থাকে—

ঘুষ দিয়ে টিকেট আগেই কেনা আছে, এখান থেকে দু'পা শেয়ালদা অবধি যেতে রিক্শা-ভাড়া নিলে দু টাকা। পথ দিয়ে বন্যার মতো ধারায় চলেছে ভয়ার্ত মানুষের

শোভাযাত্রা। ঠিক শোভাযাত্রা নয়, শবযাত্রা। ছেদহীন ট্রাফিকে পলাতকদের বহু আপার গৃহস্থালির সরঞ্জাম—অনেক শুকিয়ে যাওয়া সাজানো বাগানের কাঁসার জিনিসপত্র থেকে শুরু করে পায়া-উঁচু-করা ডাইনিং টেবিল পর্যন্ত। সেই মহামানবের স্রোতে নিকুঞ্জ ঘোষও মিশে গেলেন, আপাতত এযাত্রা বোধ হয় রক্ষাই পেয়ে গেলেন জাপানী বোমার হাত থেকে। দার্জিলিং মেল ছাড়তে সাড়ে চার ঘণ্টা দেরি আছে এখনো।

সেদিকে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল সুমিতা। তারপর হাতের মুঠোর মধ্যে চাবির গোছাটা নিয়ে অন্যমনস্কভাবে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করে দিলে।

পৃথিবীটা অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে। বদলে গেছে মানুষের মন—পলায়নী ছাড়া আর শাশ্বত সমস্ত বৃত্তিগুলোই যেন ভোঁতা হয়ে গেছে একসঙ্গে। তাই সুমিতাকে দেখে কেউ হাঁ করে তাকিয়ে রইল না, কেউ শিস দিলে না, আলগাভাবে কেউ একটুখানি ধাক্কাও দিয়ে গেল না ওকে। যুগান্তর ঘটেছে যেন চারদিকে—পৃথিবীতে সত্য যুগ এবারে নেমে আসবে বলেই ভরসা হচ্ছে।

চারদিকে টুকরো টুকরো উত্তেজিত আলোচনা। একই আলোচনা।

—ওদের আর কিছু নেই, এবারে ডুবল বলে—

—ফ্ল্যাণ্ডার্সে যে মারটা খেল, দেখলেন না?—শুনেছেন হাওড়া ব্রীজের ওপারে স্টেশনের দিকে আর এগনো যাচ্ছে না—

—অদ্ভুত জাত বটে এই জাপানীরা। কী কাণ্ডটাই না করলে সিঙ্গাপুরে। এই বেঁটে ব্যাটারাই দুনিয়ায় কীর্তি রাখলে দাদা।

—তাড়াতাড়ি চল বাবা রিক্‌শ, নইলে ঢাকা মেলে নাক গলাবারও উপায় থাকবে না যে। না হয় আরো কিছু বকশিশ দেব—

সেই পুরানো ভয়, পুরানো যুদ্ধের খবর। অসুস্থ, অসংলগ্ন কলকাতা। সমস্ত শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতার ওপরে ছেদের একটা আকস্মিক সীমারেখা নেমেছে এসে। হঠাৎ ভয় পেয়ে জ্বরে পড়লে যেমন হয়, তেমনি ভূতগ্রস্ত বিকারের রোগীর মতো দুটো ভয়াতুর রক্তবর্ণ চোখ মেলে কলকাতা প্রলাপ বকছে।

—টেলিগ্রাম—টেলি—গ্রা—আ—আ—ম্—

—কী বাবা, আবার নতুন কী খবর?

—এই কাগজওয়ালা!

—এদিকে এসো তো একবার ভয়দূত, স্বর্ণলঙ্কার কোন্ দেউটিটি আবার নিভল দেখা যাক—

—টেলিগ্রা—ম্—ম্ বাবু, লড়াইয়ের জোর খবর, দু পয়সা—

—Fall of—অ্যা! Successful retreat—তাই নাকি! এযাবৎ তো এই

ওস্তাদিটুকুই দেখিয়ে আসছ সোনার চাঁদেরা। আরো কিছু পারলে তো বেঁচে যেতাম।

—না মশাই, অত সহজে হবে না। এ যুদ্ধে ফ্যাসিস্ট্‌রা এবারে মরবেই, তাই শেষ দশায় পিঁপড়ের পাখা উঠেছে।

—হুঁ, পাখা যে কাদের উঠেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

মাথার ওপর দিয়ে আর. এ. এফ.-এর বিমান উড়ে গেল। জনতার মধ্যে জয়ধ্বনি, নানা রকমের টীকা-টিপ্পনী।

—যাও না বাপু, জাপানে গিয়ে গোটাকয়েক ডিম পেড়ে এসো গে।

—অত সস্তা নয়, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট দাঁত খিঁচিয়ে আছে সেখানে।

—আমেন জনি, হ্যারি, টমি। তোমাদের বারোটা তো বেজেছে। এখন প্রার্থনা কার আত্মাগুলো শান্তিলাভ করুক। আমেন—আমেন।

পরম দুঃখের মধ্যেও রসিকতা করতে পারে বাঙালী। জাতটার আর কিছু না থাক, এই বৈশিষ্ট্যটুকু যে এখনো বজায় আছে—এটা মনে করেই যেন স্মিতা আশ্বাস পেল খানিকটা।

চলতে চলতে একটা ওষুধের দোকানের সামনে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বড় দোকান, কিন্তু এখন তার শোভা বিশেষ কিছু চোখে পড়ছে না। শো কেস-গুলোতে যে সব শিশি বোতল প্যাকেট সাজানো আছে, তারা যেন কেমন একটা অসহায় করুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় ওগুলো শুধু দোকানের ফাঁপা অলঙ্কার—ভেতরে সারবস্তু বিশেষ কিছু নেই। কাচের গায়ে কাগজের আর কাপড়ের অসংখ্য পটি আঁটা—বোমার ঝাঁকুনির প্রতিষেধক।

কয়েক মিনিট কিছু একটা ভেবে নিলে স্মিতা। রাস্তার উদ্দাম জনযাত্রা গায়ের ওপরে প্রায় নদীর স্রোতের মতো এসে পড়ছে। এত লোকের কি দাঁড়াবারও জায়গা হবে শেয়ালদা স্টেশনে?

একটু ইতস্তত করে স্মিতা ওষুধের দোকানে ঢুকল।

কাউণ্টারে লোকজন নেই। শুধু একপাশে বুড়োমতন একজন ভদ্রলোক বসে খাতায় কী হিসেব লিখছিলেন। চোখেমুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া।

—কী চাই মা?

—একটু ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?

—নিশ্চয়।

ফোন তুলে নিয়ে স্মিতা একটা খবরের কাগজের অফিসকে ডাকলে। আদিত্য অফিসেই ছিল, পাওয়া গেল তাকে।

—কী খবর স্মি?

—খবর আছে—খুব ভালো খবর।

—চটপট বলে ফেল।

—এত তাড়াতাড়ি নয়। তোমাকে আসতে হবে।

—এখুনি ?

—এখুনি।

—অসম্ভব। এখন রয়টারের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ করছি আমরা। গান-পয়েন্ট আগলে বসে আছি, নড়বার জো নেই।

—চালাকি নয়। আধঘণ্টার মধ্যে আসা চাই—মণিদির ওখানে।

—এক ঘণ্টা সময় দাও তবে।

—আচ্ছা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। এক সেকেণ্ড ওদিকে নয়।

—তাই তো, মুশকিল ! আচ্ছা—চেষ্টা করছি।

—চেষ্টা নয়—অবশ্য অবশ্য। নইলে তুমিই ঠকবে, আমার কী !

—আচ্ছা।

ফোনটা রেখে সুমিতা এগিয়ে গেল ভদ্রলোকের দিকে। ব্যাগ থেকে তিন আনা পয়সা টেবিলে রেখে বললে, ধন্যবাদ—নমস্কার।

দুশ্চিন্তা-বিবর্ণ ভদ্রলোক খাতা থেকে চোখ না তুলেই বললেন, নমস্কার।

সুমিতা আবার রাস্তায় নেমে পড়ল।

দুই

মণিকাদির আস্তানা সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে—নরেন্দ্র সেন স্কোয়ারের পাশেই।

বাড়িটা পুরোনো। চুনসুরকির আস্তর ঝরে গিয়ে সারা গায়ে যেন অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন ফুটে উঠেছে। যুদ্ধের দোহাই দিয়ে বাড়িওলা চুপ করে বসে আছে, অনেক আবেদনেও ফল হয়নি। তারই মাঝখানে মণিকাদির ঝকঝকে সাইনবোর্ডটা কেমন বিচিত্র আর বেমানান লাগে দেখতে।

বাইরের চেহারা যত বিবর্ণই হোক—ভেতরের ব্যাপারটা অত খারাপ নয়। পুরোনো বাড়ির পুরোনো ঘরকেই যতদূর সম্ভব সুন্দর করে সাজাবার চেষ্টা করেছে মণিকা। একা মানুষের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে অনেক বেশিই সে রোজগার করে। তাই দেওয়ালের শাদা চুনকামের ভেতর দিয়ে কতগুলো বিশ্রী আর খয়েরী রঙের দাগ এলো-মেলো ভাবে ফুটে বেরুলেও মণিকার সাজানোর গুণে সেগুলোকে যেন তেমন পীড়াদায়ক বলে মনে হয় না।

ইচ্ছে করলে অবশ্য বাড়ি বদলাতে পারত মণিকা—যে কোনো সুন্দর নতুন বাড়িতে সুন্দর করে গুছিয়ে নিতে পারত। কিন্তু বাড়ি বদলানো সম্পর্কে তার ভয়ঙ্কর একটা আলসেমি আছে। মন্দ কী—এই তো বেশ। তা ছাড়া দশ বছর আগে যখন প্র্যাকটিশ জমে ওঠেনি, তালি দেওয়া জুতো আর সেলাই করা কাপড় পরে যখন তাকে কলকাতার রাস্তায় পথ হাঁটতে হত, তখন থেকেই এই বাড়িটার সঙ্গে অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি তার জড়িত। তাই এর ওপরে কেমন যেন একটা মায়া বসে গেছে মণিকার।

মোটা মানুষ—মনের দিক থেকেও ভারী শান্ত আর স্তিমিত। কোনো রকম হাঙ্গামা হট্টগোলটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না। তাই যেমন বিশ্রী তেমনি একটা তীব্র বিরক্তি বোধ হচ্ছিল মণিকার। এতদিন পরে সত্যিই কি বাড়ি বদলাতে হবে নাকি? শুধু বাড়ি নয়—ছেড়ে যেতে হবে কলকাতাকে? একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চিন্তাকুল চোখে মণিকা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সামনে নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার। স্কোয়ার নয়—স্কোয়ারের একটা নকল একমুঠো সংস্করণ। ধুলোভরা খানিকটা বিবর্ণ জমির চার পাশে সযত্নে লোহার রেলিং দেওয়া। মাঝে তিন-চারটে লোহার বেঞ্চি পড়ে আছে, তাদের চেহারাও সমান বিবর্ণ এবং বয়োজীর্ণ। সব চাইতে উপভোগ্য নানাবিধ নিষেধ সম্বলিত কর্পোরেশনের সুদীর্ঘ লিপিখানা। ফুল ছিঁড়িলে আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইতে হইবে। একগোছা মরা ঘাস থাকলেও কথা ছিল—তাতে অন্তত দু-চারটে ঘাসের ফুল ফুটতে পারত।

চারপাশের বাড়ি অনেকগুলোই এর মধ্যে তালাবন্ধ। যারা বন্ধ নয়, তাদের সামনে ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ি আর রিক্‌শার ভিড় জমেছে, উঠেছে স্তূপাকার মালপত্র। ছারপোকা আর ধুলোয় ভরা পুরোনো জাজিম থেকে কানাভাঙা ফুলকাটা কুঁজো পর্যন্ত। যাচ্ছে তো সব, কিন্তু মানুষ যাবে কী করে?

সামনে দু-তিনটে ডাস্টবিনে শতাব্দী-সঞ্চিত আবর্জনা। ক'দিন ধরে ধাঙড়ের দেখা নেই, তারা বোধ হয় রাস্তার ধুলো ঝাঁট দিতে দিতে এতক্ষণে মোকামা ঘাটে গিয়ে পৌঁছুল। স্কোয়ারের এদিকের রাস্তায় লোকজন নেই—শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় কতগুলো শুকনো কলাপাতা উড়ে বেড়াচ্ছে, কোনো শেষ মহ্‌ফিলের স্মারকচিহ্ন বোধ হয়। থেকে থেকে ভেসে আসছিল ডাস্টবিনের পচা গন্ধের এক-একটা উত্তাল তরঙ্গ।

বাইরে খুট খুট করে হালকা জুতোর শব্দ। দরজা ঠেলে সুমিতার প্রবেশ। কাঁধের ব্যাগটা ঝুপ করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললে, বাবা, হাঁপিয়ে গেছি।

অসাড় জড় মনটা যেন খানিক পরিমাণে সক্রিয় হয়ে উঠল মণিকার। যেন আশ্রয় পেল, আশ্বাস পেল।

—তারপর, কোন্ লঙ্কা জয় করে এলি?

—অনেক। মীর্জাপুর, কলেজ স্ট্রীট, বেনেটোলা, হ্যারিসন রোড—

—থাম্ থাম্। দিনরাত কেন এই টো টো কোম্পানির ম্যানেজারি করে বেড়াচ্ছিস বলতে পারিস?

—আমি তো আর তোমার মতো মোটা নই যে, জড়ভরত হয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকব।

—চুপ কর্ সুমি, মোটা বলবি না।

—আচ্ছা বলব না—সুমিতা হাসল : কিন্তু একটু চা খাওয়াতে হবে মণিকাদি। একেবারে বেদম হয়ে গেছি।

—চা খাবে? তা হলে তৈরি করে নাওগে।

—কেন, তোমার খসরু কোথায় গেল?

—খসরু?—মণিকাদি ভ্রূভঙ্গি করলে : সে এখন আর খসরু নেই, সম্রাট সাজাহান। তাই দিল্লীর তখতে-তাউস অধিকার করবার জন্যে দিল্লী এক্সপ্রেসে উঠতে গেছে।

—যাক, বাঁচিয়েছে।—অত্যন্ত খুশি হয়ে সুমিতা হেসে উঠল। ইজিচেয়ারটাতে নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল মণিকা : কী যে হাসছিস সুমি, ভালো লাগে না। আমি অনাথ হয়ে পড়ে আছি, তোর হাসি পাচ্ছে কী করে?

—অনাথ! আহা-হা, কী দুঃখের কথা! কেন সময়মতো একটি গোলগাল পতিকে ইহ-পরকালের সিংহাসনে বসিয়ে সনাথ হওনি মণিকাদি? তা হলে তো এখন এমন বিলাপ করতে হত না। অন্তত এই দুঃসময়ে এক পেয়ালা চা করে সে খাওয়াতে পারত।

—আমাকে চটাসনি সুমি, মার খাবি।

—নাঃ মণিকাদি, তুমি একেবারে হোপলেস।

সুমিতা উঠে দাঁড়ালো।

—যাচ্ছিস কোথায়?

—যাবো আবার কোথায়? একটু চা তৈরির চেষ্টাই করা যাক। তোমার খসরু সাজাহানই হোক আর আলমগীরই হোক, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু এখন এক পেয়ালা চা না পেলে নির্ঘাত মরে যাবো।

অসহায় নৈরাশ্যের একটা করুণ নিশ্বাস ফেললে মণিকা। পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললে, দু পেয়ালা করিস।

সুমিতা ভেতরে চলে গেল, আর ইজিচেয়ারটায় তেমনি করে ঠেসান দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল মণিকা। ফাঁকা হয়ে আসা কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যেন কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই, নিজেকে আত্মস্থ করে রাখবার কেন্দ্রীয় বিন্দু নেই কোনো। একটা পীতাভ কুয়াশার মতো জমাট অবসাদে সমস্ত চৈতন্য যেন

মূর্ছিত হয়ে আছে।

পার্কের পাশ দিয়ে এক-একটা করে বোঝাই গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা খোলা ফিটনে একটি বউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর পা-দানীতে দাঁড়িয়ে রুমালে চোখ মুছছেন একজন ভদ্রলোক—নিশ্চয় স্বামী। যে বোমার দিন আসছে, তাতে স্বামীর সঙ্গে ফিরে দেখা হবে কিনা কে জানে!

মাথার ওপরে বায়ুতরঙ্গে সাইক্লোন। এরোপ্লেন উড়ে গেল, চারদিকের এই অশুভ আয়োজনটাকে আরো বেশি পরিপূর্ণ করে দিয়ে গেল যেন। মণিকার কেমন বিশ্রী অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। ইচ্ছে করতে লাগল সেও পালিয়ে যায় এখান থেকে—পালিয়ে যায় কোন দূরের আশ্রয়ে। এই ভীতির বাইরে—এই পুঞ্জিত আতঙ্কের নেপথ্যে। কলকাতার আনন্দিত আতিশয্য পীড়াদায়ক লাগে, কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি পীড়াদায়ক মহা-নগরীর এই বৈধব্য-মূর্তি।

চমক ভাঙল স্থমিতার ডাকে।

—মণিকাদি, ঘুমুচ্ছো নাকি? চা নাও।

নিরুত্তরে হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালা নিলে মণিকা।

—তোমার খসরুর বাহাদুরি আছে। কেটলি, পেয়ালা, দুধ, চা, চিনির এমন চমৎকার বন্দোবস্ত করে রেখেছে যে তাদের একসঙ্গে জড়ো করতে গেলে উত্তর মেরু আবিষ্কার করতে হয়।

চায়ে একটা আলগা চুমুক দিয়ে মণিকা বললে, কী করা যায় বল তো, স্থমি?

স্থমিতা বললে, অনাথিনী হয়ে পড়েছো বুঝি? তার জন্যে এত দুর্ভাবনার কী আছে? অনুমতি দাও, বারো ঘণ্টার ভেতরে নাথের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—ইয়াকি দিসনে। সত্যিই কী করি বল্ তো?

এবারে স্থমিতার মুখের ওপর থেকে হালকা হাসির সূক্ষ্ম রেখাটা মিলিয়ে এল। নিবিষ্ট মনে চামচে দিয়ে পেয়ালাটা নাড়তে নাড়তে জবাব দিলে, কী আবার করবে? চুপ করে বসে থাকো।

—বসে থাকব মানে? অবস্থা দেখতে পাচ্ছিস না? কলকাতা তো নয়—যেন নরককুণ্ড। এর ভেতরে পড়ে থেকে কী লাভ আছে বলতে পারিস?

—পালিয়ে গিয়েই বা কী লাভ?

—কেন? যুদ্ধের যে অবস্থা—

স্থমিতা আবার হাসল।

—আচ্ছা মণিকাদি, কলকাতা যারা দখল করে নিতে পারে, ভারতবর্ষের কোথায় তারা বোমা ফেলবে না আমাকে বলতে পারো?

মণিকা চুপ করে রইল।

—পালিয়ে কোথায় যাবে? আগুন শুধু বোমারই নয়—সারা দেশেই জ্বলেছে। চারদিক থেকে ছুটে আসছে বেড়া আগুন। তার হাত থেকে কোথাও তুমি রেহাই পাবে না। কলকাতায় যদি না হয়, তা হলে পৃথিবীর কোন প্রান্তেই নয়।

এবারেও চিন্তিত মুখে চুপ করে রইল মণিকা। কোনো কথা আসছে না তার মুখে। শুধু টেবিলের ওপরে গোলাপী রঙের সুগন্ধি হালকা ধোঁয়াটা হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে চায়ের পেয়ালাটা ঠাণ্ডা হয়ে চলেছে।

মণিকার মনে হতে লাগল যেন তার সমস্ত সত্তা তলিয়ে যাচ্ছে কোনো একটা অতলান্ত গভীরতার মধ্যে, বায়ুবাষ্পহীন জলের নীলিম অন্ধকারের ভেতরে। চোখের দৃষ্টি খোলা—অথচ সে চোখে ক্রমাগত অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। কিছু ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না। বুকের মধ্যে নিশ্বাস আটকে আসছে বারে বারে—নাক কানের ভেতর দিয়ে যেন ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসবে। ঠিক এই রকম একটা অনুভূতি হয়েছিল তার ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে গিয়ে। বড় দীঘিটার শ্যাওলা পড়া ঘাট থেকে পা পিছলে সে গভীর জলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল—নীলাভ শীতল অন্ধকারের মধ্যে এমনি করেই চূড়ান্ত বিস্মৃতির ভেতরে বিলীন হয়ে আসছিল তার চেতনা।

হঠাৎ মিষ্টি করে হাসল সুমিতা।

—আচ্ছা মণিকাদি, তুমি কাজ করো না আমাদের সঙ্গে।—চটুল কৌতুকে সুমিতার চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল: তোমাকে আমরা প্রেসিডেণ্ট করে দেব।

মণিকা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল।

—হঠাৎ?

—বাঃ—হঠাৎ কেন! তোমার মতো যোগ্য প্রেসিডেণ্ট আর কোথায় পাওয়া যাবে। বেশ মানানসই চেহারা আছে—লোককে দেখানো যাবে।

—কেন, আমার কি আর মরবার জায়গা নেই?

—তোমার রোগীরা তো? তারা কি আর কলকাতায় আছে নাকি? যতদিন তাদের মারবার সুযোগ ফিরে না পাচ্ছ, ততদিন আমাদেরই মাথা খাও না হয়।

—তোদের মাথায় কি আর কিছু আছে যে খাবো?

বাইরে ঘটাং ঘটাং করে কড়া নড়ে উঠল।

—কে?

সাড়া নেই। তেমনি ঘট্ ঘট্ করে কড়া নড়তে লাগল।

—আঃ, জ্বালাতন করলে! সুমি, একটু দেখে আয় তো লক্ষীটি।

কিন্তু সুমিতাকে আর যেতে হল না। যে কড়া নাড়ছিল, নিজেই এসে দর্শন দিলে।

মণিকা তাকিয়ে দেখলে আদিত্য।

চেয়ারে একবার নড়েচড়ে ওঠবার চেষ্টা করেই হাল ছেড়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল মণিকা: ওঃ তুমি! এক সুস্মিতা এসে হাড় জ্বালিয়ে মারছে, সেই সঙ্গে তুমিও এসে জুটলে!

আদিত্য প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল। প্রচুর শব্দ সাড়া করে এক কোণ থেকে চেয়ারটাকে টেনে আনল আরেক প্রান্তে। তারপর আরাম করে তার ওপরে আসন নিলে। হাতে মোটা একটা চুরুট, তাই থেকে একরাশ ধোঁয়া উড়িয়ে বললে, ছিঃ মণিকাদি, আপনি দিনের পর দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন। এটা কি কোনো ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করবার রীতি নাকি!

—তোমাদের ভদ্রতার জ্বালায় আমি তো গেলাম।

—এখনি কী হয়েছে!—আদিত্য কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো দৈববাণী করতে লাগল: মাত্র আমাদের দুজনকে দেখেই আপনি বিচলিত হয়ে পড়ছেন, কিছুদিনের মধ্যে দেখবেন গোটা কলকাতাকেই আপনার ঘরের ভেতর এনে জড়ো করে ফেলব।

ছোটখাটো মানুষ আদিত্য। অতিরিক্ত বই পড়ে পড়ে কেমন একটুখানি কুঁজো হয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো বন্য এবং বিশৃঙ্খল—বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যে বিরহী নায়কের মতো। কিন্তু এটা ইচ্ছাকৃত নয়—যে কোন বিদ্বান এবং বুদ্ধিজীবীর মতোই নিয়মিত চুল কাটানোর ব্যাপারে ওর যেমন আছে আতঙ্ক, তেমনিই সময়াভাব। শেষ পর্যন্ত কেশভার যখন গলা ছাড়িয়ে কাঁধের সীমা ডিঙিয়ে পিঠে নেমে পড়তে চায়, সেই সময় গলির মোড়ে একটা উড়ে নাপিত ডেকে আনে আদিত্য—ওর ভয় হয় সেলুনের ভদ্রলোক হেয়ার কাটার ওর বন্য বর্বর চুলে কাঁচি ছোঁয়াতে রাজী হবে না।

কিন্তু চুলের বেলা যাই হোক, দাড়ি সম্বন্ধে আদিত্য অত্যন্ত হুঁশিয়ার। সে দাড়ি গজায় একেবারে মোগল সম্রাটদের মতো—শুধু চোখ দুটো বাকি রেখে মুখের সর্বত্র তাদের উদার অভ্যুদয় ঘটে। আদিত্য গর্ব করে বলে, বহুরোমিতা আর্যত্বের লক্ষণ—এ হচ্ছে আমার এরিয়ান বিয়ার্ড। কিন্তু এরিয়ান বিয়ার্ডের আরেকটা দিকও আছে। একটু বড় হলেই তারা একেবারে পিনের মতো ফুটতে থাকে। তাই বাধ্যতামূলক ভাবেই আদিত্যকে নিয়মিত দাড়ি কামাতে হয়।

গায়ের জামাতেও বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বুকপকেটটা কাঁধের কাছাকাছি অনেকখানি উঠে পড়েছে, অন্যান্য সেলাইগুলোও ঠিক নিয়মমাফিক পড়েনি। ওর বোন পিংড়ী—যার কলেজের নাম সুশ্বেতা রায়—তারই হাতের এক্সপেরিমেণ্ট এসব। সে বাড়িতে বসে নিজের হাতে টেলারিং শিখছে। বন্ধু-বান্ধবেরা ঠাট্টা করলে

ভারী চমৎকার জবাব দেয় আদিত্য। বলে, বহু মানুষ বানর আর গিনিপিগের প্রাণ নিয়ে বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেণ্ট চলে, পিংড়ীর এক্সপেরিমেণ্টের কল্যাণে আমি না হয় পোশাকী সভ্যতাটাকেই কিছু পরিমাণে নিধন করলাম।

এ হেন আদিত্য। যেমন সপ্রতিভ, তেমনি ওরিজিন্যাল। খবরের কাগজে চাকরি করে আর অন্যান্যভাবে করে খানিকটা রাজনীতি। একটা এম. এ. আর একটা এম. এস-সি. পাস করে বসে আছে, যদিও দুটোর কোনোটাই বিশেষ কাজে লাগে না। শুধু তর্কের বেলায় রাজনীতির মধ্যে খানিকটা বিজ্ঞানের দুর্বোধ্য মিশাল দিয়ে প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। আর তার চরিত্রের বিশেষত্ব সব চাইতে চমৎকার হয়ে ফুটে আছে তার চোখে। চোখ দুটি বড় নয়—কিন্তু আশ্চর্য নীল তাদের রঙ। বাঙলা দেশের শ্যামবর্ণ বেঁটে মানুষ আদিত্য সমুদ্রপার থেকে অমন নীলিম চোখ কী করে আমদানি করল, ওর এক জেনিটিকস-বিশারদ ডাক্তার বন্ধু মাঝে মাঝে তাই নিয়ে গবেষণা করতে চেষ্টা করে।

আদিত্যের চোখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ফেলে মণিকাদি বললে, থাক অত বিশ্বপ্রেমে দরকার নেই। আমার ঘরটা এখনো অতটা পরিমাণে সোশ্যালাইজ্‌ড হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ব্যাপার কী, একসঙ্গে মঘা অশ্লেষা এখানে এসে জুটলে কেমন করে।

সুমিতা ভালোমানুষের মতো চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, চা খাবে আদিত্যদা? মণিকাদির খসরুর চা নয়—আমার শ্রীহস্তের তৈরি।

আদিত্য হাসল: উঁহু, মণিকাদির প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে চলবে না। সত্যি বলছি মণিকাদি, আমার কোনো দোষ নেই। সুমিতা আমাকে টেলিফোন করেছে পত্রপাঠ আপনার এখানে চলে আসবার জন্যে।

—হুঁ।

সুমিতা বললে, সত্যি দরকারী কথা। তোমাদের দুজনকে স্তম্ভিত করে দিতে পারি এমন খবর নিয়ে এসেছি।

আদিত্য চুরুটে টান দিয়ে বললে, বটে! তা হলে বলো, অবহিত হয়ে সেই ভয়ঙ্কর সংবাদটা শোনা যাক।

সুমিতা গম্ভীর হয়ে বললে, তাহলে শোনো। আমি এখন বিবেকানন্দ রোডের একখানা চারতলা বাড়ির একচ্ছত্র মালিক।

—তার মানে?

মণিকা এবং আদিত্যের যুগপৎ সবিস্ময় স্বর বেরুল।

—দাঁড়াও বলছি। তার আগে আর একবার চা করে আনি—নইলে আলোচনাটা ঠিকমতো জমে উঠবে না। সমস্ত ঘরে বিস্মিত কৌতূহলের একটা নাটকীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করে সুমিতা চায়ের সন্ধানে গেল।

বাইরে বেলা ডুবে আসছিল। কলকাতার ভাঙা হাটের ওপর দিয়ে বিমর্ষ বিষণ্ণ হয়ে নামছিল বিকেলের রাঙা আলো। সামনে পার্কের বেঞ্চিগুলো এমন সময়েও প্রায় শূন্য পড়ে আছে—একফালি নির্বারিত আকাশ আর খোলা হাওয়ার লোভে কোনো স্বাস্থ্যান্বেষী ওখানে এসে আসন নেয়নি। শুধু ছেঁড়া হাফপ্যান্ট পরা অত্যন্ত মলিন চেহারার দু-তিনটি ছেলে ওখানে ডাংগুলি খেলছে। নিতান্তই পথের ছেলে, তাই জীবনের দাম নেই, জীবনের ভয়ও নেই। একখানা কলাপাতাকে অবলম্বন করে দুটো নেড়ী কুকুর শুরু করেছে আকাশ-ফাটানো কলহ।

মণিকার ঘরের ভেতরে তিনটি প্রাণীর আলোচনা জমে উঠেছিল।

মণিকা বললে, অত বড় বাড়ি দিয়ে তুমি কী করতে চাও?

—বিশেষ কিছু না। অনাথ-আশ্রম খুলব।

—অনাথ-আশ্রম:

—ক্ষতি কী! সুমিতা সকৌতুকে হেসে উঠল।

মণিকা বিরক্ত হয়ে বললে, ছাখ সুমি, ইয়ার্কিরও একটা সময় অসময় আছে। এখন ওসব ভালো লাগছে না।

—বাঃ, ইয়ার্কি! অনাথ-আশ্রম খুলব এর মধ্যে ইয়ার্কির কী আছে! এ তো রীতিমত মহৎ ব্যাপার! পরলোকে কাজ দেবে।

মণিকা বললে, খুব তো আনন্দ দেখতে পাচ্ছি। দুদিন পরেই যখন ঘাড়ের ওপর বোমা পড়বে, তখন টের পাবি। তখন কোথায় থাকবে অনাথ, কোথায় থাকবে কী!

আদিত্য জানলার বাইরে নীল চোখের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ফেলে অনেকক্ষণ ধরে কী একটা পর্যবেক্ষণ করছিল। এইবারে বেশ আরাম করে খানিকটা চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে বললে, আশ্রমে অনাথের অভাব হবে বলছেন মণিকাদি? কিন্তু আপনি তো জানেন না কত অসহায় নাবালক এই মুহূর্তেই আশ্রমে আশ্রয় পাওয়ার জন্যে আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—তার মানে?

—দাঁড়ান, দেখাচ্ছি—চেয়ার ছেড়ে চট করে উঠে পড়ল আদিত্য। দ্রুতগতিতে বেরিয়ে এল বাইরে। পার্কের এদিকের কোণায় একটা লাল বাড়ির রোয়াকে একটি ভদ্র-সন্তান গোঁফের পরিচর্যা করতে করতে বিড়ি টানছিল, আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে সিনেমার গানের কলি গুঞ্জন করছিল। আদিত্যকে ঘাড় নিচু করে বুলডগের মতো তার দিকে আসতে দেখে গুঁফো লোকটির হঠাৎ কী একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেল। বিদ্যুৎগতিতে উঠেই সে জোর পা চালিয়ে দিলে নরসিং লেনের দিকে।

পাথরের মতো কঠিন মুখ নিয়ে আদিত্য ফিরে এল। নীল চোখে আর প্রসন্ন কৌতুক নেই, আগুনের স্ফুলিঙ্গ চমক দিয়ে উঠছে।

—কী হল আদিত্যদা ?

—টিকটিকি।

—সে কি !—মণিকা সভয়ে বললে, এখানে কেন ?

—ওয়াচ করছিল আমাদের।

—কী সর্বনাশ !

সুমিতা হাসল, কিন্তু আদিত্যের নীল চোখের স্ফুলিঙ্গ উঠল শিখা হয়ে।

—এরা ভেবেছে কী ! এমনি করে শানানো চোখ আর শানানো ঠোঁট নিয়ে বসে থাকবে আর ছোঁ মারবে ! জীবন যে দুর্বহ করে তুলল !

কেউ আদিত্যের কথার জবাব দিল না।

আদিত্য বাইরের দিকে তাকিয়ে দু চোখের আগুন বৃষ্টি করে চলল। তার সমস্ত চেহারাটাই বদ্‌লে গিয়েছে মুহূর্তে : নাঃ, আর সহ্য হয় না। এর একটা উপায় করতেই হবে। বন্দুক ছোঁড়াটা ভুলেই গিয়েছিলাম তিরিশ সালের পরে—এবার শকুন শিকার আবার প্র্যাকটিশ করতে হবে।

মণিকাদি বললে, শকুন শিকার !

মেঘের মতো গলায় আদিত্য জবাব দিলে, হাঁ, শকুন বই কি। শুধু শকুন নয়—কাক-চিল থেকে শুরু করে ডোরা-কাটা বাঘ পর্যন্ত। খবরের কাগজ উড়িয়ে অনেককাল কাটল, এবারে দেখা যাক তার চাইতে বেশি কিছু করা যায় কি না।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সুমিতার দৃষ্টি—আর মণিকা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল। আদিত্যের কথাটা সে ঠিক যে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে কেমন একটা অশুভ ইঙ্গিত অনুভব করেছে। জঙ্গলের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে আসা শিকারীর বন্দুকের নল থেকে বুনো হাঁস যেমন বারুদের গন্ধ পেয়ে সজাগ ও চকিত হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি ভাবে মণিকার মনও যেন একটা সুনিশ্চিত আসন্নতায় শঙ্কিত হয়ে উঠল।

বাইরে সাইকেলের শব্দ। ডাক শোনা গেল, আদিত্যবাবু আছেন এখানে ?

—কে ? আত্মসংবরণ করে সাড়া দিলে আদিত্য।

—আমি মথুর, অফিস থেকে আসছি। একটা চিঠি আছে আপনার।

আদিত্যের অফিসের ছোকরা বেয়ারা মথুর। খামে আঁটা একখানা চিঠি নিয়ে এসেছে। বললে, এক ভদ্রলোক অফিসে এসে এটা দিয়ে গেলেন। বললেন, খুব জরুরী, এক্ষুনি এটা আপনাকে পৌঁছে দিতে হবে।

চিঠি দিয়ে মথুর চলে গেল।

ক্ষিপ্র হাতে খাম খুললে আদিত্য। কালো মুখের ওপর কালো কালো রেখা দেখা দিল একরাশি। হাত কাঁপতে লাগল।

—সুমিতা, অনিমেষের খবর।

ব্যাকুল উৎসুক ভাবে সুমিতা এগিয়ে এল : কী খবর অনিমেষের ?

—ভালো নয়। বাগানের ভেতরে সাহেব তাকে এমন ভাবে মেরেছে যে, বাঁচবে কিনা বলা শক্ত। সমস্ত অবস্থাই প্রতিকূলে।

মণিকা বললে, কী ভয়ানক ! আমাদের অনিমেষকে !

—হ্যাঁ, অনিমেষকে। শোনো সুমি, আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। আমি এক্ষুনি অফিসে যাচ্ছি ছুটির জন্য—যত ভিড়ই হোক না কেন, সাড়ে দশটার ট্রেন আমি ধরবই। চারতলা বড় বাড়িটা আপাতত তোমার চার্জেই রইল, যা হয় কোরো তুমি।

ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল আদিত্য—এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না।

আর এতক্ষণে ভাবান্তর দেখা গেল সুমিতার মুখে। মণিকাদির চোখে পড়ল তার গালের ওপর থেকে রক্ত সরে সরে সমস্ত মুখটাই কাগজের মতো বর্ণহীন আর শাদা হয়ে যাচ্ছে।

তিন

এদিককার ছোট গাড়ি যে ছোট লাইন দিয়ে আসে, তার দু'পাশেই আলোর গতিকে স্তব্ধ সংহত করে ঘন নিবিড় জঙ্গল দাঁড়িয়ে আছে।

সে জঙ্গল শালের। মাঝে মাঝে দু-চারটে অন্য গাছও আছে। নিঃসঙ্গ নিভৃত দু-একটি দেবদারু শালবনের ঘন সন্নিবেশের মধ্যে নিজের রাজকীয় মর্যাদাকে তেমন করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি ; পলাশ শিমূলের যে রাঙা ফুলের মঞ্জরী পাহাড়ী ঝোরার পাশে রূপের আগুন জ্বালিয়ে জেগে আছে, এক বুনো জানোয়ার ছাড়া সে সৌন্দর্যকে উপভোগ করবার দৃষ্টি নেই কারো। শুধু মাঝে মাঝে ভীরু ভীরু পা ফেলে হরিণের পাল আসে, শিমূলের ফুল খেয়ে খুশি হয়, দেবদারুর ছায়ায় পরস্পরের গা চাটে আর ভয় পেলে শুকনো শালের পাতায় মর্মরিত পদশব্দ তুলে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

তা ছাড়া শাল, শাল, আর শাল। রেল লাইনের দু'পাশে মন্দিরের মতো উঠে পাতার আবরণে যেন ঢেকে দিয়েছে আকাশকে। তবু লাইন যেদিকে সোজা চলে গেছে—সেদিকে অনাবরণ দিগন্তের একটা মুক্ত রূপ চোখে পড়ে। মুক্ত রূপ কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। ওখানে আকাশের সীমা টেনে দিয়েছে হিমালয়ের মহিমামণ্ডিত অপূর্ব সুন্দর গিরিশৃঙ্গ—তুষারমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘা।

এক বর্ষাকালে যখন মেঘের পর মেঘের কালো দুর্ভেদ্য প্রাচীর ওদিকটাকে দৃষ্টির দুরধিগম্য করে রাখে সেই সময় ছাড়া—বছরের আর সব সময়েই এই রেল লাইনে দাঁড়িয়ে

কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ মূর্তিখানা দেখা যায়। ভোরের আলো যখন শালবনের অন্ধকারকে স্বচ্ছ তরল করে দিতে পারে না, শুধু ঝোরার জল একটা আসন্ন আশায় ঝিকিয়ে ওঠে—তারও বহু আগে আকাশের এই প্রান্তে কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভাঙে। পেনসিলে আঁকা ঝাপসা ধোঁয়াটে ছবির মতো সে দাঁড়িয়ে থাকে সূর্যোদয়ের প্রত্যাশায়। তারপরে অরণ্যের কোনো এক প্রান্তরেখায় দেখা দেন সূর্য-সারথি, আকাশ রাঙা হয়ে ওঠে। এই শালবন ছাড়িয়ে আরো বহু বিস্তীর্ণ বাঙলাদেশ, সেই বাঙলাদেশের আরো সুদূর কোন এক সীমান্তে কলকাতার আকাশ অরুণরাগে রাঙিয়ে ওঠবার আগেই কাঞ্চনজঙ্ঘা তার দীপ্তিতে রঙীন হয়ে ওঠে। শাদা তুষারের ওপর দিয়ে যেন রক্তের ধারা গলে গলে পড়তে থাকে। শালবনের বনের মধ্যে সূর্যের আলো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আর কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ ক্রমশ উজ্জ্বল আর প্রখর হয়ে ওঠে। আবার বেলা ডোবে, দুপুরের রৌদ্র শাণিত তীক্ষ্ণ তুষার সোনার রঙ মাখে,—দেখতে দেখতে সে রঙ ছাপিয়ে রক্তধারা গড়িয়ে যায়। সুমেরু থেকে পরিক্রমা শুরু করে কুমেরুর অস্তদিগন্তে সূর্য-সারথি তার যাত্রা শেষ করে—কাঞ্চনজঙ্ঘার ধোঁয়াটে ছায়ামূর্তি একটা বিশাল প্রেতচ্ছবির মতো নিঃসীম অন্ধকারের নেপথ্যে তলিয়ে যায়।

সারাদিন—সারারাত কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো অবগুণ্ঠিত এই পর্বতশিখরের ছায়ার নিচে শালবনের ফাঁকে ফাঁকে যন্ত্র গর্জন করে চলে। বাঘের ডাক তলিয়ে যায় তার ভেতরে, তলিয়ে যায় শাল-পলাশের ডালে ডালে ময়ূরের কেকাধ্বনি। শালবনের ওপরে নির্মল নীল আকাশে চিমনির ধোঁয়া উঠতে থাকে।

চা-বাগান।

ঢালু মাটি। চারিদিকে অরণ্যের পরিবেশ। বর্ষার জল গড়িয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে চলে, চা-বাগানের বড় বড় নালা বেয়ে নেমে যায় পাহাড়ী নদীতে। চায়ের পক্ষে আদর্শ দেশ।

শালবনের মধ্যে পত্তনি করে, আশেপাশের ফাঁকা জায়গায় অনেকগুলি চায়ের বাগান গড়ে উঠেছে। শুধু বাঙলাদেশে নয়, সমস্ত পৃথিবীময় খ্যাতিলাভ করেছে এই তথাকথিত ভারতীয় চা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চমৎকার পিচের রাস্তা, বাগানের ইন্‌স্পেকশন বাংলোতে একেবারে রাজপ্রাসাদের স্বাচ্ছন্দ্য। সস্তা ডিম, দুধ, মাংস আর সস্তা মানুষের পরিশ্রম। অপ্রতিহত প্রতাপে সাম্রাজ্য ভোগ করবার এমন সুযোগ অন্যত্র দুর্লভ। তাই বুনো জানোয়ারের আর কালাজ্বরের ভয়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেই অর্থলোভী মানুষ এখানে ডেরা বেঁধেছে।

এই স্বনামধন্য ভারতীয় চা আর সেই সঙ্গে কাঠের ব্যবসার জন্যেই এই রেল লাইন। দু'পাশে শালবন আর দিগন্তে কাঞ্চনজঙ্ঘা। পাহাড়ে বুনো জানোয়ারের ডাক। ঘাসবনের

মধ্যে অজগর কবলিত বুনো শূয়োরের আর্তনাদ। আর সব কিছুর ভেতর দিয়ে মসৃণ, মোটরের তেলে চকচকে পিচের রাস্তা। রেলের ওয়াগনে আর লরিতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয়ের সহজ রপ্তানি।

এইখানে একটি সাহেবী চা-বাগানে মাস তিনেক আগে বাবু হয়ে এসেছিল অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুজন ইংরেজ এই বাগানের মালিক। একজন লিয়োপোলড, আর একজন রবার্টস। লিয়োপোলড বড় সাহেব, ইয়োরোপীয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের একজন হর্তাকর্তা-বিধাতা। সে শহরেই থাকে, নিতান্ত দরকার না পড়লে বাগানের দিকে পা বাড়ায় না। আর এখানকার সব কিছু দেখাশোনা করে ছোট সাহেব রবার্টস—দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী জেনারেল ম্যানেজার। মস্ত বড় বাংলো, ফুলের বাগান, বিলিতী কুকুর, ঘোড়া আর দু-দুটো বন্দুক। যেন দক্ষিণ-আফ্রিকার কোনো জঙ্গলে উপনিবেশ বসিয়ে সেখানে রাজত্ব করে যাচ্ছে।

আদর্শ ইংরেজ রবার্টস। নিজের শিরাস্নায়ুতে যেন প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে নর্ডিক রক্তের নীল-প্রবাহ। মাথার চুলগুলো উগ্র তামাটে রঙের। মোটা নাকে পরিস্ফীত রক্তাক্ত শিরার জাল-বিস্তার। হাতের রাইডারটা বড় ঘোড়াটাকে মায়া করে চলে বটে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তার অনুকম্পা নেই। কুলির পিলে-ফাটানো বীর জাতির উপযুক্ত বংশধর।

অনিমেষ যখন চাকরির দরবারে এল, সাহেব তখন হাফ-প্যান্টের পকেটে দু হাত পুরে নতুন ডায়নামোটাকে নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করছিল। কাল এটাতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে। একটা কুলির একখানা হাত বেল্টটা সম্পূর্ণভাবে টেনে নিয়েছিল—বহুভাগ্যে লোকটা প্রাণে মরেনি। কুলিরা বলছে বিপজ্জনক, ওটাতে কাজ করতে তারা ভরসা পাচ্ছে না। ভ্রূকুঞ্চিত করে রবার্টস ভাবছিল, কী করা যায়!

এমন সময় অনিমেষ এসে সেলাম দিলে।

ঠোঁটের পাশে পাইপ কামড়ে ধরে, মোটা নাক আর কপিশ চোখ দুটোকে একসঙ্গে জড়ো করে রবার্টস জিজ্ঞাসা করলে, কী চাই বাবু?

—একটা চাকরি!

—ওঃ!—রবার্টসের চোখ দুটো মিটমিট করতে লাগল: বাগানে কাজ করেছ কখনো?

—না।

—টেস্‌টিমোনিয়াল আছে?

—না।

—চায়ের কাজ কিছু বোঝো?

—কিছু না।

রবার্টসের চোখ তেমনি মিটমিট করতে লাগল : তা হলে আমি নিরুপায়। বাগানে অভিজ্ঞ লোকই আমাদের দরকার।

অনিমেষ বললে, মাপ করবেন স্যার। কাজ করবার সুযোগই যদি না পাই, তা হলে অভিজ্ঞতা আসবে কোত্থেকে। আপনি আমাকে সুযোগ দিয়ে দেখুন।

—তা বটে।—কথাটা রবার্টসের মনে লাগল। পাইপের ধোঁয়া ছড়িয়ে কী ভেবে নিলে মিনিট কয়েক। বললে, আচ্ছা, বিকেলে দেখা কোরো আমার সঙ্গে। তোমার স্পষ্টবাদিতা আমার ভালো লেগেছে।

বিকেলে অনিমেষের চাকরি হয়ে গেল।

সে প্রায় আজ ছ' মাস আগেকার কথা। এর মধ্যে অনেকখানি বদলে গেল পৃথিবী। ইয়োরোপে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তার আগুন আস্তে আস্তে শিখা বিস্তার করতে লাগল এশিয়ার প্রান্তে প্রান্তে। খবরের কাগজ খুলে রবার্টসের চোখে পড়তে লাগল দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ। চায়ের ব্যবসায় মন্দা—ইয়োরোপে শিপ্‌মেণ্ট যাচ্ছে না—প্লাইউডের বাক্স-ভর্তি চা পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে খিদিরপুরের ডকে। বাকি ছিল আমেরিকা, জাপানী-যুদ্ধের ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রশান্ত জলের তলাতেও দেখা দিতে লাগল ইউ-বোট আর টর্পেডো—ও পথও বন্ধ হয়ে গেল।

শুধু এ হলেও দুঃখ ছিল না। খবরের কাগজগুলো যে-সব বার্তা বহন করে আনে, বেতারের ঘোষক প্রতিদিন গম্ভীর কণ্ঠে যে ঘোষণা করে, তার কোনোটাই আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠার মতো নয়। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যে সাম্রাজ্যের আকাশ থেকে কখনো সূর্য অস্ত যেতো না—তার সেই সূর্যের দিকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে আসছে করাল রাহু। শুধু গেল-গেল ডুবল-ডুবল, বোমায় চুরমার হয়ে গেল সমস্ত।

অপমানে দুশ্চিন্তায় রাত্রে রবার্টস ঘুমোতে পারে না। অসহায় আক্রোশে নিজের হাত দুটোকে তার কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। এ কী হচ্ছে, এ কী হল? হিংস্র বিদ্বেষে রবার্টস নিজের ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়ায় বুনো জানোয়ারের মতো। খেতে বসলে খেতে পারে না, মাঝে মাঝে মনে হয় ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে পারলে যেন সে বাঁচে। বুকের ভেতরে থেকে থেকে আর্তনাদ ওঠে : গেল, গেল, সব গেল।

মেজাজ যেমন তিরিক্ষি, তেমনি বিকট হয়ে উঠেছে। কথায় কথায় কুলিদের ওপর হাত চলে। অকারণে লাথি মারে কুকুর দুটোকে। কোনো জার্মানকে বা জাপানীকে হাতের কাছে পায় না বলেই কাক-চিল-শকুন যা পায় তারই ওপরে গুলি চালাতে চেষ্টা করে। রবার্টস নিজেই যেন ভয়ানক একটা বিস্ফোরক হয়ে উঠেছে।

কিছুতেই মন শান্তি পায় না। শেষ পর্যন্ত দু'কাঁধে দুটো রাইফেল নিয়ে রবার্টস জঙ্গলে

ঢুকে পড়ল। শিকার করবে।

দুর্ভাগ্য যেদিন আসে সেদিন সেটা সব দিক থেকেই আসে। সারাদিন শালবনের মধ্যে ঘুরেও কিছু মিলল না। বড় শিকার তো দূরের কথা, দু-একটা হরিণও চোখে পড়তে না পড়তেই মিলিয়ে গেল নক্ষত্রবেগে। কাঁটায় হাঁটু ছিঁড়ে গেল, কাঁধ টনটন করতে লাগল রাইফেলের ভারে। নিজের ঠোঁটটাকে কামড়াতে কামড়াতে রবার্টস উঠে এল রেল লাইনে, হাঁটতে শুরু করে দিলে বাগানের দিকে।

সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা। দিনান্তে তার চূড়ো বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ওই দিকে তাকিয়ে হঠাৎ রবার্টসের চোখে জল এল। এমনি করে কি অস্তে নামছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্যও? ওই রক্ত কি ইংলিশ চ্যানেলে, ফ্ল্যাণ্ডার্সে আর সিঙ্গাপুরে অমনি করে ছড়িয়ে গেছে?

নিচ দিয়ে পিচের একটা রাস্তা চলে গেছে বাগানের দিকে। রবার্টস দেখলে বাগানের একটা কুলি-সর্দার সেই পথ দিয়ে সাইকেলে করে চলেছে। লোকটা নতুন, খুব কাজের লোক।

কিন্তু আশ্চর্য, সাহেবকে দেখেও লোকটা সাইকেল থেকে নামল না বা সেলাম দিল না। কয়েক মুহূর্ত ঘটনা যেন বিশ্বাস করতে পারল না রবার্টস। এত বড় দুঃসাহস তার বাগানের একটা কুলির কেমন করে হতে পারল যে, এতদিনের বাঁধা নিয়মকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই বীরের মতো সে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল!

জঙ্গলের ভেতর ঘুরবার সময় প্রাণভরে হুইস্কি গিলেছিল রবার্টস। এতক্ষণে দেহের মধ্যে অ্যালকোহলের সেই আগুন যেন সক্রিয় হয়ে উঠল। বাজের মতো গলায় রবার্টস ডাকলে, এই শূয়ারকা বাচ্চা।

সাইকেল তখন পিচের রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। কিন্তু কটু গালটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নক্ষত্রবেগে নেমে পড়ল। বললে, কেন গাল দিচ্ছ সাহেব?

স্পর্ধা! কপিশ চোখ দিয়ে মাংসাশী ক্ষুধা যেন ঠিকরে বেরোতে লাগল। কেন সে গাল দিচ্ছে তারও কি কৈফিয়ৎ দিতে হবে এই কুলি-সর্দারটাকে? ইংরেজ কি যুদ্ধে সত্যি সত্যিই হেরে গেছে নাকি যে এর মধ্যেই এই ব্ল্যাক-সোয়াইনেরা যা খুশি তাই করতে আরম্ভ করেছে!

—সেলাম দিতে জানো না শালা শূয়োর?

—খবর্দার, গাল দিয়ো না সাহেব। তুমি যাচ্ছ লাইন দিয়ে, আমি যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে। খামোকা তোমাকে সেলাম ঠুকতে যাবো কেন? মদ গিলেছ, ঘরে গিয়ে পড়ে থাকো গে যাও। রাস্তায় মাত্‌লামি করে মরছ কেন?

রবার্টস থরথর করে কাঁপতে লাগল। এর পরে মুখে আর কোনো কথা আসছে না, আসা সম্ভবও নয়। মিনিটখানেক কুলিটার দিকে তাকিয়ে থেকে রবার্টস বললে, ইউ

এণ্টার মাই গার্ডেন এগেইন অ্যাণ্ড আই উইল শুট্ ইউ।

—যাও, যাও।—একটা ব্যঙ্গাত্মক মুখভঙ্গি করলে কুলি-সর্দার: গুলি করা অত সস্তা নয়। পয়সা লাগে। অনেক সেলাম তো পেয়েছ, এবার চুপ করে বসে থাকো গে। অত নবাবী আর চলবে না।

রবার্টস পিঠের রাইফেলে হাত দিলে। সত্যি সত্যিই লোকটাকে গুলি করবে কিনা ভাবতে ভাবতে তাকিয়ে দেখলে সাইকেলটা বাঁক ঘুরে শালবনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হেঁটে নয়, যেন জলন্ত একটা হাউয়ের মতো বাগানে উড়ে এল রবার্টস। একটা কুলি-সর্দারের এত সাহস হওয়া সম্ভব নয়—এর পেছনে কোনো ভদ্রবাবুর ইঙ্গিত নিশ্চয় আছে। এতকাল এই চায়ের বাগানের সপ্তদশ শতাব্দীর ধরনে যে রাজত্ব চলে এসেছে—সাহেবের সামনে দিয়ে কেউ ছাতা মাথায় চলতে পারেনি, ঘোড়া বা সাইকেলে করে যেতে পারেনি, সাহেবকে যারা দেবতার চাইতেও বড় করে দেখে এসেছে—তাদের এতখানি আস্পর্ধা দিল কে? কে সেই শয়তান?

কোয়ার্টারে ফিরে রবার্টস গুম্ হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। হুইস্কির ক্রিয়াটা ততক্ষণে শান্ত হয়ে এসেছে। না—রাগে আগুন হয়ে ঝটপট একটা কিছু করে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। একটা কুলি-সর্দারের কথায় রাগ করে কোনো লাভ নেই, ঝাড়ে-মূলে একে উচ্ছন্ন করতে হবে।

রবার্টস বাগানের ডাক্তার ডাঃ যাদব ঘোষালকে খবর দিলে।

গুটিগুটি পায়ে এল যাদব ডাক্তার। প্রথম জীবনে শহরে কোথায় কম্পাউণ্ডারী করে হাত পাকিয়েছিল, সেই যোগ্যতায় চা-বাগানের সুযোগ্য সিভিল সার্জেন হয়ে উঠেছে। কিন্তু যোগ্যতা হিসেবে সেইটাই তার বড় পরিচয় নয়। সাহেবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক সে—হুইস্কির একটুখানি তলানি বকশিশ পেলেই বাগানের অনেক গোপন খবর সে সাহেবের কানে তুলে দেয়। অনেকটা তারই বিশ্বস্ততার গুণে বাগানের জীবনযাত্রা এতকাল নিরাপদ স্বাচ্ছন্দ্যে চলে এসেছে।

এক পেগ পেটে পড়তেই যাদব ডাক্তারের মুখ খুলে গেল। বললে, অনেকদিন ধরেই বলব বলব করছিলাম, কিন্তু হুজুরের যে মনের অবস্থা দেখেছি, সেই জন্যেই—

সবটা শুনে রবার্টস চুপ করে রইল। পাইপের গোড়াটা চিবুতে লাগল নিজের মনে। তারপর বললে, আচ্ছা তুমি যাও ডাক্তার, আমি দেখছি।

পরদিন সকালে কুলিদের কোলাহলে রবার্টসের ঘুম ভাঙল। সমস্ত বাগানে কেমন একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। ফ্যাক্টরীর বাঁশি বেজেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু বাগানে একটি লোক কাজ করতে যায়নি, একটি লোকও হাত দেয়নি। ম্যানেজারের কোয়ার্টারের সামনে এসে হট্টগোল শুরু করে দিয়েছে তারা।

চাবুক হাতে করে রবার্টস নেমে এল।

—কী ব্যাপার ?

—আমাদের মজুরী বাড়াতে হবে।

—কেন ?

—যুদ্ধের বাজারে ঢের খরচ। পোষাচ্ছে না।

—বটে ?

রবার্টসের জীবনে এ আর একটা নতুন অভিজ্ঞতা। ধর্মঘটের খবর সে কাগজে পড়েছে, পড়েছে শ্রমিক বিক্ষোভের বিবরণ। কিন্তু সে-সব শহরের ব্যাপার, তার সম্পর্ক বড় বড় ফ্যাক্টরীর সঙ্গে। সেখানে বাইরে থেকে উত্তেজনা যোগাবার মতো লোকের অভাব হয় না—সেখানে আছে শিক্ষা, আছে খবরের কাগজ। কিন্তু এই চা-বাগানে, হিমালয়ের ছায়ার নিচে দূর দুর্গম এই ডুয়ার্সের জঙ্গলের ভেতরে যে সে-আগুনের স্ফুলিঙ্গ কখনো উড়ে আসতে পারে, তা রবার্টসের ধারণাও ছিল না। কালাজ্বরে জীর্ণ নির্বোধ সাঁওতাল আর ভয়ত্রস্ত ওঁরাওঁয়ের দল—যাদের সঙ্গে না আছে শিক্ষার সংস্রব, না পৃথিবীর, এমন করে দাবি জানাতে তাদের শেখালে কে ? এই ভয়ে রবার্টস বাগানের ইস্কুলে কুলির ছেলের ভালো করে লেখাপড়া শেখবার সুযোগ দেয় না, সন্দেহজনক কোনো বাইরের লোককে ঢুকতে দেয় না বাগানের ত্রিসীমানার ভেতরে। কিন্তু আজকে—

জার্মানী আর জাপানের প্রতি সঞ্চিত ক্রোধ একসঙ্গে জ্বলে উঠল রক্তের মধ্যে।

—বাড়তি মজুরী চাও, বটে ?—খাড়া খাড়া চোয়াল দুটো ঝুলে পড়ল রবার্টসের : দিচ্ছি বাড়তি মজুরী। তোমাদের ব্যানার্জিবাবুকে ডাকো তো একবার। তার সঙ্গেই কথা কইব।

কুলিরা কিছু বুঝতে পারল না। আনন্দিত কোলাহল করে তারা অনিমেষকে ডেকে নিয়ে এল। তাদের দাবি পূরণ হবে বলেই ভরসা হচ্ছে।

সাহেবের আহ্বানে অনিমেষ সামনে এসে দাঁড়ালো। বুক সোজা করেই দাঁড়ালো। রবার্টসের চোখের দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পেরেছে এ সাক্ষাৎ সুখের বা আনন্দের নয়। কিন্তু এই ভেবে তখনো তার বিস্ময় লাগছিল যে সে এর ভেতরে যে আছে এ খবর রবার্টসকে কে দিলে ?

রবার্টস বললে, ভেতরে এসো আমার সঙ্গে।—তারপর কুলিদের দিকে ফিরে বললে, তোমরা যাও—কাজ করোগে। আমার যা কথাবার্তা আমি ব্যানার্জিবাবুর সঙ্গেই বলব।

আধ ঘণ্টা পরে যা ঘটল তার জন্যে বাগানের কেউ প্রস্তুত ছিল না।

চাবুক আর রোলারের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত অনিমেষের অচেতন দেহটা সাহেবের চাপরাসীরা বাইরে টেনে নিয়ে এল। পেছনে পেছনে এল রবার্টস। তার এক হাতে

রাইফেল উদ্যত হয়ে আছে।

বাঘের মতো গর্জন করে রবার্টস বললে, এই রাস্কেলকে বাগানের সীমানার বাইরে টেনে ফেলে দাও। আর শুনে রাখো সকলে, আমার রাইফেলের মুখেই বাড়তি মজুরীর ব্যবস্থা করেছি, যাদের দরকার থাকে এসে নিয়ে যেতে পারো।

ভয়ে আতঙ্কে সমস্ত বাগানটা থমথম করতে লাগল। আর এরই দুদিন পরে নরেন্দ্র সেন স্কোয়ারে মণিকাদির বাড়িতে বসে মথুরের মারফৎ খবরটা পেল আদিত্য।

প্রশস্ত চারতলা বাড়িটার মালিক সুমিতা। শুধু মালিক নয়—একচ্ছত্র মালিক্।

নিচ দিয়ে উত্তর কলকাতার দীর্ঘ বিস্তীর্ণ রাজপথ। যুদ্ধের দুর্যোগ নেমেছে চারদিকে —তবু এ পথটায় ট্রাফিকের মন্দা পড়েনি। ছেদহীন গাড়ির সারি চলেছে, চলেছে মানুষ, অথচ বেশ বোঝা যায় কোথায় যেন সুর কেটে গেছে, কোথায় যেন ঘটে গেছে ছন্দো-পতন। শীতের রৌদ্রে যেন একতান মিলিয়েছে একটা অনাসক্ত ঔদাসীন্য—প্রয়োজনের তাগিদ নেই, কাজের অহেতুক বিড়ম্বনা নেই, একটা বৈরাগ্যের ইন্দ্রজালে কলকাতার সমস্ত স্নায়ুগুলো শিথিল আর নিঃসাড় হয়ে গেছে। শুধু কান পেতে আছে কখন বেজে উঠবে সাইরেনের প্রেতিনীকণ্ঠ, আকাশে দেখা দেবে নিপ্পনী বিমানের বিভীষিকা, তারপর—

তেতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুমিতা অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে ছিল নিচের দিকে। শীতের রোদে চাঁপা ফুলের রঙ, উত্তুরে বাতাসে অল্প অল্প ধুলো উড়ছে। সামনে কতগুলো দোকান খোলা—কতগুলোতে কোলাপ্সিবল গেটে তালা ঝুলছে। তেতলা চারতলার বারান্দায় আর কাপড় শুকোচ্ছে না, বোমার ভয়ে সব একতলায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। টাকার পাখায় উড়ে যারা আকাশের সগোত্র হয়ে উঠছিল, তারা হঠাৎ কঠিন মাটির অতিশয় কাছাকাছি নেমে এসেছে—পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে বাধ্যতামূলক সাম্যবাদ।

এত বড় বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। এখানে ওখানে ঢুকছে বাইরের অনধিকারী বাতাস, কোথায় যেন জানলার একটা পাল্লাকে নিয়ে ক্রমাগত আছড়া-আছড়ি করছে। চব্বিশ-খানা ঘরে ঘুরতে ঘুরতে আর সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে হাত-পা ব্যথা হয়ে গেছে সুমিতার। বিচিত্র একটা অনুভূতিতে সমস্ত মনটা কেমন বিহ্বল হয়ে গেছে—যেন কলকাতার নয়, কোথায় কোন্ একটা নির্জন দ্বীপে কে ওকে নির্বাসন দিয়ে গেছে।

তিনদিন হল হঠাৎ ঝড়ের মতো চলে গেছে আদিত্যদা। সেই থেকে আর কোনো খবর নেই। কোথায় ডুয়ার্সের চা-বাগান,—ঘন শালের বন, দিকচক্রবালে কাঞ্চনজঙ্ঘা, যেখানে অনিমেষ থাকে, সেইখানে চলে গেছে আদিত্য। তারপর আদিত্যের কোনো খবর নেই, অনিমেষেরও না।

একদিন ছিল, যখন অনিমেষের খবরই সব-চাইতে বেশি দরকারী ছিল সুমিতার জীবনে। কিন্তু সেদিন আর নেই—সব বদলে গেছে। নিজের হাতেই একদিন সব-কিছুর ওপরে সীমারেখা টেনে দিয়েছে অনিমেষ। যা হতে যাচ্ছিল, তা হল না। কোনোদিন আর হওয়া সম্ভবও নয়। যেদিন মনে হল, বসবার ঘরের এই চায়ের পেয়ালা, হাতের কাছে এই দিশি-বিলিতী কবিতার বইগুলো,—নিঅনের বর্ণচ্ছটায় সিনেমার ইন্দ্র-পুরী, গড়ের মাঠের ঠাণ্ডা অন্ধকারে মিষ্টি আইসক্রীম আর মিষ্টি ভালোবাসা, এরা শুধু নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা—সেদিন থেকে সব কিছুর অর্থই বদলে গেল।

তখন নামজাদা একটা মিশনারী কলেজে পড়াশুনো করত ওরা দুজনে। অনিমেষ ছিল কলেজ ইউনিয়ানের সেক্রেটারী। যথানিয়মে একদিন গোলমাল বাধল কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে। দু'পক্ষেরই জেদ ছিল সমান—ছাত্রেরা এক পা নড়তে চাইলো না—প্রিন্সিপ্যালও নয়। ফলে স্ট্রাইক এবং হাঙ্গার স্ট্রাইক—উত্তেজনা কলকাতার সব কলেজগুলোতে ছড়াতে লাগল প্রবল দাবাগ্নির মতো। তারপরে দেখা দিল পুলিস।

সুমিতা বি. এ. পাস করল, কিন্তু অনিমেষ করল না। কলেজ থেকে আগেই তাকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে হয়েছিল। কিন্তু সেই থেকেই দুজনের পথ এক হয়ে গেল। যে অনিমেষ সুমিতাকে অনার্স পড়াত, সেই অনিমেষই তাকে পড়াতে লাগল রাজনীতির বই। আগে দেখা হত লেকের ধারে, এখন দেখা হতে লাগল বস্তিতে বস্তিতে, সভা-সমিতিতে আর রাজনৈতিক আলোচনার চক্রে।

আশ্চর্য, কী হতে গিয়ে কী হয়ে গেল! নিতান্ত শৌখীন মানুষ ছিল অনিমেষ। কবিতা ভালোবাসত, ভালোবাসত থর্নি স্মিথের ফ্যাণ্টাসী। আদ্দির পাঞ্জাবি গিলে করত, চশমার ভেতর দিয়ে তাকাত উদাস দৃষ্টিতে—যেন জন্ম-জন্মান্তর ধরে না পাওয়া প্রিয়ার বিরহে সে ব্যাকুল হয়ে আছে। পেছন থেকে একটি মেয়ের বিনুনি নজরে পড়লে তার মুখখানা দেখবার জন্যে এক মাইল রাস্তা হেঁটে যেতেও তার আপত্তি ছিল না। আউটরাম ঘাটে বাফেটে বসে গঙ্গার বুকে জ্যোৎস্না দেখে তার মরে যেতে ইচ্ছে করত, ইচ্ছে করত মরে গিয়ে সে ম্যাগ্নোলিয়া হয়ে ফুটে উঠবে। গরম চায়ে সে চুমুক দিতে রাজী হত না—ভয় পেতো পাছে তার ঠোঁট দুটো মোমের মতো গলে যাবে। অর্থাৎ দেহে-মনে-প্রাণে পরিপূর্ণ অ্যাডোনিস্ হবার সে স্বপ্ন দেখত—তার পৃথিবীতে জ্যোৎস্নার আলো আর রজনীগন্ধার গন্ধ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যে কোন মেয়ের সঙ্গে যে কোন মুহূর্তে প্রেমে পড়বার জন্য সে তৈরি হয়েই ছিল, সুতরাং সামান্য পরিচয়ের সূত্রেই সুমিতাকে সম্পূর্ণ করে হৃদয় ঢেলে দিতে তার দেরি হয়নি।

বাহ্যিক ন্যাকামি অবশ্য যথেষ্ট ছিল অনিমেষের—তবু সুমিতার তাকে নিতান্ত মন্দ লাগেনি। মানুষটা সরল, মন শিশুর মতো অপরিণত। মেয়েদের সম্বন্ধে দুর্বলতা থাকলেও

বর্বরতা ছিল না। প্রেমিক মানুষ, সুমিতাকে যখন ভালোবাসবার সুযোগ পেল তখন নিঃশেষে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিত হয়ে রইল, নিজের মনের মধ্যে পূর্ণ হয়ে উঠল, আর ছন্দ মেলাতে না পেরে দিস্তা দিস্তা কাগজে গাদায় গাদায় গদ্য কবিতা লিখতে শুরু করলে।

বেশ চলছিল—শেষ পর্যন্ত হয়তো চলতও এমনি করেই। তারপর সুমিতার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেত, তারও পরে অ্যাডভোকেট হয়ে কালো গাউন গায়ে চড়িয়ে হাইকোর্টে গিয়ে 'মি লর্ড' বলে সওয়াল করত অনিমেষ। সেদিন কাব্য ল রিপোর্টের নিচে চাপা পড়ত, আদ্দির পাঞ্জাবি গিলে করবার সময় পাওয়া যেত না। উচ্চবিত্ত বাঙালী ছেলের জীবনে কলেজী রোমান্স যে পরিণতি লাভ করে, অনিমেষের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হত না।

কবিতা লিখেই কলেজ ইউনিয়ানের সেক্রেটারী হল অনিমেষ। কিন্তু পরিণতি যা ঘটল তা কবিতা নয়।

আবেগমুখী রোম্যান্টিক মন। কিন্তু একটা নিষ্ঠুর আঘাতেই সে মনের গতি ঘুরে গেল সম্পূর্ণ উল্টো দিকে। কবিতার স্রোত ছুটল সক্রিয় রাজনীতির খাতে। চাঁদের আলো হঠাৎ ঝড়ের কালো মেঘের করাল ছায়ার নিচে চাপা পড়ে গেল, রজনীগন্ধার গন্ধ ছাপিয়ে হঠাৎ রক্তের গন্ধের জোয়ার এল। যে অনিমেষ একদিন রাজনীতিকে মেছোহাটার দরাদরি বলে ঠাট্টা করত, সেই অনিমেষের নাম একদিন ছাত্র-সমাজকে চঞ্চল করে তুলল।

তবু মাঝে মাঝে পুরোনো দিনগুলো রক্তের মধ্যে কথা কয়ে উঠেছে। যেন ভুলে যাওয়া একটা গানের কলি হঠাৎ গুঞ্জন করে উঠেছে চেতনার ভেতরে। সবই তো স্বপ্ন—দিবাস্বপ্ন। তবু কোনো কোনো স্বপ্নের রেশ মনের ভেতরে অস্ফুট ব্যথার মতো বাজতে থাকে, কয়লার ধোঁয়ায় কালো ফ্যাক্টরীর আকাশে যেন অ্যাডোনিসের জ্যোতির্ময় মূর্তিটা চকিতের জন্যে আভাসিত হয়ে ওঠে। এমনিই একদিন হয়েছিল।

মানিকতলার একটা শ্রমিক অঞ্চল থেকে ফিরে আসছিল সুমিতা আর অনিমেষ। রাত প্রায় দশটা বেজে গিয়েছিল—এর মধ্যে কেমন করে যেন কে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছিল। শুধু দক্ষিণ থেকে বাতাস বইছিল, লন-ওলা একটা বাড়ি থেকে বিলিতী ঝাউ শব্দ করছিল, আকাশে শুক্লা রাত্রের মস্ত বড় একখানা চাঁদ জেগে ছিল আর বেতারে যেন কে চমৎকার ক্ল্যারিওনেট বাজাচ্ছিল।

নির্জন পথে পাশাপাশি চলছিল সুমিতা আর অনিমেষ। সুমিতার কাঁধে মোটা স্ট্র্যাপের সঙ্গে ঝোলানো বড় একটা চামড়ার ব্যাগ, তাতে রাশীকৃত কাগজপত্র খচখচ করছে। অনিমেষ প্রাণপণে তাকে জটিল একটা রাজনৈতিক সমস্যা বোঝাবার চেষ্টা করছিল—সুমিতা মন দিয়ে শুনছিল, কিন্তু ভালো করে বুঝতে পারছিল না।

এমন সময় হঠাৎ সুমিতার খেয়াল হয়েছিল আকাশে চাঁদ উঠেছে, বিলিতী ঝাউয়ের

শব্দ বয়ে দক্ষিণা বাতাস বইছে, ক্ল্যারিয়োনেটের একটা মধুর মাদক সুর রক্তের মধ্যে ঘুমন্ত স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলছে।

সুমিতা বলে বসল, বড় ক্লান্তি লাগছে। চলো, বসা যাক।

—এখন, এই রাতে? কোথায় বসবে?

—কলকাতার পথ ঘাট সব ভুলে গেলে নাকি?—সুমিতা হঠাৎ মিষ্টি করে হেসে উঠল: সামনেই তো দেশবন্ধু পার্ক।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বললে, রাত কিন্তু দশটার কাছাকাছি।

—তাতে কী হয়েছে?

—পুলিসে ধরবে।

—ধরবে তো ধরুক। কিন্তু সত্যি আমি আর হাঁটতে পারছি না।

—একটা রিক্‌শা ডাকি তা হলে।

—আঃ, সত্যিই তুমি অধঃপাতে গেছ। এমন চমৎকার জ্যোৎস্না—সামনে এমন চমৎকার পার্ক, এখন রিক্‌শা চড়ে ঠনঠন করে যেতে তো আমার বয়ে গেছে।

হঠাৎ অনিমেষের চমক লাগল।

চাঁদ বেশ মাথার ওপর। তার সমস্ত আলো একরাশ সন্থফোটা বকুলের মতোই যেন সে সুমিতার মুখে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। আর তার ছোঁয়ায় সুমিতার চোখ দুটিও ফুলের মতো ফুটে উঠেছে—ফুটে উঠেছে সন্ধ্যার আকাশে প্রথম জেগে-ওঠা দুটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। এই চোখ—এই চাঁদ—কতকাল আগে ভুলে গিয়েছিল অনিমেষ?

মুহূর্তের জন্যে ঘোর লাগল অনিমেষের। রক্তে কথা কয়ে উঠল কথাকলির ছন্দ। বললে, আচ্ছা, চলো।

পার্কেও লোকের ভিড় নেই। যারা স্বাস্থ্যান্বেষী, তারা অনেকক্ষণ আগেই স্বাস্থ্যলাভ করে বিদায় নিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দু-একটা বেঞ্চিতে দু-একজন ভবঘুরে সাংখ্যোক্ত পুরুষের মতো নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছে, অথবা আলোয় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়ি টানছে। অন্য সময় হলে হয়তো ওই বিড়ির আগুনের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলে উঠত, The desire of the moth for the star—

নিভৃত ঘুমন্ত পার্ক। কোথাও যেন আমের মুকুল ধরেছে, দক্ষিণা বাতাস তার জানান দিয়ে গেল। সামনে ছোট পুকুরটায় জল যেখানে জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে, দুজনে সেই-খানেই এসে বসল।

কিছুক্ষণ কারো কোনো কথা নেই। শুধু অনিমেষ দেখছিল চাঁদের আলোয় দুটি নক্ষত্র ফুটেছে সুমিতার চোখে। অসম্বৃত; একগুচ্ছ চুল উড়ে পড়েছে ওর মুখের ওপর, একটা উজ্জ্বল সরীসৃপের মতো সরু সোনার হারটা ওর কণ্ঠকে বেষ্টন করে আছে। নীরবে একটা

ঘাষের শীষ তুলে নিয়ে সেটাকে চিবিয়ে চলেছে সুমিতা।

জ্যোৎস্নায় স্নান করছে পার্ক। জ্যোৎস্নায় ঝিলমিল করছে রূপকথার মতো সামনের জলটা। জ্যোৎস্নায় একাকার হয়ে গেছে আমের বউলের গন্ধ। জ্যোৎস্নায় আলো হয়ে গেছে সুমিতার মুখ।

তিন বছর আগেকার কবি অনিমেষ হঠাৎ যেন ফিরে এল। অ্যাডোনিসের পায়ের কাছে হঠাৎ তরঙ্গ-মন্দ্রে মূর্ছিত হয়ে পড়ল পূর্ণিমার মায়ায় বিহ্বল সেই ঈজীয়ানের উদ্বেল উল্লাস। মনে হল পাশে সুমিতা নেই—কিরণবর্ণা অ্যাটলাণ্টা উঠে এসেছে সমুদ্রের অতল গর্ভ কালো অন্ধকার থেকে ফুল আর জ্যোৎস্নায় ভরা পৃথিবীর এই স্বপ্নলোকে।

যেন মগ্নচৈতন্যের ভেতর থেকে কথা কয়ে উঠল অনিমেষ: আউটরাম ঘাটের সেই সন্ধ্যাগুলোকে তোমার মনে আছে সুমি?

সুমিতা ফিস ফিস করে জবাব দিলে, আছে।

—আজ অনেকদিন পরে তেমনি রাত ফিরে এসেছে, না?

সুমিতা জবাব দিল না।

আবার চুপচাপ। বহুদিনের পর যখন হারানো স্বপ্ন ফিরে আসে, তখন হয়তো সব কথাই এমনি করে অনুভূতির অতলতায় হারিয়ে যায়। নেপ্‌লসের সমুদ্র আর দেশবন্ধু পার্কের এই জলটা যেন একাকার হয়ে গেছে।

কিন্তু রাস্তায় তীব্র স্বরে কুকুর ডেকে উঠল। কোথায় একটা পেটা-ঘড়ি প্রবল বেগে বাজালো রাত দশটা। খালের দিক থেকে ছ্যারারারারা করে উঠল মাল্লাদের প্রচণ্ড হোলির গান। অ্যাট্‌লাণ্টার স্বপ্ন বহুদূরের নিকষ কালো ঈজীয়ানে অবলীন হয়ে গেল।

অনিমেষ আত্মস্থ হয়ে উঠল—হঠাৎ হেসে উঠল হো হো করে। রাস্তায় যে কুকুরটা গলা খুলে সঙ্গীতালাপ করছিল, এই আকস্মিক হাসিতে সন্ত্রস্ত হয়ে সে সবেগে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলো। ওপাশের বেঞ্চির ওপরে যে লোকটা সুখনিদ্রায় মগ্ন ছিল, কান খাড়া করে সে তড়াক করে উঠে বসল, জ্বলন্ত চোখে তাকালো এদের দিকে।

—তাই বলো বাবা, প্রেম করছে। তা এমন করে হাসবার দরকার ছিল কী! শালা কাঁচা ঘুমটাকে মাটি করে দিলে।

চাপা আক্রোশে দাঁতের নিচে একটা কটু গাল বর্ষণ করে সে আবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল—কাঁচা ঘুমটাকে আবার জমাতে হবে ভালো করে।

অনিমেষের হাসির শব্দে সুমিতা সুদ্ধ চমকে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্ত সে বিস্মিতভাবে অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—অমন করে হাসলে যে?

—নেশা ধরছিল। ছেলেবেলার বোকামিগুলো আবার সার বেঁধে পিঁপড়ের মতো

মগজের ভেতরে হানা দেবার চেষ্টা করছিল।

—তাই বুঝি ওই রকম একটা বেখাপ্পা হাসি হেসে সেগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিলে?

—নিশ্চয়। কবিতা তো কবিতা, দেখলে না, রাস্তার থেকে কুকুর সুদ্ধ তাড়িয়ে ছাড়লাম। বেচারা বাড়ি গিয়ে হার্টফেল না করে।

সুমিতা হাসল: না, তা করবে না। কিন্তু পাহারাওলা তেড়ে আসতে পারে। ভাববে আমরা এখানে মদ খেয়ে ইয়ার্কি দিচ্ছি।

—তা হলে হাসির তোড়ে পাহারাওলাকে সুদ্ধ উড়িয়ে দেব। মনে করবে ভূত। নমুনা দেখতে চাও তার?

—থাক, রক্ষা করো। এমন অসময়ে অত বীরত্বে দরকার নেই। কিন্তু—সুমিতা ইতস্ততঃ করতে লাগল: একটা কথা জিজ্ঞেস করব কী?

—স্বচ্ছন্দে।

আকাশে চাঁদ তখনো মোহ ছড়াচ্ছে। তখনো জ্যোৎস্না জ্বলছে সামনের জলটায়। মুকুলের গন্ধ তখনো রক্তের মধ্যে নেশার মতো সংক্রামিত হয়ে যাচ্ছে। সুমিতার চোখে ফুটে-ওঠা নক্ষত্র দুটো তখনো নিবে যায়নি।

—সব জিনিস কি সব সময়ে হেসেই উড়িয়ে দেওয়া যায়?

অত্যন্ত আস্তে আস্তে কথাটা বললে সুমিতা। উড়ন্ত কতগুলো লঘু পালকের মতো হালকা হাওয়ায় যেন কথাগুলো উড়ে গেল।

—তার মানে?—অনিমেষ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

—মানে আর কিছুই নেই—তেমনি আস্তে আস্তে সুমিতা বললে, আউটরাম ঘাটের সন্ধ্যাগুলো কি একেবারেই মিথ্যে? জীবনে কোনো দাম, কোনো সার্থকতাই নেই তাদের?

—হয়তো আছে। কিন্তু আজ নয়।

—কবে তা হলে?

—যেদিন অধিকার আসবে।

—কিন্তু মানুষের এই অধিকারগুলো কি কোনো মুহূর্তের মুখ চেয়ে থাকে?

—মানে?

—বলছি।—আকাশের দিকে আবিষ্ট চোখ রেখে সুমিতা বললে, ধরো একজন বন্দী। চারদিকে তার লোহা আর পাথরের বেড়া। পাহারাওলা, ওয়ার্ডার আর পেটির ঘা তার কাছে প্রতি মুহূর্তের সত্য। কিন্তু কোনো রাত্রে তার লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে যদি জ্যোৎস্না পড়ে, যদি তখন তার গান গাইতে ইচ্ছে হয়, সেটা কি অপরাধ?

—অন্তত বন্দিত্বটা ভুলে যাওয়া অপরাধ বই কি।

—কিন্তু বন্দিত্বটা ভুলতে তো তাকে কেউ বলছে না। জীবনে সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। বন্দিত্ব তার কালও থাকবে, এমন কি কয়েক মুহূর্ত পরেও থাকবে। কিন্তু সেই বিশেষ সময়টিতে তার মন যদি হঠাৎ মুক্তি পেয়ে বসে, তা হলে কি তুমি তাকে অস্বীকার করবে?

—রোমান্টিক বন্দীর মনোবিলাসকে আমি স্বীকার করি না।

চকিতের জন্য সুমিতার মুখের ওপর দিয়ে কৌতুকের একটুখানি হাসি খেলা করে গেল। আজ অনিমেষও রোমান্টিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। মরে গিয়ে যে ম্যাগ্নোলিয়া হয়ে ফুটবার কামনা করত, গরম চায়ের কাপে যে চুমুক দিতে চাইত না ঠোঁট গলে যাওয়ার ভয়ে—আজ তারই মুখে এই কথা! অতিরিক্ত নেশা করত বলেই যেন নেশার নামে ক্ষেপে ওঠে অনিমেষ, প্রয়োজনের চাইতে ঢের বেশি গোঁড়ামি করে। যেন এতকাল ধরে অজ্ঞানের মতো যে পাপ সে করেছে, আজ একটা সজ্ঞান চেতনা লাভ করে সেই পাপের সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। শুধু ষোলো আনা নয়—তার চাইতে আরো কিছু বেশি, একেবারে আঠারো আনা!

কিন্তু সুমিতা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

—আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করব।

অনিমেষ একটা সিগারেট ধরালো। খুশিমুখে খানিক ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে প্রসন্ন ভাবে বললে, বেশ, করো তর্ক।

—রোমান্টিক হওয়া কি এমনিই ভয়ঙ্কর অপরাধ?

অনিমেষ অনাসক্ত হয়ে বললে, জবাব দেওয়া অনাবশ্যক।

—কেন?

—কারণ প্রশ্নটাই তামাদি হয়ে গেছে। Barred by limitation!

—ফাঁকি দিলে তুমি।

—ফাঁকি দেব কেন? ও কথার জবাব এতবার এত লোকে দিয়েছে যে তার পরে ও সম্পর্কে আর কিছু বলবারই দরকার নেই।

—মোটেই না। কোনো লোক এ কথার জবাব দেয়নি। যারা রোমান্টিক নয়, তারা নন্‌রোমান্টিক হওয়ার জন্যেই রোমান্টিক।

—অত্যন্ত বাজে কথা—অনিমেষ সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে লাগল।

—বাজে কথা? কে রোমান্টিক নয়, বলতে পারো? আচ্ছা, একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যুদ্ধক্ষেত্রের মতো বাস্তব আর কিছুই হতে পারে না, সে কথা মানো কিনা? মাথার ওপরে বোমারু, সামনে শত্রু আসছে, মেশিনগানের গুলি কানের কাছে শিস্ দিয়ে যাচ্ছে, এর চাইতে নিষ্ঠুর রিয়্যালিটি আর কিছু নেই নিশ্চয়?

—মানলাম।

—আচ্ছা বেশ। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্বসে যাওয়া ট্রেঞ্চের ভেতরে এক সৈনিকের মৃতদেহ পাওয়া গেল। বুকের কাছে তার পকেট-বইতে দেখা গেল একগুচ্ছ শুকনো মৌসুমী ফুলের পাপড়ি আর একটি মেয়ের ফোটো। তখন তাকে তুমি কী বলবে?

—বলব, মেয়েটির সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে বেচারা বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল, সেই ফাঁকে শত্রুর বুলেট এসে তার পাঁজরা ফুটো করে ফেললে। অর্থাৎ নির্বুদ্ধিতার প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু ওসব অ্যাকাডেমিক তর্ক এখন থাক—সিগারেটটাকে জুতোর তলায় মাড়িয়ে অনিমেষ বললে, ও রবারের মতো, টানলেই বাড়তে থাকবে। তার চাইতে উঠে পড়া যাক—অভদ্র রকমের রাত হয়ে গেছে।

পৃথিবী আরো নীরব, জ্যোৎস্না আরো বিহ্বল, আমের মুকুলের গন্ধ আরো গভীর আর জলটা আরো জলন্ত। অনিমেষের চোখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলল সুমিতা। অনিমেষ যা বলেছে, এ ওর নিজের কথা নয়। ওর মনের ভেতর যে সুরের সাড়া গুনগুন করে উঠেছে, তাকে গলার জোর দিয়ে চাপা দিতে চায়, 'বুলী' করে আত্মনিগ্রহ করতে চায়। সুমিতা জানে, ওর সঙ্গে অনিমেষের মতের কোনো তফাত নেই, বরঞ্চ যেগুলো ও ভালো করে বলতে পারেনি, তাদের আরো চমৎকার করে—আরো সুন্দর করে বলতে পারত অনিমেষ। কিন্তু সে কথা সে বলবে না, নিজেকে শাস্তি দেবে; অনেক বিভ্রান্তি ভরা রাত্রি—অনেক আত্মমগ্নতার দুর্বল মনোবিলাস, অনেক কার্থেজ আর উজ্জয়িনীর স্বপ্নকে নিষ্ঠুর আঘাতে যেমন করে হোক সে ভেঙে-চুরে দেবেই। পরম বস্তুবাদী আদিত্যদা আজো কবিতা পড়ে খুশি হতে রাজী আছে, কিন্তু অনিমেষ নয়। সে রোমান্টিক কবিদের—এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিতে প্রস্তুত।

দুজনে আবার পথে নেমে পড়ল। আবার নীরবতা। দুজনেই দুজনকে সম্পূর্ণ করে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু কোন উপায় নেই। জীবনের গতি যখন ঘুরেছে, তখন একান্ত করেই ঘুরেছে। কোন মধ্যপন্থা নেই, আর কোনো মধ্যপন্থার প্রশ্নও আজ অবান্তর। নিজের মনকে এখনো বিশ্বাস করে না অনিমেষ, সুমিতাও না। একটুখানি চাঁদ আর একটুকু বিহ্বল মুহূর্ত হয়তো আদর্শের দৃঢ় কঠিন প্রাচীরে এমন একটা ফাটল ধরিয়ে দেবে—যেখান দিয়ে ঢুকবে অসংযমের বাঁধভাঙা বন্যা।—প্রতিজ্ঞাকে সহস্র মুখে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। তার চেয়ে এই ভালো। কোনোদিন কবিতা ছিল না, কোনোদিন প্রেম ছিল না। একটা দূরপ্রসারী পথ—সংশয়ে শঙ্কিল, সঙ্কটে বন্ধুর। সে পথে পাশাপাশি চলেছে দুজনে। সুমিতার চোখ থেকে দুটি শান্তোজ্জ্বল সন্ধ্যা-নক্ষত্র নিবে গেছে অনেকদিন আগে, শুধু সেখানে জ্বলে যাচ্ছে উল্কার প্রখর শাণিত শিখা।······

······চমক ভাঙল। অনিমেষ পাশে নেই। কয়েক মাস আগে সে বেরিয়ে চলে গেছে

একটা গুরুদায়িত্ব নিয়ে, চা-বাগানে অর্গানাইজেশন গড়ে তুলতে হবে। ধনতান্ত্রিক শোষণের অন্যতম চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে চা-বাগান। সেখানে এখনো আফ্রিকার আদর্শে রাজ্যপাট চলছে। সেখানে শ্রমের দাম নাম মাত্র, জীবনের দামও প্রায় তাই। ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর মানুষের জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, যেটুকু বাকি আছে, তাকে শেষ করে দিচ্ছে ম্যানেজার থেকে নিম্নতম বাবুটি পর্যন্ত। বাইরে থেকে কারো সেখানে ঢুকবার জো নেই—যে ঢুকবে তাকে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বিতাড়িত করবার ব্যবস্থা হবে।

তাই আদিত্য অনিমেষকে পাঠিয়েছে বাগানে। যেমন করে হোক ঢুকতে হবে, যেমন করে হোক বহুদিনের নিশ্চিন্ত রাজ্যপাটে ফাটল ধরাতে হবে। অনিমেষ চলে গেছে কয়েক মাস আগে, নানা বাগানে ঘুরে একটা সাহেব বাগানে চাকরি জুটিয়েছে। কাজকর্মও করছে ভালো। তারপর দিন তিনেক আগে এসেছে দুঃসংবাদ। কী একটা অঘটন ঘটেছে, ছুটে গেছে আদিত্য। অনিমেষ আদিত্যের ডান হাত—তাকে বাদ দিলে একমুহূর্ত তার চলে না। অথচ এ পর্যন্ত অনিমেষ বা আদিত্য কারো খবর এল না। তার কাছে নয়, মণিকাদির ওখানেও নয়। কী যে হয়েছে কে জানে।

রেলিঙে ভর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে তেমনি করে দাঁড়িয়ে রইল সুমিতা। সমস্ত চৈতন্যটা যেন বিশৃঙ্খলভাবে ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে। ঠিক উৎকণ্ঠা বোধ হচ্ছে তা নয়—কেমন একটা অনাসক্তি তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ধরেছে। সুমিতা বুঝতে পারছে লক্ষণটা ভালো নয়—হারানো চাঁদ তার ওপর প্রভাব বিস্তার করছে, তার রক্তে রক্তে ছায়া সঞ্চার করছে। তাই অলক্ষ্যে থেকে অনিমেষ—

নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা করলে সুমিতা। শীতের রোদে চাঁপা ফুলের রঙ। সামনে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে গাড়ির স্রোত। একখানা এ-আর-পি'র মোটর তীরবেগে বেরিয়ে গেল—যেন ভবিষ্যৎ কর্মতৎপরতার আভাস দিচ্ছে। দেওয়ালে দেওয়ালে পড়েছে সতর্কতামূলক পোস্টার। ওপাশের লাল বাড়িটার গায়ে দুজন বিকৃত বীভৎস-মুখ জাপানীর চিত্র। একজন হাতে ফুলের মালা নিয়ে পরম স্নেহভরে বেতারে বক্তৃতা দিচ্ছে আর একজন জানোয়ারের মতো বত্রিশটা তীক্ষ্ণ দাঁত বের করে তার পেছনে সঙ্গীন উঁচিয়ে আছে। প্রচারপত্র বড় বড় হরফে বলে দিচ্ছে : ভুলেও ভুলবেন না—এরাই আপনাদের শত্রু—

হঠাৎ হাসি পেল। ছবিটা এঁকেছে মন্দ নয়। মানুষকে কত বিকৃত করে দেখানো যায় তার নমুনা। জাপানীরা ইংরেজের কী জাতীয় কার্টুন আঁকে জানতে ইচ্ছা করে—অন্তত তাদের হাতে কী রকম রূপ পায় উইন্স্টন চার্চিলের মুখখানা।

বাড়ির নিচে দুখানা রিক্শা এসে থামল। সুমিতার দৃষ্টি উৎসুক হয়ে উঠল মুহূর্তে।

চারটি ছেলে নেমেছে রিক্‌শা থেকে। বার বার করে তারা বাড়ির নম্বর মিলিয়ে দেখল, তারপর তাকালো এ ওর মুখের দিকে। যেন ব্যাপারটা তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। মানিকতলার একটা অন্ধকার খোলার ঘর থেকে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের এই রাজপ্রাসাদে তাদের পদোন্নতি—এটা যেন তারা স্বপ্নেরও অতীত বলে মনে করছে। সুমিতা সকৌতুকে তাদের লক্ষ্য করতে লাগল।

একজন বললে, দূর, ভুল হয়েছে।

আর একজন জবাব দিলে, কেমন করে হবে? এই তো নম্বর।

কিন্তু ইতিমধ্যে বাকি দুজন তেতলার বারান্দায় দেখে ফেলেছে সুমিতাকে। উল্লাসে তারা চিৎকার করে উঠল: আরে, ওই তো সুমিতাদি।

চারজনের দৃষ্টি একসঙ্গে সুমিতার ওপরে গিয়ে পড়ল। সত্যিই সুমিতাদি—অবিশ্বাস্য হলেও এ বাড়ির মালিক এখন তারাই। খোলার ঘরের অন্ধকারে ঠাণ্ডা মেজেতে শুয়ে শুয়ে আর ইঁদুর তাড়াতে হবে না, মস্ত বাড়িতে নিশ্চিন্ত আরামে রাজার হালে তারা ঘুমুতে পারবে।

—ও সুমিতাদি, ভেতরে যাবো কোন্ রাস্তায়? সব তো বন্ধ।

—দাঁড়াও ভাই, আমি আসছি, সদর খুলে দিচ্ছি।

দ্রুতগতিতে ভেতরে চলে এল সুমিতা, তর তর করে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। পার্টির ছেলেরা এসে পড়েছে। এখন তার অনেক কাজ। এই ভবঘুরে বাউণ্ডুলে ছেলে-গুলোর দায়িত্ব তাকে নিতে হবে—এদের সামলাতে হবে, এই হচ্ছে আদিত্যদার আদেশ।

অনিমেষের কথা ভাববার সময় নেই এখন, আদিত্যেরও নয়। সুমিতার এখন অনেক কাজ।

চার

কলকাতায় সম্পূর্ণ ব্ল্যাক-আউট হয়নি, শুধু আলোগুলোর মুখে কালো ঘোমটা নেমেছে। মাঝে মাঝে পুরো অন্ধকারের মহড়া চলে। অস্বাভাবিক একটা বিভীষিকার মতো অন্ধকারের কালো গুণ্ঠন কলকাতাকে ঢেকে দেয়—ট্রাফিক থমকে দাঁড়ায়, চারদিকের বাড়িঘরগুলো থেকে দানবীয় চিৎকার ওঠে। সে চিৎকার আনন্দের না ভয়ের ঠিক বোঝা যায় না। মোড়ের বিড়িওয়ালা অশ্লীলভাবে অশ্লীলতম একটা গানের কলি চিৎকার করে ওঠে—মনের নিরুদ্ধ পশুটাকে মুক্তি দেবার পক্ষে এর চাইতে চমৎকার সুযোগ আর কী হতে পারে? মনে হয় এ অন্ধকার কলকাতার ওপরতলার নয়—নিচের ড্রেন পাইপের কালো গর্তের থেকেই এ বস্তু ওপরে ঠেলে উঠেছে। তেমনি বিষাক্ত, তেমনি শ্বাসরোধী,

তেমনি কদর্য আর তেমনি পূতিগন্ধী।

আর বাকি সন্ধ্যাগুলো ঘোমটা-পরা আলোর অনুগ্রহে অস্বচ্ছ, অনুজ্জ্বল। একটা প্রেতপিঙ্গল আভায় চারদিকের মানুষ-জন, বাড়িঘর গাড়ি-ঘোড়া—সব যেন অশরীরী ছায়ামূর্তির মতো নাচতে থাকে। সব বদলে গেছে, সব অন্যরকম হয়ে গেছে। এ কলকাতা আলাদা। এ কলকাতা অচেনা। এখানকার মানুষগুলো একটা পাথরের মতো গুরুভার ভয় বুকে চাপিয়ে নিয়ে যেন শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে। আর পালাচ্ছে প্রাণপণে—পালাচ্ছে কুৎসিতভাবে—প্রাণরক্ষার একটা ঐকান্তিকী জৈব তাড়নায়। 'থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় নিমেষে যোজন ফরসা'—পথ চলতে চলতে এই গানের কলিটাই বার বার করে আদিত্যের মনে পড়ছিল।

একহাতে একটা ছোট স্যুটকেশ নিয়ে হন হন করে এগিয়ে আসছিল আদিত্য। সাড়ে দশটার ট্রেনটা তাকে ধরতে হবে—যদিও ট্রেন ছাড়তে এখনও দু ঘণ্টার ওপর দেরি আছে। গাড়িটা সাইডিং থেকে এসে প্ল্যাটফর্মে ইন্ করবার আগেই চলতি অবস্থায় তাতে ঝাঁপিয়ে উঠতে হবে—একেবারে ওস্তাদ সাঁতারুর ডাইভ করবার কায়দায়। না হলে পরমুহূর্তে লাঠিঠ্যাঙ্গা এবং বিপুল জনতার এমন তরঙ্গ আসবে যে, মুহূর্তে পিষে ফেলে দেবে একেবারে। যতই আত্মবিশ্বাস থাক, গণ-দেবতার এই ভৈরব-সংঘাতকে ভয় করে না, এত বড় সাহসী পুরুষ আদিত্য নয়।

বড় রাস্তা বিপজ্জনক। একচোখো মোটরগুলো এর মধ্যেও পাগলের মতো ছুটছে। আলোটা মোটরের কোন্ দিকে যে জ্বলছে, ঠিক ঠাহর করা যায় না—বিব্রত পথচারী পাশ কাটাতে গিয়ে অনেক সময় সোজা মোটরের তলায় গিয়ে ঢোকে। সুতরাং সন্ধ্যার পর গলিই নিরাপদ—যদিও এর মধ্যেই গুণ্ডার আবির্ভাব ঘটেছে শহরের অন্ত-প্রত্যন্তে। অন্ধকার কলকাতার ভূগর্ভবাহী বিষদিগ্ধ নালাগুলো থেকে দানবের আনা-গোনা শুরু হয়েছে। তবু গলিই ভালো।

পায়ের নিচে স্তূপাকার আবর্জনা মাড়িয়ে আদিত্য এগোতে লাগল। চাপা গলির দুপাশে বীভৎস দুর্গন্ধ পাক খাচ্ছে। তার ওপরে খাদ্য খুঁজছে পথের কুকুর—অন্ধকারে তাদের চোখগুলো বুনো জানোয়ারের মতো জ্বলছে। ওই কুকুরগুলোকে দেখেও এখন ভয় করে। শ্মশান-কলকাতার বুকে যেন ওরা শ্মশান-কুকুর—ভীত আতঙ্কিত মানুষের কাঁধের ওপরে এই সুযোগে ওরা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

চুরুটটা ধরিয়ে নেওয়া দরকার। এই আবর্জনার ভেতরেও আদিত্য দাঁড়িয়ে পড়ল। পকেট থেকে দেশলাই বার করে একটা কাঠি ধরালো। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা তিরস্কার।

—আসবে তো এসো না। অত পরখ করবার কী দরকার ?

আদিত্য চমকে উঠল। ভৌতিক গলা নাকি ? না—ভূতের চাইতেও মারাত্মক।

অন্যমনস্ক আদিত্যের এতক্ষণ চোখেই পড়েনি এই সরু গলির দুপাশের রোয়াকে আর দরজায় কারা মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বিড়ি টানছে, কেউ সিগারেট।

এতটুকু দেশলাইয়ের কাঠি, এইটুকু আলো। তবু মলিন অন্ধকার গলিটা যেন অতি-রিক্ত আলো হয়ে উঠেছে—আলোর খোঁচা তীক্ষ্ণমুখ আলপিনের মতো গিয়ে বিঁধছে নিশাচরীদের চোখে। দুপাশে রং-বেরংয়ের কাপড়-পরা বিকৃত নারীপণ্য। কলকাতার পয়ঃপ্রণালীর আরেক রূপ। ক্রুর বিসর্পিল কামনার কদর্য প্রবাহিকা।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছ কী? আসবে তো চলে এসো না নাগর।

দুপাশের মূর্তিগুলো প্রেতিনীর মতো খিল খিল করে হেসে উঠল। নিশ্চয় ভেবেছে নবাগত—এ পথে নতুন সংশয়গ্রস্ত পথিক। চুরুট আর ধরানো হল না, পালাতে পারলে বেঁচে যায় আদিত্য।

—আহা, পালাচ্ছ কেন? ট্যাঁকে পয়সা নেই বুঝি? খালি দেখেই সুখ?

আদিত্য প্রায় ছুটে চলেছে একরকম। পেছন থেকে হাসির আওয়াজ কানে আসছে, ওর কাপুরুষতায় ভারী কৌতুক অনুভব করছে ওরা।

গলি দিয়ে আসতে গিয়ে এই বিড়ম্বনা। শর্টকাট করবার বিঘ্ন অনেক। কিন্তু আদিত্য ভাবতে লাগল: এরা এখনো দাঁড়িয়ে আছে, এখনো প্রতীক্ষা করে আছে কিসের আশায়? ওদের খদ্দেরেরা তো প্রায় পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে—ওদের কি কোনখানে যাওয়ার জায়গা জুটল না? পরিত্যক্ত কলকাতার পাপ আর আবর্জনার বোঝার সঙ্গে ওরাও কি এইখানেই পড়ে রইল? সভ্যতার যে নরকে এসে ওরা নেমেছে, সেখানে ওদের নতুন করে কিছু ভাববার নেই, ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকবার জন্যে ওদের যে দুঃসহ যন্ত্রণা, জাপানী বোমা তার চাইতে বেশি দুঃখ ওদের আর কী দিতে পারে? সমাপ্তি ঘটে অকথ্য ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে, গুণ্ডার ছুরি আর মদের গ্লাসের আর্সেনিকে, একেবারে একটা বিকট বিস্ফোরণের মধ্যে সেই সমাপ্তি যদি ওদের কাছে নেমে আসে, তাহলেও অনুযোগ করবার কিছুই নেই ওদের।

চলার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও দ্রুতগতিতে চলছিল। তাড়াতাড়ি স্টেশনে পৌঁছনো দরকার। পরে আর গেটের ভেতরে ঢোকা যাবে না। অনিমেষের খবরটা দুশ্চিন্তার একটা পাথরের মতো চেতনার ওপরে চেপে বসেছে। কী যে হয়েছে, কে জানে—ডুয়ার্সের জঙ্গলে যে কোন রকম ঘটনা যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে। চা-করদের অপরিসীম মহিমা আর দোর্দণ্ড প্রতাপের ইতিবৃত্ত অজানা নেই আদিত্যের।

কিন্তু চিন্তায় ছেদ পড়ে গেল।

ছোট গলির পাশে আবার কানাগলি। কোন অ্যাক্সিডেন্টের ফলেই বোধ হয় সেখানে আধখানা গ্যাস জ্বলছে। তারই আলোয় দেখা গেল, কানাগলির ভেতর দিকে

টলতে টলতে একটি কাপ্তান বেরুল। যাক রোয়াকে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একেবারে হতাশ্বাস হওয়ার মতো অবস্থাটা এখনো ঘটেনি তাহলে!

লোকটা একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল। পরম বিরক্তিভরে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে আদিত্য, এমন সময় আধখানা গ্যাসের আলোয় আদিত্য তাকে চিনতে পারল। এবং চেনবার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ময়ের একটা প্রচণ্ড চমক তার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল!

লোকটি হেমন্তবাবু।

হেমন্তবাবু! তাদের পাড়ারই মানুষ। কী একটা ব্যাঙ্কের সামান্য কেরানী, আধবুড়ো নিম্নবিত্ত ভদ্রলোক। শান্ত এবং নির্জীব। ন'টা না বাজতেই অফিসে ছোটে, ফেরে বিকেল পাঁচটায়। নিজের দীনতায় সব সময়ে নিচু হয়ে থাকে—সহজে চোখ তুলে কারও সঙ্গে কথা বলে না। সেই হেমন্তবাবুর পেটে পেটে এই বিদ্যে!

হেমন্তবাবু তাকে চিনেছে। অথচ আশ্চর্য, লোকটা লজ্জা পেল না! বরং পরম কৌতুক ও কৌতূহলভরে হো হো করে মাতালের হাসি হেসে উঠল।

—কী দাদা, তুমিও এই দলে? বাইরে ভালো মানুষটি, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানো না, আর ভেতরে ভেতরে অ্যাঁ—

হাসির আবেগে টলে পড়ে যাচ্ছিল হেমন্তবাবু, হঠাৎ গ্যাসপোস্টটা আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলে নিলে।

আদিত্য বললে, পথ ছাড়ুন। বুড়ো বয়েসে এসব করে বেড়াচ্ছেন, লজ্জা করে না আপনার?

—লজ্জা? লজ্জা কিসের বাবা? ওসব তোমাদের ভূষণ। আমাদের তো পেটেও নেই, পরণেও নেই। একটু ফুর্তি করব, তাতেও তোমরা বাগড়া দিলে চলবে কেন?

—পথ ছাড়ুন। আদিত্য অধৈর্য আর বিপন্ন বোধ করতে লাগল।

—পথ ছাড়ব? আচ্ছা বেশ। কিন্তু সোনার চাঁদ, একটা কথার জবাব দাও দিকি। তোমরা সব ভালো লোক—তোমাদের এত ভালো ভালো জায়গা থাকতে আমাদের এই হাড়কাটায় এসে ঢুকলে কেন? সবই তো বাবা নিয়েছ, ভালো চাকরি, ভালো বাড়ি, ভালো খাবার—আমাদের খেঁদী পাঁচী বিদ্যেধরীদের দিকেও হাত বাড়াতে চাও? এমনিতে পথ ছাড়ব না বাপধন, কৈফিয়ৎ চাই।

আশ্চর্য, হেমন্তবাবুও কৈফিয়ৎ চায়। সেই কোলকুঁজো লোকটা, যার মেরুদণ্ড চাকরির চাপে ধনুকের মতো বাঁকানো, পৃথিবীর সকলের কাছে মাথা নুইয়ে নুইয়ে যার ঘাড় ঝুলে পড়েছে, সে কিনা আদিত্যের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে এল! যার জোর গলার আওয়াজ কেউ কখনো শুনতে পেয়েছে কিনা সন্দেহ—সেই হেমন্তবাবু যেন সম্রাট আলেকজাণ্ডারের

মতো অকস্মাৎ উদাত্তকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। তার নির্বোধ ভীত চোখে যেন হঠাৎ জ্বলে উঠেছে পৌরুষের আগুন। এ কি শুধুই মদের নেশা, না আরো কিছু আছে এর পেছনে? বাইরের পৃথিবীতে, সভ্য ভদ্রলোকের জগতে ভয় পায় হেমন্তবাবুরা, তারা চোখ তুলে চাইতে জানে না, কথা কইতে ভরসা পায় না। সেখানে যেন তারা অনধিকারী। কিন্তু এই অন্ধকার হাড়কাটা গলিতে তারা যেন নিজের রাজ্য ফিরে পায়, মদের তরল তীক্ষ্ণ ধারা তাদের বুকের মধ্যে প্রদীপ্ত পৌরুষকে জ্বালিয়ে তোলে—নিজস্ব গৌরব এবং মর্যাদায় তারা আদিত্যদের পথ আটকায়, জবাবদিহি দাবি করে।

আদিত্য বললে, হেমন্তবাবু সরুন, আমাকে স্টেশনে যেতে হবে।

—স্টেশনে? তাই বলো। পালাও বাবা পালাও। কলকাতায় মধু নেই তো, এখন সটকান দিয়ে প্রাণ আর পিত্তি রক্ষে করো। তোমরা সব সুখের পায়রা হে—হে—হে—

আবার প্রচণ্ডভাবে হাসতে শুরু করে দিলে হেমন্তবাবু। থুথুর কণা ছিটকে আদিত্যের মুখে এসে পড়তে লাগল, নাকে আসতে লাগল দিশি মদের উগ্র অম্ল গন্ধ। আদিত্যের ইচ্ছে করতে লাগল এক ধাক্কা দিয়ে ডাস্টবিনের মধ্যে উল্টে ফেলে দেয় হেমন্ত-বাবুকে—তার সময় নেই, এর পরে আর প্ল্যাটফর্মে ঢোকা যাবে না। কিন্তু হেমন্তবাবুর বলার মধ্যে একবিন্দুও সত্যি নেই কি?

—আপনি পথ ছাড়বেন, না ধাক্কা মেরে চলে যাবো?

—ছাড়ব বইকি, ছাড়ব বইকি। আপনাদের পথ কি আমরা কখনো আটকাতে পারি স্যার? আপনাদের দামী জীবন স্যার—পাঁচশো সাতশো হাজার টাকা মাইনে পান, আপনাদের মারতে পারে কে? কিন্তু আমার তো পালাবার উপায় নেই, ঘুষ দেবারও পয়সা নেই। বোমা খেয়ে ঘরে বউ ছেলেমেয়ে মরুক, এখানে আমি পাঁচীকে আঁকড়ে নিয়েই উড়ি। যাঃ—শালা, চুকে যাক ল্যাঠা।

হাতের কাছে পাঁচীকে পাওয়া গেল না, কাজেই ল্যাম্পপোস্টকে আঁকড়ে হেমন্তবাবু মাটিতেই বসে পড়ল।

—এই বসলাম। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং উঁহু। এসো বাপ জাপানী বোমা, তোমার সঙ্গেই মোলাকাৎ হোক।

পাশ কাটিয়ে তীরের মতো এগিয়ে গেল আদিত্য। পেছনে তখন চিরনির্বাক হেমন্ত-বাবু প্রাণ খুলে একখানা বিচিত্র দুর্বোধ্য গান ধরেছে—হয়তো পেশোয়ারী ঠুংরী কিংবা আফগানী গজল।

আর গলি নয়, ঘুরে ফিরে এবার মীর্জাপুর স্ট্রীট।

ওদিকের ফুটপাথে পানের দোকানে কতগুলো লোক জটলা করছে। লুঙ্গি, লাল গেঞ্জি আর গিলেকরা পাঞ্জাবি পরা গুণ্ডা-শ্রেণীর লোক। পান খাচ্ছে, সিগারেটের ধোঁয়া

ওড়াচ্ছে। নিশ্চিন্ত আর নির্ভীক। ওরা জানে ওদেরই দিন এসেছে এইবারে।

তবু ওর ভেতর থেকে একজন আদিত্যকে দেখেই চট্ করে উঠে দাঁড়ালো। তারপর নিতান্ত উদাসীনের মতো যেন সান্ধ্য ভ্রমণ করবার জন্যেই ধীর মন্থর গতিতে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিলে।

কিন্তু আদিত্যের দৃষ্টি এড়ালো না। টিকটিকি। এই ডামাডোলের মাঝখানেও ভয় পায়নি, কর্তব্যবুদ্ধি হারায়নি। বরং ভারতরক্ষা বিধান আইনে অনেকগুলো নতুন হাতিয়ার পেয়েছে হাতে। ওদের প্রভুভক্তি অতুলনীয়—মরে নিশ্চয়ই কুকুরের স্বর্গলোক লাভ করবে।

আদিত্য তাড়াতাড়ি চলেছে, লোকটারও যেন কাজের তাগিদ বেড়ে গেছে অত্যধিক পরিমাণে। যেন সাড়ে দশটার ট্রেনটা না ধরলে ওরও চলবে না—অনিমেষের মতো ওরও কোন বিপন্ন বন্ধু সেখানে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে।

কিন্তু ওদিকে লক্ষ্য রেখে লাভ নেই। যা খুশি করুক—যতটুকু পারে কর্তব্য পালনের আনন্দটা উপভোগ করে নিক। কিন্তু আসছে শিয়ালদা স্টেশনের মহাসাগর, সেখানে ওর যে কিছুই করবার নেই, আদিত্য তা ভালো করেই জানে।

অনুমানটা একেবারে মিথ্যাও হল না।

মেইন গেটে ঢোকবার মুখেই বাক্স প্যাঁটরা, মানুষ, রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি আর চারদিকের প্রায়ান্ধকারে একেবারে হারিয়ে গেল আদিত্য, হারিয়ে গেল সমুদ্রবেলায় একটি বালিবিন্দুর মতো। সরকারের ঘ্রাণকুশল বুলডগ এই জনারণ্যে তাকে খুঁজে পেল না।

সে খুঁজে পাবে কি, নিজেকেই নিজে খুঁজে পায় না আদিত্য—এমনি অবস্থা।

কী করে যে ট্রেনে উঠল নিজেও তা ভালো করে বুঝতে পারল না। কয়েক মুহূর্ত পিণ্ডাকার ধ্বস্তাধস্তি, তারপর একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় বন্দুকের গুলির মতো জানালা ডিঙিয়ে ভেতরে ছটকে পড়ল একখানা বেঞ্চের ওপর। তারপর টাল সামলে দাঁড়াতে গিয়ে দেখল কাঠের দেওয়াল ঘেঁষে বেঞ্চের এক পাশে ইঞ্চিকয়েক জায়গায় সে কচ্ছপের মতো সংকীর্ণ হয়ে আছে। কোন অবস্থাতেই মানুষের যে অতখানি সংকুচিত হওয়ার ক্ষমতা থাকতে পারে—এটাকে একটা নতুন অভিজ্ঞতা বলে মনে হল।

মাত্র দু মিনিট কি তার চাইতেও কম। তারপরে আর সর্ষে ফেলবার জায়গা রইল না। গরমে নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম—দরদর করে ঘামের স্রোত নেমে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিতে লাগল। আর এরই মধ্যে চোখে পড়ল ঘড়ির কাঁচটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, শক্ত খদ্দরের পাঞ্জাবিটাও আধাআধি ছিঁড়ে নেমেছে একরকম।

নিশ্চিন্ত আরামে একটা চুরুট ধরালো আদিত্য। তবু সে উঠতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত, গিয়ে পৌছুতেও পারবে হয়তো।

কিন্তু বাইরে প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়েছে তখন। যারা ভেতরে উঠতে পেরেছে তারা আর অপেক্ষা না করে পত্রপাঠ নামিয়ে দিয়েছে শার্শী আর কাঁচের জানালাগুলো। যারা বাইরে আছে তারা দমাদ্দম শব্দে বন্ধ দরজা জানালায় কিল ঘুষি চালাচ্ছে—লাঠির ঘা মারছে। আর সবসুদ্ধ এমন দানবীয় কোলাহল উঠছে যে কানের পর্দা ফাটবার উপক্রম।

ঝন ঝন ঝন—

প্রচণ্ড আঘাতে ওদিককার একটা কাঁচের জানালা ভেঙে পড়েছে। তীরের মতো কাঁচের টুকরো উড়ে এল, তারপরেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ।

—আহা-হা—

—একদম খুন কর দিয়া—

—মারো শালাকে।

তারপর ভেতরে বাইরে অশ্লীলতম ভাষায় গালাগালি। ভদ্রাভদ্র, বাঙালী হিন্দুস্থানীর বাছবিচার নেই, ভয়ের মর্মান্তিক তাড়নায় মানুষ তার খাঁটি অনার্য আদিমতাকে খুঁজে পেয়েছে।

আদিত্য চুরুট টানতে লাগল। কামরায় বাতাস আসবার এতটুকু পথ নেই। যেটুকু ছিল তা এত মানুষের নিশ্বাসে বিষাক্ত হয়ে গেছে। তার সঙ্গে মিশেছে রাশি রাশি বিড়ি সিগারেট, সেই সঙ্গে নিজের চুরুটের ধোঁয়া। পাশেই ল্যাভেটরী, মানুষের চাপে তারও দরজাটা একেবারে খোলা—দুর্ভাগ্যের যেটুকু বাকি ছিল, ওখান থেকে যে তীব্রতর গন্ধটা আসছে তাতে তাও পূর্ণ হয়ে গেছে। রুমাল ঘুরিয়ে আদিত্য বৃথাই খানিকটা বায়ুলাভের চেষ্টা করতে লাগল।

চারদিকে আলোচনার আর বিরাম নেই। কান্নার শব্দও শোনা যাচ্ছে। কারো কাছে একটি কচি শিশু আছে বলে মনে হয়—মাঝে মাঝে প্রবলবেগে সে ডুকরে উঠছে। নিশ্চয় কামরায় ওঠবার সময় সেই মল্লযুদ্ধের পরে কোথাও চোট লেগেছে তার। একটা বিরক্ত পুরুষ-কণ্ঠ বীভৎসভাবে ধমক দিচ্ছে: চুপ চুপ! গলা টিপে মেরে ফেলব কিন্তু।

গলার আওয়াজে মনে হল কাজটা তার পক্ষে একেবারে অসাধ্য ব্যাপার নয়।

বাংলা-হিন্দী-উর্দুতে মেশানো আলাপ-আলোচনা তো চলছেই; কেউ শোক করছে অমন কারবারটা এবারে গেল; কারো চাকরির মায়া ছাড়তে হয়েছে, এবার দেশে ফিরে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই। তেতারিয়ার মা ব্যাকুল স্বরে বলছে, তার জোয়ান মেয়েকে সে হারিয়ে ফেলেছে, এই ভিড়ের মধ্যে কোন্ গাড়িতে কাদের পাল্লায় সে পড়েছে কে জানে। কোন এক অতুলদার কোন এক ভাই তার বৌদিকে বোঝাচ্ছে যে, অতুলদা অত্যন্ত হুঁশিয়ার মানুষ—তাঁর জন্যে ভাবনার কিছুমাত্র কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু অতুল-বৌদি বুঝছেন না—তিনি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে শাড়ির আঁচলে

চোখ মুছছেন—গাড়ির অনুজ্জ্বল আলোতেও তাঁর কপালের সিন্দুর-বিন্দুটা বড় বেশি জলজ্বল করে জ্বলছে। অশ্লীল ইয়ার্কিও চলছে, চলছে হিন্দী সিনেমার গান। ওদিকে স্তূপাকার একটা বিছানার ওপরে আসীন দুজন প্রৌঢ়বয়সী হিন্দুস্থানী এর ভেতরেও সুর করে কী একখানা ধর্মগ্রন্থ পাঠ শুরু করেছে—খুব সম্ভব তুলসীদাসের 'রাম-চরিত মানস'। শ্মশান-বৈরাগ্যই বোধ হয়। বাইরে প্রবল কোলাহলে স্টেশন ফেটে যাচ্ছে, ভেতরে যারা আছে, তাদের সে সম্বন্ধে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, যেন জাহাজ ডুবছে—সেই অবসরে তারা লাইফবোট আশ্রয় করে সমুদ্রে ভেসে পড়েছে।

আর রাজনীতি, যুদ্ধের আলোচনা তো আছেই।

—জাপানী লোগ তো আ গিয়া।

—জরুর। মাণিক লালজী বোলা রহা কি দো-চার রোজ মে কলকাত্তা একদম চুর-চুর হো যায়ে গা।

—অ্যায়সা—হাঁ?

—আখবার নেই দেখা? রংগুণমে ভি ভারী জং লাগ গিয়া—অংরেজ লোক একদম—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

—হাঁ—অ্যায়সা?

—ও আর কিছু হবে না দাদা। সিঙ্গাপুরে প্রিন্স অব ওয়েলস আর রিপালসের সঙ্গে সঙ্গেই যা হবার হয়ে গেছে।

—সেদিন টোকিও রেডিও থেকে কী বলেছে শোনেননি? **Where is the great British Navy? Under the sea! Where is the great Commander-in-Chief? He is commanding his fleet at the bottom of Pacific!**

—বাঃ, বেড়ে বলেছে তো। ব্যাটাদের রসবোধ আছে।

—আজকের কাগজ দেখেছেন তো? রেঙ্গুনে শত্রু-বিমানের বোমা বর্ষণের ফলে কয়েকজন অ-সামরিক হতাহত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য।

—তাই বটে! দেখুন গে, এতক্ষণে সব লেভেল করে দিয়েছে। মিথ্যে কথা তো বলবেই—লোকের 'মোরেল' ঠিক রাখা চাই তো।

—হাঁ—হাঁ—'মোরেল'। ও নিয়ে আর মোড়লি না করে নিজেদের 'মোরেল' ঠিক রাখুক গে—যুদ্ধটা জিততে পারবে।

—হুঁ, জিতবে। গোড়া থেকেই তারই তো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

—আহা ঘাবড়াচ্ছেন কেন! এ হচ্ছে স্ট্র্যাটেজির যুদ্ধ—ওয়ার অব নার্ভস। ব্লিৎসক্রীগ দেখিয়ে চমক দিলেই হয় না মশাই, ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।

—রাত তো পুইয়েই গেল দেখতে পাচ্ছি। এর পরে আর মারের সময় আসবে কখন বলুন দেখি?

—আসবে আসবে। সেদিন কাগজে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেননি? অ্যাংলো-আমেরিকান এয়ার ফোর্স ইচ্ছে করলে তিন দিনে ফুজিয়ামা সুদ্ধ জাপানকে জাপান সাগরের নিচে পৌঁছে দিতে পারে।

—তা ইচ্ছেটা তাঁরা করছেন না কেন? আপনি মশাই দুখানা টেলিগ্রাম করে দিন না চার্চিল আর রুজভেল্টকে—কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে আপনার।

—ওরকম অ্যাটাক করছেন কেন মশাই? তর্ক করবেন তো ভদ্রভাবে করুন।

—কী বললেন! আপনার কাছ থেকে ভদ্রতা শিখতে হবে নাকি? মহা ভদ্রলোক দেখছি যে! বলি মশায়ের পেশাটা কী, নিবাস কোথায়?

তারপর ভদ্র ভাষায় অভদ্র বাক্য বিনিময়। বাঙালী যুদ্ধ করতে পারে না, তাই যুদ্ধ করবার আগ্রহ ও উত্তেজনা এই পথেই ব্যয় করছে। মনে হল, এরা ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তেই যুদ্ধের যা কিছু জটিলতার মীমাংসা হয়ে যেতে পারে।

—থামুন দাদারা, আর বকাবকি করবেন না। এর পরে যে ইণ্ডিয়া ডিফেন্স-অ্যাক্টে পড়বেন, সে খেয়াল নেই বুঝি? সরকারী প্রচার-পত্র পড়েননি? শত্রুর কান চারিদিকেই খাড়া হইয়া আছে?

বেশ উপভোগ্য লাগছে আদিত্যের। আলোচনা শুধু শুষ্ক রাজনীতিই নয়—বেশ সরস, উপাদেয়। তবু এই ভালো—ট্রেনের এই আবহাওয়ার মধ্যে পাণ্ডিত্যের কূটতর্ক বরদাস্ত হত না।

গরমে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে—অন্ধকূপ হত্যার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। দরজায় জানলায় সশব্দ আঘাতের বিরাম নেই। সমস্ত কোলাহল ছাপিয়েও শোনা যাচ্ছে বাইরে কে কাতর কণ্ঠে ডেকে ফিরছে: সুবোধ, সুবোধ কোথায় গেলি রে? ও সুবোধ?

দরজার কাছে কার বিপন্ন মিনতি: খোল্ দিজীয়ে—মেহেরবাণী করকে খোরা খোল্

—নেহি—নেহি—

—মর যায়েগা, বালবাচ্ছা মর যায়েগা—

—মরনে দেও। যে অবস্থা হয়েছে, দেখছ না? কে কাকে বাঁচাতে পারে বাবা?

ছোট ছেলেটি মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে এখনো—ধমকাতে ধমকাতে পুরুষটি হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অথবা হয়তো যোগ দিয়েছে রাজনীতির উত্তপ্ত আলোচনায়। অতুল-বৌদির বিলাপের বিরাম নেই। দেবর অশ্রান্তভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছে: কেন ভয় পাচ্ছ? যদি তেমন

কিছু হয়, তাহলে পালিয়ে আসতে আর কতক্ষণ লাগবে? কলকাতা থেকে রংপুর আর ক' ঘণ্টার পথ! তাছাড়া অতুলদা তো হুঁশিয়ার মানুষ—সব ঠিক হয়ে যাবে বৌদি।

ঢং ঢং বাইরে ঘণ্টা বাজল। ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসল আদিত্য। গাড়ি ছাড়লে জানলা খুলবে—হাওয়াও আসবে দু-চার ঝলক।

—যাক, বাঁচালে বাবা।

বন্ধ দরজা-জানলার বাইরে শেষ আকৃতি। ওদিকে কোথায় আর একখানা কাঁচ ভাঙল। আর এক দফা গালাগালি উঠল উত্তাল হয়ে। সবাই পালাতে চায়, সবাই বাঁচতে চায়। কাউকেই দোষ দেওয়া চলে না।

বাঁশি বাজল—নড়ে উঠল গাড়ি। আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে দিলে। হঠাৎ শোনা গেল: গেল, গেল।

কে গেল—কোথায় গেল, কে জানে। হয়তো কোন গাড়ির হাতল থেকে সোজা চাকার নিচে, অথবা প্ল্যাটফরমের ওপর। তা যাক—কারো জন্যে কিছু ভাববার সময় নেই —নিজের কথা ভেবেই এখন থই পাচ্ছে না মানুষ। স্বার্থপরতা? ভালো ভালো কথা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলে অর্থটা তাই হয়েই দাঁড়াবে বই কি। কিন্তু জীবন শুধু ভালো কথাই নয়—বেঁচে থাকার নামই জীবন। সেই বাঁচাটা যে কত শক্ত, আজ তা মানুষ অস্থি-মজ্জায় টের পেয়েছে। আর সেই সঙ্গে ওরা টের পেয়েছে, ভালো কথা বলবার বা শোনবার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। অন্তত দুর্দিনের আকাশে যখন জাপানী বোমার আবির্ভাব ঘটে, তখন সেই লগ্নটা পরার্থপরতার অনুকূল অবকাশ নয়।

ট্রেন বেরিয়ে এসেছে প্ল্যাটফরম থেকে। ঝরাং ঝরাং করে দুপাশের কাঁচ আর কাঠের জানলাগুলো খুলে যেতে লাগল—বাইরে থেকে ছুটে এল শীতার্ত রাত্রির হাওয়া। কিন্তু বাতাসটাকে তেমন তীব্র বলে মনে হল না, এতক্ষণ ধরে গরমে সেদ্ধ হওয়ার পরে যেন এরই প্রয়োজন ছিল। অন্ধকারের ভেতরে একে একে ছিটকে সরে যেতে লাগল নানা রঙের অসংখ্য আলো, এঞ্জিনের সার্চলাইট, শেড্ থেকে বয়লারের রক্তিমাভা।

অনিমেষের জন্যে সমস্ত মনটা উদ্বিগ্ন আর বিষণ্ন হয়ে আছে। কী যে ঘটেছে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। যুদ্ধের সময়। পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ভয়চকিত হয়ে যেন অপমৃত্যুর প্রহর গুণছে। আমাদের যা করবার তা করতে হবে এখনি। হাতে হাত মেলাও ভাই, কাঁধে কাঁধ মেলাও। আদায় করে নাও যা তোমার পাওনা। কল-কারখানার হাতুড়িতে, ধানের ক্ষেতের কাস্তের মুখে প্রতিষ্ঠা করো তোমার দাবি-দাওয়াকে। অনেকবার অনেক ভুল করেছো—আর নয়। কিন্তু অনিমেষের কী হয়েছে কে জানে। চা-বাগানওয়ালাদের অসাধ্য কাজ সংসারে নেই কিছু।

হঠাৎ চমক ভেঙে গেল।

সামনের সীটে একটু এগিয়ে কে বসে? লোকটাকে যেন চেনা চেনা ঠেকছে না? —হাঁ, চেনা লোকই বটে, শশাঙ্ক।

—শশাঙ্ক!

শশাঙ্ক চমকে মুখ ফেরালো। আদিত্যের দিকে চোখ পড়তেই সে যেমন ম্লান, তেমনি বিমর্ষ হয়ে গেল। মুখের ওপরে একটুকরো কৌতুকের হাসি খেলা করে গেল আদিত্যের।

—কোথায় চলেছো শশাঙ্ক?

—রাজসাহী।

—রাজসাহী? রাজসাহী কেন?

শশাঙ্ক নিরুত্তর। মনে হল কী একটা কথা বলবার জন্যে নিজের ভেতরে সে অসহায়ভাবে খাবি খাচ্ছে, কিন্তু বলতে পারছে না।

—পালাচ্ছ তাহলে?

মিথ্যে বলতে পারলে সুখী হত শশাঙ্ক, কিন্তু বলতে পারল না। আদিত্যের নীল চোখ থেকে খানিকটা বিদ্যুতের মতো তীব্র একটা কিছু এসে তার গায়ে বিঁধছে। হঠাৎ শশাঙ্ক টের পেল বেঞ্চের ভেতরে বড্ড বেশি ছারপোকা, তাকে ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করেছে।

—না, ইয়ে তা নয়, তবে বাবা লিখলেন কিনা—

আদিত্যের কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ ফুটে বেরুল: পিতৃভক্তির জন্যে এত সুনাম তো তোমার ছিল না। তাছাড়া প্রতিজ্ঞা করেছিলে, কলকাতা হাওয়ায় উড়ে গেলেও এখানেই তুমি পড়ে থাকবে। তা প্রতিজ্ঞার চাইতে পিতৃআজ্ঞাটাই বোধ হয় বেশি হয়ে উঠল?

শশাঙ্ক তাকিয়ে রইল। অসহায়ভাবে—মূঢ় একটা নির্বোধ জানোয়ারের মতো। যেন আত্মসমর্পণ করে বসে আছে—যেন করুণা ভিক্ষা করছে আদিত্যের। সদর রাস্তা হলে ছুটে পালিয়ে যেত, কিন্তু এখানে ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

যে ভয় করছিল, সেই প্রশ্নটাই এল শেষ পর্যন্ত।

—শীলার কী করলে?

—কী আবার করব?—অনেকটা যেন মরীয়া হয়েই জবাব দিলে শশাঙ্ক।

—কী করবে? আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি। নিজে তো পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছ, তাকে কার কাছে রেখে এলে?

—তার—তার—মাসিমার কাছে।

—বাঃ, চমৎকার।—আদিত্য হেসে উঠল: চমৎকার। তোমার জন্যে সে বেরিয়ে এল ঘর-বাড়ি ছেড়ে, বাপ-মায়ের সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারল, আর তুমি তাকে মাসিমার

কাছে ফেলে চলে যাচ্ছ?

—কী করব?—মুখ চুন করে শশাঙ্ক বললে: বাবার কাছে নিয়ে গেলে বাবা আমাকে সুদ্ধ বাড়ি থেকে বার করে দেবেন। আপনি বাবার মেজাজ জানেন না আদিত্যদা।

এবার ঘৃণায় আদিত্যেরও আর কথা বেরুল না। কী কাপুরুষ—কী ইতর। শীলা ওর জন্যে সর্বস্ব ফেলে বেরিয়ে এসেছে—নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎকে দু-হাতে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আর সেই শীলাকে আজ আসন্ন বোমার অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে শশাঙ্ক—আকস্মিকভাবে পিতৃভক্ত হয়ে-ওঠা কাপুরুষ স্বার্থপর শশাঙ্ক। যুদ্ধের কালো বিষ আজ ওর রক্তকেও জর্জরিত করে দিয়েছে, আজ ওর চেতনার প্রান্তে প্রান্তে নেচে বেড়াচ্ছে আদি মানবতার দানবীয় প্রেতচ্ছায়া!

দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে চাপা গর্জন বেরুলো আদিত্যের। নীল চোখ যেন জ্বলে যেতে লাগল: যাক—বেশ করেছো।

—আমি, আমি বাবার সঙ্গে একটু দেখা করতে যাচ্ছি। তিন-চারদিনের মধ্যেই আবার কলকাতায় ফিরে আসব।

—হুঁ।

আর কথা বাড়াতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না আদিত্যের। শশাঙ্ক মিথ্যা কথা বলছে—অনিবার্যভাবেই মিথ্যা কথা বলছে। তার জন্যে কোনো প্রমাণ প্রয়োগেরই দরকার নেই। তার চোখ-মুখ, তার সন্ত্রস্ত ভঙ্গি সব কিছু একসঙ্গে বলে দিচ্ছে, শীলার প্রতি প্রেমের চাইতে তার আরো বড় তাগিদ আছে—সে জৈবিক তাগিদ, প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখবার তাগিদ। একটু আগেই যে কথাটা ভাবছিল আদিত্য। নিজেকে ভালোবাসে বলেই সব কিছুকে ভালোবাসে মানুষ। প্রেম, স্নেহ, বন্ধুত্ব আর এথিকসের সব তত্ত্বগুলো এরই কষ্টিপাথরে নির্ভুলভাবে যাচাই হয়ে যায়। শশাঙ্কের দোষ নেই।

শশাঙ্কও মুখ ফিরিয়েছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে—আদিত্যের নীল তীক্ষ্ণ চোখের সঙ্গে দৃষ্টি মেলাবার সাহস তার নেই। এক-আধটা নয়—সবগুলো কথাই মিথ্যে বলেছে সে। শীলাকে সে মাসিমার বাড়িতে রেখে আসেনি, কলকাতায় শীলার মাসিমা কেন, কোনো আত্মীয়ই যে নেই একথা আদিত্য না জানলেও শশাঙ্ক জানে। চোরের মতো রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছে শশাঙ্ক—একা ঘরে ঘুমের ঘোরে হয়তো এখন তাকে বিছানায় হাতড়ে ফিরছে শীলা। কাল নির্বান্ধব নিঃসহায় কলকাতায় তার কী হবে সে কথা ভাববার মতো মনের অবস্থা নয় শশাঙ্কের। একটা বোকা রোমান্টিক মেয়েকে নিয়ে দিন কয়েক প্রেম করা চলতে পারে, কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎকে তার সঙ্গে হত্যা করা চলে না, নষ্ট করা চলে না বাবার অত বড় জমিদারীটাকে। পৃথিবীতে শীলা এক-

মাত্র নয়—অসংখ্য ; আর এই অসংখ্য শীলারা আছে বলেই শশাঙ্কদের জীবনে বৈচিত্র্য আছে—রোমাঞ্চ আছে। অনেক দিন ধরেই যা তার কাছে বোঝা হয়ে উঠেছিল, আজকের এই উপলক্ষ্যটাকে অবলম্বন করে সেটাকে ঝেড়ে ফেলেছে শশাঙ্ক—মুক্তি পেয়েছে। শীতের বাতাস নাসারন্ধ্র ভরে বুকের মধ্যে টেনে নিতে লাগল সে—আঃ! বাইরের দিক-চিহ্নহীন অন্ধকার আর অবারিত আকাশের রাশি রাশি তারায় তার মুক্তি যেন প্রসারিত হয়ে গেছে। আদিত্যের নীল চোখের আগুন এখন তাকে অস্বস্তির কাঁটায় পীড়িত করে তুলছে বটে, কিন্তু এ আর কতক্ষণ!

ওদিকে নিবে যাওয়া চুরুটটাকে আবার ধরিয়েছে আদিত্য। হঠাৎ মনের সামনে ভেসে উঠেছে স্টেশনে আসবার পথে ভুল করে ঢুকে পড়া হাড়-কাটা গলির কথা। আধা-অন্ধকার—অথবা সম্পূর্ণ অন্ধকারে দেহ-পসারিণীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কেন যেন মনে হল, ওদের দলে একদিন শীলাকে দেখতে পেলেও সে আশ্চর্য হবে না।

আর ল্যাম্প-পোস্ট ধরে টলছে মাতাল হেমন্তবাবু।

—পালান, পালান আপনারা। আপনাদের দামী জীবন, বাঁচাতে হবে। কিন্তু আমরা এখানকার আবর্জনা, এই আস্তাকুঁড়ে মরবার জন্যেই জন্মেছি। যদি বোমায় উড়ি তো পাঁচীকে আঁকড়ে নিয়েই উড়ব। সুখের পায়রা আপনারা—মানে মানে সরে পড়ুন।

মানে মানে সরেই তো যাচ্ছে সব। সুখের জন্যে যাদের বলি দেওয়া হয়েছে, যাদের নিঃশেষে নিষ্পেষিত করা হয়েছে, তারাই পড়ে থাকবে, তারাই শ্মশানে জাগিয়ে রাখবে কঙ্কালের বাসর। আজ তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে—আজ আর তাদের কেউ চায় না। যারা স্বর্গের অধিবাসী—স্বর্গে তারাই যাবে, তাদের পবিত্র এঁটো পাতা ধুলোয় পড়ে থাকবে—হাওয়ায় উড়বে।

কিন্তু শীলা! অমন ফুলের মতো মেয়েটা! জীবনে এমন ভুল কেন করল—কেন শশাঙ্কের মতো এমন একটা অপদার্থকে নিজের সর্বস্ব দিয়ে বসল! এ যে কতখানি অপাত্রে দান হচ্ছে, শীলার মতো এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে তা কি এক মুহূর্তের জন্যেও বুঝতে পারেনি! আজ শশাঙ্ক পালিয়ে যাচ্ছে—প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। পুরুষমানুষের জীবনে ভুল দু'চার-বার হয়েই থাকে—সেজন্য কেউ ওকে অপরাধী করবে না—নিজের হারানো অধিকারে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে শশাঙ্ক। কিন্তু শীলা? শীলার কী হবে?

গাড়ির ভেতরে কোলাহল চলেছে, তর্ক চলেছে, কান্নাকাটি চলেছে, কদর্য গালাগালি চলেছে, গান আর ধর্মগ্রন্থ পাঠ চলেছে। কিন্তু সব কিছুর পেছনে একটি সুর—সীমাহীন ভয়, আকুল অসহায়তা আর অন্ধ জৈবিক তৎপরতা। এ কিসের রূপ? মনে হল: যেন ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ একটা মূর্তি খণ্ডাংশ হয়ে এই কামরাটার ভেতরে এসে দেখা দিয়েছে। শতাব্দী-সঞ্চিত গ্লানি আর অপমানের বিকারে বিভ্রান্ত ভারতবর্ষ অলক্ষ্য নিয়তির শাসনে

ছুটে চলেছে—কোথায়—কোন্ দিকে—জানে না।

আজ যুদ্ধ। পৃথিবীব্যাপী স্বাধীনতার সংগ্রাম—দেশে দেশে মানুষের হাতে আত্ম-প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। এদের হাতে সেই অস্ত্র থাকলে জন-যাত্রার ধার কি বদলে যেত না? পলায়ন কি সেদিন হয়ে উঠত না অগ্রগামী সংশপ্তকের মুক্তি অভিযান?

জানলার বাইরে থরে থরে অন্ধকার। কল্যাণতম রূপের পাত্র অপাবৃত করে কবে সেখানে দেখা দেবে সবিতা—জ্যোতির্ময় হিরণ্য-পাণির সূর্য-সারথি কোন্ তমসা-তীর্থে সেই শুভযোগের প্রতীক্ষা করে আছে?

পাঁচ

দেখতে দেখতে সুমিতার চারতলা বাড়িটা প্রায় ভরে উঠল।

যেখানে যেসব ছেলেরা ছড়িয়ে ছিল, তারা তো এলই, মেয়েরাও বাদ গেল না। আর এতগুলি ছেলেমেয়ের কর্তৃত্ব করবার ভার সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ল সুমিতার ওপরেই। কিন্তু কর্তৃত্ব করা কি সহজ? দিনের বেলা অবশ্য খুব বেশি অসুবিধা হয় না। আটটা-নটা বাজতে না বাজতে ছেলেরা বেরিয়ে পড়ে নিজেদের এলাকায়। কেউ কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে নেয়, কেউ বা রেশনের থলে। বইতে আর কাগজপত্রে সেগুলোকে একেবারে ঠাসাঠাসি করে তারা নেমে পড়ে রাস্তায়।

তারপর বাড়িটা নিঝুম হয়ে থাকে সারাদিন। প্রায় নির্জন কলকাতার বুকের ওপর নামে আরো নির্জন দ্বিপ্রহর। শীতের চাঁপাফুলী রৌদ্রেও সামনের পীচ জ্বলতে থাকে—কোলাপ্‌সিবল গেটে বড় বড় ভারী তালা আঁটা বাড়িগুলোকে যেন ভুতুড়ে বলে মনে হয়। সুমিতার বাড়িতেও কোনো সাড়াশব্দ থাকে না। মেয়েরা নিজেদের ঘরে পড়াশুনো করে, রিপোর্ট তৈরি করে, পোস্টার লেখে। শুধু বাতাসে কোনো খোলা জানলা থেকে কট কট করে শব্দ ওঠে, কোথাও বা গঙ্গাজলের কল থেকে ছরছর করে অবিশ্রান্ত জল পড়ে।

ঠিক এই সময়টাতে সুমিতার কিছু ভালো লাগে না। নিজের মনটাকে ভারী অপ্রস্তুত, ভারী নিরবলম্ব, ভারী অসহায় বলে বোধ হয়। এত কাজ আছে, এত দায়িত্ব আছে। সমস্ত জীবনটাকে ছবির মতো সামনেই তো দেখতে পাওয়া যায়। দুস্তর কঠিন পথ। বিঘ্ন, বাধা, সন্দেহ, অবিশ্বাস। মাঝে মাঝে নিজের শক্তির ওপরেও সংশয় আসে। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই, অপেক্ষা করবার উপায় নেই। দিগদিগন্তে প্রচণ্ড ধ্বনি-তরঙ্গ জাগিয়ে চলেছে জগন্নাথের রথ। আর সেই রথের দড়ি ধরে টানছে গণ-জনতা। তার সামনে থেমে দাঁড়ানো তো চলবে না। হয় রথের দড়ি টানো নতুবা জন-জগন্নাথের জয়রথের চক্রতলে চূর্ণ নিষ্পিষ্ট হয়ে যাও। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, গত্যন্তর নেই কিছু।

আসন্ন যুদ্ধের আতঙ্কে বিহ্বল ব্যাকুল কলকাতা। সব বিশৃঙ্খল, সব অসংলগ্ন। কিন্তু আকাশে বাতাসে যেন কিসের একটা সুতীক্ষ্ণ সংকেতময়তা, একটা অনিবার্যতার ইঙ্গিত। নিজের রক্তের মধ্যে সুমিতা শুনতে পায় রথচক্রের গর্জন। আসছে—আসছে—তার আর দেরি নেই। আকাশে ঝড়ের মেঘ উড়েছে, সেই মেঘের বুকে বিদ্যুতের রক্ত-শিখায় লক্-লক্ করে যাচ্ছে তার রক্তপতাকা। দুপুরের বাতাসে বিচিত্র শব্দ বাজে—মনে হয় কোথাও দৃষ্টির অগোচরে—কোনো একটা নেপথ্যলোকে কারা যেন লক্ষ লক্ষ তরোয়ালে শান দিয়ে চলেছে, তাদের দিন আসছে, তাদের প্রবল প্রচণ্ড মুহূর্ত আসছে ঘনিয়ে। এই যুদ্ধ শুধু এশিয়া-ইউরোপে খানিকটা বিচ্ছিন্ন রক্তপাতের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে না। বদলে দেবে লক্ষ কোটি মানুষের চিরাচরিত অপমানের ইতিহাস, নতুন করে গড়ে তুলবে আর এক পৃথিবী। সার্থক এবং পরিপূর্ণ, বিপুল এবং বিরাট।

কিন্তু তবুও নির্জন দুপুর। ঘরে বাইরে একটা আশ্চর্য শূন্যতা। সেই শূন্যতা যেন চেতনার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। অনিমেষ আর আদিত্য, আদিত্য আর অনিমেষ মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়। বহুদূরে কোথায় সমুদ্রের নীল-তরঙ্গ প্রতিহত হচ্ছে গ্র্যানাইটের শৈলসিকতায়। বাতাসে নারিকেলবীথির মর্মর। ঈজিয়ানের সমুদ্র। পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। ইংরেজ কবির এলোমেলো কবিতার লাইন। অনিমেষ কোথায়, অনিমেষ কত দূরে? এইসব কবিতাগুলো কখনও কি তার মনে পড়ে না? সমুদ্রের জল হীরার মতো ঝলমল করছে। কিরণবর্ণা অ্যাট্‌লাণ্টা কি চিরদিনের জন্যেই তার আড়ালে তলিয়ে গেল, আর কোনোদিন উঠে আসবে না? সৈনিকের জীবনে কি একটি মুহূর্তও নেই, নেই এতটুকুও অবকাশ?

দুপুর গড়িয়ে যায়, বিকেল আসে। চব্বিশটা ঘরের ওপর দিনান্তের মলিন ছায়া ঘনাতে থাকে। তারপর চব্বিশটা ঘরে একটার পর একটা আলো জ্বলে ওঠে। ছেলেরা ফিরে আসে।

আর নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে থাকবার সুযোগটুকুও ফুরিয়ে যায় সুমিতার।

বড় একটা কেট্‌লিতে চায়ের জল ফোটে। ছেলেমেয়েরা গোল হয়ে ঘিরে বসে তার চারপাশে। কাচের গ্লাস, মাটির ভাঁড়, হাতলভাঙা পেয়ালা, যে যা পারে যোগাড় করে নিয়ে বসে। তর্ক চলে, আলোচনা চলে।

—লেবারকে মবিলাইজ করতে গেলে আগে ওদের লিটারেচার ভালো করে পড়ানো দরকার। অন্তত একটা ক্ল্যারিটি অব ভিসন—

—আমার কিন্তু মনে হয় থাটি থিয়োরি ওদের মনে সাড়া দেবে না। ওরা কাজ বোঝে, কথা বোঝে না।

—আহা সে তো বটেই, সেটা কে অস্বীকার করছে। আমরা তো ওদের বক্তৃতা

দিয়েই উদ্ধার করে দিচ্ছি না। বক্তৃতায় কাজ হলে তো স্বরেন বাঁড়ুয্যের আমলেই দেশ স্বাধীন হয়ে যেত। আসল কথা—ওদের বোঝানো দরকার কিসের জন্যে ওরা লড়ছে, কেমন করে ওরা লড়বে।

—বেশ তো, সেটাই বোঝাও।

—বোঝাচ্ছি তো নিশ্চয়ই। সেই সঙ্গে ভেস্টেড্ ইনটারেস্টের শিকড়টা কোন্ অবধি গিয়ে যে পৌঁছেছে, সেটাও ভালো করে পরিষ্কার করে দেবার দরকার আছে তো। তাই বলছিলাম লিটারেচারটা কিছু কিছু পড়ানো ভালো।

—কিন্তু সেটা সকলের জন্যে নয়। ওতে অনর্থক সময় নষ্ট, উৎসাহেরও অকারণ অপব্যয়। এটা তো মানো কোনো কাজে সবাই-ই লীড্ নিতে পারে না, মাত্র দু'এক-জনকেই সে দায়িত্ব নিতে হয়?

—মানি।

—আর এও নিশ্চয় জানো, পিপ্‌লের সামনে যে বাস্তব সমস্যাগুলো আসে, তাকেই তারা একমাত্র স্বীকার করে? ফাঁকা আদর্শের মূল্য কী, বলো? আমাদের ন্যাশন্যাল স্ট্রাগ্‌ল থেকে এর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। স্বাধীনতা আন্দোলন আমরা বারে বারেই তো করেছি। দেশের সবাইকে ডাক দিয়েছি, মধ্যবিত্তকে, শ্রমিককে, কৃষককে। কিন্তু ফল কী হয়েছে শেষ পর্যন্ত? আমরা বন্দেমাতরম্ বলে আহ্বান জানিয়েছি, তারাও ছুটে এসেছে। জেলে গেছে, নির্যাতন সয়েছে, পিটুনী ট্যাক্সের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছে। তার পরের ইতিহাস দেখো। আমরা যারা উকিল, তারা আবার আদালতে ফিরে এসে 'ইয়োর অনার' বলে সওয়াল করেছি, যারা ছাত্র তারা আবার ইস্কুল, কলেজে ফিরে গিয়ে অধ্যয়নের তপস্যায় মন দিয়েছি, যারা জমিদার তারা 'এ' ক্লাস প্রিজনার হয়ে সসম্মানে জেল খেটে আবার এসে যথানিয়মে জমিদারী করেছি। কিন্তু একবার ভাবো কৃষকের কথা। কী লাভ হয়েছে তার, এ থেকে সে কী পেল?

অপর পক্ষ এতক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছে: তা হলে তুমি কী করতে বলো?

—যা করতে বলি, তা এই। ওদের রাতারাতি বিদ্বান করতে চেয়ো না। মোটা প্রয়োজনগুলো মোটা কথায় ওদের বুঝিয়ে দাও, যদি কাজ হয় তো তাতেই সব চাইতে বেশি হবে।

—তুমি কি মনে করো দশ বছর আগে আমাদের যে পলিটিক্যাল লাইন অব্ একটি-ভিটিজ ছিল, আজও তাই আছে? আজকের লিটারেচার শুধু কতগুলো কথার সমষ্টি নয়, তা প্র্যাক্‌টিক্যাল।

তর্ক চলে, মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, সবাই উত্তপ্ত বোধ করে, উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে চলে চা। দুধ-চিনির মাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে আর উদ্দীপনাও বেড়ে উঠতে

থাকে সমান তালে।

গল্প করে, হাসি-ঠাট্টা করে। একপাশে দু-তিনজনে মিলে ঘরোয়া আলোচনা চালায় চাপা গলাতে। কেউ নিজের ঘরে বসে চুপচাপ করে পড়ে, কেউবা লেখে। তারপরও আলোচনায় যখন ছেদ পড়ে, সবাই যখন ক্লান্ত হয়ে ওঠে, তখন সুমিতা মধ্যস্থতা করে। বলে, আর তর্ক নয়—ওসব কচকচি এখন থাক। এখন কাব্যপাঠ হোক।

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র অল্পবয়সী একটি ফর্সা ছেলের চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। নিঃশব্দে সে সরে পড়বার চেষ্টা করে।

কিন্তু মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। রমলা বলে, সুমিতাদি, ইন্দু কিন্তু পালালো।

সুমিতা হাসে, না, না, কবি পালালে চলবে না। এবারে তোমার পালা, রাজনীতির এই মরুভূমিতে তুমি কবিতার মরূদ্যান দু'চারটে জাগিয়ে তোলো দেখি। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

ইন্দু যেন লজ্জায় আরো ছোট হয়ে যায়। একটু আগেই এই ছেলেটি যে রাজনীতি আলোচনা করতে গিয়ে হাতাহাতির উপক্রম করেছিল, একথা এখন কিছুতেই যেন মনে করা চলে না।

ইন্দু বলে, না, সুমিতাদি।

—না কেন? সভার সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ। কই, পকেট থেকে বার করো খাতা। একটা গরম গরম কিছু শুনিয়ে দাও দেখি।

ইন্দু প্রাণপণে কী বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু চারদিকের প্রবল কোলাহলে তার গলার স্বর অসহায়ভাবে হারিয়ে যায়। কবিতা শোনবার জন্যে সকলের মন যে একেবারে হাহাকার করে উঠেছে তা নয়। দুর্দান্ত তার্কিক এবং পরম সপ্রতিভ ইন্দুর এই বিপন্ন অবস্থাটা সকলের কাছে ভারী উপভোগ্য বলে বোধ হয়। বিশেষ করে তর্কে যারা হেরে গেছে, তাদের গলাই আরো বেশি জোরালো হয়ে ওঠে।

জলে ডোবা মানুষের মতো ইন্দু অবশেষে পকেট থেকে একটুকরো কাগজ টেনে বার করে। একবার শেষ চেষ্টা করে বলে, এ কবিতাটা ভালো হয়নি।

উল্লসিত চিৎকার ওঠে: না, না, চমৎকার হয়েছে। পড়ো কবি, শোনাও আমাদের।

আর উপায় নেই। ইন্দু শেষবারের মতো তাকায় সকলের মুখের দিকে—কিন্তু কোথাও এতটুকু সহানুভূতি নেই কারো। এমন কি সুমিতারও না। অতএব নিরুপায় হয়ে কবিতা পড়তে শুরু করে।

প্রথমে ভীরু, তারপর ক্রমশ গলার স্বর স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে, উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। ইন্দু কবিতা পড়তে শুরু করে:

হংস-মিথুন, নীড়ের ঠিকানা কই
অসীম সাগর দুলিছে পাখার নিচে
ছুটেছ কোথায় কোন্ মরীচিকা পিছে
পথের সঙ্গী আমরা তো কেহ নই—

একজন মন্তব্য করে : এখনো হংসমিথুনের কবিতা !

সুমিতা বলে, চুপ। বে-রসিকের মতো আগে থাকতেই টিপ্পনী কাটতে যেয়ো না।

হংস-মিথুন, দেখো দিগন্ত-তলে
মেঘের মতন কামানের ধোঁয়া জমে।
আলোর আভাস দেখে কি পড়েছো ভ্রমে ?
আগুনে বোমায় মারণ-যজ্ঞ চলে।

এইবারে সকলে চুপ করে যায়। হংস-মিথুন নীড় হারিয়েছে। কবিতার ছন্দে ছন্দে উচ্ছ্বসিত ভাষায় ইন্দু বলে চলে, বিলের বুকে বুনো কলমী ফুলের আড়ালে আড়ালে তোমাদের যে মিলন-বাসর, আজ সেখানে বিপ্লব দেখা দিয়েছে, বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। আজ বন্দুক হাতে এসেছে শিকারী, তাদের সাথে সাথে এসেছে লোল-জিহ্বা ঝুলে পড়া হিংস্র শিকারী কুকুরের দল। আজ আর নিস্তার নেই, রক্ষা নেই কারো। তোমাদের স্বপ্নাতুর বাসক-রজনী অপমৃত্যুর প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হয়ে গেল :

হংস-মিথুন, এখন সেদিন নয়,
হাঁকিছে শিকারী, ডাকিছে যুগের শিখা,
কোনো আলো নেই, নেই কোনো সান্ত্বনা,
বধির স্বর্গে ভাষাহীন প্রার্থনা,
দেবতার বেদী বলির রক্তে লিখা
লোভী পুরোহিত জাগিছে বিশ্বময়—

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ইন্দু থেমে যায়। কবিতা থামে, তার রেশ হারায় না। সকলে চুপ করে বসে থাকে। এত বস্তুবাদী এরা, এত বুদ্ধিবাদী, তবু কারো সমালোচনা করতে ইচ্ছে করে না। কবিতা ভালো কি মন্দ সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু তার দোলাটা বাজছে রক্তের মধ্যে, তার ছন্দটা যেন মর্মরিত হয়ে উঠেছে শিরায় শিরায়।

খানিক পরে একটি দুটি করে কথা বেরুতে থাকে।

—বাঃ, বেশ হয়েছে।

—মন্দ হয়নি তো কবিতাটা।

—নাঃ, কবির হাত আছে সেটা মানতেই হবে। আগামী দিনের স্বাধীন ভারতবর্ষে ইন্দুই নব-জীবনের গান গাইবে।

বুদ্ধিবাদীদের বুদ্ধিও সজাগ হয়ে ওঠে আস্তে আস্তে।

—তবে প্রকাশ-ভঙ্গিটা এখনো গতানুগতিক।

—আরো স্ট্রেট্, মানে আরো তীক্ষ্ণ হওয়া দরকার। ইন্দুর বুদ্ধি যতটা ধারালো হয়ে উঠেছে, মন ততটা নয়। ওর ভেতরে একটা ডুয়্যালিটি আছে। বাইরে ও ভয়ঙ্কর যুক্তি-পন্থী, কিন্তু মনে রোমান্স একেবারে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে।

—তবু চেষ্টাটা ভালো।

—নিশ্চয়। তবে আরো সজাগ মন চাই। এখনো হংস-মিথুনের জন্য বিলাপ করছে। কিন্তু পুরানো নীড়ের ঠিকানা যদি নাই থাকে, তা হলেই বা এত কাতর হবার কী আছে! নতুন নীড় খুঁজে নিতে হবে, নতুন করে বাঁচতে হবে।

—হংস-মিথুন পরাজয়ের মধ্যেই তলিয়ে যাবে কেন? তারও দিগন্ত আছে—আরো বিস্তীর্ণ পৃথিবী আছে। কবি, সেই বৃহত্তর পৃথিবীরই জয়গান করো।

—ঠিক কথা। 'কবি তবে উঠে এসো যদি থাকে প্রাণ—'

ইন্দু উত্তর দেয় না। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে নিজের ঘরে উঠে চলে যায়। কোন সমালোচনায় সে কখনো জবাব দেয় না, যে যা বলে, নীরবেই শুনে যায় চিরকাল।

বাইরে রাত বাড়ে। সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউতে ট্রাফিকের স্রোতে মন্দা পড়তে থাকে। রান্নাঘরের তত্ত্বাবধানে যারা ছিল, তারা এসে খবর দেয়, খাবার তৈরি হয়ে গেছে, এবার বৈঠক ভাঙতে পারে।

খাওয়ার ঘরেও তর্ক আর আলোচনা চলে পুরোদমে। মাঝে মাঝে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথাও ওঠে।

—উঃ, মানিকতলার বস্তিতে কী দিনগুলোই গেছে ভাই।

—আর ইঁদুরগুলো? এক-একটা যেন বাচ্চা শূয়োরের মতো দেখতে। সারারাত ঘরে কী গণ্ডগোল যে করত! সুরেশদার পায়ে কামড়ে দিলে সেবার, একটু হলে চাই কি একটা আঙুলই কেটে নিয়ে যেত।

—নাঃ, এখানে রাজার হালেই আছি বলে মনে হচ্ছে। একেবারে রাইট্ রয়্যাল! স্বাধীন ভারতে আমরা সুমিতাদিকে জন-খাদ্য-বিভাগের প্রেসিডেণ্ট করে দেব।

সুমিতা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, থাক, অত অনুগ্রহে দরকার নেই।

—অনুগ্রহ মানে? ভোটের জোরে করে দেব—দেখবেন।

—সত্যি বড্ড খাওয়া হচ্ছে। এ রকম খাওয়াদাওয়া হলে ক'দিন বাদে আয়েসী হয়ে পড়ব, বাড়ি ছেড়ে আর নড়তে পারব না।

সুমিতা বলে, যাও না তোমরা সব বাড়ি ফিরে। ঘরের ছেলে ঘরে যাও, আমার হাড় আর জ্বালিয়ো না।

খেতে খেতেই একজন গান জুড়ে দেয় :

"যাবো না আজ ঘরে রে ভাই,
যাবো না আর ঘরে—"

সকলে মুহূর্তে তাকে থামিয়ে দেয়।—থাম্, থাম্ বাপু, তোকে আর তেওট তালে হালুষ রাগিণী ভাঁজতে হবে না। বিষম লাগিয়ে এমন খাওয়াটা একেবারে মাটি করে দিবি দেখছি।

এমন খাওয়া! তাই বটে। সুমিতার মনটা হঠাৎ ছলছল করে ওঠে। কত অল্পে এরা খুশি, কত সামান্য আয়োজনে এরা পরিতৃপ্ত! অথচ এরা সবাই যে গরীবের ঘরের ছেলে তা নয়। ভালো খাওয়া-দাওয়া কাকে বলে তা এদের অজানা নেই। কিন্তু যে পথে আজ এরা নেমে এসেছে, তার দাবিতেই মুছে ফেলেছে, দূরে সরিয়ে দিয়েছে এতদিনের অভ্যাস, এতদিনের সংস্কার।

কী খেতে পায় এখানে? একটুকরো মাছ, একটুখানি ডাল, আর কোনোদিন বা একটু তরকারী। তাতেই খুশির সীমা নেই, যেন রাজভোগ খাচ্ছে। ওরা মুখে যা কিছু তর্ক করুক, যা কিছু বলুক—জীবনের লক্ষ্য ওদের বাঁধা। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। কঠিন পৃথিবী ডাকছে, ডাকছে কঠিনতম কর্তব্য। নতুন মানুষ, নতুন জগৎ। সেই নতুন মানুষদের না আনা পর্যন্ত—সেই নতুন জগৎকে সৃষ্টি করে না তোলা পর্যন্ত বিশ্রাম নেই—দাঁড়াবার উপায় পর্যন্ত নেই।

দুশো বছরের পরাধীনতার অভিশাপ। দুশো বছরের কালো অন্ধকার জাতির আর দেশের বুকের ওপরে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। সেই পাথরকে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে। উদয়-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করতে হবে সেই লগ্নের জন্যে—যেদিন দিক-চক্রে তিমিরহারী সূর্যের বাণী বয়ে দেখা দেবেন সূর্য-সারথি।

তারই প্রতীক্ষা, তারই সাধনা বস্তির বিষাক্ত অবরোধে, কারখানার ধোঁয়া আর আগুনে, খর রৌদ্রে 'দিগবিস্তীর্ণ মাঠে মাঠে। তিলে তিলে নিজেদের জীবনকে ক্ষয় করে ওরা মহাজীবনের যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিচ্ছে।

কতদিন খাওয়া জোটে না, শোবার জন্যে এতটুকু জায়গা পর্যন্ত জোটে না। দু'এক-জনের সাস্‌পেক্টেড টি. বি., কেউবা ম্যালনিউট্রিশনে ভুগছে। সাধারণের চোখে ওরা শহীদের সম্মান পাবে না, ফুলের মালাও নয়। ওরা বক্তৃতা দেয় না, সভা-সমিতি করেও বেড়ায় না। তাই ওদের নাম নেই কোনোখানে, তাই কেউ ওদের চেনে না। যেদিন মরবে, সেদিনও unwept, unlamented, unsung, মহা জীবনের যজ্ঞাগ্নিতে প্রাণের হবি-বিন্দু মুহূর্তে ছাই হয়ে মিশিয়ে যাবে!

—বাঃ, কী চমৎকার ডালটা! কতদিন পরে এমন ডাল জুটল বল দেখি?

—যাই বলো, জগদ্দলের সেই হরবন্শীর মা খাসা অড়োরের ডাল রান্না করে। মোটা রুটির সঙ্গে সেই ডাল একদিন খেলে তিনদিন পেট ভরে থাকে ভাই।

অকারণেই সুমিতার চোখে জল আসে।

রাত বারোটা বেজে গেল।

যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। সারাদিন খেটে এসেছে,—এখন ঘুমোচ্ছে একেবারে কুম্ভকর্ণের মতো। শুধু দু'চারজন এখনো আলো জেলে পড়াশুনো করছে। আর ঘুম নেই সুমিতার চোখে।

ইন্দুর কবিতার লাইনগুলো মনের কাছে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ কবিতা কার? শুধু কি ইন্দুর, না সুমিতারও?

হংস-মিথুন, এখন সেদিন নয়;
বিলের বুকেতে বুনো কল্মির ফুল।
বিভোর স্বপ্নে প্রহর হয়েছে ভুল—
কালের আঘাতে সে মোহের হলো লয়।—

হংসমিথুনের মতো নীড় ভাঙলো কাদের? অনিমেষের আর সুমিতার? দেশের আরও বহু মুগ্ধ বিহ্বল প্রেমিক-প্রেমিকার? স্বপ্ন দেখছিল তারা, একটা মধুর আবেশের মধ্যে পড়েছিল মূর্ছিত হয়ে। কিন্তু এল আঘাত—এল নিষ্ঠুর কাল। কোথা থেকে নির্মম বাণ এসে বিঁধল অ্যাডোনিসের বুকে—ঈজিয়ানের হীরা মাখানো জল রক্তে লাল হয়ে গেল।

নীচে নিঃশব্দ রাত্রি—ওপরে তারাখচিত আকাশ। অস্বচ্ছ আলোয় পিঙ্গল অন্ধকার রাস্তার বড় বড় বাড়িগুলোর ওপরে যেন প্রেতচ্ছায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। একচক্ষু মোটরগুলোর স্রোতে ভাঁটা পড়ে গেছে একবারে। এক-আধখানা মোটর যা চলছে, তাদের শব্দ যেন বড় বেশি জোর—যেন সে শব্দে দুপাশের বাড়িগুলো অবধি কেঁপে উঠছে। মাঝে মাঝে দু-একজন পথচারী চলেছে, তাদের জুতোর শব্দ যেন পাঁচগুণ হয়ে বহুদূর থেকে ভেসে এসে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু কোথায় এত রাত্রেও কারা গ্রামোফোন বাজাচ্ছে—হাল্কা একটা হিন্দী গান, সুরটা খ্যামটার মতো। প্রতিমুহূর্তে যারা আসন্ন দুর্বিপাকের প্রহর গুণছে, তারা যেন ওই গানের ভেতর দিয়ে নশ্বর জীবনের শেষ আনন্দটুকু উপভোগ করে নিতে চায়।

—সুমিতাদি?

সুমিতা চমকে উঠল: কে?

মিষ্টি হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল: ভয় পেলে নাকি? আমি রমলা।

—ওঃ। কিন্তু এত রাত্রে হঠাৎ উঠে এলি যে?

—এমনি, ঘুম আসছিলো না। আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখছিলাম তুমি কখন থেকে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছো। তাই এলাম।

—বেশ, আয়।

রমলা এসে পাশে দাঁড়ালো। ওপাশের একটা ঘর থেকে যে আলো এসে পড়েছিল, তাতে করে রমলাকে সুমিতা দেখে নিলে একবার। শ্যামবর্ণা একটি ক্ষীণকায়া মেয়ে, দেখলে কেউ সুন্দরী বলতে রাজী হবে না। কিন্তু রূপ না থাকলেও লাবণ্য আছে। চোখ মুগ্ধ হয়ে ওঠে। ছোট বোনের মতো ভালোবাসাতে ইচ্ছে করে, আদর করতে ইচ্ছে করে।

সুমিতা আস্তে রমলার পিঠে হাত রাখল। রমলা আরো ঘন হয়ে তার কাছে এগিয়ে এল, যেন আশ্রয় খুঁজছে।

—কী হল রমলা? কিছু বলবি?

রমলা কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখের দৃষ্টি ডুবিয়ে দিলে বাইরের তরঙ্গিত রাত্রির ভেতরে। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, আদিত্যদার কোনো খবর কি আসেনি সুমিতাদি?

—না তো।

—আর অনিমেষদার?

বুকের ভেতরে একটা নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে সুমিতা বললে, নাঃ।

—ওখানে কী সব গণ্ডগোল হয়েছে, তুমি জানো?

সুমিতা মনের ভেতরে ক্লান্তি বোধ করতে লাগল। এ আলোচনা তার ভালো লাগছে না, এ প্রসঙ্গটাকে সে এড়াতে চায়। শ্রান্ত গলায় জবাব দিলে, নাঃ, কিছুই না।

রমলা চুপ করে রইলো। এ কৌতূহলগুলো স্বাভাবিক হলেও এগুলো তার বলবার কথা নয়। রাত বারোটার পরে যে প্রসঙ্গ ও যে চিন্তা তার স্নায়ুকে এমন ভাবে সজাগ করে রেখেছে, তারা সম্পূর্ণ আলাদা। আদিত্য আর অনিমেষের কথাটা তারই ভূমিকা মাত্র।

রাস্তার ওপরে জোরালো টর্চের আলো পড়ল। মচ্ মচ্ করে জুতোর শব্দ। দু'জন সার্জেণ্ট রাউণ্ডে বেরিয়েছে। শান্তিরক্ষা করছে যুদ্ধ-বিঘ্নিত নিশীথ নগরীর। গ্রামোফোনে হিন্দী থ্যামটার গানটা বারে বারে বাজছে, ঘুরে ঘুরে বাজছে। বোধ হয় মদের বোতল খুলে নিয়ে বসেছে একদল।

রমলা আস্তে আস্তে, অত্যন্ত কোমল গলায় বললে, আজকে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে সুমিতাদি।

—কী ব্যাপার?

রমলার স্বর আরো মৃদু হয়ে এল: আজকে দেখা হয়েছিল।

—তাই নাকি? বাসুদেবের সঙ্গে?

রমলা চুপ করে রইল।

—কী বললে?

—যা বলে আসছে চিরকাল।

—অর্থাৎ ফিরে এসো? তোমার জন্যে পথ চেয়ে আছি? জীবনে শুধু রাজনীতি নয়, তার অন্য দিকও আছে, এই তো?

—শুধু এই? আরো অনেক কথা। তার মাথামুণ্ডু কিছুই নেই। এত করেও আমি ওকে বোঝাতে পারলাম না সুমিতাদি। ঢের লেখাপড়া শিখেছে, তবু এই সহজ জিনিসটা কেন যে বুঝতে পারে না—আশ্চর্য!

সুমিতা সস্নেহে হাসল: সবাই কি সব জিনিস বুঝতে পারে বোকা? পৃথিবীতে একদল নির্বোধ থাকবেই—হাজার চেষ্টা করলেও তোরা কখনো তাদের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াতে পারবি না।

রমলা যেন আহত হল একটুখানি: তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ না তো?

সুমিতা রমলার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল: ঠাট্টা করব কেন রে? যা সত্যি, তাই বলছি। বাসুদেব চৌধুরী কখনো আদিত্য রায় হতে পারবে না, ওরা আলাদা ধাতের মানুষ।

রমলা বললে, আমি বড় বিপদে পড়ে গেছি সুমিতাদি। যেখানে যাই কেমন করে খোঁজ নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয়। আর এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যে কী বলব।

—এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যে ভয়ানক রাগ হয়, তাই না?

রমলা মাথা নীচু করে জবাব দিলে, হুঁ। কিন্তু তার আকার ইঙ্গিতে এটা অন্তত স্পষ্ট হয়ে উঠল যে বাসুদেব নিতান্ত অশোভন ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেও যে অনুভূতিটা তার মনে জাগে, সেটা আর যাই হোক, রাগ যে নয়, এটা নিশ্চিত।

—তা হলে এখন কী করবি?

—কী করব তাই তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম। আজকে একটা ভারী বিশ্রী কথা বলেছে, সেই থেকে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে।

—কী বিশ্রী কথা বলেছে? সুমিতার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ আর কৌতূহলী হয়ে রমলার লজ্জিত মুখের ওপরে পড়ল।

—বলেছে—রমলার গলাটা একবার কেঁপে উঠল: বলেছে, আমি যদি কথা না শুনি, তা হলে আত্মহত্যা করবে এবারে।

—আত্মহত্যা!

রমলার স্বরে যেন প্রচ্ছন্ন কান্নার আভাস পাওয়া গেল : হুঁ।

—পাগল নাকি রে? একটা বুদ্ধিমান মানুষ আত্মহত্যা করবে কী রকম? ও তোকে ভয় দেখিয়েছে।

রমলা প্রতিবাদ করলে : না সুমিতাদি, ভয় দেখানো নয়। যে রকম মানুষ, সব করতে পারে। সব সময় খেয়ালের ওপরে থাকে, কখন যে কী করে বসবে—

হঠাৎ কেমন একটা বিদ্বেষে সুমিতার মনটা পূর্ণ হয়ে উঠল। রমলা দুঃখ করছে, বাসুদেব যে তাকে জ্বালাতন করে বেড়ায় সেজন্যে ক্ষোভ করছে, আত্মহত্যা করবার ভয় দেখিয়েছে বলে তার অস্বস্তির সীমা নেই। কিন্তু সব কিছুর ভেতর দিয়ে একটা সুর স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুচ্ছে, সেটা সুখের, সেটা গর্বের। সাধারণ একটি কালো মেয়ে, তবু একজন তাকে এত বেশি ভালোবাসে যে তার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে চায়, এটা তার কাছে যেমন গৌরব, তেমনি আনন্দের সামগ্রী হয়ে উঠেছে!

ক্ষণিকের জন্যে সুমিতার মনটা যেন কালো হয়ে গেল। বাসুদেব রমলাকে চায়, প্রাণ দিয়ে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। অথচ রূপ নেই রমলার, এমন কিছু বিশেষত্বও নেই। আর সে? তার তো সব ছিল, তবু অনিমেষ তাকে স্বীকার করে নিলো না, বৃহত্তরের আহ্বানে অনায়াসে পেছনে ফেলে চলে গেল। বাসুদেবের মতো গদ্যময় ইতিহাসের অধ্যাপক যেখানে বিহ্বল ব্যাকুল হয়ে নিজের হাতে নিজের জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দিতে চায়, সেখানে কবি রোম্যাণ্টিক অনিমেষ এমন ভাবে নিজেকে বজ্রকঠিন করে তুলল কী উপায়ে? এমন একটা বজ্রমণির ছোঁয়াই কি সে পেয়েছিল?

সুমিতা হঠাৎ রূঢ়ভাবে বলে ফেলল, তোরও দোষ আছে। প্রশ্রয় দিস বলেই ওসব নাকে কাঁদবার সুযোগ পায়! পুরুষকে এখনো চিনিসনি কিনা। মিষ্টি কথা ভালো করে সাজিয়ে বলতে ওরা ওস্তাদ, কথার প্যাঁচে লোককে ভুলিয়ে দেওয়াতেই ওদের বাহাদুরি।

সুমিতার স্বরের রূঢ়তায় রমলা চমকে গেল। ঠিক এমনটা সে আশা করেনি, সুমিতাদির পক্ষে এটা কেমন অশোভন আর অস্বাভাবিক বলে তার ঠেকেছে। সে কথা বলতে পারল না, শুধু মূক বিস্ময়ে সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুমিতা যেন আত্মমগ্ন হয়ে গেছে। একটানা বলে চলল, কথা বলা একটা আর্ট, সে আর্ট ওরা ভালো করেই জানে। কিন্তু ওদের পক্ষে শুধুমাত্র আর্ট ফর আর্টস সেক—জীবনে তার প্রয়োগ নেই। ওরা মুখে যা বলে, তার এতটুকুও যদি অনুভব করত, তাহলে পৃথিবীর চেহারাটা এতদিনে আগাগোড়াই বদলে যেত, বুঝলি?

রমলা শুনে যেতে লাগল, জবাব দেবার মতো কোনো কথাই সে আর এখন খুঁজে পাচ্ছে না।

—কী, কথা বলছিস না যে?

—কী বলব ?

—কী বলবি ?—যেন অন্ধ একটা রাগে হঠাৎ ফেটে পড়ল সুমিতা ঃ সোজা বাড়ি ফিরে যা—বাসুদেবকে বিয়ে করে বেশ একটা গিন্নীবান্নী হয়ে বস। দিন কাটবে ভালো, প্রজাপতির অনুগ্রহে বংশবৃদ্ধি করতে পারবি, তাতে বাধা পড়বে না।

—সুমিতাদি !

এতক্ষণে সুমিতার চমক ভাঙল। এ সে করছে কী ! এ কার কথা কাকে সে বলছে ! রাত্রির এই পরম বিস্ময়কর বিচিত্র মুহূর্তটিতে নিজের মনের একান্ত নিভৃত দুর্বলতাটাকে এই ভাবে সে প্রকাশ করে বসল শেষ পর্যন্ত ! যে আঘাত নিজেকে সে দিতে চেয়েছিল, স্বগতোক্তিটা শেষে সজোর হয়ে সেই আঘাতটা গিয়ে পড়ল বেচারী রমলার ওপরে ! রমলার কী দোষ ! কালো মেয়ে সে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অতি সাধারণ মেয়ে সে—একজন পুরুষের প্রেম যদি তার সেই অতি সাধারণ জীবনটিকে মধুর উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ করে দিয়ে থাকে, তাতে সুমিতার এতটা হিংসা করবার কী আছে ! নিজেকে সে এমন করে ছোট করে ফেলল অবশেষে !

সুমিতার হাতখানা আবার রমলার পিঠের ওপরে ফিরে এল।

—না সুমিতাদি—রুদ্ধ গলায় রমলা বললে, আমি ফিরে যাব না। আত্মহত্যা করে করুক, কিন্তু সে নিয়ে ভাবলে তো আমার চলবে না। ওর চাইতে ঢের বড় কাজ আমার আছে।

সুমিতা বললে, থাক থাক। কিছু মনে করিসনি ভাই। তোকে একটু ঠাট্টা করলাম খালি। বাসুদেবের কথা না হয় ভাবা যাবে কাল সকালে, এখন তা নিয়ে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তুই গিয়ে লক্ষ্মী মেয়েটির মতো বিছানায় শুয়ে পড়, ঢের রাত হয়ে গেছে।

রমলা আর দাঁড়াল না। মনের মধ্যে তীব্র ঘা লেগেছে একটা। সুমিতাকেও সে আর সহ্য করতে পারছে না। যেখানে আশ্রয় আশা করেছিল, সেখানে দেখেছে দাবাগ্নি। সুমিতাদির বুকের ভেতরে এমন একটা আগ্নেয়গিরি যে লুকিয়ে রয়েছে, এ কথা কি সে কোনো দিন স্বপ্নের মধ্যেও ভাবতে পেরেছিল !

রমলা চলে গেল। বারান্দায় সুমিতা আবার একা। কলকাতা গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে এখন। সাড়া নেই, শব্দ নেই, গ্রামোফোনটাও থেমে গেছে। শুধু আকাশে নক্ষত্র-মালার আবর্তন চলেছে নিয়মানুগ গতিতে—পৃথিবীর ওপর এত অসংলগ্নতা, এত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও ওদের কোনো নিয়মভঙ্গ ঘটবে না কোনো দিন।

চব্বিশটা ঘরের আলো নিবেছে। সবাই ঘুমিয়েছে, হয়তো রমলাও ঘুমিয়ে পড়বে একটু পরে। কিন্তু সুমিতার আজ আর ঘুম আসবে না। হংস-মিথুন নীড়ের ঠিকানা হারিয়েছে,

ঠিকই লিখেছে ইন্দু। এবার অসীম সাগরের ওপর দিয়ে অশ্রান্ত যাত্রা দিগন্তের দিকে—সেই দিগন্ত, যা কামানের ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে, রাঙা হয়ে গেছে বোমার আগুনে।

ছয়

শালের বন, ছোট লাইন, ছোট ট্রেন। মন্থরগতিতে চলতে চলতে খেলনার মতো রেল-গাড়িটা এসে জঙ্গলের মধ্যে থামল। স্টেশন নয়, স্টেশনের পরিহাস। একদিকে ঘন জঙ্গল অচ্ছেদ্য রেখায় তরাইয়ের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে, অন্য দিকে চা-বাগানের নিস্তরঙ্গ সবুজ সমুদ্র। সমান মাপে ছাঁটাই করা কোমর সমান উঁচু চা গাছের শ্রেণী ওদিকের দিগন্তরেখায় মিশে গেছে—মাঝে মাঝে ছোট ছোট শিরিষ গাছ ছায়া দিচ্ছে তাদের। আর সামনে কাঠের খুঁটি দেওয়া একখানা চালাঘর, তার গায়ে লেখা বাতাসীপুর স্টেশন।

আদিত্য নেমে দাঁড়ালো পাথর ছড়ানো প্ল্যাটফর্মে। শুধু পাথর নয়, প্রচুর বালিও মিশে আছে। এককালে এখান দিয়ে একটা পাহাড়ী ঝোরা বয়ে যেত বোধ হয়। কিন্তু সে ঝোরা আজ ফল্গুধারা হয়ে মাটির তলায় মিলিয়ে গেছে, শুধু পড়ে আছে অসংলগ্ন বালু-বিস্তৃতি।

বালি আর পাথরের মধ্য দিয়ে অনিশ্চিতভাবে হাঁটতে লাগল আদিত্য। কোথায় কোন্ দিকে যাবে ঠিক জানা নেই। এই পর্যন্ত জানে এখানে নেমে মাইল তিনেক হাঁটলে বাগান পাওয়া যাবে—যে বাগানে আজ অনিমেষ বিপন্ন আর বিব্রত হয়ে আছে।

একটা চুরুট ধরিয়ে আদিত্য চিন্তা করতে লাগল।

বাঙালী স্টেশন মাস্টার কিছুক্ষণ থেকে আদিত্যকে লক্ষ্য করছিলেন। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক।

—আপনার টিকেটটা দিয়েছেন স্যার?

—না—এই নিন।

টিকেটখানা হাতে নিয়ে তার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন স্টেশন মাস্টার।—ওঃ, কলকাতা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন আপনি?

—রংঝোরা বাগান। কোন্ দিক দিয়ে যাব বলতে পারেন?

—রংঝোরা? এদিক দিয়ে নেমে এগিয়ে যান। ভালো পীচের রাস্তা আছে, মাইল তিনেক হাঁটলেই বাগান পাবেন।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

আদিত্য চলতে শুরু করলে।

মনের ভেতর বিশৃঙ্খল চিন্তা ঘুরছে। বাগান যে কী ব্যাপার সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার

বালাই তার নেই। অনিমেষ সেখানে কী ভাবে আছে, কেমন আছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। তা ছাড়া বাগান সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী সে শুনেছে, তাতে মনটা আরো বেশি সংশয়ে পীড়িত হয়ে আছে। বিচিত্র দেশ—বিচিত্রতর পরিবেশ। জঙ্গলের মধ্যে অষ্টাদশ শতকীয় রাজ্যপাট। চা-বাগানের সাহেব বিধাতার মতো দণ্ডধর। নির্মম আর সংক্ষিপ্ত বিচার—কালাজ্বরে স্ফীতোদর কুলির পিলে ফাটানো সেখানে এমন কিছু চাঞ্চল্যকর ব্যাপার নয়। তার খবর বিশ্বদূত রয়টারের মুখে এসে পৌছোয় না—প্লাইউডের বাক্সে তার রোমাঞ্চকর বার্তা নিউজ এডিটরকে অনুপ্রাণিত করে না। শালবনের নিভৃত পত্রাচ্ছাদনের রহস্যময় অন্তর্লোকে রহস্যজনকভাবেই তা মিলিয়ে যায়—যেমন করে জঙ্গলের পথে অত্যন্ত অনায়াসে ভালুক এসে বজ্র-আলিঙ্গনে একটা মানুষের হাড়গোড় গুঁড়ো করে দিয়ে যায় কিংবা নীল-গাইয়ের শিং বুকের পাঁজরা ভেঙে ফুসফুসটাকে নিষ্পেষিত করে ফেলে।

বাগান তো ফরবিডেন প্যারাডাইজ—ঢোকবার কোন উপায় নেই। আশ্রয় কুলি-লাইন, কিন্তু সেও নিরাপদ নয়। সাহেবের শ্যেন দৃষ্টিকে তা এড়াতে পারবে না। কোথায় অনিমেষ—কী ভাবে আছে কে জানে।

চলতে চলতে হঠাৎ আদিত্যের চোখ পড়ল সামনের দিকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা। তুষার-গুণ্ঠিত শুভ্রবপুতে হীরার মতো সূর্যকিরণ। পূর্ব দিগন্তে সূর্য-সারথি দেখা দিলে ওখানে তার প্রথম সম্বর্ধনা। আদিত্য মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল সেইদিকে।

পীচের পথ চলেছে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মানুষের হাতে গড়ে দেওয়া পথ, মসৃণ, মনোরম। চমৎকার বীথিপথ। আলগা হয়ে যাওয়া বনের আড়ালে আড়ালে সূর্য আর কাঞ্চনজঙ্ঘা। আশ্চর্য জগৎ। শাল গাছের মাথায় হরিয়াল ডাকছে—বনমুরগী চলেছে ছুটে।

কেমন একটা ক্লান্তি আর অবসাদ যেন আদিত্যকে আচ্ছন্ন করে দিলে। মনে পড়ল কলকাতা। দিগন্তে যুদ্ধ আর ভীতিজর্জর রাজপথে. মানুষের ক্লেদাক্ত শোভাযাত্রা। কবি ইন্দুর কয়েকটা লাইন মনে পড়ছে:

> প্রাচীতে প্রারব্ধ হোলো যুগান্তের মহা নরমেধ
> নিষ্প্রদীপ নিশীথ নগরী।
> বিদেহী বেতারে বাজে প্রলয়ের সমুদ্র গর্জন
> ভয়ার্ত মানুষ পশু চলিয়াছে ক্লেদাক্ত মিছিলে
> শোভাহীন উগ্রতায় প্রাসাদের পরিসীমা পারে,
> আঁকড়ি রাখিতে হবে দুর্মূল্য জীবন।

দুর্মূল্য জীবনকে আঁকড়ে রাখতে হবে। নাগরিক জীবন। সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত, বিপর্যস্ত, যক্ষ্মার রোগীর মতো বিড়ম্বিত, মনুষ্যত্বের বিচারে প্রতিমুহূর্তে লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

এদিকে শ্যামবাজার, ওদিকে টালীগঞ্জ—মাঝখানে ডালহাউসি স্কোয়ার। যমুনা আর সরস্বতী এসে মিশেছে গঙ্গায়। বাঙালী জীবনের ত্রিবেণীসঙ্গম।

কিন্তু ত্রিবেণীসঙ্গম? মানবতার মহাতীর্থ? নাকি পশ্চিমগামিনী সুবর্ণরেখায় উপনদীর আত্মদান—তিলে তিলে রক্ত দিয়ে, স্বাস্থ্য দিয়ে, মানবতা দিয়ে?

আর—এখানে অরণ্য। আদিম অরণ্য, প্রাথমিক অরণ্য। পৃথিবীর প্রথম প্রাণশক্তির শ্যামায়িত বিকাশ। কোথায় ছুটেছ তোমরা, পালাচ্ছ কোথায়? শহরে, গ্রামে? তার চাইতে চলে এসো এখানে, সব ভুলে যাও, ভুলে যাও সেদিনের কথা—যেদিন এই বনানীর আশ্রয় থেকে তোমরা বেরিয়ে চলে এসেছিলে, তোমরা ভেসে পড়েছিলে সভ্যতার স্রোত-প্রবাহে, এগিয়ে গিয়েছিলে বিজ্ঞানীদের জ্যামিতিক পরিমিতি কষা রাজপথ দিয়ে। তার ফলে এল দ্বন্দ্ব, এল সমস্যা। অনেক পেলে, হারালেও অনেক। খনির তলা থেকে জাগিয়ে তুললে ঘুমন্ত কালযবনকে, তার হাতে তুলে দিলে বিশ্বকর্মার হাতুড়ি। সব কিছুকে ভেঙে-চুরে সে গড়ে দিলে যন্ত্র—যান্ত্রিকতা, আকাশছোঁয়া বাড়ি, বৈদ্যুতিক স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু দানবের রক্তে জেগে উঠেছে পাশব বিদ্রোহ। হাতুড়ি ফেলে দিয়ে গদা তুলে নিয়েছে হাতে, ভেঙে চুরমার করছে সমস্ত, কিছু বাকি রাখবে না কোনোখানে।

তার চেয়ে পালাও পালাও, পালিয়ে এসো এখানে। এই জঙ্গলে, এই শালবনানীর নিভৃত মর্মলোকে। দৈত্যের গদা এখানে তোমাদের খুঁজে পাবে না। আবার পশুর মাংস, আবার চকমকির আগুন—আবার পাথরের অস্ত্র। শহরে পড়ে থাক শীলারা, পড়ে থাক হেমন্তবাবুরা—বক রাক্ষসের মুখে খাদ্য যুগিয়ে দিক নিরীহ নির্বোধ প্রজাবৃন্দ। তোমরা চলে এসো, আদিমতায় ফিরে যাও—সার্থক হোক ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্বপ্ন থেকে ডি এইচ. লরেন্সের কামনা। জ্যামিতির রেখা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাক, বিদ্যুতের তার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে মিলিয়ে যাক পৃথিবীর ধুলোর সঙ্গে—

কিন্তু!

কিন্তু এ কী ভাবছে আদিত্য! এ কি ওর মনের কথা, না কাল রাত্রে ট্রেনের সেই দুর্বিষহ প্রহরগুলোর প্রতিক্রিয়া এটা! সেই রাজনীতির তর্ক, সেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা মেয়েটি—শশাঙ্কের সেই স্বার্থপর পলাতক মুখচ্ছবি। কিন্তু এ কি সত্য? এতদিন ধরে রাজনীতি চর্চা আর ফিজিক্সে এম. এস-সি. পাস করবার এই কি পরিণতি!

না—না, কখনো না। মানুষ কখনো পিছোয় না, পিছানো তার ধর্ম নয়। মানুষ কখনো আর হামাগুড়ি দিয়ে তার শৈশবে ফিরবে না, মাতৃগর্ভে তার প্রত্যাবর্তন হতে পারে না কোনোদিন। যে দানব আজ বিদ্রোহী, তার বিদ্রোহকে দমন করতে, দলন করতে কতক্ষণ লাগবে! অমিত মানুষের শক্তি, অপরিসীম তার আত্মবিশ্বাস। আবার বাঁধা পড়বে কালযবন, পশু চূর্ণ হয়ে যাবে—বজ্রধর মানুষের শক্তি নতুন নির্দেশ দেবে তাকে।

আজ যে হিংসা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সে তো এই আদিম সত্তারই দান,—তাকে নিয়ন্ত্রণ করাই মানুষের সভ্যতা, মানুষের প্রগতির তাৎপর্য।

ঘুমিয়ে থাক শালবন—শান্ত পরিতৃপ্তি নিয়ে নির্জনতার অখণ্ড আনন্দে বিস্তীর্ণ হয়ে থাক তার নীলচ্ছায়া। এখানে আর আমরা ফিরে আসব না। জ্যামিতির রেখা আমরা টেনে আনব এখানে, বয়ে আনব বিদ্যুতের শক্তি; তোমরা আজ যারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছ, তোমরা আবার ফিরে আসবে, ফিরে আসবে কলকাতায়—কলকাতাকে সঞ্চারিত করবে দিকে দিকে, অরণ্যে প্রান্তরে। পলাতকের মিছিল সেদিন রূপান্বিত হবে বিজয়ীর অভিযানে। তাই ইন্দু লিখেছে:

প্রশান্ত সমুদ্রজলে ফেনায়িত নিষ্ঠুর সংগ্রাম
দিগন্তের চক্রতীর্থে রক্তশতদল
দেবতার সিংহাসন ভাবীযুগে করিবে রচনা।—

কিন্তু এখনো সময় হয়নি:

মালয়ের তীরে তীরে পীতরক্তে নামিল জোয়ার
সিদ্ধার্থের স্বপ্ন বয়ে তন্দ্রাতুর পাষাণ দেবতা—

আদিত্য চলেছে এগিয়ে। চুরুটের ধোঁয়া ভেসে যাচ্ছে শালবনের বাতাসে-বাতাসে। মনে পড়ছে অনিমেষও কবিতা লিখত এক সময়ে, কবি অনিমেষ। আজ চা-বাগানের অক্লান্তকর্মী যে কী ভাবে আছে সেটা অনুমানও করতে পারছে না আদিত্য।

দূরে কতগুলো ঘরবাড়ি—একটা বাগানের শ্যামায়িত ব্যাপ্তি। ওই কি রংখোয়া বাগান? আদিত্য পা চালিয়ে দিল।

সাত

বন্দুকটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ তেমনি বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল রবার্টস। শিরাস্নায়ুতে নর্ডিক নীলরক্ত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে বারে বারে। কপিশ চোখে বন্যহিংসা জ্বলছে—বন আর বাঘ-ভালুকের সংস্পর্শে থেকে রবার্টস তাদের স্বভাবেরও খানিকটা আয়ত্ত করে নিয়েছে নিজের মধ্যে।

হাতের সামনে জাপানীরা নেই, যারা মালয় কেড়ে নিয়েছে, যারা ডুবিয়ে দিয়েছে প্রিন্স অব ওয়েলস, সমুদ্র-শাসক ব্রিটানিয়াকে যারা সমুদ্রের তলায় চালান করে দেবার মতলব করেছে, তাদের কাউকে হাতের সামনে পাচ্ছে না রবার্টস। কিন্তু ক্ষুদ্র শত্রু যে আছে সেও নিতান্ত অবহেলা বা অবজ্ঞার ব্যাপার নয়। এই চরম দুর্বল মুহূর্তে আর চূড়ান্ত দুঃসময়ে সাপের মতো এরা এসে মাথা তুলেছে মাটির তলা থেকে। কিন্তু এই উদ্ধত

মাথাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে—ব্রিটানিয়া শুধু সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে না, সমগ্র পৃথিবীর মাটিতেও তার তুল্যমূল্য অধিকার, তার সমান মর্যাদা।

মাথার ভেতরে হুইস্কির নেশা। বাঘের মতো দৃষ্টিতে অনিমেষের দেহটার দিকে তাকিয়ে রইল রবার্টস। যেন গ্রাস করবে, চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে তাকে। শুনেছিল জাপানীরা নাকি দরকার হলে নরমাংস খায়, সেও দেখবে নাকি একবার?

দূরে কুলিরা ভীত, বিবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলছে না তারা, কথা বলবার শক্তি বা সাহস পাচ্ছে না কেউ। মাইনে বাড়াবার দাবি তুলেছিল, সে দাবির জবাব রবার্টস তৈরি করে রেখেছে তার দুনলা বন্দুকের মুখে। তাদের মধ্যে হঠাৎ এসেছিল অনিমেষ, এসেছিল একটা নতুন পৃথিবীর খবর নিয়ে। কোথায় নাকি এমন একটা দেশ আছে যেখানে মালিক বলে কেউ নেই, যেখানে কথায় কথায় বুকে পিঠে বুটের লাথি এসে পড়ে না। যেখানে খাটুনি কম, মজুরী বেশি। যেখানে ওরা সব, ওদেরই সব।

ম্যানেজার নেই, সুপারভাইজার নেই, বাগানের ছোট বড় লাটসায়েব বাবুরা নেই, বেগার খাটনি নেই। যেখানে কুলির ছেলে বাবুদের চাইতেও বেশি লেখাপড়া শেখে, বাবুদের চাইতেও বেশি রোজগার করে। ব্যানার্জিবাবু সেই দেশের খবর ওদের দিয়েছিল—আশ্বাস দিয়েছিল সেই দেশের মানুষদের মতো ওরাও সব পাবে, এত বড় পৃথিবীটার যা কিছু আছে সব চলে আসবে ওদেরই হাতের মুঠির ভেতরে।

সব কথা ওরা বোঝেনি, যতটুকু বুঝেছিল তাই ওদের মনের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল একটা বিচিত্র আস্বাদ, একটা বিপুল অনুভূতি। আশায় আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল মন। ব্যানার্জিবাবুকে দেবতা বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল: ব্যানার্জিবাবু সব করতে পারে, তাদের গুনিনদের মতো অসাধ্য সাধন করে ফেলতে পারে। একদিন হয়তো ঘুম ভেঙে ওরা উঠে দেখবে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োয় একটা নতুন সূর্যের আলো পড়েছে; ম্যানেজার নেই, বাবুরা নেই। কলটা ওদের—বাড়িঘরগুলো ওদের—সব ওদের, শহরও ওদের। সেই দিনের আসন্ন ইঙ্গিত যেন শুনতে পাচ্ছিল।

কিন্তু কী হল—এ কী হয়ে গেল!

সমস্ত মন নিরাশার মধ্যে তলিয়ে গেছে। সামনে ব্যানার্জিবাবু পড়ে আছে রক্তাক্ত হয়ে। ওদের জীবনে সম্ভাবনার কথা যা ওরা শুনেছিল তা একটা নিছক রূপকথা। যা আছে তাই সত্য—যা এতকাল চলে আসছে তাই সত্য। কিছুই বদলাবে না। চিরকাল ওদের বুকের সামনে বন্দুকের নলটা উঁচু হয়েই থাকবে, চিরদিন ওরা ভয় করেই চলবে। কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপরে সে সূর্য আর কখনো উঠবে না।

রবার্টস আগুন-ঝরা গলায় বললে, কী, সব চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো যে?

কুলিরা কাঁপতে লাগল; কথা বলতে পারল না।

—এখুনি সরিয়ে নিয়ে যাও—আমার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাও। ছুঁড়ে ফেলে দাও জঙ্গলের মধ্যে। গো—

এক পা এক পা করে কুলিরা এগোতে লাগল। রক্ত শুধু অনিমেষের গা থেকেই ঝরেনি, তাদের বুকের ভেতরেও যেন ওই আঘাতগুলো এসে পড়েছে।

—আর শোনো। এর একটি বর্ণও যেন বাইরে প্রকাশ না পায়। যদি কেউ বলে, তার অবস্থাও ঠিক এই রকম হবে—হুঁশিয়ার।

কুলিরা অনিমেষের দেহকে বহন করে নিয়ে গেল।

দাপদাপে ঘরে ঢুকল রবার্টস। মনের মধ্যে ভয়ঙ্কর কী একটা ঘটে চলেছে। যেন একটা প্রচণ্ড যুদ্ধে গৌরবময় জয়লাভ হয়েছে তার, নিজের ভেতরে আত্মবিশ্বাসের একটা প্রবল উদ্দীপনা। আঃ, কেন সে যোগ দিলে না যুদ্ধে? আজ যদি সে সেনাপতি হত, তাহলে মালয়ের যুদ্ধের ইতিহাসটাই হয়তো বদলে যেত, সব কিছু হয়ে যেত সম্পূর্ণ অন্য-রকম। রুল ব্রিটানিয়া রুল দ্য ওয়েভস্—

ঘরে ঢুকে আরও দু পেগ হুইস্কি গিললে সে। একটা মাসিকপত্র খুললে, প্রথমেই বেরিয়ে পড়ল অ্যাডল্ফ হিটলারের একটা ছবি। দ্য ডেভিল, দ্য মনস্টার। দাঁতের ভেতর থেকে বেরুল একটা চাপা রূঢ় গর্জন। পরক্ষণেই পত্রিকাটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললে রবার্টস।

তারপর প্রচণ্ড বেগে একটা কিল মারলে কলিং বেলটার ওপরে। বেলটা শুধু যে বেজে উঠল তাই নয়, টেবিলটা সুদ্ধ কেঁপে উঠল থর থর শব্দে। ওটা কাঠের টেবিল না হয়ে যদি তোজোর মাথা হত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই গুঁড়ো হয়ে যেত বোধ হয়।

কম্পিত পায়ে সাঁওতাল কুলি ঢুকল একটা।

—ডাক্তার কো বোলাও—

—জী—

কুলিটা পালিয়ে বাঁচল। হাতের পাশেই রবার্টসের দো-নলা বন্দুকটা দাঁড় করানো। মগজের ভেতরে হুইস্কির আগুন নেচে বেড়াচ্ছে। বন্দুকের একটা গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তার দিকে ছিটকে আসাটা আজকে নিতান্ত অসম্ভব ঘটনা নাও হতে পারে।

খবর পেয়েই যাদব ডাক্তার এল। ঘটনাটা নিজের চোখেই দেখেছে সে সমস্ত। ব্যাপার এ পর্যন্ত গড়াবে কল্পনাও সে করতে পারেনি। তাই নিজের মনের ভেতরে এক ধরনের অনুতাপ তাকে পীড়ন করছিল। কিন্তু এ সময়ে তাকে আবার খবর কেন? আশঙ্কা হচ্ছিল।

বলির পশুর মতো যাদব ডাক্তার এসে সেলাম দিলে।

—সিট ডাউন ডাক্তার।

ডাক্তার তবু দাঁড়িয়ে রইল। অপাঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগল রবার্টসের হাতের পাশেই

রাখা টোটাভরা দো-নলা বন্দুকটার দিকে।

—ইয়েস স্যার—

রবার্টস বিকট ভাবে ধমকে উঠল: নো—নো ইয়েস স্যার। বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? বোসো।

—ই-ইয়েস স্যার—জড়িত গলায় অস্পষ্ট ভাবে জবাব দিয়ে পুঁটলির মতো যাদব ডাক্তার ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

রবার্টস তখন গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে। মদের পর মদের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ আজ তার মনের সব কিছু সীমাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে। রক্তের মধ্যে তার যেন যুদ্ধের বিউগল বাজছে। যাদব ডাক্তার আড়ষ্ট দৃষ্টিতে রবার্টসকে লক্ষ্য করতে লাগল।

—খাবে একটু?

—নো স্যার—এক্সকিউজ মি—

—হো-হোয়াই? রবার্টসের দুই চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল: তুমিও কি ওদের সঙ্গে ভিড়েছ নাকি? আমাকে দিয়েছ বাদ দিয়ে? হো-হোয়াট্‌স ইয়োর বিগ আইডিয়া?

—নাথিং স্যার—

—দে-দেন হো-হোযাই? কেন খাবে না?

—মানে, আ-আমি ওসব বেশি স্ট্যাণ্ড করতে পারি না স্যার—

—রা-রা-রাস্কেল!

ফট্‌ করে একটা সোডার বোতল খুললে রবার্টস। হুইস্কি ঢাললে গেলাসে। সমস্ত শরীরটা তার টলছে, তবু আজ মদে বিরাম দেবে না সে। রক্তে রক্তে বিউগল বাজছে, স্নায়ুর ভেতরে সে শুনতে পাচ্ছে যেন টর্পেডোর বিস্ফোরণে ফেনায়িত প্রশান্ত সাগরের উত্তাল গর্জন।

—ডাক্তার—

—ইয়েস স্যার?

—কী ভেবেছ? স্বাধীন হয়ে গেছ তোমরা?

—না স্যার, কক্ষনো না।

—ভেবেছ, যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি, তাই না? এইবার তোমরা আমাদের বুকের ওপরে চেপে বসবে?

—নেভার স্যার।—যাদব ডাক্তার নেশা করেনি, তবুও তার গলা জড়িয়ে আসছে: আমি কখনো একথা বিশ্বাস করি না। ওয়ার-ফাণ্ডে আমি পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়েছি।

—রিয়্যালি? বেশ, বেশ! আই ওয়াণ্ট এ ডগ লাইক ইউ। আর ইউ নট এ ডগ ডাক্তার?

—ডগ স্যার ?—যাদব ডাক্তার মাথার মসৃণ টাকটাকে চুলকে নিলে এইবারে : ই-ইয়েস স্যার, এ ভেরি লয়্যাল ডগ।

রবার্টস টলছে, চোখের রাঙা দৃষ্টি ঘোলা হয়ে আসছে ক্রমশ। অস্বাভাবিক গলায় বলে চলল, দ্য জার্মানস আর ডগস, দ্য জাপস আর ডগস, দ্য ইণ্ডিয়ানস আর ডগস। ইউ আর এ ডগ ডাক্তার।

—সার্টেনলি স্যার।

—ডাক্তার, কুকুর কি কখনো স্বাধীনতা দাবি করতে পারে ?

—কখনো না স্যার।

—কুকুর সব সময় লাথি খাওয়ার জন্যে তৈরি থাকে নিশ্চয় ?

—নিশ্চয় স্যার।

ঘোলা চোখ দুটো সম্পূর্ণ করে মেলল রবার্টস। মদের নেশায় সমস্ত চিন্তা আর বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। একটা অপরিসীম ঘৃণা ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে অনুভূতির অন্ত-প্রত্যন্তে। জার্মানদের ওপরে ঘৃণা, জাপানীদের ওপরে ঘৃণা, ইণ্ডিয়ানদের ওপরে ঘৃণা। দুর্দিন আর দুঃসময় এসেছে বলেই আজ মাটির তলা থেকে কেঁচোরা অবধি কেউটে হয়ে উঠেছে। ব্যানার্জিবাবু! ছদ্মবেশে ঢুকে তারই রাজ্যপাটে ভাঙন ধরাবার উপক্রম করেছিল! দ্য ডগ! আর সামনে বসে আছে যাদব ডাক্তার। তাদেরই একজন, তাদেরই মতো কালো চামড়া। হোক লয়্যাল, তবু এ ডগ ইজ এ ডগ আফটার অল।

—ইউ থিঙ্ক সো ?

—ই-ইয়েস স্যার—তেমনি শঙ্কিত গলায় যাদব ডাক্তার জবাব দিলে।

—দেন—

বিদ্যুৎগতিতে রবার্টস উঠে দাঁড়ালো। তারপর প্রচণ্ড বেগে একটা লাথি ঝেড়ে দিলে যাদব ডাক্তারের বুকের ওপরে। মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরুল কি বেরুল না, পরমুহূর্তেই চেয়ারসুদ্ধ যাদব ডাক্তার হুড়মুড় করে উল্টে পড়ল মেজেতে।

প্রভুভক্ত কুকুরের অকৃত্রিম পুরস্কার।

মিনিটখানেক যাদব ডাক্তার হতভম্ব হয়ে পড়ে রইল মেঝেতে। বিনা মেঘে বাজ নেমেছে আকাশ থেকে। ব্যথার চাইতেও বেশি জেগেছে বিস্ময়—কী অপরাধে এই শাস্তি ?

কিন্তু আর ভাববার সময় নেই। তার চোখের সামনে রবার্টসের চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলে যাচ্ছে। আর একটু অপেক্ষা করলে ওই রকম আরো দু-একটা লাথির পুনরাবৃত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। তড়িৎগতিতে সে উঠে পড়ল, তারপর মুক্তকচ্ছ হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল বাইরে। কানের কাছে ক্রমাগত বাজছে প্রভুভক্ত কুকুরের অকৃত্রিম

পুরস্কার। একটুর জন্যে মাতালের লাথিতে তার দুর্মূল্য মহাপ্রাণীটা বেরিয়ে যায়নি। রবার্টস হো হো করে হেসে উঠল। যাদব ডাক্তারের পলায়নটা ভারী উপভোগ্য বলে মনে হয়েছে তার।

অ্যানাদার ভিক্টরী। আজকে মালয় ফ্রণ্টে থাকলে নির্ঘাত যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারত রবার্টস।

কুলিরা অনিমেষকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এল—নিয়ে এল ফ্যাক্টরীর সীমানার বাইরে। যারা এতক্ষণ রবার্টসের বাংলোর সামনে থ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও সন্ত্রস্ত ভাবে পেছনে পেছনে অনুসরণ করতে লাগল।

রবার্টস বলে দিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিতে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, কোন গণ্ডগোলই আর থাকবে না তা হলে। সেইখানেই পড়ে থাকবে, শেয়ালে বা অন্য জানোয়ারে খেয়ে শেষ করে দেবে। কোন দায়িত্ব থাকবে না রবার্টসের, কোন অসুবিধাও না। জানোয়ারে যাকে মেরে ফেলেছে, তার সম্বন্ধে রবার্টস আর কীই বা করতে পারে?

কিন্তু কুলিরা অনিমেষকে জঙ্গলে নিয়ে গেল না।

বনের আড়ালে তখন দিনান্ত ঘনিয়ে আসছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োর ওপর দিয়ে রক্তের ধারা যাচ্ছে গড়িয়ে। অনিমেষের সর্বাঙ্গেও রক্ত। ক্লান্ত নিশ্বাস পড়ছে। নাক দিয়ে কপাল দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত নামছে, দিনান্তের আলোয় সে রক্ত জ্বলছে চুনীর মতো। নির্মমভাবেই তাকে মেরেছে রবার্টস।

কুলিরা অনিমেষকে নিয়ে গেল বাগানের মধ্যে। শুইয়ে দিল চা-গাছের ছায়াকুঞ্জের ভেতরে। তারপরে জটলা করতে লাগল কী করা যায়।

না—কখনোই না। প্রাণে ধরে তারা ব্যানার্জিবাবুকে কখনো জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসতে পারবে না। তাকে বাঁচাবে, তাকে লুকিয়ে রাখবে। নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন এখনো মুছে যায়নি মন থেকে। রবার্টসের বন্দুকের নল দেখে ভয় পেয়েছিল, সাময়িকভাবে একটা নৈরাশ্য আর অবসাদ এসে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল ওদের চেতনাকে। কিন্তু সেটাই সব নয়—সেটাই শেষ কথা নয়।

ওদের রক্তের মধ্যে ডাক এসেছে। পৃথিবী ওদের, দিন ওদের, আগামী কালের যা কিছু সব ওদের। ভয় পেলে চলবে না। এর শোধ দিতে হবে, এর বদলা নিতে হবে কড়ায় গণ্ডায়। এখানকার চা-বাগানের বিষাক্ত বাতাস আর কালাজ্বরের মৃত্যুবীজাণু ওদের নির্জীব করে ফেলেছে বটে, কিন্তু এই ওদের শেষ পরিচয় নয়। এই বাগানে যখন আড়-কাঠি ওদের ভুলিয়ে আনে, তার আগে ওদেরও দিন ছিল, ওদের দিগন্তব্যাপ্ত আকাশ ছিল একটা। ওদের পাহাড়ে পাহাড়ে মহুয়ার গন্ধ ভাসত, ওদের দেশে এমনি করে ফুটন্ত শালের

দূর। ওরা সজীব ছিল—ওরা সেদিন কুলি ছিল না, মানুষ ছিল। দিল-মজুরীর বদলে কথায় কথায় ওদের কেউ লাথি মারতে পারত না। সেদিন ওরা তীর শানিয়ে রাখত, টাঙীতে ধার দিয়ে রাখত। আজ ওদের সেই তীর ভোঁতা হয়ে গেছে, মরচে পড়ে গেছে ওদের টাঙীতে। কিন্তু পৃথিবীতে আজ যুদ্ধ এসেছে, এসেছে ওদের যুদ্ধের দিন। আবার ওরা নতুন করে সেই অস্ত্রগুলোকে শান দেবে—এর বদলা নেবে।

কিন্তু সে তো পরের কথা, এখন কী করা যায়?

কুলি লাইনে নিয়ে রাখবার কোনো উপায় নেই। সাহেবের চোখ শয়তানের চোখ। আর তার চাইতেও বেশি ভয় ওই ডাক্তারটাকে। ওই লোকটাকে ওরা কখনো দুচক্ষে দেখতে পারে না। ব্যানার্জিবাবুর মুখে শুনেছে, ওদের অসুখ-বিসুখে চিকিৎসা করার জন্যেই নাকি ডাক্তার এখানে থাকে। কিন্তু ওরা তার পরিচয় পায়নি কোনোদিন। ওষুধ চাইতে গেলে গালাগালি করেছে, কখনো দেখতে এলেও গাল দিয়ে গেছে অশ্রাব্য ভাষায়, যেন অসুখ করাটা ওদের পক্ষে একটা প্রচণ্ড অপরাধ।

ওই ডাক্তারটাই সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে দিনরাত। ও ঠিক খবরটা যোগাড় করে সাহেবের কানে পৌঁছে দেবে। তা হলে?

উপায় ঠিক হয়েছে। ধরমবীরের কাঠের গোলায় ব্যানার্জিবাবুর জায়গা হতে পারে। ধরমবীরের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে ব্যানার্জিবাবুর। ধরমবীর লোক ভালো, গান্ধী মহারাজের চেলা।

...সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। বন থেকে সবে ফিরে এসেছে ধরমবীর, ফিরে এসেছে তার কাঠগোলায়। অনেকগুলো গাছে আজ দাগ দিয়ে আসতে হয়েছে, কাল থেকে কাটাবার পালা।

শালবনের মাঝখানে ধরমবীরের কাঠগোলা। শুধু শালবন নয়, এখানে ওখানে দু-একটা আম গাছ, লেবু গাছ, পাহাড়ী বাঁশের কয়েকটা ঝাড়ও আছে। আর এই আরণ্যক পরিবেশের ভেতরে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ধরমবীর তার কাঠের গোলা ফেঁদে বসেছে। বড় বড় শালের গুঁড়ি, চেরাকাঠের স্তূপ। সেই কাঠ থেকে বিচিত্র একটা মিষ্টি গন্ধ উঠে চারদিক ভরিয়ে দিয়েছে। ক্লান্ত ধরমবীর নেমে পড়ল টাট্টু থেকে।

নির্জন থমথম করছে চারদিক। যারা কাজ করছিল তারা চলে গেছে, স্তব্ধতায় ভরে আছে সমস্ত। ধরমবীর টাট্টুটাকে একটা কাঠের খুঁটিতে বেঁধে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠল ওপরে। চাবির তাড়াটা বার করে ঘর খুললে, আলো জ্বাললো, নিজের হাতে স্টোভ জ্বেলে এক কাপ চা খেল, তারপর একটা ইজিচেয়ারে বসে সিগারেট ধরালো। ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের তাগিদে অর্ডারের আর বিরাম নেই, এক মুহূর্তও সে বিশ্রাম পাচ্ছে না। এই লোকজনে তার কুলোবে না, আরো যোগাড় করতে হবে।

ধরমবীর একবার ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে। সব যেন মূর্তিমান বিশৃঙ্খলা। একার সংসার। প্রথম জীবনে একটি মেয়ে তাকে অশেষ দুঃখ দিয়েছিল, তার ফলে আর বিয়ে করাটা ঘটে উঠল না তার কপালে। তারপর উনিশশো তিরিশ সাল এল। গান্ধী মহারাজ ডাক দিলেন স্বরাজের লড়াইয়ের জন্যে। ডাণ্ডীতে সত্যাগ্রহ। আইন ভাঙতে হবে—লড়তে হবে সরকারের বিরুদ্ধে—সত্যাগ্রহীর বুকের শেষ রক্তকণা দিয়ে স্বরাজ আনতে হবে। ঝাঁপিয়ে পড়ল ধরমবীর, জেল খেটে এল। তারপর ঘুরতে লাগল জীবনের চাকা। টাকা দরকার, বাঁচা দরকার। বন ইজারা নিলে, শুরু করলে কাঠের ব্যবসা। আজ তার অবস্থা ভালো, অনেক টাকার মালিক সে।

প্রেম তাকে দুঃখ দিয়েছে, ব্যথা দিয়েছে বলেই সেটাকে সে ভুলতে চেয়েছে। কিন্তু যা ভুলতে পারেনি তা গান্ধী মহারাজের কথা, ডাণ্ডী সত্যাগ্রহের শপথ।

তাই ধরমবীর আজো পড়াশোনা করে। ভালো হিন্দী জানে, ইংরেজিও জানে এক রকম। সেইজন্যেই এই জঙ্গলের মধ্যেও যোগাড় করেছে একগাদা রাজনীতির বই। এতদিন একা ছিল, এইবারে এসে জুটেছে আর একটি আশ্চর্য লোক, তার নাম ব্যানার্জি-বাবু। আশ্চর্য মনের মিল ঘটেছে দুজনের। একসঙ্গে পড়ে, একসঙ্গে আলোচনা করে। ব্যানার্জিবাবু যে কত জানে ভাবতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় ধরমবীর। তার যেন মনের কবাট খুলে যাচ্ছে। নতুন ভাব, নতুন ভাবনার একটা জগৎ। এই সন্ধ্যাবেলাতেই রোজ ব্যানার্জিবাবু তার কাছে আসে, আজও আসবে নিশ্চয়।

ধরমবীর সিগারেট ধরিয়ে ব্যানার্জিবাবুর প্রতীক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় চোখে পড়ল বাগানের একদল কুলি আসছে। কী একটা জিনিস তারা বয়ে আনছে। আশঙ্কায় শিউরে উঠল ধরমবীর। নিশ্চয় জানোয়ারে মেরেছে কাউকে, কিন্তু কাকে?

দ্রুতপায়ে সে নেমে এল বারান্দা থেকে। বললে, কে?

—আমরা। বাগানের কুলি।

—কী হয়েছে?

—ব্যানার্জিবাবুকে মেরেছে।

—ব্যানার্জিবাবুকে মেরেছে! তিন লাফে ধরমবীর নেমে পড়ল নিচে। বললে, কে মারলে?

—সাহেব।

তারপরে খানিকটা উত্তেজিত কোলাহল। তার মাঝখানেই সব কথা শুনতে পেল ধরমবীর, বুঝতে পারলে সমস্ত। কিন্তু তখন আর সময় নেই সে সব আলোচনা করবার। ধরাধরি করে অনিমেষকে নিয়ে এল নিজের ঘরে, শুইয়ে দিলে বিছানায়। আঘাতের

জায়গাগুলো ধুয়ে আইডিন লাগালে, তারপরে মুখে ঢেলে দিলে ব্র্যাণ্ডি।

আস্তে আস্তে চোখ মেললে অনিমেষ।

—কেমন আছো ব্যানার্জিবাবু?

—কে, ধরমবীর? হ্যাঁ ভাই, ভালো আছি। কিন্তু মাথায় বড় কষ্ট হচ্ছে।

—সকালেই ডাক্তারকে খবর দেব। বাগানের ডাক্তার তো আর তোমাকে দেখতে আসবে না, আমি সকালে সাইকেল দিয়ে লোক পাঠাব মানিকনগরে।

—আচ্ছা—অনিমেষ চোখ বুজল, তারপরে আবার আস্তে আস্তে চোখ মেলল।

—ভাই, বুকে ভয়ানক লেগেছে। আমার হার্টের অবস্থা আগেই খারাপ ছিল। বোধ হয় বাঁচব না। তুমি শুধু একজনকে একটা খবর পাঠাও।

—কাকে খবর পাঠাব?

মুহূর্তের জন্যে অনিমেষের মুখের সামনে ভেসে উঠল সুমিতার মুখ। সুমিতা। একদিন আকাশে বাতাসে যে ফুলের গন্ধের মতো পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল, একদিন যাকে কেন্দ্র করে মুখরিত হয়ে উঠেছিল ওর সমস্ত প্রাণ, সমস্ত গান, সমস্ত কবিতা। তারপর যখন জীবনের স্রোত বইল অন্যমুখে, সেদিনও যে ওর পাশ ছাড়েনি, সমস্ত প্রতিকূলতার ভেতর দিয়েও ওর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসেছিল, সেই সুমিতা।

কিন্তু না। এখন দুর্বলতার সময় নয়। এখন সে মরবে না, তার বাঁচবার প্রয়োজন আছে। যুদ্ধ এসেছে, এসেছে স্বাধীন ভারতের মানুষদের সৈনিক ব্রতে দীক্ষিত করবার পরমতম অবকাশ। এখন মরলে চলবে না। আর যদি বা মরে তাতেই বা ক্ষতি কী। সুমিতার কাজে তাতে বাধা ঘটবে না, হয়তো বা মনের দিক থেকে একটা মুক্তিই খুঁজে পাবে সে।

কিছুক্ষণ অনিশ্চিত হয়ে রইল অনিমেষ। বললে, আদিত্যদাকে খবর দাও একটা—আদিত্যদাকে—

—আদিত্যদা! ঠিকানা কী?

কিন্তু ঠিকানা পাওয়া গেল না। অনিমেষ আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিলে ধরমবীর। আদিত্যের নাম সে শুনেছে অনিমেষের মুখে, যে খবরের কাগজে আদিত্য চাকরি করে সে কাগজটার নামও জানে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ সে একটা চিঠি লিখলে কলকাতায় তার এক দেশোয়ালী ভাইয়ের নামে। সে যেন যেমন করে হোক খবরটা ওই পত্রিকার অফিসে আদিত্যবাবুকে পৌঁছে দেয়।

এদিকে কুলিরাও চুপ করে বসে ছিল না। অনেক রাত পর্যন্ত তারা লাইনে ফিরে গেল না। যতই সময় কাটছে, মনের ভেতরের ভয়টা ততই বেশি করে মুছে যাচ্ছে হালকা কুয়াশার মতো। পাহাড়ী জীবন, মহুয়া ফলের গন্ধ, শানানো তীর, মাদলের শব্দ। চা-

বাগানের বাঁশি, কালাজ্বর আর বাবুদের ভয়ে যা এতকাল চাপা পড়ে ছিল, তাই হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে আবার। অন্ন্দাগারের নতুন সম্ভাবনায় বুকের তলায় ধূমায়িত হয়ে উঠছে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি।

তাদের দিন আসছে, তাদের পৃথিবী আসছে। ব্যানার্জিবাবুর কথা মিথ্যে নয়, তাদের স্বপ্নও মিথ্যে নয়। কোনো অন্যায় আর তারা সহ্য করবে না, এর বিচারের ভার নেবে নিজেদেরই হাতে। একবার দেখিয়ে দেবে তারা শুধু মার খেতেই জানে না, দরকার হলে দিতেও জানে।

ধরমবীরের গোলার বাগানে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বসে রইল তারা। ব্যানার্জিবাবু বেঁচে আছে তো?

—হ্যাঁ।

—বাঁচবে তো?

—বলা যায় না।

পাথরের মতো বসে রইল তারা। তারপর সেইখানেই নিয়ে এল তাদের ঘরের ভাত পচানো মদ। রবার্টসের মতো ওদেরও শিরায় শিরায় নেশার আগুন জ্বলতে লাগল। যুদ্ধে ওরাও জয়লাভ করবে, ওরাও দমন করবে ওদের প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে।

রাত বাড়তে লাগল। ধরমবীরের ঘরে আলো জ্বলছে। প্রহর জেগে অনিমেষের শুশ্রূষা করছে ধরমবীর। শালবনের মধ্যে থমথম করছে রাত। বহুদূরে কোথায় হাতীর ডাক শোনা যাচ্ছে—জঙ্গলের ভেতর থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসছে বাঘের গর্জন। শালবনের খসখসে পাতাগুলোতে বাতাসের অশ্রান্ত দোলা, নানা জাতের পোকার অশ্রান্ত ঐকতান। কুলিরা কতগুলো কাপড়ের মশাল জেলে নিয়ে গোল হয়ে বসেছে ধরমবীরের গোলায়। আগুনের আলোয় ওদের কালো মুখগুলোকে ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো অসাড় নিষ্কম্প বলে বোধ হচ্ছে।

ভুল করেছিল রবার্টস।

রক্তবীজের রক্ত পড়েছে মাটিতে। তার প্রত্যেকটি বিন্দু থেকে জেগে উঠছে এক-একটি সৈনিক, এক-একজন শত্রু। অকালে বিনাশ করতে গিয়ে রবার্টস অকালেই জাগিয়ে তুলেছে চামুণ্ডাকে। সাঁওতালের বুকের ভেতরে সাঁওতাল-বিদ্রোহের অতীত ইতিহাস অনুরণিত হয়েছে।

রাত আরো বাড়তে লাগল, একটা একটা করে নিবতে লাগল মশালের আলো। পচাইয়ের হাঁড়ি নিঃশেষিত হয়ে আসতে লাগল। শুধু ব্রোঞ্জের মতো কঠিন মুখগুলো অন্ধকারের ভেতরেও জেগে রইল, জেগে রইল তাদের চোখে আগ্নেয়গিরির আগুন।

পরের দিন।

ভোরের বাঁশি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙল রবার্টসের। নেশাটা কেটে গেছে, মাথা আর ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর। আর তখনি মনে পড়ে গেল অনিমেষের কথা।

কুলি সর্দারকে ডেকে পাঠালো রবার্টস।

—ব্যানার্জিবাবুকে কী করেছিস?

—জঙ্গলে ফেলে দিয়েছি হুজুর।

—জঙ্গলে—কোথায়?

—কালীঝোরার খাদের ভেতর।

যাক নিশ্চিন্ত। কালীঝোরার গভীর খাদ। মানুষপ্রমাণ জল সেখানে। দু'পাশে দুর্ভেদ্য ঝোপ, চারদিকে শালবনের ছিদ্রহীন পত্রাবরণ। আশেপাশে হিংস্র জানোয়ারের অভাব নেই। সুতরাং অনিমেষের জন্য আর ভাবতে হবে না।

—কী বলেছি, মনে আছে তো?

—আছে হুজুর।

—এ কথা যেন বাইরে কেউ টের না পায়। রটিয়ে দিবি ব্যানার্জিবাবুকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

—জী হুজুর।

কুলি সর্দার চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল রবার্টসের। শুধু ঘুষি নয়, ঘুষও দরকার। ভেতরে ভেতরে অনিমেষ কতটা এগিয়ে গেছে কে জানে। অথচ আজকে বড় দুর্দিন। খবরের কাগজের পাতায় আর রেডিয়োতে ক্রমাগত দুঃসংবাদ আসছে। এখান ওখান থেকে আসছে ধর্মঘটের বিবরণ। সুতরাং আরো একটু সতর্ক হওয়া দরকার। কাজ করা দরকার আরো একটু বুদ্ধিমানের মতো। সময়টা সত্যিই বড় খারাপ।

কুলি সর্দারকে আবার ডাকলে রবার্টস।

—এই শোন্।

—কী হুকুম হুজুর?

—তোদের সকলকে আজ মদ খাওয়ার বাড়তি পয়সা দেব আমি। আট আনা করে বেশি মজুরী সকলের মিলবে আজকে—যা বলে দে সবাইকে।

—জী হুজুর।

কুলি সর্দার সেলাম ঠুকলে একটা। অনুগৃহীত হওয়ার একটা ভাব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে সর্বাঙ্গে। কিন্তু সত্যিই কি অনুগৃহীত হয়েছে অতটা? লোকটার চোখেমুখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি যেন খেলা করে গেল, ঠোঁটের কোণে যেন ঝিলিক দিয়ে গেল বিচিত্র একটা হাসির আভাস।

সঙ্গে সঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল রবার্টসের।

—হাসলি যে—এই উল্লুক?

—না হুজুর, হাসিনি তো?

—না? অল-রাইট।—রবার্টস গর্জে উঠল অকস্মাৎ: গেট আউট, রাস্কেল! অর আই উইল শুট ইউ—

কুলি সর্দার সোজা হয়ে দাঁড়ালো, দাঁড়ালো মেরুদণ্ড খাড়া করে। শেষ ঘা পড়েছে। এরপরে আর অপেক্ষা করা চলে না। এর পরে যা করবার তাদেরই করতে হবে।

—জী হুজুর—

বড় বড় পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

সেইদিন সন্ধ্যা।

রোজকার অভ্যাসের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরছিল রবার্টস। বেলা ডুবে আসছে—কাঞ্চনজঙ্ঘাকে রাঙা করে দিয়ে জঙ্গলের ওপারে আস্তে নামছে সূর্য। চমৎকার বাতাস দিচ্ছে—শালফুলের গন্ধটা নেশার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে চেতনায়।

খট্ খট্ করে আসছে ঘোড়াটা, কাঁধে ঝুলছে বন্দুক। বনের সান্ধ্যশ্রী রবার্টসের মনটাকে প্রসন্ন আর প্রফুল্ল করে তুলেছে। গাইতে গাইতে চলেছে সে: টিপ্পারেরি—টিপ্পারেরি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবময় অভিযান-গীতি।

দুদিকে জঙ্গল—মাঝখানে ঝোরা। তার ওপর দিয়ে একটা কাঠের পুল। খট্ খট্ করে বীরদর্পে ঘোড়া পুলের ওপর উঠে পড়ল। রবার্টসের গলার স্বর চড়ল আরো এক পর্দা: টিপ্ প্যারে—রি—

কিন্তু গানটা শেষ করা রবার্টসের কপালে ছিল না।

জঙ্গলের ভেতর থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে দুটো তীর এসে বিঁধল—একটা রবার্টসের বুকে আর একটা পেটে। প্রবল কণ্ঠে একটা অভিশাপ দিয়ে আছড়ে পড়ল রবার্টস। ছুটন্ত ঘোড়ার পা-দানীতে একখানা পা আটকে গিয়ে ঝুলন্ত মাথাটা কাঠের খুঁটিতে আছড়ে আছড়ে চুরমার হয়ে গেল, তার পরেই শেষ আশ্রয়চ্যুত হয়ে দেহটা ঝপাং করে পড়ল বিশ ফুট নিচে কর্দমাক্ত ঝোরার মধ্যে। খট্ খট্ করে বাগানের দিকে ছুটে চলে গেল ঘোড়া, আর ঝোরার কাদাজলটা লাল হয়ে উঠল একটু একটু করে।

তার পরেই আগুন জ্বলল।

আর ঠিক পরের দিন বেলা বারোটার সময় রংঝোরা বাগানে এসে পৌঁছল আদিত্য।

আট

ঘুম ভাঙতেই মণিকাদি তন্দ্রাজড়িত চোখে একবার মাথার দেয়ালের দিকে তাকালেন। টাইমপীসটা নির্ভুল নিয়মেই চলছে, যুদ্ধের এত বিড়ম্বনার মধ্যেও ওর কোনো ব্যতিক্রম নেই। ঘরের ভেতর প্রথম সূর্যের আলো পড়েছে—সকালটা বড় তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে বলে মনে হল।

ঘড়ির কাঁটা বলছে সাড়ে সাতটা। মানে হাতে আর এক ঘণ্টা সময়—নটার সময় ডিউটি দিতে হবে হাসপাতালে। মনটা বিরক্তিতে কালো হয়ে গেল। অভ্যাসবশেই ডাকলেন: খসরু!

ডাকটা আর্তনাদের মতো আছড়ে পড়ল শূন্য ঘরের মধ্যে। তন্দ্রার শেষ রেশটুকুও মিলিয়ে গেছে মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর নির্মম সত্যটা সূর্যের আলোর মতোই প্রতিভাসিত হয়ে উঠল। খসরু পালিয়েছে। সম্রাট শাজাহানের শূন্য তখ্ত-ই তাউস অধিকার করবার জন্যেই বোধ হয় চটপট উঠে পড়েছে দিল্লী এক্সপ্রেসে। অতএব—

অতএব জীবনটা একেবারে নীরস। শুধু নীরস নয়, মরুভূমি এবং সাহারা মরুভূমি। আপাতত এই মুহূর্তে গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, সমস্ত অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠেছে এক পেয়ালা চায়ের জন্যে। খসরু থাকলে এখন কী আর ভাবনা ছিল? দরজার এতক্ষণে কড়া নড়ে উঠত, খসরুর আদেশ আসত: চটপট উঠে পড়ুন দিদিমণি, জল চাপিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যেত পাশের ঘরে স্টোভের গর্জন, নাকে আসত ঘিয়ে-জাগানো মাখন-মাখানো ভাজা টোস্টের গন্ধ। তড়াক করে মণিকাদি উঠে পড়তেন, নিশ্চিন্ত আরামে মন বলে উঠত: আঃ!

কিন্তু—কিন্তু এখন সেসব স্বপ্ন। যুদ্ধ মানুষের অনেক স্বপ্নকেই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, করুক—মণিকাদির আপত্তি ছিল না। কিন্তু আক্রমণটা তাঁর ঘাড়ের ওপরে কেন? উঃ—খসরু! ব্যাটার মনে-মনে এই ছিল। এত করে খাইয়ে-দাইয়ে—এত আদর-যত্ন করে—শেষে এই কাণ্ড! নাঃ—পৃথিবীটা ভালো লোকের জায়গা নয়। সব কৃতঘ্ন—সব বিশ্বাস-ঘাতক।

এমন কি ঘড়িটাও। যেন ঘোড়ার মতো চলেছে। একটু দাঁড়া না বাপু। মোটা মাথায় একটু হাঁফ ছাড়তে দে। কিন্তু ছাড়তে দিচ্ছে কই। দেখতে দেখতে পাঁচ-পাঁচটা মিনিট উড়ে গেল হাওয়াতে। আর দেরি করা চলে না।

মণিকাদি কম্বলটা আস্তে আস্তে নামালো [illegible] ওপর থেকে। অনন্তর আশায় একবার [illegible] মতো তাকালো রান্নাঘরের দিকে। পৃথিবীতে কত বিশ্বাসঘাতকই তো আছে, কিন্তু

এমন একটা কিছু কি ঘটতে পারে না এখন? বিবেকের দংশনে মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছে খসরু। হঠাৎ তার মনে হয়েছে দিদিমণিকে এমন বিপন্ন অবস্থায় ফেলে যাওয়া গুরুতর নৈতিক অপরাধ। আর সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে সে, লাফিয়ে উঠে পড়েছে উজানমুখী গাড়িতে। তারপর ভোরবেলা এসে নেমেছে হাওড়াতে, সোজা চলে এসেছে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের এই বাড়িতে, ঢুকেছে রান্নাঘরে, কেটলিতে জল চাপিয়ে দিয়ে ডাকছে: দিদিমণি—

কিন্তু বৃথা। কলিযুগে মানুষের বিবেক নেই—মির‍্যাক্‌ল-এর দিনও ফুরিয়ে গেছে অনেক-কাল আগে। সুতরাং রান্নাঘর শ্মশানের মতো খাঁ-খাঁ করছে। স্টোভের শব্দ আসছে না, আসছে না পেট আর প্রাণ-জুড়োনো মাখন-মাখানো টোস্টের গন্ধ। শুধু শীতার্ত ঘরটার ভেতরে রাত্রিচর ইঁদুরের গায়ের গন্ধ যেন জমাট ঠাণ্ডার সঙ্গে ঘনীভূত আর বিস্বাদ হয়ে আছে।

মোটা মানুষ মণিকাদি উঠে পড়ল। একটা স্কার্ফ জড়িয়ে নিলে গায়ে। আগে চা-টা করে নিয়ে তারপর যেমন করে হোক সেদ্ধ-ভাত একটা চাপিয়ে দিতে হবে। নটার সময় ডিউটি, ভুললে চলবে না কোন উপায়েই।

শুধু একটা সান্ত্বনা: বাঁকুড়ার ঝি-টা পালায়নি এখনো। তিনকুলে কেউ নেই, পালাবার জায়গাও নেই। তাছাড়া অন্য পেশাও তার আছে বলে মণিকাদির সন্দেহ হয়। একমাত্র সে-ই আছে, কলতলায় বাসন মাজছে ছরছর করে। ও পালালেও মন্দ হত না। সুখের পাত্রটা একেবারে কানায় কানায় ভরে উঠত।

গজগজ করতে করতে মণিকাদি স্টোভ ধরালো। বহু পরিশ্রমে কাপ-পেয়ালা জড়ো করলে একসঙ্গে, খুঁজে আনলে চা-দুধ-চিনির কৌটো। তারপর চায়ে একটা চুমুক দিয়ে চোখ বুজে ভাবতে লাগল: আর কতদিন এভাবে বিড়ম্বনা সহ্য করা যায়? নাকি এবারে পালাতেই হবে কলকাতা থেকে?

কিন্তু সুখ মণিকাদির কপালে ছিল না। দরজার কড়া নড়ে উঠল। হঠাৎ মণিকাদির হৃৎপিণ্ডটা উছলে উঠল একবার। খসরু ফিরে এল নাকি? আহা তা যদি হয়—

কড়া নড়ছে। নাঃ, খসরুর চেনা-হাতের মিষ্টি কড়া নাড়া এ নয়। অত সুখ ভগবান কপালে লেখেননি। নিশ্চয় পেসেন্ট। কপালের ওপরে বিরক্তির রেখাগুলো সংকুচিত হয়ে উঠল অর্ধবৃত্তের আকারে।

—দাঁড়ান আসছি—

এক চুমুকে বাকি চা-টা গিলে নিলে মণিকা। স্কার্ফটা ভালো করে জড়িয়ে নিলে গায়ে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা আঁচড়ে নিলে এক মিনিটে। শাড়ি বদলাবার আর সময় নেই, সভ্যতা-ভব্যতাও রসাতলে গেল মনে হচ্ছে।

দরজাটা খুলল মণিকা। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়ে নয়—[illegible] আলো-জ্বালানো মেয়ে। সুমিতা মিত্র।

—ওঃ, তুই। কী মনে করে রে?

—দর্শন দিতে এলাম।

—দরকার নেই দর্শনে।

সুমিতা ফেরবার জন্যে পা বাড়ালো: চলে যাব নাকি?

হতাশভাবে মণিকাদি বললে, লাভ কী? একটু পরেই তো আবার আসবি জ্বালাতন করতে। তার চাইতে ঘরে আয় বাপু, বোস। যা বকবক করার ইচ্ছে থাকে করে যা।

সুমিতা হাসল: বাঃ, কী চমৎকার অভ্যর্থনার ভাষা। মণিকাদি, জন্মাবার সময় তোমার মুখে কী দিয়েছিল বলতে পারো? নিশ্চয় মধু নয়?

—না, কুইনাইন।

—তাই দেখতে পাচ্ছি। সেই কুইনাইনের জোরেই ডাক্তার হয়েছ তো? শিখেছ লোককে গাল দেবার তৈরি আর চোস্ত বুলি?

—তর্ক করিসনি সুমি—ভেতরে আয়। আমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, ওদিকে হস-পিট্যাল ডিউটির সময় হয়ে গেল।

দুজনে চলে এল ভেতরে। সুমিতা বললে, দিব্যি চায়ের গন্ধ বেরিয়েছে তো। নিশ্চয় একা খাচ্ছ না মণিকাদি?

—নিশ্চয় একা খাচ্ছি। শখ থাকে বানিয়ে নাও নিজের জন্যে।

—তাতে আপত্তি নেই—সোৎসাহে সুমিতা কেটলিটা স্টোভে চাপালো।

—আর শোন্ সুমি—মণিকা আদেশ দিলে: আমার জন্যে দুটো ভাত আর ডিমসেদ্ধ বসিয়ে দিস তো লক্ষ্মীটি। এক্ষুনি খেয়ে বেরুতে হবে।

চা নিয়ে এল সুমিতা। আরাম করে বসল মণিকাদির ডেক-চেয়ারে। বললে, নাঃ, মুখটা তোমার যেমনই হোক না মণিকাদি, আতিথেয়তাটা ভালো। লোক তুমি নেহাৎ মন্দ নও দেখতে পাচ্ছি।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তখন প্রসাধন শুরু করেছে মণিকা। ভ্রূকুটি করে বললে, তোমার সার্টিফিকেটে আমার দরকার নেই। কিন্তু মতলব কী সেইটে আগে বলো দেখি। বিনা কাজে তো পা দাও না। আজ প্রায় সাত দিনের মধ্যে টিকিটিও দেখতে পাইনি।

—বড্ড ব্যস্ত ছিলাম মণিকাদি। নতুন সংসার পেতেছি—তার দায়িত্ব কত, সে তো জানো।

সবিস্ময়ে হাঁ করলেন মণিকাদি : তোর আবার কিসের সংসার রে ?

—বাঃ, সেই চারতলা বাড়িটা ? বিনা পয়সাতে অত বড় একখানা বাড়ির মালিক হলাম, সেটা কি খালি পড়ে থাকবে নাকি ? সংসার গুছিয়ে নিতে হবে না ?

—সংসার গুছিয়ে নিলি ? বর পেলি কোথায় ?

—বর জুটল না—হঠাৎ সুমিতার প্রসন্ন হাসিটা যেন ম্লান হয়ে এল : কিন্তু বর না থাকলেই কি আর সংসার হয় না ? একবার গিয়ে দেখে এসো না—দেখলে আর ফিরতে চাইবে না।

—দরকার নেই দেখে—ঐকান্তিক তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করলে মণিকা : কতগুলো বাউণ্ডুলে ছেলেমেয়ে জুটিয়ে নিয়ে ওখানে পলিটিক্স করছিস তো। সবসুদ্ধ একদিন জেলে যাবি, এই একখানা কথা বলে রাখলাম।

সুমিতা বললে, তা তো যাবই। কিন্তু তুমি অ্যাপ্রুভার হয়ো, গায়ে আঁচড়টাও লাগবে না—বরং পরকালের কাজ হয়ে যাবে।

কী ভেবে হঠাৎ মুখ ফেরালো মণিকা।

—একটা কথা শুনবি সুমিতা ?

—কী কথা ?

—বল্ শুনবি কথাটা ?

সুমিতা হেসে ফেলল : মুখ অত গম্ভীর করছ কেন ? ভাবটা যেন বলে ফেলবে আমার সাসপেক্টেড 'টি-বি'র লক্ষণ দেখেছ।

—নাঃ, ঠাট্টা নয়।—মণিকার মুখে গাম্ভীর্যের মেঘ তেমনি ঘন হয়েই রইল : আমার কথাটা শোন্। বিয়ে করে ফেল্।

—বিয়ে !—সুমিতার শরীরের ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। এমনভাবে চমকে উঠল যে, আর একটু হলে হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটাই আছড়ে পড়ত ঝনঝন করে।

—হ্যাঁ, বিয়ে। এসব করে কোন লাভ নেই।

জোরে—অনেকটা যেন জোর করেই, সুমিতা হেসে উঠল : মণিকাদি, আজকাল ডাক্তারী ছেড়ে ঘটকালির পেশা নিয়েছ নাকি ? কিন্তু আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছ কেন ? নিজের ইচ্ছে হয়ে থাকে বলো, আমি পাত্র জুটিয়ে আনি।

—বয়েস নেই, থাকলে তোর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে থাকতাম না। কিন্তু তোর তো সময় যায় নি। শোন্ সুমি, এর পরে যেদিন ক্লান্ত হয়ে উঠবি, সেদিন মুক্তি নিবি [illegible] জীবন থেকে।

সুমিতা বললে, তোমার উপদেশ মনে থাকবে। কালই কাগজে বিজ্ঞাপন দেব পাত্র চাই

[illegible]। দেখি কোন্ নবীন-[illegible] কার্তিক বরমাল্য নিয়ে আসেন আমার কাছে।

মণিকাদি বললেন, আচ্ছা, বিয়ে করতে আপত্তি কী?

—কিছু না। কিন্তু আমার এমন কপালে মণিকাদি—বর আর ধরা দিল না, ছিটকে পালিয়ে গেল। তাই তো তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—অলিতে-গলিতে, আলোয়-অন্ধকারে। যদি কোনদিন ধরা দেয়, তুমি খবর পাবে বৈকি। কিন্তু এ যাত্রা বোধ হয় নিতান্তই শ্মশান-বান্ধব।

সুমিতা হঠাৎ উঠে পড়ল: দেখি তোমার ভাতটা হয়ে গেল কিনা।

ভাত কিন্তু সত্যিই হয়নি। চড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাত যে ফোটে না, এ কথাটা মণিকাও জানে, সুমিতাও জানে। তবু সুমিতা সরে এল—পালিয়ে এল। কাল সারারাত মনের মধ্যে ঘুরেছে রমলা আর বাসুদেবের কথা। বাসুদেব আত্মহত্যা করতে চায়। কিন্তু বুক ফেটে মরে গেলেও অনিমেষ ফিরে তাকাবে না। ফুলের মধ্যে তার বজ্র লুকিয়ে আছে।

অন্যায় হচ্ছে—অত্যন্ত বেশি প্রশ্রয় পাচ্ছে এলোমেলো ভাবনাগুলো। এ উচিত নয়, একে দমন করা দরকার। চারতলা বাড়ির অত বড় সংসারের মধ্যেও মনটাকে সে ডুবিয়ে দিতে পারছে না, থেকে থেকে বিদ্রোহ করে উঠছে। সে কি দুর্বল—রমলার চাইতেও দুর্বল?

আজ সকালে সে কেন ছুটে এল মণিকাদির এখানে? কী প্রয়োজন ছিল? এইখানেই অনিমেষের সঙ্গে তার শেষবারের মতো দেখা হয়েছিল বলে? সাতদিন হতে চলল আদিত্যদার কোন খবর নেই, অনিমেষেরও না। সে কি অবচেতন মনের ভেতর থেকে একটা আশা পোষণ করছিল যে, এখানে এলেই ওদের কিছু একটা খবর পাওয়া যাবে? হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত অভিশপ্ত, অত্যন্ত অসহায় বলে মনে হল সুমিতার। এগোতে পারছে না, পিছিয়ে যাবারও উপায় নেই। এ কি বিড়ম্বনা পেয়ে বসল তাকে?

হঠাৎ মণিকাদির ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। সুমিতা শুনতে পেল মণিকা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। তার পরেই তীব্র উত্তেজনা উৎকণ্ঠায় মণিকা ডাকলে, সুমি!

সুমিতা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। সমস্ত চেতনাটা চকিত হয়ে উঠেছে: টেলিফোনে কার খবর এল কে জানে। আদিত্যের, না অনিমেষের?

—কী হল মণিকাদি?

—একটা ভয়ানক দুঃসংবাদ আছে সুমি।

সুমিতার মুখ থেকে রক্ত সরে গেল, বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল। কথা বলতে পারল না, শুধু মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বিহ্বলভাবে।

—লীলা [illegible] পেয়েছে। হাসপাতাল থেকে ফোন করেছে আমাকে।

মনের ভেতর থেকে ভয়ের গুরুভার পাথরটা নেমে গেল, কিন্তু জেগে উঠল অপরিসীম বিস্ময়। সুমিতা বললে, শীলা ? কোন শীলা ?

—আমাদের শীলা রে। সেই যে শশাঙ্ক লাহিড়ীর—

—বুঝতে পেরেছি।—সুমিতার গলায় বেদনার সুর ফুটে উঠল : কিন্তু অমন শান্তশিষ্ট মেয়েটা আফিং খেতে গেল কেন ? শশাঙ্ক কী করছে ?

—শশাঙ্কের কোন খবর নেই।

—খবর নেই ?

—না, পালিয়েছে। কলকাতায় বোমা পড়বে—সেই ভয়ে আগে থাকতেই তার দামী দুর্মূল্য জীবনটা নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধতা। দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কেউ কোন কথা বলতে পারছে না। শশাঙ্ক লাহিড়ী পালিয়েছে। বীরের মতো অসবর্ণ বিয়ে করে—বাপের অত বড় সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে সমাজে একটা আদর্শ স্থাপন করেছিল শশাঙ্ক। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে এবং এই যুদ্ধের সুযোগে শশাঙ্ক সে-সীমাটাকে বুঝে ফেলেছে। বহু কষ্টে ক্ষিতি-অপ-তেজঃ থেকে সংগ্রহ করা দামী দুর্লভ প্রাণ। তাকে এত সহজে হারালে চলবে না, বরং জীইয়ে রাখলে ভবিষ্যতে অনেক শীলা আসবে। কারণ শশাঙ্কের রূপ আছে, শশাঙ্কের টাকা আছে এবং শশাঙ্কের অভিনয় করবার ক্ষমতা আছে।

সুমিতা হঠাৎ হেসে উঠল।

—যাক, বিবাহিত জীবনের চরম পুরস্কার পেল শীলা। এর পরে আমার পত্রপাঠ বিয়ে করে ফেলা উচিত, কী বলো মণিকাদি ?

মণিকা কথা বললে না, ব্যথায় সমস্ত মুখটা পাণ্ডুর হয়ে গেছে। তার পরেই পায়ে গলিয়ে নিলে একটা স্যাণ্ডাল, হাতে তুলে নিলে তার ডাক্তারী ব্যাগটা।

—একবার যাবি সুমিতা ? দেখে আসবি ?

—চলো। বাঁচবে তো ?

—জানি না। ওরা স্টমাক পাম্প দিয়েছিল, কিন্তু বেশি তুলতে পারেনি। অনেকটাই কনজিউম করে ফেলেছে তার আগে। মরুক, ওর মরাই ভালো—। অনেক কষ্ট পেয়েছে, এবার রক্ষা পাবে।

ঘরে তালা দিয়ে দুজনে রাস্তায় নেমে এল। নির্জন নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার। বন্ধ আর শূন্য বাড়িগুলো যেন ভয়াতুর চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে শূন্য দিগন্তের চক্রবালে—যেখানে মৃত্যুবজ্র বহন করে জাপানী বিমান দেখা দেবে। লোহার বিচ্ছিন্ন বেঞ্চগুলো সব ফাঁকা—মরা ঘাসে রাত্রির শিশির ঝিকমিক করছে। ব্যথাবিদীর্ণ ভয়ার্ত কলকাতার চোখের জল যেন ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে দিকে দিকে।

প্রায় নির্জন পথ দিয়ে চলল দুজনে। কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে ট্রাম ধরতে হবে—ওখান থেকে বেলগাছিয়া।

—খেয়ে নিলে না মণিকাদি?

—এসে খাব।—মণিকার স্বর ক্লান্ত শোনালো।

সুমিতা ভাবছে শীলার কথা। অবশ্য ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, তবু চিনত শীলাকে। ছোট একটুকরো মেয়ে—। কথা বলে না, চুপ করে শোনে, মিষ্টি করে হাসে। ভীরু চোখ, শান্ত স্বভাব। বলার চাইতে অনুভব করে বেশি। লেখাপড়া শিখেছে, তবুও গৃহকপোতী। পথে নামলে কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়—বাইরের পৃথিবীটাকে ভয় করে, নিজেকে অনুভব করে একান্ত অসহায় বলে। তিনপুরুষ কলকাতায় কাটিয়েছে, তবু চাল-চলন দেখলে মনে হয় যেন গ্রামের একটি ছোট মেয়েকে হঠাৎ মহানগরীর এই জীবন-স্রোতের মধ্যে টেনে আনা হয়েছে—এখানে সে যেমন বেমানান তেমনি অসঙ্গত।

সেই শীলা। হঠাৎ এ কী করে বসল। অমন ভীরু ছোট মেয়েটা—পরিবারের শাসন মানল না, বাঘের মতো বিশুদ্ধ ব্যুরোক্র্যাট বাপের তর্জনকে ভয় করলে না, সমাজকে অস্বীকার করলে, বেরিয়ে এল শশাঙ্কের হাত ধরে। সেদিন সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল—জলভরা মেঘে যে প্রচ্ছন্ন বজ্র থাকে, এই সত্যটাকে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এই জোরটা কি এসেছিল শীলার নিজের ভেতর থেকেই? না—এই শক্তি সে পেয়েছিল শশাঙ্কের কাছ থেকে, পেয়েছিল তার প্রেম থেকে? ভালোবাসা শীলার জন্মান্তর ঘটিয়েছিল, ভীরু মেয়েটির ভেতর থেকে আর একজনকে জাগিয়ে তুলেছিল—যে কাউকে ভয় পায় না—পৃথিবীকে নয়, সমাজকেও নয়।

নিশ্চয় তাই—সুমিতা ভাবতে লাগল: নিশ্চয়ই তাই। নিজের জীবনেও এই সত্যটাকে সে বুঝতে পেরেছে। অ্যাডোনিসের ভেতরেও হার্কিউলিস জাগে। লীলাসঙ্গিনী হয় বিপ্লবী-নায়িকা। হাত থেকে লীলাকমল ঝরে গিয়ে সেখানে আসে তলোয়ার। সে তলোয়ার অগ্নিদীপ্ত—বজ্রের চাইতেও গুরুভার। তবু তাকে বহন করতে হয়, সেই দানকে গ্রহণ করতে হয়। 'কী পেলি তুই নারী' বলে আক্ষেপ করা বৃথা—চোখের জল মূল্যহীন।

কিন্তু নিজের কথা থাক। শীলা ভুল করেছিল। শশাঙ্ক ওকে লীলাকমল দেয়নি, তলোয়ারও নয়। যা দিয়েছে, তা বঞ্চনা। তাই আজ নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে শীলাকে। আফিং খেয়েছে। হয়তো বাঁচবে—হয়তো বাঁচবে না।

মণিকাদির অসন্তুষ্ট গুঞ্জনে চমক ভাঙল সুমিতার।

—মোটা মানুষ, হাঁটতেও পারি না ছাই। একটা রিকশা যদি পাওয়া যেত—কিন্তু বৃথা আশা। রিকশা আছে, চলছেও অনেক, কিন্তু সব উজানের স্রোতে। বাক্স-প্যাটরা আর বাক্স-প্যাটরার সামিল মানুষ। হাওড়া-শেয়ালদার মুক্তিপথ দিয়ে খাঁচায়-বন্দী মহাপ্রাণীগুলো

উড়ে পালাচ্ছে। চার আনার রিকশা আড়াই টাকা।

মণিকা বললে, কী আর করবে, হেঁটেই চলো—একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ভাবটা এই : যেন সুমিতারই কষ্ট হচ্ছে—তাকে একটা রিকশাতে চাপিয়ে দিতে না পারলে মণিকার মন শান্তি পাচ্ছে না।

সুমিতা সান্ত্বনা দিয়ে বললে, চলো, আর দু-পা রাস্তা—এক্ষুনি তো ট্রাম পাবে।

—অগত্যা।

শীলা। সুমিতা ভাবছে : এই যুদ্ধ অনেক সত্যকে অনাবৃত করল, মুখোশ খুলে দিলে অনেক মিথ্যার, উজ্জ্বল আর নির্মল করে তুললে অনেক বিভ্রান্তিকে। যেন সুমিতা বেঁচে গেছে—যেন একটা ভার নেমে গেছে কাল সারারাত্রির বিনিদ্র অস্বস্তিটার ওপর থেকে। ভালোই করেছে অনিমেষ—রক্ষা করেছে একটা স্বপ্নভঙ্গ থেকে—হয়তো শীলার মতো আফিংয়ের হাত থেকে।—সেও তো রোমান্টিক ছিল, তারও তো এই রকম বিহ্বল আত্মবিস্মৃতি ছিল। কিন্তু অনিমেষ নিজেকে বাঁচিয়েছে, তাকেও বাঁচিয়েছে। লীলাকমল নাই রইল—নাই-বা রইল পদ্মপর্ণে নিজের স্বপ্ন-কামনার রক্তরাগ। তার চাইতে ঢের বড় সত্য হাতের এই তলোয়ার। আত্মরক্ষা করতে পারে, আঘাত করতে পারে—আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারে।

নিঃশব্দে পথ কাটতে লাগল। সুমিতা ভাবছে—মণিকাও ভাবছে। গাড়ির স্রোত চলেছে স্টেশনের দিকে, ওই পথ দিয়েই পালিয়ে গেছে শশাঙ্ক। পালিয়ে গেছে অনেক অসত্য—অনেক মিথ্যা—অনেক অভিনয়ের নিপুণ আর নিখুঁত চতুরতা।

মোড। ট্রাম এল। যাত্রীর ভিড় নেই—দুজনে তেমনি নীরবে ট্রামে উঠে বসল।

হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকালো সুমিতা। ন'টা বাজে। তার সংসার এখন মুখরিত। ছেলেমেয়েরা একদল খেয়ে-দেয়ে এখুনি বেরিয়ে যাবে। ওদের শীলার কথা ভাববার সময় নেই—সুমিতার হৃদয়ের কথাও না। তার চাইতে ঢের বড়, অনেক বড় কথা ওরা ভাবছে। দেশ। দেশ ছাড়িয়ে মহাদেশ, মহাদেশ ছাড়িয়ে পৃথিবী। ওরা সেই দিনটাকে স্বপ্নে দেখতে পাচ্ছে—যেদিন পৃথিবীতে সব মিথ্যা—সব অপমান—সব উৎপীড়নের সমাপ্তি হয়ে গেছে—যেদিন শীলারা এত সহজে ভুল করে না, আর যদি ভুলই করে, তাহলে আত্মহত্যা করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। এদের নিয়েই সুমিতার সংসার—এদের স্বপ্নই আগামী কালের, আগামী পৃথিবীর সংসার।

আর শীলার সংসার। ঠুনকো কাঁচের মতো ভেঙে পড়ল মাত্র একটি আঘাতে। এতটুকু ভর সইলো না। চোরাবালির বনিয়াদ শিথিল হয়ে এক মুহূর্তে মাটির তলায় দুজনকে টেনে নিয়ে গেল।

মনের দিক থেকে হঠাৎ যেন জোর পেল সুমিতা। হঠাৎ যেন পুঞ্জীভূত আলস্য আর

জড়তা—দ্বিধা আর অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে সে পথ খুঁজে পেল। সে শক্তি ফিরে পেয়েছে। শীলার সংসার ভাঙবে না—মরবে না শীলা। সে বেঁচে উঠবে—সামগ্রিক সংসারের নতুন ইঙ্গিত—নতুন সম্ভাবনায় ধন্য হয়ে উঠবে।

শীলা মরবে না।

কিন্তু শীলা বাঁচলো না। ওরা যখন পৌঁছুল, তার দশ-পনেরো মিনিট আগেই শীলা মরে গেছে। হাসপাতালের লোহার খাটে শাদা-চাদরে বুক পর্যন্ত ঢেকে সে ঘুমিয়ে আছে। স্টম্যাক টিউব বসানোর চেষ্টায় গালের একদিকে একটুখানি চিরে গিয়েছিল—সেখানে একটুখানি কালো রক্ত জমাট বেঁধে আছে শুধু। আর কোনোখানে কোনো বৈলক্ষণ্য নেই—ঘুমিয়ে আছে শীলা। শশাঙ্ককে নিষ্কণ্টক করেছে, নিজেকে ভারমুক্ত করেছে।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন মণিকাদি। সুমিতা শুধু চিত্রকরা চোখে তাকিয়ে রইল শীলার মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের দিকে।

ডাক্তার বললেন, অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল মিস সেন—বাঁচানো গেল না। অনেকটা আফিং খেয়েছিল, খবরও পাওয়া গিয়েছিল ঢের দেরিতে। ততক্ষণে রক্তের ভেতরে ছড়িয়ে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে ডাক্তার আবার বললেন, শুধু আত্মহত্যাই করেনি, সি হ্যাজ অলসো কিল্ড এ চাইল্ড উইথ হার।

আবার একটা আর্তনাদ। এবার শুধু মণিকা নয়, সুমিতাও।

শীলা মরে গেছে। সেই সঙ্গে ধ্বংস করে গেছে শশাঙ্কদের পাপ—শশাঙ্কদের বীজাণু। বড়লোক শশাঙ্ক—অভিজাত শশাঙ্ক, মেয়েদের জীবন নিয়ে যারা অসংকোচে ছিনিমিনি খেলতে পারে সেই শশাঙ্ক। কিন্তু এক শীলাই কি নিজেকে বলি দিয়ে নীল রক্তের এই অভিশাপকে ধ্বংস করতে পারবে? এত সহজেই কি এর সমাপ্তি? সুমিতা ভাবতে লাগল: এত সহজেই কি এই রক্তবীজেরা পৃথিবী থেকে অপসৃত আর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?

খোলা জানলা দিয়ে সূর্যের আলো শীলার মুখে এসে পড়েছে। এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে ওই সূর্য—পৃথিবীর আদিম দিনে তামস-বিজয়ী যে সূর্যকে অগ্নিমন্ত্রে বন্দনা করা হয়েছিল; অন্ধকারের পরপার থেকে অমৃতরূপে যে হিরণ্ময় দ্যুতির আবির্ভাব—যার ত্রিকালদর্শী নিরঞ্জন দৃষ্টি অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে স্পষ্ট আর প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে।

* * *

রমলার ঘুম ভাঙল কবি ইন্দুর কণ্ঠস্বরে।

রাত্রির সেই ভীরু লাজুক কবিটি আর নেই। এখন ওর মধ্যে দ্বিতীয় সত্তা জেগেছে। চিৎকার করে সমস্ত বাড়িটা মাথায় করে তুলেছে, মনে হচ্ছে যেন মারামারি বাধিয়েছে। কিন্তু মারামারি নয়, কাকে যেন একটা প্রাণপণে দুরূহ রাজনীতির জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানা-

লোক বিতরণ করছে।

রমলা ঘর থেকে বেরিয়ে বললে, কী শুরু করেছ ইন্দু? মানুষকে কি একটু ঘুমোতেও দেবে না?

ইন্দু বললে, বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমোবে মানে? ওসব জমিদার-গিন্নীর চাল ছাড়ো।

—না, শেষ রাত্রে উঠে তোমার মতো চ্যাচাতে শুরু করব। কবির ইমোশনটা যখন রাজনীতির ওপব গিয়ে পড়ে, তখন তার চাইতে মারাত্মক দুর্ঘটনা পৃথিবীতে আর ঘটতে পারে না।

ইন্দু বললে, যাও—যাও।

—বটে?—রমলা হাসল : তাহলে শোনো :

হংস মিথুন, নীড়ের ঠিকানা কই —

অসীম সাগর—

ইন্দুর কান লাল হয়ে উঠল : রমলাদি, থামো।

—থামবো মানে?—আড়চোখে কবির বিব্রত বিপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে রমলা বলে চলল : অসীম সাগর দুলিছে পাখার নিচে—

প্রচণ্ড রাজনৈতিক ইন্দু মুহূর্তে ছেলেমানুষ হয়ে গেল। আলোচনার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেছে। দেখতে দেখতে সামনে থেকে পালিয়ে মান এবং কান বাঁচালো। ওর পলায়ন দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল রমলা। কত সহজেই মানুষটাকে যে বিব্রত করে তোলা যায়!

সুমিতার ঘরের সামনে এসে ডাকলে, সুমিতাদি।

ঘর থেকে বেরুল.শোভা : সুমিতাদি সকালে বেরিয়ে গেছে।

—কখন ফিরবে?

—বলে যায়নি।

রমলা খানিক্ষণ,দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিতভাবে। কী করবে বুঝতে পারছে না। একটা অদ্ভুত দো-টানায় বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছে। সুমিতা নেই, সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল যেন তার নোঙর ছিঁড়ে গেছে—এই স্রোতের ভেতরে নিজেকে সে সামলাতে পারছে না। সুমিতা যেন ওর শক্তি—ওর আশ্রয়। একদিকে বাসুদেব, অন্যদিকে আদর্শ। কোন্ পথে যাবে সে—আত্মরক্ষা করবে কী উপায়ে?

বাসুদেবের সঙ্গে এনগেজমেন্ট। রমলা করেনি, বাসুদেবই করেছে। বলেছে কাল আটটার মধ্যে আসবে কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণ কোণায়। আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকব। যদি না আসো, তাহলে জীবনে আর কোনদিন আমাকে দেখতে পাবে না।

বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতেই কথাগুলো বলেছে বাসুদেব। বুকে হাত দিয়ে, চোখের কোণা

ছলছলিয়ে, গলার স্বরে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার অনিবার্য ইঙ্গিত এনে। সুস্মিতার কথা সত্যি, খানিকটা অভিনয় করেছে বাসুদেব। কিন্তু সবটাই অভিনয় নয়। নিজের কথাটাকে প্রাণ দিয়ে বোঝাতে গেলে খানিকটা অভিনয় আসবেই—এটা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য।

বাসুদেবের চোখে কাতরতা—বাসুদেবের সমস্ত মুখ একটা সঙ্কল্পে নিষ্ঠুর। বেশ বোঝা যাচ্ছে, রমলাকে না পেলে নিজেকে ক্ষমা করবে না, নিজের ওপর একটা নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে প্রস্তুত হয়ে আছে। কথাটা কল্পনা করেও রমলার অন্তরাত্মা চমকে উঠল।

ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। আর আধ ঘন্টা সময়। যাবে কি যাবে না? আদর্শ আর সঙ্কল্পকে একেবারে বিসর্জন দেবে, না বাঁধা পড়বে বাসুদেবের জীবনে? এ সময়ে সুস্মিতা থাকলে কাজ হত। সুস্মিতার মধ্যে শক্তি আছে—জোর আছে। তবু—

তবু মনে হয়েছে সুস্মিতাও একেবারে খাঁটি নয়। কোথায় যেন তারও ভাঙন আছে, অন্তত কাল রাত্রে তাই মনে হল। কাকে ভালোবেসেছে সুস্মিতা? আদিত্যদাকে? কে জানে?

কিন্তু কী করবে রমলা? বাসুদেব প্রতীক্ষা করবে। যদি না যায়, তাহলে বাসুদেব কী করে বসবে, কে জানে। তার জন্যে একটা মানুষ অসময়ে জীবনটাকে শেষ করে দেবে—না:, অসম্ভব। অন্তত একবার দেখা করে আসা যাক, একবার বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করা যাক যে এম. এ. পাস করে কলেজের অধ্যাপক হয়ে এসব ছেলেমানুষি শোভা পায় না। জীবনটাকে সহজভাবে দেখতে শিখুক বাসুদেব, বুঝতে শিখুক যে—

একটা অজ্ঞাত টানেই রমলা বেরিয়ে পড়ল।

বাসুদেব ঠিকই অপেক্ষা করছিল, ঘন ঘন অধৈর্যভাবে তাকাচ্ছিল হাতের ঘড়িটার দিকে। রমলাকে আসতে দেখে তার আগ্রহ-ব্যাকুল দুই চোখে যেন আলো জ্বলে উঠল।

—এসেছ?

রমলা ম্লান বিষণ্ণ গলায় বললে, হাঁ, আসতেই হল।

বাসুদেব বললে, চলো।

—কোথায় যেতে হবে?

—চলো, কথা আছে।

একটা ট্যাক্সি নিলে বাসুদেব। দুজনে এল চৌরঙ্গীতে—ঢুকল একটা নিরিবিলি ছোট রেস্তোরাঁয়।

রমলা বললে, আমি কিছু খাব না।

—খাবে না? বেশ, আমিও খাব না।

—অমনি রাগ হল? আচ্ছা, তাহলে চা নাও দু পেয়ালা।

চায়ের কথা বলে দিয়ে বাসুদেব একবার নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকালো রমলার দিকে। তারপরে সোজা পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কী ঠিক করলে ?

রমলা টেবিলটার ওপরে নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে লাগল, জবাব দিল না।

বাসুদেব নাছোড়বান্দা। বললে, কী ঠিক করলে ?

—তুমি ফিরেই যাও।

—আর তোমার কিছু বলবার নেই ?

রমলা বললে, না।—তার গলা কাঁপতে লাগল।

—আমার চাইতেও তোমার কাজ বড ?

রমলা আবার চুপ করে রইল। এ কথার জবাব দেবে কি, জবাবটা তার নিজেরই জানা নেই। কে বড়, কে ছোট এটা যদি বুঝতে পারত তাহলে অনেক আগেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। বুঝতে পারেনি বলেই তো এই বিপত্তিটা দেখা দিয়েছে।

—স্বীকার করি, যে কাজ তুমি করছ, তার দাম আছে। নিজের দেশকে ভালোবাসি না, এমন অকৃতজ্ঞ আমি নই—বাসুদেবের গলা আবেগে কাঁপতে লাগল: কিন্তু এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। সব কাজ সকলের জন্যে নয়। আমাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেবার কী অধিকার তোমার আছে, সেই কথাটাই স্পষ্ট করে তোমার মুখ থেকে জানতে চাই রমলা।

রমলা মুখ তুললে। গালের দুপাশে উত্তেজিত রক্তের কণিকা এসে জমেছে। সে নিজেই দুর্বল—নিজের কাছে নিজেই একান্তভাবে অসহায়। বাসুদেবকে কেমন করে সংযত করবে, কেমন করে জয় করবে ?

—কিন্তু আমি ছাড়া আরো তো মেয়ে আছে—রমলা আস্তে আস্তে বললে কথাটা। কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই কেমন অপরিচিত আর বেখাপ্পা ঠেকল। সত্যিই আজ যদি সে শুনতে পায় যে, বাসুদেব আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হয়েছে, তাহলে মনের দিক থেকে সে কি সুখী হতে পারবে একবিন্দুও ?

বাসুদেব উত্তেজিত গলায় বললে, মেয়ে অনেক আছে, কিন্তু তাদের সবাইকে আমি ভালোবাসিনি। অনর্থক ওসব কথা বোলো না রমলা, অকারণে আমাকে আঘাত দিয়ো না।

রমলা বললে, আঘাত কেন পাও ? কেন সহজভাবে বিদায় করে দিতে পারো না আমাকে ? তোমার জীবন থেকে, তোমার কামনা থেকে ?

বাসুদেব যেন হিংস্র হয়ে উঠল: সেইখানেই তো আমার কাল হয়েছে। তা যদি পারতাম, তাহলে কোন সমস্যাই আজকে আর দেখা দিত না। অবজ্ঞা করতে পারি না, ভুলতে পারি না, আঘাত করে সান্ত্বনা পাই না। ওতেই আমার মরণ হয়েছে—

বাসুদেব আরো কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হল না। চায়ের ট্রে নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢুকল।

রমলা দু পেয়ালায় চা ঢাললে। একটা চুমুক দিয়ে বাসুদেব বললে, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। অনেক বিরক্ত করেছি, আর করব না। আজ শুধু শেষ কথাটা শুনে যেতে চাই।

রমলা মৃদু গলায় বললে, আমার কথা তো শুনেইছ। অনেক কাজ—অনেক দায়িত্ব। এখন এসব ফেলে দিয়ে নিজের সুখ আমি বেছে নিতে পারব না।

বাসুদেব খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল—তার হতাশাক্ষিপ্ত জলন্ত চোখের আগুন যেন দগ্ধ করতে লাগল রমলাকে। আর রমলা রইল মথা নত করে—বাসুদেবের ওই অগ্নিময় চোখের দিকে তাকাবার সাহস পর্যন্ত তার নেই। শুধু দুজনের চায়ের পেয়ালা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, চায়ের সুরভিত ধোঁয়া কতগুলো এলোমেলো সর্পিল রেখায় উঠে ঘরময় ছড়িয়ে যাচ্ছে। আর কানে আসছে চৌরঙ্গীর ট্রাফিকের অবিরাম গর্জন।

বাসুদেব বললে, এই শেষ কথা?

রমলা জবাব দিলে না।

বাসুদেবের মুখে দৃঢ়সঙ্কল্পের একটা কঠিনতা ব্যঞ্জিত হয়ে উঠল। পরক্ষণেই পকেটে হাত দিয়ে একটা ছোট শিশি সে বের করে আনল। নীল রঙ, চ্যাপ্টা ছিপি।

—দেখেছ?

—এ কী!

রমলা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

প্রশান্ত নিরুদ্বিগ্ন গলায় বাসুদেব বললে, হাইড্রোসায়ানিক। ভালো জিনিস, বেশি সময় লাগবে না।

সভয়ে রমলা বাসুদেবের হাত আঁকড়ে ধরলে, না—না।

বাসুদেব তেমনি নিরাসক্ত গলায় বললে, তোমার ক্ষতি কী! তোমার আদর্শ আছে, সঙ্কল্প আছে। এ তোমার মনেও থাকবে না। পৃথিবীতে কত মানুষই তো প্রত্যেক দিন এমনি করে মরে যাচ্ছে, তাদের জন্যে কে আর চোখের জল ফেলতে যাচ্ছে বলো?

এতক্ষণে রমলা বাসুদেবের হাত থেকে জিনিসটাকে আয়ত্ত করে ফেলেছে। বাসুদেব কিন্তু জোর করেনি, খুব সামান্যতেই তার হাতের মুঠি আলগা হয়ে গেছে।

রমলা বললে, না।

—আমাকে মরতেও দেবে না?

—না।—রমলার চোখ এবারে জলতে লাগল: ভেবেছ ইচ্ছে করলেই পারো?

—আমার ওপরে তোমার দাবি আছে?

—নিশ্চয়।

আধ ঘণ্টা পরে সেই ট্যাক্সিটাই আবার বেরিয়ে পড়ল রাজপথে। চলো গড়ের মাঠে, চলো লেকে। যুদ্ধ এসেছে, দুর্দিন এসেছে—তাতে ক্ষতি কী! জীবন এখনো রিক্ত হয়ে যায়নি—প্রেমের মৃত্যু ঘটেনি এখনো। সমস্ত দুঃখ সমস্ত ব্যথার অন্ধকারে মৃত্যুঞ্জয় ভালোবাসা ধ্রুবতারার মতো চিরজাগ্রত হয়ে আছে।

নয়

আদিত্য যখন রংঝোরা বাগানে এসে দাঁড়ালো, তখন সেখানে একেবারে প্রলয় কাণ্ড চলছে।

রবার্টসের বিকৃত মৃতদেহটা জলের থেকে তুলে আনা হয়েছে পরদিন সকালে। খবর গেছে থানায়। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে পুলিস। ব্যাপারটা তুচ্ছ করবার মতো নয়। সাধারণ হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ে একে ফেলা চলবে না, এর ভেতরে বিরাট একটা ব্যঞ্জনা লুকিয়ে রয়েছে। শহরের পথঘাটে, মিলে, ফ্যাক্টরীতে দিনের পর দিন যে আগুন অলক্ষ্যে ধূমায়িত হয়ে উঠছে—এ তারই একটি বহ্নিস্ফুলিঙ্গ। সুনিশ্চিত এবং আশঙ্কাজনক।

রবার্টসকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু শুধু রবার্টসকে নয়—এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে একটা প্রবল ও প্রকাণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান। অপমানিত মানুষের রক্তে রক্তে সাড়া উঠেছে—শ্রেণী-সংঘাতের সাড়া। বিপ্লবের লাল ঘোড়া দিগন্তের আকাশে ঝোড়ো মেঘের কেশর ফুলিয়েছে। এখন থেকে এর প্রতিবিধান না করলে কল্পনাতীত পরিণাম অপ্রত্যাশিত নয়।

ওদিকে বর্মা ফ্রন্টে দুঃসংবাদ। রেঙ্গুনের পতন হয়েছে, মান্দালয়ের ওপরে চলেছে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ। মিত্রবাহিনী এক পা এক পা করে "শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চাদপসরণ" করছে আসামের দিকে। ব্রিটিশ সিংহ ঔপনিবেশিক সুপ্তি-গুহা থেকে চমকে জেগে দেখতে পাচ্ছে সামনে বন্দুকের উদ্যত নল।

সুতরাং ঘরের বিদ্রোহ আগে দমন করা দরকার। বাইরের আঘাতে যখন চারদিক টলমল করছে, তখন যদি সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতটাও নড়ে ওঠে, তখন পরিণামে ইংলিশ-চ্যানেলে আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। উইনস্টন চার্চিলের মেঘমন্দ্র আশ্বাস-বাণীতেও নয়।

রবার্টসের হত্যার মধ্যে এতগুলি সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

চারদিকে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে ইয়োরোপীয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। এই যদি সূত্রপাত হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিলক্ষণ উৎকণ্ঠিত হওয়ার

কারণ আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কি সত্যি সত্যিই লালবাতি জ্বালিয়ে লিকুইডেশনে গেল নাকি? ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয়ানদের নিশ্চিন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যকেও কি এমনি করেই লাল-বাতি জ্বালতে হবে? এর মধ্যে নীল বিদ্রোহের পূর্বাভাস লুকিয়ে নেই তো?

অতএব থানা আর সদর উজাড় করে পুলিস এসে পড়েছে।

ইতিমধ্যে আদিত্য এসে পৌঁছেছে রংঝোরা বাগানের দরজায়। একরাত্ত একবেলা অসহ্য ট্রেনের কষ্ট গেছে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেটে কিছু পড়েনি। তার ওপর তিন মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছে—ক্লান্তিতে যেন সর্বাঙ্গ ভেঙে পড়ছে আদিত্যের।

কিন্তু বাগানের গেটের সামনেই জমেছে লাল-পাগড়ী। সেই সঙ্গে একদল কুলি। শহরের ইয়োরোপীয়ান ডি-এস্‌-পি একখানা টেবিল পেতে নিয়ে জেরা করছেন তাদের। যেটা বাংলাতে ভালো আসছে না, সেটার ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন দারোগা এবং যাদব-ডাক্তার। বাগানের অন্যান্য বাবুদের চাইতে পুলিসের সহযোগিতায় যাদব-ডাক্তার বেশি অগ্রণী। রবার্টস তাকে লাথি মেরেছিল—সে ব্যথাটা এখনো মিলিয়ে যায়নি। তাই বলে যাদব-ডাক্তার অকৃতজ্ঞ নয়। রবার্টসের অনেক প্রসাদ পেয়েছে সে—হুইস্কির সে সব ঋণ যদি সে বেমালুম ভুলে বসে থাকে তাহলে অধর্ম হবে যে। পরকালে সে কী বলে জবাবদিহি করবে!

ডি-এস্‌-পির চোখে আগুন জ্বলছে। টেবিলের ওপরে তিনি টোটাভরা রিভলভারটা খুলে নামিয়ে রেখেছেন। ওর একটা মনস্তাত্ত্বিক সার্থকতা আছে। ইংরেজ রাজত্ব যে এখনো বানচাল হয়ে যায়নি, ওটা তারই নিদর্শন। দরকার হলে ডি-এস্‌-পি এই মুহূর্তে ওটাকে হাতে তুলে নিতে পারেন—সব কটা ব্লাডি-নিগারকে একেবারে শেষ করে দিতে পারেন। কিন্তু ডি-এস্‌-পি বলেছেন, তিনি অত্যন্ত সদাশয় লোক বলেই তা করবেন না। ইংরেজ সরকার বিচার করে—প্রতিহিংসা নেয় না। সুতরাং কুলিরা যদি অপরাধীদের খবরটা দিয়ে দেয়, তাহলেই সমস্ত জঞ্জাল মিটে যাবে। আর তা যদি না হয়, তাহলে তাদের অদৃষ্টে যে বিস্তর দুঃখ আছে, এ নিশ্চিত।

এই সময় প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে এসে দাঁড়াল আদিত্য। জিজ্ঞাসা করলে, এই কি রং-ঝোরা বাগান?

ডি-এস্‌-পি উঠে দাঁড়ালেন বিদ্যুৎবেগে। আদিত্যের সমস্ত অবয়বের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যা দেখে অনায়াসে অনুমান করা চলে যে, লোকটি বিপজ্জনক। বজ্র-কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, হু ইজ ভাট?

মুহূর্তে আদিত্য বুঝতে পারল, সে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে।

—এটা কি রংঝোরা বাগান?

—হ্যাঁ—তুমি কি চাও?

—অনিমেষ ব্যানার্জিকে।

—অনিমেষ ব্যানার্জি !—ডি-এস্-পি বললেন, অল্ রাইট। আই হ্যাভ্ এ ক্লু। তোমার নাম কী ?

—আদিত্য রায়।

—অল্ রাইট মিস্টার আদিত্য রায়, আই অ্যারেস্ট ইউ।

অপরিসীম বিস্ময়ে আদিত্য বললে, অ্যারেস্ট ? কেন ?

—এই বাগানের ম্যানেজার লিওপোল্ড রবার্টসের হত্যা সম্পর্কে।

ভয় পেল না আদিত্য, হতবুদ্ধি হয়ে গেল না। শুধু অসীম বিস্ময়ভরে সে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

* * * *

আদিত্য বাগানে পৌঁছেছে এই খবরটা যখন ধরমবীর পেল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আদিত্যকে গ্রেপ্তার করে ইন্সপেকশন বাঙলোতে রাখা হয়েছে—তাকে যথাসময়ে সদরে চালান করে দেওয়া হবে।

অসহায়ভাবে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল ধরমবীর। একটু আগে যদি জানতে পারত, তাহলে কখনও এমন একটা ব্যাপার ঘটতে পারত না। হয় নিজে স্টেশনে যেত অথবা লোক রাখত—সোজা আদিত্যকে নিয়ে আসত তার গোলায়। কিন্তু আদিত্য যে এমন হঠাৎ বাগানে এসে পৌঁছে যাবে, এ কথাই বা কে কল্পনা করতে পেরেছিল !

শুনে অনিমেষের মুখ পাংশু হয়ে গেল। তিন দিন পরে আজ সে বিছানার ওপরে উঠে বসতে পেরেছে। খবরটা যখন এসে পৌঁছুল, তখন একটা কাপে করে সে দুধ খাচ্ছিল। খবর পাওয়া মাত্র হাত থেকে কাপটা ঝন্ ঝন্ করে পড়ে চুরমার হয়ে গেল, কাঠের মেজে দিয়ে গড়িয়ে চলল দুধের স্রোত।

অনিমেষ বললে, আমি যাব।

ধরমবীর কাছে এসে দাঁড়ালো। একটা হাত রাখলে অনিমেষের কাঁধে। জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবে ?

—বাগানে।

—কেন ?

—আদিত্যদাকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে—

—তুমি গিয়ে কী করবে ?

—ওদের বুঝিয়ে বলব যে—

ধরমবীর সস্নেহে হাসল : ব্যানার্জিবাবু, দেশের কাজ যা-ই করো, তুমি এখনো নেহাৎ ছেলেমানুষ। পুলিসকে তুমি কী বোঝাবে ? যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তোমাকেও গ্রেপ্তার করবে—কী লাভ হবে বলতে পারো ?

লাভ! সত্যিই কোন লাভ হবে না। কিন্তু শুধু কি লাভালাভের কথাটাই ভাবছে অনিমেষ? আদিত্য। উজ্জ্বল নীল চোখ। একটু কুঁজো ধরনের মানুষ, অতিরিক্ত পড়াশোনা করার জন্যেই বোধ হয় ঘাড়টা একটু সামনের দিকে ঝুঁকে গিয়েছে তার। মাথার বিশৃঙ্খল ঝাঁকড়া চুলগুলো কাঁধ বেয়ে প্রায় পিঠের ওপরে নেমে এসেছে। গায়ের খদ্দরের জামাটা ছোট বোন পিংডীর এক্সপেরিমেণ্টের একটা অপূর্ব নিদর্শন। কিন্তু এই সমস্ত আঁপাত-বৈসাদৃশ্যের আবরণের নিচে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে শানানো তলোয়ার। সেই তলোয়ারের আঘাতেই একদিন কবি অনিমেষের রজনীগন্ধার স্বপ্ন কেটে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল—সেই তলোয়ারের ঝলকেই একদিন পথ দেখতে পেয়েছিল অনিমেষ।

আজ আদিত্যকে—সম্পূর্ণ নিরপরাধ এবং সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত আদিত্যকে খুনের অপরাধে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। অথচ অনিমেষের কিছু করবার উপায় নেই—কিছুই না।

অনিমেষ ক্ষীণস্বরে বললে, তা হলে?

ধরমবীর চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বললে, একটা কিছু হবেই। এই কুলি ব্যাটারা পচাইয়ের নেশায় সাহেবকে খুন করে যে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে—তাতে—

ধরমবীর থেমে গেল। কুলি লাইনের দিক থেকে প্রবল আর্তনাদ আসছে। খুব সম্ভব আসামীর হদিশ পাওয়ার জন্যে ওখানে কিছু কড়া ওষুধ প্রয়োগ করেছে পুলিস।

ধরমবীর বললে, লোকগুলোকে মারপিট করছে বোধ হয়।

অনিমেষ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল: আদিত্যদাকে না তো?

—না, অতটা নয় বোধ হয়। আচ্ছা—আমি দেখছি। তুমি চুপ করে বসে থাকো ব্যানার্জিবাবু, তোমার কিছু ভাবতে হবে না। যা করবার আমরাই করব।

অনিমেষ চুপ করেই বসে রইল। কিছু ভাবতে পারছে না। চিন্তায় দুর্ভাবনায় বোঁ বোঁ করে ঘুরছে দুর্বল মস্তিষ্কটা। আদিত্যদাকে গ্রেপ্তার করেছে, অথচ তার কিছুই করবার নেই।

রবার্টসকে খুন করেছে কুলিরা। কারো মতামতের অপেক্ষা করেনি, কারো কাছ থেকে নির্দেশ নেয়নি। বাঘ-শিকার-করা সাঁওতালী রক্তে যখন আগুন ধরেছে, তখন সে আদিম প্রবৃত্তিকে ওরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি—প্রতিহিংসা নিয়েছে। কিন্তু এ পথ নয়। রবার্টসের মতো একজনকে হত্যা করে অত্যাচারের মূল উপড়ে ফেলা যায় না—অত্যাচারকে সুযোগ দেওয়াই হয় মাত্র। সমস্ত বিপ্লব আন্দোলনের পেছনেই এ ইতিহাস আছে। একটি হত্যার ছুতোকে অবলম্বন করে ওরা বহুকে হত্যা করবার বহু-বাঞ্ছিত অবকাশ পায়, সুবিধে পায় বিপ্লবকে সমূলে উৎপাটন করবার। কুলিরা সেই ভুলই করে বসেছে। এ ভুলের জন্যে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, অনেক মূল্য দিতে হবে। আদিত্যকে দিয়েই তার সূত্রপাত।

কারা খুন করেছে? তাদের নাম অনিমেষ জানে। আদিত্যকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় তাদের নামগুলো গিয়ে পুলিসকে বলে দেওয়া। কিন্তু সে রকম কথা বিকৃত-মস্তিষ্কেও কল্পনা করা চলে না।

তা হলে উপায়? আদিত্য তাদের সংগঠনের প্রাণস্বরূপ। শুধু প্রাণই নয়—তাদের মধ্যে আদিত্য নেই একথা ভাবতে গেলেও একান্তভাবে দুর্বল আর অসহায় বলে মনে হয় নিজেদের, অথচ কিছু করতে পারছে না অনিমেষ, গিয়ে একবার দেখা করে আসবে সে উপায়ও তার নেই।

হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়ল ধরমবীর।

—ব্যানার্জিবাবু, ভারী গোলমাল শুনে এলাম।

—কী হয়েছে?

—পুলিসে খবর পেয়েছে তুমিই এ সব সাঁওতালদের দিয়ে করিয়েছো, আর আমার গোলায় লুকিয়ে আছো। ওরা তোমাকে ধরতে আসছে।

—বেশ ধরুক—

—না।—ধরমবীরের চোখ জ্বলে উঠল: যতক্ষণ জান আছে তা হতে দেব না।

—কী করবে?

—যা করব তা শোনো। আমার ভাল গাড়ি জোতা আছে—তুমি এখনি স্টেশনে চলে যাও। গাড়ি হাঁকিয়ে গেলে দশটার ট্রেনটা ঠিক ধরতে পারবে।

—কিন্তু ওরাও তো পেছনে ছুটতে পারবে—শহরে টেলিগ্রাম করতে পারবে—

—কিছুই করতে পারবে না—ধরমবীরের কণ্ঠস্বরে যেন আগ্নেয়গিরি আভাসিত হয়ে উঠল: মহাত্মাজীর হুকুমে একদিন পথে নেমেছিলাম। আজ দেখছি মানুষ এত ছোট যে মহাত্মাজীকে বোঝবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই তাদের মতো ছোট হয়ে গিয়েই আমার কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করব।

অনিমেষ সবিস্ময়ে বললে, তার মানে?

—সব কথার মানে বুঝতে চেয়ো না ব্যানার্জিবাবু। কিন্তু তুমি আর দেরি কোরো না—পালাও।

—তারপর?

—আমরা আছি।

অনিমেষ ধরমবীরের মুখের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল ঠিক যেন প্রকৃতিস্থ নেই ধরমবীর। খুব খানিকটা কড়া মদের নেশা করলে চোখমুখের অবস্থা যে রকম হয়—ধরমবীরকে দেখলে অনেকটা তাই মনে হতে পারে। অনিমেষের ভয় করতে লাগল, শঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে এল চেতনাটা।

—তুমি কী করতে চাও জানতে না পারলে আমি এখান থেকে যাবো না।

—কী ছেলেমানুষি করছো ব্যানার্জিবাবু—এবার যেন দস্তুরমতো একটা ধমক দিলে ধরমবীর: তোমার শরীর এখনো সারেনি। তুমি রওনা হয়ে যাও—তোমার গাড়ি তৈরী।

অনিমেষ আর কথা বলতে পারল না। কথা বলবার কিছু তার ছিলও না।

আধ ঘণ্টা পরেই ধরমবীরের কাঠগোলায় পুলিসবাহিনী এসে দর্শন দিলে। ধরমবীর যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করলে ডি এস. পি. সাহেবকে, আদর করে বসতে দিলে। তারপর সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, হুজুরের আদেশ কী?

হুজুর সংক্ষেপে জবাব দিলেন: সেই ব্লাডি ব্যানার্জিকে বার করে দাও।

—কে ব্লাডি ব্যানার্জি?

হুজুর গর্জন করে উঠলেন:

—চালাকি কোরো না। হোযার ইজ ব্যানার্জি?

—আমি জানি না।

সাহেব বললেন, বলবে না?

—আমি জানি না।

—তা হলে তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।

কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে ধরমবীর উঠে দাঁড়ালো: নো, ইউ ওন্ট্ অ্যারেস্ট্ মি—এক হ্যাঁচকা টানে ঘরের কাঠের দেওয়ালটা থেকে বন্দুকটা নামিয়ে আনল: আই নো হাউ টু ডিফেণ্ড মাই লিগ্যাল রাইটস্—

প্রায় মিনিটখানেক সাহেব বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। এমন একটা অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে কমই ঘটেছে। তারপরে সগর্জনে বললেন, অ্যারেস্ট হিম—স্ন্যাচ দি গান।

বন্দুক উদ্যত রেখে ধরমবীর বললে, প্রসিড ওয়ান.স্টেপ, অ্যাণ্ড—

সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকালো। কী করা যাবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত একটা পাথরের মতো স্তব্ধতা চারদিকে বিরাজ করতে লাগল।

কিন্তু ধরমবীর কাউকে কিছু ভাববার সময় দিলে না। অপ্রস্তুত আতঙ্কের সুযোগ নিয়ে একটা লাফ দিয়ে সোজা সে কাঠের বারান্দা থেকে মাটিতে নেমে পড়ল, তারপর দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের দিকে।

এতক্ষণে সাহেবের চমক ভাঙল।

—হাঁ করে সব দেখছ কি? ইউ ফুল্স্! ফলো হিম—অ্যারেস্ট!

উর্ধ্বশ্বাসে পুলিসবাহিনী ছুটল জঙ্গলের দিকে—তন্ন তন্ন করে ধরমবীরকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় ধরমবীর? ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গলের ভেতর কোন্ নিভৃত আশ্রয়ে সে

নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে—কে বলবে ?

ততক্ষণে ঝোরার পাশে নিবিড় একটা ঝোপের মধ্যে বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছে ধরমবীর। ওরা খুঁজুক—খুঁজে বেড়াক ওকে। ধরমবীর জানে পুলিস জীবনে তাকে ধরতে পারবে না—আজকেই রাতারাতি চেনা পথ দিয়ে সে সোজা চলে যেতে পারবে সিকিমে। ঠিক এই রকম একটা ব্যাপারের জন্যে প্রস্তুত ছিল বলেই আগে থেকে নগদ টাকাগুলো এনে পেট-কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। ডুয়ার্সে কাঠের কারবার তার গেল ; কিন্তু সেজন্য তার দুঃখ নেই। বরাবর নিজের ভাগ্য নিজের হাতে সে গড়ে তুলেছে—এবারেও সে পারবে—এটুকু আত্মবিশ্বাস তার আছে।

একটা ভালো ব্যবসা গেল, অনেকগুলো টাকাও গেল। ডাণ্ডী সত্যাগ্রহের সময় এর চাইতে বড় ত্যাগ সে করেছিল। সেদিন মহাত্মাজী তাকে ডাক পাঠিয়েছিলেন—আজ ডাক দিয়েছে ব্যানার্জিবাবু। ডাক যেই দিক, তার লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক। চিরকাল ধরমবীর আজাদীর সৈনিক। আজও তার ব্যতিক্রম হবে না। নিজের জন্যে তার ভাবনা নেই। একা মানুষ—বাঙলাদেশে না হয়, বাঙলার বাইরে, বাঙলায় না হয় ভারতবর্ষে, আর ভারতবর্ষে না হয় ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে যেখানে হোক সে নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে পারবেই। ডাণ্ডী সত্যাগ্রহের সময় সে কোনো কথাই ভাবেনি, আজও ভাববে না। হাতে যতক্ষণ তার বন্দুক আছে, ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত, ততক্ষণ সে নির্ভয়।

পুলিস তাকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুঁজুক। তাকে তারা খুঁজে পাবে না কখনো। আর এই ফাঁকে ব্যানার্জিবাবু নিশ্চয়ই সাড়ে দশটার ট্রেন ধরে কলকাতার দিকে সরে পড়তে পারবে। ধরমবীরের বিশ্বাস আছে যে ধরা পড়বে না।

হাতের বন্দুকটা মাথায় দিয়ে ঝোপের মধ্যে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে। তার ঘুম-পাচ্ছে।

দশ

শীলার মৃত্যুটা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না স্মিতা।

শীলা মরে গেছে। কিন্তু মরে গেছে বললে কথাটা ঠিক হল না, শশাঙ্ক হত্যা করেছে তাকে। শশাঙ্ক, শিক্ষিত ভদ্রলোক শশাঙ্ক। সমাজ-সংস্কার করবার জন্যে শীলাকে বিয়ে করেছিল, চেয়েছিল একটা মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। কিন্তু তার ভিত্তি যে এত ভঙ্গুর একথা কল্পনা করেছিল কে!

মনে আছে শীলাকে জিজ্ঞাসা করেছিল একদিন : যা করতে যাচ্ছ তার ভবিষ্যৎ ভেবেছ কি? এক মুহূর্ত চুপ করে ছিল শীলা। স্বল্পভাষী মানুষ, কোনদিন বেশি কথা

বলেনি, কোনদিন সহজে নিজেকে উদঘাটিত করতে চায়নি। কিন্তু সেদিন কথা বলেছিল। বলেছিল, আমি ওঁকে বিশ্বাস করি সুমিতাদি—উনি আমাকে কখনো ঠকাবেন না।

বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে শশাঙ্ক! কিন্তু কাকে দোষ দেবে সুমিতা? এই বিশ্বাসের ওপরেই তো অনাদি অনন্তকাল থেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে প্রেম। বারে বারে প্রেম আঘাত খেয়েছে, বারে বারে প্রেম মিথ্যার সংঘাতে রঙীন কাচপাত্রের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, বনহংসীর বাণবিদ্ধ বুকের মতো ঝিলের জল রাঙা হয়ে গেছে। তবু প্রেম মৃত্যুহীন। শশাঙ্কেরা শীলাদের চিরকাল ঠকিয়ে আসছে, চিরদিন ঠকাবে। তবুও শীলারা শশাঙ্কদের ভালবাসবে—আফিং খেয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে—

এক অনিমেষ কি এই সত্যটাকে বুঝতে পেরেছিল? কী জানি!

কিন্তু অনিমেষের কথা মনে পড়তেই সুমিতার মনটা ভয়ানকভাবে নাড়া খেয়ে উঠল। আজ পাঁচদিন আগে চা-বাগান থেকে অস্বস্তিকর সেই খবরটা এসেছে, পাঁচদিন আগে রওনা হয়ে গেছে আদিত্য। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার—এব ভেতরে কারো কোনো খবর নেই। ওখানে কী হচ্ছে কে জানে! এক লাইন পোস্টকার্ড লিখে একটা খবর দেওয়াও কি অসম্ভব ছিল?

মরুক গে। এখানে তার অনেক কাজ। এখানে তার সংসার। এই বিরাট সংসারের ভার আদিত্য তাকে দিয়ে গেছে। তার কর্তব্য সে করে যাবে—তার বেশি ভাববার অধিকারও নেই তাব, সময়ও নেই।

—সুমিতাদি!

—কে, ইন্দু?

—রমলাদির কী হল বলো দেখি?

—রমলা? কেন—কী হয়েছে?

—কাল সকালে বেরিয়ে গেছে—এখনো ফেরেনি।

—সে কি!—ভয়ে সুমিতা পাণ্ডুর হয়ে উঠল: গেল কোথায়?

—সে আমরা কেমন করে জানব। এখানে কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে হয়তো—

—আত্মীয়স্বজন!—সুমিতা ভ্রূ কুঞ্চিত করলে: আত্মীয়স্বজন কেউ আছে বলে তো জানি না। হোস্টেলে থেকে পড়ত, তারপর এখানে—তবে—'

একটা কথা মনে পড়তেই চমক ভাঙল। বাসুদেব। এর মধ্যে বাসুদেবের কোনো হাত নেই তো? কিন্তু তাও কি সম্ভব? এমনভাবে না বলে কি কখনো চলে যেতে পারে রমলা? না—অতটা দায়িত্বজ্ঞানবর্জিত রমলা নয়।

সুমিতা সত্রাসে বললে, থানাগুলোতে খবর নাও। হাসপাতালগুলোতে খোঁজ করো। যদি কোনোরকম অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে থাকে—

ইন্দু বললে, তাই যাচ্ছি—

সুমিতা এল রমলার ঘরে। ছোট বিছানাটা যত্ন করে গুটানো—ডালা খোলা অ্যাটাচিটা তার পাশেই পড়ে আছে। এটা ঠিক যে রমলা ইচ্ছে করে চলে যায়নি। এমন কি যে বইখানা পেনসিলে দাগ দিয়ে দিয়ে সে পড়ছিল, তার পাতাটাও তেমনি করে ভাঁজ করা আছে। একপাশে ময়লা শাড়িজামাগুলো স্তূপাকার। শুধু নেই তার ব্যাগ আর স্লিপারটা।

দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ মুখে সুমিতা খানিকক্ষণ রমলার বিছানার ওপরে চুপ করে বসে রইল। কী হল মেয়েটার? যুদ্ধ—ব্ল্যাক-আউট। বিশৃঙ্খল কলকাতা। কোনো গুণ্ডা বদমায়েসের হাতেই গিয়ে পড়ল না তো শেষ পর্যন্ত? ভাবতেও আতঙ্কে যেন দম আটকে এল তার।

তবু বৃথা আশায় চারদিক একবার খুঁজলে সুমিতা। যদি একখানা চিঠি পাওয়া যায় —যদি কোনো হদিস মেলে—

কিন্তু বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না সুমিতাকে। একটু পরেই এল ডাকপিয়ন আর তার সঙ্গে এল রমলার চিঠি।

রমলা লিখেছে:

সুমিতাদি, আমি পারলাম না। আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি যে এত দুর্বল তা জানতাম না। বাসুদেব আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। তার মৃত্যু আমি সহ্য করতে পারব না। জানি কত বড অন্যায় আমি করছি। কিন্তু আজ যদি বাসুদেব আত্মহত্যা করে—তা হলে সেটাও কি অন্যায় হবে না? কোন্‌টা বড অন্যায় আর কোন্‌টা ছোট তা বিচার করবার শক্তি আমাব নেই—এ ত্রুটি আমি স্বীকার করি।

তোমার সঙ্গে দেখা করবার সাহস আমার নেই। জীবনে বখনো আর হয়তো দেখা হবে না। প্রণাম নিয়ো।—রমলা।

চিঠিটা হাতে করে সুমিতা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এমনি করেই ঘটে নাকি? শীলা যেভাবে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে—রমলাকেও কি তাই করতে হবে?

দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠল হাসপাতালের ছবি। লোহার খাটে শুয়ে আছে শীলা। বুক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। গালের একপাশে কয়েক ফোঁটা কালো রক্ত জমে রয়েছে। জানলা দিয়ে সূর্যের আলো রমলার মৃত্যু-বিবর্ণ মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ সুমিতার যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। শীলা, না রমলা?

কিন্তু নিজেকে সংযত করলে সুমিতা। সবাই তো শশাঙ্ক নয়। পৃথিবীতে সব প্রেম এমনি করে ব্যর্থ হয় না। যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় সব প্রেমের মর্মগত নগ্ন স্বার্থপরতাই যে এমনভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে এমন কথাই বা কে বলতে পারে?

নিজের বাসর-ঘরে আগুন জলেছে সুমিতার। রুদ্র দেবতার আহ্বানে বেরিয়ে চলে গেছে অনিমেষ। তাই কি পৃথিবীর যত প্রেম তাদের সকলের সম্পর্কে একটা অবচেতন ঈর্ষা জেগেছে সুমিতার মনে? শীলার মৃত্যুতে কি একধরনের আনন্দ পেয়েছে—একধরনের তৃপ্তি পেয়েছে সুমিতা—নিজেকে সান্ত্বনা দেবার, আশ্বাস দেবার একটা আশ্বাস আর অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে সে?

কথাটা ভাবতেও সুমিতা শিউরে উঠল। মনের মধ্যে অনুভব করল যেন একটা প্রচ্ছন্ন সরীসৃপের বিষাক্ত নিশ্বাস। হঠাৎ নিজের মধ্যে এ কী বিচিত্র ভয়াবহ একটা সত্যকে আবিষ্কার করে বসল সুমিতা!

রমলার চিঠিটার দিকে আর একবার তাকালো সে। না—না, সুখী হবে রমলা, জয়ী হবে। বাসুদেবের প্রেমে হয়তো খাদ নেই—হয়তো রমলাকে না পেলে সে সত্যিই বাঁচবে না। ঘর যার ভেঙেছে—ভাঙুক। যে ঘর বেঁধেছে তার স্বপ্ন যেন মিথ্যে না হয়।

একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো বাইরে থেকে একঝলক ঝোড়ো হাওয়া এসে সুমিতার চুলে চোখে আছড়ে পড়ল।

খাওয়ার ঘরে তখন তর্কের ঝড় শুরু হয়েছে। রমলার তিরোধানের খবর সকলে রাখে না, যারা জানে তারাও চুপ করে আছে। অতএব তর্ক চলছে তাদের চিরন্তন বিষয়বস্তু নিয়ে।

—তা হলে শনিবার থেকে এশিয়াটিক আয়রনে স্ট্রাইক?

—উপায় নেই।

—কিন্তু ওদের ইউনিয়ানের অবস্থা কি যথেষ্ট ভালো? শুনেছি রি-অ্যাকশনারী দলগুলো এর মধ্যেই বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।

—হাঁ—শেষ পর্যন্ত যদি কল্ অফ্ করতে হয়—

—কক্ষনো না। আজকে লেবারের আর সে অবস্থা নেই। নিজেদের দাবিদাওয়া ওরা বুঝে নিয়েছে। ওরা জানে হাজার অসুবিধে হলেও পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। একবার পিছিয়ে গেলে আবার এগোতে পাঁচ বছর সময় লেগে যাবে।

—সে বেশ কথা। তার আগে স্ট্রেংথ একবার বোঝা দরকার তো। শেষ পর্যন্ত যদি—

—ছাখো—একটা জিনিস তোমরা বুঝতে পারছ না। মানলাম, ওরা এখনো যথেষ্ট সঙ্ঘবদ্ধ হয়নি। এটাও সত্যি যে কোনো কাজেই তোমরা সকলের সমর্থন সঙ্গে সঙ্গে পাবে না। কিন্তু একবার কাজটা শুরু হয়ে গেলে ঝোঁকের ওপরে সবাই এগিয়ে আসে—তখন আর কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

—হাঁ—বিশেষ করে ওদের রক্তে বিপ্লবের বীজ। সব সময়ে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। শুধু সুযোগ বুঝে ওদের জাগিয়ে দিতে হয়।

—কিন্তু কাজ বন্ধ হলে মজুরীও বন্ধ হবে। তখন খাবে কী?

—সে ব্যবস্থা যদি না করতে পারো তা হলে এতদিন ওয়ার্ক করছ কী? সেইখানেই তো ওদের ইউনিয়ানের শক্তি পরীক্ষা করবে। তা ছাড়া কালেক্‌শন করতে হবে—যেমন করে হোক স্ট্রাইককে বাঁচিয়ে রাখা চাই।

—মালিক এবার খুব স্টার্ন অ্যাটিচুড নেবে বোধ হচ্ছে।

—খুব স্বাভাবিক।

—দরকার হলে গুলি চালাতে পারে।

—সে তো আরো ভালো। যত বেশি গুলি চলবে তত বেশি করে শক্তি বাড়বে আমাদের। গুলির ভয়ে কোনো দেশে বিপ্লব বন্ধ হয়েছে কি কখনো? চিকাগোর পথ একদিন রক্তে লাল হয়ে গেছে, একদিন প্যারীর পথে হাজার মজুর রক্ত দিয়েছে—সোভিয়েটের তো কথাই নেই। কিন্তু ফল হয়েছে কী? কে জিতেছে?

—সে কথা সত্যি। তবে আমাদের অর্গানাইজেশন—

—এখনো অত শক্ত হয়ে ওঠেনি। হয়তো পিছিয়ে যেতেও পারে। কিন্তু আজ পিছোলেও কাল আমরা এগোবই। এক আঘাতেই কোনো বিপ্লব কখনো সার্থক হয়নি। নাইন্‌টিন ফাইভের পরে এসেছে নাইন্‌টিন সেভেন্‌টিন। তোমরা কি একবারেই ক্যাপিটালিজ্‌মকে শেষ করে দিতে চাও নাকি? দিস্ ইজ ওন্‌লি দি বিগিনিং অব্ দি এণ্ড—

ঘরে ঢুকল সুমিতা।

—ব্যাপার কী, তোমরা যে ঘর-বাড়ি একেবারে ফাটিয়ে দিচ্ছ।

—সুমিতাদি—শনিবারে এশিয়াটিক আয়রনে স্ট্রাইক।

সুমিতা একটা আসন টেনে নিয়ে বসল: মালিকের সঙ্গে রফা হল না?

—নাঃ। ওরা আপোসের কোনো কথাই শুনতে রাজী নয়। সুতরাং ওদের একবার নিজেদের শক্তিটাই ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

—ফ্যাক্টরীতে এখন ওদের কাজের চাপ। ওয়ার এমার্জেন্সী। ক্ষেপে গিয়ে রিপ্রেশন চালাতে পারে।

—তা পারে—কিন্তু সুমিতাদি—কতদিন গুলি চালাবে ওরা? ওদের গুলি একদিন ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু মানুষ মেরে কোনোদিন ওরা শেষ করতে পারবে না।

হঠাৎ বুকভরে একটা নিশ্বাস টেনে নিলে সুমিতা। কেমন যেন জোর ফিরে পেয়েছে নিজের পায়ে। রমলা চলে গেছে—কিন্তু তার ভেতরে কোনো সংকেত নেই পরাজয়ের,

কোনো ইঙ্গিত নেই ব্যর্থতার। আরো অনেকে আছে—এই ছেলেরা আছে, আছে এই মেয়েরা। শীলার ভাঙা সংসার নয়, রমলার ক্লেদাক্ত গতানুগতিক সংসার নয়—এদের নিয়েই সে গড়ে তুলবে সমস্ত মানুষের সংসার—ভাবী ভারতের যৌথ-পরিবার।

* * * *

রাত হয়ে গিয়েছিল।

বিছানায় শুয়ে কী একটা বই পড়ছিলেন মণিকাদি। এমন সময় দরজায় কড়া নড়ল।

—এত রাত্রে আবার কে জ্বালাতন করতে এল?

বিরক্ত মুখে গজগজ করতে করতে উঠে গিয়ে মণিকা দরজা খুলে দিলেন। তারপরে আতঙ্কে তিন পা পিছিয়ে এলো।

—এ কে?

—আমি অনিমেষ।

—এ কি চেহারা তোমার?

—পরে বলব। এখন এক কাপ চা খাওয়ান তো মণিকাদি।

এগারো

টেবিলের এক পাশে একটা সবুজ আলো জ্বলছিল। আলোটা ক্ষীণ—ঘরখানাকে উদ্ভাসিত করে তোলেনি, বরং একটা বিষণ্ণ ছায়ায় ম্লান করে রেখেছে। গোটাকয়েক ধূপকাঠি জ্বলছে টিপয়ের ওপরে—বন্ধ ঘরের ভেতর রুদ্ধ সুগন্ধি আবর্তিত হচ্ছে। শেল্‌ফের ওপরে টিক টিক করছে ঘড়িটা। দেওয়ালে মণিকাদির একখানা ছবি—প্রথম কৈশোরে যে সময় মানুষ নিজেকে ভালোবাসতে শেখে বোধ হয় সেই সময় ছবিটা তোলা হয়েছিল। তারপর কৈশোরের আত্মপ্রেমকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়েছে বহু ঝড়, বহু ভূমিকম্প, বহু বিপর্যয়। শুধু সেদিনের ছায়ামূর্তি নিয়ে দেওয়ালের বুকে মণিকাদির ফোটোটা জেগে রয়েছে। বয়েসকালে মণিকাদির চেহারা নেহাৎ মন্দ ছিল না।

ওই ফোটোটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে শুয়ে ছিল অনিমেষ আর পায়ের কাছে তেমনি নীরবে বসে ছিল সুমিতা। একটা পুরু কাশ্মীরী রাগ অনিমেষের গলা পর্যন্ত টানা—পাণ্ডুর মুখে মৃত্যুর মতো ম্লানিমা। সুমিতা একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার মুখের দিকেই। বাইরে বর্ষণ-মন্দ্রিত শীতের রাত্রি যেন স্বপ্নময়ী হয়ে উঠেছে। কাচের জানলায় ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক। শীতার্ত অন্ধকার কলকাতা মৃত্যুভয়ে যেন অশ্রুবর্ষণ করে চলেছে।

অনিমেষ আস্তে আস্তে বললে, পালিয়ে আসাটা ঠিক হয়নি।

সুমিতা শুনে যেতে লাগল, জবাব দিলে না।

অনিমেষ আবার বললে, ওতে করে নিজেদের অপরাধটাই যেন প্রমাণ হয়ে গেল। কাজটা ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে।

সুমিতার মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনাচ্ছিল : কিন্তু রবার্টস তোমাকে মারবার পরে কুলিরা ধরমবীরের ওখানে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল এ খবর তো কেউ জানত না।

—বাগানের ডাক্তার খোঁজ পেয়েছিল। লোকটা সাহেবের স্পাই—ওর নজর কেউ এড়াতে পারে না। এ সব গণ্ডগোল ওরই জন্যে।

—তা হলে?

—তাই ভাবছি। ওরা যা বোঝবার সোজা বুঝে নিয়েছে। রবার্টস আমাকে মারবার পরেই আমি কুলিদের ক্ষেপিয়ে তুলেছি—কুলিরা রবার্টসকে খুন করেছে। সুতরাং আমরা সবাই খুনী—আদিত্যদাও।

—কিন্তু সত্যিই তো তুমি জানতে না।

—না—আমরা কেউ কিছুই জানতাম না। কুলিদের রক্তে আগুন ধরে গিয়েছিল। ওরা কারো কথা শোনবার অপেক্ষা রাখেনি। নিজেদের স্বাভাবিক বুদ্ধির সাহায্যেই ওরা অপরাধীর বিচার করেছে।

—কিন্তু এর ফল যে ভয়ানক হল।

—হল বইকি। এ পথ আমাদের নয়। একজন রবার্টসকে খুন করা আমাদের কাজ নয়—আমাদের উদ্দেশ্য পৃথিবী জুড়ে রক্তবীজ রবার্টসদের ঝাড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেওয়া। কিন্তু ওরা ভুল করল—ভয়ঙ্কর ভুল করল। এক পা এগোতে গিয়ে আমরা তিন পা পেছিয়ে গেলাম।

—তাহলে?

অনিমেষ ক্লান্তভাবে হাসল : আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। অনেক অপচয়ের ভেতর দিয়ে করতে হবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

সুমিতা নীরবে চিন্তা করতে লাগল।

অনিমেষ বলে চলল, কিন্তু আমাদের দমে গেলে চলবে না সুমি। বিপ্লবের ধর্মই যে এই। শক্তি আমরা যত বেশি সঞ্চয় করব—স্থানে অস্থানে সে শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেই। মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ ঘটবে, আমরাও রেহাই পাব না। তারপর যেদিন শেষ বিপ্লব আসবে—সেদিন আমরা অনেকেই চূর্ণ হয়ে যাব বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এই রক্তবীজেরাও একেবারে নিঃশেষে লোপ পেয়ে যাবে। এ তারই ভূমিকা।

—কিন্তু আদিত্যদা?

—বিশেষ কিছু হবে বলে মনে হয় না। অনিমেষ ব্যানার্জিকে খুঁজতে যাওয়ার সঙ্গে বাগানের ম্যানেজার খুন হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু দুর্ভোগ বইতেই হবে।

—আর তোমার?

—এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।

কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল অনিমেষ, বড় একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল। আবার সমস্ত ঘরটায় ঘনিয়ে এল সঙ্কেতময় একটা নিস্তব্ধতা। ধূপদানীতে ধূপকাঠি-গুলো পুড়ে পুড়ে ঘরময় গন্ধের ইন্দ্রজাল বিকীর্ণ করতে লাগল। বাইরে বৃষ্টি চলেছে সমানে —যেন আকাশ জোড়া একটা তারযন্ত্রে মল্লারের মূর্ছনা অনুরণিত হচ্ছে। উত্তুরে বাতাসে যেন পূবালি হাওয়ার ছোঁয়া লেগেছে—যুদ্ধ-শঙ্কিত বেদনার্ত কলকাতার চোখের জল আকাশ থেকে অবিরাম ঝরে পড়ছে। কাচের জানলায় তেমনি বিদ্যুতের চমক।

অনিমেষ ভাবছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর বাণী : দরকার হলে এক পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে যাও। সত্যি কথা—কোনো ভুল নেই, কোনো সংশয় নেই। বিপ্লব কখনো সোজা রাস্তায় তীরের মতো উড়ে চলে না। তার লক্ষ্য নিশ্চিত, কিন্তু গতিপথ সরীসৃপের মতো আঁকাবাঁকা কুটিল। 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা।' কিন্তু প্রতীক্ষা করা যায় না—অপেক্ষা করা যায় না। কুলিরা হয়তো ভুল করেছে—কিন্তু একেবারেই কি ভুল করেছে? অপমানে যখন হাড়গুলো পর্যন্ত ইলেকট্রিক আগুনে জলে যাওয়ার মতো পুড়ে যায়—যখন প্রতিটি মুখের গ্রাস লজ্জা আর ক্ষোভের অশ্রুতে নোনা বলে মনে হয়—যখন সহিষ্ণুতার পাত্র মানুষের নিজের রক্তেই পূর্ণ হয়ে ওঠে—তখন কজনে বিচার করে চলতে পারে? অপেক্ষা করতে পারে কজনে? ঠিক যে কারণে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের হাতে একদিন রিভলভার গর্জন করে উঠেছিল, কালাপানির পারে আর ফাঁসির মঞ্চে তারা জীবনের জয়গান গাইবার শক্তি অর্জন করেছিল, আজ সেই কারণেই কুলিদের 'কাঁড়' এসে রবার্টসের ফুসফুস ফুটো করে ফেলেছে। কাকে দোষ দেবে অনিমেষ? পিছিয়ে যেতে হল—কোনো ভুল নেই। কিন্তু পিছোতে পিছোতে এমন এক জায়গায় মানুষ এসে দাঁড়াবে—যেখান থেকে আর পিছিয়ে যাওয়া চলে না। তারপরে 'আগে কদম'! আঘাত করো—ভাঙো—মিথ্যার আর শোষণের যে দেবতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাক্ষসের মতো নরবলি নিচ্ছে, তাকে সেখান থেকে উপড়ে এনে বিসর্জন দাও অতলান্ত সমুদ্রের জলে। সেই সিংহাসনে বসাও নতুন যুগের দেবতাকে, মানুষকে, সমাজকে। শেষ সংগ্রামে সেইদিন জয় হবে।

গম্ভীর গলায় অনিমেষ বললে, সুমি, আমরা জিতবই। তুমি ভেবো না।

সুমিতা হঠাৎ মৃদুরেখায় হেসে ফেলল : না, আমি ভাবব না।

ঘরে আবার স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল।

না, সুমিতা ভাববে না। সত্যিই তার ভাববার কী আছে। সে তো সেনাপতি নয়, সৈনিক। তাকে যে পথে চলবার নির্দেশ দেওয়া হবে সে-ই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। পথের লক্ষ্য সে জানে, কিন্তু পথ জানে না। সে জানে অনিমেষ, আদিত্য—আর পৃথিবীর বিপ্লবীরা

—দেশ-দেশান্তের, যুগ-যুগান্তের শূর্ধ-মন্ত্রের সাধকেরা।

তবু পথ চলতে বাধা আসে। বাধা দেয় রমলা, বাধা দেয় শীলা। শীলা মরে গেছে, রমলা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে বাসুদেবকে। একজন পথ খুঁজে পেল অপমৃত্যুর মধ্যে, আর একজন পথ খুঁজে নিলে দৈনন্দিন জীবনের মৃত্যুর মতো সংকীর্ণতার অন্তরালে। সুমিতা জানে ওরা দুজনেই পথভ্রষ্ট—রমলার পরিপূরক শীলা। তবুও পতঙ্গের মতো মন উড়ে যেতে চায়—পুড়ে মরতে চায়। আজও সুমিতা নিজেকে জয় করতে পারল না!

আজকের এই রাত্রি। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। নির্জন ঘরে সে আর অনিমেষ। সুমিতার মনে হল এ তাদের বাসররাত্রি। তিন বছর আগে—তিন বছর আগে এমন একটি নির্জন ঘরে বর্ষা-তরঙ্গিত রাত্রিতে যদি তার সঙ্গে অনিমেষের দেখা হত, তাহলে কী হত?

কী হত? ভাবতেও সমস্ত শরীর একটা নিষিদ্ধ আনন্দের নেশায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কিন্তু তিন বছর আগের রাত্রি আর নেই। এ তাদের বাসর বটে, কিন্তু লোহার বাসর। বাইরে বৃষ্টিতে স্বপ্নের মূর্ছনা তার কানে এসে বাজছে না—যেন ক্রূর কুটিল একটা চক্রান্তের আভাস সে পাচ্ছে। উত্তর বাতাসে পুবালির আমেজ নেই, মনে হচ্ছে লোহার বাসরের চারপাশে ঘিরে ঘিরে কালনাগিনীরা গর্জে বেড়াচ্ছে—একটা ছিদ্রপথ পেলেই সেখান দিয়ে এসে লখীন্দরকে দংশন করবে।

এ কী করল সুমিতা! এ কোন্ রাহুর প্রেমে জড়িয়ে পড়ল! আজ মনে হচ্ছে এ পথ তার ছিল না। অতি কঠোর, অতি নিষ্ঠুর। সহজ স্বাভাবিক প্রেম—রমলার মতো ভালোবাসাকে জীবনে কেন মেনে নিতে পারল না? পুড়ে মরত? পুড়ে মরাই যদি পতঙ্গের ধর্ম হয় তবে আলোক-তীর্থের পথে তার এই অভিযান কেন? তার পাখা ছিঁড়ে পড়ছে—সে আর সহ্য করতে পারছে না।

অনিমেষ ডাকলে, সুমি!

সুমিতা চমকে উঠল। বহুদিন পরে এমন কোমল গলায় এত মিষ্টি করে অনিমেষ তাকে ডেকেছে। রক্ত যেন ঝনঝন করে উঠল। একটা রাত্রে ব্যতিক্রম হলে ক্ষতি কী? বিপ্লবীর জীবন কি এমনই শূন্যচারী যে একটা বিশেষ মুহূর্তের জন্যে সে মাটির কাছে নেমে আসতে পারে না? অথবা সে জীবন সমগ্রব্যাপী মহাজীবনের সাধনা করে বলে প্রতি দিনের ছোট বড় কামনার একটি ঝরা পাপড়িও কুড়িয়ে নিতে রাজী নয়?

অনিমেষ আবার ডাকলে, সুমি!

সুমিতা কথা বললে না, শুধু কথার আলোয় উজ্জ্বল দুটি গভীর চোখের দৃষ্টি অনিমেষের চোখের ওপরে ফেলল। ঘরে সবুজ আলোটার দীপ্তি তার দৃষ্টিকে আরো ঘন, আরো নিবিড় করে তুলল।

অনিমেষ বললে, কাছে এসো।

সুমিতার হৃৎপিণ্ড দুটো প্রাণপণে শব্দ করতে লাগল, মনে হল কী একটা অসহ্য উদ্দাম আবেগে যেন তারা টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে পড়বে। আজ তার প্রথম মিলন-রাত্রি এল নাকি! বিপ্লবী যাত্রী সূর্যোদয়ের দিগন্তে যাত্রা করবার পথে একটি ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তাকে কি উপহার দিয়ে গেল?

নিরুত্তরে সুমিতা এগিয়ে এল, বসল অনিমেষের পাশে।

আজ তিন বছর পরে অনিমেষ সুমিতার একখানা হাত টেনে নিলে বুকের ওপরে। বরফের মতো ঠাণ্ডা হাতে অনিমেষের উত্তপ্ত স্পর্শ লাগল—মনের মধ্যেও কোথায় যেন জমাট তুষারকণা তরল হতে শুরু করেছে সুমিতার।

অনিমেষ বললে, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

চাপা গলায় ফিস ফিস করে জবাব দিলে সুমিতা, না, কষ্ট আর কী।

—জানি, তোমার ভালো লাগে না, কষ্ট হয়—ঘরের জন্যে মন টানে। কী হতে পারতে, অথচ কী হয়ে গেলে!

সুমিতা চোখ বুজে অনিমেষের বিচিত্র স্পর্শানুভূতিটা যেন নিজের চেতনার মধ্যে সঞ্চার করে নেবার চেষ্টা করছিল। তেমনি চাপা গলায় জবাব দিলে, না।

অনিমেষ হাসল: তার চেয়ে সেই রমেশ চৌধুরীকে অনুগ্রহ করলে আজ কোনো ঝঞ্ঝাট তোমার থাকত না। বড়লোকের ছেলে—বহুদিন মোটর নিয়ে তোমার পেছনে পেছনে ঘুরেছিল, অনেক সাধনা করেছিল। চৌধুরীগিন্নী হলে আজ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারতে।

সুমিতার চোখে যেন ঘুম জড়িয়ে আসছিল। কথা বলবার কিছু নেই—বলবার প্রেরণাও নেই। যুগ-যুগান্তরের ক্লান্তি যেন আজ তাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

অনিমেষ বললে, সুমি, অনেকের ঘর বাঁধবার জন্যে আমাদের ঘরটাকে নিতান্ত বাজে খরচ করতে হল। কিন্তু কে জানে—হয়তো সুযোগ আমাদেরও আসবে। আমরা সন্ন্যাসী নই—কিন্তু যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছে, তখন রাইফেল ছাড়া আর কী ভাবতে পারি, বলো?

সুমিতা কিছুই বললে না। শুধু অনিমেষের বুকের ওপর নিজের মাথাটাকে এলিয়ে দিলে—বহুদিনের বহু অনিদ্রা সুযোগ পেয়ে আজ তার ওপরে প্রতিশোধ নিচ্ছে।

অসুস্থতা আর ক্লান্তি অনিমেষকেও কি দুর্বল করে ফেলেছে? মুহূর্তের জন্য সমস্ত মনটা তার বিদ্রোহ করে উঠল। কিন্তু সবুজ ল্যাম্পের স্বপ্নচ্ছায়া ছড়িয়েছে সুমিতার মুদিত চোখে, তার ম্লান মুখের ওপরে। রুক্ষ চুল থেকে কতদিন আগেকার একটা তেলের ক্ষীয়মাণ গন্ধ এসে মিশছে ঘরের ধূপের গন্ধের সঙ্গে—মণিকাদির কৈশোরে তোলা ছবিখানা যেন সকৌতুকে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনিমেষ সস্নেহে সুমিতার চুলের ভেতরে আঙুল বুলোতে লাগল।

বাইরে কালনাগিনীর বিষ নিশ্বাস থেমে গেছে। কুটিল চক্রান্তের গুঞ্জন ছাপিয়ে রণিত হচ্ছে মল্লারের সুর। আজ সুমিতার বাসর। সুমিতা জানে এই প্রথম, এই শেষ। কাল থেকে অনিমেষের সময় থাকবে না, তারও না। একটি রাত্রির বর্ষণেই তার মরুভূমি চিরশ্যামল হয়ে থাকবে—একটি ফুলের গন্ধ তার চেতনাকে চিরদিন ঘিরে রাখবে। রাত্রির তমসাতোরণ ভেদ করে যতক্ষণ সূর্য-সারথির আবির্ভাব না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিমির-যাত্রায় এই তার পাথেয় থাক।

আজ হাসপাতালে মণিকাদির নাইট ডিউটি, সকালের আগে ফিরবেন না।

* * *

বিলিতি সিনেমার বক্সে বসে ছিল বাসুদেব আর রমলা।

সামনে সাদা পর্দায় মিউজিক্যাল কমেডির উত্তাল উল্লাস চলেছে। সমস্যাহীন জীবনে —বন্ধনহীন প্রেমে। ফ্ল্যাটে, মোটরে, হোটেলে, জাহাজে, সমুদ্রের ধারে। পৃথিবীতে এখন আর কিছুই নেই। এয়ারকণ্ডিশনড্ ঘরের উত্তপ্ত আবহাওয়া সিগারেট আর চুরুটের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে উঠেছে। পুরু কুশন, দামী শীতের পোশাক আনন্দিত অনুভূতিটার তীব্রতাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

জীবন কত সহজ—কত নির্ঝঞ্ঝাট। ফুলের মতো সুন্দর পৃথিবী। ভালোবাসো, ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে ওঠো। অর্কেস্ট্রার তালে তালে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দাও—দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে নাচের ছন্দে অপূর্ব ভঙ্গিতে লীলায়িত করে তোলো, পুরুষের দেহে রক্তধারা উদ্বেল-উল্লাসে নাচতে শুরু করে দিক। তোমাদের মিলন-শয্যা বিছিয়ে আছে সী-বীচে, পাম-গ্রোভে, আলোকোজ্জ্বল হোটেলে, ক্যাবারেতে। পৃথিবীতে চিরতারুণ্যের কন্দর্প-উৎসব চলেছে।

বাসুদেব আস্তে আস্তে রমলাকে স্পর্শ করলে।

—তোমার ভালো লাগছে?

জড়িত মৃদু গলায় রমলা জবাব দিলে, হুঁ।

—কতদিন যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে ছিলাম? আজ যদি তুমি আমার জীবনে দেখা না দিতে, তা হলে হয়তো ওই হাইড্রোসায়ানিক—

বাসুদেবের মুখে হাত চাপা দিয়ে রমলা বললে, ছিঃ, চুপ করো।

বাসুদেব বললে, চুপ করব না। আজ তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, নতুন করে গড়ে তুলেছ আমাকে। আজ আমার জন্মান্তর।

রমলা বললে, আমারও।

রমলার আঙুলগুলো নিজের আঙুলের ভেতরে জড়াতে জড়াতে বাসুদেব বললে, জানো, আজকাল আমি রীতিমতো রোমান্টিক হয়ে উঠেছি।

—কবে তুমি রিয়্যালিস্টিক ছিলে ?

—মনে নেই। আজ ভাবছি: "আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগলপ্রেমের স্রোতে"—

রমলা বললে, থামো, কাব্যি রাখো। পাশের বক্সের ভদ্রলোক কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছেন, দেখতে পাচ্ছো না ?

—হি ইজ জেলাস। আহা বেচারা, আই পিটি হিম।

এয়ার-কণ্ডিশনড্ ঘরের ভেতরে চুরুট, প্রসাধন আর বিলিতি মদের চাপা গন্ধ ভাসছে একসঙ্গে। সমুদ্রতীরে নারিকেল-বীথি মর্মরিত হয়ে উঠছে, বালুবেলার ওপরে তরঙ্গে তরঙ্গে সফেন রোলার ভেঙে পড়ছে। নারিকেলপুঞ্জের ভেতর থেকে যে বিচিত্র লতার পোশাক পরে নায়িকা বেরিয়ে এল সে পোশাকের অর্থ দেহশ্রীকে আবৃত করা নয়, তাকে আরো পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা। হঠাৎ কোথা থেকে চিতাবাঘের জাঙিয়া-পরা নায়ক এসে দেখা দিলে। তারপর মিলনের উত্তেজক রোমান্স। হুলা হুলা নাচের উন্মাদ উল্লাসে সফেন তরঙ্গের মতো যৌবনের মত্ততা। দর্শকের রক্তেও যৌবন কথা কয়ে উঠছে—পুরু গদি-আঁটা চেয়ারে বসে অদ্ভুত ভালো লাগছে প্রশান্তসাগরীয় স্বপ্নলোককে। রমলার হাতের ভেতর বাসুদেবের স্পর্শ ক্রমশ যেন মুখর হয়ে উঠছে।

বাসুদেব রমলার কানের কাছে মুখ এনে বললে, যুদ্ধ থামলে আমবা ম্যানিলায় বেড়াতে যাব। নতুন করে আমাদের হনিমুন হবে ওখানে।

—বেশ।

কিন্তু যুদ্ধ থামলে! কথাটা রমলার কানে যেন খট করে বিঁধল। যুদ্ধ থামলে! কী বলেছিল সুমিতা, কী বলেছিল যেন আদিত্যদা ? যুদ্ধ থামলে নতুন যুগ আসবে আমাদের, আসবে নতুন জগৎ। সেদিন পরাধীনতা থাকবে না, সেদিন আমরা আগামীকালের মানুষের জন্যে আগামী দিনের সমাজ গড়ে তুলব। আজ তার জন্যে আমাদের প্রস্তুতি চাই —প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে। আর তারই প্রতিধ্বনি করে ইন্দু লিখেছিল:

ছেঁড়া-তারে ঘেরা ভাঙা-ট্রেঞ্চের মলিন অন্ধকারে,
মৃত-সৈনিক উষার স্বপ্ন দেখে—

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

হাতে চাপ দিয়েছে বাসুদেব। কণ্ঠ মৃদু মৃদু কাঁপছে উত্তেজনায়: দেখেছ কী রকম এক্সাইটিং! মেয়েটা কী দারুণ ককেট!

এক মুহূর্তে বাস্তব জগতে ফিরে এল রমলা। ওসব ভেবে আর কোন লাভ নেই বাস্তবিক। যা হারিয়ে গেছে তা হারিয়েই যাক, যা পেছনে পড়ে আছে তা পেছনেই পড়ে থাকুক। সবাই সৈনিক হতে পারে না, রমলাও পারেনি। তার জন্যে অপরাধবোধ কেন ?

সুমিতাদি বৃহত্তরের সন্ধানে ছুটেছে, নিজের ছোট গণ্ডিটুকুতেই পরিতৃপ্ত আর পরিপূর্ণ হয়েছে রমলা।

সুমিতার নতুন যুগ যত দূরে—তার চাইতে রমলার ম্যানিলা অনেক কাছে। সুতরাং এয়ারকণ্ডিশনড ঘরে গদিআঁটা চেয়ারে স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল রমলা। সামনে ম্যানিলার নারিকেল বীথিতে চলেছে যৌবনের নির্লজ্জ উৎসব—জীবনে এ সত্যকেও তো অস্বীকার করার উপায় নেই!

না—রমলা অস্বীকার করতে চায়ও না।

সিনেমা শেষ হল। বাসুদেব ট্যাক্সি ডাকলে।

রমলা বললে, কোথায় যেতে চাও?

—আমার বাড়িতে।

—ছিঃ, সেটা কি ভালো হবে? এখনো বিয়ে হল না—

—ওর জন্যে কী হয়েছে? অত বড বাড়ি আমার—লোকজন নেই তো। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। তাছাড়া ভেবো না, কালই রেজিস্ট্রেশনের বন্দোবস্ত করব।

—কিন্তু—

—তুমি বড় ভাবছো মনু। কালই তুমি আমার হচ্ছো, আর শুধু আজকের রাতটা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আর যাবেই বা কোথায়? ফিরতে হলে তো তোমাদের বিবেকানন্দ রোডের সেই পার্টি-অফিসে—

সার্পের কামড় খাওয়ার মতো রমলা চমকে উঠল।

—না, না, যাব। তোমার ওখানেই চলো।

ট্যাক্সি চলল। শীতার্ত রাত্রি—চারদিকে চলেছে অশ্রান্ত ধারাবর্ষণ। অর্ধাবগুণ্ঠিত আলোগুলো বৃষ্টিতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে—যেন কতগুলো মড়ার চোখ শুধু জেগে আছে কলকাতার ওপরে। বাসুদেব দু' হাত দিয়ে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রেখেছে রমলাকে। বৃষ্টিভেজা পথ মোটরের চাকার নিচে ছিটকে ছিটকে সরে যাচ্ছে।

এমন সময় হাড়কাটা গলি থেকে বেরুল হেমন্তবাবু।

নেশায় একেবারে চুরচুরে হয়ে গেছে—ভালো করে চলতে পারছে না। যার ঘরে ছিল, পকেটগুলো বেশ করে হাতড়ে নিয়ে সে হেমন্তবাবুকে বার করে দিয়েছে রাস্তায়। তারও ক্লান্তি আছে, শীতের রাত্রে লেপের মধ্যে প্রেমের মতো একটা স্নিগ্ধ ঘুমে মগ্ন হয়ে যাওয়ার প্রলোভন আছে। তা ছাড়া হেমন্তবাবুর আর শাঁস নেই—সারারাত একটা ভবঘুরে বুড়ো মাতালকে বরদাস্ত করাও শক্ত।

অতএব হেমন্তবাবু বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়।

টলতে টলতে একটা লাইট পোস্টকে আঁকড়ে ধরলে, তারপর আবার ছিটকে সরে এল।

সেখান থেকে। ছেঁড়া ফ্ল্যানেলের জামার ফাঁক দিয়ে শীতের হাওয়া ঢুকছে হাড়ের মধ্যে—এমন চমৎকার নেশাটার ভিত অবধি কাঁপিয়ে তুলছে। মাথার ওপরে টপ টপ করে পড়ছে শীতের বৃষ্টি। অবচেতনভাবে হেমন্তবাবুর মনে হতে লাগল: এই রাত্রে এমন শীতে পথে পথে বেড়ানোটা কোনো কাজের কথা নয়। কোথায় যেন তার জন্যে একটা আশ্রয় আছে, একটা উত্তপ্ত বিছানা আছে—যেখানে গিয়ে একটা পলাতক কুকুরের মতো সে লুকিয়ে থাকতে পারে। যেখানে গেলে একখানা লেপ সে পাবে—হিমে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে আসা হাত-পাগুলো উষ্ণতার আরাম পাবে, মাথাটা সেখানে এমনভাবে ভিজবে না। কিন্তু সে কোথায়, কতদূরে? নেশাটা বড্ড বেশি হযে গেছে হেমন্তবাবুর, কিছুই ভালো করে মনে পড়ছে না।

সপ্—

জুতোসুদ্ধু পা-টা পড়ল জলের মধ্যে। জুতো তো গেলই, জল মুখে-চোখে পর্যন্ত ছিটকে এল। খানিকটা দুর্গন্ধ পচা জল—বোধ হয় কোনো ডাস্টবিন্ থেকে চুইয়ে বেরিয়ে এসেছে।

শালাব—একটা অশ্লীল গাল দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে হেমন্তবাবু।

চারদিকে অন্ধকার—কালো কালির মতো অন্ধকার। তমসার নিশ্ছিদ্র যবনিকা দিয়ে কেউ যেন সব কিছুকে ঢেকে রেখে দিযেছে। সরু গলির মধ্যে চলতে চলতে নোনাধরা ঠাণ্ডা দেওয়ালে বারকয়েক ধাক্কা খেলো হেমন্তবাবু। জুতো দিয়ে বেড়ালের মতো কী একটা জানোয়ারকে মাড়িযে দিলে, তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠল সেটা। ছুঁচো।

—শালার—

টলতে টলতে হেমন্তবাবু বড়রাস্তায় বেরিয়ে এল।

—শালার যুদ্ধ বেধেছে। সব অন্ধকার। পড়ুক—পড়ুক, বোমা পড়ুক। বাবুরা তো পালিয়ে বাঁচল, আমি এণ্ডি-গেণ্ডি ছানাপোনা নিয়ে পালাই কোথায়?—বিড় বিড় করে হেমন্তবাবু বকতে লাগল: পড়্—পড়্, জাপানী বোমা—লাগ্ বাবা ভানুমতীর খেল্। চুরমার হয়ে যা সব—খাস্তা হযে যা। খেঁদী মরুক—আমাকে ঘর থেকে বার করে দিলে। মরুক—মরুক—সব মরুক—

—কিন্তু—হেমন্তবাবুর নেশায় আচ্ছন্ন মগজের ভেতরে হঠাৎ চেতনার বিদ্যুৎ খেলা করে গেল। নিজের বাড়ির কথা এতক্ষণে মনে পড়েছে—পঞ্চানন শিকদার লেনের সেই একতলা ঘরখানার কথা। হঠাৎ হেমন্তবাবুর কান্না পেল। মরবে, মরবে? তার ঘর আছে, ছেলেপুলে আছে। টুনু, বুঁচি, বিজলী আছে—স্ত্রী আছে। না—না, কখনো বোমা পড়বে না। হেমন্তবাবু মরবে না, তারা মরবে না—সবাই বাঁচবে—বাঁচবে—

সবাই বাঁচবে। হেমন্তবাবুর মুখ চেয়ে এতগুলি প্রাণী বেঁচে আছে। মাথার ওপর

টপ টপ করে বর্ষার জল পড়ছে—আস্তে আস্তে ফিরে আসছে সম্বিৎ। নাঃ, খুব অন্যায় হচ্ছে। আর নেশা করবে না হেমন্তবাবু। কাল থেকে এ পথে আর পা দেবে না সে। যুদ্ধ লেগেছে, যুদ্ধ একদিন থামবে; এই ব্ল্যাক-আউট থাকবে না, সূর্য উঠবে, অন্ধকার মিলিয়ে যাবে ছায়া হয়ে। সবাইকে বাঁচতে হবে।

জোর পা চালিয়ে দিলে হেমন্তবাবু—নেশায় ক্লিষ্ট পায়ে যতটুকু জোর পাওয়া যায়। ঘরের কথা মনে পড়েছে—মনে পড়েছে টুনু—বুঁচি—বিজলীর কথা—

কিন্তু ভালো করে মনে পড়বার আগেই মাথায় যেন প্রচণ্ড একটা হাতুড়ির ঘা পড়ল। চোখের সামনে অন্ধকার কলকাতা ভেঙে গেল হাজার টুক্‌রো হয়ে, শেষবারের মতো আলো দেখতে পেলো হেমন্তবাবু। রাশি রাশি আলো—অজস্র আলো—হাজার হাজার ফুলঝুরির ঠিকরে-পড়া গণনাতীত আলো!

ট্যাক্সি-ড্রাইভার মুহূর্তের জন্যে ব্রেক্ কষলে, পরক্ষণেই বিদ্যুতের মতো ছুটিয়ে দিলে গাড়িটাকে।

রমলা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছে। ব্যাকুল গলায় বাসুদেব বললে, এই রোখো, রোখো, আদমী চাপা পড়ল যে—

ড্রাইভার গাড়ি থামালে না, বরং আরো স্পীড্ বাড়িয়ে দিলে।

—রোখো—রোখো—

—চুপ্‌চাপ রহ্ যাইয়ে বাবুজী—মাতোয়ালা থা—ড্রাইভারের কণ্ঠ নিরাসক্ত।

—তাই বলে—

ড্রাইভার যেন ধমক দিলে এইবার। পুরো ছয়হাত পাঞ্জাবী, গলার স্বরে কর্কশ নিষ্ঠুরতা ফুটে বেরুল: বাস্ বাস্। পুলিস পাকড়নেসে আপ্‌কো ভি মুস্কিল হো যায়গে। উও মাতোয়ালা থা—মোটরকা আগ্‌মে আ পড়া—

তা সত্যি। মাতাল নিজের দোষে চাপা পড়েছে—তার জন্যে কে দায়ী? যে মাতাল সে গাড়ি চাপা পড়বেই—হয় বাসুদেবের, নইলে আর কারুর। বাসুদেবের ট্যাক্সির নিচে সে স্বর্গলাভ করল—এ দুর্ভাগ্য তার নয়, বাসুদেবেরই।

অতএব—

অতএব আরো জোরে ছুটিয়ে চলো মোটর। শীতের রাত্রি—গরম বিছানা, নিশ্চিন্ত আরাম। এমন সময় পুলিসের হাঙ্গামায় পড়ার অর্থ যে কী শোচনীয় তা বাসুদেব জানে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, কতদিন যে তার জের চলবে কে জানে।

তা ছাড়া যুদ্ধ থামলে রমলাকে নিয়ে পার্ল হারবারে যাবে বাসুদেব, যাবে ম্যানিলায়। সে বহু দূরের পথ। এখানে এখনি তার ট্যাক্সি থাম্‌লে চলবে কেন!

ওদিকে বেশ জমিয়ে নিয়েছে আদিত্য।

জেলখানার একটি মনোরম ঘরে সে আশ্রয় পেয়েছে। আদিত্য ভাবছে: হমেনন্ত্—হমেনন্ত্! স্বর্গসুখ ভোগ করা আর কাকে বলে! দিল্লীর দেওয়ানী খাস যাঁরা গড়েছিলেন—তাঁদের শোচনীয় দুর্ভাগ্য যে জেলখানার এই ইন্দ্রপুরী তাঁরা দেখতে পেলেন না!

কত বড় বাড়ি, আর তার কী রাজকীয় বন্দোবস্ত। আকাশ-ছোঁয়া প্রাচীর, লোহার শিকের বেড়া। অতি সাবধান, অতি সতর্ক। পৃথিবীতে কারো সাধ্য নেই এখন তাকে স্পর্শও করতে পারে। সে আজ রাজবাড়ির অতিথি—স্থায়ী একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই যে একটা দুর্বোধ্য রহস্য বলে মনে হচ্ছে! বাগানের ম্যানেজার খুন হয়েছে, অতএব কলকাতার আমদানি আদিত্যকে ধরে চালান দাও। কে ম্যানেজার, কী হয়েছে, কিছুই সে জানে না। কিন্তু কিছু না জানাতেও যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আশা করা যাচ্ছে বেশি কিছু বোঝবার আগেই তার শাস্তিও হয়ে যাবে। বেঁচে থাকুন রাজা হবুচন্দ্র আর তাঁর গবুচন্দ্র মন্ত্রী। মানুষকে তাঁরা অনেক মূল্যবান শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

শুধু একটা জিনিস খচ খচ করছে মনে। অনিমেষের হল কী? অমন ভাবে তাকে চিঠি দিয়ে ডেকে আনবার তাৎপর্যটাই বা কী হতে পারে? কিছুই করতে পারল না আদিত্য। লাভের মধ্যে ডি. এস. পি. তাকে অনেক তর্জনগর্জন করলেন, স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে পাঁয়তারা ভাঁজলেন অনেকখানি।

—Perhaps you know many things about the murder Babu! Confess it like a nice chap and get rid of all these troubles!

—বিশ্বাস করো সাহেব, আমি কিছু জানি নে।

—ইম্‌পসিবল্! আমি বলিটেছে—টোমাকে কন্‌ফেস করিটে হোইবে।

তুমি তো বলিতেছ—কিন্তু আমাকে কী কন্‌ফেস্ করিটে হোইবে? মেনে নিতে হবে যে, আদিত্য রবার্টসকে খুন করেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের দায়মুক্তি হয়ে যাবে, তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সে নিশ্চিন্ত মনে পাইপ ধরাবে! আদিত্য পরোপকার করতে নেহাৎ অরাজী নয়; কিন্তু দধীচির মতো অত বড় আত্মত্যাগে তার আপত্তি আছে। তা ছাড়া উপকার করবার লোকের অভাব নেই সংসারে—সাহেবকে ঠিক অতখানি যোগ্য ব্যক্তি বলে কোনোমতেই আদিত্য মেনে নিতে পারেনি।

ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। নিশ্চিন্তে হাজতে আশ্রয় পেয়েছে আদিত্য। কলকাতায় খবর পাঠিয়েছে, ওখান থেকে যতক্ষণ ব্যবস্থা না হয়—ততক্ষণ এখানেই বাস করতে হবে। তাছাড়া যে রকম ব্যাপার—জামিন দিলে হয়।

সাহেব চটে বলেছে, আমি টোমাকে ডেখিয়া লইবে।

আদিত্যের হাসি পেয়েছিল। জবাব দিয়েছে, লইয়ো।—তারপর সাহেবের ভাষার প্যারডি করে বলেছে: শাদা চোখে ডেখিতে না পারিলে, মাইক্রোসকোপ লইয়া ডেখিয়ো।

দুঃখের কথা, সাহেবের রসজ্ঞান নেই। সুতরাং ঘৃতাহুতি পড়েছে আগুনে। বলেছে: টুমি বড্‌মাস আছে।

—তা তো বটেই। 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ'—ইতি দুই বিঘে জমি।

সাহেব খানিকক্ষণ সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকেছে আদিত্যের মুখের দিকে। পাগল নয় তো লোকটা?

তারপর বলেছে, লে যাও।

—তোমারও দিন একদা আসবে বৎস—সেডিন আমিও টোমাকে ডেখিয়া লইবে—স্বগতোক্তি করে পুলিসের পাহারায় চলে এসেছে আদিত্য। নীল চোখ দুটোতে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আড়াল থেকেও ঝড় ঝিকিয়ে উঠেছে। যতদূর মনে হচ্ছে কিছুই হবে না, দিন কয়েক বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে শুধু। কিন্তু কাজ নষ্ট হয়ে গেল। অনিমেষের কী হল—ব্যাপারটাই বা কী ঘটেছে আসলে কিছুই বুঝতে পারছে না।

সুতরাং আপাতত কম্বলাসনে যোগনিদ্রায় মগ্ন হয়ে থাবা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। যোগনিদ্রাই বটে! কম্বলের এই মনোহর শয্যায় যোগী ছাড়া শয়নানন্দ উপভোগ করা একটু শক্ত। লোহার খোঁচা খোঁচা তারের মতো কম্বলের রোঁয়া, তার সংঘর্ষে গায়ের ছাল-বাকলসুদ্ধ উঠে আসবার উপক্রম করে। পুলিসী শাসনের সুযোগ্য সহকারী রূপে তার ভেতরে কৌরব-অক্ষৌহিণীর মতো অগণ্য ছারপোকা রৌরব যন্ত্রণা স্মরণ করিয়ে দেয়। হঠাৎ আদিত্যের একটা থিয়োরী মনে এল। রাজদ্রোহীদের দমন করবার শ্রেষ্ঠ উপায় ফাঁসিকাঠ নয়; তুড়ুং ঠোকবার মতো এই একখানা কম্বল বাধ্যতামূলকভাবে গায়ে জড়িয়ে রেখে তাদের তিনদিন ঠায় বসিয়ে রাখা। ব্যাস, আর দেখতে হবে না। ফাঁসির চাইতে সেটা অনেক বেশি শিক্ষাপ্রদ এবং হিতকর হবে।

ঠিক আদিত্যের ভাববার প্রতিধ্বনি করেই যেন পাশের যোগশয্যা থেকে আর একজন যোগী বললে, উঃ—শালার কী ছারপোকা রে! 'বাগ্‌' নয়তো 'বাঘ'!

বোঝা গেল লোকটির ইংরেজি বিদ্যা আছে। হঠাৎ আদিত্যের কৌতুক বোধ হল। একটু আলাপ জমাবার ইচ্ছেও হ'ল সঙ্গে সঙ্গে।

—ঠিক বলেছেন মশাই। একেবারে সোঁদরবনের বাঘ। চুষে আঁটি বের করে ফেললে।

ঘরে দুর্গন্ধ অন্ধকার—কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু আদিত্য টের পেলো সমর্থন পেয়ে

পাশের বিছানায় লোকটি উৎসাহিত হয়ে উঠে বসেছে।

—আপনিও ভদ্রলোক নাকি! বাঁচালেন মশাই, একটা কথা কইবার লোক পাওয়া গেল। খোট্টা আর মেড়োর পালের ভেতরে পড়ে প্রাণটা ছটফট করছিল। তারপর, এখানে ঢুকলেন কী মনে করে?

—সাধ করে কি আর ঢুকেছি! ধরে ঢোকালে আর কী করতে পারি বলুন?

—তা বটে। উত্তরে পাশের ভদ্রলোকটি খুশি হয়েছে বলে মনে হল: কী করেছিলেন?

আদিত্য নিরাসক্ত গলায় জবাব দিলে, বেশি কিছু নয়, এক ভদ্রলোকের পকেট হাতড়েছিলাম।

—আরে, একই দলের যে—ভদ্রলোকটি রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল: আমারও অবস্থা ওই রকম। বললাম, বিড়ি খুঁজছিলাম—তা বিশ্বাস করলে না। বলে, পরের পকেটে কেন? জবাব দিলাম, ভিড়ের মধ্যে নিজের আর পরের পকেট বুঝতে পারিনি। তা ব্যাটাদের ধর্মভয় নেই—ব্রাহ্মণসন্তানকে এনে হাজতে ঢোকালে। পাপের ভরা ওদের পূর্ণ হয়ে উঠেছে মশাই, দেখবেন দুদিন পরেই জাপানী বোমা ওদের ঠাণ্ডা করে দেবে।

যাক্—সঙ্গটা ভালো। একে ভদ্রলোক, তার ওপরে ব্রাহ্মণসন্তান।

—ঠিক বলেছেন। ব্রহ্মশাপ ক্ষত্রিয় পরীক্ষিৎ এড়াতে পারলে না তো ম্লেচ্ছ ইংরেজ কোন্ ছার!

—আপনি রসিক লোক। বিড়ি আছে দাদা?

—না মশাই, কোথায় পাবো?

—ধ্যাৎ, কোনো কাজের লোক নন আপনি। পয়সা-টয়সা লুকোনো আছে কোথাও? থাকে তো দিন, ওয়ার্ডার ব্যাটাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণান্ত করলে হয়তো মিলতে পারে।

—না, পয়সাও নেই।

—ধ্যাৎ—কিছু হবে না আপনাকে দিয়ে—ব্রাহ্মণসন্তান আবার নিরাশ চিত্তে কম্বলাসন গ্রহণ করলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, এই বুঝি প্রথম এলেন?

—হুঁ—আর আপনি?

—এবার নিয়ে বার-পাঁচেক হল। কী করব মশাই। লেখাপড়া শিখিনি, চাকরি পাই না। ঘরে বউ আছে, ছেলেপিলে আছে। বাঁচতে তো হবে একরকম করে!

বাঁচতে হবে। সব চাইতে বড় কথা, সব চাইতে নিষ্ঠুর আর নির্মম সত্য। কিন্তু বাঁচবার অধিকার নেই। প্রতি পদে পদে তাদের খর্ব করো, প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে তাদের ঠেলে দাও সুস্থ জীবন আর সহজ মনুষ্যত্বের সীমারেখার বাইরে—গ্লানি আর অপরাধের ক্লেদ-পঙ্কিল

অন্ধকার গহ্বরটার ভেতরে। সেখানে তারা হাহাকার করুক, তারা আর্তনাদ করুক—আকাশ-ফাটানো গলায় স্রষ্টা আর সৃষ্টিকে অভিসম্পাত করুক। কিন্তু তোমরা তা শুনতে পাবে না। তোমাদের এখন 'জাজ্' রেকর্ডে নাচের সুর বাজছে, তোমাদের রূপালি পর্দায় এখন কোকোনাট গ্রোভের প্রেমস্বপ্ন মদির হয়ে উঠেছে, তোমাদের বেতারযন্ত্রে এখন কম্বুকণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে বিজয়ী বাহিনীর জয়যাত্রার ইতিহাস। সম্মুখের রণাঙ্গনে তোমাদের সেনাবাহিনী কামানগর্জনে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে এগিয়ে চলেছে—তাদের বুটের তলায় পড়ছে রক্তের ছাপ—ঔপনিবেশিক মৃত্তিকার অধিকার নিয়ে ক্ষমতালুব্ধ শক্তির সংগ্রাম। তোমরা পেছনের কালো গহ্বরের দিকে তাকিয়ো না, উপনিবেশকে আয়ত্ত করো, কিন্তু উপনিবেশের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো না, দুঃখ পাবে—লজ্জা পাবে, নিজেদের কীর্তির পরাকাষ্ঠায় নিজেরাই স্তম্ভিত হয়ে যাবে। তার চাইতে জাজ্ রেকর্ড, সিনেমার গান, বেতারের প্রচণ্ড কলরব এবং রণাঙ্গনের কামান-নির্ঘোষের মধ্যেই শ্রবণেন্দ্রিয়কে তলিয়ে দাও—এত বড জগৎ—এমন বিপর্যস্ত বিপ্লববিক্ষুব্ধ জগৎ তার মাঝখানে বিন্দুবৎ হয়ে মিলিয়ে যাবে। মনে রেখো, অনেক মানুষকে অমানুষ না করলে তোমরা অতিমানুষ হতে পারবে না।

আদিত্য আস্তে আস্তে বললে, হ্যাঁ, বাঁচতে হবে বইকি।

—কিন্তু বাঁচতে দিচ্ছে কে দাদা? যা যুদ্ধ বেধেছে। আমি চলে এলাম জেলে—ছেলেপুলেগুলো না খেয়ে মরবে? ব্যাটারা এনে জেলে ঢোকাতে পারে, কিন্তু খেতে দিতে পারে না কেন বলতে পারেন মশাই?

—যেদিন খেতে দিতে পারবে, সেদিন আর জেলখানা থাকবে না। খেতে দিতে চায় না বলেই তো পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার জেলখানা ওরা গড়ে রেখেছে।

লোকটি কী বুঝল কে জানে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপরে বললে, হুঁ, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।

বাইরে থেকে সেন্ট্রি ধমক দিলে রূঢ় গলায়।

—আই—বাত্‌চিত্‌ মত্‌ করো। চুপসে নিদ যাও—

ধর্মরাজ্যের ধর্মশালায় অক্ষুণ্ণ শান্তি বিরাজ করতে লাগল। শুধু মাঝে মাঝে দূরে কাছে সেন্ট্রির জুতোর শব্দ বিচিত্র ভাবে পাষাণপুরীর অন্ত্য-প্রত্যন্তে পড়তে লাগল মূর্ছিত হয়ে, আর অকারণে কান পেতে শব্দটা শুনতে লাগল আদিত্য।

বারো

চা-বাগানে জ্যোৎস্নার জোয়ার নেমেছে।

দু'হাজার 'একার' প্ল্যান্টেশনের ওপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ। শীতের রাত্রে আকাশে ম্লান কুয়াশার অস্পষ্ট ছায়া আবর্তিত হচ্ছে—কিন্তু মেঘ নেই কোনো-খানে। দিগন্তে কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণমুকুটকে ভালো করে চেনা যাচ্ছে না—শুধু একটা অতিকায় কৃষ্ণতার ওপরে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে খানিকটা ম্লান তাম্রাভ দীপ্তি। ডুয়ার্সের ঘন অরণ্য জ্যোৎস্নায় আর শিশিরে অপরূপ হয়ে আছে।

দু'হাজার 'একার' প্ল্যান্টেশনের ওপরে জ্যোৎস্না ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কুয়াশায় একটু-খানি ফিকে, একটুখানি বিষণ্ণ। তবুও আকাশ-গলা জ্যোৎস্না, নরম স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না—বাসর-রাত্রির বাতায়নে প্রসন্ন আশীর্বাদের মতো পিছলে-পড়া চিরন্তন জ্যোৎস্না। চা-বাগানের বিস্তীর্ণ শ্যামলতার ওপরে তার অবলেপ পড়েছে, যেন কালো সাঁওতাল মেয়ের মুখে চন্দনের পত্রলেখা পরিয়ে দিয়েছে কেউ।

এমন রাত্রে বাগানের শোষিত পীড়িত কুলিরাও যেন হঠাৎ প্রাণ পেয়ে ওঠে। ওই জ্যোৎস্না যেন সাঁওতাল পরগণার পাহাড় আর মহুয়া ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু এখানে সাঁওতাল পরগণার পাহাড় নেই—মহুয়াও নেই। আছে ফ্যাক্টরী, আছে ম্যানেজার, আছে ক্ষুদে লাটবাবুরা, আর আছে অত্যাচার। তবু এমনি রাত্রে মহুয়ার বদলে ওরা সরকারী মদে বন্য যৌবনকে জ্বালিয়ে তোলে, এমনি রাত্রে ওদের মাদলে পাহাড়-ভাঙা পাগলা ঝরণার ছন্দ লাগে।

কিন্তু আজ ব্যতিক্রম। এ যুগ আলাদা, একালের রূপ স্বতন্ত্র। এ দেশ সাঁওতাল পরগণা নয়। সহজ অরণ্য-জীবনের সরল কাব্য যান্ত্রিক জটিলতায় প্রত্যক্ষ সংঘাতের রূপ নিয়েছে। শুধু বিচ্ছিন্ন ভাবে এই চা-বাগানেই নয়, সমগ্রব্যাপী বিপ্লব-সমুদ্রের জোয়ার এসে দোলা দিয়েছে ওদেরও ধমনীতে।

চা-বাগানের পাশেই ফরেস্ট শুরু। ডুয়ার্সের যোজনব্যাপ্ত শালবনের একটি প্রান্ত জ্যামিতিক ত্রিভুজের সূক্ষ্মাগ্রের মতো রংখোরা চা-বাগানকে ছুঁয়ে গেছে। চা-বাগানের পাশে সেই শালবনের ভেতরে কুলিদের বৈঠক বসেছে।

গভীর রাত—ঘুমন্ত অরণ্য। বাতাস নেই, শালের পাতায় শিরশিরানি পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। ঘুমিয়েছে হরিয়াল, ঘুঘু, বনমুরগী। জঙ্গলের মধ্যে সতর্ক পায়ে চলা সম্বর আর চিতি হরিণের চোখেও যেন ঘুম জড়িয়ে এসেছে। শুধু ঝোপের আড়ালে হয়তো পাইথনের হিংস্র চোখ জেগে আছে অসতর্ক দুর্ভাগা শিকারের প্রতীক্ষায়।

আর জঙ্গলের মধ্যে জেগে আছে হিংস্র জানোয়ারের চাইতেও হিংস্র একদল মানুষ।

শালপাতার ফাঁক দিয়ে হয়তো স্বপ্নের মতো মিষ্টি জ্যোৎস্না ঝিলিক দিয়ে পড়েছিল, কিন্তু তীব্রতর আগুনের আলোয় সে জ্যোৎস্না হারিয়ে গেছে। একরাশ কাঠ-কুটরো জেলে নিশীথ সভার আয়োজন করেছে কুলিরা। লাল আগুন ওদের কালো মুখগুলোকে বিচিত্র ভাবে রাঙিয়ে দিয়েছে—যেন যজ্ঞাগ্নির কুণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে কতগুলো অগ্নিময় পুরুষ—দ্রুপদের হবি-হুতাশন থেকে প্রতিহিংসামূর্তি ধৃষ্টদ্যুম্নের দল।

ছবির মতো সবাই নীরব হয়ে আছে।

—ঝং—ঝং—

স্তব্ধ বনভূমিকে চকিত করে দূরে কোথায় পাহাড়ীদের 'ঝাঁকড়ী' বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল মানুষগুলো, নড়েচড়ে বসল একবার। তারপর কথা বললে হীরালাল।

হীরালাল। কুলিদের সর্দার। তিরিশ বছর চাকরি করছে এই বাগানে। পনেরো বছর ভুগেছে ম্যালেরিয়ায়—পাঁচ বছর কালাজ্বরে। আর দীর্ঘ তিরিশ বছর বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু ঢেলে দিয়ে বাড়িয়েছে বিলাতী মালিকের লোভের পুঁজি। তারপর আজ বছরখানেক ধরে বুকের ভেতরে বাসা বেঁধেছে মরণকীট,—যক্ষ্মা। তিরিশ বছর একনিষ্ঠ সেবার পুরস্কার। নিঃশব্দে দিনের পর দিন এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর পথে।

কিন্তু মরবার আগে জ্বলে উঠতে চায় একবার। দেখে যেতে চায় নতুন যুগের গোড়া-পত্তনি। এতদিন শুধু দিয়েই এসেছে—ফিরে পাওয়ার যে লগ্নটা এল তার পদধ্বনি একবার অনুভব করে নিতে চায় নিজের মধ্যে। অন্ধকারের শেষ পৈঠায় পা দিয়ে একবার পেছন ফিরে দেখে নিতে চায় আকাশে সূর্য উঠছে।

হীরালাল ডাকলে, মংরু, ডোমন!

ডাকটা একেবারে বেজে উঠল গমগম করে। কঠিন, গম্ভীর গলা। পাহাড়ীদের ঝাঁকড়ীর শব্দ ছাপিয়েও যেন তার ডাক বনের প্রান্তে প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হয়ে পড়ল। মাথার ওপরে শালের ডালে ঝট্‌পট্ করে পাখা ঝাড়া দিলে একটা ঘুমন্ত পাখী।

বলিষ্ঠদেহ দুজন উঠে দাঁড়ালো। একজন সাঁওতাল, আর একজন ওঁরাও। নতুন আমদানি, চা-বাগানের বিষ এখনো ওদের রক্তে ক্রিয়া করেনি। আগুনের আলোয় ওদের চোখে প্রতিহিংসারূপী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রেতচ্ছায়া।

—ঠিক আছে। এখন বৈঠ যাও। বিচার হবে।

নীরবে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, নিরুত্তরেই বসে পড়ল।

—তোমরা তীর মেরেছিলে?

—হাঁ।

—কে মারতে বলেছিল?

—পঞ্চায়েত।

আবার স্তব্ধতা। শুধু সামনের আগুনটা পাতা পোড়ানোর একটা বিচিত্র শব্দ করে জলে যেতে লাগল। আর দূরে বাজতে লাগল পাহাড়ীদের ঝাঁকড়ী—ওরা ভূত তাড়াচ্ছে, রবার্টসদের প্রেতাত্মাগুলোকেই হয়তো।

—কে কে ছিল পঞ্চায়েতে?

সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন উঠে দাঁড়ালো। দুজন বুড়ো, তিনজন আধবুড়ো। সব চাইতে যে বুড়ো তার নাম দুলীরাম। কয়েক বছর আগে এই দুলীরামের ছেলেকে ইলেকট্রিক ডায়-নামোর বেল্ট ভেতরে টেনে নিয়েছিল, রক্তাক্ত টুকরো কয়েক মাংস ছাড়া তার আর কিছু পাওয়া যায়নি। অনেক কায়দাকানুন করে কোম্পানি পুলিসের হাঙ্গামা এড়িয়েছিল আর দুলীরামের ক্ষতিপূরণ মিলেছিল নগদ একশো টাকা। কিন্তু ক্ষতিপূরণে ক্ষত শুকোয়নি।

—এক, দুই, তিন—হীরালাল গুনতে লাগল: মোট সাত। সাতজন বরবাদ।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই যেন নিশ্বাস বন্ধ করে একটা চরম মুহূর্তের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে।

হীরালাল চারদিকে তাকিয়ে নিলে একবার। শুভ্র ভ্রূরেখাটা আবর্তিত হয়ে গেল বিচিত্র ভঙ্গিতে। বনের মধ্যে এতক্ষণে একটু একটু হাওয়া দিয়েছে, পোড়া পাতাগুলো উড়তে লাগল, আগুনের একটা দীর্ঘ শিখা বেঁকে গিয়ে হীরালালের মুখটাকে যেন আরো বেশি করে রক্তাক্ত করে তুলল। হীরালাল বললে, পঞ্চায়েতের ভুল হয়েছিল। ব্যানার্জি বাবু কি কোনোদিন তোমাদের বলেছিল মানুষ খুন করতে?

সবাই নড়েচড়ে উঠল, কেউ কথা বললে না।

—একটা দুটো মানুষকে খুন করে দাবি মেটে না, ওতে নিজেদেরই খুন ঝরে যায়, নিজেদেরই দুব্‌লা করে ফেলে। আমি জ্বর হয়ে পড়ে ছিলাম, সেই ফাঁকে তোমরা এ কাজ করে ফেলেছ। কী লাভ হল এতে?

নির্বাক সভার ওপর একটা তীব্র দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হীরালালই বললে, কারো লাভ হল না। মাঝখান থেকে পুলিস এসে হাত বাড়ালো—বাবুরা বিনা দোষে জেলে চলে গেল। তোমাদের কাজ পেছিয়ে গেল দশ বছর। এর জন্যে দায়ী কে?

দায়ী কে তা সবাই জানে। তাদের উত্তর এত স্পষ্ট যে ভাষা দিয়ে তা বোঝাবার দরকার নেই। নীরবে নিজেদের অপরাধ তারা কবুল করে নিয়েছে।

হীরালাল বললে, এক—দুই—তিন—সাতজন আবার দাঁড়াও।

সাতজন ফের উঠে দাঁড়ালো।

—তোমরা ক্ষতি করেছ কাজের। ক্ষতি করেছ সমস্ত মজুরের, ক্ষতি করেছ দুনিয়ার যত গরীব পরিবারের। এর সাজা তোমাদের নিতে হবে।

অপরাধী সাতজন ছাড়া বাকি মানুষগুলো এককণ্ঠে সাড়া দিলে এইবারে: আলবৎ।

—তা হলে সকলে একমত ?

সমস্ত অরণ্য মুখর করে আবার সাড়া উঠল : আলবৎ।

—তোমরা—তোমরা সাতজন শোনো। আজ রাতেই সব হেঁটে সদরে চলে যাও। কবুল করো দোষ—বলো আমরা সাহেবকে খুন করেছি। কী বলো আর সবাই ?

—আলবৎ।

—কেউ বেইমানি কোরো না, কেউ পালিয়ো না। হয়তো মরতে হবে, হয়তো ফাঁস হবে তোমাদের। কিন্তু তোমরা মরলে তাতে দুনিয়ার মানুষের আরো বেশি লাভ হবে। এক-আধটা দুশমন নয়—সব দুশমনের জান নেবার জন্যে হাতে হাতিয়ার তৈরি হবে তাদের। যাও—আজ রাতেই সব সদরে চলে যাও—

সভায় চাঞ্চল্য দেখা দিল, কিন্তু অপরাধীরা দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মতো নিস্তব্ধ। সামনের আগুনটা এতক্ষণে প্রায় নিবে এসেছে, এতক্ষণে শালের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে ওদের চোখেমুখে। প্রতিহিংসা-কঠোর অগ্নিমূর্তিগুলো ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নায় অকস্মাৎ যেন বিচিত্র কোমল আর করুণ হয়ে গেছে।

—উ—উ—

কঠিন সংযম সত্ত্বেও একটা চাপা কান্নার গোঙানি ডোমনের বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল। আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে, সামনে অফুরন্ত জীবনের আশা—রক্তে রক্তে উদ্বেলিত যৌবন। কদিন আগেই সাঙা হয়েছে তার—প্রথম প্রেম, প্রথম মিলনের নেশা এখনো তার চেতনার ভেতরে ছড়িয়ে রয়েছে। তার ফাঁস হয়ে যাবে! ফুরিয়ে যাবে সমস্ত—মিটে যাবে জীবন।

অসহায় হাহাকারটা চাপা কান্না হয়ে বেরিয়ে এল : উ—ই—

—চুপ—বাজের মতো গর্জে উঠল হীরালাল : কাঁদে কে—কোন্ শুয়োরের বাচ্চা ? মরতে যে ডর করে, মারতে তার হাত ওঠে কেন ? সে পুরুষ না মেয়েমানুষ ?

তিরিশ জোড়া চোখ পলকে ডোমনের ওপরে গিয়ে পড়েছে। তিরিশ জোড়া চোখে শুধুই ঘৃণা—অমানুষিক ঘৃণা—যে ঘৃণা দিয়ে তারা দেখত রবার্টসকে, যাদব ডাক্তারকে। কোনোখানে একবিন্দু সহানুভূতি নেই, এতটুকু আশ্বাসও নেই।

দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলে নিলে ডোমন। মাথা ঘুরছে—চোখের সামনে সব শূন্য হয়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতরে ডুকরে উঠছে কান্নার উচ্ছ্বাস। ফাঁসি হবে তার—সে মরে যাবে! পৃথিবীতে দুঃখ আছে—অপমান আছে; কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আছে চাঁদ, আছে শালফুলের গন্ধ, আছে বাঁশি, আর—

কিন্তু উপায় নেই। এ বিচার। এর নির্ধারণ মৃত্যুর মতো নির্ভুল।

শুকনো পাতা পড়ে সম্মুখের আগুনটা আবার জ্বলে উঠেছে দপ দপ করে। কালো

মূর্তিগুলোর গায়ে আবার ছড়িয়ে পড়েছে সেই আশ্চর্য আগের রক্তাভা। আর হীরালাল জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডোমনের দিকে—গলা দিয়ে তার একটা শব্দ বেরুলে বাঘের মতো যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়বে !…

……:শালবনের মধ্যে রাত ঘনিয়েছে, আরো নিবিড়, আরো নিঃশব্দ। পাতায় পাতায় চলেছে বাতাসের কানাকানি—কুহেলিগ্রস্ত জ্যোৎস্না জঙ্গলের মধ্যে আঁকছে অপরূপ পত্রলেখা।

আর আলো-আঁধারির বনপথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে সাতজন। স্থির, অকম্পিত, সুনিশ্চিত। ওদের মধ্যে ডোমনকে চেনা যাচ্ছে না। তাই বুঝতে পারা যাচ্ছে না তার পা কাঁপছে কি না, তার চোখে ছড়িয়ে আছে কিনা অপমৃত্যুর আতঙ্ক। অন্ধকার পথ দিয়ে ওরা এগিযে চলেছে শহরের দিকে—

কিন্তু ওরা জানে : ওই ফাঁসিকাঠ চিরদিন থাকবে না। অনেক পাপ, অনেক মিথ্যার সঙ্গে সঙ্গে রবার্টসরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ওদের সাতজনের মৃত্যুর পেছনে জেগে উঠবে সাত হাজার—সাত লক্ষ—সাত কোটি—সংখ্যাতীত, গণনাতীত জীবন। ওই ফাঁসিকাঠে সেদিন মানুষেব রক্ত ফুল হয়ে ফুটে উঠবে—সে ফুল অহিংসার, সে ফুল মৈত্রীর—সে ফুল কল্যাণেব।

তেরো

‘কল’ থেকে ফিরে মণিকাদি দেখল অনিমেষ আর সুমিতা তখনো বসে বসে নিশ্চিন্তে গল্প করছে।

হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে মণিকা ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, সুমি, অনিমেষকে খেতে দিসনি এখনো ?

—খায়নি। তুমি এলে একসঙ্গেই খাবে বলেছে।

মণিকা চটে উঠল : কেন ? একসঙ্গে কেন ? বেলা কটা বেজেছে খেয়াল আছে ? রোগীকে এতক্ষণ না খাইয়ে রাখলি, তুই ভয়ানক ইরেস্‌পন্‌সিবল সুমি।

অনিমেষ হাসল, খামোখা বেচারাকে বকছ মণিকাদি। ওর দোষ নেই।

—না, কারো দোষ নেই। তুই এখন ওঠ্ তো সুমি। চটপট গরম জল নিয়ে আয় অনিমেষের। ঝি'টা বাজার করে দিয়ে যায়নি বুঝি এবেলা ? নাঃ—সবাই মিলে হাড় জালিয়ে দিলে আমার।

নতুন গৃহিণীর সংসার পাতবার মতো ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে মণিকা। নতুন সংসার বইকি। চিরকাল কেটেছে নিজের সংক্ষিপ্ত গণ্ডিরেখার মধ্যে, বৈচিত্র্যহীন নিঃসঙ্গ জীবন-

যাত্রার ভেতরে। খসরুর চিরন্তন রান্না, হাসপাতাল, ডিউটি, রোগী দেখে বেড়ানো। বাড়ি ফিরে এক-একদিন নিজেকে কেমন অবলম্বনহীন আশ্রয়হীন বলে মনে হয়েছে। বঞ্চিত মাতৃত্ব আর রিক্ত নারীত্ব জীবনযুদ্ধের কঠিন বর্মটার তলায় রক্তটাকে মাঝে মাঝে চঞ্চল করে তুলেছে, ঘুমভাঙা নিশীথ রাত্রে নির্জন নরেন্দ্র সেন স্কোয়ারটার মতো নিজেকেও অস্বাভাবিক শূন্য বলে বোধ হয়েছে।

আজ অনিমেষ একান্তভাবে তারই আশ্রয়ে এসেছে। আর তার দেখাশোনা করতে এসেছে সুমিতা। হঠাৎ যেন সব পূর্ণ হয়ে গেছে। মণিকাদির কল্পকামনা এক ধরনের পরিতৃপ্তি খুঁজে পেয়েছে যেন, এতদিন পরে সংসার বেঁধেছে সে।

খাওয়ার টেবিলে বসে মণিকা বললে, নাঃ, এতে চলবে না। আমি বিকেলে নিজেই বেরুব, বাজার করে আনব। অনিমেষের এখন ভালো নিউট্রিশন দরকার।

অনিমেষ ছোট্ট করে হাসল: কিন্তু আজ বিকেলে আমি চলে যেতে চাই মণিকাদি।

—সে কি! মণিকা আর সুমিতা দুজনেই একসঙ্গে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

—হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে। না গিয়ে উপায় নেই।

জোর করে হাসবার চেষ্টা করলে মণিকা: পাগল! এখন এই শরীর নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে কে তোমাকে? বাড়ির বাইরে তোমাকে এক পা বেরুতে দেওয়া হবে না।

অনিমেষ তেমনি ছোট করে হাসল, জবাব দিল না। সে হাসি সংক্ষিপ্ত, তার অর্থও সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ কোনোমতেই তাকে রাখা যাবে না। বাইরের ডাকে আজ সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাকে ধরবার ক্ষমতা কারো নেই। মণিকার স্নেহেরও নয়, সুমিতার প্রেমেরও নয়।

সুমিতার মুখের ভাত মুহূর্তে তেতো হয়ে গেছে। শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কোথায়?

—গার্ডেনে। রংঝোরা চা-বাগানে।

—চা-বাগানে!

—হ্যাঁ। পালিয়ে এসে ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। মাথার ঠিক ছিল না। ধরমবীর কী করেছে না করেছে, কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। ওটাও এক পাগল—যা-তা করতে পারে। কিন্তু এখন আর আমার থাকা চলে না—ফিরে যেতেই হবে।

—কিন্তু পুলিস—

অনিমেষ হাসল: পুলিস আর কী করবে? ওদের হাঙ্গামাকে ভয় করি না, ভয় করি নিজের মনের অপরাধকে। কোনো দোষ করিনি, কোনো অন্যায় করিনি—কেন পালিয়ে আসব চোরের মতো, খুনীর মতো? বরং যারা খুন করেছে, তাদের এখনি এ পথ থেকে

ফিরিয়ে আনা দরকার, তাদের বোঝানো দরকার, শক্তিকে অপচয় করবার কোনো সার্থকতা নেই, আসন্ন আগামী বিপ্লবের জন্যে তাকে সংহত করতে হবে।

—কিন্তু এই শরীরে—

—ও কিছু না, দুদিনেই চাঙ্গা হয়ে উঠব। অত সহজে মরলে কি আমাদের চলে?—প্রসন্ন হাসিতে অনিমেষের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: ইংরেজের দৈত্যকুলে আমরা প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপু গণনৃসিংহের হাতে না মরা পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু নেই।

মেয়েরা দুজনেই চুপ করে রইল। একজনের দৃষ্টি হতাশায় ম্লান, আর একজনের মুখ বেদনায় পাণ্ডুর। প্লেটের ভাত কারও আর মুখে উঠছে না।

—তা ছাড়া সব চেয়ে বড় কথা এই, অবিলম্বে আদিত্যদার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। অকারণে হয়রান হতে হচ্ছে বেচারাকে। আমি না গেলে কিছুই করা চলবে না। আর আদিত্যদা ফিরে না এলে এদিকের কাজকর্ম সব পণ্ড—

এ যুক্তির কোন প্রতিবাদ নেই। একটা আকস্মিক তিক্ততায় ভরে উঠল মণিকার মন। বৃথা—বৃথা। এদের নিয়ে দু'দিনের জন্যেও নিজেকে পূর্ণ করে তোলবার কল্পনা অর্থহীন। এদের রক্তে রক্তে ঝড়ের রাত্রির ফেনায়িত সমুদ্রের আহ্বান। সেই মাতাল সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে এরা উদয়-তীর্থের পথে নৌকো ভাসিয়েছে। হয় ভরাডুবি হবে—অথবা কোনো একদিন, কে জানে কবে—সার্থকতার বন্দরে গিয়ে পৌঁছুবে।

আর সুমিতা ভাবছিল: একরাত্রির মোহ—একরাত্রির স্বপ্ন। প্রথম এবং শেষ বাসর। তার মাথাটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল অনিমেষ, সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। ব্যক্তি-জীবনের চরম সার্থকতা এসেছিল আকস্মিকভাবে, আকস্মিক ভাবেই ঘটল তার শেষ পরিণতি। ক্ষণিকের জন্যে লোভ এসেছিল—ক্ষণিকের জন্য এসেছিল দুর্বলতা। কিন্তু নিজের হাতেই অনিমেষ শেষ করে দিলে তাকে, তার বিস্মৃতি-জাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলে। তিন বছর আগে যেমন করে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল একদিন। সেদিন মন ছিল কাঁচা, সেদিনের স্বপ্নভঙ্গ বেজেছিল অত্যন্ত নির্মমভাবে, বুকের ক্ষতচিহ্ন থেকে অনেক রক্ত ঝরে পড়েছিল। কিন্তু আজ আর সে দুর্বলতা নেই—পথ চলতে নেমে অনেক কঠোর হয়ে গেছে—নিজের সীমার ওপারে মহাজীবনের নির্দেশ—আত্মকেন্দ্রিকতার বাইরে সর্বময় মানবতার নির্দেশ পেয়েছে সে। তবু একটি রাত্রির ফুল—একটি রাত্রির মাদকতা। বন্ধুর পথে চলতে চলতে যখন নিজের ভেতরে ক্লান্তি ঘনিয়ে আসবে, সেদিন এই ফুলের গন্ধ, এই মাদকতার মাধুরী তাকে প্রাণ দেবে।

সুমিতা মৃদুকণ্ঠে বললে, আজকেই যাওয়া দরকার?

—হ্যাঁ, আজই।

মণিকাদি কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হল না। বাইরে দরজায় সজোরে কড়া

নাড়ছে কে যেন। এমন ভাবে কড়া নাড়ছে যেন ভেঙে ফেলবে।

পুলিস নয় তো! মুহূর্তে রক্তহীন হয়ে গেল সুমিতা আর মণিকার মুখ। প্রায় আর্তকণ্ঠে মণিকা চিৎকার করে উঠল: কে?

—আমি বিকাশ। সুমিতাদি আছে?

বিকাশ। দলের ছেলে। সুমিতা ভাত ফেলে উঠে পড়ল। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। জিজ্ঞাসা করলে, কী হয়েছে?

—সাংঘাতিক ব্যাপার সুমিতাদি।

—কী হল?

—এশিয়াটিক আয়রনে স্ট্রাইকারদের ওপর গুলি চলছে।

গুলি চলছে! মুহূর্তে ইঙ্গিতময় স্তব্ধতায় ভরে গেল সব। মণিকা তাকিয়ে রইল বিহ্বল দৃষ্টিতে, সাগ্রহ উত্তেজনায় অনিমেষের চোখ জ্বলতে লাগল।

সংশয়গ্রস্ত ক্ষীণ গলায় সুমিতা জিজ্ঞাসা করলে, আমাদের কোনো ছেলে—

—হ্যাঁ, ইন্দুর বুকে লেগেছে একটা।

ইন্দু! কবি ইন্দু! সুমিতার মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরুল শুধু। মুহূর্তে টেবিল থেকে উঠে এল অনিমেষ। চোখে আগুন; বিকাশকে বললে, চলো।

অনিমেষকে দেখে বিকাশ চমকে উঠল।—অনিমেষদা! আপনি এখানে?

—হ্যাঁ, আমি এখানে। সেসব কথা পরে হবে। এখন চলো। ইন্দু বাঁচবে তো?

—বলা যায় না—

—চলো, চলো—

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে মণিকাদি দেখলে কেউ নেই। বিকাশ নেই, অনিমেষ নেই, সুমিতাও নেই। যেন ছায়াবাজির মতো মিলিয়ে গিয়েছে।

মণিকা পাথরের মতো বসে রইল টেবিলে। অনিমেষ আর সুমিতার অর্ধভুক্ত প্লেটের দিকে তাকিয়ে তার চোখ জ্বালা করতে লাগল। তারপর টপ টপ করে চোখের জল ঝরে যেতে লাগল নিজের প্লেটটার ওপরে।

না—সত্যিই যুদ্ধ বেধেছে কলকাতায়। আর থাকা চলে না। মণিকা এবার কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাবে—যেখানে হয়, যতদূরে হয়। দৃষ্টির সামনে সমস্ত কলকাতা শূন্য আর ঝাপসা হয়ে গেছে।

* * * * *

আসামীরা একরার করেছে এসে। জেল থেকে বেরিয়েই কলকাতায় ফিরেছে আদিত্য।

লক্ষ্যহীনের মতো পথ দিয়ে চলতে লাগল সে। ক'দিনের একটা ঘূর্ণিঝড়েই সমস্ত আয়োজনটা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। এশিয়াটিক আয়রনে গুলি চলবার পরের দিনই সুমিতার

চারতলা বাড়ির সংসারে নজর দিয়েছিল পুলিস। অনেককে ধর-পাকড় করেছে, বাকি সব আবার কোন্ অন্ধকারের মধ্যে ছিটকে পড়েছে, তার ঠিকানা নেই। আবার তাদের খুঁজে বার করতে হবে, আবার কাজ শুরু করতে হবে নতুন করে।

অনিমেষ, সুমিতা জেলে। ইন্দু হাসপাতালে, বাঁচবে কিনা ঠিক নেই। কবি ইন্দু! ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চারতলা শূন্য বাড়িটার দিকে আদিত্য একবার তাকালো। গোটা দুই শক্ত শক্ত তালা ঝুলছে লোহার গেটে। কে তালা দিয়েছে কে জানে—বোধ হয় পুলিস।

একবার থেমে দাঁড়িয়েই চলতে শুরু করেছিল আদিত্য, হঠাৎ হাওয়ায় একটুকরো ছেঁড়া কাগজ এসে তার জুতোর সঙ্গে যেন জড়িয়ে গেল। কী মনে করে কাগজখানাকে তুলে নিলে সে।

কবি ইন্দুর কবিতার একটা ছেঁড়া পাতা। রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছিল। অনেকগুলো অক্ষর একেবারে ধুয়ে গেছে। তবু দুটো লাইন পরিষ্কার পড়া যায় এখনো:

ছেঁড়া তারে ঘেরা ভাঙা ট্রেঞ্চের মলিন অন্ধকারে
মৃত সৈনিক উষার স্বপ্ন দেখে।

মাথার ওপরে কর্কশ ধ্বনিতে বিমান উড়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ। গণতন্ত্রের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে। ভারতের শৃঙ্খলিত বুকের ওপরে ট্যাঙ্কের চাকা কেটে কেটে বসে যাচ্ছে—স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র আসছে বইকি। কিন্তু এ যুদ্ধে নয়, এ যুদ্ধে তার প্রস্তুতি মাত্র।

উজ্জ্বল নীলকান্ত মণির মতো তীব্র দৃষ্টিতে সন্ধ্যার কালো আকাশের দিকে তাকালো আদিত্য। মৃত সৈনিকের চোখে উষার স্বপ্ন। কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণশিখর থেকে সাগর-প্রান্তের কলকাতা পর্যন্ত—আসমুদ্র হিমালয় সূর্য-সারথির রথচক্রে মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে॥

শিলালিপি

—বাবার স্মৃতির উদ্দেশে—

লেখকের নিবেদন

এই বইয়ের সব চরিত্রই কাল্পনিক। নামসাম্য, স্থানসাম্য কিংবা ঘটনাসাম্য যদি কোথাও কিছু পাওয়া যায়, তা হলে সে সব নিছক যোগাযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সম্পর্কে লেখকেরও কোনো দায়িত্ব নেই।

প্রথম অধ্যায়

এক

আকাশে শাদা মেঘের পাল, নিচে মহাজনী নৌকোর।

বড় ভালো লাগছে অলস কর্মহীন চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে। মনে হচ্ছে ওই নৌকোগুলো আর কিছুই নয়—পদ্মার ঘোলাজলের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে অতিকায় কয়েকটা চখাচখী।

পদ্মা। গভীর, গম্ভীর। খড়্গাধার জলতরঙ্গ। নিজের রক্তের সঙ্গে তার সংযোগ আছে। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পদ্মার কলধ্বনি শুনতে শুনতে কেমন যেন ঘোর ঘনিয়ে আসে চেতনায়। আর তখন, ঠিক তখনই শোলাবনের নিচে হঠাৎ কে যেন হেসে ওঠে খল্ খল্ শব্দে। একটি ছোট্ট নদী—তার নাম আত্রাই।

শিশির-ঝরা কোনো একটা আশ্চর্য সকালে সে চোখ মেলেছিল। চোখ মেলেছিল পদ্মের একটা কুঁড়ির মতো। কিন্তু তখন কি জানত অগ্নিকমল হয়ে ফুটে উঠবে তার সেই দৃষ্টি? শিশির-ঝরা সকাল পথ হারিয়ে ফেলবে মৃত একটা আগ্নেয়গিরির চড়াই-উত্‌রাইয়ে?

তারপরে একটা নিঃসীম সমতলের দেশ। বাতাসে ঢেউ-জাগানো ধান। সুখী, স্বাস্থ্যবান আর কর্মী মানুষের মুখের ওপর রামধনু-রঙা আলো। তার হাতের কাস্তেটা যেন চাঁদ-ঝরা জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া।

তারও পরে আবার সেই শিশির-ঝরা সকাল। সেই আত্রাই নদীর খল্ খল্ শব্দ।

কিন্তু এখনও তো প্রখর পদ্মার মুখর তরঙ্গ। ওপারে বালুচর চোখে ধাঁধা লাগায়—চোখে পড়ে না জনপদ, বালিতে ঘূর্ণি ঘুরে ছুটে যায় কোনো অদৃশ্য চিতার ধোঁয়ার মতো। মৃত আগ্নেয়গিরির শেষ নিশ্বাস—ওরই ওপর দিয়ে এখনো তার দীর্ঘপথ।

—রঞ্জনদা!

ঘুম থেকে জেগে উঠল অন্তরীণবন্দী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তারবাবুর মেয়ে সীতা।

—কী খবর সীতু?

—নান্টুকে দেখেছেন এদিকে?

—না তো। কেন, কী হয়েছে?

—ইস্কুল থেকে পালিয়ে এসেছে—খবর পেয়ে রাগারাগি করছেন বাবা। ভারী দুষ্টু ছেলে হয়েছে।

রঞ্জন হাসল: ইস্কুল থেকে পালিয়েছে বলে অত নিন্দা করছ কেন? হয়তো বড় হয়ে

রবীন্দ্রনাথ হবে।

—ছাই হবে।—পাতলা ঠোঁট দুটিতে এক ঝলক স্নেহভরা ভৎর্সনা ফুটিয়ে তুলল সীতা: ইস্কুল থেকে পালাতে শিখলে কিছু আর হবে ওর? বয়ে যাবে একদম।

সীতা চলে গেল।

পদ্মার উপর থেকে উঠে এল একটা হু-হু-করা বাতাস। পেছনের বন্ধ দরজাটা শব্দ করে খুলে গেল; আর দরজা খোলবার সেই শব্দটা হঠাৎ যেন একটা ইথারের ঢেউকে আশ্রয় করল—স্পন্দিত হতে হতে ভেসে চলল সময়ের আকাশ দিয়ে পনেরো বছর পেছনে; যেখানে ইস্কুল-পালানো একটি দিনের দরজা খুলল—হঠাৎ শুক্তি-খুলে-যাওয়া নিটোল মুক্তোর মতো উজ্জ্বল একটি দিন!

ইস্কুল-পালানোর সুবুদ্ধিটা প্রথম বাতলে দিল বাদল।

ভয় যে না করছিল তা নয়। বাড়িতে কড়া শাসন—একেবারে নিখুঁত ভালো ছেলে করে গড়ে তোলবার চেষ্টায় ত্রুটি নেই কারো। বিশেষ করে বাবার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাবার কল্পনাও করতে পারে না রঞ্জু। বাইরের বারান্দায় তাঁর চটির শব্দ পেলেই অন্তরাত্মা একেবারে শুকিয়ে যেতে থাকে। অপরাধের অঙ্কটা তো সারাদিনে নেহাৎ মন্দ জমা হয়ে ওঠে না। ছোট বোনের ঝুঁটি ধরে টেনে দেওয়া, তেঁতুল গাছে উঠে টক কাঁচা তেঁতুল চিবানো, ঠাকুরমার আচার অপহরণ, গদাযুদ্ধ করতে গিয়ে বালিশ ফাটানো, পড়ার সময় মেজদার সঙ্গে বল খেলা এবং যথানিয়মে সে বলের রান্নাঘরে ডালের গামলায় অবতরণ। সন্ধ্যাবেলা বাবার চটির শব্দে আদালতের পরোয়ানা বয়ে আনে এবং ফাঁসির আসামীর মতো ম্লান মুখে বসে থাকে রঞ্জু। সময়মতো ঠাকুরমা যদি কপালগুণে এসে পড়েন সে যাত্রা রক্ষা মেলে, নইলে দু-চার ঘা অনিবার্য এবং দৈনন্দিন।

কিন্তু ইস্কুল পালানো! সে ভয়ঙ্কর, সে কল্পনাতীত। বাবা যদি টের পান তাহলে পিঠের চামড়া সেলাই করতে যে মুচি ডাকতে হবে এ নিঃসন্দেহ। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে রঞ্জু বললে, না ভাই।

—দুর, বোকা তুই, খালি ভয় পাস। তোর বাবা জানবে কী করে? আমি তো রোজই ইস্কুল পালাই, কই কাকা তো টের পায় না।

—না, আমার ভয় করে।

—তবে তোর ভয় নিয়ে তুই বসে থাক—বাদল বিরক্ত হয়ে উঠল: আমি খরগোশ মারতে যাই।

—খরগোশ মারতে যাবি!—এতক্ষণে রঞ্জুর মুখে বিস্মিত কৌতূহল দেখা দিল: কী করে মারবি ভাই? কোথায় পাবি?

বাদল ততক্ষণে বসে পড়েছে বকুল গাছের ছায়ার নিচে। চারদিকে ছড়িয়ে গেছে

অজস্র ফুল—ভিজে ঘাসের সঙ্গে তার স্বপ্নের মতো গন্ধ ভাসছে বাতাসে। একটু দূরে আত্রাই। তার খাড়া পাড়ের ওপরে শিমুল গাছের ন্যাড়া ডালগুলো আলো হয়ে আছে—রাঙা টকটকে ফুলে আত্রাইয়ের নীল-ঘোলাটে জলে পাল তুলেছে পাঁচশো-মণী ধানের নৌকো, চলেছে কাঁটাবাড়ির গঞ্জের দিকে।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করলে রঞ্জু, একবার তাকিয়ে দেখল সোনারতলী ইস্কুল যাওয়ার রাঙা রাস্তাটা, রবিশস্যের ঐশ্বর্যে ভরপুর সোনালি বড মাঠটার ভেতর দিয়ে যেটা এঁকে বেঁকে ঈশানপুকুরে বটতলায় গিয়ে হারিয়ে গেছে। বাদলের মুখের দিকে একটা চোরা-চাহনি ফেলে নিজেও ঘাসের ওপরে বসে পড়ল।

বাদল নিশ্চিন্ত আরামে বকুল গাছটায় হেলান দিয়ে বসেছে। ছিঁড়ে নিয়েছে চোর-কাঁটার একটা লম্বা ডাঁটা, অখণ্ড মনোযোগে চিবিয়ে চলেছে সেটাকে। আধবোজা চোখে দুষ্টুমিভরা একটা ভঙ্গি করে বললে, কই, গেলি নে ইস্কুলে ?

—আগে বল্, কোথায় খরগোস মারতে যাবি ?

বাদল বললে, কেন বলব ? তুই তো আমার সঙ্গে যাবি না। বরং ইস্কুলে গিয়ে আমার নামে লাগাবি, আর পণ্ডিত আমাকে ধরে ঠেঙিয়ে দেবে।

—সত্যি বলছি কাউকে বলব না।

—যাবি আমার সঙ্গে ?

রঞ্জুর বুক কেঁপে উঠল : কিন্তু বাবা—

—ধ্যাৎ—চিবোনো চোর-কাঁটাটা ফেলে দিয়ে বাদল বিরক্তিভরে উঠে পড়ল : তোকে বলাই আমার ভুল হয়েছে। ভীতুর ডিম কোথাকার !

—না ভাই, তবে আমাকেও নিয়ে চল।

—কাউকে বলবি না তো ?

—কক্ষণো না।

বাদল বললে, তবে আয়।

খরগোশ মারবার আয়োজন সত্যিই তৈরি। বাদলের বুদ্ধি দেখে রঞ্জুর তাক লেগে গেল।

ছোট আমবাগানটা পেরিয়ে দুজনে এল চণ্ডীবাড়িতে।

গ্রামের বারোয়ারীতলা এই চণ্ডীবাড়ি। দুর্গাপূজো কালীপূজোর সময় এখানে চালা তোলা হয়, প্রতিমা আসে, বাজনা বাজে, লোকের ভিড় জমে। তিন রাত যাত্রাগান হয়। তারপর সারাটা বছর পড়ে থাকে অনাদৃত হয়ে, এলোমেলো আগাছা গজায়, সাপের আমদানি হয়, শেয়ালের আসর বসে। বোধনের বড় বেলগাছটা থেকে অসংখ্য কাঁচাপাকা বেল চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে, শুকিয়ে শুকিয়ে পাকা বেলগুলো কালো হয়ে যায়, কিন্তু কেউ

কুড়োতে যায় না—লোকে বলে ওখানে ব্রহ্মদৈত্য আছে। নিঝুম রাত্রে চারদিকের পৃথিবী যখন থমথম করে, চণ্ডীবাড়ির আগাছা জঙ্গলের আনাচে কানাচে ঝিঁঝিরা যখন আশ্চর্য তীব্র-গলায় ঝিঁ ঝিঁ করতে থাকে, শেয়ালের সাড়া পেয়ে গাঁয়ের কুকুরগুলো যখন ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে—তেমনি সময়, ঠিক তেমনি সময় আচমকা জেগে ওঠে একটা অদ্ভুত খট্ খট্ শব্দ, কে যেন খড়ম পায়ে দিয়ে হেঁটে চলেছে, তাকে দেখা যায় না, শুধু তার শরীরের অতি-বিশাল একটা ছায়া অন্ধকার দিগ্‌দিগন্তের ওপর দিয়ে পিছলে চলে যায়।

চণ্ডীবাড়িতে ঢুকতে রঞ্জুর পা আর ওঠে না।

—এখানে কেন এলি বাদল?

—বাঃ রে, এখানেই তো খরগোশ।

—ব্রহ্মদৈত্য আছে ভাই, আমি যাব না।

—ব্রহ্মদৈত্য না তোর মুণ্ডু। সব বাজে কথা—

এক লাফে বাদল উঠে পড়ল চণ্ডীমণ্ডপে। ক্যাঁচক্যাঁচ করে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করলে একদল চামচিকে, পাখা ঝটপট করে তিন-চারটে উড়ে চলে গেল বাইরে। রঞ্জুর সমস্ত শরীরটা ছমছম করে উঠল। বড় বেলগাছটা দুলছে—কেমন বিশ্রীভাবে যে দুলছে! কখন ওখান থেকে খড়ম পায়ে ব্রহ্মদৈত্য নেমে আসবে কে বলতে পারে!

ততক্ষণে বাদল অবতীর্ণ হয়েছে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে। হাতে করে এনেছে দুটো ধনুক, আর একরাশ প্যাঁকাটির তীর। তীরগুলোর মাথায় ছোট ছোট পেরেক বসিয়ে একেবারে মোক্ষম করে তৈরি করা হয়েছে। একবার লাগলেই আর দেখতে হবে না—খরগোশের পতন ও মৃত্যু!

—বাঃ, চমৎকার হয়েছে।

—চমৎকার হবে না?—অসীম আত্মতৃপ্তিতে বাদল হেসে উঠল: কাল সারা দুপুর বসে বসে বানিয়েছি। একেবারে রামের ধনুক হয়েছে—হয়নি রে?

—তা তো হয়েছে। কিন্তু এখান থেকে এখন চল ভাই—

—আঃ গেল যা! তুই যে ভয়েই মরে যাচ্ছিস। জানিস হাতে তীর-ধনুক রয়েছে, রামচন্দ্রের নাম করে যেই বাণ ছুঁড়ব, অমনি ব্রহ্মদৈত্য একেবারে ঠাণ্ডা।

—ব্রহ্মদৈত্য আর মারতে হবে না, কোথায় খরগোশ আছে দেখাবি চল্।

চণ্ডীবাড়ির একেবারে গা ঘেঁষেই শুরু হয়েছে কবিরাজের বড় আমের বাগান। একটা পায়ে চলার সরু পথ ঠাণ্ডা ছায়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। রওনা হল দুজনে।

ফাল্গুন মাস। কবিরাজের আমবাগান মুকুলে মুকুলে ছেয়ে গেছে। শুকনো পাতারা ছড়িয়ে আছে সমস্ত বাগানময়, তাদের ওপর ঝির ঝির টপ টপ করে ঝরছে মৌ। মধুর গন্ধে বাতাসেরও যেন নেশা ধরে গেছে, ঠাণ্ডা মিষ্টি ছায়াটা আছে আচ্ছন্ন আর অভিভূত

হয়ে। পুরানো আমগাছের শ্যাওলাধরা মোটা গুঁড়িতে জড়িয়ে উঠেছে পরগাছা, হালকা নীল রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ধরেছে এখানে ওখানে। জংলা বাগান, মাঝে মাঝে গুলঞ্চের লতা দুলছে, পায়ের নিচে অসংখ্য ভুইচাঁপা এক একটা রোদের ঝলক পড়ে মণি-মুক্তোর মতো ঝলমলিয়ে উঠছে। আর উড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে পাহাড়ী মৌমাছি, উড়ে বসছে মধুভরা মুকুলে, আকাশী-রঙের অর্কিডগুচ্ছে, আর ভুইচাঁপার পাতলা পাতলা বেগুনী পাপড়িতে।

বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে এখন বেশ ভালো লাগছে রঞ্জুর। ইস্কুল পালিয়েছে—বাড়ির রূঢ়তম শাসনের ভয়কে অস্বীকার করেই বেরিয়ে পড়েছে দুপুরের এই রোমাঞ্চকর অভিযানে। নিষিদ্ধ আনন্দের উত্তেজনা ঝিনঝিন করে বাজছে রক্তের মধ্যে। ওদিকে এতক্ষণে ক্লাস নিচ্ছে ধনঞ্জয় পণ্ডিত। টেবিলের ওপরে জোড়া বেত, মুখে বাঘের মতো গর্জন! সমস্ত ক্লাসটা আতঙ্কে কাঁপছে—মধ্যপদলোপী আর বহুব্রীহি সমাস বিভীষিকার মতো রাজত্ব করছে।

আর এই বাগান। ঘুমের মতো ঠাণ্ডা। পায়ের নিচে মধুতে চট্‌চটে শুকনো পাতাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে—জড়িয়ে যাচ্ছে স্নেহের মতো। ইস্কুলের পথটা চলে গেছে সর্ষেফুলের সোনালি রঙে ভরা উজ্জ্বল মাঠের ভেতর দিয়ে, কিন্তু এখানে ছায়া, এখানে মিষ্টি গন্ধ আর পাহাড়ী মৌমাছির গুঞ্জন যেন আর একটা দেশের—আর একটা পালিয়ে যাওয়া জগতের সন্ধান আনছে।

—কোথায় তোর খরগোশ ভাই?

—আর একটু দাঁড়া না, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

বাগান ছাড়তেই খানিকটা নিচু জমি। বর্ষায় আত্রাইয়ের জল আসে—তখন নজীপুরের সীমানা পর্যন্ত টানা একটা বিল হয়ে যায়, থই থই করে ঘোলা জলে, মেঠো পিঁপড়েতে ভরা দামঘাসের শিষগুলো ঢেউয়ে দোলা খায়। তারপরে জল নেমে গেলে, থকথকে কাদায় আর একটু টান ধরলে জন্মায় বিশল্যকরণীর জঙ্গল। এদেশে বলে 'বিশ্‌লা'।

বিশ্‌লার জঙ্গল। জঙ্গল বললে ঠিক হয় না, কালচে সবুজ আর লালের একটা বিশাল সমুদ্র যেন। এদিকে লোকের যাতায়াত বড় নেই, একটু দূরে ভাগাড়ে মরা গোরু ফেলার উপলক্ষে যা দু-চারজন আসে যায় মাত্র।

বাদল বললে, এর ভেতরে খরগোশ আছে।

—এই জঙ্গলে!

—হ্যাঁ, এই বিশ্‌লার বনে। অনেক আছে, বুঝলি? সাঁওতালেরা এসে সেদিন তিন-চারটে মেরে নিয়ে গেল। তাই দেখেই তো আমি তীর ধনুক তৈরি করলাম।

—কিন্তু খুঁজে পাবি কী করে ?

—দ্যাখ্ না। তুই জঙ্গলের ভেতর হৈ হৈ করে ছুটে যাবি, আমি তীর ধনুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। তাড়া খেলেই ব্যাটারা বেরিয়ে আসবে আর আমি তীর দিয়ে পটাপট মেরে ফেলব। সাঁওতালরা সেদিন অমনি করেই মারল কিনা। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শিখে নিয়েছি।

—আচ্ছা। কিন্তু যা জঙ্গল, যদি সাপ থাকে ?

—দূর বোকা—বাদল হো হো করে হেসে উঠল : সাপ থাকবে কেন ?

—বাঃ, জঙ্গলে সাপ থাকবে না ?

—আরে, এ যে বিশ্‌লা।

—বিশ্‌লা তো কী হয়েছে ?

—ধ্যাৎ, কিচ্ছু জানিস না তুই—বাদল আশ্চর্য হয়ে গেল রঞ্জুর অজ্ঞতায় : এর আসল নাম কী জানিস ? হুঁ হুঁ, এ বাবা বিশল্যকরণী। রামায়ণের গল্প পড়িস নি ?

রঞ্জু মাথা নেড়ে জানাল সে পড়েছে।

—লক্ষ্মণকে যখন শক্তিশেল মেরেছিল ইন্দ্রজিৎ, তখন হনুমান গন্ধমাদন বয়ে বিশল্যকরণী নিয়ে এল না ? আর তাইতেই তো লক্ষ্মণের প্রাণ বেঁচে গেল। তবে ?

রঞ্জু তবু বুঝতে পারল না, তাকিয়ে রইল।

—বিশ্‌লার বনে সাপ থাকতে পারে না, গন্ধেই পালিয়ে যায়। কোনো ভয় নেই, তুই ওদিক থেকে তাড়া দে। এক্ষুণি কান উঁচু করে দৌড়ে বেরিয়ে আসবে'খন। তারপর তুই তীর মারবি, আমিও মারব, দেখি ব্যাটারা পালায় কী করে।

অসীম আত্মবিশ্বাসভরে একটা ছোট টিলার ওপরে তীর-ধনুক বাগিয়ে দাঁড়ালো বাদল। নিতান্তই বাখারির ধনুক আর প্যাঁকাটির বাণ, নইলে মনে করা যেতো অর্জুনের মতো এই মুহূর্তে বাদল একটা ভয়ঙ্কর এবং প্রলয়ঙ্কর কিছু ঘটিয়ে বসতে পারে।

—কোন্ দিক থেকে তাড়া দেব ?

ধনুকটা আরো জুৎসই করে বাগিয়ে নিয়ে বাদল বললে, যেদিক থেকে খুশি। তুই বড্ড বকাস রঞ্জু। ওদিকে আবার দেরি হয়ে যাবে, খেয়াল আছে তো ?

তা বটে। ইস্কুল ছুটির সময়টা নাগাদ বাড়ি পৌঁছুতেই হবে যেমন করে হোক। নইলে হাতেনাতেই ধরা পড়তে হবে এবং তার পরিণতি যে কী ঘটবে সেটাও অনুমান করা শক্ত নয় একেবারে।

—দে দে, তাড়া দে। ওই ওদিক থেকে—হৈ-হৈ—হায়—উৎসাহের আধিক্যে বাদলও টিলার ওপর থেকে লাফিয়ে জঙ্গলের মধ্যে নেমে পড়ল। আর ব্যাপারটাও ঘটল ঠিক সেই সময়ে।

—কক্—কক্—কক্—

জঙ্গলের ভেতর থেকে উঠল একট বিশ্রী বেখাপ্পা শব্দ। এ তো খরগোশের আওয়াজ নয়। দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—কক্—কক্—কক্—

আচমকা বিশ্‌লার বন তোলপাড় করে, প্রবল ঝট্‌পট্‌ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে এল একটা বিকট বিভীষিকা। একটা পাখি বটে, কিন্তু রাক্ষুসে পাখি। দেড়হাত লম্বা মিশ-কালো একটা ন্যাড়া গলা, পিট্‌পিট্‌ করছে লাল বর্ডার দেওয়া গোল গোল চোখ। মস্ত বড় ঠোঁট দুটোকে ফাঁক করে সে তেড়ে আসছে ওদের দিকে, তার পাখার ঝাপটে খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হয়েছে বিশ্‌লার বনে। বিশল্যকরণীর জঙ্গলে সাপ না হয় নাই থাকল, কিন্তু বক-রাক্ষস যে বাস করতে পারবে না এমন কথা তো রামায়ণে লেখা নেই।

—ওরে বাপরে, হাড়গিলা পাখি—

বীর ধনুর্ধর বাদলের দুর্জয় গাণ্ডীব হাত থেকে খসে পড়েছে, জঙ্গল ভেঙে উর্ধ্বশ্বাসে আমবাগানের দিকে ছুটেছে বাদল। রঞ্জু যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে, ভয়ে তার পা সরছে না, শুধু সম্মোহিতের মতো পাখিটার লাল টকটকে মস্ত হাঁ-টার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

চমক ভাঙল বাদলের আর্তনাদে।

—পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়। হাড়গিলা পাখি, এক্ষুণি হাড়টাড়সুদ্ধ গিলে ফেলবে—

—ওরে বাবা—

কোথায় রইল তীর ধনুক, কোথায় রইল ব্রহ্মদৈত্যবধের কঠিন সংকল্প। দুজনে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলে, এখনও বুঝি কক্ কক্ করে পেছনে পেছনে তেড়ে আসছে পাখিটা। চক্ষের পলক ফেলতে না ফেলতে বাদল অদৃশ্য হয়ে গেল, আর একটা লাটা-ঝোপের কাঁটাবনে জামাকাপড় জড়িয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল রঞ্জু। মুখ থেকে বেরিয়ে এল কাতর কান্নার একটা প্রবল শব্দ।

একটু দূরে জঙ্গলের ভেতরে গুলঞ্চের লতা সংগ্রহ করছিলেন অবিনাশবাবু। রঞ্জুর কান্নার শব্দ তিনি শুনতে পেলেন। চমকে তাকাতেই চোখে পড়ল কাঁটাবনের ভেতরে একটি ছোট ছেলে ছট্‌ফট্‌ করছে। কী সর্বনাশ, সাপেটাপে কামড়াল নাকি!

অবিনাশবাবু দ্রুত ছুটে এলেন।

—এ কি, রঞ্জন!

রঞ্জু জবাব দিল না, ব্যথায়, লজ্জায় আর ভয়ে দু চোখ দিয়ে তার টপটপ করে জল পড়ছে। হাতমুখ ছড়ে গেছে কাঁটায়, গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। চারদিকে ছড়িয়ে আছে বই, খাতা, শ্লেট, পেন্‌সিল।

—সর্বনাশ, এ কি হয়েছে! এই জঙ্গলেই বা ঢুকেছিলে কেন?

তবু জবাব নেই। দুঃখের পাত্র পূর্ণ হয়ে গেছে। বাবার কাছে খবরটা আর চাপা থাকবে না। ইস্কুল পালিয়েছে, জামা কাপড় ছিঁড়ে গেছে, রক্তারক্তি হয়ে গেছে সমস্ত শরীর। খড়মের বাড়িতে পিঠের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে না আজকে—একবার রাগলে বাবার মেজাজ বাঘের চাইতেও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। রঞ্জুর বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন বরফের মতো জমাট বেঁধে গেল। হাড়গিলা পাখিটা হাড়-মাসসুদ্ধ তাকে টক করে আস্ত গিলে ফেললে এর চাইতে বরং ঢের ভালো হত সেটা।

স্নেহে করুণায় অবিনাশবাবুর চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এল। দুখানি বলিষ্ঠ হাতে রঞ্জুকে তিনি তুলে আনলেন বুকের মধ্যে, কুড়িয়ে নিলেন বইখাতাগুলো। বললেন, দুষ্টু ছেলে! এই ভরদুপুরবেলা এমন জঙ্গলের ভেতরে আসতে আছে কখনো!

অবিনাশবাবুর বিশাল বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল রঞ্জু।

কাটা জায়গাগুলো বেশ করে ধুয়ে আইডিন লাগিয়ে দিলেন অবিনাশবাবু, তারপর পেছন দিকের জানালাটা দিলেন খুলে। আত্রাইয়ের বুক থেকে এক ঝলক ভিজে বাতাস এসে রঞ্জুর সর্বাঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—তা হলে বলো, দুপুরবেলা জঙ্গলে ঢুকেছিলে কেন?

রঞ্জু নতমস্তকে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল, জবাব দিলে না।

—ইস্কুল পালিয়েছিলে, কেমন?

রঞ্জু তেমনি নিরুত্তর।

—এবার তবে তোমার বাবাকে খবর পাঠিয়ে দিই, কী বলো?

রঞ্জু কেঁদে উঠল।

অবিনাশবাবুর একখানা মস্ত বড় হাত সস্নেহে রঞ্জুর পিঠের ওপরে নেমে এল। স্নিগ্ধ গলায় বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, খবর না হয় দেব না। কিন্তু কী করছিলে বলো।

—বাবাকে বলবেন না তো?

—তুমি যদি সত্যি কথা বলো, তা হলে এ যাত্রা তোমায় বাঁচিয়ে দিতে পারি। ওখানে কেন গিয়েছিলে?

—ওই বাদল—

—হুঁ, এক নম্বর বাঁদর ছেলে। তা বাদল কী করেছে?

পাংশু মুখে রঞ্জু ঘটনাটা বিবৃত করে গেল।

—ছিঃ ছিঃ, এমন কাজ কখনো করতে আছে! এইটুকু বয়েস থেকেই মিথ্যে কথা বলতে শিখছ, এখনও তো সমস্ত জীবনটা পড়ে রয়েছে! অন্যায় দিয়ে শুরু করলে সারাটা জীবনই যে অপরাধের বোঝা টেনে কাটাতে হবে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

রঞ্জু চমকে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে তাকালো। সে মুখে রাগের চিহ্নমাত্র নেই,

চোখের দৃষ্টিতে একটুখানি কৌতুকের আভাসই উঁকি দিচ্ছে বরং। তবু রঞ্জুর মনে হল, বাড়ির নিষ্ঠুর শাসনের চাইতেও কঠিন একটা নির্মমতা লুকিয়ে আছে অবিনাশবাবুর কণ্ঠস্বরে, অবিনাশবাবুর ধিক্কারের জ্বালাটা যেন ধনঞ্জয় পণ্ডিতের জোড়া বেতের চাইতেও তীব্র বেগে ওর পিঠের ওপরে এসে পড়েছে।

—কী বলো, এমন আর করবে কখনো ?

কান্নাভরা গলায় রঞ্জু জবাব দিলে, না।

অবিনাশবাবু খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে বললেন, বেশ, খুশি হলাম। অন্যায়কে চিনতে শেখো, তাকে স্বীকার করতে শেখো। আমি আরো বেশি খুশি হবো, যদি তুমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে যা করেছ সব খুলে বলতে পারো : আমি অন্যায় করেছি, শাস্তি দিন আমাকে।

—বাবা তাহলে মেরে ফেলবেন।

অবিনাশবাবু হাসলেন, না, মারবেন না। আর যদি মারেন, তাহলেও পাওনা হিসেবেই সেটা তোমার মেনে নেওয়া উচিত। কেমন, তাই না ?

রঞ্জু মাথা নিচু করে রইল। বোঝা গেল, সাত-আট বছরের একটি ছেলের মধ্যে অতটা সৎসাহস এখনো সঞ্চারিত হয়ে ওঠেনি। ওর মুখের ওপর থেকে অবিনাশবাবু দৃষ্টিটা দেওয়ালের ওপরে সরিয়ে নিলেন।

বিচিত্র লোক এই অবিনাশবাবু। সকলের মাঝখানে থেকেও তিনি সকলের চাইতে আলাদা, তাঁর চারদিকে যেন একটা কুয়াশার আড়াল। গ্রামের প্রান্তে একটা ছোট টিনের বাড়িতে একা বাস করেন তিনি। এ দেশের লোক নন, তাঁর দেশ কোথায় তাও কেউ জানে না। হঠাৎ যেন আকাশ থেকে একদিন নেমে এসেছেন অবিনাশবাবু। তিনি স্বদেশী, তিনি কাজ করেন কংগ্রেসের।

কংগ্রেস। একটা স্বপ্নের মতো নাম, রূপকথার মতো অপূর্ব বস্তু একটা। রঞ্জু মাঝে মাঝে বাবার মুখে শুনেছে কথাটা। কংগ্রেসের নামে বাবার মুখের ওপর যেন মেঘের ছাপ পড়ে, চিন্তার রেখা দেখা দেয় কপালে। বাবা পুলিসের দারোগা, এখানকার থানার বড়বাবু। একদিন মাকে বলেছিলেন কংগ্রেসীরা বড় গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, ওদের নিয়ে মুশকিলে পড়তে হবে এরপর।

অবিনাশবাবু কংগ্রেসী। বাবার সঙ্গে পরিচয় আছে, রঞ্জুদের বাড়িতে কখনো কখনো তিনি না আসেন এমনও নয়। তবু রঞ্জুর মনে হয়, বাবা যেন কেমন ভয় করেন অবিনাশবাবুকে, হয়ত এড়িয়ে চলতে পারলেই খুশি হন তিনি।

ওদের ইস্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ে অশ্বিনী। ধেড়ে ছেলে, পাঁচ বছর ধরে মাইনার পরীক্ষা দিয়ে আসছে, পাস করবার আশা তার নিজেরও নেই, মাস্টারদেরও নেই। হাডুডু

খেলার মাঠে সেই অশ্বিনী একদিন নিচু গলায় অনেকগুলো কথা বলেছিল ফিস ফিস করে।

—জানিস, অবিনাশবাবু স্বদেশী।

আর একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, স্বদেশী তো কী হয়েছে ?

—কী হয়েছে ?—বিজ্ঞের মতো মুখ করে তাচ্ছিল্যভরা গলায় অশ্বিনী বলেছিল, স্বদেশীরা কী করছে জানিস কিছু ? না ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বেত খেয়ে কর্মধারয় সমাস মুখস্থ করেছিস খালি ?

শ্রোতারা জবাব দেয়নি।

—ক্ষুদিরামের নাম শুনেছ কেউ ?

—না ভাই, কে ক্ষুদিবাম ?

—হুঁহুঁ !—অশ্বিনীর গলার স্বর আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছিল : নিখিলিস্ট কাদের বলে বুঝিস ? (রঞ্জু পরে জেনেছিল, কথাটা নিহিলিস্ট।)

সবাই জানিয়েছিল, কেউ বোঝে না।

—তাহলে শোন্—চোখ দুটো বড বড় কবে অশ্বিনী তেমনি ফিস্ ফিস্ কবে বলে গিযেছিল : তারা সব বোমা আব কামান তৈরি করে। মাটির তলায় তাদের বড বড কারখানা আছে—সেখানে সব তৈরি হচ্ছে। ক্ষুদিরাম সেই বোমা দিয়ে লাটসায়েবকে মেরে ফেলেছিল।

—কেন ভাই ?

—বাঃ—মারবে না ? ওরা যে—অশ্বিনীর গলা আরো নেমে এসেছিল, আরো অনেকগুলো কথা বলেছিলো তেমনি চাপা ভয়ঙ্কর গলাতে। রঞ্জুর মনে আছে স্বাধীনতা বলে শব্দটা শুনেছিল সেই প্রথম।

—তাহলে স্বদেশীরা—

—ওরা বোমা তৈরি করবার দল।

—আর অবিনাশবাবু ? কংগ্রেস ?

—সব এক।

মনে আছে, সারাটা রাত একটা অশ্রান্ত আশ্চর্য উত্তেজনায় ঘুম আসেনি তার। সমস্ত রাত শুয়ে শুযে ভেবেছিল স্বদেশী 'নিখিলিস্ট'দের কথা। তাকিযে তাকিয়ে দেখেছিল কাচের জানালার ওপাবে থরে থরে অন্ধকার ; আর বাইরে আত্রাইয়েব বাতাসে দোলা-লাগা কৃষ্ণচূড়া গাছটার ছায়ানৃত্য। মাটির তলায় বোমা আর কামানের কারখানা। যেখানে মখমলের মতো সবুজ আর নরম ঘাস গুচ্ছে গুচ্ছে মাথা তুলেছে, যেখানে ছায়ায় ঘেরা বকুল বনের ভেতরে টুপটুপ করে শিশির পড়বার মতো শব্দ করে ফুল ঝরে পড়েছে

—সেইখানে, সেই নিশ্চিন্ত মাটির তলায় কামান আর বোমা তৈরি হচ্ছে! হঠাৎ একদিন, কেউ বলতে পারে না সে কবে—সেই মাটিতে ভয়ঙ্কর শব্দে চিড় খাবে একটা—রাশি রাশি ধুলোবালি উড়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাবে, ঘাসের চাঙড় আর গাছপালাগুলো যেন ঝড়ের মুখে শোঁ শোঁ করে উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আত্রাইয়ের ক্ষেপে ওঠা নীল জলে, বেরিয়ে আসবে ক্ষুদিরামের কামান। তারপর—

তারপর আর ভাবতে পারেনি রঞ্জু। অশ্বিনী আরো বলেছিল, শুধু মাটির নিচে নয়, সমুদ্রের জলের ভেতরেও সে কারখানা আছে। সমুদ্রের কাছে যারা থাকে, তারা বলে মাঝে মাঝে নিথর নিস্তব্ধ রাত্রে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে ক্ষুদিরামের কামান গর্জন করে ওঠে। সে শব্দ ভযানক, সে শব্দ শুনলে তালা ধরে যায় কানে। ক্ষুদিরামের সেই কামান উঠে আসবে একদিন, উঠে আসবে মাটির তলা থেকে—সমুদ্রের অতল থেকে। সেদিন—

আজ অবিনাশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল রঞ্জুর। সে কারখানার খবর জানেন অবিনাশবাবু, জানেন সেই রহস্যভরা পাতালপুরীর কথা। আলিবাবার গল্পে শুনেছিল চিচিং-ফাঁক মন্ত্রটা। উচ্চারণ করলেই পাহাড়ের মুখ দু-ভাগ হয়ে যেত, খুলে যেত দস্যুদের রত্ন-সঞ্চয়ের চোরা-ভাণ্ডার। তেমনি অবিনাশবাবুও একটা আশ্চর্য মন্ত্র জানেন, যার বলে এই সবুজ ঘাস আর বকুল বনের আবরণটা সরে গিয়ে বেরিয়ে পডতে পারে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ, পাতালপুরীতে ক্ষুদিরামের কারখানায় যাওয়ার রাস্তা।

অবিনাশবাবুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রঞ্জু ভাবছিল কথাটা একবার জিজ্ঞাসা করবে নাকি।

আর অবিনাশবাবু তাকিয়েছিলেন দেওয়ালের একখানা ছবির দিকে। তিনি কি ভাবছিলেন তিনিই জানেন, হঠাৎ মুখ ফেরালেন।

—ওই ছবিটা কার জানো? ওই যে চরকা কাটছেন?

—না।

—জানো না? ওঁর নাম মহাত্মা গান্ধী।

রঞ্জু মন দিয়ে ছবিটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আকৃষ্ট হওয়ার মতো কিছু তার চোখে পড়ল না।

—এ যুগে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সত্যবাদী মানুষ উনি। যা কিছু মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, অত্যাচার, দুঃখ সহ্য করছেন। হতে পারবে ওঁর মতো?

রঞ্জু লজ্জিত হয়ে মাথা নত করে বসে রইল।

অবিনাশবাবুর স্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল, ছলছল করে উঠল তাঁর চোখ। বললেন, শোনো রঞ্জন, বাড়িতে বাবার শাসনের ভয়ে তুমি একটা সত্যি কথা বলতে ভয় পাও, কিন্তু

অসংখ্য শাসন, অসহ্য নির্যাতনও ওঁকে সত্যের আশ্রয় থেকে এক তিল নড়াতে পারেনি। তাই আজ উনি এত বড়—তাই যারা ওঁকে শাস্তি দিতে চায়, তারাও মনে মনে ওঁকে দেবতা বলে প্রণাম করে।

—উনি বুঝি স্বদেশী?

—হ্যাঁ, স্বদেশী বইকি।—অবিনাশবাবুর গলা কাঁপতে লাগল: নিজের দেশে আমরা এতকাল পরদেশী হয়ে ছিলাম, আজ দেশের মধ্যে উনি আমাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমস্ত জীবন দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে। তুমি এই গানটা শুনেছ কখনো?—

হঠাৎ গুন্ গুন্ করে গাইতে শুরু করলেন:

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে
এ দেশ তোদের নয়—
এই যমুনা গঙ্গা নদী,
তোদের ইহা হত যদি,
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে
জাহাজ কেন হয়—

রঞ্জু বিহ্বল হয়ে বসে রইল। অবিনাশবাবুর কথা সে বুঝতে পারছে না, ধরতে পারছে না তাঁর ব্যবহারের একটা সঙ্গত ও শোভন অর্থ। সবই তার কাছে বিচিত্র বিস্ময়কর বলে বোধ হচ্ছে।

হঠাৎ চমক ভেঙে গেল অবিনাশবাবুর। এতটুকু একটা ছেলের সামনে এই ভাবে খানিকটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েছেন তিনি। সামলে নিয়ে বললেন, তুমি গান গাইতে পারো রঞ্জন?

—ভালো পারি না।

—আমি তোমাকে গান শেখাব। শিখবে? অনেক ভালো ভালো গান, নতুন নতুন গান।

—শিখব।

বাইরে বেলা পড়ে আসছিল। আত্রাইয়ের নীল জলে লাল-রোদের ঝিলিমিলি। নদীর ওপারের বাগানগুলোর ওপর দিয়ে বকের ঝাঁক উড়ে চলেছে। অবিনাশবাবুর খেয়াল হল।

—আজ আর নয়, অন্যদিন হবে। চলো, বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি তোমায়।

কিন্তু রঞ্জুর মনের মধ্যে উদগ্র কৌতূহলটা থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। বাড়িতে শাসনের ভয়টা মন থেকে যে মুছে গেছে তা নয়, বুকের ভিতরেও দুরদুর করছে এখনো; তবু ভরসা আছে অবিনাশবাবু একটা কিছু উপায় করে দেবেনই। কাজেই ভয়ের

চাইতে একটা কৌতূহলের পীড়নই এখন বেশি তীব্র বলে বোধ হচ্ছে।

—আচ্ছা, অবিনাশকাকা?

—কী বলছিলে?

—আপনি—দ্বিধাজড়িত ভাবে রঞ্জু থেমে গেল।

—আমি কী? সস্নেহে কৌতুকে অবিনাশবাবু বললেন, কী জিজ্ঞাসা করছিলে?

—আপনি ক্ষুদিরামের কারখানায় একদিন আমাকে নিয়ে যাবেন?

—ক্ষুদিরামের কারখানা! সে কী?

—বাঃ, সেই যেখানে বোমা আর কামান তৈরি হয়? মাটির তলায়, সমুদ্রের জলে—অবিনাশবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

—এসব কথা তোমায় কে বলেছে?

রঞ্জু বুঝতে পেরেছে একটা বোকামি করে ফেলেছে কোথাও। ক্ষীণ স্বরে বললে, আমি শুনেছি।

কৌতুক-প্রফুল্ল-মুখে অবিনাশবাবু বললেন, আর কী শুনেছ?

—আপনি তাদের খবর জানেন, আপনি তাদের দলের—

হেসে উঠতে গিয়েও হঠাৎ কেন যেন থেমে গেলেন অবিনাশবাবু। শান্ত কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন রঞ্জুর দিকে। বললেন, তুমি এখনো একেবারে ছেলেমানুষ—এসব কথা এখন বুঝতে পারবে না। শুধু একটা জিনিস মনে রেখো। আজ যাঁর ছবি তোমাকে দেখালাম, তিনি স্বদেশী বটে, কিন্তু এ দলের নন। তিনি বলেন, বোমা কামান দিয়ে কখনো অন্যায়কে জয় করা যায় না, তাকে জয় করা চলে ত্যাগে, জয় করা যায় অহিংসায়। আমি সেই মন্ত্রের সাধক। ক্ষুদিরামের কারখানা যদি কোথাও থাকে, তার সন্ধান নেওয়ার অধিকার আমার নেই ভাই।

রঞ্জুর চোখমুখে অবিশ্বাসের ছায়া স্পষ্ট হয়ে আসে—কথাটা বোঝেওনি, গ্রহণও করতে পারেনি। মৃদু হেসে অবিনাশবাবু বললেন, চলো, এবার বাড়িতে তোমাকে জিম্মা করে দিয়ে আসি।

শিলালিপিতে আঁচড় পড়ল সেই প্রথম।

দুই

একটা আশ্চর্য জগৎ আছে মনের ভেতরে! সেখানকার নিয়মকানুনগুলোর সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কোনো মিল নেই। তার আলাদা খাতা, আলাদা নিয়মে তার জমাখরচ। অনেক বড় বড় দুঃখ মিলিয়ে যায়, অনেক উচ্ছ্বসিত আনন্দের স্মৃতি হারিয়ে যায় তার নির্বিচার

অপচয়ের নেপথ্যলোকে। হয়তো মনে রাখে কোনো একটা অসংলগ্ন মুহূর্তের একটুখানি সোনালি রেখাকে, ছোট্ট একটু অভিমানের একফোঁটা চোখের জলকে। আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া নানা রঙের পাখির খসে-পড়া এক এক টুকরো হাল্‌কা পালকের মতো অযত্নে কেউ সেগুলোকে জড়ো করে রাখে ; তাদের ভার নেই—শুধু সেই সব উড়ন্ত পাখির মতো আবছা অস্পষ্ট স্মৃতি তাদের ঘিরে থাকে।

আরো আশ্চর্য ছেলেমানুষের মন—। তার হিসাবের খাতা আরো অসংলগ্ন, আরো বিশৃঙ্খল। সেখানে যোগঅঙ্কে প্রতি পদে পদে ভুল, সেখানকার বিয়োগে ঠিক মেলে না। নিজের দিকে তাকিয়ে এই এলোমেলো হিসেবটা আরো বিচিত্র লাগে রঞ্জুর। রঞ্জুর বললে ঠিক হয় না, পরিণত—হিসেবী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের।

সেদিনের সেই শিকার-অভিযানের পরে কী ঘটেছিল একেবারেই মনে পড়ে না। হয়তো বাড়িতে খানিকটা বকুনি জুটেছিল, হয়তো বাবা কান ধরে দুটো থাপ্পড় দিয়ে থাকবেন অথবা কিছুই হয়নি হয়তো। শুধু সেদিনের সেই ভয়টা, সেই নিষেধ ভাঙবার একটা অপূর্ব উত্তেজনা—শিশুমনের কাছে এর চাইতে বড় সত্য আর কিছুই ছিল না সেদিন। আর তার চাইতে সত্য ছিলেন অবিনাশবাবু। তাঁর সেই টিনের চালা দেওয়া ছোট্ট ঘরখানা, দেওয়ালে একটি বিচিত্র মানুষের ছবি—যাঁর নাম মহাত্মা গান্ধী। বাইরে সেই আত্রাইয়ের জলে ঝিলিমিলি আলোর দোলা আর সেই গানের টুকরোটা : "স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়—"

অবিনাশবাবু। অবিনাশবাবুকে আরো একবার দেখেছিল সে—শেষ দেখা।

কত সাল? রঞ্জু তখন জানত না, এখন জেনেছে। বড় হয়ে বই পড়ে জেনেছে। সেই সেবার—যেবার উত্তর বাংলার বুকের ওপর দিয়ে সর্বনাশা বন্যায় মৃত্যুর স্রোত বয়ে গিয়েছিল, সেই বার। এই এতটুকু নদী আত্রাই—এই ঘুমের মতো শান্ত নীল জল, ওপারে বাঁশ আর আমের ছায়া, এপারে রঙে রঙে আলো-করা ন্যাড়া শিমুলের সারি, এই নদীর বুকেও জেগেছিল মাতলামির নেশা। নদীর জলে ঘূর্ণি ঘুরিয়েছিল পাহাড়-ভাঙা গেরি-মাটির ঢল, উপরে পড়েছিল বড় বড় শিমুল, ডুবিয়ে দিয়েছিল ওপারের ছায়াশ্যামল আমের বন। সেই সেবার।

তিরিশ সালের বন্যা। তেরোশো তিরিশ সাল। অত বড় বান এদিকে আর কেউ দেখেনি কখনো। সমস্ত উত্তরবঙ্গের ওপর নেমেছিল মৃত্যুর তাণ্ডব।

হয়তো সে বন্যার কথাও মনে থাকত না রঞ্জুর। ছোট বড় আরো অনেক স্মৃতির সঞ্চয়ের সঙ্গে সেটাও হারিয়ে যেত—তলিয়ে যেত কালো পর্দাটার আড়ালে। কিন্তু সেই অবিনাশবাবু।

মনে পড়ছে তিন-চারদিন থেকে বিশ্রী ঘোলাটে হয়ে ছিল আকাশটা। টিপ্ টিপ্,

ঝির্ ঝির্, ঝর্ ঝর্। এলোমেলো বাতাসে শোঁ শোঁ করছিল কৃষ্ণচূড়া গাছটা, ফুল আর পাতা ঝরে ঝরে তার তলাটা একাকার হয়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে পড়ে ছিল জলে-ভেজা ছোটো মরা কাকের ছানা। আর কাকের কান্না উতরোল হয়ে উঠে ছাপিয়ে গিয়েছিল বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দ।

বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ। ইস্কুল ছুটি। কাচের জানালা দিয়ে দেখা যায় ওপারের মাঠটা একটা ধূসর ছায়ায় হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে নতুন ধানের শিষ্ ওঠা মস্ত মাঠের ভেতর দিয়ে ইস্কুলে যাওয়ার পথটাও। একটু দূরে বকুল বনের নিচে শাদা জল থইথই করছে। বাইরে ঘাসের মধ্যেও জল চিক চিক করছে, সারা দিনরাত ধরে চলেছে ব্যাঙের ডাক। জানা অজানা কত পোকা, কত প্রজাপতি আর ফড়িং উড়ে উড়ে এসে ঘরের ভেতরে আশ্রয় নিচ্ছে, অনবরত গুম্ গুম্ করে মেঘের ধমকানি।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে রঞ্জু। ভারী ভালো লাগে। চুপ করে একা একা বসে বৃষ্টি পড়া দেখতে আশ্চর্য ভালো লাগে তার। কেমন ঘুম পায়, কেমন ঝিম ধরে। সত্যিই কি ঘুম পায়? না—ঠিক তা নয়। রূপকথাগুলো মনে পড়ে—ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প মনে পড়ে—মনে পড়ে কোথায় ক্ষীর-সমুদ্রে ফুটেছে সোনার পদ্ম, তার ঝকঝকে পাপড়ি-গুলোর ওপর দিয়ে নিটোল মুক্তোর মতো গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির বিন্দু। অন্ধকার—নীলাভ হালকা অন্ধকার—মস্ত বড়, ঘন, বৃষ্টি-ছায়ায় আরো অন্ধকার হয়ে গেছে, ঘন পাতার ফাঁকে ফাঁকে চুইয়ে পড়ছে জল, ফুটেছে অজস্র ভুঁইচাঁপা; পথ নেই, হাত বাড়িয়ে লতারা আঁকড়ে আঁকড়ে ধরছে। আর তারই ভেতরে পথ ভুলেছে রাজপুত্রের পক্ষিরাজ ঘোড়া, সেই ঘোড়া —যার মন পবনের গতি, পূর্ণিমার রূপালী জ্যোৎস্নায় ডুব দিয়ে আসা যার গায়ের রঙ। ওদিকে একটা কালো পাহাড়—মস্ত একটা জানোয়ারের মতো থাবা গেড়ে রয়েছে। বৃষ্টিতে ঠিক বোঝা যায় না ওটা কড়ির পাহাড়, না হাড়ের পাহাড়? ওটা পাশাবতীর দেশ, না শঙ্খমালার পুরী?

বৃষ্টিতে এই সব মনে পড়ে—মনে পড়ে এই সব এলোমেলো গল্প। আকাশের কোণে কোণে ধোঁয়ায় তৈরী নানা আকারের মেঘ উড়ে যায় অতিকায় ফানুসের মতো। এই সব মেঘের যেমন কোনো বাধা-বন্ধন নেই—সাত সমুদ্র তেরো নদী আর অনেক পাহাড় যাদের কাছে সব সমান, ওদের মতোই সমস্ত ভাবনাটা সব কিছুর ওপর দিয়ে পাখনা মেলে দেয়। খালি ইচ্ছে করে—এই বৃষ্টিটা যেন কখনো না থামে—ইস্কুল, ধনঞ্জয় পণ্ডিতের জোড়া বেত, হেড মাস্টারের গভীর গম্‌গমে স্বর, অঙ্কের ক্লাসে ভয়ে গলা আর বুকের ভেতরটা অবধি শুকিয়ে ওঠা, পাশাবতীর পাশার একটি দানে তারা যেন মিলিয়ে যায় ভোজবাজির মতো।

তবু মনটা ফিরে আসে পৃথিবীতে। বেশ লাগে কৈবর্তপাড়ার কালো কালো নেংটি-

পরা ছেলেগুলোকে দেখতে। মেঘের ডাকে নাকি কানখাড়া পুকুর-ডোবার জল থেকে বেপরোয়া হয়ে উঠে পড়েছে কই মাছের ঝাঁক। চলছে আধডোবা ঘাসের ভেতর দিয়ে, চলছে বৃষ্টি-ভেজা এঁটেল পায়ে-চলার-পথটা দিয়ে কিল্‌বিল্‌ করে। মচ্ছব লেগেছে কৈবর্ত-পাড়ার ছেলেদের। লেংটি পরে পরে বেরিয়ে এসেছে সব। কারো মাথায় ভাঙা ছাতা, কারো মাথায় টোকা—আর বেশির ভাগই বৃষ্টি সম্পর্কে একেবারে নিরঙ্কুশ। লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি আর কাড়াকাড়ি করে কইমাছ ধরছে তারা। একজন বেশ চিৎকার করেই গান ধরেছে :

পরাণ পুড়ে গেলরে সই, শ্যামের বিহনে—

বেশ আছে ওরা। ইস্কুলে কখনো যেতে হয় না, বৃষ্টিতে বাইরে বেরুতে ওদের নিষেধ নেই। ওদের জ্বর হবে না কোনোদিন—সর্দিও হবে না কখনো। রঞ্জু ওদের থেকে আলাদা। সে ভদ্রলোকের ছেলে, থানার বড়বাবুর ছেলে। ওদের সঙ্গে ঝাঁপাঝাঁপি করে তাকে কেউ কইমাছ ধরতে দেবে না। তার মানসম্মান আছে, তার সুকুমার শরীরে জলে ভেজার অত্যাচার সইবে না। রঞ্জু সত্যিই ওদের থেকে আলাদা। আলাদা ওই সব ছোটলোকদের দল থেকে।

লোভ হয়, ইচ্ছে করে সেও ওদের সঙ্গে মিশে দুটো একটা মাছ ধরে। সেদিন যেমন ইস্কুল পালিয়ে বাদলের সঙ্গে খরগোশ শিকার করতে গিয়েছিল, রক্তের মধ্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে নিষেধ ভাঙবার তেমনি একটা উন্মাদনা। কিন্তু বাবা—বারান্দায় তাঁরই খড়মের শব্দ। কার সঙ্গে যেন কথা কইছেন তিনি।

—নদীতে বান ডাকবে বলে মনে হয়।

কে যেন জবাব দিচ্ছে : হুঁ, খুব জল বাড়ছে।

আর একজন বলছে : লক্ষণ ভারী খারাপ। ধানের ক্ষেতে জল ঢুকেছে। আরো যদি বাড়ে, ফসলের সর্বনাশ করে দেবে একেবারে।

—হাজীগঞ্জের বাঁধটা নাকি টলমল করছে।—বাবার গলা : আমার কনেস্টবল গিয়েছিল, খবর নিয়ে এসেছে।

—কী হবে বড়বাবু?—বৃষ্টি আর বাতাসের মধ্যেও রঞ্জু শুনতে পাচ্ছে আশঙ্কায় বক্তার স্বর কাঁপছে : যদি বান ডাকে কী হবে? তিরিশ বছরের ভেতরেও নদীর এমন চেহারা দেখিনি আমি।

বাবা সান্ত্বনা দিচ্ছেন : ভেবে আর কী করবে? মানুষের তো কোনো হাত নেই ভগবানের ওপর। বরং খবর নাও—হাজীগঞ্জের বাঁধটার অবস্থা কেমন। দরকার হলে ওখানে পাহারা বসাতে হবে।

কথাগুলো রঞ্জুর কানে আসে, কিন্তু মনে দোলা দেয় না। সমস্ত চেতনা যেন চলে গেছে

এই পৃথিবীর যা কিছু ধরাছোঁয়ার একেবারে বাইরে। বান ডাকবে—ডাকুক। 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর—নদী এল বান'—

ওই কৈবর্ত ছেলেগুলো কিন্তু আছে বেশ। বাইরের পৃথিবীতে ওইটুকুই রঞ্জুর কাছে সব চেয়ে বড় সত্য।

তবু সত্যিই বান ডাকবে নাকি? যদি ডাকে—কেমন হবে দেখতে? ওইটুকু ছোট নদীটার কূল থাকবে না, কিনারাও না। শাদা জল ছুটে চলবে প্রবল স্রোতে, মাঠ ডুববে, ডুবে যাবে বকুল বন, একাকার হয়ে যাবে আলেয়াদীঘি আর কবিরাজের বাগানের নিচে বিশ্‌লার মাঠ। বেশ লাগবে—সত্যি চমৎকার লাগবে দেখতে।

আর তাই তো—এতক্ষণ যে খেয়ালই হয়নি!

গোঁ—গোঁ—গোঁ—গোঁ। একটানা একটা তীব্র ধ্বনি। বাতাসের শব্দ? না—তা তো নয়। বৃষ্টি? তাও নয়। ঠিক কথা—নদী গর্জাচ্ছে। গোঁ—গোঁ—গোঁ। অনেক দূর থেকে গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠবার মতো একটা অদ্ভুত বিশ্রী আওয়াজ।

নদী গর্জাচ্ছে—রঞ্জুদের ছোট্ট নদী আত্রাই। যার জল ঝিলমিলে নীল, যার স্রোতে ভেসে যায় পলাশের রাঙা টুকটুকে ফুল, সেই নদী এমন করে গজরাতে পারে এ কি কল্পনা করতে পারে কেউ? বিশ্বাসই হতে চায় না যেন।

'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর—নদী এল বান'—

নদীতে বান আসুক—বাঁধ-ভাঙা, মাঠ-ভাসানো বান।

এই খোলা জানালাটার বাইরে বানের জলের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলুক রঞ্জুর মন।

শেষ পর্যন্ত সেই বান এল।

সারা দিনরাত সমানে বৃষ্টি চলেছিল। সন্ধ্যার একটু পরেই খিচুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছিল সবাই। বৃষ্টির শব্দে কী অদ্ভুত নেশা ভরা ঘুম আসে। মনে হয় চেনা জগৎটাকে আড়াল করে দিয়ে আর একটা নতুন পৃথিবী দেখা দিয়েছে। মায়ের কোলে বসে চিকের পর্দার আড়াল থেকে যাত্রা দেখে যেমন করে, এই বৃষ্টির ধারাও যেন সেই চিকের পর্দার মতো একটা রূপকথার দেশকে রাখে একটা অপরূপ আবরণের আড়ালে ঢেকে।

কিন্তু সকলে জেগে উঠল ঠাকুরমার চেঁচামেচিতে।

তখন মাঝরাত্তির। কালির মতো কালো অন্ধকারে জল আর ঝোড়ো বাতাসের মাতামাতি। এমন সময় জেগে উঠল ঠাকুরমার আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ: ওরে খোকা, সব যে গেল!

খোকা অর্থাৎ বাবা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন, পেছনে পেছনে আর সকলে। আর চার-পাঁচটা লণ্ঠনের আলোয় যে দৃশ্য রঞ্জু দেখল জীবনে তা ভুলবার নয়।

জল—জল। আর কিছু নেই জল ছাড়া। রঞ্জুদের দালানের আধ হাত নিচেই থই থই

করছে ঘোলা জল—এত বড় উঠোনটা কার মন্ত্রবলে যেন টইটম্বুর পুকুর হয়ে গেছে। উঠোনের ওদিকে ঠাকুরমার ঘরখানা, তার ভিতরটা মাটির—মাটি-ধ্বসে পড়েছে একদিকের বেড়া—আর উঠোনের সেই পুকুরে পরমানন্দে ভাসছে ঠাকুরমার আচারের হাঁড়ি, ঠাকুরের কাঠের সিংহাসন, থালা, ঘটি, বোক্‌নো। দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে ঠাকুরমার খাটখানা। জলের দোলায় দোলায় সেগুলো নেচে উঠছে, যেন এতদিনের বন্দিত্বের পরেও তারাও শুনেছে মুক্তির ডাক—বেরিয়ে পড়েছে বন্যার আহ্বানে, ঠিক রঞ্জুর চঞ্চল ব্যাকুল মনটার মতোই।

আর সব চাইতে চমৎকার ঠাকুরমার অবস্থাটা। একগলা জলের ভেতরে দাঁড়িয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করছেন তিনি। বুড়ো মানুষ—একটা কিছু টের পেয়ে উঠে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেই উঠোনে সমুদ্রদর্শন করে ফেলেছেন।

—খোকা রে, আমি গেলাম, সব গেল, হায় হায়—

কারো মুখে আর কোনো কথাই নেই।

হতভম্ব ভাবটা ভাঙল মায়ের চিৎকারে।

—ওগো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী! মা যে গেলেন!

ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে জলে পড়ল সবাই। নামলেন বাবা, বড়দা, বাড়ির চাকর মহেশ, জ্যাঠতুত ভাই নীপুদা।

ধরাধরি করে ঠাকুরমাকে তুলে আনা হল।

বুড়ীর তখন কাঁপুনি উঠেছে। দাঁতে দাঁতে একটা অদ্ভুত শব্দ উঠছে ঠাকুরমার—প্রবল জ্বরে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি উঠলে যেমন হয় অনেকটা সেই রকম। কিন্তু সে কাঁপুনির ভেতরেই চিৎকারের বিরাম নেই তাঁর। একটা বিশ্রী অস্বাভাবিক স্বর, যেন ঠাকুরমার নয়, আর কারুর।

—ওরে, আমার আতপ-চালের হাঁড়ি ভাসছে। ওরে, ওই যে, আমার বাড়ির হাঁড়ি ভাসছে। ওরে, আমার ঠাকুরের সিংহাসন যাচ্ছে—ধর্‌ ধর্‌—

অল্প অল্প স্রোতে সেগুলো সব তখন খিড়কির দিকে চলেছে—আর একটু এগিয়ে গেলেই পাবে আত্রাইয়ের প্রবল-টান। সুতরাং অবিলম্বে উদ্ধার করা দরকার।

আবার ঝপ্‌ ঝপ্‌ ঝপ্‌—

ঠাকুরমা সমান ভাবে চেঁচিয়ে চলেছেন: ওরে, আগে ঠাকুরের আসনটা ধর্‌, ওরে বোক্‌নোটা ওখানে ডুবেছে, ডুব দিয়ে তোল্‌ ওটাকে; ওরে, খাট্‌খানাকে যেতে দিসনি! ওরে সব গেল, বাসন গেল, চাল গেল, গুড় গেল, কাপড়চোপড় গেল, তোশক গেল, জাজিম গেল—

চিৎকারটা একটানা চলছিল, হঠাৎ দশগুণ জোরে আর একটা আর্তনাদ উঠল:

আরে, আরে, ওটা কী চিক্‌চিক্‌ করছে রে ? আমার মিশির গুঁড়োর কৌটোটা না ? ওরে সর্বনাশ, ওটাকে আন্—ধর্ ওটাকে—

উঠোনের জল তোলপাড় হচ্ছে—আট-দশটা লণ্ঠনের আলো সেই জলের ওপর পড়ে একটা অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে এটা ওটা ধরা হচ্ছে, আর এনে তোলা হচ্ছে বড় দালানের দাওয়ায়। ওদিকে ঠাকুরমার ঘরের একখানা বেড়া খসে পড়েই জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। খাটটা দুলতে দুলতে সেই পথে বেরুবার চেষ্টা করছে—আর সব চাইতে মজার, জলের ওপরে ভাসছে শূন্য একখানা টাঙানো মশারি। নিচে খাট নেই, মশারিটা সেটা টেরই পায়নি।

চিৎকার, কোলাহল, আর্তনাদ। কী বুঝেছে কে জানে, ছোট বোনটা গলা ছেড়ে কাঁদছে প্রাণপণে। সব মিলিয়ে ভারী মজা লাগছে রঞ্জুর। হঠাৎ খিল্ খিল্ করে সজোরে হেসে উঠল সে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই কুড়ি জোড়া চোখ ফিরে গেল সেই দিকে।

বাবা, থানার বড়বাবু, তখন ডুব দিয়ে দিয়ে ঠাকুরমার মালিশের কৌটোটা খোঁজ করছিলেন বোধ হয়। হাঁপানির রোগী, জলে ভিজে আর উত্তেজনায় এর মধ্যেই হাঁপানির টান ধরেছে ঠাকুরমার। কী অদ্ভুত লাগছে বাবাকে দেখতে! জলে-কাদায় মানুষটিকে চেনাই যায় না আর।

বাবা বোধ করি মালিশের কৌটোটা তখনো খুঁজে পাননি। আর তখন মেজাজটাও কোনো দিক থেকেই খুশি না থাকবার কথা। রঞ্জুর হাসির শব্দে বাঘের মতন গর্জে উঠলেন বাবা।

—অ্যাই—হাসে কে—হাসে কে রে ?

রঞ্জু চুপ।

কিন্তু জবাবটা গৃহশত্রু দাদার মুখে তৈরীই ছিল : রঞ্জু হাসছে বাবা।

বাবা হুঙ্কার করে বললেন, এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেল, আর মজা পেয়েছে ছেলে। ধরে ধরে সব আত্মীয়ের জলে ফেলে দেব, হাসি টের পাবে তখন।

হাঁপানির শ্বাস টানতে টানতেই ঠাকুরমা বললেন, আহা ছেলেমানুষ, বুঝতে পারেনি—

—নাঃ, বুঝতে পারেনি ! আচ্ছা, এসে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি। খড়ম পিটিয়ে বের করে দিচ্ছি হাসি।

কিন্তু ফাঁড়া কেটে গেল। উঠে খড়ম-পেটা করবার মতো সময় এখন বাবার নেই। ঠাকুরমার মালিশের কৌটোটা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি !

চুপ করে ভাবতে লাগল রঞ্জু। তার মনটা কিন্তু এই দৃশ্যের মধ্যে নেই—ছাড়িয়ে চলে গেছে এই সব, এই কোলাহল, এই আর্তনাদ।

বাবা বলছেন, আত্রাইয়ের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন ওকে। আত্রাই! ওই তো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে আত্রাইয়ের গর্জন—সন্ধ্যাবেলায় শোনা সেই গুমরে কান্নার মতো গোঁ গোঁ শব্দ। কিন্তু কত স্পষ্ট এখন, কত প্রবল। রঞ্জু সাঁতার জানে না, কিন্তু কেমন যেন মনে হচ্ছে আত্রাইয়ের জলে ওকে ফেলে দিলে সেটা নেহাৎ মন্দ হয় না একেবারে। কেমন হয়েছে এখন নদীর চেহারা, কেমন ভয়ঙ্কর তীব্র তার গতি? তার স্রোতের টানে ও চমৎকার ভেসে যেতে পারবে, সাঁতার জানবার দরকারই হবে না। কোথা থেকে কোথায় চলে যাবে রঞ্জু, দেশের পর দেশ ছাড়িয়ে, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে, জানা থেকে কতদূরে কোন্ অজানা অচেনার আশ্চর্য জগতে। গল্প শুনেছে, ভেলায় চড়ে লোকে সাত সমুদ্রের নোনা জল পেরিয়ে যায়, আচ্ছা, ঠাকুরমার খাটটায় চড়ে ও কি তেম্‌নি অনেক নদী, অনেক সাগর পাড়ি দিয়ে চলে যেতে পারে না কোনো শঙ্খমালার দেশে?

কিন্তু শঙ্খমালার দেশ নয়, সকালের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে যে দেশ ওর চোখে পড়ল তা রূপকথার গল্পের চেয়েও আশ্চর্য।

বাড়ির বাইরে কি মাঠ ছিল কখনো? ওদের বৈঠকখানা ঘরটা—রোজ সকালে টাট্টু ঘোড়ায় চেপে নবদ্বীপ মাস্টার মশাই এসে যে ঘরে বসে ওদের হস্তলিপি লেখাতেন, তারই সামনে রঞ্জুর নিজের হাতে পোঁতা দো-পাটী ফুল গাছগুলোর অস্তিত্ব ছিল কি কোনো দিন? না, কেউ বলতে পারে তারই কাছাকাছি একটু ছোট খুঁটি ছিল, যাতে নবদ্বীপ মাস্টার তাঁর বুড়ো ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখতেন? আরো একটু দূরে ছিল বন্দরে যাবার রাস্তাটা, তার দুপাশে নুয়ে নুয়ে ছিল বুনো দ্রোণ ফুলের ঝাড়—কিন্তু কোথায় গেল সে সব?

কোথায় গেল সে সব? পরিচিত পৃথিবীটাই বা হারিয়ে গেল কোন্‌খানে? রঞ্জু কাল বসে বসে যে বানের কথা ভাবছিল, এ মূর্তি তার সে কল্পনাকেও ছাড়িয়ে চলে গেছে। ওই বকুল বনের নিচে যেখানে শাদা জল চিকচিক করছিল ঘাসের মধ্যে, কানে হেঁটে হেঁটে চলেছিল উজান-দেওয়া কইমাছের ঝাঁক, আর কৈবর্ত ছেলেরা পরমোল্লাসে যেখানে হুটোপুটি করছিল—যেন চেনাই যায় না সে জায়গাটাকে। জলের ওপর বকুল গাছগুলোর আধখানা করে জেগে আছে, তাদের মাথার ওপরে অশ্রান্তভাবে চেঁচামেচি করছে শালিকের দল। বোধনতলার দিকটায় শুধু খানিক উঁচু জমিতে সবুজ ঘাস মাথা তুলে রয়েছে, তা ছাড়া জল, সব জল। থানাটা জলের ওপরে ভাসছে মস্ত একটা লাল রঙের নৌকোর মতো, ইস্কুলে যাওয়ার মস্ত মাঠটার ওপর সমুদ্রের ঢেউ খেলছে। কাল পর্যন্ত পৃথিবীর মাটি ছিল সবুজ, আজ সব শাদা, সব ঘোলাটে, যেন মাত্র একটি রাত্রির

মধ্যে ওরা একটা নতুন কোনো দেশে এসে পৌঁছেছে।

জল আর জল। তিন দিন ধরে মেঘলা ছিল আকাশ, বাতাস বইছিল দমকা, বৃষ্টি পড়ছিল কখনো তীরের মতো, আবার কখনো ফুলঝুরির মতো ঝুর ঝুর করে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সে মেঘ সে বৃষ্টি আজ যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। মাথার ওপরে ধরা দিয়েছে নীলাঞ্জন আকাশ, তার কোণায় শাদা শাদা হালকা মেঘের ছেঁড়া টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। আর উঠেছে রোদ, গলানো সোনার মতো তাজা মিষ্টি রোদ, অপর্যাপ্ত-ভাবে ঝরে পড়েছে নিচে শাদা জলের ওপরে, যেন ছোট্ট খোকার কান্নাভরা চোখের ওপর মায়ের হাসিভরা চুমু পড়েছে এসে।

তিন

জল দুলছে, জল নাচছে, জল খেলা করছে। মাঠ নেই, পথ নেই, আলেয়াদীঘিটার চিহ্নই নেই। কৃষ্ণচূড়া গাছটার গুঁড়িটাকে ঘিরে ঘিরে জল পাক খাচ্ছে, সেই মরা কাকের ছানা দুটো যে এতক্ষণে কোথায় ভেসে গেছে কে বলবে! শুধু নতুন-রোদ-ওঠা আকাশে পাখা মেলে দিয়ে ঘুরে ঘুরে একদল কাক কান্নাকাটি করছে এখনো।

রোদ উঠেছে আকাশে, চারদিন পরে নতুন রোদ। একটা নতুন অপরূপ আর অচেনা পৃথিবীর ওপরে। বেশ খুশি হয়ে দেখছিল রঞ্জু, হঠাৎ তার খেয়াল হল সে যতটা খুশি হয়েছে, আর কারো ততটা খুশি হবার মতো কারণ ঘটেনি।

সকালের আলোয় এ জলের খেলা তো সুন্দর নয়—এ যে একটা ভয়ঙ্কর সর্বনাশের রূপ! আস্তে আস্তে রঞ্জু এও শুনতে পেলো যে শুধু তার ঠাকুরমার ঘরই নয়, আরো অনেকের ঘর গেছে, গেছে ঘরের সঙ্গে সঙ্গে যথাসর্বস্ব। বন্দরের যে দিকটায় মালোপাড়া ছিল, সেখানে দাঁড়িয়েছে দু বাঁশ জল। নদীর ধারে মশানীর পুরানো মন্দিরটা ধ্বসে নেমে গেছে নদীর গর্ভে। ওপারে চণ্ডীপুরের দিকে যে কী হয়েছে, সে কথা কেউ বলতেই পারল না। বন্দরের ঘাটে ঘাটে যে সব নৌকো বাঁধা ছিল, বন্যার টানে কাছি-নোঙর উপড়ে তারা অদৃশ্য হয়েছে, কোথায় কোন্ পথে দরিয়ায় ভেসে চলে গেছে একমাত্র ভগবানই সে সন্ধান দিতে পারেন।

আর সেই সঙ্গে মানুষের আর্তনাদ—মানুষের হাহাকার।

—হায় ভগবান! তোমার মনে এই ছিল!

—ওগো, তোমরা কেউ আমার ছোট ভাইটাকে দেখেছ, জহিরদ্দিকে? কাল বানের টানে সে ভেসে গেছে, কোথাও উঠেছে বলতে পারো?

—হায় হায়, আমার তিনটে গোরু গেল, ছটা ছাগল—

—বাবু গো, ঘরের ধান গেল, চাল গেল, জিনিসপত্তর সব গেল, আমাদের উপায় কী হবে ?

কে কাকে উপায় বলে দেবে ? নিজের উপায়ই কেউ জানে না। থানায় গিজগিজ করছে লোক, দলে দলে লোক হাঁড়ি-কুড়ি বাক্‌সো-প্যাটরা যা পেয়েছে নিয়ে এসে উঠেছে রঞ্জুদের দালানে। তাদের অবস্থা দেখে ঠাকুরমা পর্যন্ত আচারের বয়ামের কথা ভুলে গেছেন।

বারান্দায় পাতা হয়েছে মস্ত বড় একটা উনুন। তাতে হাঁড়ি-বোঝাই করে খিচুড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সারাদিন সমানে চলেছে সেই খিচুড়ি রান্না, লোকগুলোকে খাওয়ানো হচ্ছে। তাদের বিলাপে-আলাপে রঞ্জুর যা কিছু ভাবনা কল্পনা—সব ছায়াবাজির মতো মিলিয়ে গেছে মন থেকে। ভয়—একটা অস্বাভাবিক ভয়ে বুকের ভেতরটা অবধি শুকিয়ে উঠেছে তার। বাইরের শাদা থল্‌থলে জলে যেন একটা নিষ্ঠুর হাসি ; দূর থেকে নদীর গোঙ্‌রানি যেন একটা বন্যজন্তুর আর্তনাদ—শীতের রাত্রে ফেউয়ের ডাক শুনে বাঘের কল্পনায় যেমন ভয় পেয়েছিল, ঠিক সেইরকম।

—হে আল্লা, জল নামাও, জল নামাও—

—মুন্সীহাটের ওদিকটার আর কোনো চিহ্নই নেই, সব সাফ হয়ে গেছে।

—ঢের ঢের মানুষ মরেছে, আমার সামনেই তো হোসেন হাজীর বউ ব্যাটা বানের টানে ভেসে চলে গেল দেখলাম—

—হায় ভগবান, আমাদের উপায় কী হবে ?

উপায় কী হবে ? তার জবাব দিলেন অবিনাশবাবু।

আখের চাষ আর গুড়ের জন্যে গঞ্জটা বিখ্যাত। বন্দরের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে কতদিন রঞ্জু দেখেছে উঠোন-জোড়া এক-একটা মস্ত কড়াইতে জাল দেওয়া হচ্ছে আখের রস। পাতা পুড়ছে, লাক্‌ড়ি পুড়ছে, আর মস্ত মস্ত কাঠের হাতা দিয়ে নাড়া দেওয়া চলছে প্রথম-দানা-ধরে-আসা তরল গুড়কে। বাতাসে ভাসছে গুড়ের উগ্র মধুর একটা গন্ধ। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যারা ভিড় করেছে সেখানে শালপাতায় তাদের একটু একটু গরম গুড় দেওয়া হচ্ছে, পরমানন্দে চেটে চেটে খাচ্ছে তারা।

রঞ্জুর ওই গুড় খাওয়ার জন্যে যে খুব লোভ জেগেছে তা নয়। তবু ওই বিচিত্র উগ্র গন্ধটা, লালচে হয়ে আসা ফুটন্ত ওই ঘন রসের গন্ধ ভারী ভালো লেগেছে তার। ইচ্ছে করেছে তাকেও যদি পাতায় করে ওই রকম একটুখানি গুড় দেয়, সে খেয়ে দেখতে পারে কেমন লাগে। কিন্তু উপায় নেই। সে বড়বাবুর ছেলে, ওসব ছোটলোকের খেয়াল মনের কোণে তার স্থান দেওয়াও চলবে না।

—আর আশ্চর্য, কত বড় ওই কড়াইগুলো। অত বড় কড়াই যে কী করে তৈরি করল,

সেটা যেন ভেবেই পাওয়া যায় না। ওই রকম একটা কড়াইতে চুপচাপ শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে রঞ্জু, ঘুমুতে পারে স্বচ্ছন্দ আরামে।

আজ বান ডেকেছে। বাঁধ-ভাঙা, উপচে-পড়া ভয়ঙ্কর বান। ক্ষেপে উঠেছে নাগিনীর মতো, গর্জে উঠছে ঘুমন্ত নদী আত্রাই। এই সময় রঞ্জু দেখতে পেল, গুড় জাল দেওয়ার চাইতেও আরো ঢের ঢের বেশি কাজ করতে পারে ওই কড়াইগুলো!

চোখকে বিশ্বাস কি করা যায়? না—যায় না। তবু এ সত্যি—বাইরের ঝকঝকে শাদা জলের ওপর সকালের মিষ্টি নরম রোদটার মতোই সত্যি।

বন্দরের ওদিক থেকে জলেব ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে আসছে মস্ত একটা কড়াই। সেই কড়াইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবিনাশবাবু। একটা লম্বা বাঁশ তাঁর হাতে। লোক যেমন করে লগি দিয়ে নৌকো ঠেলে নিয়ে যায়, তেমনি করে বাঁশের খোঁচায় কড়াই বাইতে বাইতে অবিনাশবাবু ওদেরই বাড়ির দিকে আসছেন!

এই অপূর্ব নৌকায় আবোহণ করে ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন একেবারে কৃষ্ণচূড়া গাছটার সামনে। তারপর কড়াইয়ের আংটার ভেতর দিয়ে লগিটা মাটিতে পুঁতে দিয়ে এক লাফে রঞ্জুদের সিঁড়িটার উপর নেমে পড়লেন।

শশব্যস্তে বেরিয়ে এলেন বাবা: অবিনাশবাবু যে! ব্যাপার কী!

অবিনাশবাবুর সাবা গা বেয়ে টপটপ করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল। অতখানি রাস্তা কড়াইয়ের নৌকাটা ঠেলে আনতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। একটু দম নিয়ে তিনি বললেন, চাটুয্যে মশাই, সর্বনাশ যে!

—আপনার আশ্রমের খবর কী? ঠিক আছে তো?

—তা আছে। ওদিকটাতে জল ওঠেনি। কিন্তু মালোপাড়ার খবর শুনেছেন বোধ হয়!

বাবা বিষণ্ণস্বরে বললেন, শুনেছি।

—কী করা যায় বলুন দেখি?

বাবা হতাশার ভঙ্গি করলেন: কোন উপায়ই তো দেখছি না। একেবারে নদীর গায়ে, শুনেছি বারো হাত জল দাঁড়িয়ে গেছে সেখানে।

—আর মানুষগুলো?

বাবা তেমনি ব্যথিত গলায় বললেন, ভগবান জানেন।

—না, না, ভগবান নয়।—অত্যন্ত চঞ্চল শোনালো অবিনাশবাবুর কণ্ঠ: আমাদেরও কিছু করবার আছে। শুনেছি বড় বটগাছটায় এখনো কিছু কিছু লোক ঝুলে-ঝাপটে রয়েছে কোন রকমে। ওদের উদ্ধার করা দরকার। একটুও দেরি নয়—স্রোতের টানে গাছ উপড়ে যেতে পারে!

বাবা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু ওখানে যাওয়া যায় কী করে? নৌকো তো একখানাও পাওয়া যাবে না, স্রোতের তোড়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

অবিনাশবাবুর চোখ দপদপ করে উঠল। শান্ত নম্র চোখ দুটিতে এমন জোয়ালো আগুন থাকতে পারে, এমন করে যে কোনো মানুষের চোখ জ্বলে উঠতে পারে, রঞ্জুর জীবনে এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

অবিনাশবাবুর স্বর তীব্র: তাই বলে এতগুলো মানুষ এমনভাবে মরতে পারে না। এ কখনোই হতে দেওয়া যাবে না, কোনমতেই নয়।

বাবা যেন এবার একটুখানি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, আপনি কী করতে চান?

সতেজ গলায় জবাব এল: ওদের উদ্ধার করব।

—কেমন করে?

অবিনাশবাবু আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন কড়াইটা: ওই ওটায় করে।

—পাগল আপনি!—বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন: ওই কড়াইতে করে! ওটায় আপনি ক'জন মানুষকে তুলে নিয়ে আসতে পারবেন?

—যে কজন পারি। একজন দুজন। বারে বারে গিয়ে নিয়ে আসব।

বাবার মুখের চেহারা ক্রমে গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল: অবিনাশবাবু, পাগলামি করবেন না। ওখানে নদীর ভয়ঙ্কর টান, ও কড়াই আপনি কিছুতেই সামাল দিতে পারবেন না। শেষকালে আপনি সুদ্ধ—

এক মুহূর্তের জন্যে মাথা নিচু করে রইলেন অবিনাশবাবু। পরক্ষণেই যখন তিনি মাথা তুললেন, তখন তাঁর চোখে আবার ঝকঝক করে উঠেছে সেই আশ্চর্য আগুনটা। কাচের জানালার পেছনে দুটো আলো জ্বেলে দিলে সামনে থেকে যেমন দেখায়, তেমনি দেখাতে লাগল অবিনাশবাবুর চোখ দুটোও—যেন তাদের আড়ালে কেউ দুটো প্রদীপ জেলে রেখেছে।

শান্তগলায় অবিনাশবাবু বললেন, জানি!

বাবা বোঝাবার ভঙ্গি করে বললেন, তবে? জেনেশুনে ও বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন কেন?

এবারে অবিনাশবাবু হাসলেন, অত্যন্ত মিষ্টি করে হাসলেন। রঞ্জুর মনে পড়ল তাঁর আর একদিনের এমনি সুন্দর হাসির কথা, যেদিন সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি 'নিহিলিস্ট' কিনা।

বললেন, আমি সত্যাগ্রহী চাটুয্যে মশাই। মরাটা আমার কাছে বড় কথা নয়, তার চাইতে ঢের বড় সত্যপালন। সেই চেষ্টাই আমি করব। একজন মানুষকেও যদি বাঁচিয়ে

যেতে পারি, তা হলে মরতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই।

বাবা হাল ছাড়েননি তখনো। বললেন, থামুন, পাগলামি করবেন না। যা সম্ভব, তারই চেষ্টা করা ভালো, অসম্ভবের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপদ ডেকে আনবার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া দেশ আপনাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে, এত সহজে আপনারা মরলে চলবে কী করে ?

'দেশ' কথাটায় বাবা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও একটুখানি খোঁচা দিয়েছিলেন হয়তো—অথবা হয়তো বলেছিলেন নিতান্ত সহজ আর নিরীহভাবেই। কিন্তু অবিনাশবাবু আর বসলেন না, সঙ্গে সঙ্গে পিঠের মেরুদণ্ডটাকে একেবারে সোজা করে খাড়া করে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

অবিনাশবাবু বললেন, চাটুয্যে মশাই, দেশ বলতে আমি ঝাপসা বা আবছায়া কিছু বুঝি না, একটা মানচিত্রও আমার দেশ নয়। দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে যদি কোনো একটা আলাদা দেশের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তার সম্বন্ধেও আমার কোনো কৌতূহল নেই। আপাততঃ এই মানুষগুলোকে বাঁচানো ছাড়া দেশের প্রতি কোনো বড় কর্তব্যও আমি দেখতে পাচ্ছি না।

বাবা বললেন, কিন্তু আপনি পারবেন না।

—অন্ততঃ চেষ্টা করতে পারি, সেইটাই আমার সান্ত্বনা।

বাবা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সময় দিলেন না অবিনাশবাবু। বাইরে এসে তিনি একলাফে আবার তাঁর কড়াইয়ের নৌকোতে উঠে বসলেন। তারপরেই বাঁশের খোঁচায় তেমনি ভাবে কড়াই দুলতে দুলতে বন্দরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাবা সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, লোকটার সত্যিই মাথা খারাপ, বেঘোরে প্রাণটা দেবে মনে হচ্ছে।

অবিনাশবাবুর সত্যিই মাথা খারাপ ছিল কিনা এ প্রশ্নের উত্তর আজো রঞ্জু পায়নি। বাবার শেষ অনুমানটা কিন্তু ভুল হয়নি। সেই যে কড়াইতে বাঁশের খোঁচা দিয়ে বানের জলের ওপর দিয়ে তিনি ভাসতে ভাসতে চলে গিয়েছিলেন, তারপরে রঞ্জু আর কোনোদিন তাঁকে দেখতে পায়নি।

হ্যাঁ—জলে ডুবে মারা গিয়েছিলেন অবিনাশবাবু। সত্যাগ্রহী রক্ষা করেছিলেন তাঁর কঠিন শপথ। যে দেশের আহ্বানে নামগোত্রহীন মানুষটি সকলের অগোচরে নিঃশব্দে এখানে এসে বাসা বেঁধেছিলেন, সেই দেশের তাগিদেই তিনি আবার তেমনি নিঃশব্দে হারিয়ে গেলেন পৃথিবীর সম্মুখ থেকে। কোথা থেকে তিনি এসেছিলেন কেউ জানেনি, কোথায় তিনি চলে গেলেন সেটাও কেউ জানতে পারল না।

তিরিশ সালের বন্যা। উত্তর বাংলার বুকের ওপরে সর্বনাশা বন্যার ভৈরবী মূর্তি।

তার স্মৃতি এখনো সুদূর নয়। রেল লাইন ডুবেছিল, বহু গ্রাম ভেসে গিয়েছিল, মানুষ, গোরু, ছাগল প্রাণ দিয়েছিল অজস্র। তার পর এই বন্যার সেবার কাজে সমস্ত বাংলা দেশ সাড়া দিয়েছিল। ছুটে এসেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁদের সেবা, তাঁদের ত্যাগের কথা রয়েছে ইতিহাসে, লেখা রয়েছে সোনালী অক্ষরে। কিন্তু অবিনাশবাবুকে কারোরই মনে নেই, কারো মনে থাকবার কথাও নয়। বেঁচে থেকে যে সত্যাগ্রহী নিজেকে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছিলেন, মৃত্যুর পরেও কারো কাছে তিনি ধরা দিলেন না।

কী করে মারা গেলেন অবিনাশবাবু? দু-একজনে জানে সে ঘটনাটা।

নদীর স্রোতে টলমল করছিল অবিনাশবাবুর কড়াই। তবু বহু পরিশ্রমে তিনি বটগাছটার কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু পৌঁছোনো মাত্রেই বিপত্তি দেখা দিল, একসঙ্গে আট-দশজন কড়াইয়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের ধৈর্য নেই, সকলেই সবার আগে প্রাণ বাঁচাতে চায়।

এক মিনিটও সময় লাগল না। জলে মন্থন উঠল কিছুক্ষণ, কয়েকটা মাথা হাত পা ছুঁড়ে এদিক ওদিক সাঁতার দেবার চেষ্টা করল, তারপর প্রবল টানে আর চোখে পড়ল না তাদের। শুধু যেখানে কড়াইটা ডুবেছিল, ক্রমাগত সেখান থেকে কয়েকটা বুদ্‌বুদ ওপরের দিকে পাকিয়ে উঠতে লাগল। যাদের বাঁচাতে গিয়েছিলেন অবিনাশবাবু, শেষ পর্যন্ত তারাই হত্যা করলে তাঁকে।

বাবা শুনে খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, আহা, অমন চমৎকার ভালো লোকটা! বুদ্ধির দোষেই প্রাণটা এমন ভাবে খোয়ালে!

হয়তো বুদ্ধিভ্রংশই হয়েছিল অবিনাশবাবুর। কিন্তু সত্যাগ্রহীর সত্যভ্রংশ হয়নি।

এই সময়ে আরো কয়েকটি ছোট ঘটনা ঘটেছিল।

যে মন রূপকথার জগতে ভেসে যেতে ভালোবাসে, কড়ির পাহাড, হাড়ের পাহাড় আর ক্ষীরসমুদ্র যার কাছে কিছুমাত্র অবাস্তব নয়, এ ঘটনাও সে অবিশ্বাস করতে পারে নি। বড় হয়ে রঞ্জু বুঝতে পেরেছে চোখের ভুল ওসব, মনের ভুল। কিন্তু সেদিন—সেই মুহূর্তে কী ভয়ঙ্কর সত্যি হয়ে উঠেছিল সেটা!

বিকেল শেষ হয়ে গিয়ে সন্ধ্যে নামছে তখন। পশ্চিমের আকাশ কালো হয়ে আসছে, কালো হয়ে আসছে আত্রাইয়ের জল, অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে দূরে বোধন-তলার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বেলগাছগুলোর নিচে। খিড়কির পেছন দিয়ে, বড় পেয়ারা গাছটার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা আত্রাইয়ের ঘাটে গিয়ে নেমেছে, সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়েছিল রঞ্জু। আকাশে তাকিয়ে শুনছিল, বাদুড়ের ডানার শব্দে কেমন করে হাল্‌কা অন্ধকারটা মুখর হয়ে উঠেছে।

ঠিক এমন সময়। ঠাকুরমার ভাষায়, ঠিক কালী সন্ধ্যেবেলায়। যে সময় দক্ষিণের বাঁকটায় খ্যাওড়া বনে পেত্নীরা একে একে ঘুম থেকে জেগে উঠে পলুই নিয়ে বেরোয়—নদীতে আর জলায় মাছ ধরতে; আর যে সময় আলেয়াদীঘির উঁচু মাদার-কাঁটাভরা ডাঙাটার ওপরে স্কন্ধ-কাটারা একে একে আলেয়ার আগ্নেয় হাই তুলতে থাকে,—ঠিক সেই সময়; যখন মশানীর বানে ধ্বসা ভাঙা মন্দিরটায় ইটের স্তূপের উপরে বসে মা কালীর ডাকিনী-যোগিনীরা হাজার হাজার ফণা তোলা কালকেউটের মতো কোঁকড়ানো এলোচুল নদীর উদ্দাম বাতাসে শুকিয়ে নেয়, সেই কালী সন্ধ্যেবেলায়।

খানিক দূরে বাসক বনের ভেতরে ডাহুক ডেকে উঠল। ওই ডাহুকের ডাকটা ভালো লাগে না—মনে হয় ওদের অদ্ভুত কান্নার সুরের মধ্যে অস্বস্তিকর কী একটা আছে, আছে কোনো একটা অশরীরী ব্যাপার। কয়েক পা পেছনেই রঞ্জুদের গোয়াল, বাবার ঘোড়াটার আস্তাবল, তারপরেই খিড়কির দরজা। সেই দরজার দিকে সে দ্রুত পা চালিয়ে দিলে।

এমন সময় সেই ডাক তার কানে এল।

—রঞ্জু, রঞ্জু!

বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরল সে। আশ্চর্য সেই ডাক। বাতাস বইলে নড়ে-ওঠা পাতায় যে খস্ খস্ করে অস্পষ্ট একটা শব্দ বাজে, ডাকটা তার চাইতে জোরালো নয়। অথচ রঞ্জু স্পষ্ট শুনতে পেল, যেন কানের কাছে তীব্র স্বরে কে তাকে ডেকে উঠেছে, রঞ্জু, রঞ্জু, রঞ্জন!

সে ডাক, সে গলা ভোলবার উপায় নেই। অবিনাশবাবু।

সত্যিই অবিনাশবাবু। একটু দূরেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। রঞ্জু তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ স্পষ্ট বুঝতে পারছে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। কোনো রূপ নেই, কোন আকার নেই তাঁর। কালো হয়ে আসা আব্‌ছা দিনের আলোর পটভূমিকায় ধূপছায়া রং দিয়ে কে যেন এঁকে রেখেছে তাঁকে—পৃথিবীকে, অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা পরিবেশের সঙ্গে একাকার হয়ে তিনি মিশে আছেন। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না, অথচ তিনি আছেন, তাঁর গলার কোনো স্বর নেই—অথচ স্বরের একটা মূর্ছনা কাঁপছে বাতাসে বাতাসে; রঞ্জুর কানের কাছে দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শব্দ করে কে বলছে, রঞ্জু, রঞ্জু, রঞ্জন—

পাথরের মূর্তির মতো থেমে দাঁড়িয়েছে রঞ্জু। বুকের ভেতর পাথর হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ডটা। তার চোখ দুটোয় কোনো পলক পড়ছে না, যেন সে দুটোও পাথরের চোখ।

তারপরেই সেই আকারহীন দেহটা চলতে শুরু করলে অবিনাশবাবুর। শব্দহীন কণ্ঠস্বরটা অশ্রান্ত বেজে উঠতে লাগল: রঞ্জু, রঞ্জন, রঞ্জু—

রঞ্জু চলতে লাগল। খিড়কি দরজার দিকে নয়, বাড়ির দিকেও নয়। চলে গেল সে বাদুড়ের পাখা-ঝাপ্টানো পেয়ারা গাছটার তলা দিয়ে, চলে গেল ভাহুকের কান্না-ওঠা ঘন অন্ধকার বাসক বনটার পাশ দিয়ে। কোনো কিছু তার মনে পড়ল না, কোনো কিছু সে ভাবতে পারল না; মনে পড়ল না বাইরের বৈঠকখানা ঘরে লণ্ঠনের আলো জলে উঠেছে এতক্ষণে, ভাইবোনেরা সবাই স্বর তুলে পড়তে শুরু করেছে বিকট গলায় এবং সে এখনো বই নিয়ে এসে বসে নি বলে তার কান দুটো মলে দেবার জন্তে জ্যাঠ্তুতো ভাই নীতুদার হাত নিস্পিস্ করে উঠেছে।

রঞ্জু চলতে লাগল। পায়ে চলা পথ দিয়ে ক্রমশ এল আত্রাইয়ের নির্জন ঘাটে, তারপর ঘাট ছাড়িয়ে এগিয়ে চলতে লাগল। আরো, আরো, আরো, আরো—

আকারহীন মূর্তিটা চলে যাচ্ছে সম্মুখে। তার পায়ে পায়ে কোনো শব্দ উঠছে না, অথচ শুনতে পাচ্ছে রঞ্জু; তাঁর গলায় কোনো স্বর নেই অথচ সে স্বর স্পষ্ট কানে আসছে; এই কালীসন্ধ্যেয় অশরীরীরা জেগেছে, অবিনাশবাবুও জেগে উঠেছেন তাঁর মরণ-ঘুম থেকে, আত্রাইয়ের নীল জলের নিচে ঝুরঝুরে মিহি বালির ওপরের ঠাণ্ডা বিশ্রাম থেকে। আর সেই সঙ্গে সন্ধ্যাটাও অপরূপ হয়ে উঠেছে। যা দেখা যায় না, তাই দৃষ্টির সামনে প্রত্যক্ষ রূপ ধরেছে, যা নেই তাই নিয়েছে নির্ভুল সত্যের মূর্তি।

কানের কাছে হুহু করে আত্রাইয়ের বাতাস: রঞ্জু, রঞ্জু, রঞ্জু—

রঞ্জু চলেছে—কতক্ষণ ধরে চলেছে খেয়াল নেই। ধূপছায়া রঙের সন্ধ্যাটা ক্রমে নিবিড় কালো হয়ে গেল, আলেয়াদীঘির ধারে নাচানাচি করে উঠল অসংখ্য—অগণিত আলেয়া। অবিনাশবাবুর নিরবয়ব মূর্তিটা তেমনি কালো হয়ে উঠতে লাগল জমাট অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে।

চ্যাঁ—চ্যাঁ—চ্যাঁ—

মাথার ওপরে প্যাঁচার বীভৎস একটা তীব্র চিৎকার শোনা গেল।

এতক্ষণে রঞ্জুর চমক ভাঙল। এতক্ষণে যেন ঘুম ভেঙে গেল তার।

এ সে কোথায় এসে পড়েছে! করছেই বা কী! চারদিকে থমথমে অন্ধকার—জন-প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। একটু দূরে কবিরাজের বড় আমবাগানটার মাথাগুলো আত্রাইয়ের বাতাসে শোঁ শোঁ করে দুলছে, যেন অতিকায় কতকগুলো ভূত-প্রেত মাথা নেড়ে ডাকছে রঞ্জুকে।

আর রঞ্জু একমনে ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ করছে একটা টিনের চালার ধ্বংসস্তূপ—অবিনাশবাবুর আশ্রমটা! কতকগুলো ভাঙা খুঁটি মড়ার হাড়ের মতো অন্ধকারে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে, তাদের ওপর চাপা দেওয়া নানা আকারের কতকগুলো টিনের টুকরো। রঞ্জু তারই চারদিকে বার বার ঘুরছে, ঘুরছে বিছুটির জঙ্গল মাড়িয়ে, ভাঁট ফুলের ঝোপ

ভেঙে, জানা-অজানা ছোট ছোট গাছ-গাছালি পায়ের তলায় দলে দলে। চারদিকের বনে জঙ্গলে কালিঢালা রাত্রি, জনমানুষের চিহ্ন-হীন ঘন অন্ধকারে আমবাগানটার ভৌতিক আহ্বান!

—চ্যা—চ্যা—চ্যা—

মাথার ওপরে আবার প্যাচার চিৎকার। যে মুহূর্তে রঞ্জু থেমে দাঁড়ালো, সেই মুহূর্তে অসীম-ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা। দ্রোণ ফুলের কথায় গন্ধভরা ঝোপটার ওপরে যখন সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল তখন শেষবারের মতো তার চোখে পড়ল আকাশের কালো শ্লেটটার গায়ে কতগুলো আলোর অক্ষর দিয়ে কে যেন একটা দুর্বোধ্য লিপি লিখে চলেছে!

চার

তিরিশ সালের বন্যা। রঞ্জু ভোলেনি—রঞ্জু ভুলবে না। সেদিনকার আত্রাইয়ের সেই কূলভাঙা ক্ষ্যাপা স্রোতে অবিনাশবাবু হারিয়ে গিয়েছিলেন, হারিয়ে গিয়েছিলেন চির-দিনের মতো। সেদিন বকুলবনের নিচে ঘোলা জল থলখল করে খেলা করে গিয়ে-ছিল, সেদিন কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে থইথই করা জল ভাসিয়ে নিয়েছিল মরা কাকের ছানাটা, সেদিন কবিরাজের বাগানের ওপারে বিশ্‌লার মাঠ সমুদ্রের রূপ ধরেছিল—সেই সমুদ্র—যা রঞ্জু স্বপ্নে দেখেছে, যার দুধের মতো জলে সোনার কমল ভোরের রাঙা আলোয় একটার পর একটা ঝলমলে পাপড়ি মেলে দেয়।

কিন্তু সব কিছু স্বপ্ন—সব কিছু ছায়াবাজির ওপর সেদিন প্রথম রূঢ় বাস্তবের কালো ছায়া পড়েছিল এসে। সে মৃত্যু—রঞ্জুর জীবনে মৃত্যু সম্পর্কে প্রথম অভিজ্ঞতা। যখন শুনেছিল অবিনাশবাবু মারা গেছেন, তখনকার অনুভূতি আজকে আর মনে পড়ে না। হয়তো মনে হয়েছিল রূপকথার রাজপুত্র যেমন করে গজমোতি আনবার জন্যে ক্ষীরের সায়রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, আর রূপবতী রাজকন্যা তার গলায় লক্ষেশ্বরী হার পরিয়ে তাকে বরণ করে নেবার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকে—বন্যার ঘোলাজলের স্রোতে অবিনাশ-বাবু তেমনি করেই কোনো সাত রাজার ধন মাণিকের সন্ধানে যাত্রা করেছেন। তখন মৃত্যু কী সে জানত না—জীবন-মরণের মাঝখানে যে অপরিচয়ের কালো অন্ধকার খাঁ-খাঁ করছে—নিরালোক দুর্লক্ষ্য সেই রহস্যময়তা সম্পর্কে এতটুকু ধারণা ছিল না তার।

তারপর সেই সন্ধ্যা। অবিনাশবাবু সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, অথচ তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না; তিনি রঞ্জুকে ডেকেছিলেন, অথচ কোনো স্বর ছিল না সে ডাকের। আসন্ন অন্ধকারে

আত্রাইয়ের ধারে ধারে পায়ে-চলা পথ দিয়ে সে হেঁটে গিয়েছিল, ছাড়িয়ে গিয়েছিল মশানীর মন্দিরের ভাঙা-চুরো ইটের জাঙ্গাল—যেখানে মশানীর ডাকিনী-যোগিনীরা গোখরো সাপের মতো রুক্ষ কিলবিলে চুলের রাশ শুকিয়ে নেয় নদীর উদ্দাম বাতাসে ; পেরিয়ে গিয়েছিল লাখে লাখে জোনাক-জ্বালা বৈঁচির জঙ্গল, তার পর—

তারপর রঞ্জু প্রথম অনুভব করছিল মৃত্যুকে। টের পেয়েছিল কেমন করে চোখের সামনে পৃথিবীটা সংকীর্ণ হতে হতে ক্রমে একটা আবছা আলোর বিন্দুর মতো মিলিয়ে আসে ; কেমন করে একটা অবশ ঠাণ্ডা অনুভূতি সাপের মতো পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরতে থাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। একটা অদ্ভুত—অব্যক্ত ভয়ে সমস্ত বোধ-শক্তি অসাড় হয়ে যায়, চিৎকার করে উঠলেও মুখ দিয়ে এতটুকু শব্দ বেরুতে চায় না। আর আচ্ছন্ন হয়ে আসা দৃষ্টির সামনে হাজার হাজার ছায়ামূর্তি যেন ঘুরে ঘুরে নাচে, তাদের অসংখ্য চোখ অজস্র সবুজ আলোর মতো চারদিকে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকে, তারা ডাকে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে। অবিনাশবাবু যেমন করে তাকে ডেকেছিলেন, সেই নিঃশব্দ স্বরে তারা ডাকে—হু হু করা বাতাসে তাদের সেই ডাক দিক থেকে দিগন্তে ভেসে চলে যায়।

কোথায় ডাকে তারা, কেন ডাকে ? সেই কন্যা কেশবতীর দেশে ? যাদের ডাক শুনে অবিনাশবাবু বন্যার প্রবল স্রোতে ভেসে চলে গেলেন—সেই সেখানে ?

কিন্তু সে তো মৃত্যুর ডাক। অবিনাশবাবু কি মৃত্যু চেয়েছিলেন ? না, মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আনতে চেয়েছিলেন নতুন জীবনের অঙ্কুরকে ? তিনি কি রঞ্জুকে ওই ঘন-কালো অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যেতে বলেছিলেন, না আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ওই অন্ধকার ছাড়িয়ে সূর্যোদয়ের দিগন্তে গিয়ে পৌঁছুতে হবে তাকে ? বাদুড়ের ডানার আর কালপ্যাঁচার আর্তনাদের শব্দে মুখরিত কালীসন্ধ্যায় তাকে ভাঙা আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন কি শ্মশানের রূপ দেখাবার জন্য, না ওই শ্মশানের ওপর নতুন জীবন-প্রতিষ্ঠার জন্যে ?

এ প্রশ্নের জবাব সে পেয়েছিল অনেকদিন পরে।

এই সময়ে রঞ্জুর বিয়ে হল।

হাসির কথা নয়—সত্যিই বিয়ে। সাত বছরের ছেলের সঙ্গে ছ বছরের কনের। বিয়েটা জমেছিল ভালো, আয়োজন অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয়নি কোথাও। এমন কি ভূরিভোজনের ব্যবস্থা হয়েছিল পর্যন্ত।

আর শুধু বিয়ে নয়—রীতিমত বিপ্লবাত্মক ব্যাপার। সাত বছরের ছেলে—বাপ-মার মত নিলে না, বীরের মতো অসবর্ণ বিবাহ করে ফেলল। কিন্তু আশ্চর্য—সমাজে চাঞ্চল্য ঘটল না, খবরের কাগজে লেখালেখি হল না, বাপ-মা বরকনেকে বাড়ি থেকে দিলেন না দূর করে। উল্লেখযোগ্য ঘটনা যেটুকু ঘটেছিল সেটুকু অশ্বিনীর কাঁধ থেকে কনের পতন,

সবো ' ক্রন্দন এবং অশ্বিনীর খুড়ো রাইকিশোরবাবুর পথ দিয়ে যেতে যেতে ঘটনাটা দেখে জোরে অশ্বিনীর কর্ণমর্দন।

—ফেলেই যদি দিবি, তা হলে কাঁধে করতে গেলি কেন হতভাগা?

—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—ধেড়ে ছেলে অশ্বিনী ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলল। ছাত্রমহলে বীর বলে যার অসাধারণ খ্যাতি, নিহিলিস্টদের বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করতে করতে যার চোখ দুটো উৎসাহে দপ দপ করে উঠত—এ হেন অশ্বিনী কিনা কাকার চড় খেয়ে কেঁদে ফেলল।

—অ্যাঁ—অ্যাঁ—আমি কী করব। যা ছটফট করছিল—

—ছটফট করছিল তো কাঁধে তুললি কী বলে? লেখাপড়ায় একেবারে ধনুর্ধর—অথচ সবটাতে মাতব্বরী করা চাই। গাধা কোথাকার!

সশব্দে অশ্বিনীর গালে আর একটি চপেটাঘাত করে রাইকিশোরবাবু চলে গেলেন। কিন্তু বিপর্যয়ও ঘটিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গেই। শুভ-বিবাহের শোভাযাত্রাটা ভেঙে গেল। অবশ্য সেটা বড় কথা নয়—বৃহৎ ব্যাপারে অমন দু'চারটে অঘটন ঘটেই থাকে।

কিন্তু বিয়েটা হয়েছিল—বেশ ঘটা করেই হয়েছিল।

অবশ্য বিয়ের পেছনে একটুখানি ইতিহাস আছে। দিন কয়েক আগে নামকরা মহাজন যজ্ঞনাথ কুণ্ডুর মেয়ের বিয়ে দেখেছিল ওরা। মস্ত বড় শোভাযাত্রা হয়েছিল, পিতলের গিল্‌টি করা বিশাল খোলা পাল্‌কিতে গিয়েছিল টোপর পরা বর—চেলির ঘোমটা-টানা কনে। আগে আগে চলেছিল বিরাট বাজনার দল, অভ্রের তৈরী হাজার ডালের ঝাড়-লণ্ঠন আলো করে ছিল চারদিক। এত বড় বিয়ে—এমন আয়োজন এদিককার লোক কেউ কখনো দেখেনি। সেই থেকেই প্রেরণাটা এসেছিল অশ্বিনীর মাথায়। কোত্থেকে চুরি করে আনা একখানা মস্ত পাটালিগুড় চাটতে চাটতে অশ্বিনী বলে বসল, এই, বিয়ে দিতে হবে।

সমস্বরে প্রশ্ন হল: কার?

তাই তো। অশ্বিনী সেটা ভাবেনি। অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে অশ্বিনীর চোখ পড়ল রঞ্জুর দিকে, সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহভরে লাফিয়ে উঠল সে। হাত থেকে পাটালিগুড়খানা পর্যন্ত পড়ে গেল তার।

—রঞ্জুর।

—আমার?

—হ্যাঁ, তোর। তোরই চমৎকার হবে।

রঞ্জু রাজী হয়ে গেল। বিয়ে করতে হবে—এতে আর আপত্তিটা কোথায়। বেশ উৎসাহজনক প্রস্তাব।

—কিন্তু আমাকে পাল্‌কি করে নিয়ে যাবে তো ?

—নিশ্চয়।

—আলো জ্বলবে—বাজনা বাজবে ?

—আলবাৎ।

—মাথায় টোপর দেবে তো ?

—ঠিক দেব।

ব্যাস, সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। অশ্বিনী তখনি বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছিল, কিন্তু আর একটা মুশকিল দেখা দিল। একজন জিজ্ঞাসা করে বসল, তবে বউ কই ?

—এই তো—এ কথাটাও তো এতক্ষণ মনে হয়নি। নাঃ, নিশ্চিন্তে পাটালিগুড় চাটা আর অশ্বিনীর কপালে নেই দেখা যাচ্ছে। অশ্বিনী বললে, ঠিক—বউ কই ?

রঞ্জু বললে, বউ না থাকলে আমি বিয়ে কবব না।

—তাই তো, বিপদে পড়া গেল।—অশ্বিনী মাথা চুলকোতে লাগল। কিন্তু যাদের জীবনে রূপকথাব সঙ্গে বাস্তবের ব্যবধান অত্যন্ত সংকীর্ণ—রূপকথার মতোই অতি সহজে তারা যা কিছু সংকট অতিক্রম করে চলে যায়। অতএব ঘটনাস্থলে কনের আবির্ভাব হল।

কনেব খালি গা—ছোট একটি ইজের পবনে। এক হাতে একটি সেলুলয়েডের পুতুল—অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে সেটি চর্বণ করায় তার নাকমুখগুলো সব চ্যাপ্টা মেরে গেছে। আর এক হাতের আঙুলে একটুখানি আচার, কনে সেটা একটু একটু কবে খাচ্ছিল—আর মুখ চোখাচ্ছিল উস্ উস্ শব্দে।

—বাঃ, বাঃ—ঠিক হয়েছে। এই তো বউ।—অশ্বিনীই একাধারে বরকর্তা আর কন্যাকর্তা। মেয়েটার হাতের আচারের দিকে একটা লোলুপ দৃষ্টি ফেলে অশ্বিনী বললে, এই উষি, বউ হবি ?

উষি অর্থাৎ উষা অশ্বিনীর দৃষ্টি লক্ষ্য করে ততক্ষণে পেছনে লুকিয়ে ফেলেছে আচার-সুদ্ধ হাতটা। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, আমার আচার খেয়ে নেবে না তো ?

—না, কক্ষনো না। খানিকটা লালা গিলে নিয়ে অশ্বিনী বললে, বয়েই গেল তোর আচার খেতে। আমার কত বড পাটালি রয়েছে দেখছিস না ? বউ হবি ?

—হব। কিন্তু একটুখানি পাটালি দেবে তো আমাকে ?

শেষ কথাটাস কান দিলে না অশ্বিনী। ও সব কথা অশ্বিনী শুনতে পায় না, অন্তত সব দিক থেকে না শোনাটাই নিরাপদ। বললে, বউ হলে তোকে কাঁধে করব।

—আগে একটু পাটালি দাও তবে !

—আঃ—পাটালি পাটালি করছিস কেন ? আগে বউ হয়েই ছাখ্ না—তার পর—

তারপর কনে আর বিশেষ আপত্তি করলে না। পাটালির প্রতিশ্রুতি তো আছেই, তা ছাড়া কাঁধে চড়বার ব্যাপারটাও একেবারে কম প্রলোভনের জিনিস নয়। সুতরাং শুভ-বিবাহটা হয়েই গেল।

অশ্বিনীর মৌলিকতা আছে। বললে, বিয়ের ছাত্‌নাতলা চাই। নইলে বিয়েই হয় না যে।

ছাত্‌নাতলা! ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু বর কনে যখন যোগাড় হয়ে গেছে, তখন ছাত্‌নাতলার ব্যবস্থা হতেও দেরি হল না।

সত্যিই আদর্শ ছাত্‌নাতলা। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার পাশ থেকে কে যেন কবে মাটি কেটে নিয়ে গিয়েছিল, একটা মস্ত গর্ত সেখানে হা হা করছে। বর্ষার সময় জল জমে সেটাতে, মাস-ছয়েক ছোটখাটো একটা ডোবার মতো হয়ে থাকে গর্তটা। তারপর জলকাদা শুকিয়ে গেলে ভিজে-ভিজে নরম মাটির ওপর এলোমেলো আগাছার সঙ্গে গজায় কচুর বন। তাজা পরিপুষ্ট কচু—কালচে বেগুনীরঙের ডাঁটার ওপরে প্রসারিত নধর পাতাগুলির বুকে শিশিরের মুক্তো খেলা করে বেড়ায়, তার তলায় বাড়তে থাকে কট্‌কটে ব্যাং আর কেঁচোর সংসার। মাঝে মাঝে ঘুঁটে-কুড়ুনিরা শাক খাওয়ার জন্যে দুটো চারটে কচুর ডাঁটা কেটে নিয়ে যায়, কিন্তু নিবিড় ঘনবিন্যস্ত কচুর জঙ্গল তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

অশ্বিনী বললে, ওই কচুর বনেই ছাত্‌নাতলা হবে।

হলও। চারদিকে কচুগাছ ভেঙে মাঝখানে একটুখানি জায়গা করা হল। বর-কনে দাঁড়াল মুখোমুখি।

পৌরোহিত্যটাও করলে অশ্বিনীই। রঞ্জুর হাতে তুলে দিলে কনের আচার ও লালাসিক্ত হাতখানা। বললে, এইবার মন্তর পড়্।

—মন্তর।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মন্তর। নইলে বিয়ে হবে কী করে? আমি যা বলছি তাই বলে যা।

একজন আইনঘটিত প্রশ্ন তুললে, কিন্তু তুমি তো বামুন নও।

—আরে ধ্যাৎ—রেখে দে বামুন—অবজ্ঞাব্যঞ্জক একটা মুখবিকৃতি করলে অশ্বিনী: কেউ একজন পড়ালেই হল। আচ্ছা বল্ রঞ্জু—ওং বিবাহং নমঃ—

—ওং বিবাহং নম—

—ওং উবিং নম—

এতক্ষণে রঞ্জু প্রতিবাদ করলে। বললে, দূর, তা বলব কেন? বউকে বুঝি কেউ পেন্নাম করে?

—থাম্ না, তুই ভারী তো বুঝিস!—যেন সব বোঝে এমন সবজান্তার মতো দরাজ গলায় অশ্বিনী বললে, যা বলছি তাই চুপটি করে আউড়ে যা—বুঝলি? বল্ উবিং নম—

অগত্যা বলতে হল। বিয়ে করতে বসে পুরুতের আদেশ অবহেলা করা যায় না। সুতরাং অশ্বিনীর নির্দেশে যথাযথ মন্ত্রপাঠ চলল কিছুক্ষণ। কিন্তু কচুর রসে সর্বাঙ্গ চিড়বিড় করে জ্বলতে শুরু করেছে। রঞ্জু বললে, আর নয় ভাই, গা জ্বলছে ভয়ঙ্কর।

অশ্বিনী একটা উঁচুদরের হাসি হাসল।

—আরে, বিয়ে করতে গেলে অমন এক-আধটু গা-জ্বালা করেই। জ্বলুনির এখনি কী হয়েছে!

আজ বড় হয়ে বিস্মিত রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ভাবে—অশ্বিনীর কণ্ঠে দৈববাণী আশ্রয় করেছিল নাকি সেদিন! নইলে অমন একটা নিদারুণ প্রত্যক্ষ সত্য সেদিন অমন অবলীলা-ক্রমে অশ্বিনী উচ্চারণ করেছিল কী করে!

বিয়ে মিটল, তারপরে শোভাযাত্রা।

দু-তিনজন ছেলে মিলে রঞ্জুকে চ্যাংদোলা করে নিয়েছে, আর অশ্বিনী ঊষিকে তুলেছে কাঁধের উপরে। সগৌরবে শোভাযাত্রা চলেছে। একজন মুখে মুখে ঢোলের বোল্ বাজাচ্ছে: টাক ডুম্ টাক ডুম্ টাক ডুম্ ডুমাডুম্। আর একজন একটা আমের আঁটির ভেঁপুতে প্যাঁ-প্যাঁ-প্যাঁ-প্যাঁ করে সানাইয়ের আওয়াজ তুলছে। ঝাড়লণ্ঠন নেই, তার অভাব পূরণ করতে একজন আগে আগে নিয়ে চলেছে একটা পাকুড় গাছের ঝাঁকড়া ডাল। দৃশ্যটি একাধারে মনোরম এবং রোমাঞ্চকর।

এমন সময় বাগড়া দিলে নববধূ। কাঁধের ওপর সে উস্‌খুস্ করতে লাগল: আমার গুড় কই, গুড়?

অশ্বিনী অস্থির হয়ে বললে, দাঁড়া না, দাঁড়া। আগে বিয়েটা হয়ে যাক, তারপরে তো? জানিস নে, বিয়ের দিনে বরকনেকে কিছু খেতে নেই?

কিন্তু ঊষা ভোলবার পাত্রী নয়।

—না, গুড় দাও আমাকে, পাটালিগুড়—

—আঃ, খেলে যা!—অশ্বিনী আরো বিব্রত হয়ে উঠল: কোথাকার কনে রে এটা! খালি খাই খাই! বলছি বিয়েটা মিটে গেলেই দেব এখন—

—নাঃ, এখুনি দিতে হবে—

অশ্বিনীর ধৈর্য অসীম নয়। তা ছাড়া পাটালিগুড়ের প্রশ্নটা একেবারে তার মর্মস্থলে আঘাত করছিল। আশা ছিল বিয়ের নানা আয়োজন-আড়ম্বরের ভেতরে পাটালির কথাটা ঊষা বেমালুম ভুলে যাবে, কিন্তু তার স্মৃতিশক্তির ওপরে অবিচার করেছিল সে। কাঁধের ওপর অস্থিরভাবে দুলতে দুলতে ঊষা তালে তালে বলতে লাগল: গুড় দাও—গুড় দাও—গুড় দাও—

—গুড় দাও—গুড় দাও! এইবারে অশ্বিনী খেঁকিয়ে উঠল: ফের যদি ওরকম

চ্যাচাবি তো একটা থাপ্পড় কষিয়ে একেবারে ড্রেনের ভেতরে ফেলে দেব।

এইবারে উষি বিদ্রোহ করে উঠল: অ্যা অ্যা অ্যা! মিথ্যে কথা বলে বিয়ে দিলে, এখন দেবে থাবড়া! নামিয়ে দাও—নামিয়ে দাও আমাকে। উষার ধারালো নখের আঁচড়ে অশ্বিনীর গালের কপালের এক পর্দা চামড়া উঠে গেল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল অশ্বিনী।

পরে যা ঘটল সেটুকু বিয়োগান্তক। অশ্বিনী ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিয়েছিল কিনা কে জানে, তার কাঁধের ওপর থেকে একটা পাকা কাঁঠালের মতো ধপাৎ করে মাটিতে পড়ে গেল উষা। তারপরের কাহিনীটা আগেই বলে নেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে রাইকিশোর-বাবুর প্রবেশ, অশ্বিনীকে কর্ণমর্দন এবং চপেটাঘাত, অতঃপর যবনিকা পতন।

সজল অগ্নিময় চোখে অশ্বিনী আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাইকিশোর-বাবু ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছেন, উষা কাঁদতে কাঁদতে ছুটেছে নিজেদের বাড়ির দিকে। শোভাযাত্রীর দল শবযাত্রীদের মতো শোকে এবং বেদনায় মুহ্যমান। ঢোল বাজছে না, শানাইয়ের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। পাকুড় গাছের ঝাড়লণ্ঠন অনাদৃত এবং অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সবাই বিমূঢ় আর বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, কারো মুখ দিয়ে একটা কথা ফুটছে না।

তারপর প্রথম কথা বললে অশ্বিনীই। বললে, শালা।

একজন জিজ্ঞাসা করলে, কে?

এতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকবার পরে ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মতো অশ্বিনী হঠাৎ নেচে উঠল। ভৈরব গর্জনে বললে, কাকা শালা। উষি শালা। তোরা সবাই শালা—

তারপরে দ্রুতবেগে প্রস্থান করলে সে।

আজ অশ্বিনীর কথা মনে পড়লে সহানুভূতি জাগে রঞ্জুর। সত্যিই সেদিন তার ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ ছিল। নিঃস্বার্থভাবে যারা পরের উপকার করবার মহৎ সংকল্প করে, ওই চপেটা-বর্ষণ এবং কর্ণ-তাড়নই তাদের চিরকালের পুরস্কার। বিয়ে হল রঞ্জু আর উষির—তাতে অশ্বিনীর কি লাভ? নিজে এত পরিশ্রম করে উদ্যোগ আয়োজন করলে, এতখানি পথ কাঁধে করে কনেকে টেনে নিয়ে বেড়াল, তার বিনিময়ে সে পেল এই! পৃথিবীটা এমনি অকৃতজ্ঞই বটে! অশ্বিনীর উত্তেজনার অর্থ রঞ্জু বুঝতে পারে।

আর সেই কনে—সেই উষা?

তার স্মৃতি রঞ্জুর মন থেকে প্রায় মুছে গেছে—মুছে গেছে শ্লেটের লেখার মতো। তার জীবনের প্রথম নায়িকার ছবিটা অলস কল্পনাকে স্বপ্নমন্থর করে তোলবার মতো নয়। একটুখানি ছোট্ট মেয়ে—ময়লা রং, পরনে ইজের, খালি গা, হাতে নাসিকামুখবিবর্জিত একটা সেলুলয়েডের পুতুল, আঙুলে আচারের লালাসিক্ত অবশেষ। সেদিনকার সেই রূপ-

কথার রুপালী রং মেশানো আকাশে বাতাসে নদীর জলে যে নায়িকা রঞ্জুর জীবনে নেমে আসতে পারত—ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতো তার বর্ণ, চৈতালী আকাশে ঘনিয়ে-আসা নিবিড় নীল মেঘের মতো তার চুল, সূর্য ডুবে-আসা পশ্চিম আকাশের ময়ূরকণ্ঠী-রঙা তার শাড়ির আঁচল, সূর্যোদয়ের মতো তার কপালে সিঁদুরের টিপ; তার গলার মণিমালায় চুনি-পান্নার দীপ্তি, তার হাতে বিদ্যুতের কনক-কঙ্কন, তার স্থলপদ্মের মতো দুটি রাঙা পায়ে হীরা বসানো রতনচক্র। ফড়িংয়ের পাখায় ভর দিয়ে নেমে আসতে পারত তার নায়িকা, তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারত হাল্‌কা হাল্‌কা মেঘের জগৎ ছাড়িয়ে, আকাশ-গঙ্গা পেরিয়ে সাত ভাই চম্পার নিদ্‌মহলের পাশ দিয়ে—কোথায় কত দূরে—অত কি ভাবতে পারে রঞ্জু?

কিন্তু সে এল না—দেখা দিলে না আকাশচারিণী পরীর দেশের রাজকন্যা। তার জায়গায় এল পৃথিবীর মেয়ে—মাটির মেয়ে। সে উন্মনা কল্পনার স্বপ্ন-কমল নয়, মাটিতে ফোটা ছোট একটি ভুঁইচাঁপা। কিন্তু আকাশচারী মন যার মাটির দিকে তাকাতে জানে না, শূন্যের সন্ধানে যার মন সত্যসীমা ছাড়িয়ে উড়ে চলেছে, পৃথিবীতে অনেক ঘাসের ফুল, অনেক ভুঁইচাঁপাকেই সে পায়ের নিচে দলে চলে যায়। আজ তেমনি করেই কল্প-জগতের ছায়াসঙ্গিনীরা উষিকে দৃষ্টির নিভৃত আড়ালে, স্মৃতির আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেছে রঞ্জুর। ভালোই হয়েছে—ছেলেবেলায় অমন করে স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল বলেই তো এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে মোহমোচন। কাচের রঙিন চশমাটা ভেঙে টুকরো হয়ে যেতে দেরি হল না। তবু কোথায়, কোন্ মাটিতে সেই ছোট কুঁড়িটি আজ তার মধুকোষ মেলে দিয়েছে—নতুন করে তাই ভাবতে ইচ্ছে করে। তার গান্ধর্ব-বিবাহের সেই প্রথম নায়িকা কার ঘর করছে আজ?

কার ঘর? ভাবতে ইচ্ছে করে, কল্পনা করতে ভালো লাগে। একটি সাধারণ গৃহস্থের বাড়ি। মাটির দেওয়াল, মাটির দাওয়া, দেওয়ালের গায়ে বসুধারা আঁকা, আঁকা পদ্মলতা। এক পাশে লক্ষ্মীশ্রী লাগা ধানের পালা সাজানো, উঠোনে ঢেঁকি। আর একদিকে একটি ছোট মাচায় শিমের লতায় অজস্র ফলন হয়েছে—ঝিঙেফুলে সোনার রেণু ছিটোনো। গোয়ালে টসটসে দুধে বাঁটভরা শ্যামলী ধবলী। হেনার ঝাড়ের মধ্য দিয়ে একটি ফালি পথ আম-জামের ছায়ায় ঢাকা খিড়কির পুকুরে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেই ঘরের ঘরণী হয়েছে উষা। ছেলেপুলের মা হয়েছে—স্বামী-সোহাগিনী হয়েছে—সংসারের চারদিক উথলে উথলে পড়ছে যেন।

আর রঞ্জু? সেই গান্ধর্ব-বিবাহ যদি উষার জীবনে সত্যি হয়ে উঠত, তাহলে কী হত আজকে?

কিন্তু পরের কথা আগে বলে লাভ নেই।

অতীতের দিকে তাকিয়ে রঞ্জনের মনে হয়—তার জীবনে দুটো দিক কী আশ্চর্য ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল সেই শৈশব-বয়সে, চেতনার সেই প্রথম উন্মেষ-পর্বে। অবিনাশ-বাবু আর উষা। আগামী আকাশের প্রথম অরুণোদয়। পৃথিবীর দাবির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় তার!

পাঁচ

সত্যিই স্মৃতির পাতার হিসেবটা এলোমেলো। কত বড বড় ঘটনা, কত বিস্ময়কর ব্যাপার সে অবলীলাক্রমে জলের লেখার মতো মুছে ফেলে—সাধারণ চোখে যাকে পৃথিবীর একটা অসাধারণ অঘটন বলে মনে হয়, তার কাছে তার এতটুকু দাম থাকে না হয়তো। একটা অতি তুচ্ছ মুহূর্ত, রাশীকৃত ঘটনার আকার-অবয়বহীন কালো পটভূমির ওপরে শীতল কঠিন একটি নক্ষত্রের মতো দীপ্তি পায়।

রঞ্জুর মনে পড়ে পদ্মার ভাঙনের একটা দৃশ্য দেখেছিল একবার। রাক্ষসী নদী পদ্মা—রাক্ষসীর মতো তার ক্ষুধা। তার কুটিল হিংসার অশ্রান্ত আঘাতে মুহূর্তে গ্রাস করে নেয় নগর, অরণ্য, জনপদ। লক্ষ কোটি কীর্তিকে বিনাশ করেই কীর্তিনাশার আনন্দ।

সেই ভাঙনের আনন্দে মেতে ওঠা নদীর একটা বিচিত্র খেয়াল চোখে পড়েছিল তার। ভরা বর্ষায় মাতাল নদী তার মাতলামি শুরু করেছে, পাক-খাওয়া ঘোলা জলের আঘাতে এদিকের প্রায় আধখানা পাড়ি নেমে গেছে নদীর অতল গর্ভে। অথচ কী আশ্চর্য—প্রায় নদীর মাঝামাঝি জায়গায় যেন কী একটা অদ্ভুত মন্ত্রবলে একফালি ডাঙা ছোট্ট একটা গোলাকার দ্বীপের মতো মাথা তুলে রয়েছে। চারদিক থেকে নদী ভেঙে নিয়েছে, ওই দ্বীপখণ্ডটুকুকে ঘিরে ঘিরে ক্ষ্যাপা জল নেচে বেডাচ্ছে ফেনায়িত উদ্বেল আনন্দে—অথচ একটুখানি সবুজ মাটির বুকে তিন-চারটি কলাগাছ আর একখানা মেটে ঘর আছে অবিচলিত গৌরবে দাঁড়িয়ে। পদ্মার অকারণ খুশির খেয়াল।

মনের মধ্যে সেই খেয়ালী প্রখর পদ্মার স্রোত বইছে অবিরাম ছন্দে। ভাঙছে উঁচু পাড়ি, ঝরে পড়ছে, গলে যাচ্ছে, ঢেউ জাগিয়ে, একরাশ বুদ্বুদের দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিহ্নতায়। কিন্তু একটি আশ্চর্য মুহূর্ত, একটি অতি তুচ্ছ ঘটনা, সেই প্রবল ভয়ঙ্কর কীর্তিনাশা স্রোতকে উপেক্ষা করে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। আজ রঞ্জুর মনে. হয়, জীবনের বাঁধা উঁচু ডাঙাগুলোর চাইতে স্মৃতির ওই দ্বীপখণ্ড সমষ্টির মধ্যে কোথায় যেন অনেক বড় সত্য, অনেক গভীর কোনো তাৎপর্য নিহিত রয়ে গেছে।

এমনি একটা ব্যাপার।

ইস্কুলের কথা মনে পড়ে। পাড়াগাঁয়ের এম-ই স্কুল—প্রাগৈতিহাসিক যুগের রীতি-

নীতিতে শিক্ষাদীক্ষার বন্দোবস্ত। সাড়ে সাত থেকে সাড়ে বত্রিশ টাকা পর্যন্ত শিক্ষকদের বেতনের পরিধি! তাই মাইনে আদায় করতে না পারলে তাঁরা ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি কলাটা মুলোটা যা পারেন সংগ্রহ করেন। তাতেও যখন পেট ভরে না, তখন বঞ্চিত জীবন সম্পর্কে তাঁদের যা কিছু অভিযোগ এবং বিদ্বেষ, তার পুরোপুরি শোধ তোলবার চেষ্টা করে থাকেন ততোধিক দুর্ভাগ্য ছাত্রদের ওপর দিয়ে!

"না ঠ্যাঙালে ছেলে বয়ে যাবে"—এই মহান মূলমন্ত্রটি কোন্ ইংরেজ শিক্ষক কবে আবিষ্কার করে অমরত্ব লাভ করেছেন কে জানে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করবার সদুপদেশ দিয়ে গেছেন ভারতীয় মনীষীরা। নাজীপুর এম-ই ইস্কুলের মাস্টার মশাইদের কাছে সুবল মিত্রের বাংলা অভিধান আর অক্সফোর্ডের ইংরেজী ডিক্সনারীর মতো এই মন্ত্র দুটিও অবিস্মরণীয় এবং অঙ্গাঙ্গী।

পাঠশালার পণ্ডিতদের ঐতিহ্য তাঁরা অখণ্ড বিশ্বাসে ইস্কুলেও বজায় রেখেছিলেন। দুখানা থান ইঁট হাতে করিয়ে ঠাটা-পড়া রোদ্দুরে সাত-আট বছরের ছেলেদের দিয়ে সূর্য-সাধনা করানো, গাধার টুপি মাথায় চড়িয়ে একপায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা, পরস্পরের কান ধরিয়ে শোভাযাত্রা করানো, দু'আঙুলের ফাঁকে পেন্‌সিল পুরে দিয়ে চাপ দেওয়া, বিছুটির চাবুক মারা, হাফডাউন করানো এবং তৈলপক্ক জোড়া বেতের ঘায়ে হাত ফাটিয়ে একে-বারে রক্তারক্তি করে দেওয়া—এ তাঁদের নিত্য কর্মপদ্ধতি ছিল।

রঞ্জুর মনে আছে কতগুলি বাঁধা-ধরা ছেলের বরাতেই এ শাস্তিগুলো বিশেষভাবে মুলতুবী ছিল। তাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই ময়লা ছেঁড়া কাপড়, ঘোলা ঘষা কাচের মতো চোখ, রুক্ষ লালচে ধুলোভরা চুল, ছেঁড়া বই আর ছেঁড়া খাতা তাদের সম্বল। তারা পড়া পারত না, বছর বছর একই ক্লাসে তারা ফেল করত, তারপর একদিন মা সরস্বতীর গঙ্গাজলি করে কেউ বা গঞ্জের হাটে বসত তামাক কিংবা মরিচ নিয়ে, কেউ বা সোজাসুজি ক্ষেতে নামত হালবলদ নিয়ে চাষ-বাস করতে। তারা গরীবের ছেলে, চাষার ছেলে।

তারা পড়া পারত না। আজ রঞ্জু জানে, কেন তারা পড়তে পারত না, কেন বছর বছর একই ক্লাসে ফেল করে বসত অমন ভাবে। যখন পেটের ভাত যোগাড় করবার জন্যে তাদের ক্ষেতে ক্ষেতে তামাক আর মরিচ তুলতে হত, কিংবা চাষী বাপের নাস্তা দিয়ে আসবার জন্যে ছুটতে হত মাঠে—তখন পড়াশুনোর বিলাসিতাকে তার চাইতে বেশি প্রয়োজন বলে তারা মনে করতে পারত না। তবুও গরীব বাপ আধপেটা খেয়ে, চেয়ে-চিন্তে তাদের ইস্কুলের মাইনে যুগিয়ে যেতো বছরের পর বছর। লেখাপড়া শিখবে ছেলে, মানুষ হবে, হাকিম অথবা দারোগা হবে, নিবারণ করবে গরীব বাপমায়ের পেটের জ্বালা।

কিন্তু আকাশ-স্বপ্ন চিরকাল আকাশেই থাকে, মাটিতে নেমে আসে না কথনো। তাদের ক্ষেত্রেও এই চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি কোনোদিন।

আর, ছেলেগুলো ঠ্যাঙানি খেত। শুধু ঠ্যাঙানি নয়, যাকে গো-বেড়েন বলে, তাই ছিল তাদের দৈনন্দিন প্রাপ্তি। এখন রঞ্জু বুঝতে পারে কী কারণে ইস্কুলের মাস্টারেরা তাকে এত সমাদর করতেন, হেডমাস্টার আদর করে ডেকে নিয়ে গিযে বলতেন প্রাইজের বই বেছে নিতে। আর ধেড়ে ছেলে অশ্বিনী হাজার অপরাধ করলেও কেন দু'চারটে কানমলার ওপর দিয়েই সমস্ত অপবাধ থেকে নিষ্কৃতি পেতো।

দুর্ভাগাদেব মধ্যে যে সব চেয়ে দুর্ভাগা ছিল তার নাম নিশিকান্ত। অদ্ভুত রকমের নির্বোধ ছিল নিশিকান্তের চেহারা। গোরুর মতো বড় বড় চোখ দুটোয় না ছিল ভাষা, না ছিল সুখ-দুঃখ বোধেব বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত। পড়া জিজ্ঞাসা করলে অনিচ্ছুক ভাবে উঠে দাঁড়াত, মনে হত শবীব নয়, যেন গুরুভার একটা কিছুকে সে ওপবে টেনে তুলছে। তাব-পব স্থির, নিরাসক্ত ভাবে দাঁড়িযে থাকত।

পডাব জবাব? হ্যাঁ—জবাব একটা দিতো নিশ্চয়ই। কিন্তু সে জবাব কেউ শুনতে পেতো না। মনে হত যেন বিডবিড করে সাপেব মন্ত্র পডছে—ঠোঁট দুটো অল্প নড়তে থাকত সেই ভাবে। আর হালটানা বলদের মতো বড বড শান্ত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত—দৃষ্টিতে পলক পডত না, যেন সমাধিস্থ হয়ে গেছে, তার দৃষ্টি বাইবেব জগৎ ছাডিযে অন্তবেব গভীবে কী একটা পরমার্থের সন্ধান করে ফিরছে যেন।

তারপরেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। গাধার টুপি, নীলডাউন, বেত, বিছুটি, কান-মলা। একটু প্রতিবাদ কবত না নিশিকান্ত, কেঁদে ককিয়ে উঠত না, সমাধিস্থ যোগী ঋষির মতো হজম কবে যেত নির্বিকল্প মুখে। মার খাওয়া তার প্রতিদিনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই সহজ হয়ে গিয়েছিল।

আর রাগটা ছিল ধনঞ্জয় পণ্ডিতেরই সব চাইতে বেশি।

কোলকুঁজো তামাটে রঙের লোক—প্রকাণ্ড একখানা মুখ থেকে শূয়োরেব দাঁতের মতো পানে-রঙানো দুটো গজদন্ত বেরিয়ে থাকত। কপালে বিরাজ করত চন্দনের ফোঁটা, টিকিতে বিজয়-পতাকার মতো শোভা পেতো টকটকে রাঙা একটা জবাফুল। একটা মোটা তেল-চিটচিটে ছালটি কাপড আব ময়লা নিমা গায়ে চডিয়ে খডম পায়ে তিনি ইস্কুলে আসতেন, বারান্দায় তাঁব খডমের শব্দ ক্লাসে যেন মৃত্যুদূতের পরোয়ানা বহন করে আনত।

পডাতেন ব্যাকরণ, কিন্তু তদ্ধিত-প্রকরণের চাইতে প্রহার-প্রকরণেই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যটা ছিল বেশি। তিনি বিশ্বাস করতেন শুধু পেটালেই গাধাকে ঘোড়া তৈরী করা যায়, পড়ানোটা অবান্তর। এ হেন সর্বংসহ নিশিকান্তও ধনঞ্জয় পণ্ডিতের ক্লাসে স্পষ্ট অস্বস্তি বোধ করত একটা।

মুখ ভেংচে ধনঞ্জয় বলতেন, বাছার আমার নাম কী? না—নিশিকান্ত, একেবারে প্রাণকান্ত!

রসিকতার তাৎপর্যটা ছেলেরা ধরতে পারত না, নিশিকান্ত তো নয়ই। পণ্ডিতের পণ্ডিতী-রসবোধ আরো উগ্র হয়ে উঠত, গজদন্ত দুটোকে মাড়ি অবধি উদ্ঘাটিত করে দিয়ে ধনঞ্জয় বিকট বীভৎস মুখে ছড়া কাটতেন :

নিশিকান্ত, প্রাণকান্ত,
পরাণ আমার করহ শান্ত! নামের তো বাহার আছে দুরন্ত,
কিন্তু পড়া জিজ্ঞেস করলেই বেরিয়ে যায় আক্কেলদন্ত!
আর আমি ভাবছি, কবে তোমায় নেবে কৃতান্ত!

ধনঞ্জয় পণ্ডিত নাকি জারিগানের ছড়া রচনা করতেন।

কিন্তু এমন অনুপ্রাস-সমৃদ্ধ কাব্যচর্চাও যখন অরসিকদের কাছে মাঠে মারা পড়ত, তখন একেবারে ক্ষেপে যেতেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত। বলতেন, বল্ হারামজাদা, বল্ নিশিকান্ত মানে কী?

একমণী পাথরের মতো শরীরটাকে টেনে তুলে নির্ভুল নিয়মে দাঁড়িয়ে যেতো নিশিকান্ত। তারপরে তেমনি চিরাচরিত মন্ত্রপাঠ, আর চিরন্তন নির্বিকল্প সমাধির ব্যাপার।

—ওরে ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দসিকে। নিস্-শি-খান্ত!—ধনঞ্জয় পণ্ডিতের গজদন্ত দুটো যেন কামড়াবার জন্যে তেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইত : কান্ত না তোর বাপ-বাপান্ত! ওরে হারামজাদা, তুই নিশিকান্ত নোস্, একেবারে নিশি, বুঝলি অমাবস্যার নিশি!

নিশিকান্ত মন্ত্রপাঠ করে যেত। যেন এ কথাটাতেও তার কিছু বক্তব্য আছে এবং স্মৃতির অতল সাগর মন্থন করে সেই বক্তব্যটাকে সে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে।

এইবার প্রহারের জন্যে তৈরি হতেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত। হাতের মধ্যে আঁকড়ে ধরতেন তেল-পাকানো বাদামী রঙের লিক্‌লিকে বেতজোড়া। তারপর মেঘমন্দ্র স্বরে বলতেন, হুঁ। বল্, পীতাম্বর কোন্ সমাস?

যথাপূর্বং যথাপরম্। বজ্রগর্ভ মেঘের মতন ধনঞ্জয় পণ্ডিত আধভাঙা চেয়ারটাকে ঠেলে উঠে দাঁড়াতেন। টিকিতে জবাফুলটা দুলে উঠত, দুটো ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে দেখা দিত অমানুষিক হিংসা। গজদন্তে আর ঠোঁটের পাশে পানের রঙ যেন রক্ত বলে সন্দেহ হত।

তারপর প্রহার। সাঁই সাঁই করে বেতের শব্দ উঠত, নিশিকান্তের হাতে পিঠে ঘাড়ে নির্মমভাবে বেত পড়ত। উন্মাদের মতো মারতেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত—মনে হত সম্ভব হলে একদিন নিশিকান্তকে তিনি খুন করে ফেলবেন। রঞ্জু কখনো কাউকে নরহত্যা করতে দেখেনি, কিন্তু নরঘাতকের মুখের ভঙ্গিও যে ধনঞ্জয়ের চাইতে বীভৎস হয়ে ওঠে না, এ কথা সে নিশ্চিতভাবেই বলতে পারে।

কেন অমন করে মারতেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত? আজকে তার উত্তর পাওয়া কঠিন নয়। জীবনের যা কিছু বঞ্চনার বিরুদ্ধে, সমাজের কাছে, মানুষের কাছে, আর হয়তো ঈশ্বরের কাছেও এ ধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রতিবাদ। প্রতিকারবিহীন নিরুপায়তায় আরো বেশি নিরুপায়ের ওপরে প্রতিশোধ নেওয়া—দুঃখ-দুর্গত জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের অপরাধ ছিল না। আর তারই পরিচয় পেয়েছিল রঞ্জু—দু'বছর বাদে তাঁর মৃত্যুর পরে, যখন তাঁর স্ত্রী মহাজন যজ্ঞনাথ কুণ্ডুর বাড়িতে রাঁধুনীর চাকরি নিয়েছিলেন!

নিশিকান্তকে মারতে মারতে শেষে ধনঞ্জয় ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। খোলা কাছাটা গুঁজতে গুঁজতে আবার ফিরে আসতেন তাঁর তেপায়া চেয়ারটায়, হাঁপাতে হাঁপাতে বলতেন, তোকে মারা যা—একটা গোরুকে ঠ্যাঙানোও তাই। কোনো লাভ হবে না, অকারণ খানিকটা পরিশ্রম মাত্র।

সার সত্যটা বুঝেছিলেন ধনঞ্জয়—কিন্তু মনে রাখতে পারতেন না।

নির্বোধ, নির্বিকল্প নিশিকান্ত। কিন্তু তারও সহের সীমা ছাড়িয়ে গেল একদিন। পাথরের ভেতর থেকে একটুখানি ফুল্‌কি ছিটকে বেরুল অকস্মাৎ। অগ্নিকাণ্ড ঘটল না—পাথরই গুঁড়ো হয়ে গেল।

পাড়াগাঁয়ের এম-ই ইস্কুল। দরজা-জানালাগুলোর কব্জা-ভাঙা পাল্লা আছে বটে, কিন্তু প্রতিরোধের শক্তি নেই তাদের। একটু জোরে বাতাস বইলে পাল্লা খুলে যায়—ছাগল ঢুকে রাত্রিবাস করে, গোরু এসে রোমন্থন করে যায়। গোরুর মতো বুদ্ধি নিশিকান্তের, গোরুর পথই সে নিলে।

পরদিন ইস্কুলে একেবারে হুলস্থূল কাণ্ড!

দেওয়ালে দেওয়ালে চক-খড়ি দিয়ে কাঁচা কাঁচা অক্ষরে শিলালিপি: 'পণ্ডিতকে মারিব', 'পণ্ডিত আমার শা—', 'পণ্ডিত মরিলে হরির লুট দিব'—ইত্যাদি। সমস্ত ইস্কুল একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

'নিখিলিস্ট'দের বোমার মতো ফেটে পড়লেন হেড্‌মাস্টার বিপিনবিহারী সাহা। সন্দেহজনক ছেলেদের ধরে ধরে বোর্ডে কথাগুলো লেখানো হতে লাগল। এবং হস্তলিপি পরীক্ষার ফলাফলও আশাতীত কিছু হল না, ধনঞ্জয় পণ্ডিত ক্ষ্যাপা শুয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে রায় দিলেন: এ ওই হারামজাদা নিশিকান্তের কাজ!

অনেকটা তাঁর কথাতেই কিনা কে জানে, শেষকালে নিশিকান্তই অপরাধী সাব্যস্ত হল।

তারপরের দৃশ্যটা ছবির মতো ভাসছে চোখের সম্মুখে। অপরাধের গুরুত্ব এত বেশি যে শুধু বেত্রাঘাতই যথেষ্ট বলে মনে হল না—হেড্‌মাস্টার বিপিনবিহারী সাহার কাছে।

জোড়া বেতে আপাদমস্তক জর্জরিত করে ইস্কুলের মাঠে গাধার টুপি মাথায় পরিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল নিশিকান্তকে। তারপর ধনঞ্জয় পণ্ডিতনিজেই গিয়ে ইস্কুলের সমস্ত ছেলেকে ডেকে আনলেন।

লাইন করে খাড়া করিয়ে দেওয়া হল ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত সমস্ত ছেলেকে। হেড্‌মাস্টার জলদ-গম্ভীর স্বরে বললেন, এক-একজন করে এগিয়ে যাও, তারপর দু'হাতে আচ্ছা করে ওর কান মলে দাও। খুব জোরে, কেউ কোনো মায়া করবে না। এই হল ওর উচিত শাস্তি।

ছেলেদের আনন্দের সীমা নেই। পরমানন্দে এক-একজন গিয়ে নিশিকান্তের কান মলতে লাগল। পাথরের মতো দাড়িয়ে রইল নিশিকান্ত—একটু নড়লে না, এক বিন্দু প্রতিবাদ করলে না। মুখের একটি রেখা পর্যন্ত কাঁপল না তার, মাটির দিকে দৃষ্টি নামিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে। লজ্জা, অপমান, বেদনাবোধ—সমস্ত কিছুই তার কাছে শূন্য-আর অর্থহীন হয়ে গেছে।

বঞ্জুর পালা এল। উল্লাসে এগিয়ে গেল বঞ্জু। লম্বায় অনেকটা উঁচু নিশিকান্ত, তার কান দুটোকে পাওয়ার জন্যে ওপরের দিকে হাত তুলে দাঁড়াতে হল তাকে।

আর ঠিক তখনই তার দৃষ্টি পড়ল নিশিকান্তের চোখের দিকে।

আশ্চর্য সেই চোখ। মানুষের চোখে এমন করে যে ভাষা ফুটতে পারে, এমন করে জেগে উঠতে পারে অপমানিত মনুষ্যত্বের মর্মান্তিক লাঞ্ছনাবোধ—এ সত্য বোধ হয় অর্থহীন একটা অস্বস্তির মতো বঞ্জুর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল সেই প্রথম। নিশিকান্তের চোখ দুটো শুকনো, তাতে এক বিন্দু অশ্রুর আভাস পর্যন্ত নেই। সে চোখ টকটকে লাল, যেন শরীরের সমস্ত রক্ত ওর চোখে গিয়ে জমা হয়েছে। সে চোখ অস্বাভাবিক—সে চোখ মানুষের নয়।

আলগা ভাবে নিশিকান্তের কানে হাত ছোঁয়াতেই বঞ্জু শিউরে উঠল, একটা অসহ্য উত্তাপে যেন আঙুলগুলো জ্বালা করে উঠল তার। নিশিকান্তের কান দিয়ে আগুন ছুটছে। ওর শরীরটা আর শরীর নয়—একটা মশালের মতো জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে অতি তীব্র, অতি প্রখর অগ্নিশিখার মতো।

সরে গেল বঞ্জু, পালিয়ে এল সেখান থেকে।

ইস্কুলের ছুটি হয়ে গেল—মস্ত বড় মাঠটার ভেতর দিয়ে একা বাড়ি ফিরছিল সে। ফসল কাটা শেষ হয়ে গেছে, ছোট আলপথের পাশে পাশে কাটা ধানের গোড়াগুলো ছড়িয়ে আছে, ছুটোছুটি করে ফিরছে মেঠো ইঁদুর, বসে বসে জাবর কাটছে গোটাতিনেক গোরু—আর একদল গো-বক ওদের গায়ে উঠে ঠুকরে ঠুকরে এঁটুলি খাচ্ছে। বকারি পাখির ঝাঁক উড়ে পড়ছে এদিকে ওদিকে, একটা বাবলা গাছে বসে লেজ নাচাচ্ছে হলদে পাখি।

কোনোদিকে মন নেই রঞ্জুর, দৃষ্টি নেই কোনোদিকে। ইঁদুরগুলোকে তাড়া দিতে ইচ্ছে করল না, ঢিল মেরে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করল না গো-বকগুলোকে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিহ্বল চোখ মেলে দেখতে ভালো লাগল না ওই বকারির ঝাঁক আর হলদে পাখির নাচকে। রঞ্জু অন্যমনস্ক হয়ে গেছে।

কেন অমন করে তাকিয়েছিল নিশিকান্ত? কেন তার চোখ দুটো অমন রক্তের মতো রাঙা হয়ে উঠেছিল? দিনের পর দিন যে নিশিকান্ত ক্লাসে পড়া বলতে পারে না, দাঁড়িয়ে থাকে নির্বোধ একটা অসহায় জানোয়ারের মতো, আর মার খায়—তার ঘোলা চোখ কেন অমন করে রক্তাক্ত হয়ে উঠল?

মনের কাছে অস্পষ্টভাবে উত্তর এল তার। প্রথম শৈশবের অনুভূতিরাজ্যে—প্রথম দেশাত্মবোধ, প্রথম প্রেম, প্রথম মৃত্যুচেতনার সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন চৈতন্য অঙ্কুরিত হল। এ অপমান—মানুষের অপমানের প্রথম উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। অভাব আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে যারা প্রত্যেক দিন পৃথিবীতে হার মেনে যাচ্ছে, তাদের সেই পরাজয়কে নিষ্ঠুর নির্মম অপমান। নিশিকান্ত একক নয়, বিচ্ছিন্ন নয় নিশিকান্ত। তার চোখে আরো অনেকের কথা—আরো অনেক পরাজিত মানুষের অসহায় অপমানের একটা রক্তাক্ত প্রতিবাদ।

সেই প্রথম বুঝতে পেরেছিল রঞ্জু, তারপর আরো বড় হয়ে সম্পূর্ণ করে বুঝতে পেরেছিল—নিশিকান্তের কান থেকে আগ্নেয় জ্বালাটার মর্মনিহিত তাৎপর্য। শুধু কান নয় —নিশিকান্তদের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছে অগ্নিশিখায়, চারদিকের কোটি কোটি মানুষ আজ আর মানুষ নেই—তারা অগ্নিপুত্তলি। সেই অগ্নিপুত্তলিকার দল অপেক্ষা করে আছে, প্রতীক্ষা করে আছে—একদিন সমস্ত পৃথিবীতে তারা আগুন জ্বালিয়ে দেবে। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে সমস্ত—কেউ বাঁচবে না, কিছুই না।···

তার পরদিন থেকে আর ইস্কুলে এল না নিশিকান্ত। তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, রাস্টিকেট করা হয়েছে তাকে। কেউ তার জন্যে ক্ষুণ্ণ হল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে না কেউ। অমন প্রচণ্ড শয়তান ছেলেকে যে বস্তায় পুরে পাথর বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়নি, এই ওর সাতপুরুষের ভাগ্য। বহুব্রীহি সমাস পড়াতে পড়াতে আর কেরোসিন কাঠের টেবিলে জোড়া বেত আছড়াতে আছড়াতে ধনঞ্জয় পণ্ডিত বললেন, আইনে না আটকালে তাই করা হত।

এর কিছুদিন পরের কথা।

ঠিক কতদিন—রঞ্জুর ভালো মনে পড়ে না। সন-তারিখের পাট নেই স্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে। তার সব কিছু এলোমেলো, পরেরটা আগে, আগেরটা পরে এসে পড়ে। কিন্তু সময়টা মনে না থাকলেও ঘটনাকে ভোলবার উপায় নেই।

সকালে পড়াতে এসেছেন নবদ্বীপ মাস্টার, একটা গুণ অঙ্ক নিয়ে রঞ্জু হিমসিম খাচ্ছে। এমন সময় থানা থেকে কনেস্টবল প্রিয়নাথ এল। বললে, ছোটদাদা, বড়বাবু তোমায় ডাকছেন।

—বাবা?

—হ্যাঁ—এক্ষুনি একবার থানায় আসতে বললেন।

ভয়ে গলা শুকিয়ে উঠল। বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন। তার মানে, যমরাজের পরোয়ানা। তবে ভরসা এই, থানায় যখন ডেকে পাঠিয়েছেন তখন আর যাই হোক, শাসন-সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার নয়।

—কেন?

—একটা খুব মজা হয়েছে। দেখবে এসো—

এবার রঞ্জু উল্লাসে লাফিয়ে উঠল : যাই মাস্টারমশাই?

—যাবে বই কি, নিশ্চয় যাবে। বড়বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, এর মধ্যে আবার বলবার কী আছে?—বিগলিত বাধিত হাসিতে নবদ্বীপ মাস্টার বললেন, এক্ষুনি যাও—

প্রিয়নাথের সঙ্গে রওনা হল থানার দিকে। আগ্রহভরে প্রশ্ন করলে : কী হয়েছে থানাতে? কিসের মজা প্রিয়নাথদাদা?

প্রিয়নাথ বললে, চলোই না, নিজেই দেখবে এখন।

থানার সামনে ভয়ানক ভিড়। বহু লোক জমেছে, চেঁচামেচি হচ্ছে। নিশ্চয় গুরুতর কাণ্ড কিছু ঘটেছে ওখানে।

বাবা ডাকলেন, রঞ্জু দেখবে এসো। তোমাদের বন্ধু নিশিকান্তের কীর্তি।

কীর্তি করেছে বটে নিশিকান্ত। সেদিন চোখে যে রঙ দেখেছিল, তার চাইতে অনেক ভয়ঙ্কর, অনেক বীভৎস তাব আজকের চোখ। আজ রক্ত শুধু তার চোখে ছড়িয়ে নেই—ছড়িয়ে গেছে সর্বাঙ্গে, হাতে রক্ত, কাপড়ে রক্ত, জামায় চাপ চাপ রক্ত। নিশিকান্ত যেন মেখে এসেছে ফাগুয়ার রঙ।

বাবা বললেন, জমিতে ধান কাটা নিয়ে খুড়োর গলায় দায়ের কোপ বসিয়েছে—

বাকী কথাগুলো রঞ্জুর কানে গেল না। অত রক্ত—অমন অজস্র রক্ত! নিশিকান্তের চোখ দুটো ছিঁড়ে যেন রক্তের ধারা নেমে আসবার উপক্রম করেছে। রঞ্জুর মাথার মধ্যে সব এলোমেলো হয়ে গেল, কান ঝিঁ ঝিঁ করতে লাগল, মনে হল গলার ভেতর থেকে বমির মতো কী একটা ঠেলে উঠছে। দম আটকে আসছে তার, মাথা ঘুরছে। দৃষ্টির সামনে শুধু রক্ত দুলছে, রাশি রাশি রক্ত, চাপ চাপ রক্ত—পৃথিবীময় রক্ত, দুটো জ্বলন্ত চোখে রক্তের আগুন—

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন : প্রিয়নাথ, ওকে বাইরে নিয়ে যাও, এখুনি বাইরে নিয়ে যাও।

আমারই ভুল হয়েছিল—এত রক্ত ও সইতে পারবে কেন ?

খুড়োর গলায় দায়ের কোপ বসিয়েছে নিশিকান্ত, হয়তো খুন করেছে তাকে। সেই নিশিকান্ত—যে হাজার বেত খেয়েও এখনও টুঁ শব্দ করেনি—দেড়শো ছেলের হাতে কানমলা খাওয়ার মতো অপমানও যে নির্বিবাদে সহ্য করে যেতে পেরেছে, এমন ক্ষিপ্ত, এমন ভয়ঙ্কর সে হয়ে উঠল কেমন করে ?

রঞ্জুর মন বলে, মানুষের ঘৃণা আর অসহ্য অপমানই সেদিন মানুষকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছিল তাকে, শিখিয়েছিল মানুষকে আঘাত করবার হিংসামন্ত্র। কিন্তু আঘাত করা আর আত্মহত্যা করা, এ দুটোর পার্থক্য তার কাছে স্পষ্ট ছিল না বলেই বোধ হয় শেষেরটা বেছে নিয়েছিল নিশিকান্ত।

রক্ত—রক্ত—সমস্ত পৃথিবীময় চাপ চাপ রক্ত। কিন্তু শত্রুহত্যার রক্তে নয়।—আত্ম-হত্যা খুন-খারাপী রঙেই রক্তাক্ত হয়ে গেছে পৃথিবীর ধূলোমাটি।

ছয়

নাজীপুর থানা থেকে রঞ্জুর বাবা বদলি হলেন।

চাকরিতে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। মফঃস্বলের একটি ছোট থানা থেকে একেবারে সদরের অফিসার-ইন-চার্জ হলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল বাঁধাছাঁদার পালা। নীলাঞ্চলা আত্রাই, ফুলে ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়ার গাছটা, স্কন্ধকাটার হাইতোলা, মজে-আসা আলেয়াদীঘি, রবিশস্যে ভরা ইস্কুলে যাওয়ার মাঠটা, মশানীর মন্দির, কবিরাজের বড় আমবাগানটা আর অবিনাশবাবুর ভাঙা আশ্রম, বাদল, অশ্বিনী, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, উষা, নিশিকান্ত আর অবিনাশবাবুর ওপর দিয়ে চিরদিনের মতো যবনিকা নেমে এল।

ছেড়ে আসতে খুব কি দুঃখ হয়েছিল রঞ্জুর ? না। এই ছোট গ্রাম, এই থানা, এই গঞ্জ। এর বাইরে আর একটা বিশাল, এত বিশাল, যে রঞ্জু কল্পনাও করতে পারে না—একটা দেশ আছে। তার উত্তর-পূর্বে কারাকোরাম, হিন্দুকুশ, হিমালয় আর খাসিয়া জয়ন্তীয়ার অলঙ্ঘ্য বিস্তার, তার দক্ষিণে গাঢ় নীল ঢেউ নিয়ে নেচে নেচে খেলা করছে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর। কলকাতা, কাশী, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ। সে এক আশ্চর্য দেশ, সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। মানচিত্রের ওপরে নানা রঙের ছাপ আর নানা বিচিত্র নামের ভেতরে রঞ্জু তাদের নাজীপুরের নাম কোথাও খুঁজে পায়নি। এই বিপুল দেশের কাছে তাদের নাজীপুর কত ছোট, কত নগণ্য !

মনে আছে রঞ্জুও এই ভারতবর্ষের ডাক শুনতে পেয়েছিল। ক্লাসে ভূগোল পড়ার সময় তাই সে কতবার অন্যমনস্ক হয়ে গেছে, কতবার ম্যাপের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেয়েছে,

দেখতে চেয়েছে আকুল আগ্রহে। হিমালয়, হিন্দুকুশ, কারাকোরাম, আরব সাগর আর বঙ্গোপসাগর। এতদিনে যেন সেই বহুবাঞ্ছিত যাত্রা শুরু হল তার। ধুলো-ভরা যে মেটে পথটা উঁচু উঁচু তালগাছের হাতছানিতে তার মনটাকে বারে বারে নিয়ে গেছে সেই সব দেশে, একদিন সন্ধ্যাবেলা গোরুর গাড়িতে করে সেই পথ দিয়ে রঞ্জু বেরিয়ে পড়ল মানচিত্রের রেখা-জটিল পথে—সরীসৃপ রহস্যময়তায়।

গোরুর গাড়ির পেছনে ছইয়ের ভেতরকার ছোট কাটা জানালাটা দিয়ে সে দেখছিল ঘুম-ঘুম বিহ্বল চোখ মেলে। দেখছিল একটু একটু করে কেমন ভাবে নাজীপুরের দুটো-চারটে মিটমিটে আলো ক্রমশ পেছনে সরে যাচ্ছে। শুধু অন্ধকারে কবিরাজের আম-বাগানটাকে আবছা আবছা বোঝা যাচ্ছে এখনো, যেন শেষবারের মতো মাথা নেড়ে নেড়ে কারা কী একটা কথা বলতে চাইছে রঞ্জুকে। গা ছম ছম করে উঠল, ভয় করতে লাগল তার। মুহূর্তে সে ছইয়ের ভেতরে মাথাটা টেনে নিলে, তার পর মার কোলে মুখ বুজে শুয়ে পড়ল। আর অনুভব করতে লাগল অসমতল এলোমেলো রাস্তায় গাড়িটা কেমন মাতালের মতো টলতে টলতে অন্ধকার আর অনির্দেশ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছে।

অন্ধকার আর অনির্দেশ পৃথিবী। কন্যাকুমারী থেকে হিমালয়ের তুষারতীর্থের পথে।

শহর। যেখানে ঘোড়ার গাড়ি আছে, মোটর আছে, রেলের ইস্টিশন আছে। যেখানে দোতলা-তেতলা মস্ত মস্ত দালান, যেখানে পাথর দিয়ে রাস্তা বাঁধানো, যেখানে রাস্তার পাশে পাশে রাত্তিরে আলো জেলে দিয়ে যায়। যেখানে সাবধানে চোখ চেয়ে পথ না চললে তুমি গাড়ি-চাপা পড়তে পারো, অন্য মানুষের সঙ্গে তোমার গায়ে ধাক্কা লাগতে পারে। রঞ্জুর জীবনে সেই প্রথম শহর। নাম—ধরা যাক মুকুন্দপুর।

নিতান্তই মফঃস্বল শহর। শ্রী নেই রূপ নেই, স্বাস্থ্য তো নেইই। বর্তমানের চাইতে অতীতের জীর্ণ একটি সোঁদা গন্ধই যেন চারদিকে পাক খেয়ে বেড়ায়। ধুলো আর অপরিচ্ছন্নতা। কাঁচা ড্রেনে দুর্গন্ধ সবুজ কাদা। পচা পুকুর আর জংলা আমের বাগান। পাড়াগুলো অনাবশ্যক ভাবে দূরবিচ্ছিন্ন আর বিশ্লিষ্ট—যেন একটা দেহকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে খামখেয়ালের বশে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে এদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু রঞ্জুর কাছে সেই প্রথম শহর। এর জীর্ণ নিরানন্দ রূপ প্রথম দৃষ্টিতেই যেন তাকে জয় করে নিলে। নাজীপুরের তুলনায় কত বিরাট, কত বিচিত্র! তার মুকুন্দপুরের চাইতে বহু দূরের শহর কলকাতা অনেক বড়, অনেক আশ্চর্য—এ কথা তার বিশ্বাস হত না, এ কথা ভাবতেও তার কষ্ট হত।

শহরের সঙ্গে পরিচয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠতে না উঠতে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। একটা বিপ্লব দেখা দিলে সংসারে। এতদিনের নিশ্চিন্ত সহজ জীবনে জটিলতার গ্রন্থি-বন্ধন অনুভব করলে রঞ্জু।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় থানা থেকে বাবা যখন কোয়ার্টারে ফিরলেন তখন তাঁর সমস্ত মুখ যেন একটা মুখোশ-টানা। শুভ্র বিস্তীর্ণ ললাটে কতকগুলো কালো কালো রেখা ফুটে উঠেছে, একদিনেব মধ্যে যেন কুড়ি বছর বয়েস বেড়ে গেছে বাবার। সেদিন বাড়ির ছোট বোনগুলো পর্যন্ত চেঁচিয়ে কাঁদতে সাহস পেল না, আস্তাবল থেকে ঘোড়াব সহিসটার সিদ্ধি খাওয়া গলায় রামায়ণের স্তব শোনা গেল না, বড়দার ঘরে সন্ধ্যেবেলায় নিয়মিত গানের মজলিশ বসল না, ঠাকুরমা গলা খুলে চেঁচিয়ে উঠলেন না একবারও। একটা অশুভ আর অনিশ্চিত আশঙ্কায় সমস্ত বাড়িটা ডুবে রইল স্তব্ধতার মধ্যে।

কয়েকটা মাসের ভেতরেই যেন অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সূর্য-পরিক্রমা করল পৃথিবীটা। সেই সব দিনগুলো ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মতো (বঙ্কু তখনো সিনেমা দেখেনি) পর পর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অপসারিত হয়ে গেছে, একটার পর আর একটা জড়ানো—সবগুলো মিলে এইটে মনে পড়ে—বাবার চাকরি গেল।

আঠারো বছর সুখ্যাতি আর সুনামের সঙ্গে কাজ করে তাঁর চাকরি গেল। যতদূর মনে আছে এস পির সঙ্গে কী একটা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল। বাঙালী পুলিস সাহেবের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগল এবং তার ফলে যা হওয়ার তাই হয়ে গেল।

লজ্জায়, অপমানে এবং অবিচারের ক্ষোভে বাড়িতে মৃত্যুশোকের ছায়া নেমে এল। কোয়ার্টার-ছেড়ে দিতে হল, বন্দুক বিভলবার রইল না, বিক্রি করে দিতে হল ঘোড়াটাও। তারপর আশ্রয় নিতে হল শহরের প্রান্তে একটা ভাঙা বাড়িতে।

মা বললেন, এখানে থেকে কী হবে ? চলো, দেশে চলে যাই।

বাবা কঠিনভাবে বললেন, না।

—কিন্তু এখানে থাকা কত বড় অপমান সে কি বুঝতে পারছ না ?

বাবা বললেন, না। অপমান এতদিন ছিল, এবার সে অপমানের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি।

সেইদিন রাত্রে বঙ্কুর জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল একটা।

সন্ধ্যার পরেই বাড়ির যত বিলিতী কাপড়, পুলিসী ইউনিফর্মের অবশেষ, একগাদা টুপি, দু-তিনখানা রাজভক্তির সার্টিফিকেট স্তূপাকার করে উঠোনে জড়ো করা হল।

ঠাকুরমা আর্তনাদ করে উঠলেন : খোকা, এ তুই করছিস কী ? এত দামী দামী সব কাপড় জামা—

বাবার গলার স্বর পাথরের মত শক্ত শোনাল : তুমি চুপ করো মা।

—কিন্তু দু-তিনশো টাকার জিনিস-পত্তোর—

—অপমানের শেষ চিহ্নটুকুও রাখব না। অনেক আবর্জনা জমেছিল, আজ পুড়িয়ে পরিষ্কার করে দেব।

বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন ঠাকুরমা। তারপর জোরে শ্বাস টানতে টানতে উঠে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে। তাঁর আবার হাঁপানির টান উঠেছে। তবু সে অবস্থাতেও ঘরের ভেতর থেকে তাঁর একটা অব্যক্ত আর অস্পষ্ট কান্না-ভরা বিলাপ শোনা যেতে লাগল।

বাবা কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। নিজের হাতে আধটিন কেরোসিন এনে ঢেলে দিলেন কাপড়ের স্তূপের ওপর, জ্বেলে দিলেন দেশলাইয়ের কাঠি। আগুন নেচে উঠল।

অন্ধকার উঠোনটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অতি তীব্র খানিকটা আলোর দীপ্তিতে। উঠোনের বেঁটে পেয়ারা গাছটার মাথা ছাপিয়ে শিখাগুলোর সরীসৃপরেখা আকাশের দিকে প্রসারিত হয়ে গেল। কাপড়, আলপাকা, পট্টু, তুলো আর পোড়া কেরোসিনের দুর্গন্ধে বিস্বাদ হয়ে উঠল বাতাস। অনেক অপমান, অনেক পাপ—একসঙ্গে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হযে গেল।

বাবা স্থির হয়ে বসে রইলেন নিশ্চল একটা মূর্তির মতো। আগুনের একটা লাল আভা এক-একবার তাঁর মুখের ওপরে পড়ে সরে সরে যেতে লাগল, কেমন আশ্চর্য আর ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগল তাঁকে। আর মাঝে মাঝে তাঁর চোখ সম্মুখের ওই আগুনটার চাইতেও শাণিত হয়ে জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল। সেই চোখ, ঠিক সেই চোখ—যে চোখ সে দেখেছিল অবিনাশবাবুর—সেই তিরিশ সালের বন্যার সময়। রঞ্জুর কেমন ভয় ধরেছিল, কেমন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে যেন অকারণে মনে হয়েছিল, বাবা যেন আজ প্রকৃতিস্থ নেই। তাঁকে আজ ভূতে ধরেছে, একটা প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে। সে কি অবিনাশ-বাবুরই প্রেতাত্মা!

যতক্ষণ আগুনটা জ্বলল ততক্ষণ বাবা তেমনি নিশ্চল হয়ে বারান্দায় বসে রইলেন। তারপর একটা উত্তপ্ত অন্ধকারে উঠোনটা গেল আচ্ছন্ন হয়ে। রক্তাক্ত খানিক ক্ষতের মতো কিছুক্ষণ ধরে দপদপ করতে লাগল বিস্তীর্ণ অগ্নিশয্যা, বাত'সে পোড়া ছাইগুলো উড়তে লাগল এলোমেলো ভাবে।

সেই রাত্রেই বাবা ওদের তিন ভাইকে ডেকে পাঠালেন।

লণ্ঠনের আলোয় বাবার আর এক মূর্তি সেই যেন প্রথম চোখে পড়ল রঞ্জুর। মেজেতে একখানা হরিণের চামড়ার আসন পেতে তিনি বসেছেন। উজ্জ্বল গৌরাঙ্গে শুভ্র যজ্ঞোপবীত ধপধপ করছে, একটা অপূর্ব শুচিতায় প্রশস্ত কপাল জ্বলজ্বল করছে তাঁর। আঠারো বছরের গ্লানি থেকে সত্যিসত্যিই আজ মুক্তিস্নান হয়েছে। আঠারো বছর ধরে বাবার এই রূপ, এই ব্রাহ্মণোত্তম মূর্তি কোথায় লুকিয়ে ছিল?

সামনে বসে মা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব পড়ছিলেন। ছেলেদের পায়ের শব্দে বিষণ্ণ চোখ

তুলে তাকালেন। তারপর মহাভারত বন্ধ করে নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বাবা বললেন, বোসো তোমরা।

তিন ভাই এ ওর মুখের দিকে তাকালে সভয়ে। কেমন অভিভূত হয়ে গেছে তারা। ঘরে ধূপ জ্বলছে, কোথা থেকে চন্দনেব সুগন্ধ আসছে। যেন ঠাকুরঘরের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে একটা। তিন ভাই কুণ্ঠাভরে দাঁড়িযে রইল।

অন্যদিন হলে হয়তো বাবা একটা প্রচণ্ড ধমক দিতেন। কিন্তু ওই হরিণের চামড়ার আসন, ওই ধবধবে পৈতেটা, চন্দন আর ধূপেব গন্ধ—সব মিলিয়ে সব কিছুর একটা রূপান্তর হয়ে গেছে আজ। প্রশান্ত স্বরে বাবা আবার বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো সব ওখানে।

সসঙ্কোচে তিনজনে বসল। বসল মাটিতে চোখ নামিয়েই। বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মতো শিক্ষা অথবা সৎসাহস ওরা এ পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারেনি।

—তোমাদের একটা কথা বলবার জন্যে ডেকে আনিয়েছি।

তিনজোড়া কান উৎকর্ণ হযে রইল।

আস্তে আস্তে বাবা বললেন, আজ তোমাদের একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

তিনজোড়া চোখ একবারের জন্যে একটুখানি উঠেই আবার মাটির দিকে নেমে গেল। বিস্ময়ে ওদের মন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, একটা বিশ্রী অস্বস্তি ওদের পীডন করছে।

—প্রতিজ্ঞা করতে হবে জীবনে কখনো ইংরেজের চাকরি করবে না। আর মনে রাখতে হবে যাদের কাছে ন্যায় নেই, তাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না।

যন্ত্রচালিতের মতো তিন ভাই উচ্চারণ করলে, প্রতিজ্ঞা করলাম।

প্রতিজ্ঞা! রঞ্জু জানে, সবচেয়ে সার্থক প্রতিজ্ঞা, সবচেয়ে বড় সংকল্প সেদিন সে উচ্চারণ করেছিল। এর গুরুত্ব সেদিন সে বুঝতে পারেনি, সেদিন এর বিন্দুমাত্রও অনুমান করা সহজ ছিল না তার পক্ষে। কিন্তু প্রতিজ্ঞাটা ভুলতে পারেনি। ঠাকুরঘরে ঢুকে দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে যেমন মিথ্যা বলতে পারা যায় না, তেমনি ধূপ-চন্দনের গন্ধে ভরা শুচিতায় আবিষ্ট সেই ঘরটিতে, হরিণের চামডার আসনে বসে থাকা সেই জ্বলন্ত মূর্তিটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে যে সঙ্কল্প সে নিয়েছিল, তার অনিবার্য শাসনের লৌহ-তর্জনী প্রসারিত হয়ে রইল তার আগামী ভবিষ্যতের দিকে।

শিলালিপিতে আর একটি আঁচড পডল।

এইবারে সত্যিসত্যিই পৃথিবীর মাটিতে পা দিল রঞ্জু।

এতদিন একটা গণ্ডি ছিল তার—নিষেধের একটা বেড়া টানা ছিল চারদিকে। এই-বার খোলা পৃথিবী থেকে দমকা বাতাসের ঝাপটা এল একটা, সে বেড়ার আর চিহ্নমাত্র

রইল না। প্রকাণ্ড জগৎটাকে দেখতে চেয়েছিল রঞ্জু, তাই সে প্রকাণ্ড জগতের মানুষগুলো তার চারপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়াল।

স্রোতের মতো চলে গেছে সময়, দু বছর বয়েস বেড়েছে রঞ্জুর। নতুন পরিবেষ্টনীর সঙ্গে অভ্যস্ততা পুরোনো হতে হতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বাবা একটা জমিদারী কাছারিতে ম্যানেজার হয়ে বসেছেন—মধ্যবিত্ত জীবনের অপ্রাচুর্য এখন আর কষ্ট দেয় না। ভাতের সঙ্গে গাওয়া ঘি না হলেও এখন রঞ্জুর খাওয়া হয়, ক্ষীরের মতো দুধ না হলে এখন আর কান্না পায় না, মাসে মাসে নতুন জামা জুতো এল কিনা সে সম্পর্কে এখন আর সজাগ থাকবার দরকার আছে মনে হয় না। ছেঁড়া প্যাণ্ট, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো—পাড়ার মধ্যবিত্ত ছেলেদের সঙ্গে সে একেবারে মিশে গেছে।

পাড়ার নাম মনসাতলা। নামটা হওয়ার কারণ আছে একটা। এই পাড়ার চৌমাথায় তিনকোণা একটা দ্বীপের মতো একফালি জমি ছিল। কতদিন আছে কে জানে—কোনো এক পুণ্যবান ব্যক্তি এখানে বট-অশ্বত্থের বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই দুটি গাছ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে বড় হয়েছে, রচনা করেছে বিস্তীর্ণ একটা বিশাল ছায়াচ্ছন্নতা। এই জোড় গাছের তলায় প্রায় প্রতি বছর ঘটা করে মনসা পূজা করা হয়, বিষহরির গান হয়। তাই পাড়ার নাম হয়েছে মনসাতলা।

এই মনসাতলার শান্ত ছায়ার নিচে কী মনে করে মিউনিসিপ্যালিটি লম্বা একটা সিমেণ্টের বেঞ্চি তৈরি করে দিয়েছে। ফলে এটা হয়েছে সকাল দুপুর সন্ধ্যায় পাড়ার সকলের একটা চমৎকার আড্ডা দেবার জায়গা। কিন্তু দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই জায়গাটা ছেলেদের দখলে। বেঞ্চিটা যখন প্রথম তৈরি করা হয়, তখন কাঁচা সিমেণ্টের ওপর কোনো এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা (ছেলেরা তাঁর কাছে অসীম কৃতজ্ঞ) ষোলো ঘুঁটি বাঘবন্দীর গোটাকয়েক ছক তৈরি করে রেখেছিলেন। ছেলেরা মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা থেকে খোয়া কুড়িয়ে এনে সেখানে দলে দলে খেলতে বসে যায়, ছাগলের চক্রব্যূহে বাঘকে বন্দী করে ফেলে আনন্দে জয়ধ্বনি করে। বেঞ্চিটার নিচে সারি সারি ছোট ছোট গর্ত—বেশ যত্নসহকারে গর্তগুলোকে নিখুঁত গোলাকার করবার চেষ্টা হয়েছে। সকালে বিকালে এবং রবিবারের সমস্তটা দিন ধরে সেখানে মার্বেল খেলা চলে।

মার্বেল খেলার সে সব সাংকেতিক বাক্যগুলো আজও দুটো চারটে মনে পড়ে। ইংরেজি ভাষার অমন অপূর্ব সদ্ব্যবহার বোধ হয় আর কোনো ক্ষেত্রে কোনো দিন হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'সিংগিল্ মেলালিং'এও না।

"উড্ডু কিপ্"—(মার্বেল মাটি উঁচু করে বসিয়ে দাও।)

"হাত ইস্টেট"—(হাত উঁচু করে ইচ্ছেমতো মারো।)

"ঠ্যাকাউন্স্ বাই ফরটি ফিপ্‌টি হ্যাণ্ড"—(আটকে দিলেই মার্বেল চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত

দূরে ছুঁড়ে দেওয়া হবে।) এই বিচিত্র ধ্বনি-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উঠত মার্বেলের ঠকাঠক শব্দ। কে কতটা মার্বেল ফাটাতে পারত এই ছিল কৃতিত্বের সব চাইতে বড় পরীক্ষা।

সন্ধ্যার পরে যখন ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, বাঘবন্দীর 'কোট' আর মার্বেলের গর্ত ছেড়ে ছেলেদের বাড়ি ফিরে পড়তে বসতে হত, তখন এই মনসাতলায় এসে বসতেন পাড়ার অভিভাবকেরা। সাধারণ মফঃস্বল শহরের সাধারণ মধ্যবিত্তদের মতোই তাঁরা আদালত আর কাছারি নিয়ে আলোচনা করতেন, রাজনীতির শ্রাদ্ধ করতেন, সুযোগমতো ফিস্‌ফাস করে পরের হাঁড়ির খবরাখবর নিয়ে গবেষণা করতেন, মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের অবিবেচনা পর্যালোচনা করে আগামী নির্বাচনে সব ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করবার পরিকল্পনা নিতেন। আর মাঝে মাঝে মার্বেল খেলার গর্তে পা পড়ে কেউ কেউ যখন হোঁচট খেতেন তখন তাঁদের উত্তেজনা আরো বেশি বেড়ে উঠত। জাতির এই সব অপোগণ্ড বংশধরদের ভবিষ্যৎ দুর্গতি সম্বন্ধে তাঁরা দৈববাণী করতেন, এবং স্থির করতেন, পরের দিন মার্বেল খেলতে এলেই হতভাগাগুলোকে ঠেঙিয়ে হাড় ভেঙে দেবেন।

কিন্তু আগের রাত্রির কথা পরের দিন তাঁদের মনে থাকত না। আর বেলা সাড়ে আটটা না বাজতেই হৈ হৈ করে মার্বেল নিয়ে এসে পড়ত ছেলেদের দল।

এই দলের যে পাণ্ডা তার নাম ভোনা।

বেঁটে চেহারার ছেলে, শরীরের ওপরের দিকটার চাইতে নিচের দিকটা বেশি মোটা। পায়ের পাতা দুটো এত বেশি বড় যে সেই বারো-তেরো বছর বয়সেই ভোনা তার বাবার একটা পুরোনো ছেঁড়া চটি পরে আসত। খেলার সময় যখন দৌড়োত, তখন হাতীর চলার মতো শব্দ উঠত থপ থপ করে। গালের ডানদিক দিয়ে সব সময়ে বেরিয়ে থাকত জিভের ডগাটা—মনে হত সারাক্ষণ যেন কাউকে ভেংচে চলেছে সে।

আর মুখখানা! ওরকম পাকামিভরা মুখ হাজারে একটি মেলে কিনা সন্দেহ। নিচের ঠোঁটে কয়েকটা কালো কালো দাগ পড়েছিল তার—ছেলেরা বলত ভোনা লুকিয়ে বিড়ি টানে। আর হিন্দুস্থানীরা খৈনি খেয়ে যেমন করে থুথু ফেলে, তেমনি করে দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ্ পিচ্ করে থুথু ফেলত সে। অভ্যেসটা কোত্থেকে আয়ত্ত করেছিল সে-ই জানে।

মার্বেল খেলায় ভোনার হাত ছিল পরিষ্কার। দৈনিক অন্তত দুগণ্ডা করে সে মার্বেল জিতত, ষোলো ঘুঁটি বাঘবন্দী খেলায় তাকে কেউ এঁটে উঠতে পারত না। তাছাড়া অজস্র কথাবার্তা বলতে পারত চোখেমুখে, আর কোমর দুলিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে নেচে নেচে আলিবাবার গান গাইত:

"ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল
এত্ত বড়া উঠানমে এত্তা জঞ্জাল—"

বলা বাহুল্য, ছেলেদের মধ্যে নেতা হওয়ার পক্ষে এই গুণগুলোই যথেষ্ট। বাপের

জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে বাপের মতোই জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ভোনা। কিন্তু সে গুণাবলী ক্রমশ প্রকাশ্য।

রঞ্জুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা যেভাবে হওয়া উচিত সেইভাবেই হল। একটা প্রকাণ্ড লাট্টু নিয়ে বনবন করে ঘোরাচ্ছিল ভোনা, আর মাঝে মাঝে সেটাকে হাতের তেলোতে তুলে নিয়ে সকলকে গুণমুগ্ধ করে তুলছিল। তারপর হঠাৎ রঞ্জুর দিকে চোখ পড়তেই প্রশ্ন এল : এই গঙ্গাফড়িং, তোর নাম কি রে?

অপমানে কান লাল করে রঞ্জু ফিরে যাচ্ছিল, ভোনা এসে তার কাঁধে হাত রাখল।

—আরে চট্‌ছিস কেন? তোকে গঙ্গাফড়িং বললাম, তুই না হয় আমাকে ভোঁদড় বলবি। চটাচটির কী আছে ভাই? এই নে—কামরাঙা খাবি?

এরকম লোকের ওপরে রাগ করা শক্ত। রঞ্জু হেসে ফেলল।

—হাসি ফুটেছে? আঃ—বাঁচালি। কারো গোমড়া মুখ দেখলে বড্ড বিশ্রী লাগে আমার। নে—খা এই কামরাঙাটা। ভয় নেই, টক নয়, পিটার সাহেবের বাগান থেকে চুরি করা, একেবারে চিনির মতো মিষ্টি।

ভাব হয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় যেন বাধে রঞ্জুর। মনসাতলার অন্যান্য ছেলেদের মতো—ভোনাকে তার ভালো লাগে, এক ধরনের শ্রদ্ধাও আছে তার সর্বাঙ্গীণ দক্ষতার ওপরে। তবু কোথায় যেন মনের দিক থেকে মস্ত একটা বাধা আছে, ভোনাকে ঠিক গ্রহণ করতে পারে না সে।

বৈশাখের দুপুর। ইস্কুলে গরমের ছুটি—বাড়ি থেকে পালাবার সুযোগ এবং অবকাশের অভাব হয় না। আমবাগানে ছেলেদের আড্ডা জমেছিল।

একরাশ কাঁচা আম জড়ো করা হয়েছে। ছুরি দিয়ে কেটে লঙ্কার গুঁড়ো আর লবণের সাহায্যে সেগুলোর সদ্গতি চলছে। টকে আর আরামে এক ধরনের মুখভঙ্গি করে ভোনা বললে, এই খাঁদু, রায়বাড়ির বিমলি কি করছে জানিস?

খাঁদু ভোনার প্রধান সহচর। আগ্রহভরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কী করছে রে?

তারপর তেম্‌নি চোখ আর মুখের ভঙ্গি করে, জিভটাকে বিচিত্র ধরনে বের করে কতগুলো কথা বলে গেল ভোনা। সে কথাগুলো রঞ্জুর কাছে অপরিচিত, সে সব কথা মনে করতে গেলে আজও সর্বাঙ্গ যেন কুঁকড়ে ওঠে ; আর অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা ভাবে কী একটা ইঙ্গিত তার চেতনার ভেতরে নাড়া দিয়েছিল সেদিন। রঞ্জুর কান গরম হয়ে উঠেছিল, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছিল, হৃৎপিণ্ডটা যেন আচমকা ভয় পেয়ে ধক্‌ধক্ করে উঠেছিল বার কয়েক। তারপর রঞ্জু আর সেখানে বসতে পারেনি, সোজা একছুটে পালিয়ে এসেছিল বাড়িতে। বহুদিন পরে মনে হয়েছিল, আজ যেন আবার পেছনে পেছনে সেই হাড়গিলা পাখিটা কক্ কক্ করে তেড়ে আসছে।

পেছন থেকে ভোনা, খাদু এবং অন্যান্য ছেলেদের অট্টহাসি ভেসে আসছিল। ওরা কৌতুক বোধ করছে। বিদ্রূপ করে বলছে: কাপুরুষ!

কাপুরুষ! তা হোক। ও কথাটায় তখন লজ্জা হয়নি তার।

বাড়ি ফিরে এল রঞ্জু। খিড়কি দরজার পেছনে যেখানে ছাইয়ের মস্ত একটা গাদা জমেছে; রান্নাঘরটার দেওয়াল ঘেঁষে চাল থেকে ঝরা বৃষ্টির রেখায় সবুজ ছ্যাতলা ধরা জমিতে যেখানে গজিয়েছে ছোট বড় কতগুলো ব্যাঙের ছাতা; এলোমেলো কচু গাছের সঙ্গে ডোরা-কাটা সাপের মতো লম্বা লম্বা বুনো ওলের ডাঁটা উঠেছে আর সবটা মিলে ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে নতুন ফুলে ভরা বড় বাতাবী লেবুর গাছটা—সেখানে, সেই নির্জনতা ঘেরা আবর্জনার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে রইল রঞ্জু।

কান দুটো তখনো ঝাঁ ঝাঁ করছে, তখনো কপাল বেয়ে তার টপটপ করে ঘাম পড়ছে। মাটির পৃথিবী থেকে সেই প্রথম একরাশ কাদা ছিটকে লাগল মালঞ্চমালা, কঙ্কাবতী আর পাশাবতীর সাতরঙে আঁকা কল্পনার অপরূপ ছবিতে। কিশোরের অপরিচ্ছন্ন অকাল-পক্বতার ধোঁয়াটে চিন্তা, ঘোলাটে কুশ্রীতা। একটা কদর্য রূপ নিয়ে তার চোখের সামনে সেটা বীভৎস দুঃস্বপ্নের মতো ভাসতে লাগল।

মনে হল আজ সে পাপ করেছে। মিথ্যে কথা বলা নয়, পড়ার বইয়ের আড়ালে গল্পের বই লুকিয়ে মাকে ফাঁকি দেওয়াও নয়। তার চাইতে এ অনেক বড় অন্যায়, ঢের বেশি অপরাধ। এ অপরাধের জন্যে তার ক্ষমা নেই—কারো চোখের দিকে সে আর চোখ তুলেও তাকাতে পারবে না। রঞ্জুর কান্না পেতে লাগল, হাত জোড় করে বলতে ইচ্ছে করল, ঠাকুর আমায় মাপ করো, আর কোনোদিন আমি ভোনার সঙ্গে মিশব না।

নিজের অপরাধের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে অনেকক্ষণ সেই ছাইগাদার ওপরে বসে রইল রঞ্জু। তারপরে যখন খেয়াল হল তখন বাতাবী লেবু গাছটার হালকা ছায়া ঘন হয়ে এসেছে, ফুলের গন্ধে বাতাস যেন থেমে দাঁড়িয়েছে, তিন-চারটে শালিক পাখি নেচে নেচে ব্যাঙের ছাতার তলায় তলায় কেঁচো খুঁজছে, আর একটু দূরের রেল লাইন দিয়ে বিকেল পাঁচটার প্যাসেঞ্জার গাড়িটা ঝরাং ঝরাং করে চলেছে কাটিহারের দিকে।

উঠোনে ঢুকতেই প্রথমে নজর পড়ল মায়ের।

এগিয়ে এসে কপালে হাত দিলেন: কি রে, তোর হয়েছে কী? চোখ ছলছল করছে কেন? জ্বর আসছে নাকি?

—না।

মার তবুও সংশয় যায় না।—না বললেই শুনব? যা বাঁদর ছেলে হয়েছ! সারা দুপুর খালি টো টো করে বেড়ানো, আর যত ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে কাঁচা আম খাওয়া। আজ রাত্রে আর ভাত পাবে না।

রঞ্জু আস্তে আস্তে বললে, না মা, আমি দুপুরে বেরুব না, ওদের সঙ্গেও মিশব না।

মা হেসে ফেললেন: খুব সুবুদ্ধি হয়েছে দেখছি। ভাত বন্ধ করার নামেই বুঝি? আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে, এখন হাত-পা ধুয়ে পড়তে বোসো গে।

নাঃ—রঞ্জু সত্যিই আর ওদের দলে নয়। ওরা সত্যই বদ ছেলে, খারাপ ছেলে।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে মনসাতলায় মার্বেল খেলা চলছে। শব্দ উঠছে ঠকাস্ ঠকাস্। তেমনি উল্লসিত চিৎকার কানে আসে: উড্ডু কিপ্, হাত ইস্টেট—অল্—ফিপ্‌টিন—টুয়েন্টি—

ভোনা ডাকে, রঞ্জু—রঞ্জু—উ—উ—

মন ছলছল করে ওঠে—প্রতিজ্ঞা বুঝি আর টেঁকে না। কিন্তু নিজেকে সামলে নেয় রঞ্জু। তারপর দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে আসে বাড়ির ভেতরে, খিড়কি দুয়োর পেরিয়ে এসে বসে নির্জন ছাইগাদাটার পাশে। নিজের নিঃসঙ্গতাটাকে কেমন ভালো লাগতে শুরু করেছে আজকাল। বাতাবী গাছের ছায়ায় বসে হলদে পাখির ডাক শোনে, নিজের মনে ব্যাঙের ছাতাগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে একটুকরো বাখারি কুড়িয়ে নিয়ে, ওগুলোর তলায় খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁজে দেখে রাজছত্রের নিচে সত্যি সত্যিই কোনো ব্যাঙ ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে কিনা!

তারপর আস্তে আস্তে এই নিঃসঙ্গতার ভেতর দিয়ে নিজের একটা নূতন রূপ আবিষ্কার করল রঞ্জু। দুপুরের রৌদ্রে আমবাগানের আড্ডাটা তাকে ডাকল না, ওই রৌদ্রটাই তাকে ইশারা পাঠালো। ঝরাং ঝরাং শব্দ করে যেদিকে কাটিহারের গাড়িগুলো চলে যায়, সন্ধ্যে-বেলায় গাঁয়ের লোক শহরের কাজকর্ম শেষ করে জুতো হাতে করে যেদিকে জঙ্গলে ঘেরা মেঠো পথটা দিয়ে অদৃশ্য হয়, আশ্চর্য স্বরে ডাক দিয়ে যেদিকে উড়ে যায় হল্‌দে পাখি—শহর ছাড়িয়ে সেই বুনো বিশৃঙ্খল অজানা রাস্তাটা রঞ্জুর নাড়ীতে একটা দুর্বার আকর্ষণ জাগিয়ে তুলল।

রঞ্জু শুনেছে, ওই পথের শেষে, অনেক দূরে আছে কাঞ্চননদী। বৃষ্টিধোয়া ভিজে আকাশের মতো ছলছলে নীল তার জলের রঙ, তার পাঁচ হাত নিচে নুড়িগুলোকে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তার দুধারে অনেক দূর অবধি শাদা বালি ঝকঝক করছে, সেই মিহি মখমলের মতো নরম বালির ওপরে বক আর কাদাখোঁচার পায়ের ছাপে যেন আল্‌পনা আঁকা। অজস্র বঁইচির বন সেখানে ফলে ফলে একেবারে ভেঙে পড়তে চায়। তার ওপর দিয়ে রেলের মস্ত বড় পুল—কেউ বলে এক মাইল, কেউ বলে আধ মাইল লম্বা।

ছোট নদী কাঞ্চন—নামটির মতোই মিষ্টি। তবু ওই নদীটাকে কেন্দ্র করে একটা অদ্ভুত ভয়ের সংস্কার আছে লোকের মনে। তার আশেপাশে বহুদূর জুড়ে একটা নির্জনতা

থমথম করে। লোকে বলে কালী বাস করেন নদীর জলে। লোহার পুলটার ঠিক মাঝখানে—যেখানে বড় বড় থামগুলোকে পাক খেয়ে খেয়ে তীব্র বেগে পাহাড়ী নদীর জল গর্জন জাগিয়ে চলে যাচ্ছে, ওখানে নদীর মস্ত একটা দহ আছে। আর সময়ে-অসময়ে সেই দহ থেকে নাকি বিশালকায় একখানা কালীমূর্তি ভেসে ওঠে জলের ওপরে। লক লক করছে তার রক্তাক্ত দীর্ঘ জিহ্বা, তার হাতের খড়্গ থেকে তাজা রক্ত পড়ছে গড়িয়ে। অমন শান্ত নিস্তেজ নদী তাই প্রতি বছর দুটি-একটি করে নরবলি দেয় দেবীর তৃপ্তির জন্তে, অতি সতর্ক সাঁতারুও কেমন করে যে নদীর জলে ডুবে মরে এ একটা আশ্চর্য রহস্য।

লোকে আরো বলে, এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে।

সে ইতিহাস পুরোনো—যখন এদিকে প্রথম রেলের লাইন হয় সেই তখনকার কাহিনী। তখন কাঞ্চন নদী এমন করে মরে যায়নি। তার স্রোত ছিল প্রচণ্ড, তার গর্জন ছিল ভয়ঙ্কর। হাজার হাজার মণ পাথর ঢেলেও কোম্পানি নদীকে কাবু করতে পারল না। স্রোতের মুখে কুটো পড়লে যেমন করে উড়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই রাশি রাশি পাথর কোথায় যে ভেসে যেতে লাগল তার আর ঠিক-ঠিকানাই নেই।

তখনকার দিনে ইংরেজ এমন ম্লেচ্ছ ছিল না, তাদের দেব-দ্বিজে ভক্তি ছিল বলে শোনা যায়। তাই সাহেব এঞ্জিনিয়ার স্বপ্ন দেখলেন, রাত্রির কালো জলের ওপর অতিকায় একটা কালীমূর্তি শোভা পাচ্ছে। সে মূর্তি সাহেবকে ডাক দিয়ে বললে, আমার পূজো দাও, তাহলে পুল বাঁধতে পারবে। সাহেব প্রণাম করে বললে, আচ্ছা মা তাই হবে, তোমার পূজো দেব।

পূজোর আয়োজন হল। পুরুত এলেন, পাঁঠাবলি হল। কিন্তু অমন জাগ্রত দেবতা, তিনি মেটে আর মেঠোকালীর মতো শুধু পাঁঠার মুড়ো চিবিয়েই খুশি থাকলেন না। নিজের প্রাপ্যটা নিজের হাতেই যথাসময়ে আদায় করে নিলেন তিনি।

ঘটনাটা ঘটল এরই দিনকয়েক পরে। জলের ভেতরে কুলিরা মস্ত বড় একটা লোহার ফাঁপা চোঙ্ বসাচ্ছিল, ওই চোঙ্‌টার ভেতর দিয়ে তারা পিলারের গাঁথ্‌নি তুলবে। সব ঠিক আছে, দিব্যি সাফসুফ কাজ চলছে—এমন সময় কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল, অতএব চোঙটা দেখতে দেখতে ঠিক দু'মিনিটের মধ্যে যেন চোরাবালির টানে নিশ্চিহ্ন হয়ে অতলে মিলিয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে পনেরো-ষোলজন কুলিরও কেউ সন্ধান পেল না। সার্থক হল রক্তলোলুপা দেবীর পূজো।

তার পরে বিনা বাধায় পুল গড়ে উঠল। মস্ত বড় লোহার পুল। কেউ বলে আধমাইল, কেউ বলে তার বেশি, আবার কেউ বলে পুরো এক মাইলের কম নয়। ঝমঝম করে ওর ওপর দিয়ে রেলগাড়ি বেরিয়ে যায়, যাত্রীরা নিশ্চিন্তে গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখে, কেউ ঘুমোয়, কেউ তাস-পাশা খেলে। এ পুলের ইতিহাস তারা জানে না।

কিন্তু সেই যে শুরু—সেই থেকেই ধারাটা চলে আসছে। প্রতি বছর কালী তার নিয়মিত বলি আদায় করে নেন। দলবল না থাকলে লোক নদীতে স্নান করতে নামে না, একা একা দুপুরে সন্ধ্যায় নদীর কাছে যেতে ভয় পায় তারা। নির্জন বালির চর আর বৈঁচিবন নিয়ে কলচঞ্চলা ধারায় বয়ে যায় রহস্যময়ী কাঞ্চন।

ছেলেবেলায় আত্রাইকে দেখেছে রঞ্জু, দেখেছে তিরিশ সালে ক্ষ্যাপা নদীর সেই বানের দৃশ্য। তার রক্তের ভেতরে আমের জামের ছায়ায় ঘেরা সেই নদীর সুর আছে, সেই জলের গান বাজে উল্লসিত ছন্দে। রঞ্জু জলকে ভালোবাসে, নদীকে ভালোবাসে। তাই ভয়ের জাল দিয়ে ঘেরা এই বিচিত্রস্রোতা কাঞ্চনও তাকে ডাক দিলে।

একদিন দুপুরে যখন আবার তেম্‌নি করে ডাক দিয়ে গেল একটা হলদে পাখি, উড়ে গেল পশ্চিমের দিকে, তখন রঞ্জু আর থাকতে পারল না। অবিনাশবাবুর সেই নিশির ডাকের মতো কেমন বিহ্বল হয়ে গেল সে—ছায়ায় ঘেরা বাতাবী লেবু গাছের নিচেকার আসনটি ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল।

ধুলোয় ভরা পথটা দিয়ে খানিকটা যখন এগিয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে শোনা গেল খাঁদুর ডাক।

—রঞ্জু, এই রঞ্জু ?

রঞ্জু থেমে দাঁড়ালো।

—ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস ?

রঞ্জু আর জবাব দিলে না, নীরবে এগিয়ে চলল।

পেছন থেকে ঠাট্টা করে উঠল খাঁদু : ইস্‌, বড্ড ভালো ছেলে হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে আর কথাই বলবেন না!

রঞ্জু চলতে লাগল। এ ধরনের পথ তার অচেনা নয়, এর সঙ্গে তার শৈশবের নাজীপুর একাকার হয়ে গেছে। এ শহর মুকুন্দপুর নয়, এখানে দোতলা-তেতলা বাড়ি নেই, এখানে বাঁধানো রাস্তা নেই, এখানে পথের পাশে পাশে সরকারী আলো জ্বলে না। এখানে বন-জঙ্গল, আমের বাগান, খড়ের চাল দেওয়া ছোট ছোট কুটির। রঞ্জুর মনে হারানো দিনগুলোর নেশা লাগল, বহুদিনের ভুলে যাওয়া মাটির ছোঁয়া লেগে সর্বাঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার।

রেল লাইন পাশে রেখে রঞ্জু চলল। বেশ লাগে অজানা পথ দিয়ে চলতে, অদ্ভুত মোহ জাগে একটা। মনের ভেতর হারিয়ে যাওয়ার কেমন একটা নেশা আছে লুকিয়ে। যা চেনা সে তো চিরদিনই চেনা। তার ভেতরে বিস্ময় নেই, তার মধ্যে এমন কিছু নেই যাকে দেখে তুমি বলতে পারো এ আমার—এ একান্তই আমার। এই শহর, এই বাড়িঘর, ওই ল্যাম্পপোস্টগুলো, আমের বাগান, ভূপাল রায়ের প্রকাণ্ড পোড়ো বাড়ির পেছনে মজা

পুকুর আর আদ্যিকালের সেই অতিকায় জাম গাছটা—এদের ওপরে নিজস্ব কোন দাবি নেই রঞ্জুর। এ ভোনার, এ খাঁদুর—এ আর সকলের। কিন্তু এই পথটা—যা শহরের সীমা ছাড়িয়ে জংলা বাগান, বিলাতী পাকুড়ের বন আর উঁচু-নিচু অসমতলের মধ্য দিয়ে হারিয়ে গেছে, এ পথে আফ্রিকার দুর্গমের ভেতর দিয়ে অভিযানের মতো বিচিত্র আস্বাদন আছে একটা। হয়তো কোনো নতুন ফুল চোখে পড়বে, যা পৃথিবীর আর কেউ কোনদিন দেখেনি ; কোনো নতুন পাখি—যে পাখি দূর মেঘলোকের ওপারে মেঘমালার পুরীর পোর দাঁড আর সোনার শেকল কেটে বেরিয়ে এসেছে। এখানে যা দেখবে সব একান্ত ভাবে তোমার—যা পাবে সব তোমার নিজস্ব। এ পথচলা নয়, এ আবিষ্কার।

চলতে চলতে—বাঃ এই কি কাঞ্চন! এই কি সেই ভয়ে থম্ থম্ করা আশ্চর্য নদী!

কিন্তু রঞ্জুর ভয় করল না, ছমছম করে উঠল না শরীর। আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। দুপুরের রোদে অনেকটা জুড়ে ধবধবে মিহি বালি রূপোর মতো ঝিকমিক করছে, তার ওপরে দেখা যায় একফালি নীল জল। এত শান্ত, এত মৃদু যে স্রোত বইছে কিনা সন্দেহ। একটু দূরে রেলের পুলটা টানা রয়েছে, তার বারো আনিই শুকনো বালিডাঙার ওপর দিয়ে। সব স্বাভাবিক, সব সহজ। অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে, দুটি-চারটি করে বালি উড়ছে, ছোটখাটো দু-একটা বালির ঘূর্ণি ঘুরপাক খাচ্ছে। ডেকে ডেকে জলের ওপরে ঘুরছে মাছরাঙা। এ নদী ভয় জাগায় না, নেশা ধরায়।

গরম বালির ওপর দিয়ে জলের দিকে চলল রঞ্জু। পায়ের নিচে যেন ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে এম্‌নি মনে হয়। কিন্তু তবু খারাপ লাগছে না। এগিয়ে এসে জলের কাছে বসল। বসল ভিজে ভিজে নরম বালির ওপরে, জলের ভেতরে পা ডুবিয়ে। পায়ের ওপর দিয়ে তির্ তির্ করে স্রোত বয়ে যেতে লাগল, শির শির করতে লাগল শরীর। কী চমৎকার ঠাণ্ডা জলটা! বসে বসে রঞ্জু দেখতে লাগল কেমন করে এক-একটা ছোট রূপোলী মাছ জলের ওপরে অকারণ আনন্দে ঝিলিক দিয়ে উঠছে, আর কেমন করে মাছরাঙারা মাথা নিচু করে তাদের ওপরে তীরের মতো পডছে ছোঁ দিয়ে।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর চমক লাগল একটা। পেছন থেকে মৃদু গলায় কে ডেকেছে, রঞ্জু!

রঞ্জুর মুখ দিয়ে ভয়-বিহ্বল একটা স্বর বেরুল আপনা থেকেই : মা কালী! কিন্তু পেছন ফিরে তাকাতে আর সাহস হল না—ভয়ে হাত পা পাথর হয়ে আসতে চাইছে।

যে পিছন থেকে ডাক দিয়েছিল, সে এবার মিষ্টি গলায় খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

—মা কালী কি রে! এখানে বসে তুই কালী-সাধনা করছিস নাকি?

স্বরটা চেনা। লজ্জিত হয়ে চোখ ফেরাতেই দেখা গেল তাদের পাড়ারই ছেলে। পরিমল।

—পরিমল—তুই !

—হ্যাঁ আমি। ভূত নই।

—তুই এখানে কেন ?

—সে কথা পবে হবে। কিন্তু তার আগে তোকেই ওই কথাটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম।

—আমি—রঞ্জু ঢোঁক গিলল একবার : আমি এখানে বেড়াতে এসেছিলাম।

পরিমল আবার হেসে উঠল। তার পর রঞ্জুর পাশেই বালির ওপবে বসে পড়ে বললে, তাই বলে এই দুপুব রোদে! বেড়াবার আব সময় পেলি না নাকি ?

রঞ্জু জবাব দিলে না।

তরল গলায় পরিমল বলে চলল, এখানে ভয় আছে, তুই জানিস ?

—জানি।

—তবু আসতে ভয় করল না ?

—না।

—না কেন ?

—এখানে তো ভূত নেই, মা কালী আছে। দেবতাকে কেন ভয় কবব ?

পরিমল আরো জোরে হেসে উঠল। স্বচ্ছ উজ্জ্বল হাসি—এত সহজে ছেলেটা এমন কবে হাসতে পারে—আশ্চর্য! বললে, সব গাঁজা, ও সব বিশ্বাস করিস কেন ?

—বাঃ, দেবতা বিশ্বাস করব না ?

—কচু। দেবতা থাকলে তো ?

—কী যা তা বলছ সব! এই নদীতে মা কালী আছে।

—তোর মুণ্ডু আছেন!—পরিমল একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলে : আমি তো সময়ে অসময়ে প্রায়ই আসি এখানে। কোনোদিন কোনো কালী-ফালীর টিকির ডগাটিও দেখতে পাইনি। কালী যদি কোথাও থাকে তবে মন্দিরে আছে, এখানে নদীতে ডুবে মরতে আসবে কোন্ দুঃখে ?

কী ভয়ঙ্কর কথা! এমন কথা মুখ দিয়েও উচ্চারণ করতে আছে নাকি! অবাক বিস্ময়ে রঞ্জু তাকিয়ে রইল পরিমলের দিকে। পরিমল হাসছে, কিন্তু জোরে নয়। মুচকি মুচকি দুষ্টুমির হাসি।

—তুই তো সাংঘাতিক ছেলে পরিমল।

—সেই জন্যেই তো তোদের ভোনা অ্যাণ্ড কোম্পানির সঙ্গে আমার বনিবনা হয় না।

কথাটা ঠিক। মনসাতলার ছেলে হয়েও পাড়ার কারো সঙ্গে খুব সম্প্রীতি নেই

পরিমলের। মাঝে মাঝে আগে মার্বেল খেলতে আসত, কিন্তু এত খারাপ খেলত যে পাঁচ-মিনিট পরেই ভোনা তার সব মার্বেলগুলো পকেটস্থ করে ফেলত। সেজন্যে কোনোদিন ক্ষোভ করেনি, মুখ কালো করেনি একটুও। তা ছাড়া পাড়ার দলবলের সঙ্গে মেশামেশি একেবারেই নেই তার। তার বাবা শহরের বড় উকিল। মস্ত বাগান-বাড়ি তাদের। সে বাগানে হরিণ আছে, ময়ুর চরে। বিকেলে দেখা যায় পরিমল আর তার বোন সেই বাগানে হরিণের পেছনে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

ভোনা মুখ ভেংচে তার অভ্যস্ত রীতিতে বলেছে, ওরা বড়লোক, অহঙ্কারে একেবারে চারখানা হয়ে ফেটে পড়ছে। আমাদের সঙ্গে মিশবে কেন?

রঞ্জুরও তাই ধারণা ছিল। সত্যিই কোথায় যেন একটা বৈশিষ্ট্য আছে পরিমলের, আছে স্বাতন্ত্র্যের একটা সীমারেখা—যে রেখা ওরা কখনো অতিক্রম করতে পারে না। বয়সের তুলনায় পরিমল একটু বেশি লম্বা—সুন্দর সুগঠিত শরীর, ভোনার একেবারে বিপরীত। টকটকে ফর্সা রঙ, আর রঙটা অত ফর্সা বলেই মাথার চুলগুলো কেমন লালচে, চোখের তারা দুটো কপিশবর্ণ। কথা বলার চাইতে হাসে বেশি, আর যখন হাসে না তখনও চোখ দুটো যেন হাসিতে জ্বলজ্বল করতে থাকে তার। সে বড়লোক—এই অপরাধে ভোনা অবশ্য সুযোগ পেলেই তাকে বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু পরিমল ভ্রূক্ষেপ করে না —যেন এইসব তুচ্ছতাকে অবহেলা করবার কত সহজাত কবচকুণ্ডল নিয়েই সে জন্মেছে। তাই পরিমল পাড়ার ছেলে হয়েও পাড়ার সকলের থেকে আলাদা।

এই সময়টুকুর ভেতরে একসঙ্গে এতগুলো কথা ভেবে নিলে রঞ্জু।

—কিন্তু তুই এখন এখানে কেন পরিমল?

পরিমল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, সে কথা আজ বলব না।

—কেন?

—সময় হয়নি।

—কিসের সময়?

—সব কথা বলবার।

—কী এমন কথা? রঞ্জুর যেমন বিস্ময়, তেমনি কৌতূহল বোধ হল।

প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল পরিমল। বললে, আর এখানে বসে রোদে চাঁদি পুড়িয়ে লাভ নেই রঞ্জু। বাড়ির দিকে যাবি তো চল।

নীরবে রঞ্জুও উঠে দাঁড়াল। পরিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে নতুন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল না। শুধু তখন মনে হল, পরিমল এমন একটা জগতে বাস করছে যা তার পরিচিত পরিবেশের চাইতে বহুদূরে—যে জগতের দরজা আজও তার কাছে অবরুদ্ধ…

কিন্তু ভোনাকে এড়াবার ইচ্ছে থাকলেও বেশিদিন তাকে এড়ানো গেল না।

গোষ্ঠাষ্টমী তিথি। এইদিনে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম গোচারণে গিয়েছিলেন, তাই একে উপলক্ষ করে ইস্কুলের হেড্‌মাস্টারেরা গোচারণ বন্ধ করে দিলেন। একটার সময় ঢন্‌ঢন্‌ করে ছুটির ঘণ্টা বাজাতেই ছেলের দল হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ল।

অন্যমনস্কভাবে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে সে, কোত্থেকে ভোনা এসে পাকড়াও করলে।

—কি রে, খুব মাতব্বর হয়ে গেছিস যে! আজকাল তো তো'ক দেখতেই পাওয়া যায় না।

—ছাড়ো, বাড়ি যাব।

—বাড়ি যাবি! ওঃ—একেবারে গুড্‌ বয়—বাড়ি গিয়ে দুধ-ভাত খাবে। নেঃ—অত ভালো ছেলে হতে হবে না। চল্‌, মেলায় চল্‌।

—মেলায়?

—হ্যাঁ—গোষ্ঠের মেলায়! অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কি রে? আমরা সবাই যাচ্ছি, চল্‌।

রঞ্জু বিব্রত হয়ে বললে, তা হলে বাড়ি থেকে মাকে বলে আসি।

—কথা শোনো—এর জন্যে আবার মাকে বলতে হবে। রাখ্‌, রাখ্‌—অত ভালো ছেলে না হলেও চলবে। চল্‌, দল বেঁধে যাচ্ছি, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব।

গোষ্ঠের মেলা! মনটা প্রলুব্ধ হয়ে উঠল। গোষ্ঠের মেলার নাম শুনেছে সে, কিন্তু আজ পর্যন্ত যাবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। শুনেছে, মস্ত বড় মেলা। নাগরদোলা আসে, টিনের বাক্সে বায়োস্কোপ আসে, নানা রঙের খেলনা আসে, আর আসে বড় বড় আড়াই-সেরী কদ্‌মা। গত বছর মেলা-ফিরতি মানুষ দেখেছে রঞ্জু, মনে হয়েছে মস্ত বড় একটা উৎসবের আনন্দ থেকে ফাঁকি পড়ল সে—বাদ পড়ে গেল।

—খুব দেরি করবি না তো?

—না, না, তুই চল্‌ না। ভয় নেই, হারিয়ে যাবি না। আঁচল-চাপা ছেলেকে আবার মার কোলে ঠিক ফিরিয়ে এনে দেব—দেখে নিস।

কথাটা বলে গালের পাশ দিয়ে জিভ বার করে ভ্যাংচানোর ভঙ্গিতে অবজ্ঞার হাসি হাসলে ভোনা।

খাঁদু বাঁকা মন্তব্য করলে, কেন ওকে টানাটানি করছিস? বাড়িতে ওর দুধ-ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আর একজন বললে, আমাদের সঙ্গে গেলে বাড়িতে ও পিট্টি খাবে!

হঠাৎ পৌরুষে ঘা লেগে গেল রঞ্জুর: বেশ তো, চল্‌ না। আমি কি কাউকে ভয় করি

নাকি ? কণ্ঠস্বরটা এতক্ষণে বেশ তেজোদৃপ্ত শোনালো তার।

খুশি হয়ে ভোনা পিঠ চাপড়ে দিলে : সাবাস, এই তো চাই। এখন থেকেই মরদের মতো হয়ে উঠতে হবে, বুঝলি ? অত পুতুপুতু করলে কি চলে ?

পরমোৎসাহে পায়ের তালি মারা চটিজোড়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভোনা চলতে শুরু করে দিলে। চলার তালে তালে হাতীর পায়ের মতো শব্দ উঠতে লাগল। তারপর বিকট ভঙ্গিতে যাত্রার দলের জুড়িদের মতো কানে হাত দিয়ে তারস্বরে থিয়েটারের গান ধরলে একটা :

"কালো পাখীটা মোরে
কেন করে এত জ্বালা—আ—তন—"

ট্রি-প্যারির মতো সেইটেই মার্চিং সং। নেতাকে নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করে ছেলের দলও অগ্রসর হল।

গোষ্ঠের মেলা ঠিক শহরের মাঝখানে বসে না। বসে শহর থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে—সাহানগর বলে একটা গ্রামে। ইস্কুলের ওপারে রেলের লাইন, সেই রেলের লাইন পেরুলে মাঠ শুরু। ধান হয় না, পোড়ো পতিত জমি। মাঠ ছাড়িয়ে একটা মজা নদী, তার পাশে ভাগাড়—শকুন, গিন্নী শকুন, আর টেলিগ্রাফের তারে তারে শঙ্খচিল। তার পরে বড়রাস্তা, বাগান, পুরোনো আমলের সাহেবদের ভাঙা-চুরো একটা জংলা কবরখানা। বেশির ভাগ কবরের জীর্ণ দশা, মার্বেল ফলকের ওপরে লেখাগুলো কালো আর ঝাপসা হয়ে গেছে। শুধু শ্লেট পাথরের গায়ে একটা স্মারকলিপি জ্বলজ্বল করছে : 'পিটার হপ্‌কিন্স —জন্মিলা ১৮৩২ সনে, লাভ করিলা যীশুর শান্তিময় ক্রোড় ১১ই মার্চ ১৮৮৫ সনে'। সেই সঙ্গে একটুকরা কবিতার লাইন : "পিতার অপার প্রেম সকল সংসারে।"

এই কবরখানার ওপারেই সাহানগর গ্রাম। আর এখানে এসে পৌঁছুতেই যেন বহুদূরে সমুদ্রের ডাক শুনতে পাওয়া গেল—মেলার কলরোল। অতীত মৃত্যুর স্তব্ধ বিষণ্ণ রূপ-গুলোর দিকে তাকিয়ে রঞ্জুর মনটা যখন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, তখন দূর থেকে ওই মেলার কলধ্বনি যেন হঠাৎ তাকে খুশি করে তুলল।

সারাটা পথ অজস্র বখামি করতে করতে এসেছে ভোনা। নানা সুরে নানা রকম গান গেয়েছে, মুখভঙ্গি করেছে, আগে আগে যে সমস্ত লোক মেলায় চলেছিল তাদের ভেং-চিয়েছে এবং পা থেকে চটিজোড়াকে সব সময়ে দশ হাত করে এগিয়ে রেখেছে। একবার তার একপাটি আর একজনের গায়ে লেগেছিল, সে ক্ষীণ প্রতিবাদ করতেই ভোনা দলবল নিয়ে একেবারে তেড়ে গেল। লোকটা বিড় বিড় করে বললে, অসভ্য বানরের দল।

ভোনা জবাব দিলে, তাই তো তোমায় ডাকি দাদা হনুমান !

সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্য ছেলেরা সুর ধরল, দাদা হনুমান ওগো, দাদা হনুমান !

নিজের সম্মান রাখবার জন্যে লোকটা বাক্যব্যয় করলে না আর। বেগে পা চালিয়ে দিলে। পেছন থেকে খাঁদু ডাক দিয়ে বললে, রাগ করে চললে দাদা, নিতান্তই চললে? তা বাড়ি গিয়ে চারটি বেশি করে ভাত খেয়ো—কেমন?

রঞ্জুর এতক্ষণে অনুতাপ হচ্ছিল। ভারী বিশ্রী লাগছে, অত্যন্ত আত্মগ্লানি বোধ হচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় এদের সঙ্গে এমনভাবে বেরিয়ে পড়ে মস্ত বড় ভুল করেছে সে। ওদিকে খাঁদু আর একটা বিড়ি ধরিয়েছে, পরমানন্দে মুখটাকে বিকৃতি করে ধোঁয়া ছাড়ছে। রঞ্জুর ভয় করতে লাগল। যদি চেনাজানা কেউ দেখতে পায়, যদি বাড়ি গিয়ে বলে দেয় —তাহলে তার পরের অবস্থাটা কল্পনাও করা চলে না।

অন্যান্য পথচারীরা বাঁকা দৃষ্টিতে বারে বারে তাকাচ্ছে এদের দিকে। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এই দলটির খপ্পরে কেউই বিশেষ প্রসন্ন নয়। একজন তো পরিষ্কার বললে, এই বয়সেই বিড়ি সিগারেট ধরেছে, কী চমৎকার ছেলে তৈরি হচ্ছে সব!

ঝড়াং করে হাবুল জবাব দিলে, খাই তো খাই, কারুর বাপের পয়সায় খাই?

সঙ্গে সঙ্গে ভোনা সুর করে করে 'অঙ্গদের রায়বার' বলতে শুরু করলে: "মোর বাপ কি তোর বাপকে বেঁধেছিল ল্যাজে?"

খাঁদু আরো একটু রসান দিলে: "এতগুলি রাবণ মধ্যে কোন্‌টি তোমার পিতা?"

যে মন্তব্য করেছিল সে চুপ হয়ে গেল।

সমস্ত পথটা যেন যমযন্ত্রণার মতো মনে হচ্ছিল রঞ্জুর। এক-একবার ভাবছিল ফিরে চলে যায়, কিন্তু তখন আর ফেরবার পথ নেই। এরই মধ্যে খাঁদু আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, এই, বিড়ি খাবি?

—না।

—খা না। কেউ টের পাবে না।

—না ভাই।

—ওঃ—একেবারে ভালো ছেলে!

ভোনা ইংরেজি করে ছড়া কাটলে:

Jim is a good dog
Everyday he catches a frog—

ছেলের দল হো হো করে হেসে উঠল।

কিন্তু কবরখানা ছাড়াতেই যখন মেলার কোলাহলটা কানে গেল তখন উৎকর্ণ হয়ে উঠল রঞ্জু। সমুদ্রের ডাক—অজানা, অপরিচয়ের দূরসমুদ্র। বিস্ময়ের আর অন্ত নেই সেখানে। সেখানে নাগরদোলা ঘুরছে, সেখানে টিনের বাক্সে বায়োস্কোপ, সেখানে চারপেয়ে মানুষ আর ছ'পেয়ে গোরু, সেখানে রঙীন বেলুন আর আড়াইসেরী কদমা। এতটা পথ

ভাঙা এতক্ষণে সার্থক হয়েছে।

দলটা মেলায় এসে ঢুকল। সত্যিই মস্ত বড় মেলা। নতুন একটা শহর দেখেছে রঞ্জু—দেখেছে অনেক মানুষ, কিন্তু একসঙ্গে এত মানুষকে সে আর কোনোদিন দেখেনি। অবাক হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

ভোনা হ্যাঁচ্‌কা টান দিলে একটা। বললে, অমন বাঙালের মতো হাঁ করে আছিস কী? চলে আয়। মেলায় কেনাকাটা করতে হবে না?

—কেনাকাটা! কিন্তু বাড়ি থেকে তো পয়সা আনিনি।

—দূর গাধা!—ভোনা জিভ বের করে চোখ উলটে ভঙ্গি করলে একটা: মেলায় জিনিস কিনতে এলে আবার পয়সা লাগে নাকি?

—পয়সা লাগে না?—এ একটা নতুন খবর শোনা গেল যা হোক। রঞ্জু আশ্চর্য হয়ে বললে, পয়সা লাগে না? তা হলে বিনি-পয়সায় দেয় নাকি?

—হুঁঃ—বিনি-পয়সায় দেবে? তোর শ্বশুর কিনা সব। ভোনা এবার সত্যি সত্যি ভেংচে দিলে।

—তা হলে কিনবি কী করে?

—হাতের জোরে।

—হাতের জোরে? সে আবার কী?

—আঃ—এই বাঙালকে নিয়ে তো ভারী জ্বালাতনে পড়লাম। চলে আয় না, দেখতেই পাবি সব—ভোনা টেনে নিয়ে চলল রঞ্জুকে।

বেশি দূর যেতে হল না—সামনেই একটা বড় মনিহারী দোকান। তালা চাবি, ছুরি কাঁচি থেকে শুরু করে সাবান তেল, স্প্রিংয়ের মোটর, চুলের রেশমী ফিতে, জাপানী পুতুল—সব কিছুর বিপুল সমারোহ। দোকানে ভয়ঙ্কর ভিড়। দু-তিনজন লোক একসঙ্গে যোগান দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

ভোনা বললে, চল্, এইখানেই দেখা যাক।

দোকানের সামনে ভোনা বসল তার দলবল নিয়ে। এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর দর জিজ্ঞাসা করে।

—এই সাবানটা কত?

—তিন আনা।

—ছয় পয়সায় হবে না?

—না।

—ওই রেলগাড়ির দাম কত?

—বারো আনা।

—ছয় আনায় দেবেন ?

—না।

—সাড়ে ছ'আনা ?

—কেন অকারণে বকাচ্ছ খোকা ? নিতে হয় নাও, নইলে চলে যাও।

—খালি খালি খদ্দেরকে অপমান করলেন মশাই ? চাই না আপনার দোকানে কিনতে। চল্ খাঁদু—একটা বীরত্বসূচক ভঙ্গি করে ভোনা উঠে দাঁড়াল।

দোকানদার বললে, যত সব বখাটে ছোকরা !

ভোনা শাসিয়ে উঠল : শাট্ আপ্ ! আপনি আমাদের গার্জেন নন।

দোকানদার বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

পর পর পাঁচ-সাতখানা দোকান। একটা জিনিসও কিনল না ভোনা, খালি দরাদরি করলে, দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া করলে। রঞ্জুর একেবারেই ভালো লাগছিল না ; লজ্জায় অপমানে তার মাথা যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। এরা সবাই তো তাকে ওদের মতোই বখাটে ভাবছে ! তবু দলের সঙ্গে ঘুরছিল যন্ত্রের মতো। আর ভাবছিল বাড়ি গিয়ে মা-র কাছে কী কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় ?

খানিক পরে ভোনাও বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে উঠল। বললে, আর নয় খাঁদু, কী বলিস ?

খাঁদু বললে, হ্যাঁ—মন্দ হয়নি।

মেলার ভিড়টা ছাড়িয়ে দলটা এবারে চলে এল একেবারে গো-হাটার কাছে। এখানে লোক পাতলা, কয়েকটা ছোট ছোট চালার নিচে জনকয়েক লোক গোরু নিয়ে দরাদরি করছে। দাঁত পরীক্ষা করছে, শিং দেখছে। গোবর আর ধুলোর একটা মিশ্রিত গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

এইখানে একটা বড় বট গাছের ছায়ার নিচে ওরা এসে বসল। ভোনা বললে, নে এবার বার কর্ সব।

সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল ওদের পকেট থেকে বেরিয়ে আসছে ছুরি, সাবান, স্নো, চুলের ফিতে, এমন কি একরাশ খেলনা পর্যন্ত। সব একসঙ্গে জড়ো করা হল। রঞ্জু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না—যেন স্বপ্ন দেখছে সে।

চোখ টিপে জিভ বার করে হাসল ভোনা।

—কেমন পরিষ্কার হাতের কাজ দেখলি তো ? কোনো ব্যাটা টের পায়নি।

রঞ্জুর শরীর প্রবল একটা ঝাঁকানি দিয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল, গায়ের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। গলা থেকে অবরুদ্ধ আর্তনাদের মতো একটা স্বর বেরুল : তোমরা চুরি করেছ ?

—আঃ গাধা, এমন করে চেঁচাস না! এ চুরি নয়, এর নাম হাতসাফাই। তুই একটা হাঁদা-গঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়ে ছিলি বটে, কিন্তু তোরও ভাগ আছে। নে থাঁদু, হিসেব কর্—

রঞ্জুর এবার বাক্‌শক্তি পর্যন্ত যেন লোপ পেয়ে গেছে। ক্রমাগত মনে হচ্ছে কে যেন প্রাণপণ বলে তার জিভটাকে টেনে ধরছে গলার ভেতর। একটা অপরিসীম ভয়ে চারদিকের পৃথিবীটা তার কাছে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে—যেন অসময়ে শীতের গাঢ় কুয়াশা এসেছে ঘনিয়ে।

সাত

গোষ্ঠের মেলা থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাড়ির সামনে অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জু। ভেতরে ঢুকবে কিনা বুঝতে পারছে না। পা কাঁপছে তার, বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়বার মতো একটা অবিচ্ছিন্ন আর অস্বস্তিকর অনুভূতি। তীব্র তৃষ্ণায় তালুর শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, ঢোঁক গিলতে গেলেও যেন গলার ভেতরে খচ খচ করে কাঁটার মতো বিঁধছে।

জামার পকেটে খস খস করছে একখানা সাবান আর একটা সুতোর গুটি। আজকের লুটের মাল, ভোনা ঠকায়নি, ভাগ দিয়েছে। পথে আসতে আসতে যতবার একটা চৌকিদার আর পাহারাওয়ালার মুখ চোখে পড়েছে তার, ততবার চমকে চমকে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা। চুরির অংশ নিয়েছে সে—সে চোর! আর সেই অপরাধের স্বাক্ষর আঁকা রয়েছে তার মুখে, জ্বলজ্বল করছে, ঝকমক করছে। যে দেখবে সে-ই মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পারবে—সে চোর।

বাতাসে দুটো চুল মুখে এসে উড়ে পড়তেই অকারণে শিউরে উঠল রঞ্জু। মনে পড়ল একবার একটা অদ্ভুত আর বিশ্রী পোকা দেখেছিল সে। পোকাটা বারান্দার ওপর দিয়ে কিলবিল করে চলে যাচ্ছিল, আর চলার সঙ্গে সঙ্গে এঁকে যাচ্ছিল আলোর একটা নীলাভ উজ্জ্বল রেখা। মনে হল তার কপালের ওপরে ওই রকম একটা কুৎসিত পোকা যেন নড়ে বেড়াচ্ছে, আর ক্লেদাক্ত উজ্জ্বল হরফে সেখানে লেখা হয়ে যাচ্ছে : চোর—চোর—

পকেট থেকে সাবান আর গুলিসুতোর গুটিটা সে বের করে আনল, তারপর সোজা ছুঁড়ে ফেলে দিলে পাশের অন্ধকার বাগানটার ভেতরে। এইবারে সে নিশ্চিন্ত—এইবারে মনের ওপর থেকে ভারটা নেমে গেছে তার। শুধু চুরি করে আনা সাবানটার একটা উগ্র মিষ্টি গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে জেগে রইল তার দুটি আঙুলে, জুড়ে রইল তার জামার পকেটটাতে।

জীবনে অনেক মিষ্টি গন্ধের পেছনেই ওই চুরি আর অপরাধের ইতিহাস—এ অভিজ্ঞতার সময় তখনো তার আসেনি।

খাতার পাতায় হিসেবটা আবার গোলমাল হয়ে যায়। ছিঁড়ে যাচ্ছে ধারাবাহিকতা—পেছনের কালো পর্দার ওপরে ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইডের মতো এলোমেলো ছবি ফুটে উঠছে। কত চেনা পথ, কত ঘর-বাড়ি, কত আশ্চর্য ঘটনা, আজকে নিশ্চিন্তভাবে ভুলে গেছে রঞ্জু, কেউ মনে করিয়ে দিলেও মনে পড়ে না। কিন্তু কবে—কোন্ ছেলেবেলায় নীল রঙের একটা ছোট পাখি এসে ওদের জানালার ওপরে বসেছিল; ছোট ঘাড়টি বাড়িয়ে কৌতূহলভরা উজ্জ্বল দৃষ্টিতে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল এক মুহূর্ত, তারপর লাল ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে একটা ছোট্ট মিষ্টি ডাক দিয়ে আবার উড়ে চলে গিয়েছিল—পরিষ্কার মনে আছে সেটা। পাখিটার স্বচ্ছন্দ বসবার ভঙ্গি, তার সবুজ চোখে দুষ্টুমি-ভরা জিজ্ঞাসা—এ ভোলবার নয়, কোনোদিন ভুলবে না রঞ্জু।

গোষ্ঠের মেলা দেখে ফেরবার কতদিন পরে? তিন মাস? দু মাস? দু সপ্তাহ? আরো কী ঘটেছিল এই সময়ের মধ্যে? এই চুরির প্রতিক্রিয়া কতদিন মনটাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল? হিসেব মেলে না। সমস্ত হিসেব তলিয়ে যায় বজ্রের মতো আকাশ-ফাটানো উন্মত্ত গর্জনে।

—"বন্দে মাতরম্—"

—"মহাত্মা গান্ধী কী জয়—"

উনিশ শো তিরিশ সাল।

উত্তরাপথের গিরিদুর্গ আর দক্ষিণের নীল সমুদ্র উন্মথিত করে উচ্চারিত হল সংকল্প-বাক্য:

"আজ আমরা সংকল্প লইতেছি, ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা নিরস্ত হইব না। কিন্তু এই স্বাধীনতা আনিতে হইবে সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়া, পরিপূর্ণ অহিংসার সহায়তায়। আমরা বিদেশী বয়কট করিব, আত্মঘাতী মাদকদ্রব্য বর্জন করিব, অন্যায় লবণ-করকে অস্বীকার করিয়া স্বহস্তে লবণ তৈরী করিব—"

মহাত্মা গান্ধী! দিকে দিকে রুদ্রধ্বনিতে বাজতে লাগল ওই একটি নাম। যাত্রা করলেন বে-আইনী লবণ সত্যাগ্রহের নির্ভীক অভিযানে। সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ স্পর্ধার উত্তরে শান্ত কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন: "মেরা এক কদম্‌সে সারে হিন্দোস্তান উথাল্ পাথাল্ হো যায়গা—"

ওই একটি কথার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ চক্ষের পলকে ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে—দাবানল জ্বলল পাঞ্জাব সিন্ধু থেকে উৎকল বঙ্গ পর্যন্ত, আগুন ধরল ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের বুকের পাঁজরে। হিন্দুস্থান উথাল্-পাথাল্ হয়ে উঠল।

উনিশ শো তিরিশ সাল।

সে কি ভোলবার দিন! ঘরে ঘরে উড়তে লাগল ত্রিবর্ণ পতাকা, পড়শীর ঘর ঘর মুখর হয়ে উঠল চরকার ঘর্ঘরে, হাতে হাতে ঘুরতে লাগল তকলি। স্বাবলম্বী হও—নিজের হাতে মিটিয়ে নাও নিজের প্রয়োজন, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় দেবতার প্রসাদী ফুলের মতো হাসিমুখে মাথায় তুলে নাও। কণ্ঠরোধ করে দাও ল্যাঙ্কাশায়ার আর ম্যাঞ্চেস্টারের, অবসান ঘটিয়ে দাও শৌখীন বিলাতী পরমুখাপেক্ষিতার। অপমানের লজ্জায় জর্জরিত পরের সজ্জা দূর করে দিয়ে দেশমাতার দেওয়া উত্তরীয়-উষ্ণীষ পরে শুচি হও, কৃতার্থ হয়ে ওঠো।

রাস্তার মোড় থেকে বিলিতী কাপড়ের স্তূপ পুড়ছে। রঞ্জু একদিন বাবাকে দেখেছিল এমনি করে কাপড় পোড়াতে, কিন্তু সেদিন যা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, আজ সমস্ত ভারতবর্ষ তাকে একটা পরম সত্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। সিগারেটের প্যাকেট পর্বতের আকারে জড়ো করে আগুন ধরানো হয়েছে, তার ধোঁয়াতে এক মাইল দূর থেকে কাশতে কাশতে দম আটকে আসছে লোকের। দিশি-বিলিতী মদের বোতল চুরমার হয়ে গড়াচ্ছে রাস্তায়।

কী আশ্চর্য দিন—কী অপূর্ব সেদিনকার উন্মাদনা!

আর একটা তিরিশ সালের কথা মনে আছে রঞ্জুর। তেরশো তিরিশ সাল। ফেঁপে উঠেছিল আত্রাই—ভাসিয়ে নিয়েছিল মাঠ-ঘাট, গ্রাম-গ্রামান্তর। আজ উনিশ শো তিরিশ সালে আর এক বন্যা দেখল রঞ্জু। প্রস্তুতির কূল ভাঙা বান নয়—বাঁধভাঙা জীবন-বন্যা। সে বন্যা উত্তরবঙ্গকে ভাসিয়েছিল, এ ভাসিয়ে দিলে সমস্ত ভারতবর্ষকে। মাঠ-ঘাট গ্রাম-গ্রামান্ত—কোনো কিছু বাকি রইল না।

ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল ইস্কুল কলেজ থেকে, উকিল মোক্তারেরা বেরিয়ে এলেন আদালতের মোহ কাটিয়ে। ভয় নেই, দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। স্বাধীনতা-হীনতায় কেউ বেঁচে থাকতে চায় না। এখন ঊর্ধ্ব গগনে মাদল বেজেছে, নিচে ডাক দিয়েছে উতলা ধরণী, অরুণ প্রাতের তরুণ দলকে আর অপেক্ষা করলে চলবে না, বেরিয়ে পড়তে হবে। ডাক দিয়ে বলতে হবে "ঝাণ্ডা উঁচে রহে হামারা—"

সমস্ত দেশ, সমস্ত মানুষকে সেদিন পাগল করে দিয়েছিল নবজীবনের উন্মাদ ছন্দ। কোন্ নির্লজ্জ এক ধূমপায়ী মুসলমান বিড়িওয়ালার কাছে 'কাঁচি-মার্কা' সিগারেট চেয়েছিল, তেড়ে উত্তর এল: জুতি-মার্কা হ্যায়, খাও গে? একখানা বিলিতী কাপড়ের ওপরে খদ্দরের পাঞ্জাবি চড়িয়ে কে যেন নাপিতের কাছে দাড়ি কামাতে গিয়েছিল, নাপিত তার আধখানা গাল কামিয়ে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল। স্টেশনের সামান্য কুলি পর্যন্ত সাদা সাহেবের মাল তুলতে ঘৃণাবোধ করলে, বললে, "নেহি ছুঁয়েঙ্গে।"

সেদিন কেউ ঘরে থাকতে পারেনি, রঞ্জুও না।

বেশ পরিষ্কার মনে আছে। দশটা বাজতে না বাজতেই বাঁধা নিয়মে ভাত খেয়ে রওনা হয়েছিল ইস্কুলের দিকে। কিন্তু খানিকদূর এগোতেই বাধা পড়ে গেল। দলবল নিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল ভোনা।

হ্যাঁ—সেই ভোনা। সেই মার্বেল আর বাঘবন্দী চ্যাম্পিয়ান, হাত-সাফাইয়ে বিশারদ, কুশ্রী কদর্য আলোচনায় মুখখোলা সেই ভোনা। আজ সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়েছে তার। মাথায় খদ্দরের টুপি, বুকে ব্যাজ, হাতে পতাকা। শুধু ভোনা নয়, কালী, খাঁদু, পূর্ণ—সবাই।

—কোথায় যাচ্ছিস রঞ্জু ?

—ইস্কুলে।

ভোনার দলের প্রত্যেকটি ছেলের মুখে ফুটে উঠল ঘৃণা আর অনুকম্পার রেখা।

—শেম্! শেম্!

—ধিক্!

—লজ্জা হয় না ?

নেতার মতো উদাত্ত উদার ভঙ্গিতে ভোনা তুলে ধরল পতাকা : এখনো ইংরেজির মোহ ? এখনো গোলামখানায় ঢুকতে চাস ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

লজ্জায়, অপরাধবোধে সংকুচিত হয়ে উঠল রঞ্জু : কী করব তবে ?

—আমাদের সঙ্গে চলে আয়।

—কোথায় যেতে হবে ?

—ইস্কুলে পিকেটিং করতে।

ওরা রঞ্জুকে ডাকলে বটে, কিন্তু রঞ্জুর জন্যে আর অপেক্ষা করলে না। মুহূর্তে ড্রিলের ভঙ্গিতে ভোনা অ্যাবাউট টার্ন করলে, সঙ্গে সঙ্গে দলের আর সবাই বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরে গেল। বেশ জোরে জোরে বার কয়েক পা ঠুকে ভোনা গান ধরলে :

"মেরে সোনেকি হিন্দুস্তান,
তু হামারা দিল্‌কা রোশ্‌নী
তু হামারা জান—"

তার পরেই গানের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে গেল ওরা। উৎসাহে উল্লাসে ওদের চোখমুখ ঝলমল করছে, একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, একটা কঠিন সংকল্পের নির্ভুল ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হয়ে গেছে ওদের সর্বদেহে। উনিশ শো তিরিশ সালের স্পর্শমণির ছোঁয়া পেয়ে সোনা হয়ে গেছে অনেক আবর্জনা, মুছে গেছে অনেক গ্লানি, ধুয়ে নির্মল হয়ে গেছে যুগ-সঞ্চিত অনেক অপরাধের অপবাদ। রেল স্টেশনের কুলি আর মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড়

থেকে শুরু করে ভোনা, পূর্ণ, কালী, খাঁদু পর্যন্ত কিছু আর অবশিষ্ট নেই—কেউ বাদ নেই আর। বন্দে মাতরমের বীজমন্ত্র মুখের থেকে বুকে গিয়ে জমাট বেঁধেছে। গলা টিপে মুখকে তুমি বন্ধ করতে পারো, কিন্তু বুকের এই রক্তাক্ত মর্মলিপিকে মুছবে কে?

রঞ্জু দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। চারদিকের রৌদ্র, গাছপালা, পথ, বাড়িঘর—কোনো কিছুর আজ যেন আলাদা কোনো রূপ নেই, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই কোনো রকমের। আজ সমস্ত কিছু এক রকম হয়ে গেছে,—ধরেছে একটিমাত্র রঙ—ত্রিবর্ণ পতাকার রঙ। আজ আকাশে বাতাসে ঝিম্ ঝিম্ রিম্ রিম্ করে একটা গম্ভীর মধুর সুরের রেশ অনুঝঙ্কৃত হচ্ছে: বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—

স্মৃতির মধ্যে চমক দিয়ে উঠল একটি নাম: অবিনাশবাবু! আজ এতদিন পরে রঞ্জু চিনতে পারল যেন অবিনাশবাবুকে, যেন এতদিন পরে তার কাছে এই অবারিত রৌদ্র-ধারার মতো প্রত্যক্ষ আর দীপ্তোজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর প্রত্যেকটি কথা। একটা আকস্মিক আত্ম-চৈতন্যের বিস্ময়ে জেগে উঠল সে:

"স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে
এদেশ তোদের নয়—"

এই তো স্বদেশ—এতদিন পরে এই তো স্বদেশ তার সামনে এসে দাঁড়াল। এই যমুনা, এই গঙ্গানদীর ওপর আজ থেকে আমাদেরই তো অধিকার। পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে তাদের বুকের ওপর দিয়ে জাহাজ আর বইবে না। আমরা জেগেছি, আমরা জাগব। আজ এই মুহূর্তটির জন্যে বেঁচে থাকা উচিত ছিল, তাঁর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

রঞ্জু দু'হাতে চোখ দুটো রগড়ে নিলে একবার—যেন তার ঘুম ভেঙেছে। তারপর নিজের ভেতরে কিছু একটা নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করে নিয়ে জোর পায়ে ইস্কুলের দিকে এগিয়ে গেল সে।

দূর থেকেই ঘন ঘন ধ্বনি উঠছে: বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্। বৈশাখী বিকেলে ঈশান কোণ থেকে যেমন হু হু করে একটা উত্তরোল আর্তনাদের শব্দ তুলে বয়ে আসে কালো ঝড়, ঠিক তেমনি ভাবেই শোনা যাচ্ছে বন্দে মাতরম্—বন্দে—

ইস্কুলের সামনে প্রায় দুশো আড়াইশো ছাত্র। চারদিকের চারটে ফটক তারা আগলে রেখেছে, পাঁচ-সাতজন করে শুয়ে আছে ফটকের সামনে। যারা ঢুকতে চাও, তাদের মাড়িয়েই যেতে হবে তোমাদের। দুটি চারটি ভালো নিরীহ ছেলে বিপন্নের মতো এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইচ্ছে আছে একটা সুযোগ পেলেই সাঁ করে ঢুকে যাবে ভেতরে। কিন্তু ওই সব গোবেচারী ভালো ছেলেদের ওপরে কড়া নজর আছে সকলের।

ওদের মধ্যে বজ্রী বলে একটা ছেলে কী করে ঢুকে পড়ল ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের ভেতরে।

আর ঢোকবামাত্র আর কোনো কথা নেই, ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্য না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ইস্কুলের দিকে। পেছন থেকে শতকণ্ঠে ধিক্কার উঠল : শেম্—শেম্—

কে একজন বলতে যাচ্ছিল, একবার বেরিয়ে আসুক না ওখান থেকে। চিরকাল তো আর ইস্কুলে বসে অ্যালজাব্রা কষতে পারবে না। একবারটি বেরিয়েছে কি সঙ্গে সঙ্গে এক চাঁটিতে—

কিন্তু আক্রোশটা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করবার আগেই আর একজন কেউ তাকে একটা থাবা দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। বললে, আমরা সত্যাগ্রহী—কোনো রকম ভায়োলেন্সের কথা আমাদের মুখে কেন, মনেও আসতে পারবে না।

একটু দূরেই ইস্কুল কম্পাউণ্ডের ভেতর কালো স্যুট পরে দাঁড়িয়ে আছেন হেডমাস্টার। তাঁর কালো মুখখানা আরো কালো হয়ে গেছে ; চাপা আক্রোশে কোঁচকানো ভ্রূ দুটো চোখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে—হঠাৎ একটা জোরালো আলো চোখে পড়লে যেমন অস্বস্তি বোধ হয়, সেই রকম। সত্যিই তো, বড্ড বেশি জোরালো আলো পড়েছে। সন্ত রায়-সাহেব হয়েছেন হেডমাস্টার—এ আলো তাঁর সহ্য হচ্ছে না। নতুন যুগের নতুন সূর্য উঠেছে ছেলেদের রক্তের ভেতরে, হাজার হাজার চোখে সে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। আর সূর্যকিরণের চেয়ে অতসী কাচের প্রতিফলন যে অনেক বেশি দুঃসহ একথাই বা কে অস্বীকার করবে!

বদ্রীর এই আকস্মিক সাফল্যে হেডমাস্টার যেন অনুপ্রেরণা পেলেন একটা। হিংস্র-ভাবে নিজের ঠোঁটটাকে বার কয়েক চিবিয়ে নিলেন তিনি, তারপর এগিয়ে এলেন ছেলে-দের দিকে। আগুন-ঝরা গলায় ডাক দিলেন : মৃগাঙ্ক!

ফার্স্ট ক্লাসের ফার্স্ট বয় মৃগাঙ্ক ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান ছেলে, আজ পর্যন্ত তার মুখের হাসির কেউ ব্যতিক্রম দেখেনি। মৃগাঙ্ক একমুখ হাসি নিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে কি আপনি কিছু বলতে চান স্যার?

—বলতে চাই? হাঁ—বলতে চাই বইকি।—হতাশাজর্জরিত রুদ্ধস্বরে হেডমাস্টার বললেন, তোমার কাছ থেকে এ আমি আশা করিনি।

—অন্যায় তো কিছু করিনি স্যার।

—অন্যায় করোনি!—বিকৃত ভঙ্গিতে হেডমাস্টার বললেন : পড়াশুনো বিসর্জন দিয়ে ভারতমাতাকে মুক্ত করা হচ্ছে! তা করো—আপত্তি নেই। নিজেরা গোল্লায় যাবে যাও, কিন্তু অন্য ছেলেদের মাথা খাচ্ছ কেন?

সত্যাগ্রহী মৃগাঙ্ক চটল না : আমরা তো আর কারুর মাথা খাইনি স্যার।

—খাওনি?—হেডমাস্টার বললেন, নিজেরা ইস্কুল বয়কট করেছ করো, কিন্তু যারা আসতে চাইছে তাদের বাধা দিচ্ছ কোন্ অধিকারে?

মৃগাঙ্ক তেমনি হাসতে লাগল : মনুষ্যত্বের অধিকারে। অত্যন্ত দুঃখের কথা স্যার,

আপনাকেও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। যেটা সত্য, সেটা অন্যকে বোঝাতে সকলেরই অধিকার আছে স্যার।

—বটে!—হেডমাস্টারের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল: খুব বড় বড় কথা শোনাচ্ছ যে! আচ্ছা বেশ, এ সম্পর্কে আমারও কতটা অধিকার আছে সেটা একবার জানানো দরকার। বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরলেন হেডমাস্টার। উচ্চকণ্ঠে উঠতে লাগল: বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—

মিথ্যেই শাসাননি রায়সাহেব।

আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে এল পুলিস। লাঠিধারী ভোজপুরী আর সশস্ত্র গুর্খার দল। মস্তিষ্কহীন যান্ত্রিক মানুষ—চোখে মুখে ক্লান্ত গ্লানির অপচ্ছায়া।

তরোয়াল ঘুরিয়ে উইণ্ড-মিলের সঙ্গে লড়াই করত কোন্ পাগলা লোকটা? ডন্ কুইক্সোট্। গল্পের বইতে তার ছবি দেখেছিল রঞ্জু—এবার চোখের সামনে তাকে দেখতে পেল।

বাঙালী ডি-এস্-পি—নামটা শুনেছিল, দিগম্বর সাহা। বেগুন-ক্ষেতে কাক-তাড়াবার মতো অস্থিসার চেহারা। আলনায় ঝোলানো জামার মতো শরীরে ঢল ঢল করছে ইউনিফর্মটা। রোগা হাঁটু আর হাড়সর্বস্ব পায়ে জুতোমোজা যেমন বেখাপ্পা, তেমনি বেমানান দেখাচ্ছে—কেন যেন "পুস্ ইন্ বুট্স্"-এর গল্প মনে পড়ে যায়। কোমরে চামড়ার খাপে রিভলভার, গাঁট বের করা আঙুলে সেটাকে আগলে আছেন ডি-এস্-পি; সন্দেহ হয় রিভলভার ছুঁড়বার আগেই আঙুলগুলো প্যাকাটির মতো মট্ মট্ করে ভেঙে যাবে কিনা।

চেরা-গলায় ডি-এস্-পি হুঙ্কার ছাড়লেন। হার্মোনিয়ামের প্রথম আর শেষ রীড্ দুটো একসঙ্গে টিপলে যেমন একটা মিহি-মোটা বিচিত্র দ্বি-স্বর বেরোয়, গলার আওয়াজটা শোনাল ঠিক সেই রকম।

সাদা বাংলায় বললে পাছে ছেলেরা বুঝতে না পারে সেজন্যে দিগম্বর সাহা সাধু ভাষায় বললেন, বালকগণ, তোমরা বে-আইনী কাজ করিতেছ।

উত্তর এল: বন্দে মাতরম্—

—যদি ভালো চাও তো এখনি এখান হইতে প্রস্থান কর।

জবাব এল: মহাত্মা গান্ধী কী জয়—

—শেষবার বলিতেছি, না গেলে লাঠি চালাইবার হুকুম দান করিব। গুলিও চলিতে পারে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে ছেলেরা: ভারত মাতা কী জয়—

হার্মোনিয়ামের দুটো স্বর এবার চারটে হয়ে ঠিকরে বেরুল: লাঠি চার্জ!

লাঠি চলল। প্রথমে পড়ল মৃগাঙ্ক, তারপরে আরো, আরো, আরো অনেকে। দশজন পালাল, বিশজন সম্মুখে এসে দাঁড়াল। রক্তের ছিটে বইল স্রোত হয়ে। বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্। লাঠি চালাতে পারো, গুলি ছুঁড়তে পারো, কিন্তু কণ্ঠরোধ করতে পারো না।

আহত ছেলেদের ঘোড়ার গাড়িতে তুলে ফেলা হল। বাকি জনপঞ্চাশকে একটা মোটা কাছি দিয়ে কর্ডন করে নিয়ে যাওয়া হল কোতোয়ালী থানায়, সেখান থেকে জেলখানাতে। ধুলো আর রক্তের রাজটীকা পরে অকম্পিত পায়ে এগিয়ে চলল ছেলেরা।

রঞ্জু নির্বাক দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

উনিশ শো তিরিশ সালের ছবি। অজস্র, অসংখ্য।

চৌমাথার মোড়ে একটি বেঞ্চি টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল তিন-চারটি খদ্দরের টুপি পরা ছেলে। একজন বলতে শুরু করল : বন্ধুগণ, বিদেশী শাসনের নির্মম অত্যাচারে—

দুদিকের ভিড় সরে গেল। দারোগা ঢুকলেন বাহিনী নিয়ে।

দারোগা বললেন, বক্তৃতা বন্ধ করুন!

ছেলেটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। বলে চলল, নির্মম অত্যাচারে আমরা জর্জরিত হচ্ছি। আজ এই অত্যাচারের জবাব দিতে হলে—

দারোগা বললেন, নেমে আসুন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

এইবার উঠল দ্বিতীয়জন। দারোগা বললেন, আমি নিষেধ করছি, আপনি এখানে কোনো কথা বলতে পারবেন না।

দ্বিতীয় বক্তা কথা বললে না, আবৃত্তি শুরু করলে :

"ওরে তুই ওঠ্ আজি,
আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি।"

—নেমে আসুন—ইউ আর অ্যারেস্টেড্।

তৃতীয় জন বক্তৃতা করলে না, আবৃত্তিও না—সোজা গান ধরে দিলে :

"বন্দে মাতরম্—
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্—"

—আপনাকেও আমি গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি।

ছবির শেষ নেই। একটার পর আর একটা—অসংখ্য গণনাতীত। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য—রঞ্জু এর ভেতরে যেন দর্শক ছাড়া আর কিছুই নয়। রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অসহ্য উন্মাদনায় ছিঁড়ে যেতে চেয়েছে মাথার শিরাপেশীগুলো, তবু কোথায় যেন বাধা পড়েছে তার। এই উন্মত্ত জীবন-স্রোতে তবু সে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারেনি। নিজের

ভেতর একটা বিচিত্র একাকিত্ব—বড়বাবুর ছেলের আশৈশব-লালিত স্বাতন্ত্র্য-বোধ তাকে সরিয়ে রেখেছে। ভরা গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে দেখেছে বন্যাকে, তার ফেনিল ভয়ঙ্কর রূপকে; কিন্তু একটি মাত্র পা এগিয়ে গিয়ে সেই প্লাবনছন্দে মাতামাতি করতে পারেনি তবুও। খোলা জানলার মধ্য দিয়ে যেমন করে দেখেছিল তিরিশ সালের বন্যাকে—ঠিক সেই রকম। কেন? রঞ্জু ঠিক উত্তর দিতে পারে না। আজকের রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় হয়তো বলতে পারত: মনের ভেতর যত প্রচণ্ড হয়ে তার ঝড় জেগে ওঠে, তার কাছে তত ছোট হয়ে যায় বাইরের পৃথিবী। সমস্ত শিরাস্নায়ুগুলোকে উগ্র প্রখর করে দিয়ে, বিনিদ্র উত্তেজিত মস্তিষ্কে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অস্থির ভাবে পায়চারি করে সে নিজের ভেতরে আস্বাদন করতে ভালবাসে বিপ্লবের আবর্তকে; আর অদ্ভুত—বাইরে সে ভীরু, সে সংশয়ী, আত্মকেন্দ্রিক—ব্যক্তি আর অনুভূতি-সর্বস্ব। এখানেও হয়তো প্রশ্ন উঠবে—কেন? শুধু রঞ্জু নয়, রঞ্জুর মতো আরো অনেকের কাছেই হয়তো এ প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যাবে না।

কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ থাক। সত্যিই—ছবির শেষ নেই।

একটা তোবড়ানো আলকাতরার দাগ চটে-যাওয়া বিবর্ণ ছোট সাইনবোর্ড চোখের সামনে ভেসে উঠছে এবারে। কাঁচা অসমান অক্ষরে লেখা রয়েছে: "লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশী মদের দোকান। ভেণ্ডার: হারানিধি পাল। সময়: সকাল আটটা হইতে রাত্রি নয়টা।"

কিন্তু আটটা বাজবার আগেই ভিড় জমে গেছে সেখানে। পিকেটিং চলছে।

একজন বলছে, ভাই, আজ বড় দুর্দিন। মদ খেয়ে দেশের আর সর্বনাশ কোরো না। তোমাদের পায়ে পড়ি, নেশা ছেড়ে দাও—

দশ-বারোটি ক্রেতা জটলা করছে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। বেশীর ভাগই নিম্নশ্রেণীর—ধাঙড়, মেথর জাতীয় লোক। নিম্নবিত্ত ভদ্রলোকও আছে দু-একজন। ফিটফাট বাবুদের মদ কেনাটা এমনিতেই আড়ালে আবডালে চলে, সুতরাং আপাতত তারা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত নেই—রয়েছে নেপথ্যে।

কাউণ্টারে আসীন লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডার হারানিধি পাল বসে আছে প্যাঁচার মতো মুখ করে। গোল গোল মস্ত চশমার আড়ালে চোখ দুটোতে যেন নরখাদকের দৃষ্টি। খালি গা, গলায় সোনার হারের সঙ্গে মস্ত বড় সোনার তাবিজ বুক আর পেটের মাঝামাঝি জায়গায় দোল খাচ্ছে। কুচকুচে কালো রঙের বিপুল বপু জুড়ে নিবিড় রোমাবলীর স্বচ্ছন্দ অভ্যুদয়, অনেকটা অনুসন্ধান করলে হয়তো চামড়ার সন্ধান মিলতে পারে। সবটা মিলিয়ে মনে হতে পারে, যেন শিকারের আশায় থাবা গেড়ে বসেছে একটা ভালুক।

কোমল স্বরে হারানিধি বললে, এ আপনাদের ভারী অন্যায় বাবুমশাই। এমনভাবে যদি আপনারা গরীবের অন্ন মারেন—

পিকেটারেরা তার দিকে ফিরেও তাকাল না। তারা বলে যেতে লাগল : ভাই সব, কথা শোনো। বাড়ি ফিরে যাও—

ক্রেতাদের একজন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। অভ্যস্ত নেশার সময়ে এরকম অবাঞ্ছিত বিঘ্ন ঘটাতে সে খুশি হতে পারেনি। বললে, হামাদের পয়সায় হাম্‌লোগ দারু পিব, তুম্‌হারা কেনো বাধা দিতে আসিয়েছো বাবু?

বাকি লোকগুলো বোধ হয় এই কথাটার জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল এতক্ষণ।

সঙ্গে সঙ্গে কলরব উঠল : সরিয়ে যাও—হামরা দারু পিব—হামাদের খুশি।

পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়াল পিকেটারেরা।

—না, তোমরা মদ খেতে পাবে না।

লোকগুলো চেঁচামেচি করছিল বটে, কিন্তু পিকেটারদের ঠেলে কেউ এগিয়ে যায়নি। কিন্তু রক্তে রক্তে অভ্যস্ত নেশার নিয়মিত দাবি। এগোতে পারছে না, পিছোনোও অসম্ভব। মদ ছাড়া ওদের চলবে না।

হারানিধি আবার কাতরকণ্ঠে বললে, যারা লিতে চাইছে, তাদের লিতেই দিন না। কেন খালি খালি আপনারা ঝামেলা বাড়াচ্ছেন বাবুমশাই?

অবস্থাটা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবেই হয়তো আরো খানিকক্ষণ চলত, কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি ব্যক্তি প্রবেশ করল ঘটনাস্থলে। লম্বা খিট্‌খিটে চেহারার লোক, গায়ে বিলিতী আদ্দির ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবি, কানে একটা সিগারেট। বড় বড় বাবরী চুল, অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল—পরিপূর্ণ লম্পটের চেহারা। লাল চোখ দুটো চরকির মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরছে তার—দুদিন ধরে নেশা করতে না পারায় আপাতত খুন চড়ে উঠেছে তার মাথায়।

দোকানের সামনে এসেই বাবরী-চুল আদেশ করলে, হটো—তফাৎ যাও—

পিকেটারদের ভেতর যে উৎসাহী হয়ে সকলকে বোঝাচ্ছিল এতক্ষণ, সে-ই জবাব দিলে। বললে, কাল তো ফিরে গিয়েছিলে ভাই ব্রিজ্‌বিহারী, আজও তাই যাও।

—কেয়া? ব্রিজ্‌বিহারী কদর্য একটা মুখভঙ্গি করে গাল দিলে অশ্লীল ভাষায়। বললে, নেহি যায়গা, তুম্ ক্যা করোগে শালা?

অপমানে এক মুহূর্তের জন্যে চোখমুখ লাল হয়ে উঠল ছেলেটির। কিন্তু সত্যাগ্রহীর সংযম চক্ষের পলকে আত্মস্থ করে দিলে তাকে।

—তোমাকে অনুরোধ করছি ভাই, ফিরে যাও।

—কেয়া, লৌট্ যাউঙ্গা? কভি নেহি। হটো শালা লোগ্—দিল্লাগিমে কাম ন চলে গা।

—না। তোমাকে মদ কিনতে দেব না।

—হটো—ব্রিজ্‌বিহারীর চোখে হত্যা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

—না।

—না?

নক্ষত্রবেগে মাটি থেকে একখানা থান ইট তুলে নিল ব্রিজ্‌বিহারী—বসিয়ে দিলে সজোরে। অস্ফুট কাতরোক্তি করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ছেলেটি। হাতের ফাঁক দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়তে লাগল, তবু সেই অবস্থায় সে বললে, আমার কথা রাখো ভাই—মদ খেয়ো না।

তখন চারদিকে কলরব উঠেছে ঃ খুন খুন। বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেছে মদ্যপায়ীর দল, ঝরাং করে কাউণ্টারের জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছে হারানিধি। সবাই পালিয়েছে, শুধু পালাতে পারেনি ব্রিজ্‌বিহারী নিজে। মাটির ভেতর থেকে একটা অলক্ষ্য শৃঙ্খল যেন তার পা দুটোকে আটকে ফেলেছে সেখানে।

রঞ্জু ভুলতে পারবে না ব্রিজ্‌বিহারীর সেই মুখ। আড়ষ্ট সংকুচিত হয়ে গেছে—বিবর্ণ রক্তহীন হয়ে গেছে বাসি মড়ার মতো। ছেলেটির রক্তাক্ত মুখের দিকে সে তাকিয়ে আছে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। মাথার ওপরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের ছাদ ভেঙে পড়বার মতো নিজের অপরাধের আকস্মিক চৈতন্যে নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে ব্রিজ্‌বিহারী, ভেঙেচুরে ছত্রাকার হয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রিজ্‌বিহারী থর থর করে কাঁপতে লাগল, তারপর আহত ছেলেটির মতোই দু হাতে নিজের মাথা মুখ ঢেকে বসে পড়ল ধুলোর ওপরে। যেন চৈতন্য অবলুপ্ত হয়ে আসছে তার।

মাতাল, লম্পট ব্রিজ্‌বিহারী নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে। ব্রিজ্‌বিহারী আর কোনদিন মদ খাবে না।

ছবির পরে ছবির শোভাযাত্রা চলে। কিন্তু উনিশ শো তিরিশ সালের সেই গভীর গম্ভীর পরিবেশের মধ্যেও মনে পড়ে, দলপতি ভোনা এবং তার সুযোগ্য পিতৃদেব ভবেন মজুমদারকে।—ঝোড়ো মেঘের এক কোণে একফালি রূপালী রেখার মতো তা ঝলমল করে ওঠে।

আকস্মিক দেশসেবার উত্তেজনায় বেলুনের মতো ফেঁপে উঠেছিল ভোনা; কিন্তু ছোট একটা কাঁটার খোঁচা লাগতেই ফেটে চুপসে গেল সে বেলুন।

দু'রাত্রি হাজতবাস করেই ভোনা টের পেলো কাজটা ভালো হয়নি; এবং দেশপ্রেম বস্তুটি আর যাই হোক, মনসাতলায় মার্বেল ফাটানো কিংবা গোষ্ঠের মেলায় হাতসাফাই করবার মতো সুখের ব্যাপার নয়। ছারপোকা আর কাঁটার মতো খস্‌খসে রোঁয়ায় ভরা কম্বলশয্যা তার পুষ্পশয্যা বলে মনে হল না, মশার কামড়ে চোখ মুখ ফুলে উঠল, 'সোনেকি হিন্দুস্তান' গানটা ব্রহ্মতালুতে গিয়ে আটকে রইল, গলা দিয়ে বেরুলই না আর। অবশেষে

বাপ ভবেন মজুমদার থানাপুলিসে অনেক হাঙ্গাম-হুজ্জুত করে, ছেলেকে বণ্ড লিখিয়ে দিয়ে, স্বদেশী ও কংগ্রেসের বাপ-বাপান্ত করতে করতে পুত্ররত্নকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এল।

কিন্তু আদালতের টাউট ভবেন মজুমদারের রাগটা ওইখানেই থামল না। পরের দিন সকালবেলায় বুকটান করে সে দাঁড়িয়ে গেল মনসাতলার সিমেণ্টের বেদীটার ওপরে। না—বক্তৃতা দিয়ে জেলে যাওয়ার জন্যে নয়, সম্পূর্ণ অন্যরকম উদ্দেশ্যে।

তারপর মুখ ছুটল ভবেন মজুমদারের।

শ্রাব্য-অশ্রাব্য ভাষায় অবিশ্রান্ত গালাগালি। কংগ্রেস চোর, গান্ধী বাটপাড়। স্বদেশী ছোকরারা সব গুণ্ডা আর বদমায়েসের দল। ইংরেজের সঙ্গে চালাকি করতে যায় সব। ঠেঙিয়ে দেবে টিট করে, ভুলিয়ে দেবে বাপের নাম—। তা দিক—তার জন্যে ভবেন মজুমদারের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তার ছেলেকে—এমন হীরের টুকরো ছেলেকে বিভ্রান্ত করেছে কোন্ শয়তান হতভাগারা? তাদের কাঁচা মাথাগুলো আস্ত আস্ত চিবিয়ে খেলে তবেই রাগ মেটাতে পারে ভবেন মজুমদার।

বক্তৃতা হল জমাট—প্রায় ঝাড়া দেড়ঘণ্টা। যারা শুনছিল তারা তখনকার মতো কোনো উচ্চবাচ্য করলে না। কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা হল তার পরের দিন—ভোরের আলো আকাশে ফুটে ওঠবার আগেই।

—ক্যান্-ক্যান্-ক্যান্—

টিন পেটানোর বিশ্রী বেখাপ্পা আওয়াজে পাড়ার লোক জেগে উঠল। আর জেগে উঠল ভবেন মজুমদার—কিন্তু সে জাগরণ আনন্দের নয়—এই যে বৈতালিকেরা তাকে প্রভাতী শুনিয়ে জাগাতে এসেছে এদের উদ্দেশ্য যে একেবারেই সাধু নয় এ সম্বন্ধে ভবেন মজুমদারের সন্দেহ রইল না বেশিক্ষণ।

—ক্যান্-ক্যান্-ক্যান্—

প্রায় পঁচিশ-তিরিশটি পাড়ার ছেলে জড়ো হয়েছে ভবেন মজুমদারের বাড়ির সামনে। আট-দশটা ভাঙা ক্যানেস্তারা কোত্থেকে সংগ্রহ করেছে সব—প্রাণপণে তাই পিটছে তারা। তার প্রলয়ঙ্কর শব্দে যে কোনো লোকের শুধু কান কেন, মাথার পোকা পর্যন্ত বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

টিন পেটানোর দলে আজ রঞ্জুও ছিল।

—এসব কী?—রোষরক্ত লোচনে মজুমদার বললে, অ্যাঁ, কী সব?

উত্তর এল সমস্বরে।

—বন্দে মাতরম্—

—মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়—

—ভারতমাতা কী জয়—

রাগে ভবেন মজুমদার লাফিয়ে উঠল তিড়িং করে। হাত দুই ছিটকে পড়ল একটা বাগ্‌দা চিংড়ির মতো। চিৎকার করে বলল, শালা শূয়ারকা বাচ্চা সব! ভাগো, ভাগো এখান থেকে—

এবার জবাব দিলে ক্যানেস্তারা। ভবেন মজুমদারের কণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে কর্ণপটহবিদারী শব্দ উঠতে লাগল: ক্যান্‌-ক্যান্‌-ক্যান্‌—

ক্যানেস্তারা প্রত্যুত্তর দিলে দ্বিগুণ জোরে।

ভবেন মজুমদার আবার একটা লাফ দিলে শূন্যে। এ অবস্থায় হাই-জাম্প প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে বোধ হয় রেকর্ড করে ফেলতে পারত একটা। বললে, এই ভোনা, এই হারামজাদা, হামরা লাঠি লে আও—

উত্তেজনায় ভবেন মজুমদার ভুলে গিয়েছিল তার ছেলে বাঙালী, হিন্দুস্থানী নয়।

কিন্তু বাপের পেছনে দাঁড়িয়ে ভোনা তখন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ক্যানেস্তারা পার্টির দিকে তাকিয়ে আছে। Thou too Brutus—অ্যাঁ! কাল পর্যন্ত যাদের ওপর তার একচ্ছত্র নেতৃত্ব ছিল, আজ তারাও তার শত্রুপক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে! কালী, খাঁদু, পূর্ণ—তার বিশ্বস্ত অনুচরেরা শেষে ক্যানেস্তারা বাজাতে শুরু করেছে তাদেরই বাড়ির সামনে এসে!

—এই শালা শূয়ারকা বাচ্ছা, শুনা নেই? হামি বোলানা তুম্‌কো লাঠি আনতে?—বলেই ভবেন মজুমদার একখানা দশাসই চাঁটি হাঁকড়ালো ভোনার কানের নিচে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁত্‌ করে উঠেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ভোনা, আর ভৈরব হুঙ্কার ছেড়ে ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মতো ক্যানেস্তারা পার্টিকে তাড়া করলে ভবেন মজুমদার।

ক্যানেস্তারা পার্টি তৈরীই ছিল, চক্ষের নিমেষে হাওয়া। সমস্ত পাড়াটা নিষ্ফল আক্রোশে দৌড়ে ভবেন মজুমদার যখন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল, তখন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তেম্‌নি ক্যানেস্তারা তার সঙ্গে সঙ্গে বাজতে বাজতে আসছে।

ভবেন মজুমদার ঝাঁ করে থেমে দাঁড়াল, আবার তাড়া করল। আবার ফিরল, আবার তাড়া করল। তারপর যখন বেদম হয়ে দাওয়ায় বসে কদর্য গালিগালাজ শুরু করলে, তখন তার কণ্ঠস্বরকে তলিয়ে দিয়ে দশ-দশটি ক্যানেস্তারা তেম্‌নি পরম পুলকে যথাস্থানে এসে আনন্দ-ধ্বনি করছে।

পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা অষ্টপ্রহরের অবিরাম কীর্তনের মতো চলল। ভবেন মজুমদার ঘরে থাকে—বাড়ির চারদিকে ক্যানেস্তারা বাজে; বাজারে যায়, পেছনে ক্যানেস্তারা চলে, উকিলের সেরেস্তায় হাঁটে, পেছনে ক্যানেস্তারা হেঁটে যায়; রাত্রে শোয়ার চেষ্টা করে, জানালার বাইরে ক্যানেস্তারা ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে থাকে। সমস্ত শহরের একটি দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠল ভবেন মজুমদার।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ভবেন মজুমদার ভোনার হাত ধরে আবার সেই মনসাতলায় এসে দাঁড়াল। বললে, ক্ষমা চাইছি, হাত জোড় করছি, ক্যানেস্তারা বন্ধ হোক—আমার প্রাণ যায়।

ছেলের বললে, বলুন, বন্দে মাতরম্—

কাতর স্বরে ভবেন মজুমদার বললে, বন্দে মাতরম্।

—বলুন, মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়—

—মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়!—ভবেন মজুমদার প্রায় কেঁদে ফেললে।

ক্যানেস্তারার নিনাদ বন্ধ হল।

উনিশ শো তিরিশ সাল।

ঝড়ের গতিতে উড়ে বেরিয়ে গেল আইন-অমান্য আন্দোলনের দিনগুলি। চম্পারণে, মেদিনীপুরে জেগে রইল তার চিরন্তন স্বাক্ষর। কারাগারে, নির্যাতনে, রক্তপাতে আরো দৃঢ়মূল করে দিয়ে গেল স্বাধীনতার শপথকে; সন্দেহ রইল না যে এবার যাত্রা শুরু, থেমে দাঁড়াবার উপায় রইল না আর।

বিনিদ্র উত্তেজিত মস্তকে রাতের পর রাত জেগে রঞ্জু আবৃত্তি করে যেত:

"বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে,
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল,
যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল,
এসেছে আদেশ,
বন্দরের কাল হল শেষ—"

জানালা দিয়ে আত্রাইয়ের বন্যা দেখেছিল রঞ্জু, অভিভূত দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিল অসহযোগ আন্দোলনের রূপটাকে। কিন্তু এইবারে এল তার পালা। আর এক নতুন পথে, আগুনজ্বালা রক্তঝরা দুর্গমের দিগন্তে তাকে হাতছানি দিলে উনিশ শো তিরিশ সাল।

সূত্রপাতটা হল আশ্চর্য রকমে।

খবরের কাগজের পাতায় ভয়ঙ্কর সংবাদ এল একটা। চঞ্চল হয়ে উঠল দেশ। —পুরের শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট আততায়ীর রিভলবারের গুলিতে নিহত। সংবাদ ওইখানেই শেষ হল না। একটার পর আর একটা—ডাকলুট, ডাকাতি, হত্যা, বোমা বিস্ফোরণ। ত্রিবর্ণ-পতাকার আলোড়ন-চঞ্চল শান্তিপূর্ণ অহিংস বাংলা দেশের বুকের তলা থেকে আত্ম-প্রকাশ করলে আগ্নেয়গিরি।

তারপর ?

দেশজোড়া স্বদেশী আন্দোলন তখনো পাক খেয়ে যাচ্ছে ঘূর্ণি হাওয়ায়। তখনো দলে দলে সত্যাগ্রহী যাচ্ছে জেলখানার পাঁচিলের আড়ালে, মহিষবাথানের নোনা জলে মিশছে তাদের আহত দেহের রক্ত। সহিষ্ণুতার দেবদুর্লভ শক্তির সঙ্গে চলেছে পশুত্বের লড়াই। এমন সময়—

চট্টগ্রাম! ভারতবর্ষের বুকে জ্বলে উঠল বিপ্লবের রক্তাক্ত আকাশপ্রদীপ!

এ খবর বিশ্বাস করতেও যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় রক্তবহা নাড়ীগুলো। এ কি সত্য—এ কি সম্ভব! শুধু অস্ত্রাগার নয়, চক্ষের পলকে চট্টগ্রামের বুকের ওপর থেকে মুছে গেল ইংরেজ শাসনের কালো কলঙ্ক। মাত্র কয়েকটি তরুণ প্রাণের দীপ্তিতে আর পিস্তলের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল দুশো বছরের জমাট বাঁধা আবর্জনা।

জালালাবাদ, কালারপোল, ধলঘাট, পাহাড়তলী! খবরের কাগজে যেন সুদূর মঙ্গল-গ্রহের অচেনা রহস্যময়তার খবর। মুকুন্দপুর শহরও নাড়া খেয়ে উঠেছে। উত্তেজিত আলোচনা চারদিকে—একই কথা, চট্টগ্রামের কথা। সমস্বরে সকলে বলে, হ্যাঁ, কাণ্ড একটা করলে বটে এই চাটগাঁয়ের ছেলেরা! সাবাস!

কিন্তু সব আবছা রঞ্জুর কাছে—সব দুর্বোধ্য। দুরধিগম্য মঙ্গল-গ্রহই বটে! এরা কারা —কী রকম দেখতে এরা? সাধারণ মানুষ? তাদের মতোই সুখ-দুঃখে-ভয়ে-ভাবনায় ভরা? বিশ্বাস হয় না। এমন দুর্বার যাদের শক্তি—এত দুর্ধর্ষ যাদের সাহস, মরণকে যারা এমন করে পায়ের তলায় দলে যেতে পারে, তারা কি নিতান্তই সাধারণ—একেবারে তাদের মতো হুবহু এক?

এরা কারা? তবে কি এরাই সেই ক্ষুদিরামের দল? মাটির তলায় গুপ্ত কারখানায় এরাই কি তবে প্রস্তুতি নিচ্ছিল দিনের পর দিন?

কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসাও করা যায় না। অন্তত এটা বুঝেছে যে এ প্রশ্ন যাকে-তাকে করা নিরাপদ নয়, তা ছাড়া যাকে বিশ্বাস করা চলে সে হয়তো বেকুব ঠাউরে বসে থাকবে।

অস্বস্তির একটা ঘুণ যেন কুরে কুরে খেতে লাগল বুকের মধ্যে।

একদিন অবশ্য ভোনাকে গুন গুন করে গান গাইতে শুনেছিল :

"আমায় ফাঁসি দিয়ে মা ভুলাবি
আমি কি মার সেই ছেলে,
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে—"

—কার গান, এ কার গান ভোনা? যেন আর্তনাদ করে উঠে জানতে চেয়েছিল রঞ্জু।

—আমি জানি না বাবা—ভোনা সামলে নিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। চোখেমুখে স্পষ্ট দেখা দিয়েছিল ভয়ের ছায়া: জিঞ্জার-মার্চেন্ট, নৌ-জাহাজের খবর—

হতাশায় ম্লান হয়ে রঞ্জু চুপ করে গেল। আভাস পায়, অথচ ধরতে পারে না। এমন কেউ কি নেই যে এই অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে তাকে, সরিয়ে দিতে পারে তার দৃষ্টির আড়াল করা সে পর্দাটাকে?

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ মেনে তারাও চলেছে দেশকে স্বাধীন করতে, শৃঙ্খলমুক্ত করতে ভারতবর্ষকে। কিন্তু কত জোলো তাদের কাজ, কেমন ফিকে—শুধু পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া কিছু যেন করবার নেই তাদের। আর ওদিকে চট্টগ্রাম ঈশানের রক্তমেঘ, আগামী দিগন্তের অগ্নিরাগ।

মারবার পথ না মার খাওয়ার পথ? কিল্ অর্ বী কিল্ড্? ঠিক বুঝতে পারে না। সব ঘোলাটে হয়ে যায়। কোথাও কি দিশারি নেই কেউ—নেই এমন একজন যে তার মনকে সঙ্গ দিতে পারে এখন, একটা গুরুভার নামিয়ে দিতে পারে চেতনার ওপর থেকে?

ছিল বইকি। দিশারি এল জীবনে।

পাড়ার একদল ছেলের সঙ্গে কংগ্রেস ময়দান থেকে প্যারেড করে ফিরছিল রঞ্জু। হঠাৎ একজন জ্বালাভরা গলায় বললে, ওই ছাখ, ভালো ছেলে যাচ্ছে!

সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে ঘুরে গেল সেদিকে। একটা সাইকেলে করে চলেছে পরিমল।

শুনিয়ে শুনিয়ে খাঁদু বললে, হ্যাঁ, বড় হয়ে রায়বাহাদুর হবে। এত বড় ব্যাপারটা হয়ে গেল, ঘর থেকে একবার বেরুল না পর্যন্ত!

পরিমল অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ বোঁ করে ঘুরিয়ে দিলে সাইকেলটা। তার-পর দলটার একেবারে পথ আটকে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

—এই যে দেশপ্রেমিকের দল, ভারতমাতাকে স্বাধীন করে ফিরে এলে তো?

অবাক হয়ে রঞ্জু তাকিয়ে রইল পরিমলের মুখের দিকে। এমন দিনে এই রকম কথা যে কেউ উচ্চারণ করতে পারে এটা যেন কল্পনার বাইরে ছিল। অল্প পরিচয়, মুখ-চেনা বললেই হয়, তবু কেন কে জানে পরিমল সম্পর্কে রঞ্জুর কেমন মোহ ছিল একটা—একটা কৌতূহল ছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর একটা ঘা দিয়ে পরিমল তার মোহভঙ্গ করে দিলে। পরিমল আর যাই হোক—সে যে ভবেন মজুমদারের দলের লোক এতটা ভাববার জন্যে মন তৈরি ছিল না যেন।

জবাব দিলে পূর্ণ: তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

—লজ্জা? কেন?—কৌতুকভরা হাসিতে পরিমলের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তোমরাই তো গান গেয়ে বেড়াও—'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!'

কালী বললে, ধিক্‌।

কিন্তু পরিমল গায়ে মাখল না। তেমনি উজ্জ্বল স্বরে প্রশ্ন করলে, ব্যাপারটা কী? সবাই মিলে এ ভাবে চাঁদা করে আমায় গাল দিচ্ছ কেন?

খাঁদু ঘৃণামিশ্রিত মুখে বললে, বুঝতে পারছ না?

—একেবারেই না। বোঝালে বড় বাধিত হব।

ভোনার অভাবে আজকাল খাঁদুই নেতা। সুতরাং বোঝাতে শুরু করলে।

—আজ দলে দলে দেশের ছেলে জেলে যাচ্ছে। স্বাধীনতা আসছে। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্তে টেরি বাগিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছো। তোমার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

পরিমল বোঝবার ভান করলে: ওঃ তাই নাকি! খেয়াল করিনি তো। তা কী যেন আসছে বললে?

—স্বাধীনতা।

—স্বাধীনতা? আসছে নাকি? কোন্‌ ট্রেনে?

খাঁদুর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু সত্যাগ্রহী হওয়ার ল্যাঠা অনেক। চটলে চলবে না—তাতে ভারতমাতা ব্যথা পাবেন। সুতরাং অহিংস গলায় জবাব দিলে, তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার সময় আমাদের নেই। আমরা কাজের লোক। সরো, পথ ছাড়ো।

পূর্ণ বললে, সামনে আসন্ন স্বাধীনতার রূপ দেখেও তুমি এমন করে ইয়ার্কি দিতে পারছ এটাই আশ্চর্য!

—স্বাধীনতার রূপ? সে কী রকম ভাই!—আবদারের সুরে পরিমল বললে, একটা ছাগলের গলায় খদ্দরের দড়ি আর পিঠে একবস্তা স্বদেশী লবণ—এই কি স্বাধীনতার মূর্তি?

—যা বোঝ না, তা নিয়ে বাজে কথা বোলো না—কালী চটে উঠল।

—আহা-হা, ক্ষেপছ কেন?—পরিমল হাসিমুখে বললে, সত্যাগ্রহীর যে চটতে নেই। আচ্ছা তোমরা তো সবাই অহিংস, আমি যদি তোমাদের প্রত্যেককে একটা করে চাঁটি লাগিয়ে দিই, তোমরা নিশ্চয় তাতে আপত্তি করবে না?

মুখের মধ্যে দাঁতগুলো কিড়মিড় করে উঠল খাঁদুর, কিন্তু ব্যর্থ আক্রোশ। পরিমলের কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এমনিভাবে পাশ কাটিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দলের আর সবাই।

পেছন থেকে ডাক দিলে পরিমল: চললে? হে দেশপ্রেমিকেরা, নিতান্তই যদি যাবে তাহলে যাবার আগে কেউ আমাকে চার আনা পয়সা ধার দিয়ে যাও।

মুখ ফিরিয়ে কালী বললে, কী করবে চার আনা পয়সা দিয়ে?

—গলায় দেবার জন্যে দড়ি কিনব।

এর পর আর কথা চলে না। মুখ গোঁজ করে নিরুপায় স্বেচ্ছাসেবকেরা হাঁটতে শুরু করলে। পেছন থেকে শোনা যেতে লাগল পরিমলের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ।

দু পা এগিয়ে খাঁদু বললে, বিশ্বাসঘাতক !

পূর্ণ বললে, শেম্‌লেস !

কালী বললে, দেশের শত্রু, জাতির শত্রু।

রঞ্জু কিছুই বললে না। রাগ নয়, অনুযোগ নয়, একটা গভীর বেদনাবোধে সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। পরিমলের ভেতরে অসাধারণ কিছু একটা কামনা করেছিল সে—আবিষ্কার করতে চেয়েছিল কোনো একটা আশ্চর্য কিছুকে। নির্জন কাঞ্চন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে কী একটা দুর্বোধ সম্ভাবনা তার চেতনাকে দুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলো কাচের বাসন ভেঙে পড়বার মতো বিশ্রী শব্দ করে মনের ভেতরে কী যেন চুরমার হয়ে গেল তার।

কিন্তু পৃথিবী অনেক বড়—মানুষ অনেক বড়। রঞ্জু সেটা জানল এরই দিন কয়েক পরে। উনিশ শো তিরিশ সাল তার মনের সামনে খুলে দিলে আর একটা মণিকোঠার দরজা।

আট

জংলা বাগানটায় অজস্র ভাঁট ফুল ফুটেছে। বেগুনি রঙের হালকা একটুখানি ছোঁয়া-লাগা রাশি রাশি শাদা ফুলে যেন চারদিক আলো করে দিয়েছে, মধুর একটা বুনো গন্ধ সব কিছুকে রেখেছে আচ্ছন্ন করে। রেললাইনের ওপারে একটা ন্যাড়ামুড়ো মাদার গাছ—এখান থেকে মনে হয় তার সারা গায়ে লাল রঙের তুলি ঝেড়ে ছিটে দিয়েছে কেউ। আমের মুকুল থেকে শুকনো পাতার ওপরে টপ টপ করে মধু পড়বার শব্দ। বসন্ত।

রঞ্জু চুপ করে বসে ছিল ছাইগাদাটার পেছনে। উড়তে উড়তে হঠাৎ এল হলদে রঙের একটা বড় প্রজাপতি, সেয়াকুল কাঁটার হলদে ফুলের দুটো উড়ন্ত পাপড়ি যেন। কানের কাছ দিয়ে বোঁ করে চলে গেল নীলাভ কালো রঙের মস্ত বড় একটা ভ্রমর। গোটা তিনেক শালিক পাখি নাচতে নাচতে এগিয়ে এল, কিচ্ কিচ্ করে, রঞ্জুকে যেন জিজ্ঞাসা করলে, কী ভায়া, এমন চুপচাপ যে ? ব্যাপারটা কী ? আমাদের দুটো-চারটে ঢিল পাটকেল মার-বার মতলব নাকি ? কোথা থেকে তীব্র মিহি গলায় একটা চিল চেঁচিয়ে উঠল—যথাকালে বোধ হয় মরা ইঁদুর-টিঁদুর কিছু জোটেনি, খুব সম্ভব ক্ষিদে পেয়েছে ওর। বাতাবী লেবু গাছটার কালো কোটরের ভেতরে এক জোড়া ভাঁটার মতো উজ্জ্বল গোল চোখ দেখা যাচ্ছে—ওখানে দুটো প্যাঁচা থাকে। চোখ বড় বড় করে বোধ হয় বলবার চেষ্টা করছে—বেলা ডুবতে আর দেরি কত।

বেশ লাগে। বেশ লাগে এখানে নিরিবিলিতে এমনি করে বসে থাকা। কেমন যেন হয়ে গেছে, পাড়ার কারুর সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না, ভালোও লাগে না! স্বদেশী আন্দোলন মরে গেছে, আবার ফিরে আসছে সেই পুরোনো, সেই স্বাভাবিক দিনযাত্রা! আজ রবিবার—মনসাতলায় তেমনি চিৎকারের সঙ্গে মার্বেল খেলা চলছে, তেমনি আনন্দ-ভরে উঠেছে বাঘ-বন্দীর কোলাহল। শুধু রঞ্জুর মন যেন পাখা ঝাপটে ফিরছে শূন্য আকাশে। কী একটা চাই, কিছু একটা একান্তই দরকার। যখন সমস্ত দেশটা একসঙ্গে ত্রিবর্ণ পতাকার শপথ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, তখন দূরে দাঁড়িয়েছিল রঞ্জু, দেখেছিল দর্শকের অভিভূত একটা দৃষ্টি নিয়ে, ভাবতে চেষ্টা করেছিল—বুঝতে চেয়েছিল সমস্তটাকে। আজ ভাবনা শেষ হয়ে গেছে, বোঝা হয়ে গেছে সব কিছু। মনের দিক থেকে সে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে উঠেছে এখন। কিন্তু এখন আন্দোলন থেমে গেছে—এখন সন্ধি, এখন শান্তি। এখন তার কিছু করবার নেই।

মিটে গেছে অহিংস লবণ আন্দোলন। উনিশশো ত্রিশ সালের ৬ই এপ্রিল ডাণ্ডী অভিযানকে কেন্দ্র করে যে বিপ্লব সূচিত হয়েছিল, একত্রিশ সালের ৪ঠা মে তার অকালমৃত্যু ঘোষিত হয়ে গেল। স্বাক্ষরিত হল গান্ধী-আরউইন চুক্তি।

একদল বলছে, ভালোই হল, বেশ সম্মানজনক চুক্তি হল একটা।

লজ্জায় মাথা নিচু করে থেকেছে আর একদল। দুঃখে, অপমানে মুখ দিয়ে কথা ফোটেনি তাদের। বেজেছে যুদ্ধের বিউগল, সৈনিকের হাতে ঝলসে উঠেছে তলোয়ার। রক্তে জেগেছে তরঙ্গ। তখন যেন সেনাপতি আদেশ করেছেন সেই তলোয়ার শত্রুর পায়ের নিচে রেখে তাকে প্রণাম করতে!

আগুন জ্বলেছিল দেশজোড়া মানুষের মনে। কামার-কুমোর, চাষা-মজুর—এমন কি মাতাল লম্পট ব্রিজ্‌বিহারীর পর্যন্ত। কিন্তু ঘৃণার এত বড় আগুনকে কেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলেন সেনানায়ক গান্ধী? জনগণের মনের ওপর যাঁর এত বড় আসন, তিনি কেন বিশ্বাস করতে পারলেন না জনশক্তিকে?

প্রতিবাদ আসে মনে—কিন্তু জোর করে বলতে পারে না কেউ। মহাত্মা গান্ধী—নামটাই যাদুমন্ত্র। মন্ত্রমুগ্ধই হয়ে থাকে মানুষ—ঝিমোতে থাকে নেশাখোর টিয়াপাখির মতো।

একটা ছবি আজও ভাসছে রঞ্জুর চেতনায়। সে ভালো ছেলে মৃগাঙ্কের ছবি। স্কুলে পিকেট করতে গিয়ে পুলিসের লাঠিতে মাথা চৌচির হয়ে গিয়েছিল, তবু তার মুখের হাসি ফিকে হয়নি সেদিন।

অনেকদিন পরের কথা। মৃগাঙ্ক তখন ইন্‌সিয়োরেন্সের দালাল। খদ্দরের পাঞ্জাবির মলিন আচ্ছাদনের নিচে দারিদ্র্যজীর্ণ দেহ। পুরোনো ভাঙা হার্কিউলিস্ সাইকেলে ক্যাচ্ ক্যাচ্ করে শব্দ ওঠে তার।

রঞ্জু জিজ্ঞাসা করেছিল, পড়াশুনো ছাড়লেন ? নষ্ট করলেন এমন ভালো ক্যারিয়ার ?

অত্যন্ত বিশীর্ণভাবে হেসেছিল মৃগাঙ্ক। জবাব দেয়নি।

—কী করছেন এখন ?

মুখের ওপর সেই বিষণ্ণ হাসিটা টেনেই মৃগাঙ্ক বলেছিল, দেখতেই পাচ্ছ দেশের লোককে ইন্সিয়োরেন্সের উপকারিতা বোঝাচ্ছি।

—পলিটিক্স ?

—কী হবে ? কোন মানে হয় না—কেমন যেন নিভন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল মৃগাঙ্ক।

—হঠাৎ এমন করে ফুরিয়ে গেলেন কেন ?

—কী করব ? গাছে তুলে দিয়ে বার বার মই কাড়লে কী আর করা যাবে বলো ? কম্প্রোমাইজ্ আর কম্প্রোমাইজ্। সকলেরই সব রইল, জলের মাছ জলে গেল—মাঝখান থেকে আমার ভবিষ্যৎটাকে আমি নিজের হাতে ভেঙে চুরমার করলাম। কেন বুঝিনি বার্দোলির শিক্ষা ? চৌরিচৌরার মানে ?—দেবতার পথ দিয়ে মানুষ কখনো চলতে পারে না—অন্যমনস্ক স্বরে মৃগাঙ্ক বলে।

সবটা না বুঝেও অন্তত মৃগাঙ্ককে বুঝতে পেরেছিল রঞ্জু। তিরিশ সালের এপ্রিল মাসে লাঠির ঘায়ে যার মাথা ফেটে রক্ত পড়েছিল, এ সে মানুষ নয়। এ তার 'মমি'—একটা চলন্ত শবদেহ। প্রাণ নেই, বোধও নেই কোথাও।

মৃগাঙ্কের চোখ চমকে উঠেছিল হঠাৎ : শুনছি তোমরাও কাজ করছ। খুব ভালো, খুব খুশি হলাম। কিন্তু দোহাই তোমাদের, ধার্মিক হয়ো না, আত্মশুদ্ধির চিন্তায় আকুল হয়ো না। তা হলেই বাঁচতে পারবে। আর সেই সঙ্গে যে ভুল আমরা সেদিন করেছিলাম, তারও প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবে।

রঞ্জু দাঁড়িয়েছিল স্তব্ধ হয়ে—একটা কথা মুখে আসেনি এই অপমৃত্যুর রূপ দেখে। মৃগাঙ্ক কাছে এগিয়ে এসেছিল, সমস্ত চোখেমুখে একটা বীভৎস দীনতা ফুটিয়ে রঞ্জুকে বলেছিল, আট আনা পয়সা ধার দিতে পারো আমায় ? কাল শোধ দেব। বাজারের পয়সা নেই আজ।

আট আনা দিয়েছিল রঞ্জু—মৃগাঙ্ক আর তা শোধ করেনি। শোধ যে করবে না তা পূর্ব সংস্কারেই বুঝতে পেরেছিল ও।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। এখন কিছু করা চাই। ভোনা, কালী, পূর্ণ, খাঁদু যত সহজে এগিয়ে গিয়েছিল, তত সহজেই আবার নিজেদের জায়গাতে ফিরে এসেছে—ভুলে গেছে অবলীলাক্রমে। কিন্তু রঞ্জুর তো তা নয়। ঝড় যখন থামল তখন তার ঘা এসে লাগল তার বুকের মধ্যে। দেরি করে এসেছে বলেই যেতে চাইছে না। আর মাত্র সাত-

আট মাসের মধ্যে যেন অবিশ্বাস্যভাবে বড় হয়ে উঠেছে সে।

কী করবে? কিছু জানে না। আজকাল তার আজগুবী খেয়াল জেগেছে একটা—লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখে। মিষ্টি কোমল কবিতা নয়। জীবনে যাকে সে রূপ দিতে পারল না, কবিতার ভেতর দিয়ে ধরতে চায় তাকে। বসাতে চেষ্টা করে ভালো ভালো শব্দ: রুদ্র, নটরাজ, ঈশান, বিষাণ, বহ্নি, শোণিত, আহব। চট্টগ্রাম প্রেরণা দিয়েছে তাকে।

লেখার চাইতে আরো ভালো লাগে কবিতার বই। সেদিন একটা বই এনেছিল পাশের যতীনবাবুর বাড়ি থেকে: "সবহারাদের গান"। আশ্চর্য লেগেছে তার কতগুলো লাইন:

"বাহিরিয়া এসো বন্ধু, আসিয়াছে মুক্তির আহ্বান,
সাগরের কূলে কূলে দুলে দুলে তরুণ নিশান
ডাকিছে তোমারে সখে, দেশে দেশে সাজে বীরদল,
দিকে দিকে ধ্বনিতেছে তরুণের রণ কোলাহল—"

শুধু ওই নয়। আরো অনেকগুলি কথা আছে, আছে অপরিচিত নাম, যাদের অর্থ পরিস্ফুট নয় রঞ্জুর কাছে। না হোক, সমুদ্র-ঢেউয়ের গম্ভীর গর্জনের মতো বিশাল দুর্বোধ্য কণ্ঠে কিছু একটা যেন বলবার চেষ্টা করে তারা। ভয় করে, ভালোও লাগে:

"মিশরের জগলুল, সাথে যায় বীর ডি-ভ্যালেরা,
সানিয়াৎ সেন-মন্ত্রে চলে নব দীক্ষিত চীনেরা।
সব আগে ওই চলে গুর্জরের তাপস-নির্ভয়,
মৃদুতায় মেষশিশু, পরাক্রমে কেশরী দুর্জয়!
সত্যাগ্রহ ধ্বজা করে পিছে চলে কোটি নর-নারী,
জেগেছে ভারতবর্ষ—সাবধান, ওরে স্বেচ্ছাচারী—"

সাবধান, ওরে স্বেচ্ছাচারী। বার বার আওড়াতে ইচ্ছে করে পংক্তিগুলোকে। চট্টগ্রাম! অমর অগ্নিযজ্ঞের রক্তাক্ত ইতিহাস। বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে অশ্বিনীর সেই গবেষণা: এরাই তবে 'নিখিলিস্ট'!

বৈরাগী এসেছিল বাড়িতে কিছুদিন আগে। একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল ননীচোরা যশোদা দুলালের গান। চমৎকার মিষ্টি লোকটির গলা। রঞ্জু তাকে একমুঠো চালের সঙ্গে দুটো পয়সাও দিয়েছিল।

খুশি হয়ে বৈরাগী বলেছিল, আরো গান শুনবে খোকাবাবু? স্বদেশী গান?

স্বদেশী যুগ। আগ্রহভরে রঞ্জু বলেছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বদেশী গানই শোনাও।

একতারায় ঝঙ্কার দিয়ে বৈরাগী গান ধরেছিল:

"একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি!
অভয়রামের দ্বীপান্তর মা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
লাট সাহেবকে মারতে গিয়ে মারলাম ভারতবাসী।
বারো বছর পরে
জনম নেব মাসীর ঘরে মাগো,
চিনতে যদি না পারো মা, দেখবে গলায় ফাঁসি—"

বৈরাগীর অজ্ঞতা আর কল্পনার বহর মনে করলে আজকে রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের হাসি পায়। কিন্তু রঞ্জু—সেদিনের ছোট রঞ্জুর হাসি পায়নি। একটা উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনায় চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল তার—বুকের ভেতরে ঘোড়া ছুটে আসবার শব্দের মতো কী একটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। বড় বড় চোখ মেলে আগ্রহ-ব্যাকুল রঞ্জু জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা বৈরাগী, তুমি জানো অভয়রাম কে, ক্ষুদিরামই বা কে?

বৈরাগী বলেছিল, ওই গানেই তো আছে।

—না, না, তুমি বলো।—রঞ্জুর স্বরে আকুলতা প্রকাশ পেল: আচ্ছা, সত্যি বলো তো, ক্ষুদিরামের কি ফাঁসি হয়েছে?

ছেলেমানুষি প্রশ্নে বৈরাগী কৌতুক বোধ করেছিল: ফাঁসি না হলে তো গানই হত না খোকাবাবু।

—কক্ষনো নয়, কিছু জানো না তুমি। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়নি। মাটির নিচে তার বোমার কারখানা আছে।

হঠাৎ ভয় পেয়েছিল বৈরাগী। ভয় পেয়েছিল ভোনার মতই। চারদিকে চুরি করা চোখ মেলে দেখে নিয়েছিল একবার—এই সাংঘাতিক ছেলেটির ভয়ঙ্কর কথা কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে কিনা। তারপর তাড়াতাড়ি বলেছিল—গান গানই খোকাবাবু, আমরা গরীব মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—অত খবর জানব কোত্থেকে?

গোপীযন্ত্রে দ্রুত ঝঙ্কার তুলে বৈরাগী চলে গিয়েছিল:

"নাচে আমার মাখন চোরা ননী লয়ে হাতে—"

একটা অতৃপ্ত হতাশায় ভরে গিয়েছিল মনটা। বিশ্বাস হয় না—বিশ্বাস করতে ইচ্ছেও হয় না। হতেই পারে না ক্ষুদিরামের ফাঁসি। বছরের পর বছর ধরে মাটির তলায় নিঃশব্দে তার কারখানার কাজ চলেছে। অবশ্য মাটির তলায় কারখানা থাকা কতটা সম্ভব কে জানে, তবু দু-একটা ডিটেকটিভ বইতে পড়েছে কত রহস্যভরা গুপ্তঘরের কথা। সেই রকম কোনো একটা অলখ্-পুরী থেকে একদিন উঠে আসবে কামান—একদিন ভেঙে-চুরে শেষ করে দেবে সমস্ত, একদিন—

একা একা ছাইগাদাটার পাশে বসে এসব ভেবেছে রঞ্জু, ভেবেছে নির্জন কাঞ্চন নদীর

ধারে, বৈঁচিবনের নিচে বিছানো মখমলের মতো নরম ঝুরোবালির ওপরে বসে। আর ভয় নেই কাঞ্চন নদীকে ; লোহার পুলের তলা থেকে কালীমূর্তি উঠে আসবে খেটক-খর্পর নিয়ে—এগুলিকে নেহাৎ ছেলেমানুষি আতঙ্ক বলেই মনে হয় এখন। নদীর নীল নির্মল জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের ভেতরে এই সব কথা নিয়েই আলোচনা করেছে রঞ্জু—ভেবেছে ক্ষুদিরামের কথা, তার কারখানার কথা।

আজও এলোমেলোভাবে এই সমস্তই মনের মধ্যে পাক খেয়ে ফিরছিল। 'জেগেছে ভারতবর্ষ, সাবধান, ওরে স্বেচ্ছাচারী' কিন্তু একটা ক্ষোভ তাকে পীড়ন করেছে, কাঁটার মতো ফুটছে একটা বিশ্রী অস্বস্তি। সত্যিই কি জেগেছে ভারতবর্ষ? যদি জাগলই, তবে এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল কেন?

—রঞ্জু?

কে ডাকে? চকিত হয়ে ঘাড় ফেরালো। এখানে, এই নিরিবিলি খিড়কির বাগানে আবার কে এসে হানা দিয়েছে? বিরক্তি বোধ হয়।

কিন্তু যে ডাকছিল তার দিকে চোখ পড়তেই সে বিরক্তি আর রইল না—কপালের মেঘ কেটে গিয়ে আলো হয়ে উঠল সমস্ত মুখ—বিস্ময়ে আর খুশিতে।

একটু দূরে পরিমল দাঁড়িয়ে।

—পরিমল? আয় আয়—

হাসিমুখে পরিমল এগিয়ে এল।

—অনেক খুঁজে তোকে আবিষ্কার করা গেল। বাপরে, যা জংলা বাগান—গোরু হারালে পাত্তা মেলে না। বেশ চমৎকার জায়গাটা বার করেছিস তো?

রঞ্জু শুধু হাসল।

—ঝোপ-ঝাড়ের ওপরে তোর খুব ঝোঁক আছে দেখছি! একটা গাছের ছায়াতে যেখানে রোদের তাপ না পেয়ে খানিকটা হলদে রঙের বিবর্ণ ঘাস উঠেছে, সেইখানে পা ছড়িয়ে বসল পরিমল।—সেদিন দেখলাম একা একা নদীর ধারে ঘুরছিস, আজ দেখছি চুপচাপ বসে আছিস বাগানে। ব্যাপার কি রে? একেবারে ভাবুকের মতো চাল-চলন, কবিতা-টবিতা লিখিস নাকি?

চমকে উঠল, মুখের ওপরে খেলা করে রক্তের উচ্ছ্বাস। অন্তর্যামী নাকি পরিমল? তার কবিতার খাতা এখনো একান্তভাবে তারই নিজস্ব জিনিস—পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো মানুষকে সে খাতা দেখানোর উৎসাহ তার নেই, সাহসও না। একটা গোপন অপরাধের মতো—গোষ্ঠের মেলায় চুরি করে আনা সেই সাবান আর সুতোর গুলির মতো এ তার মনের ভেতরেই লুকিয়ে রাখবার ব্যাপার।

কী জবাব দেবে, সেটা ভেবে ঠিক করবার আগেই প্রসঙ্গটা বদলে দিলে পরিমল।

মনের ওপর থেকে নেমে গেল একটা অস্বস্তির বোঝা।

পরিমল বললে, তোকে একটা কথা বলবার জন্যে খুঁজছিলাম রঞ্জু।

—কী কথা?—বিস্মিত কৌতুকে চোখ তুলল। একবার আপাদমস্তক দেখে নিল পরিমলের। দিব্যি ঝকঝকে চেহারা—সে যে বড়লোকের ছেলে এ কথা কাউকে না বলে দিলেও চলে। নিখুঁত করে আঁচড়ানো চুল, গায়ে একটা ফর্সা হাফসার্ট, পায়ে চকচকে চামড়ার চটিজুতো। একটা ব্যবধান আছে—সুস্পষ্ট ব্যবধান আছে; শুধু রঞ্জুর সঙ্গে নয়—পাড়ার সকলের সঙ্গেই। ওকে কাছে পাওয়ার কথা, ভোনা কিংবা খাঁদুর মতো ওর সঙ্গে মার্বেল খেলার কথা মনেও পড়ে না। তবু ওর ভেতরে কিছু একটা আছে—যা মনকে টানে, ওর দুটো চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কী একটা আশ্চর্য সম্ভাবনা বুঝি লুকিয়ে রয়েছে তাদের ভেতরে। কিন্তু একটা ব্যথাবোধও আছে—সূক্ষ্ম একটা অনুযোগ জেগে আছে কোনোখানে। যেমন আশা করেছিল ঠিক সেটা পায়নি—কোথাও মোহভঙ্গ হয়ে গেছে তার।

মনে পড়েছে। সেই কংগ্রেস ময়দান থেকে প্যারেড করে আসবার দিন—

কিন্তু আজ রঞ্জু কোনো কথা ভাববার আগেই পরিমল ভাবছে। বললে, আমার ওপর চটেছিস, না রে?

—কেন? চটব কেন?

—বাঃ, সেদিন? তোরা সব প্যারেড করে আসছিলি, আমি ঠাট্টা করেছিলাম?

ক্ষুণ্ণ গম্ভীর গলায় রঞ্জু বললে, তাতে চটবার কী আছে? তুমি এসব পছন্দ করো না, তোমার সঙ্গে আমাদের মত মেলে না। সেজন্য রাগ করে তো লাভ নেই।

একটা শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করছিল পরিমল—কিছু একটা ভাবছিল। রঞ্জুর কথাটা শুনেছে অথচ যেন তার মানে বুঝতে পারেনি, এমনি একটা ফাঁকা দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল খানিকটা। তারপরে আস্তে আস্তে বললে, তোদের বিশ্বাস আছে, স্বাধীনতা আসবে?

—কেন আসবে না?—রঞ্জু হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠল: তিরিশ কোটি লোক জেগে উঠেছে। তারা আর পড়ে পড়ে পরাধীনতার অপমান সইবে না।

পরিমল মৃদু হাসল।

—তা হলে এই তিরিশ কোটি জেগে-ওঠা লোক কী করবে এখন?

—লড়াই করবে ইংরেজের সঙ্গে।

—লড়াই করবে? বেশ, খুব ভালো কথা—এর চেয়ে ভালো কথা আর কিছুই হতে পারে না। আমি শুধু জানতে চাইছি—এই লড়াইটা হবে কী উপায়ে?

—কেন?—মুখস্থ করা কথাগুলো রঞ্জু আউড়ে যেতে লাগল: অহিংস আত্মত্যাগে। আইন-অমান্য আন্দোলনে। বিদেশী বয়কট করে।

পরিমল বললে, কথাগুলো শুনতে মন্দ নয়—পুণ্যি হয়। কিন্তু ওরা যদি গুলি চালায়? মারে?

—মরব। কত আর মারবে? মরতে মরতেই স্বাধীনতা আসবে।

এবার খিলখিল করে হেসে উঠল পরিমল: তা হলে পাঁটা আর মুরগীর স্বাধীনতা এল না কেন আজ পর্যন্ত? পৃথিবীর প্রথম দিনটি থেকে এ অবধি ওরাই তো মরেছে সব চাইতে বেশি!

—কিন্তু ওরা খাদ্য—পরিমলের জেরার ধরনে রঞ্জু ক্রমশ বিব্রত হয়ে উঠছিল: মানুষ তো আর খাবার জিনিস নয়। তা ছাড়া ওরা প্রতিবাদ করতে পারে না, মানুষে প্রতিবাদ করতে পারে।

পরিমল বললে, সে প্রতিবাদ কি সহিংস?

—না, অহিংস।

—তা হলে বলির পাঁটা কাঠগড়ায় ফেলবার সময় যে ব্যা ব্যা করে ডাকে, সেটাও তো অহিংস প্রতিবাদ?

—কী মুশকিল! মানুষ আর পাঁটা তুমি একভাবে দেখছ কেন?

পরিমল রঞ্জুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল অপলক-দৃষ্টিতে: তোমার কি বিশ্বাস ওরা আমাদের মানুষ বলে মনে করে কখনো?

—করে না?

—নিশ্চয় না—কথাটার ওপরে অস্বাভাবিক একটা জোর দিলে পরিমল: করে না। তাই কথায় কথায় ওরা আমাদের লাথি মারে, আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে পোষা কুকুরকে রুটি খাওয়ায়। দুনিয়ার কালো জাতিদের ওপরে ওদের কোনো দরদই নেই। শিকার করার আনন্দে ওরা আফ্রিকায় গিয়ে কালো মানুষগুলোকে গুলি করে মারে। আমেরিকার নিগ্রোদের ওপরে চালায় অকথ্য অত্যাচার। অস্ট্রেলিয়ায় সুখের রাজত্ব গড়তে গিয়ে ওরা সে দেশের লোককে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দিয়েছে।

ক্ষিপ্রবেগে একটা উল্কা ছুটে গেল রঞ্জুর শরীরের মধ্য দিয়ে। এ কে কথা কইছে? এ কোন্ পরিমল?

পরিমল বলে চলল, তুই বলছিলি, মানুষ খাদ্য নয়। কে বললে নয়? মানুষের চাইতে ভালো খাদ্য কি আর কিছু আছে? কালো মানুষের সর্বস্ব গ্রাস করে রাজার হালে কাল কাটায় ওরা। আমাদের সব কিছু লুটে-পুটে নিয়ে ওদের লণ্ডন ঝলমল করে ওঠে। ওরা বলে, আফ্রিকার লোকে নর-মাংস খায়। দু-দশটা মানুষকে তারা খায়—আর এরা খাচ্ছে কোটি কোটি মানুষকে। তারা যদি বর্বর নরখাদক হয়, তা হলে এদের সভ্যতাটা কী রকমের?

বদলে গেছে পরিমল—এ নতুন পরিমল। গলার স্বর অল্প অল্প কাঁপছে, চকচক ঝক-ঝক করছে চোখ দুটো, প্রত্যেকটা কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন কণায় কণায় ঠিকরে পড়ছে আগুন: অহিংসা দিয়ে এদের রুখতে পারবি রঞ্জু? একটা গোখরো সাপ ফণা তুলে এলে তুই কি হাত জোড় করে বলতে পারবি, ছাখো বাপু, হিংসেটা বড় খারাপ, তুমি এই তুলসীপাতাটা খেয়ে বোষ্টম হও, তারপর ঘরে গিয়ে দিনরাত 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' বলে কেত্তন গাইতে থাকো?

—কিন্তু ওরা তো সাপ নয়।

—না। সাপের চাইতেও ওরা সাংঘাতিক। আমরা মানুষ নই—পশু; ওরা মানুষ নয়—নরখাদক। আমরা যদি মানুষ হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারি তবে ওরাও মানুষ হবে—নইলে নয়।

—সেটা কি অহিংসা দিয়ে হতে পারে না?

—না। কোনোকালে পৃথিবীর কোনো দেশে তা পারেনি। আজও পারবে না।

—তা হলে?

—তা হলে মার খেয়ে পড়ে থাকাই সার হবে। যা এবারেও হল।

তর্কে হেরে যাওয়া জেদীর মতো ঘাড় নাড়তে লাগল রঞ্জু: তোর কথা আমি মানি না।

—বেশ তো, মানা না মানা সে তো তোরই হাত। কিন্তু দুঃখ কী জানিস? চোখ বুজে যারা যুক্তিকে অস্বীকার করে, তাদের দুর্গতি কোনোকালে ঘোচে না।

পরিমল চুপ করল, রঞ্জু চুপ করে রইল। বাগানটা নির্জন। শেয়াকুল কাঁটার হলদে ফুলের পাতলা পাপড়ির মতো পাখনা মেলে সেই প্রজাপতিটা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, আমের গাছে শিস্ দিচ্ছে দোয়েল, মুকুলের টাটকা ভাঙা মধু খেয়ে তারও নেশা লেগেছে হয়তো। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ধুতরো ফুলের গন্ধ, ভাঁট ফুলের গন্ধ। ওদিকের জংলা আমগাছটায় বেয়ে বেয়ে উঠেছে বুনো কাঁকরোলের ঝাঁকড়া একটা লতা, দু-তিনটে মস্ত কাঁকরোল পেকে টুকটুকে হয়ে হাওয়ায় দুলছে রঙীন বেলুনের মতো। বহুদূর থেকে গুম্ গুম্ করে একটা চাপা অস্পষ্ট শব্দ আসছে—একটু আগেই যে মালগাড়িটা সামনের রেল লাইন দিয়ে বেরিয়ে গেল, সেটা এখন কাঞ্চন নদীর পুলটা পার হচ্ছে বোধ হয়।

কয়েক মিনিট কেটে গেল চুপচাপ। হাত বাড়িয়ে একটা ভাঁট ফুলের ডগা ছিঁড়ে আনল পরিমল, তারপর আস্তে আস্তে বললে, তুই বই পড়তে ভালবাসিস রঞ্জু?

রঞ্জু কথাভরা বোবা চোখে তাকালো। সুরটা নতুন ঠেকছে।

পরিমল আবার বলে, পড়ার বই ছাড়া আর কিছু তোর ভালো লাগে? উপন্যাস পড়িস?

—পড়ি বইকি। বাবার আলমারি থেকে চুরি করে আনি।

—শরৎচন্দ্রের বই পড়েছিস ?

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো ? অনেক বই পড়েছি তার। দত্তা, শ্রীকান্ত, বিন্দুর ছেলে—

ভাঁটফুলের মঞ্জরীটা নিজের মুখের ওপরে বুলোতে লাগল পরিমল : বেশ লেখে লোকটা, তাই না ?

—চমৎকার।

পরিমল আবার চুপ করে রইল। তারপর আবার মৃদুস্বরে বললে, শরৎচন্দ্রের একখানা বই আছে, নাম শুনেছিস কখনো ? 'পথের দাবী' ?

—'পথের দাবী' ? না, শুনিনি তো।

—পড়বি বইটা ?

—দেবে ?—মন লোলুপ হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ।

—দেব, কিন্তু এখন নয়।—পরিমল বললে, তার আগে তোকে আরো খানকয়েক বই পড়তে হবে, নইলে সে বইটার মানে ঠিক বুঝতে পারবি না।

—বেশ তো, দাও না বই। সাগ্রহে রঞ্জু বললে, আজই দেবে ?

—আজই ?—পরিমল আবার একটু চুপ করে রইল : আচ্ছা, আয় তবে আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

—কেন ?—পরিমল উজ্জ্বল ভাবে হাসল : আমাদের বাড়িতে। বই তো আর আমি সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছি না। তা ছাড়া—পরিমলের কথার ভেতরে একটা অস্পষ্ট গোপনতার ইঙ্গিত ফুটে বেরুল : সঙ্গে করে নিয়ে বেরুনোর মতো বইও সেগুলো নয়। একটু লুকিয়েই পড়তে হবে—ধরা পড়লে একেবারে সর্বনাশ।

—সর্বনাশ ? কেন ?

—সেটা পরে বুঝতে পারবি—পরিমলের কথায় ইঙ্গিতটা যেন চোখের চাউনিতেই এবারে পরিষ্কার হয়ে উঠল : আয় আমার সঙ্গে।

—তোদের বাড়িতে ?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। কেন, তোর লজ্জা করছে নাকি ?

—ধ্যেৎ, লজ্জা আবার কিসের ?—লজ্জিত মুখে রঞ্জু উঠে দাঁড়ালো।

পাড়ার সব চাইতে বড়লোকের মস্ত বড় বাড়িতে প্রথম পা দিল সে।

পরিমলেরা বড়লোক। কিন্তু কত বড়লোক সেটা ধারণা করবার জো ছিল না এতদিন। বিচিত্র চেহারার একটা মস্ত বড় ফটক—পরিমল পরে বলেছিল ওটা নাকি

বানগড়ের নাগ-দরজার অনুকরণে তৈরি। দুদিক থেকে দুটো মস্ত মস্ত সাপ উঠে মাথার ওপরে একসঙ্গে ফণা মিলিয়েছে—সেখানে কালো পাথরের একটা পদ্ম বসানো। চারদিকে ঢেউ খেলানো নিচু পাঁচিল, ভেতরে ফুলের বাগান। লাল সাদা গোলাপে, স্থলপদ্মে, বড় বড় ম্যাগ্নোলিয়ায় আর নানা রঙের অজস্র ক্রোটনে বাগান আলো হয়ে আছে। লাল সুরকির ফালি ফালি পথ, হেনার ছায়াঘন কুঞ্জের ভেতরে দু-তিনটে বসবার বেদী। এক কোণে সমান করে ছাঁটা চিকন-সবুজ ঘাসের জমি, সেখানে খুঁটির সঙ্গে লোহার একটা সরু শেকল দিয়ে একটা চিতি হরিণ বাঁধা। পায়ের শব্দ পেতেই হরিণটা বড় বড় কান খাড়া করে সজাগ হয়ে উঠল, নাড়তে লাগল বেঁটে ল্যাজটা, তারপর আশ্চর্য গভীর নীল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

রঞ্জু বললে, বেশ বাগান ভাই তোদের! আর কী সুন্দর ওই হরিণটা!

পরিমল হেসে বললে, বাগানটা বাবার সখ, আর হরিণটা মিতার।

—মিতা! মিতা কে?

পরিমল বললে, মিতা আমার বোন। বাবার আবার সেকেলে নামের ওপর ঝোঁক আছে কিনা, তাই নাম দিয়েছেন সংঘমিত্রা। অতবড় নামের সংক্ষেপ হল মিতা।

মিতা! বেশ নাম তো। ওই সুন্দর হরিণটার সঙ্গে নামটিও মিলে গেছে যেন। মিতা নাম শুনলেই যেন মিতালি হয়ে যাবে মনে মনে।

পরিমল বললে, আমরা যখন ডুয়ার্সে বেড়াতে যাই, তখন মিতা বায়না ধরে হরিণের ছানাটা কিনেছিল। এখন দিব্যি বড় হয়েছে, পোষও মেনেছে। কিন্তু হলে কী হবে, দুরন্তপনার শেষ নেই। একবার ছাড়া পেলেই বাগানের ফুল-পাতা আর কিছু আস্ত রাখবে না।

হরিণটা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। নাড়তে লাগল ছোট ল্যাজটা, নীল চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল কান্নার আভাসে। মনে হচ্ছিল—ওদের সব কথা সে বুঝতে পারছে, বোঝাবার চেষ্টা করছে অন্তত।

পরিমল বললে, এখন আমি তোমায় আদর করতে পারব না, আমার অনেক কাজ—বুঝেছ? চল রঞ্জু, আমরা ভেতরে গিয়ে বসি।

ভারী সুন্দর বাড়ি—কিন্তু এ কী রকমের বাড়ি? এত বেশি সাজানো যে মন খারাপ হয়ে যায়। যেন থাকবার জন্যে নয়, দেখবার জন্যে। উজ্জ্বল তকতকে কালো রঙের মেজে, পা পিছলে পড়তে চায়। এখানে ওখানে নানারকম ছোটবড় পাথরের মূর্তি, বুদ্ধদেব, বাসুদেব এই সব। পরিমলের বাবার খেয়াল। দু'পা এগোতেই মস্ত বড় একটা হলঘর, ওদের ড্রয়িংরুম।

ঘরটায় ঢুকে বিহ্বলভাবে চারিদিকে তাকাল রঞ্জু। আকাশী নীলরঙের দেওয়ালে বড়

বড় ছবি। চারদিকে নানা আকারের বসবার আসন—সোফা সেট, কাউচ। ছোট বড় টেবিলে ব্রোঞ্জের মূর্তি; দুটো ফুলকাটা কাচের ফুলদানীতে একগুচ্ছ টাটকা গোলাপ ফুল, দেখা যায় না, অথচ কোথা থেকে মিষ্টি ধূপের গন্ধ এসে ঘরটাকে ভরে রেখেছে। হঠাৎ রঞ্জু নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করতে লাগল, যেন এমন একটা জায়গাতে এসে পা দিয়েছে যেখানে তার আসা উচিত ছিল না।

পরিমল বললে, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? ওপরে আয়—

—ওপরে?

—হ্যাঁ, আমার পড়বার ঘরে।

ভীরু পায়ে অগ্রসর হল। অস্বস্তি লাগছে—পরিমলের ঐশ্বর্য পীড়া দিচ্ছে ওকে। ভোনা, খাঁদু, পূর্ণকে যদি ওর ভালো না লাগে, তা হলে এ জগৎটাও ওর জন্যে নয়। রঞ্জুর মনে হতে লাগল এ বাড়িটা থেকে বাইরে না বেরুনো পর্যন্ত যেন ও বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারবে না। এ ওর জায়গা নয়—এ যেন শক্রপুরী।

হলঘরের কোণা দিয়ে সাদা ঝকঝকে সিঁড়ি। এত পরিষ্কার যে কল্পনাও করা যায় না। ওই সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠতে হবে? কী আছে ওপরে, কী আশ্চর্য রহস্য আছে সেখানে। সাবধানে পা ফেলে ফেলে উঠতে লাগল রঞ্জু। ভয় করছে, আশঙ্কা হচ্ছে। তার ময়লা পায়ের ছোঁয়া লেগে এমন চমৎকার সিঁড়িটাই বা নোংরা হয়ে যাবে হয়তো!

ওপরে উঠে দু'পা এগোলেই পরিমলের পড়বার ঘর। কাচের দরজা ঠেলে পরিমল ডাকলে, আয় রঞ্জু, বোস্।

পড়বার ঘরই বটে। ছোট্ট ঘর। কিন্তু নিখুঁত নিপুণভাবে গোছানো। সামনেই মস্ত বড় খোলা জানালা, তাই দিয়ে চমৎকার দেখা যায় নিচে ওদের বাগানটাকে, মিউনিসিপ্যালিটির রাঙা সুরকির রাস্তাটাকে, তার ওপারে ছোট ছোট বাড়িগুলোকে পর্যন্ত। সেই নারকেলগাছগুলোর দুলুনি বয়ে শির শির করে মিঠে হাওয়া ঢুকছে ঘরে। জানালা ঘেঁষে বড় একটা লম্বা টেবিল, কয়েকখানা ঝকঝকে বই তার ওপরে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো; দোয়াতদানি, কলম পেন্সিল, ব্লটিংপ্যাড। দুখানা গদি আঁটা চেয়ার, ফর্সা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা। ঘরের তিন দিকে আলমারি—রকমারি—অজস্র বইতে একেবারে ঠাসা। একটা ছোট কাঠের স্ট্যাণ্ডের উপরে রূপোর ফ্রেমে আঁটা দুখানি ছবি; একখানা রঞ্জু চিনল—রবীন্দ্রনাথ; আর একখানা পরিমল পরে বলে দিয়েছিল—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পরিমল বললে, এই হল আমার পড়বার ঘর। ঠিক আমার নয়—আমাদের দুজনের—আমার আর মিতার। এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বোস্, বাড়ির কেউ এদিকে আসবে না।

ইতস্তত করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রঞ্জু। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটা আধখানা প্রায় নিচের দিকে টেনে নিলে তাকে—ভয় করতে লাগল ছিঁড়ে একেবারে পড়ে না যায়। কিন্তু

সহজ বুদ্ধিটা তাকে বলে দিলে এটা স্প্রিংয়ের চেয়ার, এদের ধরনই এই।

পরিমল বললে, দাঁড়া, তা হলে একটু চায়ের যোগাড় করি।

—চা ?

—হ্যাঁ, একটু চা না হলে জমবে কী করে !

—কিন্তু ভাই. চা তো আমি বিশেষ খাই না।

—এক কাপ খেলে কোনো ক্ষতি নেই। বোস, আমি দু মিনিটের মধ্যেই আসছি।

চটিটার শব্দ করে বেরিয়ে গেল পরিমল।

রঞ্জু বসে রইল অভিভূত হয়ে। জলের মাছ ডাঙায় উঠে আসবার মতো কেমন একটা অনুভূতি হচ্ছে তার। নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন আর বিব্রত বোধ হচ্ছে। অসীম আশঙ্কা-ভরে রঞ্জু ভাবতে লাগল, এখন যদি এ ঘরে এসে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে কেউ যে সে কে এবং কেন এসেছে—তা হলে তার অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে। নিশ্চয়ই মুখে কথা আটকে আসবে—উত্তর যোগাবে না, তারপর আত্মরক্ষার জন্যে মরীয়া হয়ে সামনের জানালাটা দিয়ে সোজা নিচের বাগানটায় ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে তাকে।

রঞ্জু টের পেল বাইরে থেকে এত বেশি হাওয়া আসছে বটে, তবু তার জামাটা ভিজে উঠেছে ঘামে, তার কপাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে দু ফোঁটা ঘাম। নিরুপায় হয়ে নিজেকে সে সামলে নেবার চেষ্টা করলে খানিকটা। তারপর ওই বিশ্রী চিন্তাটার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে প্রথমটা কড়িকাঠে, তারপরে চোখ বুলোতে লাগল দেওয়ালের গায়ে।

এখানেও ছবি, এখানেও দেওয়ালে খানকয়েক যত্ন করে টাঙানো। সব চাইতে বড় ছবিখানা অয়েল-পেন্টিং—টকটকে চওড়া লালপেড়ে শাড়িপরা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা সুন্দর চেহারার একটি মহিলা। রঞ্জুর দিকে যেন নিবিড় স্নেহভরে তাকিয়ে আছেন তিনি। ছবিটার ওপর একছড়া শুকনো মালা দুলছে। পরিমলের মা নেই শুনেছিল, বোধ করি ইনিই মা। তা ছাড়া আরো খানতিনেক ছবি আছে, কিন্তু সব অপরিচিত মুখ, রঞ্জু তাদের কাউকে চিনতে পারল না।

দেওয়াল থেকে চোখ নামিয়ে টেবিলের দিকে মনোনিবেশ করলে সে। ভীরু হাতে একটা বই টেনে নিতেই নিজেই অজ্ঞাতসারে খুশি হয়ে উঠল—বাঃ, খাসা বই। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'।

প্রথম পাতাটা ওল্টাতেই চোখে পড়ল পরিষ্কার বইয়ের মালিকের নাম লেখা : কুমারী সংঘমিত্রা লাহিড়ী। সংক্ষিপ্ত 'মিতা' নামটি, পোষা হরিণটা আর এই হাতের লেখা—সব যেমন হওয়া উচিত তেমনি। খারাপ হাতের লেখা দেখতে পারে না রঞ্জু, কেমন নোংরা মনে হয়—শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যায় মানুষের ওপরে কিন্তু মিতা তাকে নিরাশ করেনি।

রঞ্জু পাতা ওল্টাতে লাগল, তারপর এক জায়গায় গিয়ে দৃষ্টিটা থেমে পড়ল তার লাল-

নীল পেন্‌সিল দিয়ে ভারী যত্ন করে দাগানো একটা কবিতা, খুব মন দিয়ে বোধ হয় মিতাই সেটা পড়েছে। কবিতার নাম "গুরুগোবিন্দ"।

গুরুগোবিন্দের নামটা জানা আছে ইতিহাসের পাতায়, কিন্তু সে মানুষটিকে নিয়ে এমন কী কবিতা লেখা সম্ভব—যা এত করে দাগ দিয়ে পড়তে হবে?

রঞ্জু আকৃষ্ট হল কবিতার দিকে। কিন্তু লাইন কয়েক পড়তেই কবিতাটার সুর আর ছন্দ তার রক্তের মধ্যে যেন দোলা ধরিয়ে দিলে। কী প্রদীপ্ত কী অপূর্ব উজ্জ্বল কবিতা! কেন সে এতদিন এমন একটা কবিতা পড়তে পায়নি! গুনগুন করে রঞ্জু দাগানো লাইন-গুলো পড়ে যেতে লাগল :

"হায় সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তূরী,
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজা ও রাজ্য ভাঙিতে গড়িতে
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি—"

নিজেই সে বুঝতে পারল না, কবিতার দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে কখন তার অপরিচিত পরিবেশের ভয় কেটে গেছে, মন থেকে মুছে গেছে অনধিকারের সংশয়। তার গলার স্বর ক্রমশ ওপরে উঠতে লাগল :

"তুরঙ্গসম অন্ধ-নিয়তি
বন্ধন করি তায়,
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন করে
সময়ের পথে ছুটাই তাঁহারে
প্রতিকূল ঘটনায়—"

পেছন থেকে হাসিভরা মুখে পরিমল বললে, বাঃ, কবি যে একেবারে ভাবের রাজ্যে তলিয়ে গেলি দেখছি!

চট্‌কা ভেঙে গেল রঞ্জুর। মুহূর্তের মধ্যে স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে সে সজাগ হয়ে উঠল। মনে হল অন্যায় করে ফেলেছে, মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, করেছে অনধিকার-চর্চার অপরাধ। সসংকোচে বইটা বন্ধ করে সে সরিয়ে রাখল, একটা ঢোঁক গিলে নিয়ে বললে, এই—একটু দেখছিলাম।

পরিমল হাসল, পাশের চেয়ারটাতে বসল এসে। বললে, কী বই পড়ছিলি? কথা ও কাহিনী?

রঞ্জু মাথা নাড়ল।

—ঠিক ধরেছি, নিশ্চয় কবি তুই! তাই কবিতার বইয়ের ওপরে এত ঝোঁক—নিজের আবিষ্কারের আনন্দে অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠল পরিমল।

—যাঃ বাজে কথা—লজ্জায় রঞ্জু ততক্ষণে আরক্তিম।

কিন্তু বরাত ভালো, এবারেও পরিমল নিজে থেকেই প্রসঙ্গটা বদলে দিলে। বললে, বলে এলাম, এক্ষুণি চা আসবে। আচ্ছা, দেওয়ালের ওই ছবিগুলোকে চিনতে পারিস?

—উনি বোধ হয় তোর মা।

—ঠিক ধরেছিস। আর ওগুলো?

—চিনতে পারলাম না।

—তোর দোষ নেই ভাই, দেশের দুর্ভাগ্য। সমস্ত ভারতবর্ষের যাঁরা সত্যিকারের গৌরব, তাঁদের ভুলে যাওয়াই রেওয়াজ আমাদের।

—কিন্তু ওঁরা কারা পরিমল?

পরিমল ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল: আর একদিন বলব, আজ থাক।

আজ থাক। এ কথাটা আরো দু-একবার রঞ্জু শুনেছে ওর মুখে। প্রথম বোধ হয় বলেছিল সেই নিরালা কাঞ্চন নদীর ধারে। কী একটা জিনিস একান্তভাবে বলতে চাইছে, কিন্তু বলতে পারছে না; কোথায় আটকে যাচ্ছে—কোথা থেকে একটা সংকোচ এসে বাধা দিচ্ছে তাকে। কী এমন একটা কথা, কিসের জন্যে এত সংকোচ পরিমলের? এক-বার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল—কিন্তু কী যে হয়েছে পরিমলের ছোঁয়া লেগে, ওরও কথা আটকে এল।

ভালো লাগছে না রঞ্জুর, কেমন বিরক্তি লাগছে একটা। কাছে থেকেও কাছে নেই পরিমল—চোখের দৃষ্টিতে ঘনিয়ে আছে দূরাস্তীর্ণ একটা অন্যমনস্কতা। কী যেন ভাবছে, অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভাবছে। অথচ সে ভাবনাটাকে অনুমানও করবার ক্ষমতা নেই রঞ্জুর—সে ভাবনার সে অংশও নিতে পারবে না। একেবারে পাশটিতে বসে-থাকা মানুষের সঙ্গেও যে মনের হাজার মাইল জোড়া দুস্তর ব্যবধান ছড়িয়ে থাকে তার পরিচয় রঞ্জু পেলো এই প্রথম।

এ ভাবে চুপ করে বসে থাকা চলে না আর। রঞ্জু বললে, কই, বই দিবি না?

—হ্যাঁ দিচ্ছি—

পরিমল উঠল। রঞ্জু আশা করেছিল বড় একটা আলমারির ভেতর থেকে একরাশ ঝকঝকে বই বার করে আনবে ও। কিন্তু তা করল না পরিমল। ঘরের এক কোণে একটা শেল্‌ফ—যেখানে একরাশ মাসিকপত্র আর খবরের কাগজে ডাঁই হয়ে উঠেছে, সেই স্তূপ

ঘেঁটে কাগজের প্যাকেট বের করলে একটা। রঞ্জু হতাশ হল অত্যন্ত।

—দেখি, কী বই ?

—একটু পরে।—প্যাকেটটা কোলের ওপর নিয়ে পরিমল মিনিটখানেক চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বললে, আচ্ছা রঞ্জু!

—কী ?

—সত্যিই কি বিশ্বাস করিস অহিংসা দিয়ে স্বাধীনতা আসবে ?

রঞ্জু হাসল : আবার ও কথা তুলছ কেন ?

—না, এমনি।—পরিমল আবার চুপ করে রইল খানিকটা : আচ্ছা, তুই বিপ্লব-বাদীদের কথা শুনেছিস কখনো ?

—শুনেছি বইকি!—রঞ্জু সোৎসাহে বললে, তারাই বোমা ছুঁড়েছে, গুলি করেছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে। ভয়ঙ্কর লোক সব—শৈশবের সংস্কারে ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : নিশ্চয় ক্ষুদিরামের দল।

পরিমল হঠাৎ নড়েচড়ে বসল চেয়ারটাতে, কেমন অদ্ভুতভাবে তাকালো রঞ্জুর দিকে।

—খুব ভয়ঙ্কর লোক ওরা, না ?

—নিশ্চয়, কোনো সন্দেহ আছে ? যারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে গুলি মারতে পারে, অসাধ্য কাজ আছে তাদের ?

পরিমল ঠোঁটে আঙুল দিলে। স্-স্-স্—আস্তে।

কাচের দরজা ঠেলে একটা চাকর ঢুকল। বাক্সের ডালার মতো একটা কাঠের পাত্রে করে (পরে জেনেছিল ওকেই ট্রে বলে) দু পেয়ালা চা আর দু রেকাবি খাবার এনে রাখল টেবিলের ওপরে।

—নে রঞ্জু।

—সে কি রে, এত খাবার কেন ? না না, ওসব আমি খাব না।

—আচ্ছা লাজুক ছেলে তো তুই। খাবার নিয়ে কখনো লজ্জা করতে আছে রে বোকা! পাওয়ামাত্র মুখে পুরে দিতে হয়—এই হচ্ছে বুদ্ধিমানের নিয়ম। নে, নে চটপট্—

থালায় লুচি, মিষ্টি, আলু আর বেগুন ভাজা। সোনালি ফুল-পাতা আঁকা নীল রঙের পেয়ালাতে সোনালি রঙের চা। খাওয়ার চাইতে দেখতেই যেন বেশি ভালো লাগে।

—কেন আবার এত সব—

বাধা দিলে পরিমল : মিতা পাঠিয়ে দিয়েছে, আমার কিছু বলবার নেই।

মিতা! সত্যি, বেশ নাম। আদর করে যেন বার বার নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে করে। রঞ্জুর চমৎকার লাগল লুচিগুলো, অনভ্যস্তভাবে চায়ে চুমুক দিয়ে জিভ একটু পুড়ে গেল

বটে, তবু সে চায়ের স্বাদ এত ভালো লাগল বলবার নয়।

খাওয়া শেষ হল নিঃশব্দে। একটু পরেই চাকরটা এসে যখন পেয়ালা-পিরিচগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল, তখন আবার পুরোনো কথায় খেই ধরলে পরিমল।

—তুই যেন কী একটা কথা বলছিলি? ক্ষুদিরামের দল—

রঞ্জু অপ্রতিহতভাবে বললে, তাই তো শুনেছি।

—জানিস, কে ক্ষুদিরাম?

রঞ্জু বিব্রত বোধ করতে লাগল: শুনেছি অল্প অল্প।

—কী শুনেছিস? তেম্‌নি বিচিত্র ধরনে রঞ্জুর মুখের দিকে পরিমল তাকিয়ে রইল।

—শুনেছি—সন্দিগ্ধ চোখে পরিমলের মুখভাবটা লক্ষ্য করে রঞ্জু বললে, মাটির তলায় তার কামানের কারখানা আছে।

—আর?

—আর—রঞ্জু একটা ঢোঁক গিলল: ক্ষুদিরাম লাটসাহেবকে মারতে চেষ্টা করেছিল।

হঠাৎ শব্দ করে সকৌতুকে পরিমল হেসে উঠল।

কেমন যেন একটা চমক লাগল তখনি। বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল বহুদিন আগেকার একটা কথা। ক্ষুদিরামের আলোচনা প্রসঙ্গে এম্‌নি করেই সেদিন অবিনাশবাবু হেসে উঠেছিলেন। আজ পরিমলের কণ্ঠে যেন তাঁরই সেই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল।

হাসি বন্ধ করলে পরিমল। তারপর শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, তুই ভুল শুনেছিস রঞ্জু।

কোথাও একটা ভুল আছে এটা রঞ্জু নিজেও অনুমান করেছিল। ক্ষীণভাবে বললে, তবে যে বৈরাগী গাইছিল—

—বৈরাগী?—পরিমল আবার হাসল, কিন্তু এবারে নিঃশব্দে।

রঞ্জু অভিভূত হয়ে আসছিল। আস্তে আস্তে বললে, তুমি জানো কিছু ক্ষুদিরাম সম্বন্ধে?

—জানি।

—জানো?—রঞ্জুর শরীরটা শিরশির করে উঠল। শূন্য কল্পনার একটা অন্ধকার সমুদ্রে সাঁতার দিতে দিতে এতদিন পরে কূল দেখতে পেয়েছে যেন। উদগ্র আকুলতার একটা তরঙ্গ এসে তার বুকের পাঁজরায় উচ্ছ্বসিত আবেগে ঘা দিতে লাগল: কী জানো তুমি?

—অনেক কথাই জানি। তুই জানতে চাস?

রঞ্জু মাথা নাড়ল। কথা বলবার শক্তি নেই তার।

পরিমল খবরের কাগজের প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। চাপা গলায় বললে,

ক্ষুদিরামের কথা আমি নিজে কিছু বলব না, এই বইগুলোই বলবে। কিন্তু একটা কথা আছে রঞ্জু।

—কী কথা ভাই?

—বইগুলো লুকিয়ে রাখতে হবে—লুকিয়ে পড়তে হবে, লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

—কেন?—রঞ্জুর মুখে বিস্মিত কৌতূহল।

—কেন?—পরিমল কঠিনভাবে বললে, যারা আমাদের গলা টিপে রাখতে চায়, তারা যে ওদের পরিচয় আমাদের জানতে দেবে না ভাই।

রঞ্জু হতাশভাবে বললে, তোর কথা কিছু বুঝতে পারছি না পরিমল।

—বইগুলো পড়লেই বুঝতে পারবি। পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবীর পরিচয়ই যে প্রথম অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আসে। দুর্যোগের ভেতরে তারা আমাদের হাত বাড়িয়ে দেয় স্বাধীনতার আলোয় এগিয়ে যাওয়ার জন্যে।

সুন্দর ভাবে, যেন ছাপার অক্ষরে সাজিয়ে কথাগুলো বলে গেল পরিমল। আর ওদিকে আবার একটা তীব্র বিদ্যুৎতরঙ্গ চমকে উঠল রঞ্জুর শরীরের মধ্যে।

—বিপ্লবী!

—হাঁ বিপ্লবী। আর বিপ্লবী শহীদদের একজন অগ্রদূত ক্ষুদিরাম।

রঞ্জু বিহ্বলভাবে বলে ফেলল: তুমি কি বিপ্লবীদের দেখেছ পরিমল? চেনো তাদের? চট্টগ্রামের সর্বনেশে মানুষগুলোকে তুমি কি দেখেছ কোনোদিন?

—আচ্ছা ছেলেমানুষ তুই রঞ্জু!—পরিমল যেন লঘু কৌতুকে আবার সহজ হয়ে উঠল: তারা ভয়ঙ্কর লোক, আমি নিরীহ জীব, তাদের চিনব কী করে? তবে তুই যদি চিনতে চাস ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—আমি!

—হ্যাঁ, তুই। ভয় কি, তারা বাঘ ভালুক নয়। তারাও আমাদের মতোই সহজ মানুষ—শুধু তাদের মনটা বজ্র দিয়ে গড়া। আমাদের পাশে পাশেই তো দিন রাত ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা চিনতে পারি না!—পরিমল যেন সামলে নিলে নিজেকে: যাক গে, ও সমস্ত বাজে কথা এখন থাক। চল্, বইগুলো তোর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

প্যাকেটটা ততক্ষণে পরিমল লুকিয়ে নিয়েছে জামার নিচে। দুজনে উঠে পড়ল, তার-পর সিঁড়ি দিয়ে নেমে, হলঘর পেরিয়ে আবার বাগানে চলে এল।

আর সেইখানেই দেখা হল মিতার সঙ্গে।

প্রাচীরের ধারে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি—কিছু ভাবছিল বোধ হয়। ওদের কথাবার্তার শব্দে ফিরে তাকালো।

তেরো-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে, অর্থাৎ বয়সে রঞ্জুরই সমান। টুকটুকে রং, কপালে

কাঁচপোকার সবুজ টিপ, পরনে ডুরে-পাড় শাড়ি। আশ্চর্য সুকুমার আর শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওদের দিকে।

পরিমল বললে—মিতা, এ আমার বন্ধু রঞ্জু—রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

দুখানি ছোট হাত কপালে ঠেকিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে মিতা বললে, নমস্কার!

নমস্কার!—রঞ্জু নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তাকেও কেউ কোনোদিন নমস্কার জানাবে—ছোট্ট, ভীরু রঞ্জু একদিন নমস্কার পাওয়ার মতো বড় হয়ে উঠবে, একথা কি কখনো কোনো কল্পনাতেও ছিল তার! প্রতিনমস্কার করল না রঞ্জু, শুধু অর্থহীনভাবে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করে দ্রুত ফটকটার বাইরে চলে গেল।

পরিমল বললে, কি রে, অমন করে দৌড়ে পালাচ্ছিস যে? ভয় পেলি নাকি? দাঁড়া দাঁড়া, আমিও আসছি—

পেছন থেকে রঞ্জু শুনতে পেল—মিতার মিষ্টি খিল্ খিল্ হাসির শব্দে সমস্ত বাগানটা ভরে উঠেছে। তার পালানোটা ভারী উপভোগ করেছে সে।

সেই প্রথম। সেই হাসির শব্দই বালক রঞ্জুকে হঠাৎ জাগিয়ে দিলে কৈশোরের রঞ্জনের মধ্যে। বাগানের ফুলে ফুলে দোলা লাগিয়ে আসা এক ঝলক বাতাসে একটা নতুন চঞ্চলতা জেগে উঠল মনে।

বাল্য থেকে কৈশোরে; কল্পনার রূপকথা থেকে জীবনের রূপকথায়! সেই প্রথম নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই রঞ্জুর কথা শেষ হল, শুরু হয়ে গেল রঞ্জনের কাহিনী।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

ভোগবতী

শ্রদ্ধেয়

সজনীদা-কে

ভোগবতী

এ পারে বাঙলা, ওপারে মানভূম। পাথর মেশানো রাঢ়ের অনুর্বর কঠিন বিস্তারের ওপর দিয়ে রাঙা সুরকির পথ। মাঝে মাঝে শালের ঘন-বিন্যাস। হিমালয়ের বুকে শালবীথির যে সমুন্নত উদ্ধত মহিমা—এরা যেন তাদের সংক্ষিপ্ত হাস্যকর সংস্করণ। আকন্দের ঝোপের মতো রাশি রাশি পলাশও মাঝে মাঝে বিকীর্ণ হয়ে আছে, ওই পলাশবন যে বসন্তে রাঙা ফুলের চেলী পরে নিজের বিন্দুতম শ্যামলিমাকেও নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে—এটা যেন কেমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

কিন্তু এ দেশটার রীতিই এই। যেন জগৎটাকে সৃষ্টি করবার আগে বিশ্বকর্মা এখানে তাদের ছোটখাটো কতকগুলো মডেল তৈরি করে নিয়েছিলেন। অথবা যেন পৃথিবীর বড়-সড় আকারের একটা রিলিফ ম্যাপ। নদী আছে, কিন্তু মোটা মোটা বালিরদানা আর ছোট বড় পাথরের টুকরোর ভেতর দিয়ে তাদের জলের ধারাটা একফালি অভ্রের পাত বলে ভুল হতে পারে। আর আছে পাহাড়। শুধু রাত্রির অন্ধকারে যেখানে বার্নপুরের চিমনির আভায় কালো দিগন্তটা লাল হয়ে থাকে, সেদিকটা ছাড়া আর তিনদিকেই চলেছে পাহাড়ের অনন্ত শ্রেণী।

একদিকের দূরান্ত রেখায় পঞ্চকোট, অন্যদিকের চক্রবালে শুশুনিয়া পাহাড়ের অলক্ষ্য-প্রায় ছায়ামূর্তি। মাঝখানে বিহারীনাথ পাহাড়। তা ছাড়া ছোট বড় অখ্যাত ও অজ্ঞাত-নামা পাহাড়ের কোনো সীমাসংখ্যাই নেই। কোনোটায় পলাশের জঙ্গল, কোনোটা একেবারে ন্যাড়া। কোনোটা নিতান্তই জংলা—শতমূলী সহস্রমূলী থেকে সুরু করে দু'হাত উঁচু আবলুশ গাছ আর নলবনের মতো সরু সরু পাহাড়ী বাঁশ—অথবা বাঁশের ক্যারিকেচার। তাতে কখনো কখনো বাঘের সন্ধান পাওয়া যায় আর মাঝে মাঝে দেখা হয় শঙ্খচূড় সাপের সঙ্গে। স্বল্পবিস্তীর্ণ একটা ব্যাসার্ধের ভেতরে সমস্ত পৃথিবীর ভূগোল-পরিচয়।

বহু দূরে দূরে ভদ্রলোকের গ্রাম। আর সাঁওতাল—সব সাঁওতাল। চাষী সাঁওতাল, খেড়ে সাঁওতাল। চাষী সাঁওতালরা ভদ্রপাড়ার কাছাকাছি এসে বাসা বেঁধেছে, চাষ করে, সবজি লাগায়। জামা কাপড় পরে তারা, কখনো কখনো কাঁচা চামড়ার ফাটা ফাটা মোটা জুতোও। আর খেড়ে সাঁওতালের কোমরে এখনো লেংটি, কানে ফুল গোঁজা, মাথায় বাবরী, হাতে কাঁড় বাঁশ। ভাতের মহিমা উপলব্ধি করে তারা এখনো পুরোপুরি 'ভেতো' হয়ে উঠতে পারেনি, বনে জঙ্গলে প্রচুর প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে তাদের প্রাকৃতিক খাদ্য ছড়িয়ে পড়ে আছে।

এদের মাঝামাঝি যারা, তারা কাঠুরে। ভদ্রলোক জমিদার বাবুদের পাহাড়ে তারা

বিনা অনুমতিতে কাঠ কাটে। এসব পাহাড়ে তাদের জন্মগত অধিকার। দশ মাইল দূরের জমিদার কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইনের বলে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এ সমস্ত পাহাড়ের ভোগ দখলের অধিকারী, তাদের স্থূল মস্তিষ্কে সেটা সহজে প্রবেশ করে না।

দূরের থেকে যে পাহাড়টাকে কাল-বৈশাখী মেঘের মতো নিবিড় নীলবর্ণ বলে মনে হয় ওর নাম ভৈরব পাহাড়। ওর সর্বাঙ্গে জঙ্গল, নিবিড় জঙ্গল। মাটি আর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জন্মেছে যেন প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য। কিন্তু ছোট পাহাড়টির মতো গাছগুলিও ছোট ছোট—জ্বালানি ছাড়া কোনো কাজেই তারা লাগে না।

এই পাহাড়ে কাঠ কাটতে এল শুকলাল আর সোনা।

ভোর হয়ে আসছে। বার্নপুরের আকাশে রক্তাভা ফিকে হয়ে আসছে—আর রাঙা রঙ ধরছে শুশুনিয়ার ছায়ামূর্তির আশেপাশে। হালকা শিশিরে ভেজা পাহাড়ী গাছগাছড়া আর রাঢ়ের রাঙা মাটির বুক থেকে উঠছে প্রতিদিনের পরিচিত লঘু একটা মিষ্টি গন্ধ।

ঝাঁকড়া তিন-চারটে মহুয়া গাছের তলা থেকে এখনো রাত্রির অন্ধকার সরে যায়নি। সেটাকে পাশ কাটিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিল শুকলাল, পেছন থেকে সোনা তার হাত চেপে ধরলে।

—এই মোড়লের পো, বাবাঠাকুরকে প্রণাম করলি নে?

থেমে দাঁড়িয়ে শুকলাল হাসল।

—ঠাকুরের ঘুম এখনো ভাঙেনি। জাগালে রাগ করবে। দেরি করিসনি সোনা, চল্।

সোনা ভ্রূকুটি করলে: মস্করা করিস নে খালভরা। ঠাকুরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিস, পাহাড়ে তোকে বাঘে ধরবে দেখিস। আয়, প্রণাম করে যা ঠাকুরকে।

নিজের পেশল শরীরটার দিকে একবার তাকালো শুকলাল। পলিমাটির দুলাল নয়, পাথুরে দেশের পাথরে তৈরি দামাল ছেলে। বললে, বাঘের বরাত মন্দ না হলে বাঘ আমাকে ধরতে আসবে না।

—থাক, থাক—খুব মরদ হয়েছিস—গলার স্বরে অবজ্ঞা ফোটাবার চেষ্টা করলেও সেটা ফুটল না। কালো সাঁওতাল মেয়ের কালো চোখে আনন্দিত গর্বের আলোই ঝিলিক দিয়ে গেল। সত্যিই অহংকার করবার অধিকার আছে শুকলালের। তার কুড়ুলের ঘায়ে শুধু গাছগাছালিই নয়, শক্ত পাথর পর্যন্ত গুঁড়ো হয়ে যায়। শুকলালের চওড়া বুকের ওপর খেলা করে গেল সোনার সানুরাগ সস্নেহ দৃষ্টি।

আর তেমনি সপ্রেম গভীর চোখে সোনার ওপরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে শুকলাল। শুশুনিয়া পাহাড়ের আকাশে রঙের সমুদ্রে ডুব দিয়ে রক্ত-পদ্মের মতো সবে ফুটে উঠেছে

প্রথম সূর্য। সোনার যৌবনোজ্জ্বল দেহেও তার আভাস এসে পড়েছে—যেন তারও ভেতরে কোথায় পাপড়ি মেলেছে ভোরের পদ্ম। হাওয়ায় কাঁপা পদ্মপাতার শ্যামলতা তার ভেতরেও যেন হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে।

চকিতে চোখ নামিয়ে নিলে সোনা। বললে, আয়, প্রণাম করবি।

মহুয়াকুঞ্জের তলায় ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার—অবসিত রাত্রি আর ছায়ার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটছে এতক্ষণে। পাথরের ঠাকুরও বোধ হয় ঘুমভরা চোখ মেলে জেগে উঠেছেন, মহুয়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে কালো গ্রানিটের ওপরে পড়েছে টুকরো টুকরো রঙের ফালি।

পাহাড়ের নিচে প্রতীহারী হয়ে আছেন বাবা ঠাকুর। চওড়া একখানা শিলাপট্ট—মাটির ভেতরে আধাআধি পরিমাণে সমাহিত। তার মাথার ওপর ছেনি দিয়ে কাটা একটা সিংহের আকৃতি। নিচে অশ্বারোহী একটি বীর পুরুষের মূর্তি—তার প্রসারিত হাতে খোলা একখানা সুদীর্ঘ তরবারি, বোঝা যায় কোনো দিগ্বিজয়ী রাজা নিজের শৌর্য-বীর্যকে অক্ষয় করে রাখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। শিলাপট্টের গায়ে কিছু কিছু লেখাও আছে, তার আভাসমাত্র পাওয়া যায়। বাকিটা তলিয়ে আছে মাটির নিচে—হয়তো ভবিষ্যৎকালের কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদের হাতে মুক্তির প্রতীক্ষায়।

কিন্তু এসব বোঝবার শিক্ষা-দীক্ষা নেই সরল সাঁওতালের। গাছতলায় একটা বড় পাথর দেখলেই তারা সিঁদুর মাখিয়ে পূজো করে, একটা ভাঙা মূর্তি দেখলেই থান বসিয়ে দেয় মুরগী বলি। তাই এখানকার বিস্মৃতনামা রাজা রূপান্তরিত হয়েছেন পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা ভৈরব ঠাকুরে।

ঠাকুর প্রণাম করে পাহাড়ে উঠল শুকলাল আর সোনা। কাঠুরেদের যাতায়াতে জঙ্গল ভেঙে দু-একটা সরু পথ আপনা থেকে তৈরি হয়েছে এদিকে ওদিকে—সরীসৃপ গতিতে পাহাড়ের চারদিকে পাক খেয়ে গেছে। তা ছাড়া দুর্ভেদ্য জঙ্গল—পাথরের চাঙাড়ের ফাঁকে ফাঁকে মাটির ভেতর থেকে রাশি রাশি বুনো গাছ আর লতার জটিলতা। কাঁটা গাছের মাথায় হাওয়ায় দুলছে বন-ধুঁদুল। মাঝে মাঝে ফুটেছে ভুঁইচাঁপা আর কাঠগোলাপ। কোথাও কোথাও বেগুনে রঙের ফুলের বাহার নিয়ে পাথরের আড়ালে আড়ালে উঁকি দিচ্ছে লজ্জাবতী। ছোট ছোট পাখি নেচে বেড়াচ্ছে এদিকে ওদিকে।

শুকনো আধ-শুকনো গাছ খুঁজে কুড়ুল চালাতে লাগল শুকলাল আর মোটা একটা শুলঞ্চের লতা দিয়ে খড়ির আঁটি বাঁধতে লাগল সোনা। ওরই এক ফাঁকে কখন দুটো ধুঁদুল সংগ্রহ করেছে সোনা, গোটা কয়েক কাঠগোলাপও সাজিয়ে নিয়েছে খোঁপায়। সংসারের কথা ভোলেনি, সেই সঙ্গে একটুখানি অঙ্গরাগও করে নিয়েছে। মাঝে মাঝে একটা গানের কলিও গুনগুন করে উঠেছে। কিন্তু আপাতত তার দিকে নজর নেই শুকলালের। বিশ্রামহীন ভাবে তার কুড়ুল চলছে, মড়মড় খটখট শব্দে ভেঙে পড়ছে গাছ আর গাছের

ভাল। আর থেকে থেকে বাঁ হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলছে কপালে জমে ওঠা বড় বড় ঘামের বিন্দুগুলো।

এর মধ্যেই কখন উঠে গেছে অনেকখানি বেলা। শুশুনিয়া পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে সূর্য উঠে এসেছে আকাশের মাঝখানে। পাথর গরম হয়ে উঠেছে—চারদিক থেকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ছে একটা বাষ্পীয় উত্তাপ। এতক্ষণ পরে হাতের কুড়ুল নামিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো শুকলাল—হাঁপাতে লাগল।

ওদিকে পিঠের বোঝাটাও বেশ ভারী হয়ে উঠেছে সোনার। রোদে টকটক করছে মুখ। দুজনে দুজনের দিকে তাকালো।

শুকলাল বললে, ভারী গরম।

শ্রান্ত গলায় সোনা জবাব দিলে, এখন থাক। ঝোরার কাছে চল।

ঝোরা! মনে পড়তেই যেন শান্তি আর তৃপ্তির একটা স্নিগ্ধ অনুভূতি এসে সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিলে ওদের। ঝোরা। এই বিস্তীর্ণ নির্মম পাষাণের বুকের ভেতর থেকে উচ্ছলিত ফল্গুর প্রবাহ। পাহাড়ের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা ভাঁজ পড়ে যেখানে ছোট একটা মালভূমির মতো সৃষ্টি হয়েছে—ওইখানে—ছোট অশ্বত্থ আর ছোট পলাশের ছায়াকুঞ্জের ভেতর প্রকাণ্ড একখানা পাথরের তলা দিয়ে একটি ঝর্ণা নেমেছে এসে। এত বড় পাহাড়ে ওটা ছাড়া আর কোথাও একবিন্দু জল নেই। ওই জলটা কোথা থেকে নিঃশব্দ প্রবাহে যে বয়ে আসছে কেউ বলতে পারে না—কিন্তু মাটির তলা থেকে উৎসারিত ভোগবতীধারার মতোই ওর ঠাণ্ডা আর মিষ্টি জল কঠিন পাহাড়টার মর্মবাহী স্নেহের মতো উছলে পড়ছে।

হাতের কুড়ুল আর পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে পাথর বেয়ে বেয়ে ঝর্ণার পাশে এসে বসল দুজনে। চারপাশে নিবিড় ছায়া দুপুরের রোদে যেন ঝিমুচ্ছে। পাহাড়ে যে দু'-চারটে বড় গাছ আছে—এখানেই যেন তারা সার বেঁধে রয়েছে। ইচ্ছে করেই ওদের গায়ে হাত দেয়নি কাঠুরেরা। রাঢ়ের আগুন-ঝরা দুপুরে পাথরের অসহ্য উত্তাপের ভেতর এখানে ওদের মরূদ্যান।

পাথরের তলা থেকে বেরিয়ে নিচে যেখানে ছোট একটা গর্তের ভেতরে একটুখানি জল জমেছে, দুটো নীলকণ্ঠ পাখি পরমোল্লাসে সেখানে স্নান করছিল পাখা ঝেড়ে। মানুষের সাড়া পেয়েও তারা ভয় পেলো না, ধীরে সুস্থে তারা ঠোঁট দিয়ে নিজেদের সদ্যঃস্নাত নরম পালকগুলোকে পরিষ্কার করে নিলে। তারপর মিষ্টিগলায় কী একটা ডেকে উঠে লাফাতে লাফাতে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ততক্ষণে সোনা আর শুকলাল এসে বসেছে ছায়ার নিচে। মিঠে বাতাসে দুজনের ক্লান্তি যেন এক মুহূর্তে দূর হয়ে গেছে। সোনার কাছে আরো ঘন হয়ে এসে শুকলাল

বলল, দেখলি ?

—কী দেখব ?

—ওই পাখি তুটো।

—ওদের দেখবার কী আছে ?

—এতক্ষণ ওরা এখানে ও ওকে সোহাগ করছিল—চান করছিল। তুই আমি এলাম দেখে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে গেল।

মুখের ভঙ্গি করে সোনা বললে, যাঃ।

—হ্যাঁ—সত্যি !

—ওরা কি এসব বোঝে ?

—বোঝে বইকি। সব বোঝে।

এবারে সোনা আরো কাছে ঘেঁষে এল শুকলালের। তার খোঁপা থেকে একটা ফুল তুলে নিয়ে শুকলাল খেলা করতে লাগল।

—বড় পিয়াস লেগেছে—জল খাই—

পলাশের পাতা ভেঙে নিয়ে তুটো ঠোঙা তৈরি করলে সোনা। ঠোঙা ভরে ভরে জল খেল তুজনে—ঠাণ্ডা জল—সুস্বাদু স্ফটিকের মতো জল। এই ঝোরা তাদের প্রাণ। যদি না থাকত তা হলে কোনো কাঠুরের সাধ্য ছিল না, এই পাহাড়ে এসে কাঠ কাটে। কাছাকাছি কোথাও জল নেই—শুধু এক মাইল দূরে একটা মরা নদী ছাড়া। তু' হাত বালি খুঁড়লে তা থেকে এক আঁজলা জল মিলতে পারে। নীরস অনুর্বরতার মাঝখানে এই ঝর্ণাটা একটা অপরিসীম বিস্ময়—যেন দৈবী করুণা। পাতালবাহিনী ভোগবতীর একটু-খানি উদ্বেলিত স্নেহনির্যাস।

তৃপ্ত গলায় সোনা বললে, আঃ! ঠাকুরের দয়া দেখেছিস! পাথর ফুঁড়ে কেমন জল দিয়েছে ?

এবারে আর ঠাকুরকে নিয়ে ঠাট্টা করলে না শুকলাল। জলে ভিজে ভিজে সোনার একখানা ঠাণ্ডা হাত নিজের কড়া-পড়া মস্ত শক্ত মুঠোর মধ্যে জড়িয়ে নিলে। গভীর স্বরে বললে, সত্যি।

—এবার উঠবি না মোড়ল ? ওদিকে কাঠ আর কুড়ুল পড়ে রইল যে।

—থাক পড়ে, কেউ নেবে না। বোস, আর একটু জিরুই। যা রোদ, একটু হেলে যাক।

তুজনে চুপ করে বসে রইল। অশ্বত্থের পাতা কাঁপছে—পলাশের পাতা কাঁপছে। বেলোয়ারী চুড়ির বাজনার মতো শব্দ করে পড়ছে ঝর্ণার জল, পাতার দোলানিতে মাঝে মাঝে চিকমিকে রোদ তার ওপরে খেলা করে যাচ্ছে। একখানা পাথর থেকে আর এক-

খানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে হীরের গুঁড়ো। খানিক দূর গিয়ে তাকে আর দেখা যাচ্ছে না—আবার কোন্ পাথরের তলা দিয়ে পাতালের ফল্গু পাতালেই ফিরে গিয়েছে হয়তো।

রোদে ঝিমঝিম করছে পাহাড়—ঝিরঝির করছে হাওয়া। পাখির ডাক আসছে, সেই নীলকণ্ঠ পাখি দুটোই হয়তো। বেলোয়ারী চুড়ির মতো শব্দ করে তেমনি বাজছে ঝর্ণার একতারা। সোনা একটা গান ধরেছে, হয়তো ঝর্ণার সঙ্গে সুর মিলিয়েই। এমন সময় একটা বিজাতীয় শব্দে পাহাড়ের দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল।

তলিয়ে গেল নীলকণ্ঠ পাখির ডাক, ঝর্ণা আর সোনার মিলিত ঐকতান। শিকরে বাজের মতো বিশাল কালো একটা জানোয়ার আকাশে দেখা দিয়েছে। তার গর্জনে পাহাড়ের গুহা-গহ্বরগুলো একসঙ্গে গুম্ গুম্ করে উঠল—যেন সাড়া দিয়ে উঠল আকাশ-চারী বিশাল জন্তুটার ডাকে, গম্ভীর ক্রুদ্ধ স্বরে কী একটা প্রত্যুত্তর পাঠিয়ে দিলে একটা কুটিল জিজ্ঞাসার।

সোনা সোৎসাহে বললে, হাওয়াই জাহাজ।

শুকলাল বললে, তাই লাগছে পারা।

—আয় দেখি—

—ও আর কী দেখব। রোজই তো আসছে আজকাল, লড়াই বেধেছে কিনা।

—আয় আয় না—

ঝর্ণার পাশ থেকে বেরিয়ে একটা বড় পাথরের ওপর দাঁড়াল ওরা। হাওয়াই জাহাজটা কোন্ খেয়ালে কে জানে ওই পাহাড়টার চারিদিকেই ঘুরে ঘুরে চক্র দিচ্ছে। আরো আশ্চর্য—এত নিচে নেমে এসেছে যে ওর ভেতরের দু'-তিনটে মানুষের মাথা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ভয় পেয়ে সোনা শুকলালের পেছনে সরে এল : ওটা নামবে নাকি ?

—কে জানে। ওদের মর্জি !

সোনা বিস্ফারিত চোখে এরোপ্লেনটার দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্ময়ে নয়, ভয়ে। এই হাওয়াই জাহাজগুলো নাকি মানুষেরই কীর্তি। কিন্তু সোনার তা বিশ্বাস হয় না, তার আশংকা হয় ওর ভেতরে অস্বাভাবিক একটা কিছু লুকিয়ে আছে, একটা কিছু অলৌকিক এবং ভয়ংকর। ঝড়ের রাত্রে যে সব ভূত-প্রেত-পিশাচ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রচণ্ড উল্লাসে নেচে বেড়ায়, ওই অস্বাভাবিক কাণ্ডটা যেন তাদেরই খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। ওটা মাটিতে নেমে এলে যে কত বড় একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে ভাবতেও ওর রক্ত জল হয়ে যায়।

বিমানটা কিন্তু নামল না। বার কয়েক পাহাড়ের মাথায় ঘুরপাক খেয়ে সাঁ করে একটা

তীরের মতো বার্নপুরের দিকে দেখতে দেখতে উধাও হয়ে গেল। শুধু নির্মেঘ আকাশে অনেকক্ষণ ধরে একটা ধূমপুচ্ছ দীর্ঘ রেখায় বিস্তীর্ণ হয়ে রইল—যেন ধূমকেতুর সংকেত।

দুদিন পরে পাহাড় থেকে কাঠের বোঝা নিয়ে নামবার পরে দেখা হরিকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে।

হরিকৃষ্ণ রায় এই পাহাড়ের মালিক পালবাবুর গোমস্তা। একটা হাড়-বের-করা টাট্টু ঘোড়াকে শায়েস্তা করতে করতে আসছিল। পাঁজরের ওপরে জুতোর ঠোক্কর খেতে খেতে ঘোড়াটা যেভাবে এগোচ্ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল যে কোনো সময় সে মুখ থুবড়ে ধরাশয্যা গ্রহণ করবে।

ওদের দেখে হরিকৃষ্ণ রায় ঘোড়ার রাশ টানল। কিন্তু রাশ না টানলেও সেটা এমনিই থামত।

খড়ির বোঝাটার দিকে একটা তির্যক কুটিল কটাক্ষ করলে হরিকৃষ্ণ।

—বেশ মনের আনন্দে গাছ কাটছিস, অ্যাঁ?

—দুটো খড়ি নিলাম খালি—

—দুটো খড়ি! দুটো দুটো করে নিতেই তো পাহাড়ের গাছপালাগুলো সব সাবাড় করে দিলি। বাবু ভালো মানুষ বলে করে খাচ্ছিস, কেমন?

জবাব না দিয়ে আপ্যায়নের হাসি হাসলে শুকলাল। তিরস্কারের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন স্নেহের সুর আছে হরিকৃষ্ণের। তার মুখটাই খারাপ, মনটা নয়।

—দাঁড়া, মিলিটারী আসছে। দুদিনেই তোদের ঠাণ্ডা করে দেব।

—কে আসছে বাবু?

—মিলিটারী, মিলিটারী। মানে পল্টন। মাথার ওপর দিয়ে হাওয়াই জাহাজ গেল, দেখলি না? এখানে মাঠের মধ্যে আস্তানা গাড়বে—দেখিস তখন।

কথার শেষে হরিকৃষ্ণ ঘোড়ার পিঠে একটা চাবুক বসালো। চিড়চিড় করে লাফিয়ে উঠে ঘোড়াটা তিন পা দৌড়ে গেল, তারপর আবার গজেন্দ্র গতি।

সোনা পাংশু মুখে জিজ্ঞাসা করলে, আকাশ থেকে ওরা নেমে আসবে এখানে?

গম্ভীর চিন্তিত দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকালো শুকলাল। কয়েক মুহূর্ত পরে জবাব দিলে, হুঁ।

তারও পরে মাত্র একটা মাস।

সব কিছু অদলবদল হয়ে গেল। পৃথিবীর রূপ পাল্‌টে গেল, পাল্‌টে গেল সোনা আর শুকলাল। সেই বুড়ো টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালো হরিকৃষ্ণ রায়। ছড়ালে মিষ্টি কথা, ছড়ালে টাকা। চাষী সাঁওতালের লাঙল খসে পড়ল, খেড়ে

সাঁওতালের ধনুক আর রইল না, মরচে ধরল কাঠুরেদের কুড়ুলে। তার জায়গায় চকচকে হয়ে উঠল শাবল, ঝকঝকে হল কোদাল।

যুদ্ধের অবস্থা আশাপ্রদ নয়। সীমান্ত থেকে দুঃসংবাদ আসছে। পশ্চাদপসরণ যদি করতে হয়, তাহলে আগে থেকে তার ব্যবস্থা করা দরকার। সুতরাং এই অঞ্চলটাকে কেন্দ্র করে একটা সম্ভাব্য ডিফেন্স লাইন গড়ে তোলা হতে লাগল।

রাঙা কাঁকরের টানা পথ ঘুমিয়েছিল শাল পলাশের ছায়াকুঞ্জের ভেতরে। তাকে ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত করে এল জীপ, এল লরী। কাঠ এল, তাঁবু এল, বিচিত্র যন্ত্রপাতি এল আর তার সঙ্গে সঙ্গে এল বিচিত্রতর মানুষ। রাঢ়ের অনুর্বর মাঠের ভেতর জাঁকিয়ে বসল কলোনী—একটা ছোট এরোড্রোম। দেশটা যেন হাজার বছরের একটানা ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠল যন্ত্রযুদ্ধের বাস্তবতম নির্মম পরিবেশের ভেতর।

সহজ হয়ে গেছে শুকলাল আর সোনার, অভ্যস্ত হয়ে গেছে বুনো সাঁওতাল, গৃহস্থ সাঁওতালদের। আজ আর ওদের ভেতরে জাতিগোত্রের ভেদ নেই। একটি মন্ত্র-বলে ওরা সবাই এক হয়ে গেছে—ওরা কুলি। নিজেদেরই ওরা এখন আর চিনতে পারে না। টাকা পায়, খেতে পায়—পায় বিস্কুট, টিনের দুধ আর চকোলেট। মেজাজ প্রসন্ন থাকলে মাঝে মাঝে কারো কিট ব্যাগ থেকে এক-আধটা লাল রঙের বেঁটে চেহারার বিয়ারের বোতলও ওদের দিকে এগিয়ে আসে। মহুয়া আর ভাত-পচানো হাঁড়িয়ার চাইতে তার স্বাদ ঢের ভালো।

আর ওরা কাজ করে। আসানসোলের দিক থেকে বড় বড় মোটর গাড়ি যাতে নির্বিঘ্ন পাড়ি জমাতে পারে, তারই জন্যে পথ তৈরি করে ওরা। কঠিন লাল মাটিতে শাবল গাঁইতির ঘা পড়ে ঝনঝনিয়ে। মাটি সহজে আমল দিতে চায় না, তার তলায় তলায় ছোট বড় পাথর শাবলের ফলা দুমড়ে দেয়—কোদাল ছিটকে বেরিয়ে আসে। তবু মাটি কাটতেই হবে—পথকে বাড়াতে হবে, বড় করতে হবে। শুকলালেরা ঘর্মাক্ত দেহে আসুরিক শক্তিতে মাটিকে কেটে নামায় আর সোনারা ঝুড়ি ভরে ভরে সেই মাটি নিয়ে ফেলে পথের পাশে।

মাথার ওপরে দুপুরের সূর্য জ্বলে। নিষ্ঠুর, করুণাহীন। পাহাড়ের পাথর আর পাথুরে মাটিতে তার উত্তাপের কোনো তারতম্য ঘটে না। সাঁওতালের কালো শরীর থেকে রক্ত-জল-করা সাদা ঘাম মাটিতে ঝরে পড়ে, তৃষ্ণার্ত পৃথিবী যেন এক চুমুকে তা চোঁ করে শুষে নেয়। ওদের অনাবৃত পেশল সিক্ত পিঠগুলো রোদের আলোয় জ্বলতে থাকে, ঘাড়ে কপালে লবণের গুঁড়ো চিকমিক করে। অপ্রাহত পাথরের টুকরোগুলো ছিটকে ছিটকে এসে চোখে মুখে আঘাত দিয়ে যায়—অসহায় পৃথিবীর যেন ক্ষীণ সহিংস প্রতিবাদ। একটু দূরে খোলা তাঁবুর ছায়ায় টেবিল ফ্যান খুলে বসে নগ্ন-গাত্র সাদা সাহেব কাজের তদারক করে ওদের। নীল চশমা পরা চোখের ভেতর থেকে উগ্র দৃষ্টি ক্ষেপণ করে, গাল দেয়,

আর একটার পর একটা বোতল শূন্য হয়ে টেবিলের নিচে গড়াগড়ি খেতে থাকে।

কাজ করে সোনা—কাজ করে শুকলাল। রোদে চাঁদি পুড়ে যায়। পিপাসায় টাকরার ভেতর যেন পিন ফুটতে থাকে। সামনে একটা মরা দীঘির দুর্গন্ধ কাদাজল—সেই জল খেয়ে ওরা পিপাসা দূর করার চেষ্টা করে।

আর তখনি চোখে পড়ে দূরে ভৈরব পাহাড়।

মাটির বুক থেকে ঢেউয়ের মতো হঠাৎ সোজা উঠে নীলিম রেখায় দিগন্তের দিকে তরঙ্গিত হয়ে গেছে। ওখানে রুক্ষ মাটি, কঠিন পাথর। কিন্তু সে মাটি—সে পাথর এ জাতের নয়। তাদের ঘিরে ঘিরে উঠেছে প্রকৃতির অকৃপণ শ্যামলতা—শতমূলী অনন্তমূলী থেকে শুরু করে ছোট আবলুশ আর পাহাড়ী বাঁশের ঝাড়, সেখানে পাথরের আড়ালে আড়ালে বেগুনী ফুলে আকীর্ণ লজ্জাবতী সংকুচিত হয়ে আছে, সেখানে বেঁটে পলাশের ছায়ায় ফুটেছে ভুঁইচাঁপা, বাতাসে ভাসছে বন-গোলাপের গন্ধ। আর—আর—পাথর চুঁইয়ে নামছে একটি ছোট ঝর্ণা, বনের ভেতরে যেন একটি সাঁওতাল মেয়ের হাতে ঠিন ঠিন করে বেলোয়ারী চুড়ির সুর বাজছে। তার জলের রঙ জ্যোৎস্নার মতো উজ্জ্বল, তার স্বাদ দুধের মতো মিষ্টি আর তা বরফের মতো ঠাণ্ডা। মরা দীঘির কাদাজলের মতো তা বুকটাকে পুড়িয়ে দেয় না—তার দিকে তাকালেই আর ক্লান্তি থাকে না কোথাও।

কিন্তু ভৈরব পাহাড় অনেক দূরে। এখানে মাটি কাটা হচ্ছে—পাথর জড়ানো রাঙা মাটি। পথ তৈরি হলে বড় বড় গাড়ি আসতে পারবে আসানসোল থেকে। তাই দু'হাত ভরে মিলিটারী ওদের মজুরী দিচ্ছে। এখন আর মহুয়া গাছের নিচে শিলাপটে খোদাই করা বাবাঠাকুর ওদের ইষ্ট দেবতা নয়—তার জায়গা দখল করেছে অতি চেতন এবং অতি সজাগ ওই সাদা চামড়ার লোকটা। নীল চশমার ভেতর দিয়ে শাণিত চোখে ওদের কাজ দেখছে আর বোতল টানছে!

—এই কুলি—ঠারো মৎ, ঠারো মৎ! ফুর্তিসে কাম চালাও—জলদি!

—বহুৎ ধূপ হুজুর—

—ওঃ—ধূপ! ধূপ! মরদ লোগ্‌কা ধূপ্‌সে কেয়া ডর হ্যায়? ডেভিল টেক্ ইউ লেজী ব্রুটস্—

গাল দেয় সাহেব, হাত ভরে পয়সা দেয়, মদ দেয়। কিন্তু কী দিতে পারে ভৈরব পাহাড়? কিছু খড়ি, কিছু ছায়া আর—আর—পাতাল ফুঁড়ে ওঠা ভোগবতীর ঠাণ্ডা মিষ্টি জল। ঝর্ণার পাশে আজ আর কেউ বসে না, শুকলাল নয়, সোনা নয়, অন্য সাঁওতালেরাও নয়। সেখানে এখন নিশ্চিন্তে নীলকণ্ঠ পাখীরা স্নান করে, পাখা ঝাড়ে আর মিষ্টি গদ্‌গদ গলায় এ ওর সঙ্গে প্রেমালাপ করে হয়তো।

কিন্তু সাহেবের দেওয়া মদ ভুলিয়ে দেয় ভোগবতীকে। তার স্বাদ মিষ্টি নয়, তেতো,

বিষের মতো তেতো। রক্ত জুড়িয়ে যায় না, জ্বলে ওঠে। মুহূর্তে ভৈরব পাহাড় সরে যায় দৃষ্টির সামনে থেকে। পাগলের মতো কোদাল তুলে নেয় শুকলাল—ঝুড়ি মাথায় করে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সোনা। দুপুরের রোদ আর মদের নেশা শরীরের ভেতরে একটা আসুরিক মত্ততা সৃষ্টি করে—অদম্য অন্ধবেগে যেন ওরা ভেঙে পড়তে চায়, টুকরো টুকরো হয়ে বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায়। প্রবল বেগে অনিচ্ছুক মাটির বুকের ভেতরে কোদালের আঘাত নেমে আসে—পাথরের গায়ে ঘা লাগে—যেন শোনা যায় মাটির তলা থেকে মা বসুমতীর চাপা যন্ত্রণার গোঙানি।

তারপর দিনান্তে শুকলাল আর সোনা ফিরে রওনা হয় ঘরের দিকে।

মদের নেশা তখন কেটে গেছে, শরীরে ঘনিয়েছে দ্বিগুণ শ্রান্তি আর অবসাদ। পা জড়িয়ে জড়িয়ে দুজনে মূছিতের মতো এগিয়ে চলে। আকাশের প্রান্তরেখায় প্রথম প্রেমের মতো অপূর্ব কোমল মাদকতা নিয়ে সন্ধ্যাতারা দেখা দিয়েছে। দিগন্তে কালো আর করুণ হয়ে আছে ভৈরব পাহাড়—যেন একটা অতিকায় ভালুক শিকারীর গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে।

দু'জনে তাকায় সেদিকে। দু'জনেরই একসঙ্গে একই কথা মনে হয়।

শুকলাল বলে, সোনা, চল্, কাল থেকে আবার আমরা কাঠ কাটব।

সোনা মাথা নাড়ে—জবাব দেয় না। অকারণে তার ইচ্ছে করতে থাকে মজুরীর টাকাগুলো পথের ওপর ছুঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দেয়।

শুকলাল বলে, মাটি কাটতে ভালো লাগে না। কাঠুরে ছিলাম—বেশ ছিলাম রে।

সোনা তেমনি নিরুত্তরে মাথা নাড়ে। অন্ধকার পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন ওটা অভিমানে ম্লান হয়ে আছে। লজ্জা হয় সোনার, অপরাধ-বোধ জাগে মনের মধ্যে। একটু পরে জবাব দেয়, ঠিক।

কিন্তু রাত্রি কাটে—দিন আসে। সন্ধ্যার সংকল্প মনে থাকে না কারো—শুকলালেরও নয়, সোনারও নয়। আবার শাবল গাঁইতির ঝকঝকে ফলা মাটির বুক কুরে কুরে বার করতে থাকে। মদের নেশা আর দুপুরের রৌদ্র বিষ হয়ে আবর্তন করে রক্তের ভেতরে। শুকলালের কোদাল পড়তে থাকে : ঝন-ঝন—ঝনাৎ—

ওরা ভৈরব পাহাড়কে ভুলেছে—ভৈরব পাহাড় ওদের ভোলেনি।

তাই হয়তো মহুয়া গাছের নিচে একদিন জেগে উঠলেন শিলাপটে আঁকা বাবাঠাকুর তাঁর মাথার ওপরে গর্জন করে উঠল সিংহ—তাঁর হাতে ঝিকিয়ে উঠল তরোয়াল। নিজের শক্তির পরিচয় দেলেন।

রাস্তা অনেকখানি তৈরি হয়ে গেছে—ভারী ভারী গাড়ির যাতায়াতের সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। সেই গাড়িগুলোর একটা সেদিন বেসামাল হয়ে বসল।

ড্রাইভারের মদের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। হঠাৎ কোথা থেকে কী হল—হাত থেকে পিছলে গেল স্টিয়ারিং। পথের পাশে বড় একখানা বেলে পাথরের গায়ে আচমকা ধাক্কা খেল গাড়িটা, তারপর সোজা একটা ডিগবাজি খেয়ে পথের উল্টো দিকে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ল। কুলি মেয়েরা ঝুড়ি ভরে মাটি ফেলছিল সেখানে।

এক মিনিটের মধ্যে যা হওয়ার তা হয়ে গেল।

উল্টানো গাড়িটার সামনের চাকা দুটো আকাশের দিকে উদ্যত হয়ে বিষ্ণুচক্রের মতো ঘুরলে খানিকক্ষণ। একটা প্রলয়ংকর ঝড়ের মতো ঝুরো মাটি চারদিকে ছিটকে যেতে লাগল। তাঁবু থেকে সাহেবেরা ছুটে এল—চেঁচামেচি জুড়ে দিলে কুলিরা।

কিন্তু শুকলালের মুখে কথা নেই—যেন পাথর।

গাড়ির ভেতর থেকে বেরুল সাহেবের দেহ—মাথাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, ঘিলু আর রক্ত পড়ছে গড়িয়ে। হাত-পাগুলো বেঁকে দুমড়ে কচ্ছপাকার ধারণ করেছে সাহেব। আর গাড়ির তলা থেকে বেরুল সোনা। সোনা? না, ঠিক সোনা নয়। নাক মুখ শরীর সমস্ত চেপটে একটা অমানুষিক বীভৎসতা। রাঢ়ের তৃষ্ণার্ত রাঙামাটিও অত রক্ত শুষে খেয়ে ফেলতে পারেনি—থকথকে খানিকটা কাদার সৃষ্টি হয়েছে। কালো সাঁওতালের রক্ত যে অত লাল তা কে জানত? আশ্চর্য—ভারী আশ্চর্য, সাহেবের রক্তের রঙের সঙ্গে তার কোনো তফাৎ নেই!

যুদ্ধের ক্যাজুয়ালটি। অমন কত হয়—অমন কত হয়েছে। কে তার খবর রাখে, কে তা নিয়ে নিজেকে বিব্রত বোধ করে? ডিফেন্স লাইন তৈরি করতেই হবে—বৃহত্তর প্রয়োজনের জন্যে, অসুরদের নিপাত করে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্যে। একটা সাঁওতাল মেয়ের মৃত্যু। তার জন্যে মাটি কাটা বন্ধ থাকবে না—মাটি ফেলাও না।

* * * *

ফিরে এল শুকলাল। এক ফোঁটা চোখের জল ফেললে না, বুক চাপড়ে হাহাকার করে উঠল না একবারও। ভৈরব পাহাড়ের দেবতা শোধ নিয়েছেন, পরিচয় দিয়েছেন তাঁর ক্ষমতার, তাঁর দোর্দণ্ড দুরন্ত প্রতাপের।

টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন হরিকৃষ্ণ রায়। দূরের গ্রামে আরো কুলি সংগ্রহের চেষ্টায় গিয়েছিলেন তিনি। এ এক মন্দ ব্যবসা নয়—বেশ দু'-চার পয়সা কমিশন আসছে হাতে। আনন্দে উৎসাহে বুড়ো ঘোড়াটাকে তাড়না করতেও ভুলে যাচ্ছিলেন তিনি, ঘোড়াটা ইচ্ছেমতো থেমে থেমে চলছিল।

শুকলালকে দেখে কষ্ট হল হরিকৃষ্ণ রায়ের। আহা বেচারা! বৌটাকে সত্যিই বড় ভালবাসত। ঘোড়া থেকে নামলেন তিনি। পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, কষ্ট করে আর কী করবি শুকলাল, কপালে যা ছিল তাই হয়েছে।

কথা বললে না শুকলাল, থেমেও দাঁড়ালো না। যেন হরিকৃষ্ণ রায়কে সে দেখতেই পায়নি। অলস শ্রান্ত গতিতে যেমন যাচ্ছিল, তেমনই চলে গেল। শুধু তার অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিটা দূরে আকাশের কোলে গিয়ে পড়তে লাগল, যেখানে লতাকুঞ্জে আচ্ছন্ন হয়ে ভৈরব পাহাড় স্তব্ধ একটা ধ্যানস্থ মূর্তি।

বহুদিন পরে মরচে-পড়া কুড়ুলটায় শান দিয়েছে শুকলাল। তারপর পাহাড়ে উঠে পাগলের মতো গাছ কাটতে শুরু করে দিয়েছে।

পাহাড় তার ওপরে প্রতিশোধ নিয়েছে—সেও পাহাড়কে ক্ষমা করবে না। দু' হাতে সে ডাইনে বাঁয়ে যা পাচ্ছে কেটে চলেছে। পাহাড়টাকে আজ সে ন্যাড়ামুড়ো আর নির্মূল করে দেবে। একবার যাচাই করে দেখবে তার শক্তি বেশি, না দেবতার প্রতাপটাই বড়।

মাথার ওপরে তেমনি আগুন-ঝরানো সূর্য। পাহাড় তেমনি উত্তাপের বাষ্প-নিঃশ্বাস ছাড়ছে। তৃষ্ণায় বুকের ভেতরটা তেমনি খাঁ খাঁ করছে। চোখে ধোঁয়া দেখতে লাগল শুকলাল—কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

তখনি মনে পড়ল ভোগবতীকে। রুক্ষ পাহাড়ের বুক থেকে উচ্ছলিত স্নেহধারা। পলাশ আর পিয়াশাল গাছের নিচে ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। ছোট গর্তের ভেতর যেখানে একটুখানি জল জমেছে, সেখানে পাখা ঝেড়ে ঝেড়ে স্নান করছে নীলকণ্ঠ পাখি।

তার ঠাণ্ডা মিষ্টি জল। বহুদিনের অনাস্বাদিত সুধার পাত্র। টলতে টলতে ঝর্ণার দিকে ছুটে এল শুকলাল। কিন্তু কোথায় ভোগবতী?

তার চিহ্নমাত্র নেই। নেই বেলোয়ারী চুড়ির হালকা ঝংকার—নেই নীলকণ্ঠ পাখি। যেখানে ঝর্ণা ছিল সেখানে কালো অজগরের মতো মোটা একটা লোহার নল—পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে সে নলটা ঘুরে চলে গেছে—কোথায় গেছে বুঝতে কষ্ট হল না শুকলালের।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়ালো শুকলাল। ওই কালো লোহার সাপটা মাটির তলায় তার হিংস্র মাথাটা ডুবিয়ে দিয়ে তাদের ভোগবতীকে চুষে খেয়ে নিয়েছে। ভোগবতীর জল—ঠাণ্ডা মিষ্টি দুধের মতো জল তার সরীসৃপ দেহের বিষসঞ্চয়কে পুষ্ট করছে আজ। তার সেই বিষে সোনা মরে গেছে—শুকলাল মরবে, আরো অনেকে মরবে। কেউ বাঁচবে না, কেউ নয়।

কেউ বাঁচবে না। কেউ বাঁচবে না। শুকলালের মাথার ভেতর সব কিছু যেন আতস-বাজির ফুলঝুরি হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। কুড়ুলটা তুলে নিলে হাতে—প্রচণ্ড শক্তিতে ঘা বসালো অজগরটার গায়ে।

ঝন ঝন করে একটা বিরাট শব্দে পাহাড় কেঁপে উঠল। আর এক ঘা—আর এক ঘা।

কুড়ুলের ফলা কুঁকড়ে এল কিন্তু লোহার সাপটা টোল খেল না।

—হু ইজ দেয়ার ?

পাহাড়ের মাথা থেকে প্রশ্ন। রাইফেল হাতে সেণ্টি. দেখা দিয়েছে।

—হু ইজ দেয়ার ?

শুনতে পেল না শুকলাল—জবাব দিলে না। আরো এক ঘা—এইবার একটু দাগ পড়েছে মনে হচ্ছে। আর এক ঘা।

—স্যাবোটেজ !

পাহাড়ের মাথা থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুটে এল রাইফেলের গুলি।

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল শুকলাল। চেতনার শেষ বিন্দুটুকুও মুছে যাওয়ার আগে টের পেল—তার পিপাসাকাতর মুখে কে যেন জল দিচ্ছে। ভোগবতীর-ধারা কি মুক্ত হয়ে গেল ? কিন্তু সে জল তো এমন গরম নয়—এমন নোনতা নয় ! নিজের রক্ত লেহন করতে করতে লোহার পাইপটার ওপরে মাথা রেখে স্থির হয়ে গেল শুকলাল।

মিলিটারী কলোনীতে ট্যাপের মুখে ভোগবতীর স্নিগ্ধ জল ঝরে পড়ছে শত ধারায়। সে জল তেমনি নির্মল, তেমনি স্বচ্ছ, শুকলালের রক্তের এতটুকুও লালের আভাস তাতে লাগেনি।

বন-তুলসী

টেলিগ্রাম এল বিমলেন্দুর তৃতীয় কন্যা নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠা হয়েছে। পত্নী এবং নন্দিনী দুইজনেই সম্পূর্ণ কুশলে আছে, সুতরাং বাবাজীবনের উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোনো হেতু নেই।

টেলিগ্রাম করেছেন পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়—আশা করেছেন কন্যালাভের সংবাদে জামাতাবাবাজী একেবারে চতুর্ভুজ হয়ে উঠবে। কিন্তু বিমলেন্দুকে আসলে দেখাচ্ছিল একটা চতুষ্পদের মতো। অদ্ভুত রকমের বোকা হয়ে গেছে মুখের চেহারাটা, ঘোলা চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র ঘানির জোয়াল ঘুরিয়ে সের তিনেক খাঁটি সর্ষের তেল বের করে এল। খুব সম্ভব আসন্ন কন্যাদায়ের সম্ভাবনাটাই বেচারার মানস-চক্ষে এসে দেখা দিচ্ছিল।

পুরো পাঁচ মিনিট পরে এঞ্জিনের ধোঁয়া ছাড়বার মতো ফোঁস করে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললে বিমলেন্দু। বললে, গেল।

আমি বললাম, কী গেল ?

—যৌবন। প্রেম।—কর্তিত-পকেট অসহায় পথচারীর গলায় বিমলেন্দু বলে যেতে

লাগল : রোমান্স। ক্রম এ ম্যান উইথ ফিউচার টু এ ম্যান উইথ পাস্ট।

আমি বললাম, যাওয়াই ভালো। বোকামির পালাটা চটপট মিটে গেলেই ভদ্রলোক হয়ে উঠতে পারবে।

হয় কথাটা বিমলেন্দুর কানে গেল না, অথবা কান দিলে না। নাটকীয় ভাবে বলে যেতে লাগল, এখন দেখতে পাচ্ছি প্রেমটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকাই ভালো। প্রিয়া গৃহিণী হলেই জীবন-স্বপ্নে বারোটা বেজে গেল। তার চাইতে কবিদের অশরীরী প্রেম, অতীন্দ্রিয় মিলন—

আমি মন্তব্য করলাম, ক্লীবের সান্ত্বনা।

বিমলেন্দু ক্ষেপে উঠল। নাটক ক্রমশ মেলোড্রামার রূপ নিতে লাগল : বৌ, ছেলেমেয়ে, বাঁধা রুটিনের চাকরি, যক্ষ্মার মতো জীবন। তার চাইতে অনেক ভালো একটা খোলা আকাশ, একটা অবার দিগন্ত, মিষ্টি মহুয়ার ফল, কালো সাঁওতালের মেয়ে—

হাসি চাপাটা দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল। পলকাতার বাইরে জীবনে বিমলেন্দু কখনো পা বাড়িয়েছে কিনা জানি না। হয়তো বড় জোর মধুপুর দেওঘর অথবা পুরী, কিংবা শ্রীশ্রীবারাণসীধাম। সুতরাং অবারিত দিগন্ত আর মহুয়া ফলের স্বপ্ন দেখাটা তার স্বাভাবিক অধিকার।

বললাম, ভুল করলে। মহুয়ার ফল অত মিষ্টি নয়, একটু তেতো। অবশ্য তাতে ক্ষতি নেই, সে কথা যাক। আসলে প্রেমের পরিণতিই হচ্ছে পূর্ণগ্রাস—ওর একমাত্র উপমা ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ। সোপেনহাওয়ের পড়লে অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবে। কিন্তু শুধু মানুষের প্রেম নয়—প্রকৃতির প্রেমও ওই রকম সর্বগ্রাসা।

—আফ্রিকার জঙ্গলের কথা বলছ?

—না। বাংলা দেশের মাঠঘাট, তার অবারিত দিগন্ত, তার ধানের ক্ষেত তার বন-তুলসীর ঝাড়—তার শরতের সোনা-ঝরানো আকাশ—

—কথাটা বিশদ করো।

আমি বলতে শুরু করলাম।

কৈশোরের অনেকগুলো দিন আমার কেটেছে বাংলা দেশের একটুকরো পাড়াগাঁয়ে।

মনে রেখো, কৈশোরের কথা বলছি। যে বয়েসে মানুষের জীবনে প্রথম নেশার মতো প্রথম প্রেম আবির্ভূত হয়, যখন চোখের সামনে পৃথিবীটাকে আরব্য-উপন্যাসের মতো বলে মনে হতে থাকে। যখন জ্যোৎস্না রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে জানলার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে, জলের ঝাপটায় চোখমুখ ভিজে গেলেও ভালো লাগে বৃষ্টি পড়া দেখতে। ঘাসের ছোট ছোট ফুলগুলোর সঙ্গে পর্যন্ত পরিচয় থাকে, সদ্য-ফোটা আনন্দের বুনো গন্ধ পর্যন্ত রক্তে রক্তে কথা কইতে চায়।

সেই বয়েসে বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে অনেকগুলো দিন আমি কাটিয়েছিলাম। জায়গাটা কোন এক অখ্যাত ব্রাঞ্চ লাইনের অখ্যাততর একটি স্টেশন। ঝিমিয়ে-চলা প্যাসেঞ্জার গাড়িগুলো পর্যন্ত সেখানে এক মিনিটের বেশি দাঁড়াত না। তিন-চার মাইল দূরের গ্রামগুলো থেকে যেসব যাত্রী আসত বা যে দু-চারজন নামত, সারাদিন-রাত্রে সবসুদ্ধ ঘণ্টা দেড়েকের বেশি তারা স্টেশনের নির্জনতায় বিঘ্ন ঘটাত না।

তা ছাড়া বিপুল ব্যাপ্ত নিঃসঙ্গ পৃথিবী। রাঙা মাটির টিলায় তালবীথির মর্মর। বহু দূরে ধুলোর কুয়াশা বুনে চলা গরুর গাড়ি। মাঝে মাঝে ভুট্টার ক্ষেত, বোরোধানের নিচু জমি। আকাশে উড়ে যাওয়া বুনো হাঁস আর এক ফালি মরা নদী। দুপুরের রোদে ঝক-ঝকে নুড়ির ওপর বিছানো চকচকে একটা মিটার-গেজের লাইন, ভুট্টা ক্ষেতের পাশে বাঁক নিয়ে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গিয়েছে; তার এক প্রান্ত একটা জংশন স্টেশনে, আর এক প্রান্ত কোথায় গেছে জানা ছিল না, কল্পনা করা যেত দিল্লী, বোম্বাই, কাশ্মীর, কারাকোরাম ছাড়িয়ে হয়তো তুষার মেরুর পেঙ্গুইনদের দেশে গিয়ে ওর যাত্রা শেষ হয়েছে।

মেজমামা ছিলেন স্টেশন মাস্টার। অকৃতদার লোক, একটা পয়েন্টস-ম্যানকে নিয়ে তাঁর সংসারযাত্রা চলত। স্টেশনের কাজ শেষ করে কোয়ার্টারে ফিরে বিবেকানন্দের বই আর শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুপ্রসঙ্গ মুখে নিয়ে বসে যেতেন। রাশভারী মানুষ, নিতান্ত দরকার না হলে কথাবার্তার বড় বালাই ছিল না।

আমার দিন কাটে কী করে? পৃথিবী ডাক দিলে। ভুট্টার ক্ষেত, রেলের লাইন আর মরা নদীর ধারে নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম আমি। টেলিগ্রাফের তারে ফিঙে আর বুনো টিয়ার নাচ, কাশফুলের বনে নানা রঙের প্রজাপতি। খোলা আকাশের সোনালি রোদ রক্তের মধ্যে যেন মদের মতো ক্রিয়া করত, যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াতাম। আর তৈরি করে নিয়েছিলাম একগাছা ছোট ছিপ, মাঝে মাঝে মৎস্য শিকারের আশায় নদীর ধারে গিয়ে বসতাম। কাদা আর নুড়ির ভেতর দিয়ে তির তির করে রূপালি জল বয়ে যেত, নেচে উঠত ছোট ছোট মাছ, তাদেরই দুটো-একটাকে ধরবার প্রত্যাশায় অসীম ধৈর্য ধরে ছিপ ফেলে বসে থাকতাম।

সেখানকার আকাশ-বাতাসের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সুর মিলিয়েছিল নদীটা। মাঝে মাঝে কাশ, মাঝে মাঝে এক-এক গুচ্ছ বন-তুলসী। কেন জানি না, এই বন-তুলসী-গুলোকে ভয়ানকভাবে ভালবেসে ফেলেছিলাম আমি। লাল রঙের বড় বড় ডাঁটায় রুক্ষ চেহারার ছোট ছোট পাতা—ভঙ্গুর, নমনীয়। মেঠো বাতাসে সহজেই নেচে উঠত, দুলে উঠত, একটা মৃদু মর্মরে ডাঁটা-পাতাগুলো আকুল হয়ে উঠত একসঙ্গে। তার মঞ্জরী থেকে ছড়িয়ে পড়ত জংলা কষায় গন্ধ—ওই গন্ধটার ভেতর দিয়ে চারদিকের প্রসারিত পৃথিবীটার একটা অভিনব আস্বাদ আমাকে ব্যাকুল করে দিত।

ওই বন-তুলসীর ঝাড়ের ভেতরে মাছ ধরবার জন্যে ছোট একটু জায়গা করে নিয়েছিলাম। সেখানে বসেই চলত শিকার-পর্ব। শিকার তো ছাই—ছিপ ফেলে হয় রেল লাইনটার অথবা আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকা। আর নয় তো ছোট ছোট মঞ্জরী ছিঁড়ে নিয়ে ডলে ডলে দু'হাতে তার আরণ্য গন্ধটা মাখিয়ে নেওয়া। এই গন্ধবিলাসের পেছনে হয়তো খানিকটা ফ্রয়েডিক মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন আছে, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে সেদিন আমি বন-তুলসীর প্রেমে পড়েছিলাম সে কথাটা অস্বীকার করবার জো নেই।

এমন সময় সেই বন-তুলসীর পটভূমিতে মানবিক প্রেমের আবির্ভাব হল।

ঘটনাটা চাঞ্চল্যকর নয়। জায়গাটা ছিল নির্জন, লোকজনের যাতায়াত ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে একদিন দেখলাম একটি ছোট মেয়ে কেমন করে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বোধ হয় তুরীদের মেয়ে। বছর বারো-তেরো বয়স হবে—হাঁটু পর্যন্ত তোলা ময়লা থান ধুতি পরনে। হাতে একটা ছোট ঝুড়ি, নদী থেকে বালি নিতে এসেছে। সারা গা অপরিচ্ছন্ন, গালে মুখে কাদার দাগ। আমাকে বোকার মতো তার দিকে তাকাতে দেখে ফিক করে হেসে ফেলল।

মনে আছে, ভারী মিষ্টি লেগেছিল হাসিটা। হয়তো তার অন্য কারণ আছে। আকাশে তখন শরতের রোদ সোনা ঝরাচ্ছিল, তখন ছোট নদীর জল চিকচিক করছিল, বাতাসে বন-তুলসীর ঝাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছিল—আমার রক্তে ছিল বন-তুলসীর গন্ধ। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েই রইলাম।

মেয়েটি বললে, কী মাছ পেলি বাবু?

আমি বললাম, কিছু পাইনি।

মেয়েটি বললে, তুই মাছ পাবি না, ব্যাঙ্ পাবি।

পূর্বরাগের প্রথম পর্যায়ে নায়িকার ভাষাটা ভদ্রজাতের নয়। আমি রূঢ়ভাবে কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই মেয়েটা মিষ্টি করে মুখ ভেংচে বন-তুলসীর ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছিপ হাতে তারপর আরো অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে। শরতের রোদ আর বন-তুলসীর গন্ধ স্নায়ুর ভেতরে ঝিমঝিম করছিল—বহুক্ষণ অকারণে ভেবেছিলাম মেয়েটার কথা। না, অনুরাগে বিহ্বল হয়ে পড়িনি। মুখ ভ্যাংচানির কথাটা যখনি মনে পড়ছিল, তখনি ইচ্ছে করছিল একবার হাতের কাছে পেলে ফাজিল মেয়েটাকে গোটা দুই চড় বসিয়ে দেব।

তারপরে আরো অনেকদিন ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে গেছি ওখানে। প্রায়ই মনে হত

ওই বাচ্চা মেয়েটা ভারী জব্দ করে দিয়েছে আমাকে, বোকা বানিয়ে দিয়েছে। আর এক দিন ধরতে পারলে এর শোধ তুলব।

কিন্তু সে সুযোগ আর হয়নি। আমার প্রথম নায়িকা দেখা দিয়ে সেই যে হারিয়ে গেল, তারপরে আর কোনদিন সে ফিরে আসেনি। ভালোই হয়েছে। আর একবার এলে নির্ঘাত ঠ্যাঙানি খেত, তার পরিণতি কী হত জানি না। প্রতিশোধের ইচ্ছাটা চরিতার্থ হয়নি বলেই তাকে ভুলতে পারিনি, অচেতন মনের ভেতরে সে আমার প্রথম নায়িকা হয়ে বেঁচে রইল—বেঁচে রইল বন-তুলসীর পৃথিবীতে।

আমার নায়িকা হারিয়ে গেল, তারপরে হারিয়ে গেল সেই ছোট স্টেশন, সেই মকাই ক্ষেত, টিলার ওপরে তালের সারি, সেই রূপালি ছোট নদী আর সেই বন-তুলসী। চলে এলাম শহরে। নতুন জীবন, নতুন পরিবেশ। ইস্কুল, কলেজ, বন্ধু-বান্ধব, রাজনীতি-সাহিত্য।

হাতের থেকে সেই উদ্ভিদ-রসের কষায় গন্ধটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু রক্তের থেকে নয়। বহুদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, সরু সরু লালরঙের ডাঁটাগুলো বাতাসে ঢেউয়ের মতো দুলছে; অনেক নিঃসঙ্গ ভাবনার অবকাশে শুনতে পেয়েছি ছোট ছোট রুক্ষ পাতাগুলোর দীর্ঘশ্বাসের মতো শিরশিরানি শব্দ। রোমান্টিক মনের মুহূর্ত-বিলাস আমন্থর হয়ে উঠেছে কটু-কষায় একটা গন্ধের উল্লাসে।

এই পর্যন্ত ছিল ভালো। আমি বন-তুলসীর প্রেমে পড়েছিলাম, বন-তুলসীও যে আমাকে ভালবেসে ফেলেছে তা কি বুঝতে পেরেছিলাম কোনোদিন। তোমাকে বলেছি, প্রেমের ধর্মই হচ্ছে পূর্ণগ্রাস। মানুষের পক্ষে কথাটার প্রমাণ দরকার নেই—ওটা স্বতঃপ্রমাণিত। কিন্তু বাংলাদেশের নিরীহ পল্লী-প্রান্তরও যে রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে ভালবাসতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না।

বছর পাঁচেক আগেকার কথা, সবে এম.এ. পাস করে বসে আছি। স্টেটসম্যান আর অমৃতবাজারের পাতা খুলে মাস্টারী, প্রোফেসারী যারই বিজ্ঞাপন দেখছি দু'হাতে দরখাস্ত করে যাচ্ছি। বলা বাহুল্য তাতে ডাক-বিভাগের পক্ষেই নিঃস্বার্থ পরোপকার সাধিত হচ্ছে মাত্র। নিরাশ হয়ে গীতা পাঠে মনোনিবেশ করব কিনা চিন্তা করছি এমন সময় ডাক এল বন্ধুর কাছ থেকে।

শিকারের নিমন্ত্রণ। ওদের বাড়ি উত্তর-বাংলার জংলা বিলের দেশে, বুনো হাঁস শিকারের অপূর্ব জায়গা। বিপ্লবী যুগে আমবাগানে টার্গেট প্র্যাকটিস করে বন্দুক পিস্তলের হাত খানিকটা রপ্ত করেছিলাম—এবারে সেটা কাজে লাগাবার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া মনের দিক থেকেও খানিকটা আউটিংয়ের দরকার ছিল, বেরিয়ে পড়লাম।

সত্যিই দেশটাকে ভালো লাগল। এত বড় একটা আকাশ যে আছে বহুদিন সে

কথাটা মনেই ছিল না। মাঠ আর বিল। বিলে অজস্র বুনো হাঁস, হাড়গিলা, দুটো-একটা ফ্লোরিক্যান, কাগ, চীনে কাগ, বক, ছোট বড় স্নাইপ, এমন কি চখা-চখী পর্যন্ত। ছররা মারা শিকারীর স্বর্গ-বিশেষ।

বন্ধু সুধীররা গ্রামের অবস্থাপন্ন তালুকদার, বাড়িতে দু-দুটো বন্দুক। পাড়াগাঁয়ের স্বভাবসিদ্ধ আতিথেয়তার সঙ্গে শিকার-পর্বও পরমোৎসাহে চলতে লাগল। শাপলা-কলমী আর পদ্মপাতার জগতে বালিহাঁসদের নিশ্চিন্ত সংসারে আমরা হাহাকার সৃষ্টি করে দিলাম। সকালের দিকে বেরিয়ে দিনান্তে যখন রক্তমাখা পাখির ঝাঁক নিয়ে আমরা ফিরে আসতাম, তখন মনে হত যেন দিগ্বিজয় করে আসছি। অদ্ভুত একটা হিংস্র আনন্দ—শিকারের নেশা—আমাদের পেয়ে বসেছিল। গুলি খেয়ে ক্ষীণপ্রাণ পাখি যখন ছটফট করত, তার রক্তে রাঙা হয়ে যেত বিলের কালো জল, তখন অমানুষিক বিকট জয়ধ্বনিতে আমরা পরস্পরকে অভিনন্দিত করতাম। আবার আমাদের সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে দিয়ে হাঁসের দল যখন বন্দুকের পাল্লার বাইরে উড়ে পালিয়ে যেত, তখন একটা চাপা আক্রোশে সমস্ত মনটাই যেন কালো হয়ে যেত। এক কথায় আমাদের মনের প্রচ্ছন্ন জল্লাদ-বৃত্তিটা তখন আত্মপ্রকাশের বেশ একটা ন্যায়সঙ্গত এবং নির্দোষ উপায় খুঁজে পেয়েছিল।

এমন সময় একদিন সুধীর বললে, রঞ্জন, একটু হাঁটতে পারবি?

—কেন রে?

—ছোট হাঁস মেরে আর সুখ নেই, বড় গেমের সন্ধান পেয়েছি।

—বড় গেম! বাঘ-ভালুক নাকি?

—দূর, বাঘ-ভালুক কেন। রাজহাঁস।

—রাজহাঁস!

—হাঁ, 'ইটালীয়ান ডাক'। কাল রাত্রে একটা খুব বড় ঝাঁক উড়ে গেছে, ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। এ বছর এই প্রথম এল। কোথায় নেমেছে জানবার জন্যে সকালে লোক পাঠিয়েছিলাম। সে খোঁজ নিয়ে এসেছে ঝাঁকটা পড়েছে মাইল পাঁচেক দূরের কমলার বিলে। মস্ত ঝাঁক, প্রায় হাজারখানেক পাখি আছে।

—এর মধ্যে পালায়নি তো?

—না, না। কমলার বিল খুব ভালো জায়গা—মাইল তিনেকের মধ্যে লোকজন নেই, ডিস্টার্বড হবে না। তা ছাড়া রাজহাঁসগুলো এম্‌নিতেই একটু বেপরোয়া, সুবিধেমতো জায়গা পেলে সহজে নড়তে চায় না। যাবি কাল?

—বেশ, চল্,—

—কিন্তু মাইল পাঁচেক রাস্তা—হাঁটতে হবে। গরুর গাড়িতেও অবশ্য যাওয়া যায়, কিন্তু অনেকটা ঘুরতে হবে, পাকা দশ মাইলের ধাক্কা। দিনটা কাবার হয়ে যাবে।

—তা হলে হেঁটেই যাওয়া যাবে।

—কিন্তু তোর অভ্যেস নেই, হাঁটতে কষ্ট হবে—

মনের জল্লাদটা নেচে উঠেছিল। সোল্লাসে বললাম, না, না, কিছু কষ্ট হবে না। আরে রোমে এসে রোমান না হতে পারলে কী চলে?

পরদিন ভোরের আবছায়া অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়া গেল। মাথায় হ্যাট, কাঁধে ফ্লাস্ক, চাকরের হাতে টিফিন-বাস্কেট আর বন্দুক। যাত্রা করলাম আমরা পাঁচজন।

কোমর সমান বিন্নার বন আর ধানক্ষেতের আল্ ভেঙে মাইল খানেক এগোতেই আকাশ রাঙা করে সূর্য উঠল। সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখিনি, তার বর্ণনা শুনেছি; দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে দু-তিনদিন টাইগার-হিলে চেষ্টা করেছি, কিন্তু মেঘ আর কুয়াশা আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। শুনেছি পাহাড় আর সমুদ্রের সূর্যোদয়ের তুলনা নেই। কিন্তু বাংলা দেশের বিশাল মাঠের ওপরে সূর্য ওঠা দেখেছ কখনো? যদি না দেখে থাকো, জীবনে একটা অত্যন্ত দামী জিনিস হারিয়েছ।

মাঠের পারে সূর্য উঠল। আকাশে ছড়িয়ে গেল সাতরঙের বিচিত্র কিরণলেখা, হাঁসের ডিমের মতো চ্যাপটা একটা বিরাট রক্তের ছোপ বিলের জল আর সবুজ বনান্তকে মায়াময় করে তুলল। সে সূর্যোদয় আমি কখনো ভুলতে পারব না—সেই সূর্যের আলোয় বন-তুলসীর গন্ধ ছিল।

আমি ছিলাম সকলের পেছনে। পায়ের জুতোয় কাঁকর ঢুকেছিল, সেটা ঝেড়ে ফেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেখি ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। তা যাক—সে জন্যে আমার চিন্তা ছিল না। মাঠের পথ, হারাবো বলে ভাবিনি। বিন্নার জঙ্গল ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে, তার আড়ালে দূরে ওদের হ্যাট আর বন্দুকের নল দেখতে পাচ্ছিলাম।

আস্তে আস্তে চলেছি। শরতের রোদ তখন সমস্ত মাঠ-ঘাটের ওপরে পাতলা একটা সিল্কের ওড়নার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট খালের পাশে চলে এলাম। তার ওপরে একটা বাঁশের পুল, সেইটে পেরিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু পুলে পা দিতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি।

চোখে পড়ল কালো পাথরের তৈরি ভেনাস। পূর্ণযৌবনা সাঁওতালের মেয়ে। বিন্নাবনের আড়ালে নির্জন খালের ধারে দাঁড়িয়ে সযত্নে গাত্র মার্জনা করছে। চারদিকের পৃথিবীর মতোই নিঃসংকোচ এবং একান্ত নিরাবরণ! কনক-চাঁপা রঙের রৌদ্রে উদ্ঘাটিত অপূর্ব দেহশ্রী।

কোনো বিবসনা মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকানো ভদ্ররুচির পক্ষে শুধু ধিক্কারজনক নয়, কল্পনাতীত। কিন্তু সেই মাঠ আর সেই সূর্যোদয় সেদিন যে পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, আমার চির-পরিচিত শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবেশের সঙ্গে তার কোনো মিল ছিল

না। লোভের বিকৃত দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে আমি তাকাইনি—সে প্রশ্ন সেখানে সম্পূর্ণই অবান্তর ছিল। শুধু চেতনার মধ্যে মর্মরিত হয়ে উঠছিল : এ আশ্চর্য, এ অপরূপ। মনে হয়েছিল, খালের জল, সূর্যের আলো, গাছপালার গন্ধ, সবাই মিলে যেন কণা কণা সৌন্দর্য দিয়ে ওকে তিলোত্তমা করে গড়ে তুলেছে—গড়ে তুলেছে একটা স্বপ্নের মূর্তি। যে কোনো মুহূর্তে ওই মূর্তিটা মিলে গিয়ে—গলে গিয়ে জলে আলোয় আকাশে হারিয়ে যেতে পারে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল ছিল না। তারপর দেখলাম একপাশ থেকে একখানা ময়লা কাপড় মেয়েটি কুড়িয়ে নিলে। সযত্নে আবৃত করলে দেহ, ওপাশের আলের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলে। খানিকদূর এগিয়েই—হ্যাঁ বন-তুলসী, আমার কৈশোরের সেই বন-তুলসী, তারই নিবিড় বনের আড়ালে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল।

আমার প্রতিটি রক্ত-বিন্দুতে যেন রণিত হয়ে উঠল কৈশোরের সেই গান, সেই মীড় মূর্ছনা। আমার দু'হাতের ভেতরে যেন ফিরে এসেছে একটা কটু কষায় উদ্ভিদ-গন্ধ। আমার পথ ভুল হয়ে গেল, আমার মাথার মধ্যে সব কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেল। কেন যেন মনে হল সেই হারিয়ে-যাওয়া নায়িকা আজ পরিপূর্ণ যৌবনে ওই বন-তুলসীর কুঞ্জে আমারি জন্যে অপেক্ষা করছে।

দিবাস্বপ্ন ? সস্তা রোমান্টিসিজ্‌ম ? তাই হবে। কিন্তু তোমাকে আগেই বলেছি সেই সূর্যোদয়ের কথা, বলেছি আমার মগ্ন-চৈতন্যের ভেতরে সেই বন-তুলসীর বিচিত্র আস্বাদ। হয়তো তখন আমার মনের ভেতরে সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল, চেতনা সত্তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিয়েছিল অবচেতনার আকস্মিক উৎক্ষেপ ; আমি বন-তুলসীর জঙ্গলের দিকে নেমে এলাম।

বহুদিন পরে শরতের রৌদ্র আর বাতাসের ঐকতান মিলল, পরে আমাকে আলিঙ্গন করলে সেই লাল নরম ডাঁটাগুলি, সেই খস্‌খসে পাতাগুলো আমার গালে মুখে ভালবাসার ছোঁয়া বুলিয়ে দিলে। বন ভেঙে আমি এগোতে লাগলাম। কোথায় চলেছি জানি না। আমার নায়িকার সন্ধানে কি ? বোধ হয় তাও নয়। ডাঁটা-পাতার সেই স্পর্শ, দলিত মথিত গাছগুলোর সেই অপরূপ আদিম গন্ধ আর বাতাসের শিরশির শব্দই আমার কাছে একান্ত হয়ে উঠেছিল, সত্য হয়ে উঠেছিল।

ঘণ্টাখানেক বনের মধ্য দিয়ে চলে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম। নিচে মাটি নেই, এত ঘন হয়ে উঠেছে যে ওদেরই একরাশকে চেপে বসতে হল আমাকে। চারদিকে বন-তুলসী আমায় ঘিরে ধরছে—আমার মাথা থেকে প্রায় দু'হাত উঁচুতে উঠে ওরা আমাকে আড়াল করে রেখেছে। কোনোদিকে কিছু দেখবার নেই—শুধু ওপরে নীল নিবিড় আকাশ আর তার কোলে শ্বেত-পদ্মের উড়ন্ত পাপড়ির মতো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের টুকরো।

অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে, সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে নিয়েছিলাম, অবগাহন করে নিয়েছিলাম বন-তুলসীর নিবিড় স্পর্শসান্নিধ্যে। পর পর যখন গোটা পাঁচেক সিগারেট শেষ করেছি তখন খেয়াল হল। তখন আমার মগ্ন-চৈতন্যের ওপরে বাস্তব চেতনার আলো পড়ল। মনে পড়ে গেল, আমি সুধীরদের সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিলাম। ওরা হয়তো এখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠছে, হয়তো ভাবছে—

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় সাড়ে দশটার কাছাকাছি। সর্বনাশ, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। দু পকেট ভরে বন-তুলসীর পাতা আমি ছিঁড়ে নিলাম, তারপর উঠে পড়লাম বেরিয়ে আসবার জন্যে।

কিন্তু আমার মতোই বন-তুলসীও বহুদিন বাদে আমাকে ফিরে পেয়েছিল। আমি ছাড়তে চাইলেও সে আমাকে ছাড়তে রাজী হল না, ঘন-নিবিড় আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরল।

বেরুতে চাই, আর বেরুতে পারি না। মোহভঙ্গের পরে বুঝতে পারলাম কত বড় বোকামি করে ফেলেছি আমি। একটু আগেই তুমি বলেছিলে প্রেমের প্লেটোনিক রূপটাই নিরাপদ। হ্যাঁ, মানুষের পক্ষেও, প্রকৃতির পক্ষেও।

এ বনের যেন শেষ নেই। মনে হতে লাগল এই বন-তুলসীর ঝাড় আদি অন্তহীন,— যেন কার একটা বিচিত্র যাদুমন্ত্রে এত বড় পৃথিবীটার পাহাড়-সমুদ্র-নগর-গ্রাম সব বন-তুলসীর জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আমার অতীত জীবন, আমার সভ্যতা, আমার আত্মীয়-স্বজন, সব মায়া, সব মিথ্যে। এ জঙ্গল থেকে আমি আর কোনোদিন বেরুতে পারব না।

কোনোদিন বেরুতে পারব না! ভয়ে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। আমার প্রেম এখন কোটিভুজ একটা রক্তশোষী জানোয়ার হয়ে আমাকে ঘিরে ধরেছে, তার লাল-লাল ডাঁটাগুলোতে রক্তের তৃষ্ণা, তার শিরশিরে পাতাগুলোর স্পর্শে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা।

ওপরে শরতের রোদ তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে আমার মাথার ভেতরে বিঁধতে লাগল, আমার চোখের দৃষ্টি আসতে লাগল ঝাপসা হয়ে। দু'হাতে জঙ্গল ঠেলে আমি এগোতে লাগলাম, কিন্তু বৃথা। এ বনের শেষ নেই—এর ভেতর থেকে কোনোদিন লোকালয়ে যাবার পথ খুঁজে পাবো না আমি। মাথা উঁচু করে জগৎটাকে দেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু চার-পাশের উঁচু-নিচু অসমতল জমির ওপরে আমার অভিশপ্ত প্রেম ছাড়া আর কিছু নেই, কোনো কিছুর চিহ্নই নেই!

প্রাণপণে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি—কিন্তু জঙ্গল ভেঙে ভেঙে আমার সমস্ত শক্তিই যেন নিঃশেষিত হয়ে গেছে। সামনে এগোবার চেষ্টা করে বার কয়েক হুমড়ি খেয়ে পড়ে

গেলাম। এক পায়ের জুতো কোথায় ছিটকে চলে গেল, টের পেলাম পকেট থেকে পড়ে গেল মনি-ব্যাগটা। কিন্তু সেগুলো খোঁজবার অবস্থা নয়, বেরুতে হবে, যেমন করে হোক বেরুতে হবে। মনে হতে লাগল কোথায় কতদূরে আমার কলকাতা, তার বাড়িঘর, তার ট্রাম-বাস, তার সুন্দর স্বাভাবিক জীবন! আজ এই বন-তুলসীর জঙ্গলের ভেতরে আমি মরে যাচ্ছি—কেউ আর কোনোদিন আমায় খুঁজে পাবে না!

অসহায় গলায় বার কয়েক চেঁচিয়ে উঠলাম; কিন্তু কে সাড়া দেবে? সেই আদিগন্ত মাঠের ভেতরে আমার অবরুদ্ধ আর্তনাদ শুনবে কে? কোনো আশা নেই, কোনো উপায় নেই। হয় এখানে দম আটকে মরে যাবো, নইলে সাপে কামড়াবে—আশেপাশে বাঘ থাকাও অসম্ভব নয়!

আর একবার শেষ শক্তিতে এগোবার চেষ্টা করেই একরাশ গাছের সঙ্গে পা জড়িয়ে আমি পড়ে গেলাম। বন-তুলসীরা সাপের মতো কিলবিল করে আমাকে আঁকড়ে ধরল। জ্ঞানটা সম্পূর্ণ লোপ হয়ে যাওয়ার আগে মনে হল: এইখানে মরে যাবো আমি, পচে গলে আমার দেহটা এখানকার মাটিতে মিশে যাবে। তারপর আমার শরীরের সারে এখানে মাথা তুলবে আরো সতেজ, আরো নিষ্ঠুর, আরো একরাশ বন-তুলসী, নিশ্চিহ্ন করে ওরা আমাকে গ্রাস করবে, আত্মসাৎ করে নেবে—

কিন্তু জঙ্গলের বাইরে আমার টুপিটা কুড়িয়ে পেয়েছিল বলেই অজ্ঞান অবস্থায় সে-যাত্রা আমাকে উদ্ধার করতে পেরেছিল সুধীর। রক্ষা করতে পেরেছিল আমার নায়িকার সেই ঊর্ণনাভ-প্রেম থেকে।

তাই তোমাকে বলছিলাম, তবু আমাদের কলকাতাই ভালো। আর ভালো মানুষের প্রেম, যেখানে তুমি না থাকো, সৃষ্টির স্বাক্ষর সন্তানের মধ্য দিয়ে তুমি বেঁচে থাকবে—প্রকৃতির মতো মানুষের পৃথিবী যেখানে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে নিজের ভেতর তোমাকে একেবারে অবলুপ্ত করে নেবে না।

জীবাণু

পাহাড়ী আকাশে দিব্যি রোদ ঝিলমিল করছিল—হঠাৎ সব ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। সারদা-প্রসাদ টের পেলেন নিবিড় ভাবে ফগ ঘনিয়ে আসছে। সামনে স্ট্যাণ্ডের গায়ে ফিট করা আয়নাটার দিকে তাকালেন, উজ্জ্বল কাচের ওপর জলের রেণু ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

ফগ ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ একটা খুশিতে মনটা যেন পূর্ণ হয়ে উঠল সারদাপ্রসাদের।

বেশি আলো ভালো লাগে না তাঁর, ভালো লাগে না দিবালোকের অতি প্রগল্‌ভ উজ্জ্বলতা। কুয়াশার এই প্রায়ান্ধকার বিষণ্নতার সঙ্গে তাঁরও মনের একটা অন্তরঙ্গ সংযোগ রয়েছে। আস্তে আস্তে ধোঁয়ার মতো তাঁর চারদিকে সঞ্চিত হতে থাকে, তারপর ক্রমশ নিজের হাত-পাগুলো পর্যন্ত আর স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না। সারদাপ্রসাদের মনে হয় নিজের বিগত জীবনটা। এম্‌নি করে যদি স্মৃতির সম্মুখ থেকে আবছায়া হয়ে যেত—মগ্নচৈতন্যের চারদিকে যদি আবর্তিত হতে থাকত এম্‌নি একটা সীমাহীন ধূসরতা, তা হলে—

—আর একটা কম্বল দেব বাবু? ঠাণ্ডা লাগছে?—চাকরের প্রশ্ন এল।

—নাঃ, থাক।

ফগ আসছে—সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে প্রেমের মতো—রাশি রাশি শীতল চুম্বনের মতো। সারদাপ্রসাদ শুনেছেন প্রেমে উত্তাপ আছে, আছে মানুষের রক্তকে সজাগ সচেতন করে তোলবার নিবিড় একটা কবোষ্ণতা। কিন্তু মানুষের প্রেমের পরিমিতি থেকে তিনি আজ বহুদূরে। আজ যে পৃথিবীর উন্মুক্ত উদার প্রেমের মধ্যে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানে বৃষ্টি, সেখানে ফগ, সেখানে বরফ গলা শীতল ঝর্ণা আর পাইন দেওদারের মর্মর।

কী হতে চলেছিল জীবন, কী হয়ে গেল।

ফগ এসেছে। বুকের ওপরে কম্বলে ঢাকা শরীরটা তার ভেতরে ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে মনে হবে হারিয়ে যাচ্ছেন সারদাপ্রসাদ, তলিয়ে যাচ্ছেন জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের নেপথ্যলোকে। এই কি মৃত্যু—একেই কি উপসংহার বলে? একটা নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ততা, সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, যা কিছু দেনা-পাওনা একেবারে কড়ায় গণ্ডায় শোধ হয়ে গেছে—শুধু শান্ত অনাসক্ত মনে হারিয়ে যাওয়ার, ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রতীক্ষা। বাতাস যেমন করে ফুলের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেম্‌নি ভাবে যা কিছু ভাব ভাবনা চিন্তা কল্পনাকে নিঃশেষে উড়িয়ে দিয়ে পাপড়ির মতো ঝরে পড়া।

কিন্তু এই মৃত্যু কি চেয়েছিলেন সারদাপ্রসাদ? কখনো কি কল্পনা করেছিলেন এমন ভাবে ফুরিয়ে যাওয়াটা?

না, তা নয়। তিনি তো বরং পরিপূর্ণ জীবনেরই কামনা করেছিলেন—চেয়েছিলেন সূর্যালোকপ্রদীপ্ত উজ্জ্বল একটি পরিপূর্ণ বাঁচাকে। আঘাত, ব্যথা, দুঃখ, ভুল আর গ্লানির মধ্য দিয়ে কামনা করেছিলেন এদের সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে যে জীবনসত্তা, তাকেই। কিন্তু কী হয়ে গেল। পথে নামবার আগেই হারিয়ে গেল পথ।

বারো বছর আগেকার কথা। সারদাপ্রসাদ তখন লণ্ডনে—সেইবারেই ডাক্তারীর শেষ ডিগ্রিটা পাবার কথা। কৃতী ছাত্র সারদাপ্রসাদ, পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে কারো মনেই সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না। আর ছিল আশা, সামনে প্রসারিত ছিল অজস্র অতুল

সম্ভাবনা। কলকাতায় ফিরে বাপের বিপুল প্র্যাক্টিস এবং প্রকাণ্ড ল্যাবরেটরীটা নিয়ে তিনি অদম্য উৎসাহে কাজে লেগে যাবেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এমন একটা স্থায়ী কীর্তি রেখে যাবেন যে মানুষে চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করবে।

আর এই স্বপ্নকে যে আরো মধু-মদির করে তুলেছিল গ্ল্যাডিস্ তার নাম। গ্ল্যাডিস্ থার্স্টন। সমুদ্রপারের নীলিমা ওর চোখে, ওর ঠাকুরমা নাকি জার্মান ছিলেন। আল্‌পসের তুষার ওর দেহবর্ণে—ওর রক্তে রক্তে ইয়োরোপের জাগ্রত যৌবন। সারদাপ্রসাদের জীবনে দুরন্ত মৌসুমী বাতাসের মতো ওর আবির্ভাব, স্নিগ্ধ-সজল অথচ উদ্দাম।

পরীক্ষার অতি পরিশ্রমেই বোধ হয় শরীরে ভাঙন ধরলো। গ্ল্যাডিস্ এসে বললে, না না, এ চলবে না। দিন কয়েক বাইরে গিয়ে শরীরটা সারিয়ে এসো।

সারদাপ্রসাদ প্রতিবাদ করলেন, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? এ তো এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। খুব বেশি পরিশ্রমের জন্মেই বোধ হয় এমনটা হয়েছে—পরীক্ষাটা মিটে গেলেই শরীর আবার সেরে উঠবে।

গ্ল্যাডিস্ বললে, না, সে হবে না। এবার পরীক্ষা দিতে না পারলে বেশি ক্ষতি হবে না, বেশি ক্ষতি হবে শরীরটা ভেঙে পড়লে। তোমাকে আর আপত্তি করলে চলবে না—কিছু-দিনের জন্যে বেরিয়ে পড়তেই হবে।

ডাক্তার সারদাপ্রসাদও নিজের সম্বন্ধে একান্ত অচেতন ছিলেন তা নয়। নিজেও বেশ বুঝতে পারছিলেন শরীরের মধ্যে এমন একটা কিছু ঘটেছে যা সাধারণ ক্লান্তি নয়, তার চাইতে আরো কিছু বেশি—কিছুটা পরিমাণে সন্দেহজনক। কাজেই দ্বিধা থাকলেও আপত্তি করতে পারলেন না—গ্ল্যাডিসের প্রচণ্ড তাগিদে এবং কিছুটা মানসিক অস্বস্তিতে তিনি শেষ পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ড রওনা হয়ে গেলেন।

প্রথম কিছুদিন চমৎকার কাটল। চারদিকের অবারিত সৌন্দর্যের মাঝখানে, লণ্ডনের শ্বাসরোধী কয়লার বাষ্পে বিষাক্ত বাতাসের বাইরে খোলা হাওয়ায় শরীরটা একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু মাত্র কয়েকটি দিনের জন্মেই। তারপরেই সত্য আত্ম-প্রকাশ করল, মৃত্যুর চাইতেও নিষ্ঠুর ভয়ংকর সত্য। এক মুহূর্তে চোখের সামনে থেকে দপ করে পৃথিবীর সূর্যালোক নিবে গেল।

ঘাড়ের নিচে মেরুদণ্ডে টিউবারকুলোসিস। মরণের নির্ভুল পরোয়ানা।

মিথ্যে হয়ে গেল পৃথিবী, মুছে গেল জীবনের সোনালি রঙ। ডাক্তারেরা বললেন, অপারেশন করে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। তা ছাড়া আর কোনো আশাই নেই।

শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হল না। সারদাপ্রসাদ বেঁচে উঠলেন, কিন্তু সে বাঁচা মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর। সে বাঁচা জীবনের প্রতি একটা মর্মান্তিক ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। শেষ

পরীক্ষায় পাস করা আর হল না, প্র্যাকটিস আর ল্যাবরেটরী হয়ে গেল একটা বেদনাবিদ্ধ মরীচিকা, আর গ্ল্যাডিস্? ইংলিশ-চ্যানেলের নীল জলে কোথায় সে নীল চোখ দুটি যে হারিয়ে গেল—সারদাপ্রসাদ তা কি জানেন? সূর্যালোকের মতো উজ্জল ওর জীবন—এই মেঘাচ্ছন্ন ধূসরতায় ও কল্পনার চাইতেও অবাস্তব।

কপ কেটে গেছে। আবার রোদ ঝলমল করে উঠল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন সারদাপ্রসাদ। ভারী চমৎকার স্নো-ভিউ পাওয়া যাচ্ছে আজকে—কাঞ্চনজঙ্ঘা ওদিকের সম্পূর্ণ আকাশটাকে অধিকার করে রাজমহিমায় বিরাজ করছে। মনে পড়ে সুইজারল্যাণ্ডকে, মনে পড়ে আল্প্সের সেই চিরশুভ্র তুষারবিস্তারকে। সে তাঁকে আশা দিয়েছিল, আশ্বাস দিয়েছিল; আর এই তুষারে আজ তাঁর চৈতন্য হিমশীতল আচ্ছন্নতার মধ্যে সমাহিত হয়ে যাচ্ছে।

চাকর এল: বাবু পাইপ দেব?

—আচ্ছা, দে।

চাকর পাইপ এনে দিলে। সেইটে ধরিয়ে নির্নিমেষ ভাবে সামনের আয়নাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন সারদাপ্রসাদ। সত্যি চমৎকার লাগছে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে। ওপাশের জংলা কালো পাহাড়টার মাথার ওপরে তার রাজকীয় বিস্তার। এ পাহাড়গুলোর চাইতে সে কত স্বতন্ত্র, অভিজাত। বর্ণে, গৌরবে, ঔজ্জ্বল্যে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করছে সে এদের সগোত্র নয়।

এই ঔজ্জ্বল্য, এই গৌরব তো সারদাপ্রসাদের জীবনেও আসতে পারত। সাধারণের মাঝখানে মিশে জলবিন্দুর মতো তিনিও অনায়াসেই হারিয়ে যেতেন না। বিদ্যায়, ঐশ্বর্যে, প্রতিভায় তিনিও জলজল করতেন, হয়তো চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা তাঁকে ওই কাঞ্চনজঙ্ঘার মতোই একটা একক মহিমা দিয়ে ভূষিত করে রাখত। কিন্তু—

কিন্তু সারদাপ্রসাদ উঠতে পারেন না। কাঁধ আর গলার মাঝামাঝি অনেকটা জায়গার হাড় একেবারে কেটে বাদ দিতে হয়েছে, উঠে দাঁড়াতে গেলেই মাথাটা পেছনের দিকে ভেঙে পড়তে চায়। সুতরাং দিনরাত বিছানাতেই পড়ে থাকতে হয়। ইচ্ছেমতো মাথাটা ঘোরাবার উপায় পর্যন্ত নেই—বিছানায় একইভাবে চিত হয়ে পড়ে থাকাই হচ্ছে তাঁর দৈনন্দিন জীবন। মুখের সামনে স্প্রীংয়ের আয়না ফিট করা রয়েছে, চারদিকের দৃশ্য দেখবার জন্যে আয়নাটাকে তিনি যেদিকে ইচ্ছে ঘোরাতে পারেন। সাদা চোখে সহজভাবে জগৎকে দেখবার অধিকার থেকে পর্যন্ত তিনি বঞ্চিত। তাও তাঁকে দেখতে হয় প্রতিচ্ছায়ার ভেতর দিয়ে। আশ্চর্য, সারদাপ্রসাদ বেঁচে আছেন।

বেঁচে আছেন বইকি; এই বারো বছর ধরে এইভাবেই তো বেঁচে আছেন তিনি। যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান আর যে মানব-সমাজকে তিনি দু'হাতে দান করতে চেয়েছিলেন, আজ

তাদেরই দানের ওপর তাঁকে নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। জীবনের কাছে তিনি অনিবার্য অপরিহার্য নন, জীবনের ওপরে একটা অসহ্য অহেতুক বোঝা মাত্র। চাকরদের অনুগ্রহে তাঁর দিন কাটছে, ইচ্ছে করলে যে কোনো মুহূর্তে ওরা তাঁর গলা টিপে মেরে যথাসর্বস্ব নিয়ে চম্পট দিতে পারে।

আশ্চর্য এই বেঁচে থাকা। পাহাড়ের মাথার ওপর নিঃসঙ্গ বাংলো বাড়ি। পাশ দিয়ে একটা শুকনো ঝর্ণা, বর্ষাকালে তাই দিয়ে নামে মুক্তা-গলানো জলের ধারা। আর চারপাশে পাইনের বন—এক-একটা রাত্রে যখন বৃষ্টিবাতাসের খেয়ালী ক্ষ্যাপা মাতামাতি শুরু হয়, তখন ওই পাইন গাছের ঘন-নিবদ্ধ সূক্ষ্মাগ্র কালো পাতাগুলোর ভেতর থেকে যেন অদ্ভুত একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, মনে হয় যেন ওদের ভূতে পেয়েছে। আর সেই সব রাত্রে ভয় করতে থাকে সারদাপ্রসাদের—সজাগ হয়ে ওঠে মনের কাছে নিজের অসহায় একাকিত্বের অচেতন অনুভূতিটা। মনে হয় পাহাড়ের মাথার ওপর এই বাংলোটা বড় বেশি নির্জন, তিনি বড় বেশি নিঃসঙ্গ, কারো অঙ্গের উষ্ণ স্পর্শ ছাড়া এত পুরু আর দামী দামী পালকের লেপেও তাঁর শীত কাটছে না।

সেইসব রাত্রে সারদাপ্রসাদ যেন অসংযত হয়ে ওঠেন—মাথার মধ্যে যেন কেমন সব বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে নিজের হাতে নিজের গলাটাকে নিষ্পিষ্ট করে দিতে, ইচ্ছে করে মানুষ খুন করতে। কী অপরাধ করে-ছিলেন সারদাপ্রসাদ, কার কাছে করেছিলেন? কে এমনভাবে একটি ফুঁ দিয়ে তাঁর জীবনের যা কিছু আলো নিবিয়ে দিয়ে চলে গেছে? বারো বছর কেটে গেল, অতিক্রান্ত হয়ে গেল একটা যুগ। তবু এখনো সময় আছে, এখনো যৌবন আছে তাঁর। সমস্ত শরীর তাঁর স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, দুধেআলতায় মেশানো তাঁর গায়ের রঙ, রূপবান হিসেবে নিঃসংশয়ে তিনি গর্ব করতে পারেন, তাঁর বিদ্যা আছে; অর্থের অপ্রাচুর্য নেই—প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁর সুস্থ, কর্মক্ষম। তবু তাঁর কিছু নেই। তাঁকে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে, তাঁকে চাকরের অনুগ্রহের ওপরে অসহায় শিশুর মতো নির্ভর করতে হবে, তাঁকে আয়নার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি দেখে খুশি থাকতে হবে, আর মৃত্যুর চাইতে অনেক ভয়ংকর, অনেক দুর্বিষহ যে জীবন—সেই জীবন বয়ে তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে।

কোনোকালে ঈশ্বর মানেননি সারদাপ্রসাদ—আজও মানেন না। বস্তু-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে এসেই মনের ভেতর থেকে ওই সংস্কারটাকে তিনি সমূলে উৎপাটিত করতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে আজ মনের কাছে তিনি মুক্তি পেতে পারতেন, নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে পারতেন, এর জন্যে তিনি দায়ী নন, এ তাঁর কৃতকর্মের প্রতিফল, এ তাঁর জন্মান্তরের পাপ, হয়তো বা কোনো গো-হত্যা ব্রহ্মহত্যার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। এবং এও হয়তো তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন যে ইহজন্ম এই দুঃখদুর্গতির

শোচনীয় মর্মবেদনায় মধ্যে কাটালেও পরজন্মে এবং পরকালে তাঁর একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত নিঃসন্দেহে হয়ে যাবে।

কিন্তু সে পথ তাঁর বন্ধ—তাঁর পায়ের তলা থেকে দাঁড়াবার সে মাটি সরে গিয়েছে। বস্তুবাদী হিসাবে তিনি জানেন, ঈশ্বর-কল্পনা মানুষের অজ্ঞান অবুদ্ধির পরিণাম, জন্মান্তরবাদ আষাঢ়ে গল্পের চাইতে একটু বেশি মুখরোচক এই মাত্র। তবু সারদাপ্রসাদের আর্তনাদ করে উঠতে ইচ্ছে করে, দার্শনিকের বিখ্যাত উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছে করে : যদি ঈশ্বর নামে কেউ থাকো, তবে হে ঈশ্বর, বিচার করো, উদ্ধার করো আমাকে, আমার জীবন আমাকে ফিরিয়ে দাও—

চাকর এসে দাঁড়াল।

—বাবু, চা এনেছি।

সারদাপ্রসাদ পাইপটা পাশের টেবিলে নামিয়ে রেখে হাত বাড়ালেন। একটা ফিডিং কাপে করে চাকর চা এগিয়ে দিলে। নিঃশব্দে সারদাপ্রসাদ কাপে চুমুক দিতে লাগলেন।

—ওরে, ডাক এসেছে ?

—হ্যাঁ বাবু, এই দিয়ে গেল। আপনার টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছি।

—আচ্ছা যা, আমি দেখবখন।

চায়ের পাত্র শেষ করে আবার পাইপ ধরালেন সারদাপ্রসাদ, তারপরে আগ্রহভরে ডাকের দিকে হাত বাড়ালেন। চিঠিপত্র নেই, লেখবারও কেউ নেই। সপ্তাহে দুখানা করে বাড়ির চিঠি আসে, কুশল নেওয়ার সহজ ভদ্রতাটুকুর আদান-প্রদান চলে। কুশল! সারদাপ্রসাদের হাসি পায়। তিনি ভালো আছেন কিনা এ খবরটা নিয়মিত না জানালে নাকি বাড়ির লোকের দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। দুশ্চিন্তাই বটে।

আজ চিঠি নেই—বাড়ির চিঠি আসবার দিন নয় আজকে। এসেছে দু-তিনখানা পত্র-পত্রিকা। একখানা খবরের কাগজ, আর বাকি দুখানা বিলিতি মেডিক্যাল জার্নাল। অন্ধকার জীবনের একফালি পিছলে-পড়া সূর্যের আলো।

খবরের কাগজটা ঠেলে সরিয়ে রাখলেন সারদাপ্রসাদ। খবরের ওপর কোন মোহ নেই তাঁর, কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই। পৃথিবীতে কোথায় কোন্ যুদ্ধ হচ্ছে, কোথায় বোমার বহরের বর্ষণে জার্মানীর আধখানা শহরকে বেমালুম উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কোথায় ধানের ক্ষেতে পঙ্গপাল নেমে ফসলের সর্বনাশ করে দিয়েছে, কোন্ নেতা গর্জন করে বলেছেন এক মাসের মধ্যে তিনি বক্তৃতা দিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করে নেবেন এবং কোন্খানে একটা গোরুর পাঁচপেয়ে বাচ্চা হয়েছে, এসব মূল্যবান খবরাখবরের কোনো লোভ, কোনো আকর্ষণ নেই সারদাপ্রসাদের। ও পৃথিবী তাঁর কাছে রূপকথা, ও পৃথিবী তাঁর কাছে জন্মান্তরের মতো একটা আষাঢ়ে গল্পের অতিরিক্ত কিছু নয়। পাহাড়ের ওপরে এই ছোট বাংলোটিতে

ওদের কোনো তরঙ্গই কলকল্লোলে এসে মুখরিত হয়ে পড়বে না—আন্দোলিত করে তুলবে না চারপাশের উদ্ধত পাইনের অরণ্যকে, প্লাবন নামিয়ে দেবে না শুকিয়ে মরে থাকা ছোট্ট পাহাড়ী ঝর্ণার বুকে।

তার চাইতে—অনেক বেশি আগ্রহ, অনেক বেশি উত্তেজনা নিয়ে মেডিক্যাল জার্নাল দুটোর মোড়ক ছিঁড়লেন তিনি। শুধু নিজের রুচিগত কৌতূহল নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাও নয়। ডাক্তার সারদাপ্রসাদ তার চাইতে অনেক বেশি প্রত্যাশা করেন। ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস নেই, মির‍্যাক্‌লে আস্থা নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের ঈশ্বর ল্যাবরেটরীর টেস্ট-টিউবে স্বতঃপ্রকাশ, তার রাজ্যে যে-কোনো মুহূর্তে মির‍্যাক্‌ল ঘটে যেতে পারে।

সেই মির‍্যাক্‌লের স্বপ্নই দেখেন সারদাপ্রসাদ, সেই মির‍্যাক্‌লের জন্যেই তিনি প্রতীক্ষা করে আছেন। কিছুই বলা যায় না, হয়তো এখন কল্পনাও করা যায় না; তবু পত্রিকার পাতা খুলেই হয়তো দেখতে পেলেন কোনো একটা নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হয়েছে, যার বলে তাঁর ঘাড়ের কাটা হাড়কে নতুন করে জোড়া লাগানো যায়! আর সেই মুহূর্তে? সেই মুহূর্তে তাঁর সামনে নতুন করে প্রাণের সিংহদ্বার মুক্ত হয়ে যায়, সেই মুহূর্তেই তিনি বলতে পারেন: এই পাহাড়ী বাংলো নয়, এই মেঘ আর কুয়াশার বেদনাচ্ছন্ন নির্বাসন নয়, জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে এই শূন্যতার বিলাপ নয়। তিনি আবার মাথা তুলে দু পায়ে ভর দিয়ে মানুষের মতো দাঁড়াবেন, এক আছাড়ে ভেঙে ফেলে দেবেন ছবি দেখানো এই আয়নাটাকে। তারপর বুক সোজা করে নেমে আসবেন ওই খবরের কাগজটার মধ্যে, ওই কাগজটার জাগ্রত চঞ্চল বহুবিক্ষুব্ধ পৃথিবীর পটভূমিতে। শুধু ওইখানে তিনি থামবেন না—তারপর আবার নীল-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলে যাবেন সেই নীলনয়নার সন্ধানে; যদি তাঁকে খুঁজে পান, পুরুষের মতো—নীরোগ স্বাস্থ্যবান যে পুরুষ কাঁধের ওপর মাথাটাকে সোজা রেখে দাঁড়াতে পারে তার মতো সতেজ কণ্ঠে বলবেন: আমি ফিরে এসেছি, তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো।

কিন্তু স্বপ্ন—দিবাস্বপ্ন। মেডিকেল জার্নালের পাতায় সদ্য-আবিষ্কৃত দশ হাজার গুণ ম্যাগ্‌নিফাই করা ব্যাক্‌টিরিয়ার ছবি আছে, তাদের প্রাণতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। কিন্তু মানুষের কথা নেই, তাঁর মতো একটা বলিষ্ঠ, শক্তিমান, কীর্তিমান মানুষকে বাঁচিয়ে তোলবার প্রতিশ্রুতি নেই কোনো। কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো উজ্জ্বল মহীয়ান একটা মানুষের মৃত্যুর মতো বাঁচাকে আলোকিত করে তোলবার কোনো আশ্বাস নেই, আছে অতি শক্তিশালী মাইক্রোস্‌কোপের লেন্সেও যা ধরা পড়ে না, সেই অলক্ষ্যপ্রায় জীবাণুর জীবনের অতি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা! ডায়াগ্রাম, ফোটোগ্রাফ, ক্যালকুলেশন!

কাগজ দুটোকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সারদাপ্রসাদ।

আয়নার মধ্যে আলো ম্লান হয়ে এলো। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টি

নেমেছে। সারদাপ্রসাদ ভাবতে লাগলেন, নিজের হাতে গলা টিপে আত্মহত্যা করাটা সম্ভব কিনা?

—কে ওখানে?

আয়নায় ছায়া পড়ল। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একটি পাহাড়ী দম্পতি এসে আশ্রয় নিয়েছে বাংলোর বারান্দায়। স্বাস্থ্যে, যৌবনে টলমল করছে। বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে সেই আনন্দে দুজনে হেসেই আকুল। এতটা পাহাড় ভেঙে উঠেছে অথচ এতটুকু হাঁপাচ্ছে না, একবিন্দুও ক্লান্তি বোধ হয়নি।

সারদাপ্রসাদ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। চিৎকার করে উঠলেন: বীরু, বীরু?

চাকর বীরু ছুটে এল।

—কোথায় থাকিস, কী করিস হতভাগা? দুটো পাহাড়ী উঠেছে বারান্দায়—তাড়িয়ে দে এক্ষুণি।

হুকুম পালন করতে বীরু এক পায়ে খাড়া। এগিয়ে গিয়ে বললে, হটো, হটো।

—কেন বাপু? বৃষ্টিতে একটু দাঁড়ায়েছি—পাহাড়ী ভাষায় ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালে ওরা।

—না, না, ওসব চলবে না, বাবুর পছন্দ নয়। যাও হটো—

তেমনি হাসতে হাসতে ওরা নেমে গেল। দুঃখিত হয়নি, অপমানিতও না। সহজ স্বাভাবিক জীবনে এসব ধুলোবালি ওদের হাওয়ায় উড়ে যায়। বৃষ্টির ভেতরে ভিজতে ভিজতে ওরা খাড়াই পাহাড়ী পথটা দিয়ে অবলীলাক্রমে নিচে নামতে লাগল, স্বাস্থ্য আর যৌবনের নির্ভুল প্রতীক।

সারদাপ্রসাদ বললেন, এখুনি ফিনাইল ছিটিয়ে দে—লাইজোল স্প্রে করে দে। সাত-জন্মে ব্যাটারা স্নান করে না, ওদের জামা-কাপড়ে দুনিয়ার যত জার্মের আস্তানা। যা—যা, দেরি করিস নে—

জীবাণুকে ভয় করেন সারদাপ্রসাদ, ভয় করেন মৃত্যুকে। আশ্চর্য, সারদাপ্রসাদ বাঁচতে চান। কিন্তু সত্যিই কাকে ভয় করেন তিনি? ওদের জামাকাপড়ের ব্যাক্‌টিরিয়াকে, না ওদের পাথুরে শরীরের শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে প্রবহমান যৌবনকে? জীবনকে, না জীবাণুকে?

আয়নার মধ্যে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ অন্ধকার।

চারতলা

ম্যানেজিং এডিটার নিজের ছোট্ট ঘরটিতে চুপ করে বসেছিলেন। পর্ব উপলক্ষে আজ অফিস আর প্রেস সমস্ত ছুটি। কাল কাগজ বেরুবে না—তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের নিয়মিত নির্ভুল ধারাটিতে আজ ছেদ পড়েছে। প্রখর কর্মব্যস্ততায় সমস্ত অফিসটা আজ চঞ্চল হয়ে উঠছে না, এঘরে ওঘরে কলিং বেলের উদ্বিগ্ন তীক্ষ্ণ আহ্বান শোনা যাচ্ছে না, পাশের ঘরে তাঁর সেক্রেটারীর টাইপরাইটারটা বাঁধা জলদে বেজে চলছে না এবং নিচের তলার মেশিন-ঘর থেকে আসছে না রোটারীর গর্জন। একটা বিচিত্র অস্বস্তিকর স্তব্ধতায় সব কিছু যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। শুধু নিতান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনের দাবিতে যাদের অফিসে আসতে হয়েছে—সেই দু-তিনটে মানুষ হয়তো এখানে ওখানে পড়ে ঝিমুচ্ছে—কেউ টেবিলে মাথা রেখে, কেউবা টেলিপ্রিণ্টারের ওপরে ঝুঁকে পড়ে।

কাজ নেই, তবু ম্যানেজিং এডিটার অফিসে এসেছিলেন। পত্রিকাটা যদিও লিমিটেড কোম্পানি, তবু এই কাগজের চৌদ্দ আনা অংশীদার তিনি—অর্থাৎ মালিক। নিজের সমগ্র জীবনের নিষ্ঠা আর সাধনা দিয়ে এই কাগজখানাকে তিনি গড়ে তুলেছেন—আজ এই কাগজ শুধু বাংলা দেশের নয়, ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রের গৌরব দাবি করতে পারে। এর সম্পাদকীয় নিবন্ধের ওপরে আজ দেশের জনমত গড়ে উঠছে—নেতাকে সিংহাসনে বসানো এবং সেখান থেকে ইচ্ছামতো তাঁকে ধুলোকাদায় টেনে নামাবার অসীম ক্ষমতাও এই কাগজেরই আয়ত্ত। ম্যানেজিং এডিটারের জীবন-স্বপ্ন সার্থক হয়েছে—আজ তিনি চরিতার্থ, তিনি জয়ী।

নামকরা কাগজ—দেশের যোগ্যতম সম্পাদক সহ-সম্পাদকেরা তাঁর কাগজে কাজ করেন। তিনি এক বছর চোখ বুজে থাকলেও নির্ভুল নিয়মে বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী কাগজ আত্মপ্রকাশ করবে—অব্যাহত থাকবে তার ঐতিহ্য। তবু তিনি একটি দিনও অফিস কামাই করেন না। পঁচিশ বছর ধরে কাগজের সঙ্গে অস্থিমজ্জায় তিনি এমনভাবে জড়িয়ে আছেন যে, দৈনন্দিন অভ্যাসের দাবিতেই অন্তত এক ঘণ্টার জন্যেও তাঁকে অফিস থেকে ঘুরে যেতে হয়।

বেলা চারটে বাজল। ওঠবার উপক্রম করেই তিনি আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। বৃষ্টি নেমেছে—বেশ জোর বৃষ্টি। গাড়িটা খারাপ বলে আজ তিনি ট্যাক্সি করে এসেছিলেন। এখন একটা ট্যাক্সির সন্ধান করতে হলে অনেকটা এগিয়ে যেতে হবে এবং ফলে ভেজাটা অবশ্যম্ভাবী। ছাতা বা রেনকোটও সঙ্গে নেই। অফিসে দু-একটা বেয়ারা এসেছে—ওদের বললে এখুনি ট্যাক্সি ডেকে দেয়; কিন্তু থাক—দরকার নেই। একটু বসাই যাক বরং।

ব্ল্যাক্ অ্যাণ্ড্ হোয়াইটের টিন খুলে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন এমন সময় চোখে পড়ল ঘরের এক কোণে একটা পোড়া বিড়ি! এখানে বিড়ি! এখানে বিড়ি এল কী করে? তাঁর নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন তো ওঠেই না—এখানে এমন কোনো অনভিজাতেরও আবির্ভাব ঘটে না যাদের রুচিটা ওই স্তরে গিয়ে নেমেছে। খুব সম্ভব তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনো কর্মচারী এখানে এসে বিড়ি টেনেছে। নাঃ, ছোক্‌রা সাব-এডিটারগুলো আজকাল কিঞ্চিৎ বেয়াড়া হয়ে উঠছে। ওদের জনকয়েককে একটু পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

এক টুকরো পোড়া বিড়ি। বিতৃষ্ণভাবে তার দিকে বার কয়েক তাকাতেই হঠাৎ কী হল কে জানে। অফিসটা আশ্চর্যভাবে নিঃশব্দ, বাইরে ঝমঝম্ করে বৃষ্টি চলছে, ঘরের মধ্যে একটা শান্ত কোমল ছায়া নেমে এসেছে। নিঃসঙ্গ ম্যানেজিং এডিটারের চোখের সামনে যেন একটা মিলনান্তক কাহিনীর পাণ্ডুলিপি পড়ে ছিল—একটা দমকা বাতাসে তার অনেকগুলো পাতা সামনের দিকে ফরফর করে উলটে গেল। চলে এল একেবারে প্রথম অধ্যায়ে—যখন দ্বন্দ্ব, যখন দুঃখ, যখন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—যখন এই রকম একটা আধ-পোড়া বিড়িও অন্যের কাছ থেকে তাঁকে ধার করে নিতে হত—

সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের একটা মেসবাড়ি। পুরনো বাড়ি—সস্তার মেস। আর সব চাইতে সস্তা নিচের তলার এই প্রায়ান্ধকার ঘরখানা। সামনেই স্নানের বড় চৌবাচ্চাটা, আটটা বাজতে না বাজতেই পাঁচ-সাতজন গামছা পরে পরমোৎসাহে স্নান-পর্ব শুরু করে দিয়েছে। তারই একদিকে ঝি নোংরা বাসনের ভাঁই নিয়ে বসেছে, ছাই আর উচ্ছিষ্টের মিলনে একটা বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে ওখানে।

এরই মুখোমুখি ঘরখানা। সামনে দুটো দরজা ছাড়া তিনদিকের নোনাধরা দেওয়ালে ও-সবের আর বালাই নেই কিছু। চোখে যথেষ্ট জোর না থাকলে বেলা বারোটার ঝক্‌ঝকে রোদ্দুরের সময়েও এঘরে বসে লেখাপড়া করা শক্ত। এই ঘরে দু-তিনটে খাট একসঙ্গে জড়ো করে নিয়ে চার-পাঁচটি যুবক প্রচণ্ডভাবে মেতে উঠেছে।

একজন বলছিল, সত্যিকারের অনেস্ট জার্নালিজ্‌ম আমরা করবই, তার জন্যে যা হবার হোক।

অপরজন জবাব দিলে, মানে সিডিসন। জেল খাটতে হবে।

—বেশ তো, খাটব। সম্পাদক যখন হয়েছি তখন তার জন্যে তৈরিই আছি।

—আর ভুলে যাচ্ছ কেন, আমি মুদ্রাকর ও প্রকাশক, প্রেস অ্যাক্টের পয়লা ফাঁসটা আমার গলাতেই এসে পড়বে?

—পড়ুক না। খবরের কাগজের ব্যবসা তো করতে নামোনি, নেমেছ দেশের সেবায়। না হয় জেল খাটলেই বা দু-এক মাস—সস্তায় শহীদ হতে পারবে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক ভ্রূকুটি করে বললে, হুঁ। তা প্রাণ না দিয়ে শহীদ না হয় এক রকম হওয়া গেল, কিন্তু কাগজের অবস্থা কি খবর রাখো ?

—কেন, আজ ক কপি বিক্রয় হয়েছে ?

—সাতাশখানা।

মুহূর্তে ঘরের সবাই চুপ করে গেল। দুঃসংবাদ—সত্যিই অত্যন্ত শোচনীয় দুঃসংবাদ। যে কাগজের পেছনে ওদের যা কিছু উদ্যম আর আগ্রহ ওরা নিঃশেষে নিবেদন করে দিয়েছে, যার প্রতিটি অক্ষরে ওরা সঞ্চার করতে চেয়েছে বিদ্রোহী যৌবনের বিপ্লবী আগ্নেয় মন্ত্র, তার আবেদন মাত্র সাতাশজন ক্রেতার কাছে গিয়ে পৌঁছুল! যতই আত্মবিশ্বাস থাক এ সংবাদ মনকে পীড়িত করে—স্নায়ুকে বিপর্যস্ত করে দেয়। মনে হয় বৃথা চেষ্টা, মনে হয় ওদের ক্রান্তিকারী বাণীকে গ্রহণ করবার জন্যে দেশ এখনো তৈরি হয়নি।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক ব্যঙ্গভরে বললে, ডোমিনিয়ান স্টেটাসের ওপরে তোমার অমন জ্বালাময় লীডারটা মাঠেই মারা গেল শশধর। কেউ পড়লে না।

আহত দৃষ্টিতে সম্পাদক শশধর একবার চারদিকে তাকালো। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি ছেলে, চোখে পুরু চশমা, মাথায় চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। সমস্ত চেহারার মধ্যে দৃঢ়তা, নিষ্ঠা আর সন্ন্যাসীর মতো তপশ্চারণের একটা ব্যঞ্জনা যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। মৃদুকণ্ঠে শশধর জবাব দিলে, কাল বত্রিশ কপি বিক্রি হয়েছিল, আজকে পাঁচখানা কম। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি নিরঞ্জন—এ দিন আমাদের থাকবে না। কই হে পাবলিসিটি ম্যানেজার—তুমি কী করছ ?

পাবলিসিটি ম্যানেজার শ্যামানন্দ একখানা খাটের ওপর সটান লম্বা হয়ে পড়ে নিরাসক্ত ভাবে বিড়ি টানছিল। সংক্ষেপে বললে, হবে—হবে—ঘাবড়াচ্ছ কেন ? কন্‌জারভেটিভ্‌ কাগজগুলো দেশটাকে করাপ্‌ট করে ফেলেছে, কিছুদিন সময় নেবে বইকি। ওজন্যে কিছু ভেবো না। তা মুদ্রাকর ও প্রকাশক, এখন একটু চায়ের ব্যবস্থা চটপট্‌ করে ফেলো দিকি। শুকনো গলায় চ্যাচামেচিটা আর পোষাচ্ছে না।

নিরঞ্জন শুকনোভাবে হাসল : আমার ট্যাঁক ভাই স্রেফ গড়ের মাঠ। যে যার পকেট ঝাড়ো—দ্যাখো কয়েক পেয়ালা হাফ কাপের বন্দোবস্ত হয় কিনা।

চার আনা চাঁদা উঠল—এল এক পয়সা দামের আট পেয়ালা চা, চার পয়সার সস্তা বিস্কুট আর চার পয়সার বিড়ি। হাফ কাপের সঙ্গে সঙ্গেই ফের চাঙ্গা হয়ে উঠল আসর।

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিরঞ্জন ক্লান্তস্বরে বললে, কিন্তু দু-একদিনের মধ্যে প্রেসের কিছু টাকা অন্তত না মেটালে কাগজ আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে বলে রাখলাম।

—হবে—হবে—শশধর উঠে দাঁড়ালো : আমি এখন চললাম, মেটেবুরুজে একটা জরুরী কাজ রয়েছে। আমি নিশ্চয় বলছি ভাই আজকের সাতাশখানা বিক্রি একদিন সাতাশ

হাজারে নিশ্চয় গিয়ে দাঁড়াবে। এতবড় সত্যটাকে দেশের লোক গ্রহণ করতে পারবে না, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

কথার শেষে শশধরের গলায় আবেগের সুর কেঁপে উঠল। পরমুহূর্তেই অপ্রতিভ ভাবে দ্রুতগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শশধর।...

...বিশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু শশধরের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যিই মিথ্যে হয়নি। দেশের লোক অকৃতজ্ঞ নয়, ঘুমন্ত নয়, নির্বোধ নয়। তারই প্রমাণস্বরূপ কাগজের বিক্রি আজ সাতাশখানা মাত্র নয়, সাতান্ন হাজারের কাছাকাছি। আজ কাগজের ম্যানেজিং এডিটার নিরঞ্জন চ্যাটার্জি ভাঙা তক্তপোশে বসে বিড়ি খায় না, অভিজাত অফিসের পুরু কুশনের ভেতর তলিয়ে গিয়ে সে ব্ল্যাক্ অ্যাণ্ড্ হোয়াইটের ধোঁয়া ওড়ায়।

মানুষকে ভালবাসত শশধর, দেশকে ভালবাসত। সে ভালবাসার মধ্যে ছিল আবেগ, ছিল নিষ্ঠা, ছিল দৃঢ়ব্রত সন্ন্যাসীর তপশ্চারণা। তাই কলমের মুখেই শুধু আগুন ঝরিয়ে শশধর ক্ষান্ত হয়নি, রিভলভারের মুখেও ঝরাতে চেয়েছিল। তার রাজনীতি শুধু বুদ্ধিজীবীর অলস মস্তিষ্কের সাজানো কথার মালাই ছিল না, নিজের জীবনের জ্বালা দিয়েই সে তা গ্রহণ করেছিল, শুধু কালিতে কলম ডুবিয়েই সে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে চলেনি—নিজের রক্তের অক্ষরে লিখে রেখে গিয়েছিল তার আদর্শ ও বিশ্বাসের বজ্রবাণী।...

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। আরো জোরে নেমেছে—আকাশের কোন্ একটা অলক্ষ্য প্রান্ত থেকে গুম্ গুম্ করে ভেসে আসছে মেঘের ডাক। মনে পড়ল, অমনি করেই শশধরের পিস্তল সেদিন মন্দ্রিত হয়ে উঠেছিল। পার্ক-সার্কাসের বাড়িটাকে ঘেরাও করেছে পুলিস—ভেতর থেকে বিপ্লবীদের পিস্তল আর বাইরে থেকে পুলিসের বন্দুক সমান তালে গর্জন করছে, চলছে দস্তুরমতো খণ্ডযুদ্ধ। এমন সময় পেছন দিককার একটা জলের পাইপ বেয়ে নেমে যাবার চেষ্টা করেছিল শশধর। নির্ভুল লক্ষ্যে ছুটে এল পুলিসের বুলেট—প্রায় দোতলার ওপর থেকে নিচের বাঁধানো উঠোনে শশধর আছড়ে পড়ল। কিন্তু তখনো তার হাতের মুঠোতে পিস্তল শক্ত করে ধরা, আর সে পিস্তলের মুখ থেকে পিঙ্গল বর্ণের অল্প অল্প ধোঁয়া তখনো বেরিয়ে আসছে।

মারা গেল শশধর, কাগজও বন্ধ হয়ে গেল কিছুদিনের জন্যে। জেলে গেল শ্যামানন্দ, শ্রীপতি, অজয়। শুধু নিরঞ্জনের গায়ে আঁচড় লাগল না—প্রমাণ ছিল না বলে। দালালীর চেষ্টায় ফাটকা বাজারে ঘুরে বেড়াতে লাগল নিরঞ্জন।

তারপরে আবার দৃশ্যপট বদলালো।...

দু-তিনটি ছেলে, উস্কোখুস্কো চুল। মুখে কর্মব্যস্ত ক্লান্তির ছাপ। দেখা হয়েছিল হ্যারিসন রোডের জ্ঞানবাবুর আদি চায়ের দোকানে।

—আপনি নিরঞ্জন চ্যাটার্জি, না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—'অগ্নিহোত্রী' কাগজের আপনিই তো প্রকাশক ছিলেন ?

—ঠিক ধরেছেন। আপনারা ?

—ভয় নেই, পুলিসের লোক নই।—ছেলেরা হেসে উঠল : আসুন না কাগজটাকে আবার চালু করা যাক।

—ফিন্যান্স করবে কে ?

—আমরা বন্দোবস্ত করব। অমন একটা কাগজ—বাংলা দেশের একটা সত্যিকারের সংবাদপত্র, ওকে অমন অকালে মরতে দেওয়া দেশ ও জাতির কলঙ্ক। আমরা ওকে রিভাইভ করব।

—আপনাদের রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে অগ্নিহোত্রীর মিলবে কি ?

—কেন মিলবে না ?—দলের যে ছেলেটি এগিয়ে এসে কথা বলছিল, উৎসাহে তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল : আমরা মিলিয়ে নেব। এটা তো বুঝতে পারছেন, গরম গরম রাজনীতির যুগ চলে গেছে ? বোমা পিস্তলের পথে অত সহজে স্বাধীনতা আসবে না। এখন পিপলের ভেতরে কাজ করতে হবে। রাজনীতির আদর্শ বদলে যাচ্ছে, দেশ এগোচ্ছে সত্যিকারের বিপ্লবের পথে। 'অগ্নিহোত্রী'ই বা পিছিয়ে পড়বে কেন ?

ঠিক কথা। 'অগ্নিহোত্রী' পিছিয়ে পড়ল না। আবার একদিন বাংলার সংবাদপত্র জগতে মহাবিপ্লবের বাণী নিয়ে সে আবির্ভূত হল।

টাকা কোথা থেকে এল ? সে একটা আশ্চর্য রহস্য। এরা বড়লোকের ছেলে নয়, কিন্তু মন্ত্রবলে কোত্থেকে টাকা আসতে লাগল—অদ্ভুত ! টাকা দিলে মজুরেরা, দিলে কুলিরা, দিলে কেরানীরা, দিলে দেশের নির্যাতিত লাঞ্ছিত মানুষেরা। এই সমস্ত মূক-মানুষের রক্তরাঙা মর্মকাহিনী বয়ে 'অগ্নিহোত্রী' আবার দেশকে ডাক দিলে।

এবার কিন্তু অপ্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া গেল।

বেরোবামাত্র হু হু করে কাটতে লাগল কাগজ। ছেপে কুলিয়ে ওঠা যায় না এই রকম ব্যাপার। ছোট প্রেস, ছোট আয়োজন। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি ছাপা যায় না—কিন্তু চাহিদা পাঁচ গুণ। এবারে লাভ হতে লাগল।

এল রাজদ্রোহ—পাঁচশো টাকা জরিমানা হল কাগজের। কিন্তু ফলে কাটতির আর সীমা-সংখ্যা রইল না। ছোট প্রেস বড় হল—হাতে চালানো ফ্ল্যাট মেশিন হল ইলেকট্রিক মেশিন। দেশের প্রগতিপন্থী কাগজগুলোর মধ্যে 'অগ্নিহোত্রী' নিজের একটা যথাযোগ্য স্থান করে নিলে।

কিছুদিন বেশ চলল, আবার দেখা দিলে রাজদ্রোহ। এবার জরিমানা হাজার, তার

সঙ্গে দশ হাজার টাকা জামানত।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল নিরঞ্জন।

ধার করে টাকা দেওয়া হল বটে, কিন্তু কাগজ আর চলে না। লাভের অঙ্ক দূরে থাক—দেনা শোধ করতে গেলে মেশিনের স্ক্রু-বলটু সুদ্ধ নিয়ে টানাটানি পড়ে। উপায় ?

সেই ছেলেটি—প্রবীর—সে-ই এসে সামনে দাঁড়ালো। বললে, আমি ব্যবস্থা করছি।

পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল প্রবীর।—শ্রমিক ভাই মজুর ভাই, তোমরা সাহায্য করো। তোমাদের কাগজ, তোমাদেরই জিনিস। তোমরা না বাঁচালে একে কে বাঁচাবে ?

কিন্তু কতটুকু তাদের শক্তি—কীই বা সামর্থ্য ? কেউ দিলে একদিনের মজুরী, কেউ দিলে নিজের অত্যন্ত সখের পাঁচ-আনি সোনার আংটিটা। সাহারায় শিশির।

প্রবীর তবু বললে, ভয় করবেন না, আমরা ঠিক করে নেব।

আহার নেই, নিদ্রা নেই, কাগজের জন্য প্রাণপাত করতে লাগল প্রবীর। কিন্তু কোনোদিকে কিছুমাত্র আশার আলো অবশিষ্ট নেই। কাগজ ডুবল।

বেশ মনে পড়ছে, তখন সন্ধ্যা। অফিসে একা চুপ করে বসেছিল নিরঞ্জন। এমন সময়ে বাইরে মোটর থামল। নিরঞ্জন চমকে উঠল। ঘরে ঢুকলেন বাংলার একজন প্রসিদ্ধ ধনপতি। এঁর অত্যাচার আর স্বেচ্ছাচারিতার ওপরে বহু অগ্নিবাণই বর্ষণ করছে 'অগ্নিহোত্রী'।

কী কী কথা হয়েছিল সবটা মনে নেই। তবে শেষের আলোচনাগুলো স্মৃতির পট-ভূমিকায় এখনো অগ্নিরেখার মতো জলজল করে।

—মাপ করবেন, আমাদের যে আদর্শ—

—আহা, আদর্শভ্রষ্ট হতে তো কেউ বলছে না। শুধু অধমের সম্পর্কে ও ধরনের কটূ মন্তব্যগুলো না করলেই বাধিত হবো।

—দেখুন, সত্যের ভিত্তিতে আমাদের এই কাগজ—

—ব্যাস, থামুন থামুন। অত সত্যের গোঁড়ামি নিয়ে কাগজ চালাতে পারবেন না, পলিটিক্স তো নয়ই। আরে মশাই, দেনার দায়ে যদি কাগজই আপনার উঠে যায়, তা হলে সত্যের সেবা করবার সুযোগ পাবেন কোথায় ?

—কিন্তু—

—আর কিন্তু কিন্তু করবেন না। আপনারা ছেলেমানুষ, বয়স কম। আপনাদের মতো রাজনীতি এককালে আমরাও ঢের করেছি, জানলেন ? তার চেয়ে পথে আসুন। আমার কথা শুনুন—সব দিক দিয়ে ভালোই হবে—

চেকের অঙ্কটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্রমশ নিরঞ্জন যেন সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছিল। ধনকুবের যখন উঠে গেলেন, তখন তার বোধ আর বিবেচনাশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছে। তার মাথার মধ্যে রক্তোচ্ছ্বাস সমুদ্রের ফেনিল ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে, ঝাঁ ঝাঁ করছে চোখ-কান। মোটরের শব্দটা দূরে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু তখনও যেন তার শিরাপেশীর ভেতরে দূর-বিলীন সেই শব্দটার অনুরণন শোনা যাচ্ছে।

খবর পেয়ে ছুটে এল প্রবীর। প্রবীর নয়, একটা আগুনের হল্‌কা।

—এ আপনি কী করলেন ?

—ভালোই করেছি। উপায় ছিল না এ ছাড়া।

—আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন—আপনি বিট্রেয়ার।

—মুখ সামলে কথা কইবেন প্রবীরবাবু।

—মুখ সামলে কথা কইব! নিশ্চয় না, আপনাকে আজই কাগজ ছেড়ে যেতে হবে নিরঞ্জনবাবু।

—কেন ?

—এ কাগজের যোগ্য নন আপনি। সুবিধাবাদীর জায়গা নেই এখানে। এ সর্বহারার কাগজ, এ দেশের লাঞ্ছিত মানুষদের কাগজ—

নিরঞ্জনের উত্তপ্ত ক্রুদ্ধ মস্তিষ্কে শয়তান সাড়া দিয়ে উঠল।

—না, এ আমার কাগজ।

—আপনার ?

নিরঞ্জনের মুখে শয়তান হাসতে লাগল। আমার কাগজ—আমার। কাগজে কলমে তার প্রমাণ আছে, আইন তার সাক্ষী দেবে। দরকার হলে আপনারা আদালতের আশ্রয় নিতে পারেন।

বজ্রাহত প্রবীর পাণ্ডুবর্ণহীন মুখে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ।

—একথা আপনি বলতে পারলেন ?

—পারলাম। এ আমার কাগজ, আমি এর মালিক। যা খুশি আপনারা করতে পারেন এখন।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রবীর। তারপর আস্তে আস্তে নেমে গেল অন্ধকারের ভেতরে। একটি কথাও আর তার মুখে যোগাল না।

তারপর ? তারপর আর একটা নতুন কাগজ চালাতে চেয়েছিল প্রবীর। চলেনি। 'অগ্নিহোত্রী' ফেঁপে উঠল, ফুলে উঠল—প্রখর আর প্রচণ্ড হয়ে ছড়িয়ে গেল দাবাগ্নির মতো, ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্কটা ক্রমে স্ফীতকায় হয়ে চলল। নিরঞ্জন জমি কিনলে বালিগঞ্জে। আর প্রবীর ?…

…বৃষ্টি চলছে তেমনি ভাবেই। পথের ওপরে দেখতে দেখতে একহাঁটু ঘোলা জল জমে গেছে, পাশের বস্তি থেকে কয়েকটা নোংরা ছেলেমেয়ে বেরিয়ে সেই জলে খেলা করছে। নির্জন আফিস ঘরের পুরু কুশন-আঁটা চেয়ারে বসে ঝিমুতে ঝিমুতে ম্যানেজিং এডিটার ভাবছিলেন—আর প্রবীর ?

অমনি একটা বস্তির খোলার ঘরেই মুখে রক্ত তুলে মরে গিয়েছিল প্রবীর। ব্যাংকে ফাঁপছিল 'অগ্নিহোত্রী'র টাকা, কিন্তু মরবার সময়ে তার একফোঁটা ওষুধ জোটেনি।

দৃশ্যপট আবার বদলে গেল।…

…দশ বছর পরের কথা।

রাজনীতির দলাদলি চূড়ান্ত রূপ ধরেছে বাংলাদেশে। খবরের কাগজগুলো পরস্পরের কুৎসা-প্রচারে মশগুল।

'অগ্নিহোত্রী' আপ্রাণ চেষ্টায় তার পৃষ্ঠপোষক ধনকুবেরটির জয়ঢাক বাজিয়ে চলেছে। এবার ইলেক্‌শনে তাঁর দলকেই যেমন করে হোক ঠেলে অ্যাসেম্ব্লিতে পাঠাতে হবে।

কিন্তু সব ভেস্তে গেল।

ফারপো, ডিনার পার্টি ! টেবিলে দামী বিলিতী খাদ্যের সমারোহ।

—আপনি আমাদের জন্যে একটু ফাইট করলেই হয়ে যাবে।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে নিরঞ্জন বললে, কিন্তু এতকাল উনি পেট্রোনাইজ করে আসছেন—

—করলেই বা। দেখুন, দেশের লোকে ওঁকে আর চায় না। তা ছাড়া, রিয়্যালি, he is a dead man in politics ! আপনি কি মনে করেন অ্যাসেম্ব্লিতে গিয়ে ওঁরা কিছু করতে পারবেন ?

—আপনাদেরই কি বিশেষ সুবিধা হবে ?

—হবে না ? কী যে বলেন।—উৎসাহের আধিক্যে বক্তা প্রখর হয়ে উঠলেন : আমাদের প্রোগ্রাম তো আপনি জানেন। শুধু হাত তোলবার দল আমরা নই, we know how to fight the diehard autocrats ! আমরা চাই লেবার আর পিজেন্ট্রির সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে। বড় বড় গালভরা বুলি নয়—স্রেফ ডাল-ভাতের সমস্যার সমাধান !

—হুঁ।

—তা ছাড়া আরো কত দিক আছে দেখুন। এই বাজেট। এ নিয়ে এবার খানিকটা আন্দোলন তুলতেই হবে—এডুকেশন, ভিলেজ রিকন্‌স্ট্রাকশন, রোড ডেভেলপমেণ্ট, এম্‌প্ল্যায়মেণ্ট—

বক্তার মুখে খই ফুটতে লাগল। নিরঞ্জন জানে কোন্ কথার পরে কোন্ কথা আসবে। সব বাঁধা গৎ, সব বাঁধা বুলি। ইলেক্‌শনের মুখে তোতাপাখির আবৃত্তির মতো ওগুলো

নির্ভুল নিয়মে বেরুতে থাকে। কিন্তু একবার রিটার্নড হতে পারলেই বিচিত্রভাবে স্মৃতি-ভ্রংশ ঘটে যায়,—তখনকার সমস্যা দলীয়, তখনকার সমস্যা ব্যক্তিগত, তখনকার সমস্যা প্রভুত্বের কায়েমি ব্যবস্থার।

সবাই—সবাই একদলের। যারা সত্যি কিছু করতে চায়, তাদের গলার জোর থাকে না। তারা একঘরে—তারা জাতিচ্যুত। আর তা ছাড়া সত্যিই কিছু করবার দরকার আছে কি? কার সময় আছে, কার আছে মাথাব্যথা? যা হবার আপনা থেকেই হয়ে যাবে, যারা চাপের নিচে নিষ্পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে—আত্মরক্ষার কবচ-কুণ্ডল আর আঘাত করবার অমোঘ অস্ত্র তারাই তুলে নেবে নিজেদের হাতে।

দামী খাবারের টুকরো মুখে তুলতে তুলতে নিরঞ্জন বললে, দেখা যাক।

পরদিন এল একখানা নতুন মোটর। 'অগ্নিহোত্রী'র সম্পাদককে সশ্রদ্ধ উপহার।

তারপর রঙ বদলালো। কতরকম ভাবে, কতবার। লোকে বলে, পরম নিষ্ঠাভরে 'অগ্নিহোত্রী' দেশের সেবা করে আসছে। তার পাঠকসংখ্যা অগণ্য, তার মতামত স্বতঃপ্রমাণ। সাতাশখানা কাগজের বিক্রি আজ সাতান্ন হাজার—দুবার বি. এ. ফেল করা দশ টাকার প্রাইভেট ট্যুশানি খুঁজে বেড়ানো নিরঞ্জন চ্যাটার্জি আজ কয়েক লাখ টাকার মালিক।...

ম্যানেজিং এডিটারের হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গেল। কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে চোখ পড়ল পাশের খোলার বস্তিটার উপরে। ভাঙাচুরো, জরাজীর্ণ, বীভৎস নোংরা। বিকৃত মনুষ্যত্বের ভগ্নাংশের প্রতীক। ওখানে যারা দিনের পর দিন অপঘাতের জন্যে, অপমৃত্যুর জন্যে প্রহর গুণছে, তাদের কথা—তাদের জীবনের বাণীকেই ঘোষিত করবার জন্যে একদিন 'অগ্নিহোত্রী'র আবির্ভাব হয়েছিল। সেদিন 'অগ্নিহোত্রী' যে দেশকে সেবা করতে চেয়েছিল—সে দেশ এখন বহু দূরে। আজ বস্তি নয়, কারখানা নয়, শ্মশান-বাংলার দুর্ভিক্ষদীর্ণ অজন্মার ধানক্ষেতও নয়। আজ 'অগ্নিহোত্রী'র দেশ তাদের মধ্যেই এসে সীমা পেয়েছে—রাজনীতি যাদের ব্যসন, যারা দামী মোটরে চড়ে, যারা স্বার্থের জন্যে রঙ বদলায়, যারা ব্ল্যাক্ অ্যাণ্ড্ হোয়াইট্ সিগারেট খায়। কিন্তু উপায় নেই, চারতলা বাড়ির রাজকীয় অফিসের কুশন-আঁটা চেয়ার থেকে আর বস্তির কাদায় নামতে পারে না নিরঞ্জন —সামর্থ্য নেই তার, উপায় নেই। ওখানে ছড়িয়ে আছে শশধর আর প্রবীরের রক্ত—ওখানে চিৎকার করে কাঁদছে প্রবীরের বিধবা মা আর শশধরের বিধবা স্ত্রী; কিন্তু এখানে বক্তৃতা—এখানে অ্যাসেম্ব্লি, এখানে—

রাজনীতির চারতলা—জীবনেরও চারতলা। বস্তি অনেক নিচে, অনেক ছোট। আজ আর তা চোখেও পড়ে না—নামার প্রশ্ন তো কল্পনাতীত।

ম্যানেজিং এডিটার উঠে পড়লেন, আর একটা ব্ল্যাক্ অ্যাণ্ড্ হোয়াইট্ সিগারেট

ধরালেন। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে এতক্ষণে।

ডিনার

টেবিলটার সামনে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল রমাপতি। সামনে চায়ের পেয়ালাটা ধোঁয়া উড়িয়ে উড়িয়ে ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, কিন্তু যেদিকে তার লক্ষ্য ছিল না। যে কেউ দেখলে মনে করতে পারত, হয় প্রেমের ব্যাপারে সে বুকে একটা নিদারুণ ঘা খেয়েছে, আর নয়তো সদ্য পুত্রশোকের বেদনায় একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

কিন্তু আমি জানি দুটোই অসম্ভব। একথা বরং বিশ্বাস করতে পারি যে সে রাতারাতি পাগল হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো সম্ভব-অসম্ভব কল্পনাতেই একথা ভাবা চলে না যে সে প্রেমে পড়েছে। মাঝে মাঝে পথচারিণী বা ট্রামে-বাসে সহযাত্রিণী কোনো মেয়ের দিকে তাকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে-থাকা অবস্থায়ও দেখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সবাই যা ভাবে হয়তো আপনিও তাই ভাববেন। কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এদিক থেকে রমাপতি একান্তভাবে খাঁটি—একেবারে শুকদেবের মতোই জিতেন্দ্রিয়। ওর দৃষ্টিটাকে আর একটু সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে সেটা নিবদ্ধ মেয়েটির দিকে নয়, তার গয়নাগুলোর দিকে। না-না, রমাপতি চোর-ছ্যাচোড় নয়। এক ঝটকায় গলার হার ছিনিয়ে নিয়ে সে পাশের অন্ধকার গলি দিয়ে দৌড় দেবে না—এ ক্ষেত্রেও সে আপনার-আমার মতোই একটি বিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক ভদ্রলোক। আসল কথা, রমাপতি স্পেকুলেশন করে। যুদ্ধের বাজারে এ সম্পর্কে তার ভুয়োদর্শন এবং ভবিষ্যৎদৃষ্টি তাকে প্রচুরভাবে পুরস্কৃত করেছে। চলতি ট্রামে রমাপতির পেছনের সীটে বসে যখন আপনি তার বর্বরতায় রীতিমত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা অনুভব করছেন, ঠিক সেই সময়ে হয়তো রমাপতি তার আগ্রহব্যাকুল শানানো চোখ দুটো মেয়েটির ভারী লকেটটার ওপরে ফেলে ভাবছে: সোনার দাম শীগগিরই আরো কিছু উঠবে কি না, এবং যদি ওঠে তা হলে এই সময়েই—

এহেন রমাপতি বিরহী-কবির মতো অথবা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় জর্জরিত দার্শনিকের মতো দু'-হাতে মাথা ঢেকে কী ভাবছে জানবার জন্যে আমার কৌতূহল হল।

এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলাম।

ইলেকট্রিকের 'শক' লাগলে যেমন চমকে ওঠে, তেমনি করেই চমকে উঠল রমাপতি। ডি-সি নয়, একেবারে এ-সি কারেন্টের শক। অদ্ভুত দুটো ঘোলাটে চোখ মেলে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে আমি যেন একটা কবরখানা থেকে উঠে-আসা প্রেতাত্মা অথবা চিড়িয়াখানা ভেঙে পালিয়ে-আসা ক্যাঙারু।

আমি বললাম, ব্যাপার কি হে রমাপতি, তোমার হল কী ?

এতক্ষণে যেন আমাকে চিনতে পারল রমাপতি : কে, রঞ্জন নাকি ? বোসো।

আমি ওর সামনের চেয়ারটাতে একেবারে মুখোমুখি হয়ে বসলাম। রমাপতি চায়ের পেয়ালাটা তুলে একটা চুমুক দিলে, তারপর অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি তুলে তাকাল জন-বিরল আমহার্স্ট স্ট্রীটের ওপর দিয়ে চলন্ত একটা মিলিটারী কনভয়ের দিকে। চাপা-গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল পর পর গোটাকয়েক উত্তেজিত এবং অনুচ্চার্য গালাগালি।

—ব্যাপার কি হে! কার এমন বাপ-বাপান্ত করছ ?

—আর কার ? ওই মিলিটারীর!

বটে! আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। কথাটা অভিমানিনী শ্রীরাধার মতোই শোনাচ্ছে যে। যে জনি-টমি-হ্যারীর প্রেমে রমাপতি এতকাল হাবুডুবু খাচ্ছিল, হঠাৎ তাদের প্রতি এত বীতরাগ কেন ? নাকি ভগবানকে শত্রুভাবে ভজনা করবার জন্যে ভক্তের এই লীলাবিলাস ?

কিন্তু মুখ দেখে তা মনে হল না। সত্যিই বিপদে পড়েছে রমাপতি—সমস্ত চেহারাটার ওপরে কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে। চোখের পাতা দুটো দুশ্চিন্তার ভারে আচ্ছন্ন। এক চুমুকেই প্রায় এক পেয়ালা চা সে নিঃশেষ করে ফেলল। একটা সজোর দীর্ঘশ্বাসের শব্দও যেন শুনতে পেলাম।

রমাপতি বললে, চা খাবে নাকি ? আমার জন্যেও নিয়ো এক পেয়ালা।

দু' কাপ চায়ের ফরমাস করলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার হয়েছে কী ?

এতক্ষণে সত্যটা আত্মপ্রকাশ করলে : রিট্রেঞ্চমেণ্টে চাকরিটা গেল ভাই।

—তাতে কী হল ? চাকরিতে তোমার আর কত আসত ? যা ব্যবসা করেছ, ব্যাঙ্কে লাখ দুই তো জমিয়েছ নিশ্চয়ই ?

রমাপতি ভ্রূকুটি করলে : লাখ দুই ?—পরক্ষণে হাতটা ঢুকিয়ে দিলে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবির পকেটে। বার করে আনলে একরাশ বিল—মদের বিল।

বললে, হ্যাঁ, টাকা রোজগার করেছিলাম। পাঁচ লাখ টাকা জমাতে পারতাম আমি। কিন্তু এই এরাই সর্বনাশ করলে আমার—রমাপতির স্বর উত্তেজিত এবং অনুতপ্ত শোনালো : টাকার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোড়ারোগটাও জুটিয়ে ফেলেছিলাম যে। ষোলো টাকার বোতল একশো টাকায় কিনে খেয়েছি—শালাদের খাইয়েছি। ফুটো কলসী দিয়ে জল গড়াতে গড়াতে কখন যে সব ফাঁকা হয়ে গেছে টেরও পাইনি।

আমি হাসব না ব্যথিত হয়ে উঠব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তবু আশ্বাস দিয়ে বললাম, ট্রাই ইয়োর লাক এগেন—ঘাবড়াচ্ছ কেন ?

রেস্তোরাঁর ছোকরাটা চা দিয়ে গিয়েছিল। রমাপতি এমন আগ্রহভরে তাতে চুমুক

দিলে যে মনে হল যে এই এক কাপ চায়ের জন্তেই সে এতক্ষণ আকুলভাবে প্রতীক্ষা করছিল।

—আবার? না ভাই—আই অ্যাম্ এ ড্রাউনড্ ম্যান! সে শক্তি আর নেই।

—কেন? বুড়িয়ে তো যাওনি এখনো। বুদ্ধি আছে—উৎসাহ আছে। বুলডগের মতো লেগে পড়ো—চোখ বুজে টাকা চলে আসবে।

—না, ভাই, আর হবার নয়।—সত্যিকারের জলে-ডোবা মানুষের মতোই অসহায় আর মুমূর্ষু মনে হল রমাপতিকে: যুদ্ধ থেমে গেছে, সে মার্কেট আর নেই। কণ্ট্রোল ব্যবসার গলা টিপে ধরেছে। আমি আজ সব দিক থেকে পঙ্গু হয়ে গেছি।

রমাপতি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। দু' হাত দিয়ে পাগলের মতো মদের বিলগুলো উড়িয়ে দিলে হাওয়ায়। বিহ্বল ব্যাকুল গলায় বললে, বলতে পারো এখন আমি কী করব? হোয়াট ক্যান আই ডু! আই অ্যাম এ ডেড ম্যান, রঞ্জন—আমি আর বেঁচে নেই।

কথাটার কী জবাব দেব ভাববার আগেই তাকিয়ে দেখি রমাপতি দ্রুতপায়ে রাস্তায় নেমে গেছে, হাঁটতে শুরু করেছে দিশেহারার মতো। শেষ পর্যন্ত লোকটা পাগল হয়ে গেল নাকি।

আমি ভাবছিলাম রমাপতিকে নিয়ে একটা গল্প লিখব।

গল্প নয়—সত্যি ঘটনা। যুদ্ধের বাজারে এরকম অনেক গল্পই আপনারা জানেন।

কলেজে আমাদের সঙ্গেই পড়েছিল রমাপতি। পর পর তিনবার চেষ্টা করেও যখন আই. এ. পাস করতে পারল না, তখন চলে গেল ফিল্মে। অভিনয় করবার জন্যে অবশ্য নয়। কলকাতার তিন-চারটে স্টুডিয়োতে এক্সট্রা যোগাবার ভার সে নিয়েছিল।

সকালবেলায় বেরুত বাউণ্ডুলের মতো। তারপর সারাদিন প্রায় গোটা কলকাতা চষে বেড়াত। সোনাগাছি-রূপোগাছি থেকে পাঁচী-খেঁদী-পিয়ারীবালাকে এনে রাতারাতি ফ্ল্যাশ-লাইটের আলোয় সিনেমার অপ্সরী বানিয়ে তোলবার দায়িত্ব সে নিয়েছিল। তখন পাঁচ আনা করে দিশী মদের বোতল পাওয়া যেত—সুতরাং যা রোজগার ছিল তাতে কখনো অকুলান ঘটেনি।

তারপর এল যুদ্ধ।

সামনে নতুন আলো দেখতে পেলো রমাপতি। দেখতে দেখতে দেশ জুড়ে ভানুমতীর কুহক লেগেছে। কাঁকর হয়ে গেল ভিটামিন 'বি', স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় হয়ে গেল বেনারসী; মানুষের জীবন হয়ে গেল রাস্তার কাঁকর আর মেয়েদের ইজ্জৎ হয়ে গেল ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো! নিরামিষাশী গণেশ রক্ষাকালী হয়ে নরবলি নিতে লাগলেন। যুদ্ধের ধোঁয়ায় বিষণ্ণ বাংলার আকাশে রক্তের অক্ষরে স্বাক্ষর দিয়ে গেল—সাল তেরশো পঞ্চাশ।

—জয় সিদ্ধিদাতা—বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল রমাপতি। লেগে গেল বিনায়কের বলি

সংগ্রহ করতে। গজমুণ্ড হেরম্বচন্দ্র ভক্তকে কৃপাবর্ষণ করলেন। পাঁচ আনার খেলো একশো টাকার হোয়াইট্‌ লেবেলে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

কিন্তু একেবারে নিবাত-নিষ্কম্প পরমহংস হতে না পারলে পুরোপুরি সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব রমাপতিরও পিছিয়ে থাকা চলল না।

রমাপতির এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত দাদা ছিলেন। এককালে ভালো চাকুরি করতেন, এখন অথর্ব আর অসহায়। নিতান্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরে রমাপতি মাঝে মাঝে তাঁকে পাঁচ-দশ টাকা সাহায্য করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরই সহায়তায় রমাপতির কপালে শিকে ছিঁড়ল।

সেই দাদা—অর্থাৎ রঘুপতিবাবুর একটি ফুটফুটে মেয়ে ছিল। মেয়েটি কিশোরী—নাম চম্পা। অনেকবার দেখেছি মেয়েটিকে—দরিদ্র বাঙালিঘরের করুণ আর ভীরু একটি ছোট মেয়েকে আপনারা কল্পনা করে নিতে পারেন। মা ছিল না, কাজেই সংসারের সব কাজ তাকেই করতে হত ; ছেঁড়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করতে হত ; ভাত না থাকলে ফ্যান খেয়ে মাঝে মাঝে পেট ভরাতে হত, রাতের পর রাত জেগে অসুস্থ পীড়িত বাপের পরিচর্যা করতে হত এবং ব্যাধি-জর্জর বিরক্ত বিতৃষ্ণ বাপের বীভৎসতম গালাগালিগুলো নীরব চোখের জলে তাকে সহ্য করে যেতে হত।

রঘুপতি অনেকবার মিনতি করে বলেছিলেন : যে করে হোক মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করে দে রমা। আমি তো আর বেশিদিন বাঁচব না। মেয়েটার অন্তত দুটো মোটা ভাত আর দুখানা মোটা কাপড়ের সংস্থান করে দে।

রমাপতি ঘাড় চুলকোত। এড়িয়ে যাবার জন্যে বলত : হবে, হবে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন, বিয়ের বয়স তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না—তারপর একটা জরুরী কাজের তাগিদে চটপট সরে পড়ত সামনে থেকে।

তারপর হঠাৎ একদিন রমাপতির খেয়াল হল : সত্যিই তার কর্তব্যে ভয়ংকর ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কারণ ছিল। একটা সাহেবকে কিছুতেই বাগানো যাচ্ছিল না—রমাপতি যতই তাকে সাপটে ধরবার চেষ্টা করছিল ততই সে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছিল পাঁকাল মাছের মতো। অথচ লোকটাকে একবার কায়দা করতে পারলে ভবিষ্যতের পথ একেবারে পরিষ্কার।

অনেক গবেষণার পরে রমাপতি জানতে পারল সাহেব সৌন্দর্যের পূজারী। তবে তার সৌন্দর্য-বিলাসটা একেবারে নিছক মানসিক নয়। বিউটি অব ইণ্ডিয়া তাকে যতটা বিচলিত করে, তার চাইতে অনেক বেশি রোমাঞ্চিত করে তোলে ইণ্ডিয়ান বিউটি। এবং কুসুম যত অনাঘ্রাত হয়, পাঁকাল মাছটা তত বেশি উৎসাহে লাফ দিয়ে হাতের কাছে এগিয়ে আসে।

সুতরাং পরম স্নেহে রমাপতি একদিন চম্পাকে বিলাতী সিনেমা দেখতে নিয়ে গেল।

ফিরতে একটু বেশি রাতই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একখানা একশো টাকার নোট যখন রমাপতি রঘুপতির বিছানার দিকে ছুঁড়ে দিলে, তখন তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোয়নি। তিনি শুধু বিস্ফারিত চোখে একবার তাকিয়েছিলেন নোটখানার দিকে—আর একবার রমাপতির মুখের দিকে।

সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারেনি রমাপতি। জীবনে এই প্রথম সে ভয় পেয়েছিল, দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল হত্যাকারীর মতো। আর সেই রাত্রে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল চম্পা। খবরের কাগজে সে সংবাদটা হয়তো আপনারা পড়ে থাকবেন।

কিন্তু তারপরেই পথ পরিষ্কার হয়ে গেল।

ওদিকে কলকাতার কাছাকাছি বড় একটা যুদ্ধের কারখানা বসেছিল। তিনশো টাকা মাইনেতে সেখানে একটা চাকরি মিলে গেল রমাপতির। কাজ বিশেষ কিছু নয়, মাঝে মাঝে এমার্জেন্সী ফায়ার ব্রিগেড্‌কে প্যারেড করাতে হয়, অবসরসময়ে জনি-টমি-হ্যারীর সঙ্গে ওড়াতে হয় বোতল আর সিগারেট। এদিকে ব্যবসা, ওদিকে চাকরি—বেশ ছিল রমাপতি।

আড়াই বছর কাটল এই ভাবে। তারপর রমাপতির সঙ্গে আমার দেখা হল চায়ের দোকানে। রমাপতি বলছে: আই অ্যাম এ ড্রাউনড ম্যান রঞ্জন, আমার আর আশা নেই।

লিখতে লিখতে আমার মনে হচ্ছিল এ হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ।

কেন যেন আজ লোকটাকে ঘৃণা করতে ইচ্ছে করছিল না। নিজের জালে অসহায়ের মতোই সে জড়িয়ে গিয়েছে। এমন অন্যায় নেই যা সে করেনি। এমন পাপ নেই যা করতে তার হাত কেঁপে-উঠেছে মুহূর্তের জন্যে। শুধু চেয়েছে টাকা। তাই আজ কেবল একটি মাত্র চম্পা নয়—শত শত চম্পার বিষনিঃশ্বাস অভিশাপ হয়ে এসে তাকে স্পর্শ করেছে। ঝড়ো হাওয়ায় ঝরা পাতার মতো রাশি রাশি কারেন্সী নোট তার হাতে এসে পড়েছিল, আবার একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় তা তেমনি করেই তার হাত থেকে উড়ে দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছে।

কানের কাছে শুনতে পাচ্ছি একটা বিচিত্র কণ্ঠস্বর: আমার আর কোনো আশা নেই, রঞ্জন—আমি মরে গেছি। আই অ্যাম্ এ ড্রাউনড ম্যান! ফাঁপা বেলুন ফুটো হয়ে গেছে, হাজার টাকার নোটগুলো হয়ে গেছে মদের বিল।

আমি কল্পনা করছিলাম: ইছাপুরের একটা জনহীন প্রান্তরের ভেতরে প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে রমাপতি। দিকে দিকে দুর্দিন আর দুঃস্বপ্নের পুঞ্জীভূত রূপ নিয়ে নিকষ-কৃষ্ণ অন্ধকার, বোবা-রাত্রির বুকের ভেতর থেকে যন্ত্রণার একটা চাপা গোঙানির মতো

শূন্য মাঠের ওপর বাতাস আর্তনাদ করছে। সামনে একটা ফ্যাক্টরীর ধ্বংসাবশেষ, অস্থায়ী টিন-শেডের ভগ্নাংশ অন্ধকারে অস্বাভাবিক রিক্ততা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে সৃষ্টি হয়েছে একটা শ্মশানের পরিবেশ। দূরে ডাকছে শেয়াল, যেন রমাপতিকে ব্যঙ্গ করছে। এরপরে কী করতে পারে রমাপতি, কী তার করা উচিত? একটু দূরে খানিকটা জল অন্ধকার আর নক্ষত্রের আলো বুকে নিয়ে ছল ছল করে দুলে যেন রমাপতিকে ডাকছে; তাকে ইসারায় আহ্বান করে বলছে—

এই পর্যন্ত আমি লিখেছিলাম। এমন সময় পিয়ন এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল।

চিঠিটা খুলে আমি বোকা হয়ে গেলাম। আপাতত আর যেখানেই থাক, রমাপতি অন্তত ইছাপুরের মাঠে যে দাঁড়িয়ে নেই এটা নিশ্চিত। চিঠিখানা আর কিছুই নয়—একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র। কাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় চৌরঙ্গী প্লেজার হোমে আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে রমাপতি। কারণ অজ্ঞাত।

নিজের লেখা গল্পটার দিকে আমি হতাশ-দৃষ্টিতে তাকালাম।

কারণ যাই হোক, আয়োজনটা ভালই করেছিল রমাপতি।

নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম আমরা তিনজন। আমি, পট্‌লা আর হরেন। পট্‌লা রেশন আপিসের কেরানী আর হরেন স্কুলমাস্টার। জীবনে এমন একটা রেস্তোরাঁয় আমরা কেউ কখনো খাইনি। চারদিকের টেবিলে চুনকাম করা গৌরাঙ্গ মূর্তিগুলি কিছুটা অস্বস্তি না ঘটাচ্ছিল এমন নয়। তবু আমরা রাক্ষসের মতো খাচ্ছিলাম। এমন সুযোগ আর কবে আসবে কে জানে।

দাঁত দিয়ে প্রাণপণে একটা মোটা হাড় চিবুচ্ছিল পট্‌লা—তার চোখ দুটো জ্বলছিল একটা জৈবিক হিংস্রতায়। যেন ভবিষ্যতে মানুষ-খাওয়ার মহড়া দিয়ে নিচ্ছে। বড় একটা চামচেতে নাক পর্যন্ত ডুবিয়ে চক্ চক্ করে সুপ খাচ্ছিল হরেন। আমি একটা কাটলেটকে কায়দা করবার চেষ্টা করছিলাম আর রমাপতি কিছুই বিশেষ খাচ্ছিল না—শুধু অখণ্ড মনোযোগে নাইন নাইন্টি নাইন সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল।

আমি ভাবছিলাম, সেদিন সেই চায়ের দোকানটাতে তবে কাকে দেখেছিলাম! সে কি রমাপতি, না আর কেউ? নাকি পানের সঙ্গে দোক্তার পরিমাণটা একটু বেশি হয়ে যাওয়ায় আমি খেয়াল দেখেছিলাম?

হাড়টাকে কিছু পরিমাণে কায়দা করে পট্‌লা এই তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি রমাপতি, আজকের এই ডিনারটা কী উপলক্ষে? খাচ্ছি তো খুব, কিন্তু কেন যে খাচ্ছি সেটা বুঝতে না পারলে খাওয়াটা জুৎসই হচ্ছে না।

রমাপতি হাসলে: আর কিছু না, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ভোজন।

হরেন স্থপ শেষ করে ঠোঁট চাটতে চাটতে বললে, ব্রাহ্মণে অত ভক্তি তোমার নেই বাবা, সে আমরা জানি। কারণটা বলেই ফেলো না—শুনে কান দুটোকে ঠাণ্ডা করি।

রমাপতি তেমনি রহস্যময় ভাবে হাসতে লাগল : ক্রমশ প্রকাশ্য।

খাওয়া-দাওয়ার পরে আমরা যখন রাস্তায় বেরুলাম তখন রাত প্রায় নটা। পটলা আর হরেন দু'জনেই ভবানীপুরে থাকে, ওরা বাসে উঠে পড়ল। রমাপতি আমাকে বললে, তুমি ট্রামে যাবে তো? চলো তুলে দিয়ে আসি।

পকেট থেকে সিগারেট বার করে একটা ধরালে রমাপতি আর একটা দিলে আমাকে। দু'জনে নীরবে এগোতে লাগলাম।

কিন্তু অসহ্য কৌতূহলের পীড়ন। আর থাকতে পারছিলাম না।

—বলোই না হে, হঠাৎ এমন করে খাওয়ালে কেন? সেদিন চায়ের দোকানে দেখলাম তোমার ওই দশা, তারপরে আজকে একেবারে বেমালুম ভোল ফিরিয়ে ফেলেছ। এর মানেটা কী?

চৌরঙ্গী রোড ক্রস করে আসছিলাম আমরা। ট্রাফিক-পুলিসের উদ্যত হাতটার দিকে চোখ রেখে রমাপতি বললে, মানে—স্পেকুলেশন।

—বুঝলাম না।

—বুঝবে যথাসময়ে।

রাস্তা পেরিয়ে সবে এ ফুটপাতে এসেছি, হঠাৎ কানে গেল একটা উল্লসিত ধ্বনি : হ্যালো ডস্—ওল্ড্ রোগ!

রমাপতি চমকে উঠল। ঠিক পাশেই একটা জীপ্‌গাড়ি গতিবেগ সংযত করছে। তাতে তিনটি শুভ্র মূর্তি—রমাপতিকে দেখে আনন্দধ্বনি করছে!

—হ্যালো জনি! রমাপতির প্রত্যভিবাদন।

—কাম্-আপ্ ইউ লাকি গাই! ইট্‌স্ ইম্পর্ট্যান্ট।

—ইয়েস্, কামিং—

মুহূর্তে রমাপতি জীপ্‌গাড়িতে লাফিয়ে উঠল। আমি কিছু বলবার আগেই বিলীয়মান জীপ্‌গাড়ি থেকে ভেসে এল : গুড্ নাইট রঞ্জন—

রহস্য অতল। দিশেহারার মতো বোধ হয় মিনিট তিনেক দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল পায়ের কাছে একটা খাম পড়ে আছে—রঙীন খাম। নিশ্চয় রমাপতির পকেট থেকে পড়েছে।

খামটা তুলে নিলাম। খোলা খাম। ভেতরে খানকয়েক কাগজ।

কৌতূহলী মন বললে, রমাপতি হঠাৎ এমন করে খাওয়ালে কেন? ভেতরে নিশ্চয় কোনো ব্যাপার আছে। এই রঙীন খামে হয়তো তার হদিস মিলতে পারে।

খাম থেকে কাগজ বার করলাম—কিন্তু অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। কিছুই বোঝা গেল না। খানকয়েক খবরের কাগজের কাটিং—সযত্নে লাল কালি দিয়ে দাগানো। বড়লাট বলেছেন : দেশে দুর্ভিক্ষ আসবে। অ্যাটম বোমার ব্যাপার ও ইরানের তেল নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই লাগাটা অসম্ভব নয়। আসন্ন রাষ্ট্রবিপ্লবের আশংকায় ভারতবর্ষের সর্বত্র সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রস্তুতি চলেছে।

ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছি, এমন সময় দেখি একজন মিলিটারী গোরার বাহুবন্ধনে সালোয়ার পরা একটি ভারতীয় মেয়ে। খুব সম্ভব বাঙালি।

মনের ভুলে আচমকা বোধ হল : মেয়েটি চম্পা নয় তো ?

প্র্যাকটিস্

শেষ পর্যন্ত গুলিই চালাতে হল।

একশো চুয়াল্লিশ ধারা তো ছিলই, জনতাও শান্ত ছিল না। উনিশশো বিয়াল্লিশের পর থেকে কী যে হয়ে গেছে, মানুষগুলো গুলিগোলাকে ভয়ই করে না আজকাল। একবার মরলে দ্বিতীয়বার যে আর মরা যায় না এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই একবার মরাটাও যে খুব একটা কঠিন দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়—কী করে লোকে এই সত্যটাকে বুঝে ফেলেছে, আশ্চর্য ! একদিন লাল পাগড়ী দেখলে ছুটে পালাতে পথ পেত না, আজ মেশিনগান সুদ্ধু গাড়ি বোঝাই ফৌজ দেখলেও দূরে থেকে টিট্‌কারী দেয়। ওঃ ক্রাইস্ট্—দিনে দিনে হচ্ছে কী এসব ! সত্যিই কী কুইট্ ইণ্ডিয়াটা একেবারে কথার কথাই নয় !

রাগে গা নিস্‌পিস্ করছিল মেজর সাহেবের। বার বার বাঘের থাবার মতো কঠিন মুষ্টিতে সাপটে ধরছিল কোমরের বেল্টে ঝুলোনো রিভলভারটাকে, চাপা বিশ্রী গলায় উচ্চারণ করছিল ভয়ংকর একটা শপথ। ভাগ্যিস সভ্য শাদা জাতিদের মধ্যে মানুষের মাংস খাওয়ার রেওয়াজ নেই, নইলে কী যে হয়ে যেত বলা যায় না।

কিন্তু 'হোলি ফাদার' অন্তর্যামী। "পিতা যীশু প্রেম করিলেন" মেজর সাহেবকে। কোথা থেকে ছটাক খানেক ওজনের একটা ঢিল এসে মেজর সাহেবের ভারী মিলিটারী বুটের কাছে ঠিকরে পড়ল। অবশ্য ঢিলটার গুরুত্ব কিছু নেই—একটা পিঁপড়েরও মাথা ফাটত কিনা সন্দেহ। কিন্তু 'ভায়োলেন্স ইজ অল্‌ওয়েজ ভায়োলেন্স'। অতএব—অতএব মেজর সাহেব গর্জে উঠলেন : ফায়ার।

কয়েকটা বেসুরো ভয়ংকর শব্দে আকাশ পাতাল ফেটে চৌচির হয়ে গেল যেন। খানিক আর্তনাদ, খানিকটা রক্ত। এমন অনেক রক্তই ভারতবর্ষের মাটিতে ঝরেছে—আজও ঝরল। শুধু চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটি কিশোরের কঠিন মুঠিতে আঁকড়ে ধরা

তে-রঙা পতাকাটা তার বুকের রক্তে রাঙা হয়ে গেল।

তারিখটা ছিল ছাব্বিশে জানুয়ারী। ভারতবর্ষের জীবন-পঞ্জীতে একটা লাল তারিখ।

ব্যারাকে ফিরে আর্মড কনস্টেবল অচ্ছয়লাল প্রসাদ ক্লান্ত ভাবে লোহার খাটটার ওপরে বসে পড়ল। ভারী হয়রানি গেছে আজ। ইচ্ছে করছে খাটিয়াটার ওপর গড়িয়ে পড়ে। জীবনে আজ প্রথম গুলি ছুঁড়ল অচ্ছয়লাল। গুলি ছুঁড়ল কংগ্রেসওয়ালা শয়তানদের ওপর, সরকারের দুশমনের ওপর। প্রথম হাতে খড়ি।

কিন্তু গর্ব বোধ হচ্ছে না, গৌরবও নয়। অথচ চাঁদমারী করবার সময়ে ঠিক এই শুভলগ্নটির কল্পনা করে কত রোমাঞ্চিত হয়েছে অচ্ছয়লাল। টিনের চাকৃতি ফুটো করে তার সুখ নেই, একটা জলজ্যান্ত তাজা মানুষের প্রসারিত হৃৎপিণ্ড ভেদ করে রাইফেলের রিভল্‌ভিং শেল চলে যায়, ফোয়ারার মতো ধারায় আগুন-রাঙা রক্তস্রোত উছলে উছলে বেরিয়ে আসে, একটা উৎকট অমানুষিক উল্লাসে ভরে ওঠে মন। আজ সেই শুভদিনটি এসেছিল অচ্ছয়লালের। কিন্তু তবু—তবু!

এ কী হল—কাদের ওপর গুলি চালালো সে! খদ্দরের টুপি পরা, তে-রঙা পতাকা হাতে একদল ছাত্র। তাদের চোখে মুখে আর যাই থাক, দুশমনীর কালো পঙ্কিল ছায়াটা তো চোখে পড়েনি কোথাও! বরং একটা অদ্ভুত আলো, একটা অপরূপ শুচিতায় কচি কিশোর মুখগুলি ঝলমল করছিল। মুহূর্তের জন্যে অচ্ছয়লালের কী একটা মনে পড়েছিল —কী একটা কথা; ঠিক ধরতে পারছিল না, অস্পষ্ট অস্ফুট একটা ছায়ার মতো সঞ্চরণ করছিল তার চেতনার মধ্যে। মুহূর্তের জন্যে কেমন আচ্ছন্ন আর অভিভূত হয়ে গিয়েছিল অচ্ছয়লাল।

কিন্তু কেটে গেল সেটা। বেখাপ্পা বিসদৃশ একটা গর্জন শোনা গেল: ফায়ার।

প্রতিক্রিয়াটা হল বিদ্যুতের চমকের মতো। রাইফেলের মস্তিষ্ক নেই, সেই রাইফেল দিয়ে যারা মানুষ মারে, তাদেরও বোধবৃত্তি থাকাটা অবান্তর এবং অসঙ্গত। কী ভাবছিল, ভুলে গেল অচ্ছয়লাল। যান্ত্রিক হাতে ঝড়াং করে যন্ত্রটা উঠে এল। এবং তারপর—

পর পর তিন রাউণ্ড। খানিকটা ধোঁয়া, খানিকটা বারুদের গন্ধ, খানিক রক্ত, খানিক আর্তনাদ এবং প্রবল কোলাহল। কিন্তু যান্ত্রিক মুখে একটা রেখাও ফুটে উঠল না।

লেফট্—রাইট্—লেফট্—রাইট্—

যন্ত্রের মতো তালে তালে পা পড়তে লাগল। অনেক রক্ত ঝরা ভারতবর্ষের জমিতে রাঙা কাঁকর গুঁড়ো করে দিয়ে সবুট পদযাত্রা। হুইট ইণ্ডিয়ার একটা মৃদু প্রত্যুত্তর।

কিন্তু ব্যারাকে ফিরে এসে কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে অচ্ছয়লালের। যেমনটি আশা

করেছিল, তেমন হল না। কোথায় সুর কেটে গেছে। জয়ের গর্ব নয়, একটা কালো গ্লানির অপচ্ছায়ায় নিজেকে বিতৃষ্ণ এবং অবসন্ন বলে বোধ হচ্ছে। এতদিন লক্ষ্য ছিল সোজা, পরিণতির ইঙ্গিত ছিল প্রত্যক্ষ এবং পরিচ্ছন্ন। নিমকের গুণ রাখতে হবে—শেষ করে দিতে হবে অন্নদাতা সরকারের দুশমনকে। আজ যেন লক্ষ্যটা কেমন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে, কেবলি মনে হচ্ছে যেমন কল্পনা করেছিল ব্যাপারটা তা ঠিক নয়।

শিবসহায় ঘরে ঢুকল।

—কী দোস্ত, অমন মনমরা হয়ে বসে আছ কেন ?

—না, কিছু না।

—শরীর খারাপ ?

—না, তাও নয়।

—তা হলে কী ? হাবিলদার গাল দিয়েছে ?

—উঁহু।

—তবে হল কী ?

পাশে বসে শিবসহায় বিড়ি ধরালো একটা, বললে, ওঃ, বুঝতে পেরেছি। বৌয়ের চিঠি পাওনি বুঝি ?

—না দোস্ত, ওসব কিছু না—তেমনি অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলে অচ্ছয়লাল : কেমন খারাপ লাগছে।

—খারাপ লাগছে ? তারও দাওয়াই আছে। লছমন সিং অনেকখানি সিদ্ধি বাটছে, এক লোটা খাবে চলো।

সন্ধ্যা নামছে পুলিস ব্যারাকে। সামনে ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে পাশে জ্বলেছে ইলেকৃট্রিকের আলো। আকাশের কোণে জ্বলছে একফালি চাঁদ। কাঁকরের ওপর কর্কশ আর্তনাদ তুলছে সেন্টি্রর পদচারণা। বাতাসে কয়লার ধোঁয়া ভাসছে, ভাসছে রুটি সেঁকার গন্ধ। ঢোল আর করতালের সঙ্গে সঙ্গে উঠছে উচ্চণ্ড সঙ্গীত। সীতাহরণের জন্যে শোক করা হচ্ছে :

"যোগী বন্‌কে আয়ে রাবণোয়া
পঞ্চবটী যঁহা সিয়া রহে—"

পুলিস ব্যারাক। কিন্তু এই সন্ধ্যায় ওরা শুধু আমর্ড ফোর্স নয়, ওরা মানুষ। বুট নয়, পটি নয়, পাকা ইস্পাতে তৈরি রাইফেলের নলটাকে ঘষে মেজে আরো পরিষ্কার করাও নয়। এই সন্ধ্যায় ওদের হয়তো মনে পড়ে বিহার অযোধ্যার সেই সব গ্রামের কথা, যেখানে রাঙা মাটির ওপরে তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে অড়হরের ফিকে সবুজ বিস্তার, টুকরো টুকরো

জলের ওপর সিঙাড়ার ছোট ছোট পাতা কাঁপছে মেঠো বাতাসে, দূরে একটা পাহাড়ের আনীল ছায়ামূর্তি; রহট্টা ঘুরছে কুয়োর ওপরে—ক্ষেতে ক্ষেতে জল দেওয়া হচ্ছে, মোষে চেপে চলেছে ন্যাংটো ছেলে, টাট্টু হাঁকিয়ে চলেছে তিন বিঘে জমির 'জমিন্দার', চালে চালে দেওয়ালে দেওয়ালে ঘেঁষাঘেঁষি করে ওদের ছোট ছোট গাঁব; সেখানে লাল নিশান উড়ছে কবীরপন্থী সাধুদের আখড়ায়। আর সব কিছুর ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে লীলাচঞ্চলা একটি তরুণী বধূর মুখ—যাঁতায় গম ভাঙতে ভাঙতে 'পরদেশিয়া'র জন্তে যার উদ্বেল মন থেকে থেকে বিষণ্ণ আকুল হয়ে উঠেছে।

লছমনের সিদ্ধি ঘোঁটাটা হয়েছিল ভালো। বেশ আমেজ এসে গেল অচ্ছয়লালের। কিন্তু গুলাবী মৌজে মনটা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল না, সাড়া দিতে ইচ্ছে করল না সঙ্গীদের অসময়ে জুড়ে দেওয়া একটা অশ্লীল হোলীর গানে। বরং মনে পড়ল সেই তে-রঙা পতাকা-টাকে, একটি কিশোরের বুকের রক্তে যেটা টকটকে রাঙা হয়ে গেছে।

আর মনে পড়ল সেই কথাটা,—যে কথাটা তখন সে মনে করতে পারেনি, যে কথাটা একটা বুদ্বুদের মতো ভাবনার কালো স্রোতের ওপরে ফুটে উঠতে গিয়েই হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল···

···তালুকদার সুরযনারায়ণ। জাতে রাজপুত, রাজপুত্রের মতো মেজাজ। তার দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। দেহাতী মানুষরা তাকে ভয় করত যমের মতো। জঙ্গলে যে সব ময়ূর আর হরিণ বসবাস করে, এ অঞ্চলের লোক পারতপক্ষে তাদের শিকার করে না, কাউকে শিকার করতে দেয়ও না। কিন্তু এ সব সংস্কারের অনেক উর্ধ্বে সুরযনারাণ। বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে ঘোড়ায় চেপে শিকার করতে যায় সে, দিনান্তে রক্ত-রাঙানো হাতে কড়া চাবুক চালিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আসে।

এ হেন সুরযনারাণের অকৃপা হল জগলালের ওপর।

অপরাধের মধ্যে জগলালের একটা রাত-চরা ঘোড়া ছিল। বেশ তেজী জোয়ান ঘোড়া। জোর কদমে ছুটতে পারত, দল বেঁধে সবাই মিলে গঞ্জের হাটে কলাই বিক্রি করতে যাওয়ার সময় সে ছুটত সকলের আগে আগে। আদর করে জানকী—জগলালের মেয়ে জানকী তার নাম দিয়েছিল 'বাহাদুর'।

জানকী! আজ পনেরো বছর হতে চলল, কিন্তু অচ্ছয়লাল জানকীকে ভোলেনি। ভোলবার উপায় নেই। প্রথম প্রেম—কিশোর প্রেম।

তখন প্রায় বছর বারো জানকীর বয়েস। ওদের দেশের রেওয়াজ অনুযায়ী অরক্ষণীয়া কন্যা। কিন্তু সব দিক থেকেই কেমন একরোখা মানুষ ছিল জগলাল। সে সোজা জবাব দিত, কী রকম ছেলের হাতে মেয়ে তুলে দেবো, বড় হয়ে হয়তো চোয়াড় হবে—বাটপাড় হবে। তখন তো তোমরা আমার মেয়েকে দেখতে আসবে না। তার চাইতে সময় হলে

ভালো ছেলে দেখেশুনে বিয়ে দেব, আমার একমাত্র বেটি ভবিষ্যতে কোনো কষ্ট যেন না পায়।

গাঁয়ের লোক ছি ছি করেছে বটে, কিন্তু তার বেশি কিছু বলবার সাহস পায়নি। নামজাদা কুস্তিগীর জগলাল। ল্যাঙট পরে, সারা গায়ে ধুলোমাটি মেখে যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন তাকে দেখায় যেন মহিষাসুরের মতো। অমন পালোয়ান আশপাশের ভেতরে জুটি মেলা শক্ত।

তারই মেয়ে জানকী। বেশ শ্রীমন্ত, লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। সুগঠন শ্যামবর্ণ শরীর প্রাণের উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে আছে। চুলগুলো মাথার ওপরে ঝুঁটির মতো বাঁধা, ছুটাছুটি করবার সময় পুরুষের মতো মালকোঁচা এঁটে কাপড় পরে।

ক্ষেতে তখন মহিষ চরায় অচ্ছয়লাল। বাঁশি বাজায়। রামলীলায় সীতা সেজে গান করে। আর দুরন্তপনা করে জানকীর সঙ্গে। জল কাদার ভেতরে মাতামাতি করে সিঙাড়া তোলে, বুড়ী রসিয়ার মা'র গালাগালি উপেক্ষা করে তার গাছ থেকে মুসম্মা চুরি করে আনে। দরকার হলে চুলোচুলিও করে জানকীর সঙ্গে।

সেদিনকার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে আজও। শীতের দুপুরের ঠাণ্ডা রোদে কেমন যেন ঘুম এসে গিয়েছিল অচ্ছয়লালের। মোষটা একটা জলার মধ্যে নেমে জোলো ঘাস খাচ্ছিল আর তার পিঠের ওপরে বসে ঝিমুচ্ছিল অচ্ছয়লাল।

—ঠক্—

কোথা থেকে ছোট একটা ঢিল উড়ে এল, লাগল অচ্ছয়লালের কপালে। ঘুমের চটকাটা ভাঙতে চোখে পড়ল অদূরে একটা মোটা শিশু গাছের আড়ালে একখানা লাল শাড়ির প্রান্ত, বাতাসে ভেসে এল এক ঝিলিক মিষ্টি হাসি।

মোষ থেকে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল অচ্ছয়লাল। তারপর অপরাধিনীকে ধরতে এক মিনিটও সময় লাগল না।

ধরা পড়ে জানকী বললে, আমি—মারিস্‌নি বলে দিলাম।

—কেন মারব না? কার ভয়ে?

—ভয়ে আবার কার? বহুকে কেউ মারে নাকি?

—বহু!

—হ্যাঁ। বাবা বলছিল তোর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে।

মনে আছে দিনের রঙটা বদলে গিয়েছিল সেদিন, বদলে গিয়েছিল আকাশের রং। রহট্টার শব্দের সঙ্গে সেদিন গানের সুর মিশে গিয়েছিল, বাঁশি বেজে উঠেছিল বাতাসে শিরশির করা গহুমের শিসে শিসে।

এল তালুকদার সুরযনারায়ণ। গানের সুর কেটে গেল, বাঁশি টুকরো টুকরো হয়ে

ছড়িয়ে পড়ল কাঁকর মেশানো রাঙা মাটিতে।

সেই ঘোড়া—সেই রাত-চরা বাহাদুর। দড়ি ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে এল—পেট ভরে ফলার করলে সুরযনারাণের পাকা গমের ক্ষেতে।

অসুরের মূর্তি ধরলে সুরযনারাণ। জগলালকে কিছু বললে না, বাঁধলে বাহাদুরকে। তারপর সমস্ত গাঁয়ের লোকের সামনে নিজের হাতে বাহাদুরকে চাবুক মারতে শুরু করলে।

সে দৃশ্য ভোলবার নয়।

সুরযনারাণ যেন ক্ষেপে গিয়েছিল। চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল—প্রচণ্ড রকমে নেশা করেছিল বোধ হয়। একটা হিংস্র সংকল্পে চোয়াল দুটো এঁটে বসেছিল এক জোড়া খিলের মতো। আর শাঁই শাঁই করে চলছিল তার হাতের চাবুক—বাতাসের বুক চিরে শিসের মতো উঠছিল একটা তীব্র নিষ্ঠুর শব্দ।

কিসের চাবুক সেটা কে জানে। সরু একটা লম্বা ল্যাজের মতো—সারা গায়ে তার কাঁটা। চাবুকের প্রতিটা আঘাত ছুরির আঁচড়ের মতো পড়ছিল বাহাদুরের সর্বাঙ্গে। দরদর করে ঝরছিল রক্ত, চিকণ মসৃণ লোমের ভেতরে ঘামের চূর্ণ বিন্দু এসে জমছিল—যন্ত্রণার প্রতীক।

আর লাফাচ্ছিল ঘোড়াটা—চিৎকার করছিল অস্বাভাবিক ভাবে, চাঁট ছুঁড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। সুরযনারাণের মুখে ফুটে উঠছিল শয়তানের একটা কুটিল সরীসৃপ হাসি।

সে দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে গাঁয়ের লোকের মুখ দিয়ে আর কথা ফুটছিল না।

কিন্তু আর পারল না জগলাল। একটা হিংস্র চিৎকার করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল,—করে বসল একটা কল্পনাতীত দুঃসাহসিক ব্যাপার।

মুহূর্তে সুরযনারাণের চাবুকটা চলে এলো জগলালের হাতে। বাতাস চিরে উঠল পর পর কয়েকটা তীব্র শিসের শব্দ। রক্তাক্ত মুখটা দু'হাতে চেপে সুরযনারাণ বসে পড়ল।

সারা গায়ে একটা মুঠো ধুলো ছড়িয়ে দিয়ে কুস্তিগীরের মতো উরু চাপড়াতে লাগল জগলাল। জগলাল? না মহিষাসুর। গর্জন করে বলতে লাগল: আও আও, চলা আও—

কিন্তু সুরযনারায়ণ সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি।

পরক্ষণেই হতভম্ব জনতার মুখের ওপর দিয়ে বাহাদুরকে ছুটিয়ে চলে গেল জগলাল।

সকলে আশঙ্কা করছিল, ভয়ংকর একটা কিছু ঘটবে। থানা পুলিস হবে, পাঁচ বছর জগলালকে হাজত ঘুরিয়ে আনবে সুরযনারাণ। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই হল না। জগলাল বুক ঠুকে বলতে লাগল: কেয়া করে গা শালা? উস্‌কো জান লে লেঙ্গে—

কিন্তু জগলালের চওড়া বুকটাও একদিন ভাঙল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চুরি হয়ে গেল জানকী। জানকী—অচ্ছয়লালের প্রথম প্রেম—কিশোর প্রেম। নীল আকাশ থেকে বাজ পড়ল।

সন্ধান যখন পাওয়া গেল, তখন ঢের দেরি হয়ে গেছে। তখন সুরযনারাণের খোঁড়া চাকরটার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে জানকীর। তার সমস্ত মুখটা মেটে সিঁদুর আর চোখের জলে একাকার হয়ে গেছে।

বন্দুক বাগিয়ে সুরযনারাণ বললে—নিকালো।

জগলাল মামলা করতে চাইলে, কিন্তু সুরযনারাণের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজী ছিল না কেউ। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদটা কেউ পছন্দ করেনি। তাদের অপরাধ ছিল না।

অচ্ছয়লালকে সঙ্গে করে থানায় গিয়েছিল জগলাল। সে তখন বদ্ধ উন্মাদ। খালি চিৎকার করেছিল : জান্ লে লেঙ্গে, উস্‌কো জান লে লেঙ্গে—

থানার দারোগাও জবাব দিয়েছিল সুরযনারাণের ভাষায়। সেও কালো একটা বন্দুকের নল জগলালের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—নিকালো।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা রেখেছিল জগলাল। সত্যিই জান নিয়ে নিয়েছিল সে। তবে সুরযনারাণের নয়, সেই খোঁড়া চাকরটার। আরা জেলে জগলালের ফাঁসি হয়েছিল।

আর জানকী? তার খবর আর কোনোদিন এসে পৌঁছোয়নি অচ্ছয়লালের কাছে।...

...হঠাৎ একটা ধাক্কা দিলে শিবসহায়।

—কী দোস্ত, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

চটকা ভেঙে কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে অচ্ছয়লাল তাকালো।

—খুব নেশা ধরেছে বুঝি? চলো, চলো, শুয়ে পড়বে চলো।

রাত্রে ক্রমাগত আবোলতাবোল স্বপ্ন দেখতে লাগল অচ্ছয়লাল। সুরযনারাণ আর থানার দারোগার মুখ বারে বারে একাকার হয়ে যাচ্ছে—আর কেন কে জানে, ভেসে উঠছে মেজর সাহেবের মুখখানা।

শেষ রাত্রে যখন অচ্ছয়লাল উঠে বসল, তখন ঘামে তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। আর অস্বস্তিকর একটা উত্তেজনার পীড়নে ক্রমাগত কাঁপছে হাতের আঙুলগুলো। কাঁচের জানালা দিয়ে হাল্‌কা চাঁদের আলো পড়েছে তার ঘরে, সে আলোয় তার রাইফেলটা ঝকমক করে উঠছে। এইটেই কি সে দেখেছিল সুরযনারাণের হাতে, সেই দারোগার হাতে?

তেরঙা পতাকাটা লাল হয়ে গিয়েছিল বুকের রক্তে। সেই রক্তের সঙ্গে জানকীর

কপালের মেটে সিঁদুরের প্রলেপটার কোথাও কোনো সাদৃশ্য আছে কি ?

* * *

ঘটনাটা ঘটল তার পরের দিন, সকাল বেলায়।

চাঁদমারী হচ্ছিল। পেছনে ছোট একটি মাটির পাহাড়—সামনে চাঁদমারির চাক্তি। আর্মড্ ফোর্স প্র্যাক্টিস করছে। ওই চাক্তি ফুটো করে হাত তৈরি করতে হবে, জলজ্যান্ত মানুষের তাজা হৃৎপিণ্ড ভেদ করবার লক্ষ্য। সরকারের দুশমনকে নিপাত করে দিয়ে নিষ্কণ্টক করে দিতে হবে শাসন-ব্যবস্থা।

—গুড়ুম—গুম্-গুম্—

গুলি ছুটছে। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে জায়গাটা—ভাসছে উৎকট বারুদের গন্ধ।

রাইফেল তুলে নিয়ে লক্ষ্যবেধ করতে যাচ্ছিল অচ্ছয়লাল। হঠাৎ কেমন করে একটা বিশ্রী হোঁচট খেল সে। পরক্ষণেই একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনা হতে হতে রক্ষা পেয়ে গেল।

হাতের থেকে ছুটে গিয়েছে রাইফেলের গুলি। আর গিয়েছে একেবারে মেজর সাহেবের কানের পাশ দিয়ে। একটু হলেই খুলিটা সুদ্ধু উড়িয়ে নিয়ে যেত।

খুব খানিকটা হৈচৈ হট্টগোল। মেজর সাহেব তখনো কাঁপছিল। কাঁপুনি থামলে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় বসিয়ে দিলে অচ্ছয়লালের গালে।

শালা উল্লু, ক্যায়সা প্র্যাক্টিস্ কিয়া এত্না রোজ ? আভিতক্ ঠিক্‌সে ঠহ্‌রানে নেহি জানতা ? থোরেসে মেরা জান বচ্ গিয়া—

কিন্তু যেটা হঠাৎ হয়ে যায়, সেটা নিতান্তই হঠাৎ। ওজন্যে বেশি গণ্ডগোল করে লাভ নেই। শিবসহায় সান্ত্বনা দিয়ে বললে, গোলাগুলির ব্যাপার—একটু হুঁসিয়ারীর সঙ্গে প্র্যাক্টিস্ করতে হয় ভাই—নইলে সব গড়বড় হয়ে যেতে পারে—

ঠিক কথা—সব গড়বড় হয়ে গেছে। অচ্ছয়লালের হাত এখনো প্র্যাক্টিস্ হয়নি।

ধন্বন্তরি

চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী।

দাতব্য চিকিৎসালয় বলেই দাতার হস্ত অকৃপণ নয় ; রিমাইণ্ডার দিতে দিতে ডাক্তার খগেন দাস এল. এম. এফ.-এর কলমটার নিব অর্ধেক ক্ষয়ে এসেছে। লাল ফিতেয় বাঁধা ফাইলগুলোর ওপর ধুলোর স্তর জমছে দিনের পর দিন—সেগুলো খুলে ঘাঁটবার মতো সময় নেই কারো—উৎসাহও না।

ডাক্তার খগেন দাস এল. এম. এফ. কিন্তু দমবার পাত্র নন। শেষ পর্যন্ত হুঙ্কার ছাড়লেন,

কম্পাউণ্ডারবাবু ?

পাশের কম্পাউণ্ডিং রুম থেকে বিবর্ণ কাটা দরজাটা ঠেলে কম্পাউণ্ডার যতীন সমাদ্দার প্রবেশ করলে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় মাসে আটাশ টাকা মাইনে পায় লোকটা। বাদুড়চোষা শরীর, মাথার শাদা-কালো চুলগুলো সমান মাপে নিরপেক্ষভাবে ছাঁটাই করা—যেন শুয়োরের গায়ের রোঁয়া। কপালে একটা মস্ত আব, তার ওপর দু-তিনগাছা চুল গজিয়েছে। তোবড়ানো গাল, চোখের কোটরে কালির পোঁচড়া। গায়ের ময়লা ফতুয়ার দুটো বোতাম ছেঁড়া, হাঁটু পর্যন্ত তোলা কণ্ট্রোলের ধুতির নিচে বকের মতো সরু সরু দুটি পা ক্যাম্বিসের ফিতেহীন জুতোয় অলঙ্কৃত হয়ে আছে।

কম্পাউণ্ডার যথানিয়মে বিনয়াবনত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো।

—ডাকছিলেন আমাকে ?

—হ্যাঁ, দেখুন তো মশাই একবার কাণ্ডটা। এত লেখালেখির পরে জবাব দিচ্ছে : our attention is drawn to the matter ! রসিকতারও একটা সীমা তো থাকা দরকার।

উত্তরে কী বলা উচিত ভেবে পেলো না কম্পাউণ্ডার।

টেবিলে একটা কিল মেরে খগেন ডাক্তার বললেন, চালিয়ে যান ওই সিঙ্কোনা আর কার্মিনেটিভ মিক্শ্চার। কলেরা, টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া, ব্ল্যাকওয়াটার, ম্যালেরিয়া, নিমোনিয়া—যাতে লাগে। যেটা বাঁচে বাঁচুক, বাকিগুলো মরে হেজে ডিস্পেন্সারীর ভিড় হাল্কা করে দেবে।

জীর্ণ চেহারার মতো জীর্ণ গলায় আটাশ টাকা মাইনের কম্পাউণ্ডার বললে, আজ্ঞে।

—আর শুনুন। ছোট আলমারির চাবিটা আমাকে দিয়ে দেবেন।

কম্পাউণ্ডার চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো। ভীরু দুটো চোখের সঙ্গে মিলল কুটিল তীক্ষ্ণ চোখের সন্ধানী দৃষ্টি। ঠোঁটের কোণে সিগারেট দুলিয়ে এক ধরনের বিচিত্র চাপা গলায় ডাক্তার বললে, শুনছি ভালো দু-চারটে ওষুধ যা আছে সেগুলো নাকি ইঁদুরে খাচ্ছে।

কথাটা রূপক হলেও ইঙ্গিতটা এত স্পষ্ট যে কম্পাউণ্ডারের ঘোলা চোখ দুটো পর্যন্ত ক্ষণিকের জন্যে চকচক করে উঠল। যেন ওষুধ একাই চুরি করে বিক্রি করে কম্পাউণ্ডার—ডাক্তার একেবারে দেবতার মতো নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। কম্পাউণ্ডারের শীর্ণ স্নায়ুগুলো এক মুহূর্তের জন্যে ধনুকের ছিলের মতো দৃঢ় হয়ে উঠতে চাইল। কিন্তু আটাশ টাকা মাইনের কম্পাউণ্ডার কোনো কথা বললে না, নিঃশব্দে কোমর থেকে চাবিটা খুলে এনে ডাক্তারের টেবিলে রাখলে, তারপরে কাটা দরজাটা ঠেলে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটা এমনভাবে চলে যে পায়ের শব্দটুকু পর্যন্ত শোনা যায় না। যেন পৃথিবীকে নিজের অস্তিত্বটুকু

জানাতেও সংকোচ বোধ করে সে।

অর্থপূর্ণ গলায় ডাক্তার শুধু বললেন, হুঁ।

ডিস্‌পেন্সারী ছোট—আয়োজনও প্রচুর নয়। কিন্তু ডিস্‌পেন্সারীর দিকে তাকিয়েই মানুষের আধি-ব্যাধিগুলো অপেক্ষা করে থাকে না। ঋতুতে ঋতুতে মহাকবি কাল নির্ভুল নিয়মে তাঁর ঋতুসংহার কাব্য রচনা করে চলেন। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত আমাশয়। ঠোঁটের কোণে সিগারেট ধরিয়ে ডাক্তার দ্রুতগতিতে প্রেসক্রিপসন লিখে যান—একই মিকশ্চার কম্পাউণ্ডারের হাতের গুণে বহুরূপীর মতো রঙ বদলায়। বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ—রোগমুক্তি না হোক, কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঠেকাবে কে!

ওরই ফাঁকে ফাঁকে রোগী পরীক্ষাও চলে।

—দেখি, জিভ দেখি। আঃ—অতটুকু কেন—লজ্জায় যেন জিভ কাটছে! আরো বার কর, একটুখানি, আর একটু—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। এদিকে এসো তো বাপ, পেটটা একবার দেখাও। ওরে বাপরে—পিলে তো নয় যেন দেড়মনী একটা কচ্ছপ। অতবড় পিলে বয়ে ব্যাটা হাঁটিস কী করে?

কথা চলে, লেখাও চলে সঙ্গে সঙ্গে। কলমটার সুর বাঁধাই আছে—চোখ বুজে কাগজের ওপর ধরে দিলেই নির্ভুল প্রেসক্রিপসন বেরিয়ে আসবে, এমন কি ডাক্তারের দস্তখতটা পর্যন্ত। যেমন ডিস্‌পেন্সারী, তেমনি ওষুধের ব্যবস্থা। দানের উপযোগী দক্ষিণা। আড়াই পয়সায় অক্রূর সংবাদ হয় না।

সার্ভিং রুমে কম্পাউণ্ডার দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের সামনে। এক হাতে মেজার গ্লাস, এক হাতে কাঁচি। টেবিলের ওপর একরাশ কাগজ, এক শিশিতে গঁদের আটা। মেজার গ্লাসে করে ওষুধ মাপে, কাঁচি দিয়ে দাগ কাটে, কেটে আটা দিয়ে আঁটে। প্রেসক্রিপসন-গুলোও আর পড়বার দরকার হয় না আজকাল।

তবু ওরই ভেতরে নিচু গলায় রোগীদের সঙ্গে কথা জমাতে চেষ্টা করে কম্পাউণ্ডার।

—কি রে, তোর ছেলে কেমন আজকাল?

—জ্বর তো ছাড়ে না বাবু। আজ যদি একটু ভালো করে ওষুধ দেন—

—ওষুধ—ওষুধ! আরে ওষুধে কি আর অসুখ সারে! বাড়িতে ডাক্তার নিয়ে গিয়ে দেখা, তবে তো?

রোগীর অভিভাবক ম্লান হয়ে যায়। বিষণ্ণ ক্লান্ত মুখের ওপরে স্পষ্ট হয়ে বেদনার নিবিড় ছায়া পড়ে। ক্ষীণ গলায় বলে, দু' টাকা করে ডাক্তারবাবুর ভিজিট লাগবে। কোথায় পাব বাবু?

কম্পাউণ্ডারের ঘোলা চোখ দুটো অকস্মাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। লোভের রেখায় চিহ্নিত হয়ে ওঠে সমস্ত মুখাবয়ব। একটা অবজ্ঞাবাচক ভঙ্গি করে কম্পাউণ্ডার বলে, আরে চেয়ারে

বসে খালি সই করলেই যদি ডাক্তার হওয়া যেত তাহলে তো আর কথাই ছিল না। এ হল হাতে কলমের কাজ। ডাক্তারবাবু তো লিখেই খালাস—কিন্তু ভেবেচিন্তে হিসেব করে ওষুধ কে দেয় শুনি ?

—আজ্ঞে আপনি।

—তবে ?—কম্পাউণ্ডারের সর্বাঙ্গে বিজয়গর্ব ফুটে ওঠে। লোকটা বোকার মতো তাকিয়ে থাকে, কম্পাউণ্ডার কী বলতে চায় বোঝবার চেষ্টা করে।

একটা ঢোঁক গিলে কম্পাউণ্ডার তেমনি নিচু গলায় বলে, আর তা ছাড়া দেখছিস তো—একেবারে চামার। চোখের পর্দা বলে বালাই নেই। গরীবের ঘরে ভাত নেই, কিন্তু দু' টাকার কমে উনি কোন কথা কইবেন না। কাগজে সই করেই দু'-দুটো টাকা—এ মামাবাড়ির আবদার নাকি!

বোকা লোক তবুও বুঝতে পারে না, তেমনি তাকিয়ে থাকে।

—একটা টাকা দিতে পারবি ? তাহলে আমিই যেতাম।

—আপনি!

মেজার গ্লাসটা টেবিলের ওপরে ঠক করে নামিয়ে রাখে কম্পাউণ্ডার। শিরাসর্বস্ব হাতের গাঁট বেরুনো আঙুলগুলো অশান্ত চঞ্চলতায় নড়ে ওঠে।

—হ্যাঁ—আমি। কেন—ওই সই করা ডাক্তারের চাইতে বিদ্যেটা আমার কম বলে ভাবিস বুঝি ? বেশ তো, টের পাইয়ে দেব একদিন। আমার হাত দিয়েই তো যায়, রুগীকে পটল তুলিয়ে দিতে এ শর্মার এক মিনিট।

আতঙ্কে চমকে ওঠে লোকটা। বলে, আজ্ঞে না না, তা নয়। গরীব মানুষ—একটা টাকা—

মুখের কথা লুফে নেয় কম্পাউণ্ডার: তা হলে বারো আনা ? কী, পারবি না ? না হয় দু' আনা কম দিস। আচ্ছা, আচ্ছা, না হয় ওই আট আনাই হল। এক সের ধান নয় বেচে দিস, অত ভাবছিস কেন ?—ছুরির ডগায় দ্রুত বেগে মলম তৈরি করতে করতে কম্পাউণ্ডার বলে, বুঝলি, আমি সই করা ডাক্তার নই। লোকের রক্ত শুষে ভিজিট নেওয়া আমার পেশা নয়। নেহাত তোদের ভালবাসি বলেই—

মুখস্থ করা বুলির মতো অবলীলাক্রমে বেরিয়ে আসে বক্তৃতাটা। প্রেসক্রিপসন সার্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলোও অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেছে। রেলগাড়ির ক্যানভাসারদের মতো একটানা ক্লান্ত গলায় বলে যায় কম্পাউণ্ডার; মাঝে মাঝে নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে থামে, গলার শ্বাসনলীটা ঢেউয়ের মতো ওঠাপড়া করে, কপালের আবটার ওপরে ঘাম জমে উঠে চিকমিক করে রাজটীকার মতো।

কেউ রাজী হয়, কেউ হয় না। খুশি হয়ে ওঠে না কম্পাউণ্ডার, দুঃখিতও না। মরা

নদীতে জোয়ারের জল আসা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। আটত্রিশ বছরের শিরা-স্নায়ুর রক্তধারাকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে আটাশ টাকার জগদ্দল পাথর।

বেলা আটটা থেকে বারোটা। ডাক্তার মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায়—সাইকেল করে দুটো-চারটে রোগী দেখে ঘরে আসে। কিন্তু বিশ্রাম নেই কম্পাউণ্ডারের, অবকাশও নেই। হাত চলে, মুখও চলে সমানে। পুরোনো যন্ত্রের মতো একটানা—অবসন্ন ছন্দে। যেদিন দুটো-চারটে এমার্জেন্সী কেস আসে, ড্রেস করতে হয়, সেদিন আরো বেলা হয়ে যায়। দেড়টা দুটোর সময় মাতালের মতো টলতে টলতে কোয়ার্টারে ফিরে আসে কম্পাউণ্ডার।

কোয়ার্টারই বটে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের মর্যাদা রক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী। বাঁকারির বেড়ার ওপরে মাটি লেপা, ওপরে খড়ের চাল। মেটে দাওয়ার এদিক ওদিকে মাঝে মাঝে এক-একটা কালো কালো গর্ত ফুটে বেরোয়—রোজ সেগুলোর ওপর মাটি চাপাতে হয়—সাপের ভয়ে। দুখানা ঘর, একটুকরো রান্নাঘর, একটা পাতকুয়ো আর তিনটি পেঁপে গাছ। তার ভেতরে কম্পাউণ্ডারের জমজমাট সংসার।

স্ত্রী, পাঁচ-ছটা ছেলে মেয়ে। দিবারাত্র স্ত্রীর ভাঙা কাঁসরের মতো গলা ক্যান্ ক্যান্ করে পেত্নীর কান্নার মতো বাজতে থাকে। স্ত্রীর রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে কম্পাউণ্ডার ভাবে ভিটামিন 'বি' দরকার। ছেলেমেয়েগুলোর হাতে পায়ে একজিমা,—ক্যাল্সিয়াম ডিফিসিয়েন্সিতে ভুগছে ওরা।

রাঙা চালের ভাত আর পেঁপের তরকারী খেয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে নিতে চেষ্টা করে কম্পাউণ্ডার। কিন্তু ঘুম আসে না। স্ত্রীর গর্জন চলতে থাকে, ছেলেমেয়েগুলোর চিৎকারে কানের পোকা বেরিয়ে আসবার উপক্রম করে। নাঃ—অসম্ভব!

স্ত্রীকে খানিকটা কটু গালিগালাজ এবং ছেলেপিলেদের দু-একটা চড়-চাপড় বসিয়ে বিরক্ত বিতৃষ্ণ কম্পাউণ্ডার বাইরের বারান্দায় এসে বসে। একটা বিড়ি ধরিয়ে নেয়, তারপরে অর্থহীন চোখে তাকিয়ে থাকে সম্মুখে প্রসারিত অবারিত দিগন্তের দিকে।

একটা ধু ধু করা মাঠ। বছরে একমাত্র ফলন হয় এদেশে—আমন। ধানকাটা শেষ হয়ে গেলেই চক্রবাল-বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠটা পড়ে থাকে একটা বিপুল ব্যাপ্ত শ্মশানের মতো। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে রোদে পোড়া খেজুর গাছগুলো ডাইনির মতো মাথা নাড়ে—চিৎকার করে উড়ে যায় শঙ্খচিল। কোথাও হয়তো বা একটা মরা কুকুরের চারদিকে গোল হয়ে বসে সভা করে শকুনেরা—মাঝে মাঝে সাঁড়াশির মতো লম্বা গলা বাড়িয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নাড়িভুঁড়ি খায়।

খরিস গোখরোর ছেঁড়া খোলসের মতো এবড়োখেবড়ো মেটে রাস্তাটা মাঠের ভেতরে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আছে। ছোট ছোট ঘূর্ণি তার ওপরে এক-একটা প্রেতচ্ছায়ার মতো

অবয়ব নিয়ে উঠতে গিয়ে মিলিয়ে যায়। ধুলোর গন্ধ বয়ে গরম বাতাস এসে কম্পাউণ্ডারের মুখে চোখে ঝট্‌কা মারে।

কম্পাউণ্ডার ভাবে স্ত্রীর ভিটামিন 'বি' দরকার, ছেলেমেয়েদের ক্যালসিয়াম। কিন্তু শ্মশানের মতো ফাঁকা মাঠটার দিকে তাকিয়ে তার ভাবনাও বিস্তীর্ণ হয়ে যায়—ছাড়িয়ে যায় সাপের গর্তে ভরা দুখানা মেটে ঘরের সীমানা। চৈত্রের আগুনঝরা আকাশ আর মাঠের ওপরে ইতস্তত ছড়ানো গোরুর হাড় হঠাৎ একটা ভয়ংকর নিষ্ঠুর সত্যকে পরিস্ফুট করে তোলে তার কাছে। মৃত্যু আসছে—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, অলক্ষ্য হয়ে আসছে তার নিশ্চিত পদপাত। শুধু তার ঘরেই নয়—তারই পরিবারে নয়। সমস্ত দেশটাই অপমৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে টলমল করছে। চারদিক থেকে হাত বাড়িয়ে আসছে কালাজ্বর, নিমোনিয়া, কলেরা, বসন্ত, ম্যাল-নিউট্রিশন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সিঙ্কোনার জল আর কার্মিনেটিভ মিক্‌শ্চার তারই পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে মাত্র।

ঢিলে রগগুলো হঠাৎ টান টান হয়ে উঠতে চায় কম্পাউণ্ডারের—মরা রক্তে হঠাৎ যেন জোয়ার নেমে আসতে চায়। একটা অসহ্য অস্থিরতা হাত দুটোয় নিস্‌পিস্‌ করতে থাকে। কিছু একটা করা চাই, কিছু একটা করতেই হবে। তবে ডাক্তার খগেন দাস এল. এম. এফ-এর মতো বসে বসে সই করা নয়—রোগীর বুকে স্টেথিস্‌কোপ ঠেকিয়েই দুটো টাকা আদায় করে নেওয়া নয়। সে হাতে-কলমে কাজ করে, কাজের মানুষ। বই পড়া বিদ্যা নিয়ে ডাক্তারী করা হয় না—তার জন্যে চাই সাধনা—চাই নিষ্ঠা।

সাধনা—নিষ্ঠা। আটাশ টাকা মাইনের কপাউণ্ডার হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে। কী সব এলোমেলো ভাবছিল সে—স্বপ্ন দেখছিল নাকি! কী করতে পারে সে, কী করবার ক্ষমতা আছে তার? তার ঘরে মৃত্যুর ছায়ানৃত্য পরিষ্কার চোখে সে দেখতে পাচ্ছে, বুঝতে পারছে নিজের শরীরের মধ্যে ঘনিয়ে আসছে অনিবার্য ভাঙন। তার রক্তের ভেতরে বালির ডাঙা জেগে উঠছে—সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন ঐ গোরুর হাড়ে পরিকীর্ণ ফসলহীন মাঠটার মতো ধু ধু শূন্যতা এসে দেখা দেবে। সাধনা—নিষ্ঠা! ওই ভালো ভালো কথা দুটো কবে ছেলেবেলায় সে পড়েছিল, কোন বইতে, আর তা মনে করবারও উপায় নেই।

—কমপাউণ্ডারবাবু!

কম্পাউণ্ডার মুখ ফেরায়। সকালের সেই লোকটি এসে দাঁড়িয়েছে।

—কি রে, খবর কী?

—ছেলেটা বড় ছটফট করছে বাবু। ওষুধ খেতে পারছে না, গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে।

কম্পাউণ্ডার বিড়ি ধরায় আর একটা। অনাসক্ত গলায় বলে, তবে আর কি, এবার কাফনের ব্যবস্থা করগে। তোর ছেলের হয়ে এসেছে।

লোকটা কেঁদে ফেলে, দোহাই বাবু একবারটি চলুন। যদি কিছু করতে পারেন—

মাঠের গরম বাতাসে একমুখ কড়া বিড়ির ধোঁয়া ছড়িয়ে দেয় কম্পাউণ্ডার : বারো গণ্ডা পয়সা লাগবে। তখন আট গণ্ডায় রাজী হয়েছিলুম—সে তো ভালো লাগল না। গরীবের কথা বাসি হলে ফলে। বারো আনার কমে এখন পারবো না—কম্পাউণ্ডারের গলার স্বর গম্ভীর হয়ে আসতে থাকে—খগেন দাস এল. এম. এফ-এর ধরনটা সে আয়ত্ত করবার চেষ্টায় আছে।

—তাই না হয় দেব বাবু, মেহেরবানি করে একবার চলুন।

কম্পাউণ্ডার উঠে দাঁড়ায়। ঘর থেকে একটা ময়লা সার্ট আর পুরোনো স্টেথিস্কোপ নিয়ে এসে বলে, চল্।

ক্রমে এদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হল ডাক্তারের। কম্পাউণ্ডার তাঁর পসার মাটি করছে। দু' টাকার রোগী আট আনায় দেখে আসছে। আর আট আনা হলেও বা একটা কথা ছিল, যেখানে পয়সা পায় না, সেখান থেকে লাউটা কুমড়োটা যা পারে সংগ্রহ করে আনছে। বেশ জুৎসই প্র্যাক্টিস্ জমিয়ে নিয়েছে কম্পাউণ্ডার।

প্রথম প্রথম ডাক্তার ব্যাপারটা তেমন লক্ষ্য করেনি। বরং কৌতুক বোধ করেছে, হাসাহাসি করেছে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। কম্পাউণ্ডারও প্র্যাক্টিস্ করছে, আরশুলাও পাখী হয়ে উড়তে চায়! যেমন সব রোগী জুটেছে, তাদের ডাক্তারও জুটেছে তেমনি! এল. এম. এফ. খগেন দাস ঠাট্টা করে কম্পাউণ্ডারের নাম দিয়েছে ধন্বন্তরি।

—এই যে ধন্বন্তরি, কী রকম চিকিৎসাপত্তর চলছে?

উত্তরে তোবড়ানো মুখে একটুখানি চরিতার্থতার হাসি হেসেছে কম্পাউণ্ডার।

ডাক্তার আরো রসান দিয়ে বলেছে, চিত্রগুপ্তের সঙ্গে ধন্বন্তরির বেশ বন্ধুত্ব দেখা যাচ্ছে। তা বেশ, তা বেশ। আজ কটি রোগী ভবপারে যাত্রা করল?

কম্পাউণ্ডার এবারে সংক্ষেপে জবাব দিয়েছে, আপনাদের আশীর্বাদ।

টেবিলের ওপরে পা দুটো তুলে দিয়ে উচ্চাঙ্গের হাসি হেসেছে ডাক্তার। উপদেশ দিয়ে বলেছে, এ কাজ এত সোজা নয় মশাই, তা হলে লোকে আর এত খরচ-পত্তোর করে ডাক্তারী পড়তে যেত না, হাতুড়ে বিদ্যে নিয়েই করে খেতে পারত। লোকের জীবন-মরণের ব্যাপার—ইয়ার্কি নয়। ছাগল দিয়ে কি কখনো হালচাষ হয়? নিজের ওজন বুঝে কাজ করবেন। সহস্রমারী হয়ে পটাপট রুগী মারতে শুরু করলে শেষে প্র্যাক্টিস্ চালাবেন কাদের নিয়ে?

কিন্তু কদিন যেতে না যেতেই উচ্চাঙ্গের হাসিটা বন্ধ হয়ে গেল ডাক্তারের। ভীষণ সত্যটা ক্রমে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। কম্পাউণ্ডারের অত্যাচারে ডাক্তারের প্র্যাক্টিস্ বন্ধ হবার উপক্রম।

খগেন দাস এল. এম. এফ-এর অবস্থাও যে খুব সমৃদ্ধ তা নয়। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড কাটা গিয়ে মাইনে মেলে বাষট্টি টাকা বারো আনা। সুতরাং প্র্যাক্‌টিসের ওপরই তারও নির্ভর। কিন্তু কম্পাউণ্ডার অক্টোপাসের মতো যেভাবে চারদিকে বাহু বাড়াচ্ছে তাতে চিন্তিত হবার কারণ ঘটছে। আট আনার ডাক্তার ডাকবার আগেই ছুটে যায়, সুতরাং বিস্তর সাধ্যসাধি করে দু'টাকার ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই—আশপাশের লোকের মনে এই বিশ্বাসটাই বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। এ ঝড়ের সংকেত।

অবস্থার গুরুত্বটা কল্পনা করতেই রাগে ডাক্তারের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বালা করে উঠল। আচ্ছা বেকুব এই পাড়াগেঁয়ে হতভাগাগুলো। ভেবেছে ওই কম্পাউণ্ডারই তাদের ত্রাণ-কর্তা। যে লোকটা ডাক্তারীর 'ক' অক্ষরটা অবধি জানে না, মিক্‌শ্চার, মলম তৈরি করে আর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে হাত পাকিয়েছে খালি—তাকেই ওরা ভবার্ণবের কাণ্ডারী ঠাউরে বসল শেষটাতে! অকৃতজ্ঞ—অপদার্থের দল যত! পৃথিবীতে ভালো লোকের আর জায়গা নেই দেখা যাচ্ছে!

ক্রোধের উত্তেজনায় মাথার দু'গাছা কাঁচা চুল ঠিক ব্রহ্মতালুর ওপরটা থেকে উপড়ে আনলেন ডাক্তার। কম্পাউণ্ডারের ওপরে একটা বিষাক্ত বিদ্বেষে এক মুহূর্তে সমস্ত মনটা কালো হয়ে গেছে। নাঃ—বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, এর আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে—এবং সেটা অবিলম্বে।

পর পর তিনটে সিগারেট শেষ করে খগেন দাস আত্মস্থ হলেন খানিকটা। ইচ্ছে করলে একটা কলমের খোঁচাতেই তিনি কম্পাউণ্ডারের চাকরি খেয়ে দিতে পারেন—দিতে পারেন সমস্ত লম্বাইচওড়াই বন্ধ করে। কিন্তু অতটা অবিবেচক নন তিনি, একটা লোকের অন্ন মারবার মতো অভিপ্রায় তাঁর নেই। আগে একটু ওয়ার্নিং দেওয়া দরকার, তারপর—।

কিন্তু ওয়ার্নিংটাই বা দেওয়া যাবে কেমন করে? আসল কথাটা কম্পাউণ্ডারকে বলা যাবে না—আত্মসম্মানে বাধে। ডাক্তারের মনে হল সেটা করুণা-ভিক্ষার সামিল। সুতরাং অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে।

পাড়াগাঁয়ের ডিস্‌পেন্সারী। সাতটায় খোলবার আইন আছে, কিন্তু পৃথিবীতে আরো অসংখ্য আইনের মতোই এটাকেও কেউ কখনো মনে রাখে না। আটটার সময় কম্পাউণ্ডার এসে চাবি খোলে, চা খেয়ে ডাক্তারের পৌঁছুতে পৌঁছুতে নটা বেজে যায়। আবহমানকাল থেকে এই রীতিটাই চলে আসছে।

হঠাৎ এর ব্যতিক্রম হয়ে গেল।

ডিস্‌পেন্সারী খোলার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার এসে ঢুকলেন। ডাকলেন, কম্পাউণ্ডারবাবু?

কম্পাউণ্ডার আশ্চর্য হয়ে গেল। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, আজ এত সকাল সকাল এলেন যে?

—সকাল সকাল !—বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাক্তার বললেন, কটা বেজেছে খেয়াল আছে ?

দেওয়ালে ঘড়িটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কম্পাউণ্ডার জবাব দিলে—এই তো আটটা বাজল।

—আটটা, কিন্তু কটার সময় খোলবার রুল আছে, সেটা জানেন কি ?

কম্পাউণ্ডার বিহ্বল দৃষ্টি ফেলল ডাক্তরের মুখের ওপর : বরাবরই তো—

—বরাবর ! বরাবর এমনি বে-আইনী কাজ করেই মাসে মাসে মাইনে গুনে নেবেন ! ডিস্‌পেন্সারী আপনার 'ইয়ে'র নয় যে নবাবের মতো যখন খুশি এসে অনুগ্রহ করে দোর খুলবেন। এটা পাব্‌লিকের ব্যাপার। কাল থেকে ঠিক নিয়মমতো যদি ডিস্‌পেন্সারী খোলা না হয় তাহলে আপনার নামে আমি রিপোর্ট করতে বাধ্য হবো।

তেমনি বিহ্বলভাবে কম্পাউণ্ডার বললে, কিন্তু আপনি তো আগে আমাকে—

—আমি বলতে যাব কেন ? আপনার ডিউটি নিজে বোঝেন না আপনি ? আপনার নিজের একটু রেসপন্‌সিবিলিটি নেই ?—ডাক্তারের কণ্ঠ যেন বিষ হয়ে ঝরে পড়তে লাগল : ওদিকে তো দিনরাত এ-পাড়া ও-পাড়া খুব রুগী দেখে বেড়াচ্ছেন, কাঁচকলা আর চাল-কুমড়ো যোগাড় করছেন। অত চাল-কুমড়ো খাওয়ার শখ হয়ে থাকলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই ডিস্‌পেন্সারী খুলে বসুন !

অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে গেছে কম্পাউণ্ডার। একটা কথাও তার মুখে যোগাচ্ছে না। ওদিকে ডাক্তারের চোখ দুটো হিংস্রতায় দপ দপ করছে, সমস্ত মুখটা কুটিল হয়ে গেছে ক্ষিপ্ত ঈর্ষায়, তাঁর গলা চড়ছে পর্দায় পর্দায়। ওষুধ নেবার জন্যে যারা দোরগোড়ায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারা অবাক্‌ বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছে ডাক্তারের কটু-কঠোর মন্তব্যগুলো !

—ডাক্তার হয়েছেন—প্র্যাক্‌টিস্‌ করা হচ্ছে ! একটা প্রেস্‌ক্রিপশন রিপীট করতে পর্যন্ত ভুল করেন—লজ্জা হয় না আপনার ? আর সরকারী কাজ ফেলে ধন্বন্তরি হওয়ার চেষ্টায় আছেন ! যদি মন দিয়ে কাজ না করেন তাহলে আপনার নামে রিপোর্ট আমাকে পাঠাতেই হবে—এ কথা আর একবার জানিয়ে যাচ্ছি।

গর্জনে ঘর কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার। বাইরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর জুতোর শব্দ বাজতে লাগল।

কম্পাউণ্ডারের ঘোলা চোখে এতদিন পরে সত্যিকারের আগুন ঝিকিয়ে উঠল, বাঁকা মেরুদণ্ডটাকে আশ্রয় করে বয়ে গেল পৌরুষের দীপ্তি। ডাক্তারকে সে বুঝতে পেরেছে। ঈর্ষা—প্রতিদ্বন্দ্বিতা ! এ এক নতুন অস্ত্র সে হাতে পেয়েছে। এতদিন সে ডাক্তারকে ভয় করে এসেছে—এইবার ডাক্তার ভয় করতে শুরু করেছে তাকে। তার প্র্যাক্‌টিসের ফলে আজ ডাক্তারের প্রেস্‌টিজ এবং পসার বিপন্ন হতে বসেছে।

ভয় হল না কম্পাউণ্ডারের—দুঃখও না। বহুদিন পরে পিঠটাকে সোজা করে—দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালো সে। এতগুলো লোকের সামনে ডাক্তার তাকে অপমান করে গেছে, কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে নিজের মধ্যে একটা কঠিন লৌহবর্মের অস্তিত্ব অনুভব করেছে কম্পাউণ্ডার—যে বর্মে লেগে তুচ্ছতার সমস্ত আঘাতগুলো অতি সহজেই প্রতিহত হয়ে যায়। এতদিন পরে স্বীকৃত হয়ে গেছে তার জীবনের,—তার স্বাতন্ত্র্যের দাবি। এইবার নিজেকে প্রমাণ করবার সময় এসেছে তার। আটত্রিশ বৎসর বয়সে আটাশ টাকার পাথর চাপা পড়েই তার মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু হয়নি। এইবার কাজ করতে হবে তাকে—কিছু একটা করতেই হবে।

কম্পাউণ্ডিং রুমে ঢুকে পাশের আলমারিগুলোর দিকে তাকালো সে। খালি শিশি বোতলগুলো স্তরে স্তরে সাজানো। ওখানে কিছু করবার নেই, উপায়ও নেই কিছু করবার। নিজেকে প্রমাণ করবার শক্তি নেই তার। ছোট আলমারির চাবি আগেই হস্তগত করেছে ডাক্তার—দু-চারটে ভালো ওষুধপত্র যে সেখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে—সে পথও বন্ধ।

কিন্তু—তবু, তবু চেষ্টা করতে হবে। অস্তিত্বের দাবি আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে। ভিটামিন 'বি'র অভাবে তার স্ত্রীর বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের ওপরে ছড়াচ্ছে মৃত্যুর ছায়া—ছেলেমেয়েগুলোর সর্বাঙ্গে সংক্রামক অস্বাস্থ্যের কুৎসিত বহিঃপ্রকাশ। শুধু তার ঘরে নয়—দিকে দিকে, যতদূর চোখ যায় ততদূর—রৌদ্রদগ্ধ শূন্য প্রান্তরের মতো একটা শ্মশান আকীর্ণ হয়ে পড়েছে। কিছু কি করবার নেই, কিছুই না?

দাঁতে দাঁত চেপে কম্পাউণ্ডার ভাবতে লাগল। আঙুলগুলো অধৈর্যভাবে আঁকড়ে ধরতে লাগল মলম-তৈরি-করা ছুরিটার হাড়ের বাঁটটা। আর কিছু না হোক—এইটে দিয়ে একটা মানুষও তো খুন করতে পারে সে!......

কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে ঠোকাঠুকির আর বিরাম নেই।

—কী করে রেখেছেন টেবিলগুলো—দেখুন দেখি একবার। একটা কাগজ মানুষে খুঁজে পায় এখানে!

কম্পাউণ্ডার নিরুত্তর।

—বলেছিলাম প্রেসক্রিপশনের বইটা ফুরিয়ে গেছে, একটা নতুন প্যাড্ বার করে রাখবেন। কিন্তু কোনো দিকে লক্ষ্যই নেই আপনার। খালি ভাবছেন, কখন কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে লাউ-কুমড়োর ব্যবস্থা করে আসবেন। নাঃ—আপনাকে দিয়ে আমার পোষাবে না মশাই। হয় আপনাকে ট্রান্সফার করুক, নয় আমাকে। এছাড়া আর তো কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না।

সার্ভিং টেবিলটার কাছে দাঁড়িয়ে কম্পাউণ্ডার ভাবতে লাগল, ঠিক কথা। আর কোনো পথ নেই। এক আকাশে দুই সূর্য শোভা পেতে পারে না। আজ তার নবজন্ম

হয়েছে, সে শুধু ডাক্তারের সমকক্ষ নয়, তার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। কাগজের বিদ্যাই বড় নয়, হাতের বিদ্যা তার চাইতে ঢের বেশি। এই সত্যকে সে প্রচার করবে—সে প্রতিষ্ঠা করবে।

গতানুগতিক বাঁধা নিয়মে একই ওষুধ নানা শিশিতে ঢালতে ঢালতে কম্পাউণ্ডার তার নতুন রোগীর কথা চিন্তা করতে লাগলো। পুরানো অসুখ—বহুদিন থেকে ভুগছে। ডাক্তার খগেন দাস তিন মাস নিয়মিত ভিজিট গুনে নিয়েছে, কিন্তু কিছু করতে পারেনি। এবার তার পালা।

কিছু করা চাই—কিছু করতে হবে। অথচ ওষুধ নেই—উপায় নেই! কম্পাউণ্ডারের দাঁতে দাঁত আবার চেপে বসতে লাগল: উপায় নেই! ওষুধ চাই—ভালো ওষুধ। একবার সুযোগ পেলে সে দেখিয়ে দিতে পারে তারও ক্ষমতা আছে। কম্পাউণ্ডারের মাথার ভেতরে রক্তের উচ্ছ্বাস যেন ফেটে পড়তে লাগল। কিছু তাকে করতেই হবে—যেমন করে হোক, যে উপায়েই হোক—

ছোট আলমারিটা খুঁজলে কিছু মিলতে পারে। কিন্তু তার চাবিটা আগেই হাত করেছে ডাক্তার। সব দিক থেকে তার পথরোধ করে দাঁড়াতে চায়। বেশ—এই ভালো। এ বাধা ভেঙে সেও এগিয়ে যেতে জানে, সেও—

—বলি ও কম্পাউণ্ডারবাবু, ও সহস্রমারী ধন্বন্তরি মশাই!

কুৎসিত কটুগলায় ডাক্তার তাকে ডাকছে। কম্পাউণ্ডারের কপালের রেখাগুলো কুঁচকে উঠল একবার, তারপর সহজ স্বাভাবিক ভাবে সাড়া দিলে, ডাকছেন আমাকে?

—হ্যাঁ—ডাকছিলাম তো অনেকক্ষণ থেকে। কিন্তু আপনি তা শুনতে পাননি বোধ হয়—বিকৃত স্বরে ডাক্তার বলে যেতে লাগলেন: আজকাল আপনি একেবারে স্যার নীলরতন সরকার হয়ে উঠেছেন, এসব গরীবের ডাক আপনাদের মতো বড় বড় ডাক্তারের কানে পৌঁছুবে কেন!

কম্পাউণ্ডারের জীর্ণ হাতে দুর্বল মাংসপেশী আর রক্তহীন শিরাগুলো যেন অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রচণ্ড বেগে একটা ঘুষি সে ডাক্তারের মুখের ওপরে বসিয়ে দেবে নাকি! কিন্তু কিছুই করলে না কম্পাউণ্ডার, শুধু তেমনি শান্ত নিষ্কম্প গলায় বললে, কী করতে হবে?

—অধমকে একটু অনুগৃহীত করতে হবে—সিগারেটের ধোঁয়াটা একেবারে কম্পাউণ্ডারের মুখের ওপরেই ছেড়ে দিলেন ডাক্তার: এই উণ্ডটা একটু ড্রেস্ করে দিতে হবে। ধন্বন্তরির মূল্যবান সময়টা একটু নষ্ট হবে, কিন্তু এ দুর্ভাগা নিতান্তই নাচার—

ডাক্তারের ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা দুলতে লাগল।

কম্পাউণ্ডার নীরবে সেল্ফ থেকে তুলোর প্যাকেট গজকাঠি আর আইডিনের শিশিটা তুলে নিলে।

ফাঁকা মাঠের ওপরে ঘনিয়েছে কৃষ্ণা রাত্রি। আকাশে তারার রোশনাই তেমন জ্বলছে না, লঘু বিচ্ছিন্ন মেঘ তাদের ওপর দিয়ে আবরণ টেনে দিয়েছে। কালো অন্ধকারের মধ্যে সামনের মাঠটা থেকে যেন প্রেতলোকের সন্ধান দিচ্ছে এলোমেলো আলেয়া। হু হু করে বয়ে যাচ্ছে গরম বাতাস, দিনের প্রখর উত্তাপের রেশটা জুড়িয়ে যায়নি এখনো। শেষরাত্রে বোধ হয় বৃষ্টি বাদল হবে কিছু—বহুদূরের দিগন্তে মাঝে মাঝে চমকাচ্ছে বিদ্যুতের রক্তদীপ্তি। ডিস্‌পেন্সারীর চারদিকে নিশ্ছেদ স্তব্ধতা।

অন্ধকারে চাবি ঘোরাবার শব্দ হল—খুট্।

হাওয়ার সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে দরজাটাও খুলে গেল। কালো রাত্রির সঙ্গে একাকার হয়ে কম্পাউণ্ডারের ভৌতিক মূর্তিটা প্রবেশ করলে ডিস্‌পেন্সারীতে। উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ কাঁপছে। থেকে থেকে চমকে উঠছে হৃৎপিণ্ড। কপালের আবটার ওপরে ঘামের বিন্দু জমে উঠছে।

কিন্তু ঘাবড়ালে চলবে না—পিছোলেও চলবে না। তার শক্তির পরীক্ষা—তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার অধিকার। যেমন করে হোক তার রুগীকে সারিয়ে তুলতে হবে—তার প্রথম আত্মোপলব্ধির মূল্য বিচার করে দেখতে হবে। বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগল কম্পাউণ্ডার—ওষুধের বহু বিচিত্র মিশ্র গন্ধে ভরা থমথমে অন্ধকার যেন তার দম আটকে আনতে লাগল। কিছু জোর করে একটা নিশ্বাস ফেলতেও ভরসা পাচ্ছে না সে —পাছে বেশি করে শব্দ হয়, পাছে এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হয়ে যায় রাত্রির এই সমাহিত স্তব্ধতা!

তারপর—তারপর—কম্পাউণ্ডারের কম্পিত হাত স্পর্শ করলে ছোট আলমারির ডালাটা। কজাটা ধরে একটা মোচড় দিলেই—

টর্চ লাইটের তীব্র ঝাঁকালো আলো কম্পাউণ্ডারের গায়ে এসে পড়ল বন্দুকের গুলির মতো। তড়িদ্বেগে লাফিয়ে উঠল কম্পাউণ্ডার। অন্ধকারের ভেতরে ডাক্তারের সংক্ষিপ্ত হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল—যেন একটা গোখ্‌রো সাপ প্রবল বেগে ছোবল বসিয়ে দিলে কোথাও।

ডাক্তার বললে, চমৎকার! ভাগ্যিস ঘুম আসছিল না বলে বারান্দার অন্ধকারে চুপ-চাপ পড়েছিলাম, সেইজন্যই তো ধন্বন্তরির এ দেবলীলাটা দেখতে পেলাম! চুরি-চামারিতে প্র্যাক্‌টিসটা বেশ জমে উঠেছে তা হলে!

কম্পাউণ্ডারের বিবর্ণ মুখের ওপর টর্চের আলো আগুনের জ্বালার মতো জ্বলতে লাগল।

—ভালো, ভালো।—ডাক্তার শান্ত স্বরে বললে, কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলেকে আমি জেলে পাঠাতে চাই না। তবে কাল থেকে ডিস্‌পেন্সারীর চাবিটাও আমার কাছে থাকবে

আর একটা চৌকিদারেরও বন্দোবস্ত হবে। তাহলেই আর ওষুধ চুরির ভয় থাকবে না—কী বলেন কম্পাউণ্ডারবাবু?

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল কম্পাউণ্ডার। শরীরটা একচুল নড়ল না—একটা নিশ্বাস পড়ল না পর্যন্ত।

*　　*　　*　　*

পরদিন দুপুরে কম্পাউণ্ডারের বাড়ি থেকে একটা বিশ্রী মড়াকান্নার শব্দে ডাক্তার ছুটে এলেন।

—কী হল? ব্যাপার কী?

কম্পাউণ্ডার কোনো জবাব দিলে না। সামনে মেঝের ওপর কম্পাউণ্ডারের স্ত্রী হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। বড় বড় শ্বাস উঠছে পড়ছে, চোখ দুটো ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে তার। সমস্ত গাল মুখ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে—রক্তবমি করেছে সে!

ডাক্তার শিউরে উঠলেন। কম্পাউণ্ডারকে একটা সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, কথা বলছেন না যে? ব্যাপার কী?

অর্থহীন দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে কম্পাউণ্ডার বললে, পেটে একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল—ঠিক ডায়গোনাইজ্ করতে পারিনি। ওষুধ দিয়েছিলাম।

—ওষুধ! কী ওষুধ!

—তা তো জানি না। আপনার ছোট আলমারিতে তো হাত দেবার উপায় নেই। তাই সামনে যা পেয়েছিলাম—আইডিন, মরফিয়া, রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট, কার্বলিক অ্যাসিড, ষ্ট্রিকনিন, সিন্‌কোনা—সব মিলিয়ে একটা এক্সপেরিমেণ্ট করবার চেষ্টা করে-ছিলাম।

ডাক্তার পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন, আপনি মার্ডারার—আপনার স্ত্রীকে নিজের হাতে আপনি খুন করেছেন! আপনার ফাঁসি হওয়া উচিত—Yes, you deserve it! এক্সপেরিমেণ্ট! কেন আপনি আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন না, একবার ডাকলেন না—

ঘষা চোখে, জীর্ণ গলায় আটাশ টাকার কম্পাউণ্ডার জবাব দিলে, আপনাকে ভিজিট দেবার পয়সা ছিল না।

পিতরি

বাজারের থলিটা একপাশে ফেলে হাঁপাতে লাগল সখানাথ। ভালো মাছ পাওয়া যায় বৈঠকখানা বাজারে, হাঁটতেও হয় অনেকখানি। বয়স হয়েছে এখন, তা ছাড়া অভাবের

বোঝা টানতে টানতে মেরুদণ্ডটায় ভারবাহী জন্তুর শিথিলতা এসেছে। কপাল থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে এক ফোঁটা নোনা ঘাম মুখে এসে পড়ল। ময়লা টুইল শার্টটার আস্তিনে সখানাথ কপাল আর মুখ মুছে নিলে একবার।

উঠোনে কল, তার পাশেই চট ঘেরা 'বাথরুম'। কিন্তু চট দেওয়া থাকলেও সেদিকে চট্ করে তাকানো চলে না। বৃষ্টিতে পচে গেছে এখানে ওখানে। একটু মনোযোগ দিলেই ভেতরটা লক্ষ্য করা যায়। তবুও যেন তেন উপায়ে আত্মরক্ষা বা আব্রুরক্ষা, নিম্নবিত্তের মনুষ্যত্বের মতো।

চৌবাচ্চা থেকে ছড়ছড় করে জল ঢালবার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—ভাঙা ড্রেনটা দিয়ে ভেসে চলেছে সুগন্ধি সাবানের ফেনা। গুন্ গুন্ করে গানের সুর আসছে, জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিকের জন্য থেমে যাচ্ছে গানটা। সত্যভামা গান করছে।

বাজারের থলিটা সরিয়ে রেখে সখানাথ দীর্ঘ প্রসারিত রেখায় আকাশের দিকে তাকাল। কিন্তু আকাশটা খণ্ডিত, বস্তির খোলার চালাগুলোর ওপারেই তাকে প্রতিরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে লালরঙের মস্ত চারতলা বাড়ি। রেলিঙে রঙীন শাড়ি ঝুলছে, দাঁড়ের ওপর শাদা রঙের বড় একটা কাকাতুয়া পাখা ঝেড়ে তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করছে কী একটা অভিযোগ নিয়ে। কোথা থেকে আট-ন বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে এসে কাকাতুয়ার ল্যাজ ধরে হালকা একটা টান দিয়ে গেল। রেডিয়োর চিৎকার ছড়াচ্ছে বাতাসে। তেতলার বারান্দাতে ডোরাকাটা পাজামাপরা চশমা চোখে একটি তরুণ পায়চারি করতে করতে কী একখানা মোটা বই পড়ছে। ওরা সব আলাদা জগতের জীব, ওরা বড়লোক। ওখানে যারা থাকে সখানাথ তাদের চিরদিন ভয় করে এসেছে, সম্মান করে এসেছে।

এখানে ঘরের মধ্য থেকে গিরিবালার গোঙানি। সখানাথের স্ত্রী। একটা ছেলে হয়ে মরে যাওয়ার পর থেকেই নানারকম অসুখে ভুগছে। বিছানা থেকে উঠতে পারে না, তার অপটু আর অসুস্থ শরীরটা গরীবের সংসারে চেপে রয়েছে বিশ মণ ভারী একখানা পাথরের মতো। নিজে কিছুই করতে পারে না গিরিবালা, তাই সমস্ত উৎসাহ শান্ত করে অকারণ খিটিমিটিতে, অহেতুক গালাগালি দিয়ে, আর নয়তো কাঁদতে শুরু করে দেয় অস্ত্রাহত একটা বন্য পশুর মতো। সখানাথকে দেখলেই তার মেজাজ আরো বিগড়ে যায়, মনে হয় যেন তেড়ে এসে কামড়ে দেবে।

—যাও, যাও, আর সোহাগ জানাতে হবে না। লজ্জা করে না কাছে আসতে! তুমি আমার সর্বনাশ করেছ, আমাকে মেরে ফেলেছ তুমি। কিন্তু এমন দগ্ধে দগ্ধে মারতে চাও কেন? দাও, দাও, তা হলে গলা টিপেই শেষ করে দাও।

কথার শেষটা কান্নায় গলে গিয়ে একাকার হয়ে যায়—অমানুষিক আর অর্থহীন খানিকটা গোঙানি। নিজের অপরাধ সখানাথ ঠিক বুঝতে পারে না। কয়েক মুহূর্ত

বোকার মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সবিস্ময়ে চিন্তা করে। তার পরেই মাথার মধ্যে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে যায়। সেই ভালো—সেই ভালো। গলা টিপেই সে গিরিবালাকে শেষ করে দেবে এযাত্রা। প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো পরস্পরের প্রতি ওরা হিংস্র দৃষ্টি বিনিময় করে, তারপর সখানাথ চোরের মতো বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে সেতু রচনা করেছে সত্যভামা। দেখতে কালো, রূপ-বিচারের মানদণ্ডে কিছু স্থূল, অর্থাৎ অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর তার চোখ—টানা-টানা, গভীর কৃষ্ণতারায় মাতৃত্বের স্নেহচ্ছায়া। চমৎকার চুলের গোছা স্তবকে স্তবকে তরঙ্গায়িত হয়ে ভেঙে পড়ে মাজা পর্যন্ত। আচমকা দেখলে কিছুই মনে হয় না, কিন্তু ভালো করে তাকালে কোথা থেকে একটা অপরূপ রূপের উচ্ছ্বাস এসে চোখ নয়, মনকে প্লাবিত করে দিয়ে যায়। হয়তো স্বাস্থ্যপুষ্ট শরীরের সমুচ্ছল যৌবনশ্রীর জন্যেই।

স্নান শেষ করে চটের পর্দা সরিয়ে সদ্য ধোয়া অপরাজিতার মতো বেরিয়ে এল সত্যভামা। মাথা ঝাঁকিয়ে ভিজে চুলের গোছাটা ঘাড় আর বুক থেকে সরিয়ে দিলে, শাড়িটাকে ফেলে দিলে তারের ওপর। তারপর এদিকে ফিরতেই দেখল সখানাথকে।

—বাবা কখন ফিরলে?

—এই তো। এক গ্লাস জল দে সতী।

—দিচ্ছি—একটা ছন্দের ঘূর্ণি সমস্ত শরীরে খেলিয়ে দিয়ে জলের সন্ধানে গেল সত্যভামা। যাওয়ার সময়ে একটা অপাঙ্গ দৃষ্টি ফেলে গেল বাজারের থলিটার ওপরে। একটা বড় বাঁধাকপির একরাশ সরস পাতা দেখা যাচ্ছে, বেরিয়ে আছে গলদা চিংড়ির দাঁড়া আর দাঁড়ি। মস্ত একটা পাটনাই পেঁয়াজ গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে। বেশ বড়লোকের মতো বাজার করে এনেছে সখানাথ। সত্যভামার মনটা খুশি হয়ে উঠল।

ঘরের ভেতরে গোঙাচ্ছে গিরিবালা, উঠোনে ছেঁড়া প্যান্ট পরে ছোট ভাই মণ্টু মার্বেল খেলছে। বাতাসে দুলছে বাথরুমের ছেঁড়া চটটা। আর ওদিকে রান্নাঘর থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে আনতে গিয়ে গুন্ গুন্ করে গান গাইছে সত্যভামা। ওর গানের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ অন্তরটা যেন আত্মপ্রকাশ করছে: 'আমার হিয়া উচ্ছলিয়া সাগরে ঢেউ ওঠে।' সমস্ত পারিপার্শ্বিকটার সঙ্গে কী আশ্চর্য বৈসাদৃশ্য, আশ্চর্য কী স্বতন্ত্রতা। যেন কী একটা বিচিত্র-মন্ত্রে বাবলাতলী বস্তির টালির ঘর থেকে সত্যভামা উড়ে চলে গেছে—সে যেন আজ নিজের একাত্মতা খুঁজে পেয়েছে ওই লাল রঙের চারতলা বাড়ির অধিবাসীদের সঙ্গে।

সখানাথ ভ্রূকুঞ্চিত করলে একবার। কথাটা ঠিক। সত্যভামা বাবলাতলী বস্তির সীমা ছাড়িয়ে সত্যি সত্যিই দূরে সরে চলেছে আজ। গরীবের মেয়ে কর্পোরেশনের স্কুলে পড়তে পড়তে স্কলারশিপ পেল। তারই জোরে সে চলে গেল বড় ইস্কুলে, সংসারের সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত প্রতিকূলতাতেও তার পড়া বন্ধ হল না, ম্যাট্রিক পর্যন্ত এগিয়ে গেল। তারপরে সেদিন

খবর এসেছে ম্যাট্রিকেও খুব ভালো করে বৃত্তি পেয়েছে সে। তিন-চারটে কলেজ থেকে তার সাদর আমন্ত্রণ এসেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে ধীরেন। বড়লোকের ছেলে, বি.এ. পাস। বস্তি থেকেই সে রত্ন কুড়িয়ে নিতে চায়—'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'।

—বাবা জল।

সত্যভামা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চুলের গন্ধ, সাবানের গন্ধ। কালো শরীর লাবণ্যে অপরূপ। একবার মেয়ের দিকে তাকিয়েই গর্বে ভরে উঠল সখানাথের মন। কে বলে তার মেয়ে কালো, এমন অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী আছে ক'জনের? বিদ্যায় সাক্ষাৎ সরস্বতী, কাগজে কাগজে তার ছবি বেরিয়েছে, কত কলেজ থেকে বিনয় করে কত চিঠি। সখানাথ সগর্ব চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

মুখের ওপর লজ্জার আভা দেখা দিলে সত্যভামার।

—তুমি জলটা খাও, আমি তামাক দিচ্ছি। বেশি দেরি করতে পারবে না, তাড়াতাড়ি স্নান করে নাও। অফিস ছুটি বলেই অবেলায় খাবে, এ চলবে না।

সখানাথের বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

—কিন্তু আর কদিনই বা খবরদারী করবি তুই। ধীরেন বলেছে দেরি করতে পারবে না। আজকেই সব ঠিক করে ফেলতে হবে।—আর একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে নিয়ে সখানাথ বললে, রাতে ধীরেন খাবে এখানে, বলে দিয়েছি। তাই বৈঠকখানা বাজার ঘুরে মাছ তরকারী নিয়ে এলাম। ভাখ্ তো হবে কিনা।

—আমি জানি না কিছু—সত্যভামা আরো লজ্জিত আর সংকুচিত হয়ে চলে গেল। —পুলকিত জড়িত স্বরে বলে গেল, তামাক সেজে আনছি তোমার।

চল্লিশ টাকার মাইনের ফিটার সখানাথ এক চুমুকে জলের গেলাসটা নিঃশেষ করলে। বুকের ভেতরে কেমন একটা অসহ্য তৃষ্ণা—সব যেন মরুভূমির মতো জ্বলে যাচ্ছে। নিজেকে বড় বেশি ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে—বড় বেশি অসহায়।

বাপকে তামাক দিয়ে সত্যভামা ঘরের জানালায় এসে দাঁড়ালো। বস্তির চিরাচরিত জীবন। রাস্তার কলে জলের শেষ ধারা ঝির ঝির করে পড়ছে, অথচ এখনো তিন-চারটে কলসী পড়ে আছে প্রতীক্ষায়। জলের জন্য কলহ। পানওয়ালার দোকানের সামনে সাপ-খেলা হচ্ছে, ছেলে বুড়োর ছোট একটা ভিড় জমেছে ওখানে। তুব্ড়ি বাঁশী নামিয়ে রেখে উড়ে সাপুড়ে টানা সুরে গান জুড়েছে :

তখনো কৃষ্ণ গিলা কালীদহে কালীয়ো নাগকো মারিবরে,

আ—রে—

এপাশে গোয়ালাদের ঘর, তার সামনেই পর্বতাকার ঘুঁটের স্তূপ। দুটো কালো আর ন্যাংটো ছেলে গলায় ঘণ্টা বাঁধা একটা মহিষের পিঠে চড়বার চেষ্টা করছে আপ্রাণ। মাটি-

উলী করুণ সুরে হেঁকে যাচ্ছে : মিটি লেবে গো, মিটি—

সত্যভামার চোখ পড়ে আছে এদের ওপর, কিন্তু মন ভেসে গেছে অনেক দূরে। সমস্ত চেতনার ওপর দিয়ে নেমে এসেছে বিহ্বল স্বপ্ন। আজ সন্ধ্যায় ধীরেন আসবে! অনেকদিনের স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র। কুমারী জীবনের কারাগার থেকে তাকে স্বপ্নের চৌদোলায় চড়িয়ে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে নতুন রাজ্যে। ধীরেন তাকে ভালোবাসে। কেমন লোভীর মতো কাছে আসে, কেমন আগ্রহ করে আঁকড়ে ধরতে চায় তার আঙুলগুলো। মনের মধ্যে গ্রামোফোনে শোনা গানের কলি এসে দোলা দেয় : প্রেম বুঝি এল জীবনে। তন্দ্রাভিভূতের মতো সত্যভামা নিজে নিজেই একবার আউড়ে নিলে : আজ রাত্রেই ধীরেন আসবে।

হঠাৎ চমক ভেঙে গেল। চারতলা বাড়ির তেতলায় ডোরাকাটা পাজামা পরা সেই ছেলেটা চোখ দিয়ে তাকে যেন গিলছে—একবার যেন কী একটা ইঙ্গিত দিয়ে হাসলও একটু। কটাক্ষে খানিক অগ্নিবর্ষণ করে সত্যভামা সরে এল জানলা থেকে। ধীরেনও তার দিকে তাকায়, নির্নিমেষ অর্থপূর্ণ ভাবেই তাকায়। কিন্তু তার সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। এ যেন রাক্ষসের লোলুপতা।

ঘরের মধ্যে তার লঘু পায়ের শব্দ শুনে গিরিবালার গোঙানি বন্ধ হয়ে গেল। কোটরগত চোখ দুটোকে সম্পূর্ণভাবে মেলবার চেষ্টা করলে একবার। চিঁ চিঁ করে বললে, কে, সতী? কাছে আয় মা, আমার পাশে বোস্।

সত্যভামা এগিয়ে এসে মার বিছানায় বসল। বিবর্ণ ছিন্ন শয্যায় কালো একটা কঙ্কাল অবলীন হয়ে আছে। রুক্ষ চুলের গোছা প্রতিমার পাটের চুলের মতো ছড়িয়ে রয়েছে বালিশ জুড়ে। এককালে মেয়ের মতোই চুল ছিল মায়ের—হয়তো রূপও ছিল। কিন্তু এ যেন প্রেতিনীর মূর্তি।

মেয়ের পরিপুষ্ট নিটোল হাতখানা মা টেনে নিয়ে এল নিজের বুকের ওপর। চেপে ধরলে প্রাণপণে। হাড়ের কঠিন স্পর্শে হাতটা যেন ব্যথা করে উঠল সত্যভামার। তেমনি চিঁ চিঁ করে গিরিবালা বললে, মা সতী?

—কী বলছ?

—আজ ধীরেন আসবে, না?

প্রায় নিঃশব্দ সলজ্জ গলায় সত্যভামা বললে, তাই তো শুনেছি।

—তোর বাবা আসেনি বাজার থেকে?

—এসেছে।

—ধীরেন খাবে রাত্রিতে, কী বাজার করে এনেছে কে জানে। বুদ্ধিসুদ্ধি তো নেই, ভালোমন্দ জ্ঞানও কিছু নেই। আমি নিজে এইভাবে পড়ে রইলাম, একটু যে দেখাশোনা

করব, সে সুখও কপালে নেই। ভগবান সব দিক দিয়েই এমন অথর্ব করে দিলেন! এখন মরতে পারলেই বাঁচি।

গোঙানি আর কান্না একসঙ্গে মিশিয়ে আবার খানিকটা অমানুষিক শব্দ করতে লাগল গিরিবালা। কংকালসার বুকের ভেতরটা যেন ঢেউয়ের মতো দুলে উঠতে লাগল, হাতের তলায় সত্যভামা অনুভব করলে নির্জীব হৃৎপিণ্ডের স্তিমিত স্পন্দন।

—কাঁদছ কেন তুমি? ভালো হয়ে ওঠো, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—সত্যভামা ব্যতিব্যস্ত হয়ে মায়ের বুকটা ডলে দিতে লাগল। মার কান্না দেখলে তারও অত্যন্ত বিশ্রী লাগে, মনে হয় এর চাইতে মা-র মরে যাওয়াই ভালো।

গিরিবালা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, তুই সুখী হ, রাজরানী হ তুই। ধীরেন সোনার মতো ছেলে, কোনো দুঃখই তুই পাবি না এই আমার আশীর্বাদ রইল।

মায়ের বুকের মধ্যে সুখে আর আনন্দে মুখ লুকোলো সত্যভামা। বুকের শুকনো হাড়ের স্পর্শটা এখন আর তত কঠোর বলে মনে হচ্ছে না। বাইরে বসে সখানাথ তামাক টানছে, সেই তামাক টানার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালার হৃৎপিণ্ড যেন তাল দিতে লাগল।

ডাকপিয়ন এসে একখানা চিঠি ফেলে দিয়ে গেল সখানাথের পায়ের কাছে। আরো একটা কলেজ থেকে সত্যভামাকে ডেকে পাঠিয়েছে। বিনা পয়সায় পড়তে দেবে, কলেজ থেকে স্কলারশিপ দেবে কুড়ি টাকা করে। সখানাথের চোখ ছলছল করে উঠল। অফিসের বন্ধু হারান বলছিল, এ ভালোই হল, বুড়ো বয়সে মেয়েই এবার তোমার অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল। ছেলে তো তোমার নেই—মেয়েই সে দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে।

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সখানাথ হুঁকোতে টান দিলে। কিন্তু ধোঁয়া এল না। তামাকটা পুড়ে শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

সারা বিকেলটা বসে বসে রান্না করলে সত্যভামা। ধীরেন বড়লোকের ছেলে, কী খেতে ভালোবাসে' কে জানে। থেকে থেকে মনটা আসে উৎকর্ণ হয়ে। এখনো ছায়া নামেনি বস্তির ওপর, সূর্যের আলো রাঙা হয়ে ওঠেনি চারতলা লাল বাড়িটার মাথায়। সময় চলছে অসম্ভব শ্লথ আর মন্থর গতিতে। প্রতীক্ষা-ব্যাকুল দিন। ঘরে গিরিবালার গোঙানিটা কমেছে একটু। মেয়ে সুখী হবে—এ কল্পনা যেন মায়ের মনকেও পরিপূর্ণ করে দিয়েছে।

মাছের তরকারীটা নামিয়ে রেখে গা ধুতে গেল সত্যভামা। প্রেম বুঝি এল জীবনে। সন্ধ্যা নামতে আর দেরি নেই। সাতটায় সময় ধীরেন আসবে।

বাইরে জুতোর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সখানাথের সাদর অভ্যর্থনা। এসো বাবা, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ।

ধীরেনের গলা কানে এল : কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে গিয়েছিলাম ভাই আসতে দেরি হয়ে গেল একটু। মা কেমন আছেন আজকে ?

—ওই একই রকম। এসো বাবা, বোসো। কই, সতী গেল কোথায় ? ওরে, ধীরেন এসেছে—চটির শব্দ করে ভেতরে এল সথানাথ : ধীরেন এসেছে। সতী, চা করে দিয়ে যা ধীরেনকে।

—'আমার হিয়া উচ্ছলিয়া সাগরে ঢেউ ওঠে'—সত্যভামা বেরিয়ে এল কল থেকে। গিরিবালা ডেকে বললেন, একটু ভালো করে দেখাশোনা করিস মা। আমি তো থেকেও নেই। এমনই কপাল যে—

গিরিবালা এবার আর আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল না। ধীরেন এলে খানিকটা সংযত হয়ে যায় সে। মায়ের মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিলে সত্যভামা : তোমার কিছু ভাবতে হবে না মা।

স্বপ্নের মতো দিন, ভালোবাসার মতো সন্ধ্যা। রূপকথার রাজপুত্র এসে দেখা দিয়েছে দুয়ারে। রং বদলে গেছে সমস্ত পৃথিবীর। বাবলাতলী বস্তিকে কে যেন মায়াপুরীতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। এখানকার যা কিছু কুশ্রীতা, যা কিছু গ্লানি, কিসের স্পর্শে আজ তারা সব সোনা হয়ে গিয়েছে। ফাটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার ভালো করে দেখে নিলে সত্যভামা। বার বার করে বিশ্লেষণ করে দেখতে ইচ্ছে করছে নিজেকে, নিজের মধ্যে প্রশ্ন জাগছে : এমন কী আছে তার ভেতরে, যে জন্যে ধীরেন তাকে ভালো-বাসলো ?

—সতী কই রে ! ধীরেন ডাকছে তোকে।—সথানাথের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—যাচ্ছি—মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলে সত্যভামা। কী মানুষ বাপু, একটুখানি তর সয় না। সবুজ শাড়িটা কিছুতেই যেন মনের মতো করে গুছিয়ে তোলা যাচ্ছে না : যাচ্ছি, যাচ্ছি।

হাওয়ার ওপর পা ফেলে দিয়ে প্রজাপতির মতো ঘরের মধ্যে ভেসে এল সত্যভামা। খাওয়াদাওয়ার পরে একখানা চেয়ারে নিজেকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানছে ধীরেন। শ্যামবর্ণ মার্জিত চেহারা, ওলটানো চুল। সমস্ত চোখ মুখ প্রত্যাশায় উদগ্র হয়ে আছে।

—উঃ, এতক্ষণ পরে ! তোমার পথ চেয়ে চেয়ে আমার চোখ প্রায় কানা হওয়ার যোগাড়।

ঘরে সথানাথ নেই। সময় বুঝেই সেখান থেকে সরে গেছে সে। উঠে ধীরেন সত্য-ভামার একখানা হাত ধরবার চেষ্টা করলে।

—থামো, পাগলামি কোরো না। বাবা এসে পড়বেন এখুনি।

—তুমি ভয়ানক নিষ্ঠুর।—ধীরেনের চোখের পাতা অভিমানে ভারী হয়ে এল।

—অমনিই রাগ হল? কী ছেলেমানুষ!—আদর করে ধীরেনের চিবুকটা একবার নেড়ে দিলে সত্যভামা: কী এনেছ আমার জন্যে, দেখি।

সেদিক দিয়ে রুচি আছে ধীরেনের। লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা রবীন্দ্রনাথের খানকয়েক কাব্যগ্রন্থ। ছোট মখমলের বাক্সে পার্কারের সুন্দর একটা লেডীজ পেন।

—কী চমৎকার কলমটা! সত্যভামা খুশি হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, ওই কলমটা দিয়ে আই. এ.তে তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে।

—ফার্স্ট না আরো কিছু। সত্যভামার আয়ত কালো চোখে একটা লীলায়িত ভঙ্গি মুখর হয়ে উঠল: যে পাগল তুমি! বিয়ের পরে আমাকে কি আর পড়তে দেবে একটুও? পরীক্ষায় ফেল করতে হবে নির্ঘাত।

—কক্ষণো না। আমি? কিছুতেই না—হাতে-নাতে কথাটার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার জন্যেই যেন ধীরেন উঠে এল সত্যভামার দিকে।

—কী আরম্ভ করলে তুমি! দাঁড়াও, বাবা কোথায় আছেন দেখে আসি—লঘুপায়ে সত্যভামা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মা-র ঘরের দরজায় এসেই সে চমকে থেমে গেল অকস্মাৎ। বাবা মা কথা বলছে ঘরের ভেতরে। আজ দু বছরের মধ্যে এমন মিষ্টি গলায় সে মাকে বাবার সঙ্গে কথা বলতে শোনেনি, ভারী বিস্ময় বোধ হল তার।

—কী হল, কাঁদছ তুমি! এত ছেলেমানুষের মতো করছ কেন! মেয়ে তো পরের জন্যেই জন্মায়—তা ছাড়া এমন ভালো ছেলে ধীরেন। আমাদের মতো গরীবের ঘরে এমন জামাই আনা আমরা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারি কখনো!

সথানাথের ধরা গলা কানে এল।—না, না, তা নয়। ভাবছি সংসারের অবস্থা। তোমার তো এই দশা। তা ছাড়া—সথানাথ খানিকটা শুষ্ক হাসি হাসল: হারাণ বলছিল মেয়ে তো তোমার ছেলের কাজ করবে, বুড়ো বয়সে খেতে দেবে—ছেলে তো আর নেই তোমার। তা ছাড়া যা তোমার শরীর, আর বেশিদিন তো খাটতে পারবে না, এখন মেয়ের ওপরেই নির্ভর করো। আমি বললাম, তা কেন? আমি কি এতই স্বার্থপর যে—

বাকিটা সত্যভামা আর শুনতে পেল না, হয়তো বলতেই পারলো না সথানাথ। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে একটা বিদ্যুতের চমক এসে যেন জাগিয়ে দিল সত্যভামাকে। বুঝেছে, সথানাথকে সে বুঝতে পেরেছে। এত অসহায় এত বিপন্ন। মেয়ে জীবনে কৃতী হয়ে উঠবে, বুড়ো বয়সে তার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দেবে, পিতৃঋণ শোধ করবে। এই আশাতেই এত দিন সথানাথ বুক বেঁধে বসে আছে।

মাথার মধ্যে কেমন করে উঠল, সমস্ত চেতনা যেন অসংলগ্ন আর শৃঙ্খলাহীন হয়ে গেল মুহূর্তে। স্বপ্নের সন্ধ্যা ভেঙেচুরে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেছে। বস্তির ওপর কালো কালো

কয়লার ধোঁয়া জমে উঠে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে বায়ুস্তরকে, যেন নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। আরো সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল দশ বছর বয়সের সময়েই বুড়ো হেড্‌ম্যানের হাতে তাকে গৌরীদান করে মস্ত একটা লিফ্‌ট পাওয়ার কল্পনা করেছিল তার বাবা। শুধু মার বাধাতেই এমন পুণ্য সংকল্প সেদিন সার্থক হয়নি, অবশ্য তার জন্যে অনেকগুলো পদাঘাতই বর্ষিত হয়েছিল গিরিবালার পিঠে। সেদিন সখানাথ যা ছিল আজো ঠিক তাই আছে, এতটুকু পরিবর্তন হয়নি কোনোখানে।

পিতৃঋণ? এই ঋণ তাকে শোধ করতে হবে।

দরজার গায়ে মাথা রেখে সে নিঝুম মেরে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। এক পা চলতে পারল না, কিছু আর ভাবতে পারল না। তবে তাই ভালো। ঋণই সে শোধ করবে।

ঘরের মধ্যে ধীরেন শিস্‌ দিচ্ছে অধৈর্যভাবে। ঝড়ের মতো সত্যভামা তার সামনে এসে দাঁড়াল।

—ক্ষমা কোরো, আমি পারব না।

ধীরেন চমকে উঠল।

—কী পারবে না? কী বলছ তুমি?

—তোমাকে বিয়ে করতে।

আঘাতের আকস্মিকতায় ধীরেন বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

—কী বলছ পাগলের মতো?

—ঠিক কথাই বলছি। তোমার বই, কলম সব ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমি পারব না। —বিদ্যুৎগতিতে তিরোহিত হয়ে গেল সত্যভামা, বাতাসে সঞ্চারিত হয়ে গেল চাপা-কান্নার একটা বিলীয়মান শব্দ।

ধীরেন আরো কিছুক্ষণ মূঢ়ের মতো বসে রইল। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে নেমে গেল অচেতন পায়ে। বই আর কলম টেবিলের ওপর তেমনি রইল ছড়িয়ে। ঘরের মধ্যে গিরিবালা তখনো সখানাথকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

উঠোনে নেমে আকাশের দিকে বোবা চোখ মেলে দাঁড়ালো সত্যভামা। জগৎ লুপ্ত হয়ে গেছে, পৃথিবী মিথ্যে হয়ে গেছে। বাব্‌লাতলী বস্তির প্রেতাত্মা এসে ভর করছে তার চেতনার ওপর। দাবি, দাবি আর ঋণ। মিথ্যের দাবি,—যার লালসায় তার জন্ম, তার স্বার্থপরতার কাছে আত্মবলি দেবার ঋণ।

মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে গেল। সে এর প্রতিশোধ নেবে, জগতের ওপর, নিজের ওপর, সখানাথের দেওয়া এই দেহটার ওপর। কিন্তু কেমন করে?

খস-স—। বারান্দার আলোতে দেখা গেল ঢিলের সঙ্গে বাঁধা নীল রঙের পুরু একখানা লেফাফা তার পায়ের কাছে এসে পড়েছে। আর আধো অন্ধকারের মধ্যে সে দেখতে পেল

তেতলার বারান্দায় সেই ডোরাকাটা পাজামা পরা তরুণটি রেলিংয়ে ভর দিয়ে সাগ্রহে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। এ চিঠি তারই বার্তাবাহী।

এক মুহূর্ত সত্যভামা অনড় আর অনিশ্চিত হয়ে রইল। সে প্রতিশোধ নেবে—সমস্ত পৃথিবীর ওপর দিয়ে প্রতিশোধ নেবে। তারপরে লোকে যেমন করে বিষের পাত্র হাতে তুলে নেয়, তেমনি করেই সেই সুগন্ধ নীল খামখানাকে তুলে নিয়ে সে চলে গেল ঘরের মধ্যে।

তরফদার

জীবনে তিনবার আমি তরফদারকে দেখেছি।

প্রথম যখন দেখি তখন আমি মফঃস্বল কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। ছোট মাসিমার বিয়েতে তিনদিনের জন্যে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলাম। কলকাতা সম্পর্কে তখন পরিচয় ছিল অল্প, আর সেইজন্যেই কৌতূহলটা ছিল প্রবল। বিয়ের হট্টগোলের বাইরে ফাঁক পেলেই পথে বেরিয়ে পড়তাম। ইচ্ছে করত দু চোখ ভরে দেখে নিই কলকাতাকে—পান করে নিই আকণ্ঠ। অলিতে গলিতে খেয়াল খুশি মতো ঢুকে পড়তাম—বড় রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করতাম লক্ষ্যহীনের মতো। তিনদিন আমার সময়—মাত্র তিনদিন। এই ছোট পরিসরটুকুর ভেতরে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে কলকাতাকে গ্রাস করে নিতে হবে—এতটুকু বাদ দিলে চলবে না আমার। লেকের ব্রীজের ওপরে দাঁড়িয়ে দেখেছি মাছের খেলা, আবার কার্জন পার্কের নরম ঘাসের ওপর নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখেছি আলোকিত চৌরঙ্গীর প্রাসাদ শিখরে শিখরে 'নিয়নে'র অপরূপ বর্ণরাগ।

সেই বিশেষ বয়সে আর বিশেষ সেই ক্ষুধার্ত মনটাকে নিয়ে আমি প্রথম তরফদারকে দেখেছিলাম।

গোলদীঘির একটা বেঞ্চেতে বসে সাঁতারুদের বিচিত্র ডাইভিং দেখে পুলকিত হচ্ছি, এমন সময় নজর গেল পেছনের ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের দিকে।

লোহার গেটে টাঙানো হয়েছে একখানা রাঙা টকটকে শালু কাপড়। তার ওপরে তুলোর লেখাগুলো খুব স্পষ্ট পড়া যাচ্ছিল: অস্পৃশ্যতা নিবারণ সভা। দ্বিতীয় বিপুল অধিবেশন। তারও নিচে লেখা: স্বাগতম্।

মনে হল ওই স্বাগতম্ অক্ষরগুলো আর কাউকেই নয়—বিশেষভাবে আমাকেই যেন আহ্বান জানাচ্ছে! কলকাতায় সভাসমিতিগুলো কী জাতীয় ঘটনা এ বিষয়ে বরাবরই সজাগ একটা কৌতূহল ছিল। সে কৌতূহলের হাত এড়ানো গেল না—যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণে আমি উঠে পড়লাম, তারপর ভীরু সংকুচিত পায়ে প্রবেশ করলাম লোহার গেটের ভেতরে।

দরজায় যিনি ছিলেন, তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।—আসুন, আসুন, ভেতরে যান।

ভারী সম্মানিত বোধ হল নিজেকে। নিতান্তই মফঃস্বল শহরের তথা মফঃস্বল কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র আমি। কলকাতার একটা বিশিষ্ট সভাগৃহে এমন করে আমন্ত্রিত হলাম, কী সৌভাগ্য? তা হলে কি আমার আকারে প্রকারে এবং বেশে বাসে এমন একটা কিছু আছে যাতে আমাকে একটা বিশিষ্ট কিছু বলে মনে হতে পারে? অথবা কলকাতার সভা সম্মেলনের রেওয়াজই এইরকম?

কিন্তু 'হলে' ঢুকে অভ্যর্থনার কারণটা বোঝা গেল। অত বড় হলে গোনাগুনতি চল্লিশটিরও বেশি লোক হয়েছে কিনা সন্দেহ। সামনের ডায়াসের ওপর সভাপতির চেয়ার টেবিল—তার আশেপাশে আরো খান কয়েক চেয়ার। চেয়ারগুলো সবই অধিকৃত—ওখানে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা সবাই বোধ করি বিশেষভাবে আমন্ত্রিত এবং বক্তা।

আমি এসে বসবার মিনিট কয়েক বাদেই সভা আরম্ভ হল। কী একজন অ্যাডভোকেট সভাপতির আসন সমালংকৃত করলেন। মাল্যদান হল, চল্লিশটি হাতে বাজল সংক্ষিপ্ত এবং সোৎসাহ করতালি। সগৌরবে শুরু হল অস্পৃশ্যতা নিবারক সমিতির দ্বিতীয় বিপুল অধিবেশন।

দুটি তরুণ এবং দুটি তরুণী অর্গ্যান বাজিয়ে উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলে:

'জলে হরি, স্থলে হরি,
চন্দ্রে হরি, সূর্যে হরি,
হরিজনে আছেন হরি
হরিময় ভূমণ্ডল—'

সময়োপযোগী সঙ্গীতের পরে শুরু হল বক্তৃতা পর্ব। একের পর এক বক্তা দাঁড়িয়ে উঠে জ্বালাময়ী ভাষায় অস্পৃশ্যতার ভয়াবহ কুফল বর্ণনা করে যেতে লাগলেন। শম্বুক বধ করে রামচন্দ্র যে কুকীর্তি করেছেন এবং এখনো মাদ্রাজে পারিয়াদের ওপরে যে ভয়ানক বীভৎস সামাজিক অত্যাচার সংঘটিত হয়ে থাকে—তার কোনোটাই বাদ গেল না। অবিলম্বে অস্পৃশ্যতা নিবারণ না করলে হিন্দুধর্ম বিশ বাঁও জলের নিচে ফুটো নৌকোর মতো টুপ করে তলিয়ে যাবে—অকাট্য যুক্তিতর্কে সেটা সপ্রমাণ করে দিলেন তাঁরা।

তাই আমাদেরই শাস্ত্র বলেছে: 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ'—সগর্জনে শেষ কথাটি ঘোষণা করে এবং টেবিলে সেই অনুপাতে ভয়ংকর একটি কিল বসিয়ে তৃতীয় বক্তা যখন ঘর্মাক্ত দেহে বসে পড়েছেন আর অডিটোরিয়াম সাধুবাদে রীতিমতো মুখরিত হচ্ছে, এমন সময় এক কোণ থেকে একটি উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল: সভাপতি মশায়ের অনুমতি পেলে আমি দু'চারটে কথা বলতে চাই।

আশ্চর্য গম্ভীর সে গলা। কাছাকাছি কোথাও প্রবল বেগে বাজ পড়লে যেমন তার শব্দটা অনেকক্ষণ ধরে অনুরণিত হতে থাকে—তেমনি সেই আওয়াজে সমস্ত ঘরটা যেন গমগম করে উঠল। পূর্ববর্তী বক্তার ভয়াল গর্জনটাও তার কাছে ফিকে মনে হল, মুহূর্তে চল্লিশ জোড়া চোখ চকিত হয়ে ঘুরে গেল সেদিকে।

আর সেই আমার প্রথম দর্শন। পূর্বরাগও বলা যায়।

আমার পাশের ভদ্রলোক অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলেন, অতুলন তরফদার।

আর একজন মন্তব্য করলেন: সেরেছে। এখানেও জ্বালাতে এসেছে লোকটা?

সভায় ভেতরে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন সূচিত হচ্ছিল, এমন সময় অতুলন তরফদারের সেই অতুলন গলা আবার সব কিছুকে ছাপিয়ে বেজে উঠল: সভাপতিমশাই, আমি কিছু বলতে চাই।

বেশ বোঝা গেল সভাপতি বিপন্ন বোধ করছেন। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, বক্তা আমাদের অনেকেই আছেন—সময়ও অল্প—

—আমিও আপনাদের বেশি সময় নষ্ট করব না—অতুলন তরফদার উঠে দাঁড়ালেন। নিতান্তই আন্‌কোরা মফঃস্বলের ছেলে আমি, তবু আমার মনে হল তরফদার যেন জোর করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন—এ সভায় দু'কথা বলবার অধিকার নিজের শক্তিতেই আদায় করে নিলেন তিনি।

নিজের শক্তিতে ছাড়া আর কী! এতক্ষণে সম্পূর্ণভাবে তরফদারকে দেখতে পেলাম আমি—ইংরেজীতে যাকে বলে ম্যান ইন এ মিলিয়ান। এমন বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় চেহারা কোনো বাঙালীর যে হতে পারে এ কোনোদিন কল্পনাতেও ছিল না। লম্বা বোধ হয় সাড়ে পাঁচ থেকে ছ হাতের কাছাকাছি যাবে লোকটি। পেশল ঋজু শরীরে যেন ডায়নামোর মতো শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে। প্রকাণ্ড মাথাটার চুলগুলো কুস্তিগীর পালোয়ানের ঢঙে চামড়া ঘেঁষে ছাঁটাই করা, তার ভেতর থেকে খর্বকায় একটি টিকি উঁকি মারছে। আর চুলের স্বল্পতার ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে বাঘের মতো প্রকাণ্ড মুখখানায়—জাঁদরেল একটি মানানসই গোঁফে। ছবিতে কাইজার আর হিণ্ডেনবার্গের গোঁফ দেখেছি, কিন্তু এ গোঁফ তাদের সকলকে টেক্কা দিয়েছে। তার দৈর্ঘ্য যেমন, প্রস্থও সেই অনুপাতে।

বেশবাসেও বৈশিষ্ট্যের ছাপ জ্বলজ্বল করছে অদ্ভুতভাবে। টকটকে ঘোর লাল রঙের একটা বেনিয়ান গায়ে, তার ফিতেটা গাঢ় সবুজ। অমন একটা ছেলেমানুষি জামা আর কারো গায়ে নিশ্চয় বেখাপ্পা আর বেমানান ঠেকত, কিন্তু অতুলন তরফদারের সঙ্গে ওর যেন কোথায় একটা নিবিড় আর গভীর সাদৃশ্য ছিল। লোকটিকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখেই আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

বড় বড় মোটা আঙুলে তরফদার তাঁর গোঁফের দুই প্রান্তটা একবার পাকিয়ে নিলেন,

বোধ হয় উদ্দীপনা সঞ্চার করে নিলেন নিজের ভেতরে। তারপর সেই আশ্চর্য গম্ভীর গলায় তিনি বলতে শুরু করে দিলেন।

বলবার ক্ষমতা আছে লোকটির—আর সেই ক্ষমতার সঙ্গে সুর মিলিয়েছে তাঁর অসাধারণ আত্ম-প্রত্যয়। তাঁর সব কথাগুলো ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম বলে মনে হয় না, কিন্তু যেটুকু বুঝেছিলাম তা রীতিমত চাঞ্চল্যকর।

তরফদার বলেছিলেন, অস্পৃশ্যতা নিবারণ টিবারণ নিতান্ত বাজে কথা। যাদের কাজ নেই, তারাই ওই সব নিয়ে খানিকটা হৈ চৈ করতে ভালোবাসে। অস্পৃশ্য যারা হয়েছে, তারা নিজেদের অযোগ্যতার জন্যেই হয়েছে। এঁটো পাতা কখনো স্বর্গে যায় না, তাদের উন্নতির চেষ্টা পাগলামি মাত্র। ছোটলোক ডোম না থাকলে আমাদের মড়া পোড়ানো চলবে কী করে? ছোটলোক মেথর না থাকবার অবস্থাটা একদিনও কি আমরা ভাবতে পারি? সুতরাং এসব নিয়ে গণ্ডগোল করবার কোনো মানে হয় না। এ বিষয়ে গীতায় শ্রীভগবান যা বলে গেছেন তাই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। আমি শ্রদ্ধেয় সভাপতি মশাইকে প্রশ্ন করতে পারি কি যে, কাল যদি একজন রাস্তার বেলদার এসে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তাকে তিনি জামাই করতে রাজী আছেন কিনা?

কথাটা শেষ করে নিস্তব্ধ সভার ভেতর দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলেন তরফদার। বাইরের করিডোরে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর বিলীয়মান ভারী জুতোটার শব্দ বাজতে লাগল।

প্রায় দু-তিন মিনিট পরে ধাতস্থ হল সভা। আট-দশজন সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন: শেম্ শেম্! কিন্তু ততক্ষণে তরফদার বহুদূরে চলে গিয়েছেন।

আমার পাশের ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, লোকটার সব সময় ওরিজিন্যাল হবার চেষ্টা। সবাই জানে যে অস্পৃশ্যতা দূর করাটা আজকে একান্ত দরকার, তাই তার স্বপক্ষে সাফাই গেয়ে মৌলিকতা প্রমাণ করে গেল। আশ্চর্য লোক!

সভায় তখন পঞ্চম বক্তা উঠে যুক্তির ধারালো ছুরি দিয়ে তরফদারের কথাগুলোকে কেটে একবারে কুচি কুচি করে ফেলছিলেন। কিন্তু আমার কেমন ভালো লাগল না—মনে হল তরফদার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার সব কিছু আকর্ষণ যেন আমার নষ্ট হয়ে গেছে। আমি পথে বেরিয়ে পড়লাম।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পথে জ্বলেছে বিদ্যুতের রোশনাই আর লোকের ভিড় চলছে বেড়ে। আমার মনের সামনে তরফদারের সেই অপূর্ব মূর্তিটা যেন ছবির মতো ভেসে বেড়াতে লাগল। ক্রমাগত ইচ্ছে করতে লাগল পথে যদি কোথাও তাঁর দেখা পাই, তা হলে সাহসে ভর করে তাঁর সঙ্গে আমি আলাপ করে নেব। বলব আপনি যা বলেছেন সব সত্যি, আপনার মতের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মিল আছে।

কিন্তু কলকাতার জনারণ্যে তরফদারের চিহ্নও আমি আর খুঁজে পেলাম না।

মনস্তত্ত্বে এমন কথা কি কিছু বলে যে, মানুষ একান্ত করে যা কামনা করে একদিন সে তা পাবেই? অথবা এমন একটা কিছু কি সাইকিক ফোর্স আছে যা কারো আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে তার কাছে টেনে আনে? এ সবের সত্যি মিথ্যে জানি না, কিন্তু তরফদারের সঙ্গে দেখা হওয়ার যে উদগ্র কামনা আমার মনের ভেতর প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল, সেই কামনার বলেই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়ে গেলাম।

ততদিনে পাঁচটা বছর কেটে গেছে। প্রথম যৌবনের সেই মফঃস্বলবাসী নির্বোধ মনটি আর নেই—তার রূপান্তর হয়েছে, তার উন্নতি হয়েছে। চাকরির তাগিদে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছি কলকাতার। খবরের কাগজের অফিসে উদয়াস্ত এবং অস্তোদয় পরিশ্রম করতে হয়। সস্তা ভাড়ার স্যাঁৎসেঁতে একতলা বাড়ি, ট্রামে বাসে জীবন-সংগ্রাম, ভিড়, হট্টগোল আর অভাবের পাপচক্রে পড়ে কলকাতার রূপটাই বদলে গেছে। সে কৌতূহল নেই, সে চোখও নেই। এখন মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কলকাতা থেকে ছিটকে বাইরে চলে যাই কোনো অবারিত দিগন্তে, কোনো নির্মেঘ নীলাঞ্জন আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে মুক্তি আর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি একটা। যন্ত্রের ঐশ্বর্য সমস্ত চিন্তা চেতনায় আর চমক দেয় না, যন্ত্র-পুরীর বাঁধ-ভাঙা মুক্তধারার স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে।

ছিলাম বউবাজারে, ওখান থেকে বাড়ি বদলে এলাম পটলডাঙ্গার এক গলিতে। আর প্রথম দিন বিকেলেই পাশের বাড়ির নেমপ্লেটের ওপর আমার নজর গেল: অতুলন তরফদার।

অতুলন তরফদার! আমার রক্ত ঝনঝন করে উঠল। পাঁচ বছর আগেকার সেই সন্ধ্যাটি আমার মনের সামনে নতুন করে ফিরে এল। টকটকে লাল বেনিয়ানের ওপরে সবুজ রঙের ফিতে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহধারী অসাধারণ ব্যক্তিত্বমণ্ডিত একটি মানুষ। গম্ভীর গমগমে গলায় সমস্ত হলটা যেন কেঁপে উঠেছিল। পাঁচ বছর ধরে আমার চিন্তার ভেতরে যে লোকটির ছায়ামূর্তি অপরূপ একটা ইন্দ্রজাল নিয়ে খেলা করে গেছে—সেই লোক, সেই আশ্চর্য লোকটি আমার পাশের বাড়িতেই বসবাস করছেন।

একটা বিচিত্র অনুভূতি আমার রক্তের মধ্যে ক্রিয়া করতে লাগল। বহু কামনা এবং প্রতীক্ষার পরে বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনের পূর্বক্ষণে নায়িকার মনের ভেতর যেমন আকুলি-বিকুলি করতে থাকে, আমারও যেন তাই হতে লাগল। দুবেলা অফিস এবং অফিস-ফেরত যাতায়াতের সময় উদ্‌গ্রীব চোখে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে যাই। কিন্তু কোনোদিন কাউকে দেখতে পাই না। সামনের সদর দরজাটা যেন দৈত্যপুরীর ফটকের মতো অনন্তকাল ধরে রুদ্ধ হয়ে আছে—যেন সমস্ত পৃথিবীটাকে বাইরে ঠেলে সরিয়ে রেখে ওর ভেতরে অ্যাল-

কেমিস্টদের মতো কী একটা সাধনা চলেছে। ওখানে যারা আছে তারা বোধ হয় সৃষ্টির আদিকালের বাসিন্দা—আজকের দিনের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কোনোখানে কিছুমাত্র সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য নেই। কোনোদিন ও বাড়ির দরজা খোলে না—কোনোদিন ডাকপিয়ন এসে ওখানকার সদরে কড়া নাড়ে না। কলকাতার কল্লোলিত সমুদ্রে কালো গ্র্যানাইটের পাঁচিলে ঘেরা একটা দুষ্প্রবেশ দ্বীপ-দুর্গের মতো ও বাড়িটা যেন কনান ডয়েলের প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর মতো স্তব্ধ হয়ে আছে।

সেদিন রবিবারের ছুটি। খবরের কাগজ হাতে নিয়ে নিজের বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়েছিলাম। কাগজে মন ছিল না—ওই অদ্ভুত বাড়িটা আমার মনোজগৎকে একান্তভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। হাজারবার চেষ্টা করেও কাগজের একটি ছত্র আমি পড়তে পারছিলাম না।

দুত্তোর, এ কী ব্যাধি আমাকে পেয়ে বসল! আমি খবরের কাগজের স্বল্প-বৈতনিক কেরানী তারকনাথ গাঙ্গুলী, রয়টার এ-পির খবর বাঙলায় অনুবাদ করি, দিন আনি, দিন খাই। আমার মাথার ভেতরে এসব কী বিদ্‌ঘুটে রোমান্স এসে কায়েমি বাসা বেঁধে বসল। পাঁচ বছর আগে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে দেখা বিচিত্র সেই অতুলন তরফদার আর আশ্চর্য রহস্যময় এই চির নীরব বাড়িটার কথা ভাবতে ভাবতে শেস পর্যন্ত আমি কি পাগল হয়ে যাবো! না—না, আমি ছা-পোষা মানুষ, পাগল হতে গেলে আমার চলবে না—ওসব বড়লোকের শখ।

বসে থেকে থেকে ক্রমে যেন খুন চেপে যেতে লাগল আমার, কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগলাম আমি। নাঃ—আর পারা যায় না। এ কৌতূহলের পীড়ন আমার অসহ্য। আজ একটা এস্‌পার ওস্‌পার করে ফেলতে হবে। ওই বাড়ির ভেতরে কী আছে এবং কে আছে আমি দেখব।

মনটাকে স্থির করে ফেললাম। খবরের কাগজ নামিয়ে উঠে পড়লাম—তারপর সোজা এসে এ বাড়ির দরজার কড়াতে হাত দিলাম।

কিন্তু কড়াতে হাত দিতেই কেমন চমক লাগল। মরচে পড়ে গেছে কড়া দুটোয়—দরজার পাল্লার গায়ে তারা শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে। বহুদিন কেউ ওতে হাত দেয়নি। এক মুহূর্তের জন্যে মনটা প্রশ্ন করে উঠল বাড়িটা খালি নয় তো? কিন্তু তাই বা কী করে হবে? তাহলে, সদরে নিশ্চয়ই তালা থাকত। তাছাড়া রাত্রে এ বাড়ির বন্ধ দরজা জানলার ফাঁকে ফাঁকে আমি যে আলো দেখেছি সেও তো চোখের ভুল নয়!

আমি কড়া নাড়লাম। খট খট করে একটা অস্বাভাবিক শব্দ বেজে উঠল—আমার নিজের কানেই যেন বিশ্রী লাগল সেটা। আবার কড়া নাড়লাম—তেমনি অস্বস্তিকর শব্দ উঠল। কিন্তু ভেতর থেকে কারো সাড়া এল না।

আমি যেন মরীয়া হয়ে উঠেছি। দু'হাতে আবার সজোরে কড়াটাকে ঝাঁকুনি দিলাম। প্রবল শব্দে সমস্ত পাড়াটা অবধি চমকে উঠল।

দরজা খুলে গেল।

যে দরজা খুলে দিল, তাকে দেখবামাত্র আমার শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেল মুহূর্তে। তরফদার—হাঁ, নিশ্চয়ই তরফদার। সেই বিশাল দীর্ঘ শরীর—পাঁচ বছরেও তার কিছুমাত্র রূপান্তর ঘটেনি। মাথাটা একেবারে পরিষ্কার, কানের দু পাশে গাছকয়েক চুল ছাড়া সবটাই টাক পড়ে গেছে। সে দশাসই গোঁফজোড়া আর নেই—তার জায়গা অধিকার করেছে দুর্ভেদ্য নিবিড় দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। পরনে পা পর্যন্ত একটা আলখাল্লা—তার রঙ কুচকুচে কালো। চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলছে।

এইবারে আমার হঠাৎ মনে হল লোকটা বোধ হয় পাগল। নিজের অজ্ঞাতেই আমি সভয়ে তিন পা পেছিয়ে গেলাম।

গম্ভীর প্রশান্ত গলায় তরফদার বললেন, কে আপনি?

—আমি, আমি পাশের বাড়িতে থাকি।

—নতুন ভাড়াটে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ও, সেই জন্যেই। তা কী চাই আপনার?

আমতা আমতা করে বলে ফেললাম। অনেকদিন আগে একবার তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার একটা ইচ্ছে ছিল, তাই—

—ওঃ!—নির্বিকার গলায় তরফদার বললেন, ভেতরে আসুন।

আমি ঢুকতেই পেছনের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা অনিশ্চিত আশংকায় পীড়িত হয়ে উঠল আমার মন। আশ্চর্য, এই বেলা সাড়ে আটটার সময় কলকাতার একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকতে আমি ভয় পাচ্ছি!

আদেশের গলায় তরফদার বললেন, আসুন।

সম্মোহিতের মতো আমি নীরবে তাঁর অনুসরণ করলাম।

দোতলার একটা প্রায়ান্ধকার ঘর। দরজা জানালা শক্ত করে আঁটা, ভগবানের পৃথিবীকে যেন অস্বীকার করে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাথার ওপরে বোধ হয় একটা পাখা ঘুরছে—তার আভাস পেলাম। আর ঘরের এক পাশে একটা লাল আলো—কেমন একটা আলো আঁধারে যেন সব থমথমে করে রেখেছে।

ঘরে চেয়ার টেবিল ছিল না। মেঝেতে একটা ফরাস পাতা আছে বুঝতে পারলাম। তরফদার বললেন, বসুন।

বসলাম। তরফদারও বসলেন। তারপর কেমন মিষ্টি করে হেসে বললেন, আমার

সঙ্গে আলাপ করতে চান, না?

সত্যি বলতে কি, এতক্ষণে আমার ভয় করছিল। বেশ বুঝতে পারছি এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছি যা তরফদারের মতোই দুর্বোধ্য আর রহস্যাবৃত। বেলা সাড়ে আটটার সময়ে ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে এমন একটা ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করবার মানে কী?

আমি শংকিত গলায় বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল—

—মনে হয়েছিল লোকটা একটু অদ্ভুত, তাই নয়? কিন্তু কেন বলুন তো? অদ্ভুত বলতে আপনারা কী বোঝেন?

অদ্ভুত বলতে কী বুঝি! এ কথার চট করে একটা জবাব দিই কী করে! আমি তো তো করতে লাগলাম।

তরফদার নিজেই আমাকে সমস্যার হাত থেকে উদ্ধার করলেন। বললেন, তার কারণ আপনারা যাদের দেখতে অভ্যস্ত আমি তাদের মত নই। আমার কী মনে হয় জানেন? মানুষগুলোকে সব গড্ডলিকা-প্রবাহ বললেও বেশি বলা হয়—তারা যেন পিঁপড়ের সার। সব এক রকম রঙ, এক রকম চেহারা—কোনোটাকে কোনোটা থেকে আলাদা করে নেওয়া যায় না, চেনাও যায় না।

—কী বলতে চান আপনি?

—আমি বলতে চাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা। এদিক থেকে আপনি আমাকে উগ্র ইন্‌ডিভিজুয়ালিস্টও মনে করতে পারেন। বহুর মধ্যে আমি মিলিয়ে যেতে চাই না, সবার রঙে রঙ মেশানোতে আমার রুচি নেই। তা কখনো হয় না, তা হতে পারেও না। আমি এমন একটা কিছু করছি যা একান্তভাবে আমার—যেখানে আমি একচ্ছত্র।

আমি আস্তে আস্তে সহজ হওয়ার চেষ্টা করছিলাম। বললাম, আপনার প্রচুর শক্তি আছে। আপনি যে কোনো কাজে নামলেই তো প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য—

—ব্যাস্ ব্যাস্, থামুন।—অধৈর্যভাবে আমাকে থামিয়ে দিলেন তরফদার: আপনি না বললেও আমি জানি আমার প্রচুর শক্তি আছে। কিন্তু সে শক্তি আমি কিসের পেছনে ব্যয় করব বলছেন? রাজনীতি? ও কথাটার কোনো মানে হয় না—অ্যানিম্যাল্ ওয়ার্লডে যা ঘটছে, মানুষের রাজনীতিও সেই যোগ্যতমের উদ্বর্তন। সুতরাং ওখানে মানুষের মনুষ্যত্ব কোথায়? সমাজনীতি? পিঁপড়ের কথা বলছিলাম—দেখুন গে তারাও মানুষের মতো সমাজবদ্ধ। সাহিত্য? পাগলের প্রলাপ। ধর্ম? চিরকেলে জোচ্চুরি—রিলিজিয়নের উৎপত্তির ইতিহাস পড়লে দেখবেন প্রিমিটিভ্ অজ্ঞতা থেকেই ওর সূত্রপাত এবং মানুষের স্বার্থবুদ্ধিতে ওর বিকাশ।

কথাগুলো সম্বন্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করবার ইচ্ছে আমার ছিল, কিন্তু তরফদারের এই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সম্মুখে সে ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। আধা-অন্ধকারে কালো আল্‌খাল্লাঢাকা শরীরটা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, শুধু জেগে আছে একটা মাথা—হঠাৎ মনে হতে পারে যেন শূন্যে একটা কাটামুণ্ড ভেসে বেড়াচ্ছে। আর দুটো উজ্জ্বল চোখ নির্নিমেষভাবে আমার ওপর নিবদ্ধ হয়ে আছে—যেন একটা অলৌকিক কিছু দেখতে পাচ্ছি।

আমি বললাম, তা হলে আপনি কী করতে চান?

—যা করছি তা একটা নতুন জিনিস। বিজ্ঞান আর দর্শন যা কখনো করতে পারবে না, সেইটেকে আয়ত্ত করছি।

—কী রকম?

—প্রেততত্ত্ব।

—প্রেততত্ত্ব?

—হ্যাঁ। পরলোকের সঙ্গে একটা যোগাযোগ স্থাপন করতে চাই। মানুষ যা কখনো জানতে পারেনি, অথচ চিরকাল যা জানবার জন্যে তার আকুলতা সেটাকেই আমি আবিষ্কার করব। বুঝতে পারছেন, এই ঘরটা এমন অন্ধকার কেন? এই বাড়িটাকে কেন আমি কলকাতার বাইরে রেখে দিয়েছি? কারণ—এই নির্জনতা আর অন্ধকার না থাকলে প্রেতাত্মাদের আবির্ভাব হবে কেমন করে?

আমার গা ছম ছম করে উঠল, কাঁটা দিয়ে উঠল সর্বাঙ্গ। বলে কী লোকটা! এই রবিবারের ছুটির দিনে, বাইরের ঝকঝকে শানানো রৌদ্রে আর এতবড় কলকাতার এমন প্রচণ্ড জীবনাবর্তের ভেতরে এই রকম একটা অস্বাভাবিক ভৌতিক সাধনা যে কেউ করতে পারে এ কারো কল্পনাতেও আসে নাকি? তবু আমার ভয় করতে লাগল—আমার বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা বড় বেশি সজাগ আর সচেতন হয়ে উঠল। অসম্ভব নয়—কিছু অসম্ভব নয়—হয়তো এখুনি দেখব আমার সামনে এসে তিন-চারটে অমানুষিক মূর্তি বিকটভাবে নৃত্যোল্লাস শুরু করে দিয়েছে।

কালো আল্‌খাল্লা পরা অদৃশ্যপ্রায় তরফদারও যেন আর পৃথিবীতে নেই। আধা অন্ধকারে তাঁকে দেখে মনে হতে লাগল যেন তিনিও কোনো একটা অতীন্দ্রিয় জগতেরই অধিবাসী। শরীর নেই—শুধু একটা ছিন্নমুণ্ড আর তা থেকে দৃষ্টির আগুন এসে আমাকে বিদ্ধ—বিদীর্ণ করে ফেলছে!

তীব্র অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। লোকটা হয় পাগল, নইলে সত্যি সত্যিই ভূতগ্রস্ত। এখানে আর বসা উচিত নয়। বাইরে জনতাসংকুল সুস্থ স্বাভাবিক রৌদ্রোজ্জ্বল কলকাতা আমাকে ডাকতে লাগল। আমার চেনা জগৎ, আমার পরিচিত পরিবেশ।

যেখানে আমি পিঁপড়ের সারির মধ্যে একটি, যেখানে সবার মধ্যে আমিও আমার রক্ত মিশিয়ে দিয়েছি। এই অসাধারণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন—লোকোত্তর হয়ে আমার দরকার নেই!

যেন নিঃশ্বাস আটকে আসছিল। আমি উঠে পড়তে চাইলাম।

সেই গভীর নাদধ্বনির মতো গলায় তরফদার বললেন, দাঁড়ান।

সম্মোহিতের মতো দাঁড়ালাম।

—আপনি ভূত মানেন না, না?

বললাম, মানি।

তরফদার যেন জবাবটার জন্যে তৈরি ছিলেন না। তাঁর কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর ফুটে বেরুল: না না, আমার মন রাখা কথা বলবেন না। এই বিজ্ঞান আর মেটিরিয়ালিজমের যুগে আপনারা নিশ্চয়ই ভূত মানেন না?

বললাম, মানি বইকি!

—আপনিও ভূত মানেন!—'আপনিও' কথাটার ওপরে বেশ খানিকটা জোর দিলেন তরফদার: আপনিও?

—শুধু আমি কেন, অনেকেই মানেন।

—কেন মানেন?—তরফদার যেন আমাকে চ্যালেঞ্জ করলেন। তাঁর গলার স্বরে আমি চমকে উঠলাম।

—মানি, তাই মানি।

—অঃ!—তরফদার এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন: কখনো দেখেছেন কিছু?

—ঠিক দেখেছি বলতে পারব না, তবে প্ল্যাঞ্চেটে কতগুলো আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে দেখেছি।

—প্ল্যাঞ্চেট্!

—হ্যাঁ—প্ল্যাঞ্চেট্। তাতে আমি প্রেতাত্মার লেখা দেখেছিলাম।

—আপনি একাই?

—না, অনেকেই আজকাল প্ল্যাঞ্চেটে ভূত নামাবার চেষ্টা করছে। কাজেই এতে আপনার অসাধারণ কোনো ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে পারলেন না মিস্টার তরফদার, পারবেনও না।

আমার কথাটার ভেতরে বোধ হয় একটুখানি তিক্ত বিদ্রূপেরই আভাস প্রচ্ছন্ন ছিল। তরফদার কয়েক মুহূর্ত পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ ভয়ংকর গম্ভীর গলায় তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন: বেরিয়ে যান—এক্ষুণি বেরিয়ে যান। আপনাকে এখানে ঢুকতে দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। গেট্ আউট—

নক্ষত্রবেগে আমি বাইরে ছিটকে পড়লাম। খোলা আকাশ, রৌদ্রোদ্ভাসিত রবিবারের কলকাতা। যেন বেঁচে গেলাম—যেন মুক্তি পেলাম আমি! আমার মনের ওপর থেকে পাঁচ বছরব্যাপী একটা ইন্দ্রজাল যেন সরে গেল—ওই ভুতুড়ে বাড়িটা সম্বন্ধে কৌতূহলের যে ভারটা আমাকে প্রতি মুহূর্তেবিপর্যস্ত পীড়িত করে তুলছিল সেটাও কার মন্ত্রবলে নেমে গেল যেন।

খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি।

কিন্তু তখনো শুনতে পাচ্ছি বন্ধ বাড়িটার ভেতর একটা চাপা গোঙানির মতো শব্দ। তরফদার তখনো চিৎকার করে বলছেন: গেট আউট, গেট আউট, গেট আউট—

দিন পনেরো পরে ইচ্ছে করেই বাড়ি বদলালাম। তরফদারের প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্যটা যেন আর বরদাস্ত করতে পারছিলাম না—যেন অনুভব করছিলাম ওই ভুতুড়ে বাড়ি থেকে একটা অশরীরী অস্বস্তির ছায়া আমার বাড়িতেও সব সময় ছড়িয়ে পড়ছে। কাজেই বাড়ি বদলাতে হল।

কিছুদিন পরেই কেন জানি না—তরফদার আমার মন থেকে মুছে গেলেন। পাঁচ বছরের পুরোনো ছবির ওপরে কে যেন মোটা তুলির একটা কালো পোঁচড়া দিয়ে চিরদিনের জন্যে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে দিলে। রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' মনে পড়ল: আকস্মিক মোহভঙ্গের পরিণতি বোধ হয় এই রকমই হয়।

কিন্তু আর একবার তরফদারের সঙ্গে আমার দেখা হল; সেটাও এইরকম আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত।

আরো তিনটি বছর কেটে গেছে। পুজোর ছুটিতে উত্তরবঙ্গে এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। রেল স্টেশন থেকে বারো মাইল দূরে নিরিবিলি একটি গ্রাম। কলকাতার বীভৎস শ্বাসরোধী জীবনের বাইরে অনাবরণ পৃথিবী।

ছুটিটা চমৎকার কাটল। টাটকা মাছ, নির্জলা দুধ, মাঝে মাঝে বন্দুক নিয়ে বিলে বিলে ঘুরে বেড়ানো। এই সময় থেকেই দুটো চারটে বুনো হাঁস পড়তে শুরু হয়—নদীর চরে চখা-চখীর সাক্ষাৎ মেলে। অফুরন্ত বিশ্রাম আর সহজ সুস্থ আনন্দের মধ্যে কটা দিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে চলেছিলাম।

সন্ধ্যায় ট্রেন, তাই সকাল সকাল খেয়েদেয়েই গোরুর গাড়িতে চড়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়েছি। দুপুরের রোদে চক্রবালবিসারী দিক-প্রান্তর ধু ধু করছে—যেন সমস্ত পৃথিবীটাই বিচিত্রভাবে ঝিমিয়ে পড়ছে। আমিও ঝিমুচ্ছি। গাড়োয়ানটা হাঁকাচ্ছে প্রাণপণে: ডাহিন বাঃ ডাহিন! কুনঠি যাইছে হে ভৈসা—ডাহিন্—

শরতের সোনা-ঝরানো রোদ। তবু বেলা দুপুরে এই মাঠের ভেতর সেটা রীতিমতো

প্রখর হয়ে উঠছিল। ছইয়ের ভেতর দিয়েও গায়ে এসে বিঁধছিল একটা ভ্যাপসা চাপা গরম। হঠাৎ ভারী তৃষ্ণা বোধ হল।

গাড়োয়ানকে বললাম, এখানে খাওয়ার জল পাওয়া যাবে রে?

গাড়োয়ান মহিষকে বাপ-বাপান্ত করবার ফাঁকে ফাঁকে জবাব দিলে, থোরা আগিলাত্ পানি মিলিবে বাবু, চলেক্। গাড়ি একঘেয়ে গতিতে তেমনি চলতে লাগল, আর আমি ঝিমুতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ এক সময়ে ঝাঁকানি দিয়ে সেটা থেমে গেল। গাড়োয়ান ডেকে বললে, এইঠে পানি আছে জী, পিবেন?

তাকিয়ে দেখলাম সামনেই একটা আমের বাগান। তার পেছনে একটা সাদা একতলা বাড়ি—মন্দিরের মতো লম্বা একটা চুড়ো তুলেছে আকাশে। আর বাগানের ভেতরে বড় একটা ইঁদারা, তার কাছে দড়ি-বাল্‌তি পড়ে আছে। মরুভূমির মতো শস্যবিরল মাঠের অবাধ বিস্তৃতির মাঝখানে একটা চমৎকার বিশ্রামের জায়গা—একটা অপূর্ব মরূদ্যান।

গাড়োয়ান বাল্‌তি ভরে ইঁদারার জল তুলে নিয়ে এল। জল খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম: এটা কার বাড়ি রে?

গাড়োয়ান জবাব দিলে, বাড়ি নয় হুজুর, গীর্জা।

—গীর্জা! এখানেও পাদ্রী এসেছে নাকি?

হ্যাঁ—পাদ্রী এসেছে বইকি। চার পাশের সাঁওতাল আর ওঁরাওঁদের তারা সুসমাচার শুনিয়ে আলোকে টেনে আনছে। না, আগে সাহেব পাদ্রী ছিল বলে, কিন্তু এখন তার জায়গায় এসেছে একজন বাঙালী। একটা সাঁওতাল মেয়েকে বিয়ে করে সে সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করছে।

কথাটা শেষ করে গাড়োয়ান মহিষের ঘাড়ে জোয়াল চড়াতে চড়াতে বললে, ওই তো পাদ্রী সাহেব ওইঠে খাড়াই আছে—

আমি তাকিয়ে দেখলাম অদূরেই পাদ্রী সাহেব দাঁড়িয়ে। প্রথম বিশ্বাস করতে পারিনি, তারপর নিঃসন্দেহে চিনতে পারলাম। তরফদার—অথবা ভূতপূর্ব তরফদার। এখন হয়তো নাম হয়েছে ইজিকিয়েল কিংবা ইমানুয়েল।

পাদ্রী জিজ্ঞাসা করলেন, গাড়ি কোথায় যাবে?

সজোরে মহিষ দুটোকে হাঁকিয়ে দিয়ে গাড়োয়ান জবাব দিলে, একলাখী ইস্টিশন।

গাড়ি চলেছে। বরেন্দ্রভূমির মাঠে ঝলকাচ্ছে রোদ। গাড়ির চাকায় রাঙা ধুলো উড়ছে —মাঠে ঘুরছে ঘূর্ণি। পাদ্রী সাহেবের গীর্জা পেছনে মিলিয়ে গেছে—চিহ্নহীনভাবে মিশে গেছে ফেলে-আসা দিগন্তের বীথিরেখার ভেতরে।

আমি ভাবছিলাম: ব্যাপারটা কী হল? অসাধারণ হওয়ার চেষ্টার ঐকান্তিক ফলস্বরূপই কি তরফদারের এই পরিণতি? এই গ্রামের মধ্যে তিনি একচ্ছত্র এবং একক—

বৃহত্তর পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা না করতে পেরে এই ছোট গণ্ডিটুকুর মধ্যেই তিনি সীমাস্বর্গ রচনা করেছেন ? অথবা একান্ত হতাশ এবং অসহায় হয়ে পিতা যীশুর শান্তিময় ক্রোড়েই সমস্ত উচ্চাশার পরিনির্বাণ খুঁজে পেয়েছেন তিনি ?

একটি শত্রুর কাহিনী

বড় পাদ্রী ডোনাল্ড্‌স বুড়ো হয়ে গেছেন। চুল পেকেছে, দাড়ির রঙ হয়েছে ধবধবে সাদা। আগে তিরিশ মাইল টাট্টু হাঁকাতেও কষ্ট হত না, আজকাল দু পা হাঁটলেই হাঁপিয়ে পড়েন। একবার শহরে গিয়ে সিভিল্ সার্জেনকেও দেখিয়ে এসেছেন। ডাক্তার বলেছেন, ব্লাড্‌প্রেসারের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে, সুতরাং সতর্ক হওয়া দরকার।

সতর্ক হওয়া দরকার তো বটে, কিন্তু সুযোগ কই ? এ দেশটাই যে সৃষ্টিছাড়া। দশ মাইলের ভেতরে রেল লাইনের কোন বালাই নেই। আর শুধু রেল লাইন কেন, পথঘাটের অবস্থাও তথৈবচ। মাইল আষ্টেক দূর দিয়ে জেলাবোর্ডের একটা রাস্তা চলে গেছে; বোধ হয় ইংরেজ শাসনের প্রথম পত্তনের যুগে ওই রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, তারপরে ওর গায়ে কেউ আর হাত দেয়নি। দুপাশ দিয়ে রাস্তা ভেঙে নেমে গেছে, গরুর গাড়ির অনুগ্রহে একেবারে সহস্রদীর্ণ। গরমের সময় চলতে গেলে পায়ে পায়ে হোঁচট লাগে, ধুলোয় একেবারে কোমর অবধি গেরুয়া রঙ ধরে যায়; আর বর্ষাকালে মহাপঙ্ক—হাতীর পা ডুবলে টেনে তুলতে পারে না।

তা ছাড়া মাঠ আর মাঠ। দু-এক ফালি ফসলের ক্ষেত, বাকি সবটাই বন্ধ্যা—অহল্যা পৃথিবীতে লাঙলের আঁচড় পড়ে না—পাষাণ-মূর্তি পড়ে আছে হতচেতন হয়ে। তারই ভেতরে পায়ে পায়ে কতগুলো লিক্‌লিকে পথের রেখা পড়েছে—এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে কি পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মাধ্যাকর্ষণ।

অথচ এই সব পথ ভেঙেই যাতায়াত করতে হবে। ভৌগোলিক শৃঙ্খলার কোনো বালাই নেই এ অঞ্চলে—টুক্‌রো টুক্‌রো এক একটা গ্রামের মধ্যে অসঙ্গত ব্যবধান; সেই ব্যবধানকে আরো দুর্গম করেছে এবড়ো খেবড়ো জমি, টিলা, বিল, জলা, জঙ্গল আর অজস্র বিষাক্ত সাপ।

কিন্তু জ্ঞানের আলোয় অন্তর যার বিভাসিত হয়ে গেছে, এবং এই জ্ঞানের পুণ্য কিরণ বিতরণ করাই যার ব্রত, তার এসবকে কিছুমাত্র পরোয়া করলে চলে না। এতকাল ডোনাল্ড্‌সও করেননি। তখন মুখের চাপদাড়ির রঙ ছিল কুচকুচে কালো; মেরুদণ্ডটা ছিল লোহার ডাণ্ডার মতো, ওজন ছিল দুশো পাউণ্ডের ওপরে, ধৈর্য ছিল অমানুষিক এবং গলার জোর ছিল অসাধারণ। হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন তিনি শুরু করতেন, "এই

যে মহাপ্রলয় আসিল, পৃথিবী জলে ডুবিয়া গেল, ঘন ঘন বজ্র পড়িল ও সর্বনাশ হইল", তখন সে কণ্ঠস্বরে হাটের বিপুল হট্টগোল পর্যন্ত চাপা পড়ে যেত। মুহূর্তে তাঁর চারিদিকে ভিড় জমে উঠত, নগদ এক পয়সা মূল্যে মথি ও লুক লিখিত সুসমাচার কেনবার জন্যে হুড়োহুড়ি লেগে যেত তাঁর ক্রেতাদের ভেতরে।

সে ডোনাল্ড্‌স্ এখন অতীত বস্তু। এই কুড়ি বছরে গরম দেশের গরম বাতাস আর রুক্ষ রাঙা মাটি তাঁর বয়েস চল্লিশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন দু পা হাঁটলেই তাঁর বুক ধড়ফড় করে—হাটে হাটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অবিশ্বাসীদের আলোর রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট করা আর তাঁর সাধ্যায়ত্ত নয়। তা ছাড়া ব্লাড্‌প্রেসারের আতঙ্কটা মনের মধ্যে সারাক্ষণ সজাগ হয়ে আছে, ওই অদৃশ্য শত্রুটির অলক্ষ্য মৃত্যুবাণের কথা ডোনাল্ড্‌স্ কোন মুহূর্তেই ভুলতে পারেন না।

সুতরাং ঘটনাস্থলে হ্যান্‌সের আবির্ভাব হল।

জাতে জার্মান। সোনালি চুল, নিবিড় নীল চোখ; দৈর্ঘ্যটা খাঁটি আর্যজাতির পক্ষেও একটু অতিরিক্ত, তাই খানিকটা কুঁজো বলে মনে হয়, বয়েস তেইশ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে, চঞ্চল, চটপটে, উৎসাহী। দেখলে পাদ্রী বলে ভাবতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় ইউনিভার্সিটি ব্লু, খেলার মাঠ থেকে ধরে এনে পাদ্রী সাজিয়ে তাকে এই অজগর-বিজেবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্ন্যাসীর পোশাকটা তার একটা ছদ্মবেশ মাত্র, যে কোনো মুহূর্তে ওটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পরমানন্দে হো হো করে হেসে উঠতে পারে।

ডোনাল্ড্‌স্ তবু খুশি হলেন। বললেন, ইয়ং ম্যান, তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে বলে মনে হয়।

হ্যান্‌স অসংকোচে জবাব দিলে, আমারও তাই বিশ্বাস।

—তাই নাকি?—ডোনাল্ড্‌স্ হাসলেন: খুশি হলুম। তা ছাখো, এই পেগান আর হিদেনগুলোকে ম্যানেজ করা বড্ড শক্ত ব্যাপার। এই কুড়ি বছর চেষ্টা করেও আমি এগুলোকে মানুষ করতে পারলুম না। এবার তুমি চেষ্টা করো।

—সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভাববেন না—সোৎসাহে হ্যান্‌স উত্তর দিলে।

এতবড় মাঠের ভেতরে বেশির ভাগই মরা জমি। মাটিতে রাশি রাশি কাঁকর। বর্ষায় প্রায় সমস্ত মাঠ ভেসে যায়, দু-চারটে উঁচু ডাঙা আর তাদের কোনো কোনোটার ওপরে আধখানা সিকিখানা গ্রাম কচ্ছপের পিঠের মতো জেগে থাকে। দুর্গম এই খেয়ালী পৃথিবীর বেশির ভাগ বাসিন্দা হচ্ছে তুরী, মুণ্ডা, আর সাঁওতাল। যাযাবরের দল এসে মরা মাটিকে দখল করেছে—গড়েছে ছোট ছোট ক্ষেত খামার আর নগণ্য সব লোকালয়। তাদেরই প্রেমধর্মে দীক্ষিত করবার জন্তে এখানে খৃষ্টান পাদ্রীদের আবির্ভাব।

এই কুড়ি বছরে অবশ্য তাদের সকলেরই অন্ধকার থেকে আলোকে আসা উচিত

ছিল। কিন্তু তা হয়নি। প্রথমত সকলের আত্মা থেকে শয়তানকে তাড়ানো সম্ভব নয়; দ্বিতীয়ত, এই চালচুলোবিহীন লোকগুলোর মতিগতি বোঝা প্রেমময় পিতারও অসাধ্য, আজ এখানে আছে, কাল দল বেঁধে মাদলে ঘা দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে কোথায় কে অদৃশ্য হল কেউ বলতে পারে না; আর তৃতীয়ত, আজকে ব্যাপ্‌টাইজড্‌ হয়ে কালকেই পরমোল্লাসে বোঙার পুজো করতে এদের নীতিজ্ঞান আর্তনাদ করে ওঠে না। তাই কাজের কখনোই বিরাম নেই।

তাছাড়া মরা মাটি বলেই মানুষের স্রোত মরা নয়। সে স্রোত অবিরাম গতিতে বয়ে চলছে। তাই আজ তিনঘর বাসিন্দা বাড়ি ভেঙে উধাও হয়ে গেল তো কালকেই পাঁচঘর নতুন পত্তনি করে বসল। খাজনার লোভে জমিদার হাত বাড়ালে একদিন এরাও হয়ত অদৃশ্য হয়ে যাবে, কিন্তু নতুনের আসবার বিরাম থাকবে না এবং কাজেও ছেদ পড়বে না কোনোদিন। সুতরাং কুড়ি বছর ধরে ডোনাল্ড্‌স্‌ নিত্য নতুন কর্মক্ষেত্র পেয়েছেন তাঁর—মরা জমিতে জীবন্ত মানুষের তরঙ্গ তাঁর চারদিকে প্রত্যেকদিন নতুন করে প্রতিহত হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে এ জলের গায়ে ঘা দেবার মতো, একটুখানি ঢেউ উঠবে বটে, কিন্তু দাগ থাকবে না, এ চেষ্টার কোনো মূল্য নেই। আজ পর্যন্ত পঞ্চাশটির বেশি ছেলেকে আলোকমন্ত্রে দীক্ষিত করে তিনি তাঁদের শহরের ইস্কুলে পাঠাতে পারেননি; কিন্তু মিশনারীর ধৈর্যচ্যুত হতে নেই, অপেক্ষা করো সুফল ফলবেই এ তাঁদের মূলমন্ত্র।

তোমার পতাকা যারে দাও। ডোনাল্ড্‌সের অসমাপ্ত কাজের বোঝা সুতরাং হ্যান্‌স্‌কে ঘাড়ে তুলে নিতে হল। তারপর যথানিয়মে একদিন তেঠেঙে টাট্টুতে আরোহণ করে হ্যান্‌স্‌ বেরুল ধর্মপ্রচার করতে। তার পথপ্রদর্শক হল ভূতপূর্ব ডোঙা সাঁওতাল, বর্তমানে জোসেফ ইম্যানুয়েল এবং লোকের কাছে জোসেফ ডোঙা। অবশ্য ডোঙা নামের লেজুড়টা জোসেফ ইম্যানুয়েলের পছন্দ হয় না এবং পছন্দ হয় না বলেই লোকে তাকে কিছুতেই ওটা ভুলতে দিচ্ছে না। দূর থেকে ছোট ছোট ছেলেপুলেরা ডোঙা সাহেব বলে চিৎকার করে এবং মুহূর্তে ডান-গাল, বাঁ-গালের নীতিবাক্যটা ভুলে গিয়ে জোসেফ তাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। বলা বাহুল্য তাদের ধরতে পারা যায় না এবং রোষ-কষায়িত নেত্রে ফিরে আসতে আসতে জোসেফ ইম্যানুয়েল স্মরণ করতে থাকে: প্রভু, এদের ক্ষমা করিয়ো, কারণ এরা জানে না এরা কী করিতেছে।

তেঠেঙে টাট্টুতে চড়ল হ্যান্‌স্‌ এবং তার সঙ্গে চলল জোসেফ। গন্তব্যস্থল রামগোপালপুরের হাট। শীতের মাঝামাঝি। মাঠের যে অংশটুকুতে ফসল ধরে তা রবিশস্যে আকীর্ণ হয়ে গেছে—সোনালি উজ্জ্বল পুষ্পস্তবকে আলো করে দিয়েছে চারদিক—শীতের রোদের মতোই তার রঙ। সমতল টিলা জমির ভেতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে চলেছে টাট্টু; সে চলা একটানা, থামা আর চলার মাঝামাঝি যে অবস্থাটা, সেই বিলম্বিত লয়ে তার যাত্রা।

সুতরাং সঙ্গে চলতে জোসেফের কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না।

ভারি খুশি মনে পৃথিবীটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল হ্যান্‌স্‌। নতুন জগৎ—নতুন পরিবেশ। শহরে থেকে ভারতবর্ষকে একরকম চেনা যায়, কিন্তু এর রূপ আলাদা! এই ঢেউ খেলানো জমি, এই অবিচ্ছিন্ন নির্জনতা আর ঠাণ্ডা বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ—এর সঙ্গে কোথায় যেন ইউরোপের সমুদ্রের একটা সংযোগ রয়েছে। হ্যান্‌স্‌ আনন্দিত কণ্ঠে বললে, মিস্টার জোসেফ, তোমার দেশটা ভারী চমৎকার।

জোসেফের মনে কাব্য নেই। এদেশের চমৎকারিত্বটাও তাকে যে খুব রোমাঞ্চিত করে তোলে তাও নয়। তবু স্বাভাবিক সৌজন্য রক্ষার জন্য জোসেফ ইংরাজি ভাষায় জবাব দিলে, ইয়াশ্‌।

—ম্যাক্সমুলারের বই পড়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভারী মোহ ছিল আমার এখন দেখছি ঠকিনি।

জোসেফ আবার বললে, ইয়াশ্‌ শার্‌।

কিন্তু কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে জোসেফের কান খাড়া হয়ে উঠেছে, বদলে যাচ্ছে মুখের রঙ। মাঠের ওদিকটাতে যেখানে বিলের জল মরে গিয়ে এক কোমর কাদা আর আধহাত ঘোলা জল থক থক করছে আর যেখানে একদল কালো কালো নেংটিপরা ছেলে জিওল-মাছের সন্ধানে দাপাদাপি করছে, ওখান থেকে একটা সন্দেহজনক শব্দ শোনা যাচ্ছে।

শিকারী কুকুরের মতো উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ালো জোসেফ। হ্যাঁ—কোনো ভুল নেই, এ ব্যাপারে ভুল হতেই পারে না। পরিষ্কার নির্ভুলভাবে চিৎকার উঠছে: ডোঙা ডোঙা, ঠোঙা ঠোঙা—ইঞ্জিরি মিঞ্জিরি!

ঠোঙাটা হচ্ছে ডোঙার সঙ্গে মিলিয়ে কাব্যরচনার প্রয়াস, আর ইঞ্জিরি মিঞ্জিরি ডোঙা সাহেবের ইংরেজি বিদ্যার প্রতি কটাক্ষপাত! মুহূর্তে জোসেফের মুখের পেশীগুলি শক্ত হয়ে গেল, বিড় বিড় করে অশ্রাব্য এবং অখৃষ্টানোচিত গালিগালাজ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

—কী হল মিস্টার জোসেফ?

—নাথিং শার্‌।

—ওরা ওখানে চিৎকার করছে কেন?

—গ্রামের সব ত্যাঁদোড় ছেলে শার্‌। মাছ ধরছে।

—মাছ ধরছে? ওঃ লাভ্‌লি! চলো, মাছ ধরা দেখব।

মনে মনে জোসেফ শিউরে উঠল। তবে একমাত্র ভরসা সাহেবের বাংলা জ্ঞানটা টনটনে নয়, তা ছাড়া ডোঙা শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটা উপলব্ধি করাও সম্ভব নয় তার পক্ষে।

তবু ডোঙা সাহেব শেষ চেষ্টা করলে একবার।

—ও দেখবার কিছু নেই শার্, নোংরা ব্যাপার।

—নোংরা? নোংরা কেন? নেভার মাইণ্ড, চলো।

সাহেবের গোঁ আর বুনো শুয়োরের গোঁ—এদের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই, এতদিনে সে অভিজ্ঞতাটা আয়ত্ত হয়েছে ভোণ্ডা সাহেবের। কিন্তু ওদিক থেকে সমানে সোল্লাস চিৎকার আসছে: ডোঙা ডোঙা, ঠোঙা ঠোঙা—এস্‌পার কিংবা ওস্‌পার। মনটাকে বহু কষ্টে আয়ত্ত করে নিয়ে জোসেফ বললে, চলুন—

কিন্তু ওরা সেদিকে এগোতেই ছেলের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করে দিলে।

—কী ব্যাপার জোসেফ, ওরা পালালো কেন?

—জানি না শার্।

—বোধ হয় ভয় পেয়েছে, তাই নয়?

—ইয়াশ্‌ শার্।

—কিন্তু কেন? আমরা বাঘ না ভালুক? ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রচার করতে হলে আগে তো ওদের ভয় ভাঙানোটা দরকার—কী বলো?

জোসেফ বললে, সে পরে হবে শার্। এখন চলুন, নইলে হাটে পৌঁছুতে বেলা ডুবে যাবে।

—নেভার মাইণ্ড।—বলেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল হ্যান্‌স্। বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে পড়ল তেঠেঙে টাট্টু থেকে, তারপর ছেলের পালকে লক্ষ্য করে ঊর্ধ্বশ্বাসে মাঠের ভেতরে ছুটতে শুরু করে দিল।

—ও কি হচ্ছে শার্!

কিন্তু জবাব দেবার সময় নেই হ্যান্‌সের। ততক্ষণে সে প্রাণপণে ছুটেছে মাঠের ভেতর দিয়ে। ছেলেরা পরিত্রাহী চিৎকার করে পালাবার চেষ্টা করছে এদিক ওদিক আর হ্যান্‌স্ তাদের অনুসরণ করছে। টাট্টুর লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে অভিভূতভাবে জোসেফ ঘটনাটা লক্ষ্য করতে লাগল।

পাঁচ হাত লম্বা মানুষ, সেই অনুপাতে লম্বা লম্বা তার ঠ্যাং; তা ছাড়া লাইপজীগ ইউনিভার্সিটির ব্লু, দৌড়ে তাকে হারানো অসম্ভব। সুতরাং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাহেব দু'হাতে দুটো ছেলেকে ধরে ফেলল। ছেলে দুটো আর্তনাদ করে উঠল।

সান্ত্বনা দিয়ে হ্যান্‌স্ বলল, ভয় পাচ্ছ কেন? আমি শ্বেত জাতি—ইউরোপ হইতে আসিয়াছি। আমি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে আসি নাই, নরমাংস খাই না।

ছেলে দুটো কথাটা বুঝতে পারল না, কিন্তু চোখের ভাষা বুঝতে পারল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বদলে গেল সমস্ত। দেখতে দেখতে ছেলেরা এসে হ্যান্‌সের চারিদিকে জড়ো হয়ে গেল।

নিজের চোখকে কি বিশ্বাস করতে পারে জোসেফ? বিশ্বাস না করার অবস্থাই বটে। এ দেশের লোকের সঙ্গে মেশাটা মিশনারীদের কাছে নতুন কথা নয়, বরং তাদের পক্ষে সেটা যথেষ্ট স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। তাই বলে এতটার জন্যে কেউই প্রস্তুত থাকতে পারে না, জোসেফও নয়।

গায়ের সাদা সারপ্লিস্‌টা খুলে ফেলেছে হ্যান্‌স্‌, খুলেছে জুতো মোজা। তারপর পায়-জামাটাকে হাঁটু অবধি গুটিয়ে দিয়ে ছেলেদের সঙ্গে পরমোল্লাসে সেই এককোমর কাদায় মাছ ধরতে নেমে পড়েছে। পোশাকের অবস্থা তার অবর্ণনীয়, সর্বাঙ্গে কাদার ছিটে—এমন কি গালে মুখে পর্যন্ত ছোপ লেগেছে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই হ্যান্‌সের—একটা সৃষ্টি-ছাড়া আনন্দে সে মশগুল হয়ে গেছে।

টাট্টু ঘোড়ার লাগাম ধরে ডোঙা সাহেব কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; একটা রেভারেণ্ড ফাদারের এই ব্যবহার! এমন করলে কি সম্মান থাকবে না লোকেই কদর করতে চাইবে! মুড়ি মিছরি রামাশ্যামার সঙ্গে সাহেব যে একদর হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত!

সাহেব যখন উঠে এল মাঠের ওপর দিয়ে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। পেছনে ছেলের দল চিৎকার করছে, ও সাহেব, কাল আসবে তো?

সাহেব সোৎসাহে সাড়া দিয়ে বললে, হাঁ, আসিব।

এতক্ষণ পরে গম্ভীর থমথমে গলায় কথা বললে জোসেফ: সন্ধ্যা হয়ে গেল—আজ আর যাওয়া যাবে না।

—আমি বাস্তবিক ভারী দুঃখিত—লজ্জিত স্বরে হ্যান্‌স্‌ জবাব দিলে, লোভ সামলাতে পারলাম না। ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় কাদার ভেতরে বল নিয়ে আমরাও রাগবী খেলেছি। তারপর বিশপদের কাছে গিয়েই ওসব ছেড়ে দিতে হল। কিন্তু ওদের দেখে আমার পুরোনো দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেল—

—ইয়াশ্‌ শার্‌—তেমনি জলদগম্ভীর গলায় জোসেফ বললে, এবার ঘোড়ায় উঠুন, রাত হয়ে গেল। মাঠের রাস্তাঘাট বড় খারাপ, ভয়ংকর সাপের ভয়।

—সাপ? ওঃ—লাভ্‌লি! আই অ্যাম ভেরি ফণ্ড্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়ান স্নেক্‌স—

মনে মনে দাঁত খিঁচিয়ে মাতৃভাষা সাঁওতালীতে বিড়বিড় করে ডোঙা সাহেব বললে, এবার কামড়ালেই বুঝতে পারবে।

জোসেফের মুখে সব শুনে ডোনাল্ড্‌স একটু হাসলেন মাত্র।

—এখনো বয়েস অল্প, তাই—

—ইয়াশ্‌ শার্‌, কিন্তু আপনি বুঝছেন না—এরা সব ছোটলোক, ব্ল্যাক্‌ প্যাগান্‌—

ডোনাল্ডের হাসিটা আরো একটু বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল, অপাঙ্গ দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল জোসেফের ওপরে; ট্যান করা চামড়ার ওপরে ঘোর কালো রঙের বার্নিশ লাগানো, পুরু

পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ানো নিগ্রয়েড্ চুল। মোটা আর আড়ষ্ট জিভে অশুদ্ধ ইংরিজি উচ্চারণ। তবু দু বছরের মধ্যেই কী প্রচণ্ড উন্নতি হয়েছে জোসেফের। 'ব্ল্যাক্ প্যাগান্'দের সঙ্গে তার নিজের সীমারেখাটা একান্ত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, ঘৃণা করতে শিখেছে ছোটলোকদের। ক্রিশ্চিয়ানিটির মহিমা আছে—বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে বিষয়ে।

—আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলব এখন।

—ইয়াশ্ শার্। উনি তো নতুন লোক, কিছুই জানেন না—

—আচ্ছা।

জোসেফ চলে গেল, ডোনাল্ড্স চুপ করে বসে রইলেন। হ্যান্সের উদ্দামতা তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে তোলেনি, চিন্তিতও না। মনের দিক থেকে একটা বিচিত্র প্রশান্তির মধ্যে তলিয়ে গেছেন ডোনাল্ড্স। এক-একটা শান্ত সন্ধ্যায় বসে বাইবেল পড়তে পড়তে এই শূন্য দিগন্তবিসারী মাঠটা তাঁর মনকে আশ্চর্যভাবে আবিষ্ট করে তোলে। আবছায়া অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তটা, উঁচু উঁচু টিলা, এলোমেলো জঙ্গল নিরবয়ব হয়ে আসছে ক্রমশ, তার ভেতরে চোখে পড়ছে দূরে কতগুলি অস্পষ্ট মূর্তি—দেহাতী মানুষগুলো দিনান্তে তাদের ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

তখনি মনে হয়। মনে হয় : এমনি অস্পষ্ট অন্ধকারের ভেতর দিয়ে, এমন সংশয়বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছেন মানবপুত্র। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে আরো তেরোজন শিষ্য, তাদের একজন জুডাস্ ইস্ক্যারিয়ট। সঙ্গে তাঁদের অস্ত্র নেই, জয়বাদ্য নেই। চারদিকে অন্ধকারে ইহুদীদের কুটিল হিংসা সরীসৃপের মতো তাঁকে ছোবল মারবার সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু সত্যের আলো তাঁর মন থেকে মুছে নিয়েছে সমস্ত সংশয়, নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ভয়ের অণুতম বিন্দুটুকুকেও। তিনি এগিয়ে চলেছেন, মাথার ওপরে তাঁকে পথ দেখাচ্ছে বেথেলহেমের শিয়রে জাগ্রত সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি।

ডোনাল্ডসের মনে হয় এ প্রচার অর্থহীন, এই উপদেশের ঝুলি কাঁধে বয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর সত্য মূল্য নেই কণামাত্র। এই মন্ত্র যিনি প্রচার করেছিলেন তুরী ভেরী পটহ তাঁর ছিল না, পাদ্রীর দল ছিল না। তাঁর অন্তরের মধ্যে যে সূর্য উঠেছিল, তার কিরণ আপনা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল ; তাঁর কণ্টকজর্জরিত দেহের প্রতিটি রক্তকণা ঘোষণা করেছিল তাঁর বাণী। আজ এই অন্ধকারে এই যে ছায়ামূর্তি মানুষেরা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছে একদিন নিজের প্রয়োজনেই ঐ দরিদ্র—ওই নির্বাকের মধ্যে তাঁর পুনরুত্থান ঘটবে। এই অজ্ঞাত অনাদৃত গ্রামগুলির মধ্যে কোন্‌টি যে নতুন কালের বেথেলহেম সে কথা কে বলতে পারে। যিনি আসবার নিজের প্রয়োজনেই তিনি আসবেন, অনর্থক কেন আর—

কিন্তু সৌভাগ্য এই যে মনোভাবটা তাঁর দীর্ঘস্থায়ী হয় না। নিজেকে মধ্যে মধ্যে

প্রবলভাবে ধমকে দেন্ ডোনাল্ড্স। এ অন্যায়, এমন ভাবে চিন্তা করাটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। ভারতবর্ষের জলমাটি তাঁর রক্তের মধ্যেও দুর্বলতা প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে নাকি? নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে, নিরুৎসাহ আর অদৃষ্টবাদী করে দিচ্ছে এ দেশের ইন্‌ফিডেলদের মতো? চুপ করে বসে থাকলে চলবে না, তাঁরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে না রাখলে ঈশ্বরপুত্রের রিসারেক্‌সন হবে কেমন করে, কেমন করে সার্থক হবে মিলেনিয়ামের ভবিষ্যৎ বাণী?

—শুভ সন্ধ্যা, ফাদার।

—শুভ সন্ধ্যা—মুখ ফিরিয়ে ডোনাল্ড্স তাকালেন: এসো, বোসো।

হ্যান্‌স্ এসে নিঃশব্দে পাশের চেয়ারটাতে বসল।

—কেমন লাগছে এখানে?

—চমৎকার। এ একটা আশ্চর্য দেশ।

—প্রথম প্রথম তাই মনে হবে—ডোনাল্ড্স স্নিগ্ধভাবে বললেন: কিন্তু তারপরেই মত বদলে যাবে তোমার।

—আমার তা মনে হয় না—জোরের সঙ্গে জবাব এল।

—বেশ, তাহলেই ভালো। ডোনাল্ড্স আর কথা বাড়ালেন না, বললেন, বিস্তর কাজ আছে, এতদিনে আমরা বিশেষ কিছুই করতে পারিনি। তোমাকে ভালো করে এর দায়িত্ব নিতে হবে।

—তা নেব, কিন্তু—হ্যান্‌স্ হঠাৎ থেমে গেল।

—কী বলছিলে?

—মাপ করবেন ফাদার, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল।

—কী কথা?

—জবাব দেবার আগে খানিকক্ষণ কী ভাবলে হ্যান্‌স্। অন্যমনস্ক ভাবে কামড়াতে লাগল বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা।

—এর কি সত্যিই কোনো দরকার আছে?

—কিসের?

—এই প্রিচিংয়ের?

ডোনাল্ডসের দৃষ্টি শঙ্কিত হয়ে উঠল।

—হঠাৎ এ কথা বলছ কেন?

—আমার মনে হয়—একটু থেমেই হ্যান্‌স্ বলে চলল—আমার মনে হয়, আমরা চেষ্টা করে কারুকে ভালো করতে পারি না। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে ভালো হতে পারে, আর সেইটেই সব চাইতে ভালো।

তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু চোখ হ্যান্‌সের মুখের ওপর ফেলে ডোনাল্ড্স বললেন, তোমার কথাটা

বুঝতে পারছি না।

—আমি বলছিলাম—হ্যান্‌স্ আবার আঙুলটা কামড়ে নিলে : জোসেফ ইম্যানুয়েলের মতো কতকগুলো জীব তৈরি করে ক্রিশ্চিয়ানিটির মর্যাদা বাড়ানো যায় না। ওরা যেমন আছে তেম্‌নি থাকলেই ওদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ পাবে।

—এসব কী বলছ তুমি!—ডোনাল্ড্‌স আর্তনাদ করে উঠলেন : এই তো আমাদের কাজ! অন্ধকারের মানুষকে আলোর পথ তো আমাদেরই দেখাতে হবে। তুমি কি বলতে চাও এই পৌত্তলিক হিদেনগুলো চিরকাল শয়তানের শিকার হয়ে থাকুক?

—ঠিক বুঝতে পারছি না—

আলোচনাটায় আকস্মিক একটা ছেদ টেনে দিয়ে হ্যান্‌স উঠে দাঁড়ালো। কোথায় যেন অনিশ্চিত একটা অস্থিরতা পীড়ন করছে তাকে। তারপর সোজা সম্মুখের প্রায়ান্ধকার মাঠটার ভেতরে সে গিয়ে পায়চারি করতে লাগল।

পাকা ভ্রূ জোড়াকে একটা সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের মতো একত্র করে ডোনাল্ড্‌স তাকিয়ে রইল। নতুন এ পথে এসেছে, এখনো ফিলানথ্ফি আছেই খানিকটা। কিন্তু ডোনাল্ড্‌স হাসলেন : বেশিদিন এসব থাকবে না। আস্তে আস্তে রোমান্স কেটে যাবে—যেমন করে ডোনাল্ড্‌সেরও একদিন কেটেছিল।

কিন্তু জার্মান জাতির রক্তে কোথায় উদ্দামতা আছে একটা, নিহিত আছে একটা উন্মাদ প্রাণচাঞ্চল্য। ইংরেজের মতো রক্ষণশীলতার স্থিরবিন্দুর চারপাশে সে আবর্তিত হয় না। হয়তো এটা ভালো, হয়তো এটা পরিপূর্ণ জীবনের লক্ষণ। কিন্তু আঁদাড়ে পাঁদাড়ে জীবের কল্যাণের জন্য যাকে গলা ফাটিয়ে বাইবেল আওড়াতে হবে আর বুক অব জন ব্যাখ্যা করতে হবে, তার পক্ষে এটা শুধু অসুবিধাজনক নয়, রীতিমত বিপজ্জনকও বটে।

সুতরাং ডোনাল্ড্‌স প্রচণ্ড একটা অশান্তি বোধ করতে লাগলেন।

ঘটনা যতটুকু তার বিবরণী ছত্রিশগুণ লম্বাচওড়া হয়ে এসে পৌঁছুতে লাগল ডোনাল্ড্‌সের কানে। সব চাইতে যে বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠল সে জোসেফ ইম্যানুয়েল। তার মনে হতে লাগল এই নতুন পাদ্রীটির আবির্ভাবে ক্রিশ্চিয়ানিটির মহিমা বিপন্ন হয়ে উঠছে।

হাটে হাটে প্রচার করতে যাওয়া হয় বটে, কিন্তু যা হয় তাকে প্রচার বলা চলে না। তেঠেঙে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে হ্যান্‌স হয়তো খাবারের দোকানে তেলেভাজা জিলিপি খেতে বসে যায়। খুশি হয়ে বলে, হাউ নাইস্ দিজ্ ইণ্ডিয়ান্ সুইট্‌স!

কিংবা হয়তো কারো হাত থেকে থাবা দিয়ে তুলে নেয় হুঁকোটা। কড়া দা-কাটা তামাকে একটা টান দিয়ে খক্ খক্ করে কাশতে শুরু করে, রাঙা হয়ে ওঠে চোখ মুখ। তারপর হুঁকো ফিরিয়ে দিয়ে বলে, একটু কড়া। তা হোক, ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো ভার্জি-

নিয়ার চাইতেও ভালো।

ওদিকে নিজের আভিজাত্য বজায় রেখে দূরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ডোঙা সাহেব, দাঁড়িয়ে থাকে দাঁতে দাঁত চেপে। একটা প্রচণ্ড হিংস্রতায় শরীরের ভেতরে যেন জ্বলে যায় তার। এ কী হচ্ছে—এর নাম প্রচার! রাজার জাতির সগৌরব অধিকার এতকাল তারা ভোগ করে আসছিল, হ্যান্‌স্ যেন সে অধিকারের অমর্যাদা করছে, এতকালের সম্মানটাকে টেনে নামিয়ে দিচ্ছে পথের নোংরা ধুলোতে। এ বাড়াবাড়ি, এতটা কিছুতেই সহ্য করা যাবে না।

কিন্তু লাভ নেই—বলে কোন ফল হবে না। ইণ্ডিয়ান বলে নিজের পরিচয়টাকে ডোঙা সাহেব ভুলে যেতে চায়; তার কাছে এ পরিচয় চরম অগৌরবের, পরম লজ্জার। কিন্তু কী আশ্চর্য—সেই ইণ্ডিয়ার প্রতি একটা অহেতুক প্রীতি আর অনুরাগ জেগে উঠেছে এই সাদা সাহেবের মনে। এই হতভাগা দেশ—এই উঁচুনিচু টিলা জমি, এখানকার অশিক্ষিত বর্বর মানুষ, এই ভারতবর্ষকে সে ভালবেসে ফেলেছে। মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ একেই বলে!

ডোনাল্ড্‌সের কাছে নালিশ করে ফল হয়নি। বুড়ো পাদ্রীও যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছেন। বেশি কথা বলেন না, শুধু আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন। তারপর শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেন, এখনো ছেলেমানুষ, পরে ঠিক হয়ে যাবে।

অভ্যস্ত নিয়মে পুরু পুরু ঠোঁট দুটো আলোড়িত করে একটা বিচিত্র প্রতিধ্বনি করে জোসেফ: ইয়াশ্‌ শার্, আর মনে মনে মাতৃভাষায় বলে, তোমার মুণ্ডু হবে।

স্বগতোক্তিটা কখনো কখনো একটু সরব হয়ে ওঠে। কানের ওপর একটা হাত দিয়ে বুড়ো ডোনাল্ড্‌স জিজ্ঞাসা করেন, বেগ ইয়োর পার্ডন?

—নাথিং শার্—

কিন্তু মানুষের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে।

দিব্যি নিরিবিলি পথ, বকুল গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঢাকা। নিজের মনেই একটা প্রার্থনা স্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে নিষ্ঠাবান খৃষ্টানের মতো পথ চলেছে জোসেফ আর মাঝে মাঝে বিরক্ত আড়চোখে পায়ের ঝকঝকে পালিশ করা জুতোটার দিকে তাকাচ্ছে, দেখছে কেমন করে নোংরা ইণ্ডিয়ার ধুলোতে তার জুতোটা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। নাঃ—এদেশে আর নয়। বড় পাদ্রীর তোয়াজ করে যে ভাবেই হোক এবার তার মাতৃভূমি ইয়োরোপে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে ফেলতেই হবে। ভারতবর্ষ তার সুকোমল পরিচ্ছন্ন সভ্যতাকে আহত আর মলিন করে তুলছে।

—ডোঙা ডোঙা, ঠোঙা ঠোঙা—

যেন আকাশবাণী! কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা ঘটল বোধ হয় এক সেকেণ্ডের একশো ভাগের এক ভাগের মধ্যে। মুখ থেকে উপে গেল হোলি বাইবেল, সমস্ত শরীরটা শক্ত করে

দাঁড়িয়ে গেল জোসেফ সাহেব। দু'হাতের রগগুলো কোনো অদৃশ্য শত্রুকে আঘাত করবার জন্যে একেবারে টান টান হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু কোথায় কে! নির্জন নিরিবিলি পথ, জনমানুষের চিহ্নও নেই কোনোখানে। তবে কি এ ভৌতিক ব্যাপার নাকি?

—ডোঙা ডোঙা, ঠোঙা ঠোঙা—

তারপরেই কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার! আরে, শুধু ঘাস খেয়েই তো ডোঙা সাঁওতাল জোসেফ সাহেব হয়নি। ঘটে কিছু কিছু বুদ্ধিও সে রাখে বইকি! দৃষ্টিটা ঠিক চলে গেল ওপরের দিকে। হ্যাঁ যা ভেবেছে, ঠিক তাই। গাছের মাথায় একদল কালো কালো ছেলে—একদল ডার্টি প্যাগান!

—ন্যাস্টি ইম্প্স্ (Nasty Imps)!

ডান-গাল বাঁ-গালের সারগর্ভ তত্ত্ব ব্যাখ্যাটা ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল জোসেফ ইমানুয়েলের রাজকীয় আভিজাত্য বোধটা। আদি এবং অকৃত্রিম ডোঙা সাঁওতাল জেগে উঠল, পায়ের জুতোটা খুলে ফেলে তড়াক করে গাছে উঠে পড়ল সে।

কিন্তু ছেলেরা অনেক বেশি চালাক। চক্ষের পলকে ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে পড়েছে গাছ থেকে। তারপর ইমানুয়েল তাদের তাড়া করবার আগেই মাঠের মধ্য দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। দিগন্ত থেকে একটা রেশ তখনো পাওয়া যাচ্ছে: ইস্তিরি—মিস্তিরি—

খানিকটা এলোপাথাড়ি দৌড়ে জোসেফ ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। আর ফিরে এসে দেখল এই ফাঁকে গাছের তলা থেকে তার জুতোজোড়া বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে!

—উঃ ডেভিল্স্ চিলড্রেন—

রাগে ফুলতে ফুলতে খালি পায়ে খানিকটা এগিয়েছে জোসেফ, এমন সময় চমকে উঠল একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে। একটু দূরেই রাস্তার পাশে কোমরে হাত দিয়ে ছোট পাদ্রী হ্যান্স্ দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে হাসির একটা মৃদু রেখা, চোখে কৌতুক পিট পিট করছে।

—কী ব্যাপার, অমন করে ছুটছিলে কেন?

একটা কুটিল সন্দেহে জোসেফের মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। হ্যান্সের চোখে মুখে কিসের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তারও কিছু যোগা-যোগ আছে নাকি! অসম্ভব নয়।

তবু অভ্যস্ত স্বর বেরুল: ইয়াশ্ শার—নাথিং শার্।

—আমার বড় ভালো লাগল। ইয়োর রানিং ইজ ভেরী ইন্টারেস্টিং মিস্টার ঠোঙা!

ঠোঙা! তা হলে সন্দেহের আর অবকাশ নেই। সঙ্গে সঙ্গে খুন চড়ে গেল জোসেফের মাথায়, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটোতে ঝকমক করে উঠল নরহত্যার অনুপ্রেরণা। কিন্তু এক

মুহূর্তের জন্যেই। তারপর কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে সে সোজা হন্‌হন্‌ করে হেঁটে চলে গেল।

দিনের পর দিন এমন অবস্থা দাঁড়াতে লাগল যে শান্ত নির্বিরোধ বুড়ো পাদ্রীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

তা ছাড়া একথা সত্যি যে কাজ কিছুই হচ্ছে না। শুধু জোসেফের মুখে নয়, নানা ভাবেই ডোনাল্ড্‌স খবর পাচ্ছিলেন যে এই খামখেয়ালী জার্মান ছেলেটা বড্ড বেশি বাড়িয়ে তুলছে। আজকাল জোর করে ঠেলে-ঠুলেও তাকে প্রচারে পাঠানো যায় না, তাই মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে বুড়ো ডোনাল্ড্‌সকেই বেরুতে হচ্ছে। আবার বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে তেমনি করে চ্যাঁচাতে হচ্ছে: "আইস, তোমরা আলোকে আইস। আমরা মেষের দল, মেষপালক স্বর্গীয় পিতা আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন"। কিন্তু ভাঙা গলায় ধর্মপ্রচারটা তেমন জমে ওঠে না, ডোনাল্ড্‌স বেশ বুঝতে পারেন এ নিতান্তই পণ্ডশ্রম হচ্ছে।

সুতরাং ডোনাল্ড্‌সের মেজাজ বিগড়ে গেছে। কোনো কাজই যদি না হবে তা হলে এ ছোকরাকে এখানে আমদানি করা কেন? দু'দণ্ড যে ঘরে বসে থাকবে তাও নয়। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোরে কে জানে। এর বাড়িতে তামাক খায় ওর বাড়িতে মুড়ি চিবোয়, ছেলেদের সঙ্গে ভিড়ে জলায় নেমে সর্বাঙ্গে কাদা মাখামাখি করে। তারপর সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে বলে, ইণ্ডিয়া ইজ এ বিউটি। আই লাইক ইণ্ডিয়া—আই লাভ ইণ্ডিয়া।

পাদ্রীরা বিশ্বপ্রেমিক বটে, কিন্তু এতটা বিশ্বপ্রেম হজম করা তাদের পক্ষেও শক্ত!

সেদিন সন্ধ্যার দিকে একটু জ্বর এসেছিল ডোনাল্ড্‌সের। ভারতবর্ষে প্রেমের ধর্ম প্রচার করতে এসে এইটি নগদ লাভ হয়েছে—এই ম্যালেরিয়া। বিস্তর কুইনাইন, বহু ইন্‌জেকসন কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মাঝে মাঝে জ্বর আসে। কপালের শিরাগুলো দপ দপ করতে থাকে, মাথার ভেতর অনুভব করা যায় রক্তের একটা অশান্ত চাঞ্চল্য। আর শান্ত নিরীহ বুড়ো পাদ্রীর মেজাজের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে একটা। বিশ্রী খিট্‌খিটে—ভারতবর্ষের প্রতি অমানুষিক একটা ঘৃণা যেন সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দেয়। স্বপ্নের মতো মনে পড়ে ইংলিশ চ্যানেলের নীল জল, চক হিল, মর্মরিত পপলারবীথি, স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল ইংল্যাণ্ড। মনে হয় এ নির্বাসন—একটা অসহ্য অনিচ্ছাকৃত নির্বাসন। আর এর জন্যে দায়ী এই ইণ্ডিয়ানেরা—এই ডার্টি আইডোলেটারের দল।

ডেকচেয়ারে একটা রেজাই দিয়ে পা পর্যন্ত ঢেকে ডোনাল্ড্‌স চুপ করে শুয়ে ছিলেন। পাশেই বসে ছিল জোসেফ ইমানুয়েল। তার কালো মুখ আজ আলকাতরার চাইতেও কালো।

অর্থাৎ নতুন একটা কবিতা শ্রুতিগোচর হয়েছে। প্রাদেশিক ভাষাটা সংশোধন করলে

মোটামুটি সেটা দাঁড়ায় এই রকম :

বুড়ো পাদ্রী নেহাৎ পাগল,
ঠোঙ্গা সাহেব আদত ছাগল।

ছড়াটা শুনে ডোনাল্ড্স বললেন, হুঁ !

জোসেফ বললে, আপনাকে অনেকবার বলেছি শার্, সব ওই ছোট সাহেবের দোষ। ওঁরই জন্যে লোকগুলো এতটা প্রশ্রয় পেয়েছে। ঘরের লোকই যদি এ ভাবে শত্রু হয়ে ওঠে শার্, তা হলে এসব বৃথা চেষ্টা করে আর লাভ কি ? সোজা জেরুজালেমেই চলে যাওয়া ভালো।

ডোনাল্ড্স আবার বললেন, হুঁ !

নিঃশব্দে সময় কাটতে লাগল। হঠাৎ বাতাস-থেমে-যাওয়া উষ্ণতার মতো একটা চাপা গরম যেন চারিদিকে আবর্তিত হতে লাগল। ডোনাল্ড্সের মনের কাছে ইংলিশ-চ্যানেলের সফেন-কাকলি বার বার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ইণ্ডিয়ার মশার অভিশপ্ত গুঞ্জনে। আর জোসেফের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা প্রবল বিরক্তিতে জ্বলে যেতে লাগলেন ডোনাল্ড্স, ইচ্ছে করতে লাগল একটা নোংরা কুকুরের মতো এই নিগারটাকে এক লাথি দিয়ে দূরে ছিটকে ফেলে দেন তিনি।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। সামনের রাস্তায় শোনা গেল দ্রুত জুতোর আওয়াজ আর পুলকিত শিসের শব্দ। হ্যান্স্ ফিরে আসছে। জোসেফ একটু নড়েচড়ে স্থির হয়ে বসল।

আনন্দোচ্ছল স্বরে হ্যান্স্ বললে, কী হয়েছে ফাদার, সব এমন চুপচাপ কেন ?

কারো কোনো সাড়া এল না।

হ্যান্স্ বললে, দেখুন ফাদার, কী চমৎকার একটা মুরগি এনেছি। ইণ্ডিয়ান হেন্স আর লাভলি।—

হ্যান্সের হাতের মুরগিটার দিকে তাকালেন ডোনাল্ড্স : কোথায় পেলে ওটা ?

—ওরা কী যেন পুজো করছিল, তারই বলি। আমাকে এটা প্রেজেণ্ট্ করলে। রিয়্যালি—আই লাভ—

—ড্যাম্ড্ আইডোলেটারী !—সমস্ত সংযমের মুখোশ হারিয়ে কদর্যভাবে গর্জে উঠলেন ডোনাল্ড্স : হ্যান্স্, আমি খুব দুঃখিত। তোমার আর এখানে থাকবার দরকার নেই, কালই তুমি এখান থেকে চলে যাবে।

দু চোখ বিস্ফারিত করে হ্যান্স্ বললে, ব্যাপার কী ?

—কিছু না।—তিক্ত তীব্র স্বরে ডোনাল্ড্স বললেন, চার্চ তোমার জন্যে নয়। ইউ ট্রাই ইয়োরসেল্ফ এল্সহোয়্যার।

জোসেফ নিশ্চিন্তে বসে বসে হাঁটু দোলাচ্ছে—যেন অনাসক্ত কোনো তৃতীয় পক্ষ।

তার দিকে একটা বক্রদৃষ্টি ফেলে হ্যান্‌স্ বললে, বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয়ই এই ডোঙা চ্যাপ্—

ডোঙা চ্যাপ্! সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াটা ঘটে গেল জোসেফের শরীরে। তীরের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সে : আই ওয়ার্ন ইউ শার্—আই অ্যাম নো ডোঙা!

শব্দ করে হ্যান্‌স্ হেসে উঠল—তার গভীর স্বচ্ছ হাসি লহরে লহরে মুখরিত করে তুলল তরল অন্ধকারকে।

—নিশ্চয় ডোঙা! শুধু ডোঙা নয়, ঠোঙা ঠোঙা—

পরের ঘটনাটা ঘটল চক্ষের পলক ফেলবার আগেই। বুনো একটা রক্তলোলুপ জানোয়ারের মতো ভয়াবহ হুঙ্কার করে জোসেফ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল হ্যান্‌সের ওপরে। কিন্তু লাইপ্‌জীগ্ ইউনিভার্সিটির ব্লু সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক একটা সরীসৃপের মতো পিছলে বেরিয়ে গেল; তারপর পুরু একতাল লোহার মতো প্রচণ্ড একটা স্ট্রেইট কাটের আঘাত এসে নামল জোসেফের চোয়ালে। ঠিকরে একটা দেওয়ালে গিয়ে লাগল জোসেফ, সেখান থেকে কুমড়োর মতো ধপাৎ করে পড়ল মাটিতে।

ক্রোধে, জ্বরের উত্তেজনায় যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ডোনাল্ড্‌স। অমানুষিক কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন, বেরিয়ে যাও এখান থেকে—ইউ বোথ! এটা চার্চ—গুণ্ডামির জায়গা নয়।

—সত্যিই চলে যাবো ফাদার?

—হ্যাঁ—এই মুহূর্তে। ক্রিশ্চিয়ানিটি ডিস্‌ওনস্ ইউ। বেরিয়ে যাও—

নিজের চিৎকারে নিজের মাথাটা বোঁ করে পাক খেয়ে গেল ডোনাল্ড্‌সের। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বসে পড়লেন চেয়ারে—শিরাগুলোতে ব্লাড-প্রেসারের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটে উঠছে তাঁর। অনেকক্ষণ পরে যখন চোখ তুলে তাকাবার মতো স্বাভাবিক অবস্থাটা ফিরে এল, তখন দেখলেন পায়ের কাছে পোষা কুকুরের মতো বসে আছে জোফেস; পুরু ঠোঁট ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে তার, আর সেই রক্তাক্ত মুখে একটা বিগলিত হাসির রেখা! এ অবস্থায় হাসা শুধু ইণ্ডিয়ানের পক্ষেই সম্ভব!

কিন্তু হ্যান্‌স্? তার চিহ্নমাত্রও নেই। শুধু অভিশপ্ত ভারতবর্ষের বুকের ওপরে খাঁ-খাঁ করছে অমাবস্যা রাত্রির নিকষ অন্ধকার। সে অন্ধকারে এতটুকুও দৃষ্টি চলে না!

* * *

ছ'মাস পরে—পনেরো মাইল দূরের হাটখোলায়।

ঝুরি-নামা বুড়ো বটগাছের তলায় লোকে লোকারণ্য। ঢোল আর কাঁসরের শব্দে কান পাতা যাচ্ছে না। শিবের গাজন চলছে ওখানে।

"বুঢ়া শিবের নাচ নাগিলে
নাচ নাগিলে ভোলানাথের—"

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে চলছে ভোলানাথের নৃত্য। মাথায় লাল চুলের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে পাকানো পাটের জটা। রঙ দিয়ে আঁকা বাঘছাল শিবের শরীরে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ শিবের আনন্দ-নৃত্যের তালে তালে পরমোল্লাসে ঢোল আর কাঁসর সঙ্গিত রক্ষা করে চলেছে।

"প্যাটেতে ভাত নাই, ও শিব,
গোলাতে নাই ধান,
কী দিয়া বাঁচাব ও শিব
ছেল্যা পিল্যার জান।
ও বুঢ়া শিব, দয়া করো—"

নাচতে নাচতে শিবের চোখে জল এল। পেটে ভাত নেই, গোলায় ধান নেই। একবিন্দু অতিরঞ্জন নেই এর ভেতরে—এই ছ'মাসেই নিজের চোখেই সে তা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে। ভারতবর্ষকে দেখতে চেয়েছিল সে—জানতে চেয়েছিল। কিন্তু যা দেখলে তা না দেখলেই ভালো হত। শিব ভাবতে লাগল। এই অভাব—এই রিক্ততার সঙ্গে কোথায় যেন যোগ আছে বুড়ো পাদ্রী ডোনাল্ড্‌সের আর যোগ আছে পবিত্র ক্রিশ্চিয়ানিটির। সে যোগসূত্রের রেখাটা ক্ষীণ, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া—

—ও শিব, নাচের তাল কাটল যে!

অপ্রতিভ হয়ে শিব আবার নাচতে শুরু করল। কিন্তু কানের কাছে ক্রমাগত গুনগুন করছে 'প্যাটেতে ভাত নাই, গোলাতে নাই ধান।' ভারতবর্ষকে দেখতে না চাওয়াই ভালো। প্রেমধর্মের দোহাই দিয়ে বিবেককে নিষ্কণ্টক করা সহজ; আর সহজ মনুষ্যত্বকে অন্ধ করে রাখা—

আচমকা শিবের ঘোর ভেঙে গেল। বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে, উঠেছে একটা ভয়ার্ত কলরব। আর ডোঙা সাহেবের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে: এই যে শার্—কাণ্ডটা একবার দেখুন! লোকটা নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছে! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—

জোফেসের দৃষ্টি অন্ধকারেও ভুল করেনি। এদিককার অন্ধিসন্ধি তার চাইতে ভালো করে আর কে জানে। তাই খোঁজ করে করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর তাঁর ফৌজকে সে এখানে এনে ফেলেছে।

শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের মুখ ক্রোধে আর বিরক্তিতে বিবর্ণ হয়ে উঠল। পেছনেই পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ডোনাল্ড্‌স, ম্যাজিস্ট্রেট তার দিকে একবার তাকালেন।

ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ডোনাল্ড্‌স—শব্দ করে থুথু ফেললেন মাটিতে। স্বগতোক্তির মতো শোনা গেল: ইনফিডেল! এ নিউ জুডাস টু ক্রিশ্চিয়ানিটি!

—ইন্‌ফিডেল—জুডাস !—ম্যাজিস্ট্রেটও প্রতিধ্বনি করলেন। তারপর শিবের বুকের ওপরে বাগিয়ে ধরলেন রিভলবারের একট কালো নল : তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল।

আশ্চর্য এই ছ'মাসের মধ্যে হ্যান্‌স্ একখানা খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়েনি নাকি ! না, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে শিবের নাচ নেচে সে সাড়ে ষোলো আনাই বর্বর হয়ে গেছে। জোসেফ পর্যন্ত কৌতুহল বোধ করল। বড় বড় সরল চোখ মেলে হ্যান্‌স্ জিজ্ঞাসা করলে, অপরাধ ? ইন্‌ফিডেল ?

আগুন-ঝরা গলায় ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, শেম্ ! তোমার লজ্জা করল না ? ক্রিশ্চিয়ানিটি আর ইয়োরোপের সমস্ত মর্যাদা তুমি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছ। সেজন্যেই তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল—বাট দ্য ল ইজ টু লিবারাল !—রিভলভারটাকে তেমনি বাগিয়ে রেখে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, কিন্তু সেজন্য তোমাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। তুমি শত্রু।

—শত্রু ? কার ? এই ডোঙার ?—হ্যান্‌স্ হেসে উঠল।

—না, ইণ্ডিয়ার। ইণ্ডিয়া ইজ নাউ অ্যাট্ ওয়ার উইথ্ জার্মানী। চলো, দেরি কোরো না।

—আমি ভারতবর্ষের শত্রু ! হাউ লাভলি ! হ্যান্‌স্ বিষণ্ণ হাসি হাসল : থ্যাঙ্ক ইউ। চলো—

শিবের বেশেই হ্যান্‌স্ মোটরে এসে উঠল। ঘৃণায় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থুথু ফেললেন ডোনাল্ড্‌স্, একটা বিচিত্র পিচ্ছিল হাসি খেলে যেতে লাগল জোসেফের পুরু পুরু কালো ঠোঁট দুটোতে।

অন্নহীন দরিদ্র ভারতবর্ষ তাকিয়ে রইল বিলীয়মান গাড়িটার দিকে—নির্বাক বেদনায় তার দৃষ্টি অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।

লোকটার সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নইলে পথে যেতে এমন একটা কাণ্ড করে বসতে পারে !

অপরাধের মধ্যে পথে গাড়িটা এক জায়গায় থেমেছিল। সেখানে খুব ঘটা করে কালী-পূজো হচ্ছে। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত গাড়ি থেকে নেমে পূজামণ্ডপের দিকে এগিয়ে গেলেন, ভক্তিভরে দাঁড়ালেন সেখানে।

হ্যান্‌স্ জিজ্ঞাসা করলে, এ কী ?

পাশের সশস্ত্র গুর্খাটি বুঝিয়ে দিলে, যুদ্ধজয়ের কামনাতে এখানে কালীপূজো করা হচ্ছে। টাকা দিয়েছেন গবর্নমেণ্ট—ম্যাজিস্ট্রেট নিজে এর একজন প্রধান উদ্যোক্তা।

—তাই নাকি ? লাভ্‌লি !—হ্যান্‌সের নীল চোখ দুটো একবার ঝকঝক করে উঠল : তোমার জলের বোতলটা দাও তো, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

সরল মনে গুর্খা তার ফ্লাস্কটা তুলে দিলে হ্যান্‌সের হাতে। কিন্তু জল খেলো না হ্যান্‌স্‌, তার বদলে একটা কেলেঙ্কারি করে বসল। বোঁ করে তার হাত থেকে উড়ে গেল ফ্লাস্কটা —একবারে অব্যর্থ লক্ষ্য। বিশ্রী শব্দ করে কালীমূর্তিটার মাথাটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ল মাটিতে, ঘটে গেল একটা খণ্ডপ্রলয়।

নিমেষের মধ্যে একটা উল্কার মতো মোটর থেকে মাটিতে যেন উড়ে পড়ল হ্যান্‌স্‌। উন্মাদ ছন্দে শিবের গাজন নাচতে লাগল : নাউ আই অ্যাম এ ট্রু এনিমি অ্যাণ্ড এ ট্রু ইয়োরোপীয়ান। অ্যাম আই নট ?

ইতিহাস

খোলা জানলা দিয়ে দেখা যায় মাঠের ওপারে ধূ ধূ বালুচর। সন্ধ্যার রোদ তার ওপরে রাশি রাশি রক্ত ছড়িয়েছে। আসন্ন শরৎ বালুচরের ওপরে কাশের বনে জাগিয়েছে প্রাণের সাড়া। শরতের লঘু মেঘ যেন মাটিতে ফুল হয়ে ফুটেছে।

নদী চোখে পড়ে না, কিন্তু মিষ্টি বাতাস দূর থেকে জলের ছোঁয়াচ বয়ে আনে। বাংলা দেশের গন্ধ—ভিজে মাটির গন্ধ। লিখতে লিখতে অমরেশ উন্মনা হয়ে গেলেন, কলমের ক্যাপটা বন্ধ করে তাকালেন দিগন্তের দিকে। বর্তমানের ছোট গণ্ডি পার হয়ে মনটা অবলুপ্ত অতীতের মধ্যে ফিরে চলে গেছে।

বাতাসে ফর্‌ ফর্‌ করে উঠছে পাণ্ডুলিপির পাতা। ঐতিহাসিকের সত্য-সন্ধানী দৃষ্টির কাছে বহুযুগের যবনিকাটা সরে গিয়ে ছবির মতো দেখা দিয়েছে সপ্তম শতাব্দীর বাংলা। গৌড়বঙ্গের ইতিহাস লিখছেন অমরেশ :

"আজ আমরা নিজেদের ভুলিয়া গিয়াছি। আজ বৃহত্তর আর্যাবর্ত গ্রাস করিয়াছে পঞ্চ গৌড়কে, গ্রাস করিয়াছে তাহার সংস্কৃতিকে, মুছিয়া দিয়াছে তাহার শৌর্যের জ্বলন্ত ইতিবৃত্তকে। একদিন ছিল যেদিন বাঙালী নিজেকে হারাইয়া আর্য-সভ্যতার তরঙ্গে ভাসিয়া যায় নাই। যে গৌড়েশ্বরের মস্তকে বরুণছত্র শোভা পাইত, সমুদ্র যাহার সৈন্য ছিল, যাহার ঝাণ্ডা নিশানে মীনাঙ্ক-চিহ্ন, মহেশের শূলাঙ্ক লেখা, আর্য পুরাণে তাহার উল্লেখ কোথায় ? যে গৌড়ীয়েরা কাশ্মীরে অভিযান করিয়া রামস্বামীর বিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তাহাদের অতুল বীরত্বের কথা আমরা কয়জনে মনে করিয়া রাখিয়াছি ? 'গৌড়-ভুজঙ্গ' শশাঙ্ক নরেন্দ্রাদিত্যের যে অজেয় কাহিনীর পদভরে একদিন তাম্রলিপ্ত—"

একটা দমকা বাতাসে পাণ্ডুলিপির তিন-চারটে পাতা একসঙ্গে উড়ে গেল।

কিন্তু অমরেশ ভাবছিলেন তাম্রলিপ্তের কথাই। এই তো তাম্রলিপ্তের দেশ। স্বাধীন বাঙালীর অশ্বক্ষুরের ধুলো এখনো এর বাতাসে বাতাসে মিশে রয়েছে। ওই নদী দিয়েই

হয়তো একদিন রাশি রাশি শাদা পাল উড়িয়ে বীরগর্বে বাঙালীর নৌবহর ভেসে যেত। গৌড়ীয় বাহিনীর হাজার মশালের আলোয় চোখে ধাঁধা লাগত রাজ্যেশ্বর হর্ষবর্ধনের।

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। নদীর চরে হাল্‌কা মেঘ-বরণ শাদা কাশ ফুলে ঝোড়ো মেঘের কালো রঙ ধরল। একটা লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঢুকল প্রণতি।

অমরেশ চুপ করে বসেছিলেন। সমস্ত চেতনার ভেতর অস্পষ্ট প্রতিধ্বনির মতো ভেসে আসছে অতীতের কণ্ঠস্বর। প্রণতির পায়ের শব্দে তাঁর ধ্যান ভেঙে গেল।

—এখনো লিখছ বাবা?

অমরেশ হাসলেন: না মা, লিখছি না। ভাবছিলাম।

টেবিলের উপরে লণ্ঠনটা রেখে একটা টুল টেনে নিয়ে বসল প্রণতি। ক্ষুণ্ণ অনুযোগের স্বরে বললে, তুমি দিনরাত ভাবো বাবা, বড় বেশি ভাবো।

তেমনি শান্ত হাসিটুকু অমরেশের মুখে লেগে রইল।

—ভাবনা ছাড়া আর কী করব বল্‌। বাইরে যখন পথ বন্ধ তখন মনের মধ্যেই ইচ্ছে মতো চলে বেড়াই।

—না, এত ভাবতে হবে না। এমন করে তোমাকে লিখতেও হবে না বাবা। ভাবতে ভাবতে এই তিন মাসের ভেতর চুলগুলো সব তোমার শাদা হয়ে গেল।

—চুল শাদা হয় বয়সের নিয়মেই, শুধু ভাবনার জন্যে নয়—স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অমরেশ তাকালেন প্রণতির দিকে। শুভ্র কপালে সবুজ রঙের টিপটি জ্বলজ্বল করছে। কালো চোখে সস্নেহ অনুযোগ। টেবিলের ওপরে রাখা ছোট হাতখানির সুকুমার আঙুলগুলিতে লালিত্যের ছন্দ। এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়েই মনে পড়ে গেল ওর মাকে। সেই চোখ, সেই কপাল, মুখের ডৌলটি হুবহু সেই রকম। অমরেশ আবার উন্মনা হয়ে গেলেন।

—আজ কতখানি লিখলে বাবা?—সাগ্রহে প্রণতি পাণ্ডুলিপিটা কাছে টেনে নিয়ে এল। উঃ, আর একটা অধ্যায় যে প্রায় শেষ করে ফেলেছ।—সশ্রদ্ধ প্রশংসায় প্রণতির চোখে যেন আলো জ্বলে উঠল: দেখো বাবা, তোমার এই বই সমস্ত দেশে সাড়া জাগিয়ে দেবে।

—না, অতটা দুরাশা আমার নেই। খ্যাতির লোভে এ কাজে আমি হাত দিইনি। আমি শুধু চাই বাঙালী নিজেকে জানুক, বাংলা দেশের সত্য রূপ—

কিন্তু কথার মাঝখানেই অমরেশ চমকে থেমে গেলেন। দূরের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হঠাৎ ধ্বনি উঠল, 'বন্দে মাতরম্‌'। সন্ধ্যার অন্ধকার শিউরে উঠল, শিউরে উঠল অমরেশের জানলার সামনে উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারাটা। তাম্রলিপ্তের ফেনিল সমুদ্র সরে গেছে দূরে, কিন্তু জনসমুদ্রে উঠেছে গর্জন।

প্রণতি উঠে দাঁড়িয়েছে। ওই 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনিতে তার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে

আশঙ্কার একটা কালো ছায়া। অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে প্রণতি দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েকটা মুহূর্ত পার হয়ে গেল নিঃশব্দে। চেয়ারটাকে একটু পেছনে ঠেলে দিয়ে নড়ে-চড়ে বসলেন অমরেশ। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেশ ফেরেনি এখনো?

অন্ধকারে দৃষ্টি রেখেই প্রণতি বললে, ওই শুনতে পাচ্ছ না? সভা করছে।

অমরেশ বললেন, হুঁ।—মুখের ওপর তিন-চারটে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল গাঢ় হয়ে। ১৯৪২ সালের অগস্ট মাস। আসমুদ্র হিমালয়ে আগুন জলে উঠেছে। খবরের কাগজে পাতায় পাতায় বিক্ষোভ আর উত্তেজনার বিবরণ, মৃত্যু আর রক্তপাতের কাহিনী। সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়েছে এখানেও, আর লোকেশ—

প্রণতি বললে, দাদা বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে বাবা। ভয়ানক খারাপ লাগছে আমার। ওকে একটু নিষেধ করে দিও তুমি।

সামনের শেল্‌ফ থেকে একটা মোটা বই টেনে নিলেন অমরেশ। পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে বললেন, কী হবে নিষেধ করে? যা করছে করুক।

—না বাবা, একটিবার নিষেধ করো তুমি—জানলার কাছ থেকে সরে এল প্রণতি: এর ফল কখনো ভাল হবে না। মানুষগুলো এমনিতেই ক্ষেপে আছে, তার ওপরে—

—তোর কথাই হয়তো সত্যি। কিন্তু সে কথা আজ ওকে বলে লাভ হবে না মা। লেখাপড়া শিখেছে, নিজের ওপরে ওর বিশ্বাস এসেছে। আজ ওকে বাধা দিতে গেলে অনধিকার চর্চা হবে আমার।

—কিন্তু বাবা—

আবার সেই 'বন্দে মাতরম্'। বহুশত কণ্ঠে স্বাধীনতার অমর-মন্ত্র মুখরিত হয়ে উঠেছে। এ ডাক শুধু মানুষের মুখ থেকে নয়—যেন বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। কী বলতে যাচ্ছিল ভুলে গেল প্রণতি। মরা-সমুদ্রে জোয়ার নেমেছে। রক্তে রক্তে রাখীবন্ধন হয়েছে কঠিন সংকল্পের, দুর্জয় প্রতিজ্ঞার।

খোলা জানলা, দেখল প্রণতি, দেখলেন অমরেশ। মাঠের পথ বেয়ে এগিয়ে আসছে শোভাযাত্রা। তাদের হাতে মশাল জ্বলছে, শত শত চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে তার লাল আলো।

আস্তে আস্তে মাঠ পেরিয়ে জনতা মিলিয়ে গেল—বহুদূরে অস্পষ্ট হয়ে গেল মশালের শিখায় শিখায় রক্ত-দীপালি, শুধু তখনো দূর থেকে ক্ষীণ রেশ আসছে: 'বন্দে মাতরম্'।

প্রণতি নিজের টুলটাতে এসে বসল। চিন্তিত ম্লান মুখে বললে, আজকের কাগজ দেখেছ বাবা?

অমরেশ বললেন, দেখেছি।

—ট্রাম জ্বলছে, স্টেশন জ্বলছে, পুলিসের গুলি চলছে। এত রক্ত আর আগুন

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে আর কখনো তো দেখা যায়নি। আমরা ভুল করিনি তো বাবা?

অমরেশ বললেন, কী জানি। কিন্তু ভেবে আর কী হবে। ভুলের মধ্যে দিয়েও সত্যকে খুঁজে পাবেই একদিন।

অমরেশ কলমটা তুলে নিলেন।

—আলোটা আরো একটু বাড়িয়ে দে তো মা, চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছি না।

আলোটা উসকে দিয়ে প্রণতি বললে, দাদা তো এখনো ফিরল না, আমি তোমার চা-ই করে আনি।

অমরেশ ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। কলমের মুখে বিস্মৃত বাংলা রেখায় রেখায় ফুটতে লাগল:

"মহারাজ চক্রবর্তী অশোকের অজেয় বাহিনী যেদিন কলিঙ্গ জয় করিতে আসিয়াছিল, সেইদিনের সেই মৃত্যুযজ্ঞে কতজন বাঙালী রক্ত দিয়াছিল, ইতিহাস তাহার উল্লেখ করে নাই। কিন্তু সেদিন এই মেদিনীপুর কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। সেদিন কলিঙ্গ সৈন্যের পুরোভাগে যাহারা প্রাণ দিয়াছিল, তাহারা বাংলারই সন্তান। কত বীরমল্ল, কত সহস্রমল্ল তাহাদের রায় বাঁশ লইয়া, তাহাদের বল্লম লইয়া সেই সংগ্রামে যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল—"

দূর থেকে তখনো শোনা যাচ্ছে 'বন্দে মাতরম্'। সেদিনের যুদ্ধোন্মাদনা সাড়া দিয়েছে বীরমল্ল-সহস্রমল্লদের উত্তর-পুরুষের রক্তে রক্তে, স্নায়ুতে স্নায়ুতে। মীনাঙ্ক-চিহ্নিত ঝাণ্ডা নিশান নেই, ত্রিবর্ণ পতাকায় ঝড়ের হাওয়া এসে দোল দিয়েছে।

তিরিশ বছর হেড্‌মাস্টারী করে আজ অবসর নিয়েছেন অমরেশ। কিন্তু অবসর নিলেও কাজ বন্ধ হয়নি। সম্পূর্ণ নতুন ভাবে পঞ্চগৌড়ের একখানা ইতিহাস তিনি লিখবেন এই তাঁর সংকল্প। এতবড় জাতি বাঙালী, এত তার শৌর্যবীর্য, অথচ বাংলা দেশের ভালো একখানা ইতিহাস নেই। বাঙালীর ছেলে বিজয়নগর রাজ্যের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বর্ণনা করতে পারে, কিন্তু নিজেদের পূর্বপুরুষ, অতীত গৌরব সম্পর্কে একটি বর্ণও তারা জানে না। কোটিবর্ষ, পৌণ্ড্রবর্ধন, মহাস্থান—কোথায় সে সব, সে সব কাদের?

বাড়িতে বসে মনের মতো করে তিনি গড়ে তুলছেন লোকেশ আর প্রণতিকে। লোকেশ গতবছর ইকনমিক্সে এম.এ. পাস করেছে। প্রণতি প্রাইভেটে বি.এ. পরীক্ষা দেবে। এই দুটি ছেলেমেয়ে নিয়েই অমরেশের সংসার। সন্ধ্যা-প্রদীপের মতো শান্ত আর স্নিগ্ধ মেয়ে প্রণতি। ঘরের কোণে বসে পড়তে ভালবাসে, ভালবাসে নিজের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে। কিন্তু লোকেশ তা নয়। ইকনমিক্সের বই পড়ে তার চোখে আগুন জ্বলে ওঠে, খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে ওলটাতে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায়, বন্য বন্দী পশুর মতো

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। দাঁতে দাঁতে চেপে বলে, উঃ, আমরা কি মানুষ!

উনিশশো তিরিশ সালে ইস্কুলের ছাত্র ছিল লোকেশ। এল লবণ আইন অমান্য আন্দোলন, এল সত্যাগ্রহ। ইস্কুলের গণ্ডী ভেঙে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, তিন মাস জেল খেটে এল। তারপর থেকেই চল্‌তি রাজনীতির ধারার সঙ্গে সে বরাবর যোগ রেখে এসেছে। পুলিসে বাড়ি সার্চ করেছে কতবার। কিন্তু অমরেশ কখনো কিছু বলেননি। তিনি বাপ, কিন্তু সেই অধিকারে ডিক্টেটারী করবার প্রেরণা তাঁর মনে জেগে ওঠেনি কোনোদিন। যে কাজ করতে চায় কাজ করতেই দাও তাকে।

কিন্তু উনিশশো বিয়াল্লিশের আগস্ট এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে। নেতৃহীন দেশের যা কিছু বিক্ষোভ ভেঙে পড়েছে সর্বনাশা মূর্তিতে। আগুন জ্বলেছে, রক্ত ঝরছে।

স্টোভ ধরিয়ে বারান্দায় চায়ের জল চাপিয়েছে প্রণতি। চটির শব্দ করতে করতে লোকেশ এসে দেখা দিলে।

—চা করছিস নতি? আমারও জল নিস।

পিঠের ওপর আঁচলটাকে তুলে নিয়ে প্রণতি উঠে দাঁড়ালো।

বললে, এত রাত অবধি কোথায় ছিলে দাদা?

লোকেশ নির্বিকার মুখে বললে, কাজ ছিল।

—কাজ? তাই বুঝি ওই 'বন্দে মাতরম্' শুনতে পাচ্ছিলাম?

—ঠিক ধরেছিস নতি। তোর মাথায় তাহলে অন্তত এক ছটাকও বুদ্ধি আছে।

—সত্যি দাদা, ঠাট্টা নয়।—প্রণতির কালো চোখ আশঙ্কায় ছলছল করে উঠল: এসব কি ভালো হচ্ছে? কাগজে দেখলাম, যেখানে-সেখানে হরদম গুলি চলছে। আর—

গুলি?—লোকেশের চোখে কী একটা একবার দপ্‌ করে ঝলক দিয়ে গেল: জানিস তো, 'ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে, মোদের আঁখি ফুটবে!'

—কিন্তু দাদা, সত্যাগ্রহের দীক্ষা কি আমরা এইভাবেই নিয়েছিলাম?

কয়েক মুহূর্ত লোকেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। স্টোভের শোঁ শোঁ শব্দে যেন বহুদূর থেকে আসা ঝড়ের গর্জন। প্রণতির চোখে মুখে স্টোভের নীলাভ আলো প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে। বাইরে ঘন হয়ে উঠেছে স্তরে স্তরে অন্ধকার। রাত্রির হাওয়ায় মাঠ থেকে ভেসে আসছে পাকা ফসলের গন্ধ। প্রণতির প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে লোকেশ জানাল, আমি বাবার ঘরে যাচ্ছি, তুই আমার চা নিয়ে আসিস।

কেটলিটার দিকে বোবা চোখ মেলে একা বসে রইল প্রণতি। সব দিক থেকেই তার হয়েছে মরণ। বাবা তো নিজের মধ্যেই তলিয়ে আছেন, স্বাধীন বাংলার, অতীত বাংলার

ইতিহাস লিখছেন তিনি। বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে না ঘটছে সে দিকে দৃষ্টি নেই তাঁর, মনও নেই। মোটাসোটা বইগুলোর তত্ত্ব আর তথ্যের সমুদ্র মন্থন করে অমৃতের সাধনা করে চলেছেন তিনি।

আর লোকেশ চলেছে নিজে দুরূহ প্রতিজ্ঞার সংশয়াকীর্ণ বন্ধুর পথ দিয়ে। চারদিকের পৃথিবী ঘিরে একটা আসন্ন দুর্যোগ থম থম করছে, আর সব কিছুর কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে সে। প্রণতির ভয় করছে—ভয়ানক ভয় করছে। কেবলই মনে হচ্ছে যে-আগুনে লোকেশ ইন্ধন দিচ্ছে, সে আগুন তাকেই এবারে গ্রাস করবে।

কয়েক বছর আগেকার কথা মনে পড়ল প্রণতির। মোটরে করে ওরা বেড়াতে গিয়েছিলো হিমালয়ের বুকে। সেখানে দু'পাশের খাড়া পাহাড় কেটে তিস্তার তীক্ষ্ণগামী নীলধারা ছুটে চলেছে, সেখানে একটা ঝোরার পাশে খিচুড়ি রান্না করে খেয়েছিল ওরা। সামনে পেছনে কালো পাহাড়—ঘন অরণ্যে রোমাঞ্চিত। মাথার ওপর উপড়ে-পড়া শালের গাছ বিরাটমূর্তি পাথরের চাঙাড়ে আটকে আছে। পাহাড়ের চূড়োয় গাছের ডালে বসে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে ধনেশ পাখি। বীভৎস দুর্গম জঙ্গলে বাঘ আর ভালুকের রাজত্ব।

সকলের নিষেধ না শুনেই শুকনো ঝোরার পাথর কাটা পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠে গিয়েছিল লোকেশ। বুনো পাহাড়ে ওঠা সহজ, কিন্তু নামা কঠিন। পায়ের তলা থেকে সর্ সর্ করে পাথর সরে যাচ্ছে, গুম্ গুম্ করে আছড়ে পড়ছে পাঁচশো ফুট নিচে। লোকেশ নামতে পারছিল না। তারপর একবার পা পিছলে গেল তার। সকলে আর্তনাদ করে উঠল, দারুণ ভয়ে আর্তনাদ করে চোখ বুজল প্রণতি।

কিন্তু কপাল-জোর ছিল লোকেশের। দশ-বারো ফুট গড়িয়ে একটা গাছের শিকড় আঁকড়ে ধরে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত এড়িয়েছিল সেবারে। প্রায় দেড়-ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমের পরে যখন নিচে নেমে এসেছিল, তখন তার জামাকাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, সারা গায়ে রক্তের ছোপ।

এতটুকু দমে যায়নি সে। প্রণতিকে সস্নেহ ধমক দিয়ে বলেছিল, কাঁদছিস কেন বোকার মতো? মরতামই যদি, কী আর ক্ষতি হত তাতে? 'ফলেন্ এঞ্জেলে'র মতো ওপর থেকে নিচে আছড়ে পড়তাম, একটা গ্লোরিয়াস্ ডেথ্ দেখতে পেতিস। মরতে হয় তো অমনি করেই মরব। বিছানায় শুয়ে কাশতে কাশতে 'গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম'—ও আমার পোষাবে না।

সেই লোকেশ। 'ফলেন্ এঞ্জেলে'র মতো সে মরবে। ভালো হোক, মন্দ হোক, তার পথ সঙ্কটের দিকে। বিচার-নির্বিচারের প্রশ্নই ওঠে না। লবণ-অমান্য আন্দোলন, বোমার যুগ। 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবারে'র পথ ভেঙে সে এগিয়ে যাবে। সেদিন

ঝর্ণার পথ বেয়ে পাহাড়ে ওঠবার সময় সে কারো নিষেধ শোনেনি, আজও শুনবে না।

কেটলির জলটা টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে—বাইরে এম্‌নি করে ফুটছে উত্তেজিত ভারতবর্ষের প্রাণ। স্টোভের চাবিটা খুলে দিলে প্রণতি—একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাসের মতো টানা শব্দ করে স্টোভটা নিবে গেল।

জানালার ওপারে সন্ধ্যাতারাটা ঝলমল করছে। অমরেশ লিখছিলেন:

"অষ্টম শতাব্দী। অরাজক বাংলাদেশে মাৎস্যন্যায় চলিতেছে। ভারতবর্ষের চারিদিক হইতে মাংসলোভী গৃধিনীর মতো শক্তিগুলি দেশের উপরে হানা দিতেছে। অবিচার, অত্যাচার ও নিপীড়নে মানুষ হাহাকার করিতেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে দেশের গণশক্তি জাগিয়া উঠিল, এই অরাজকতার অত্যাচার দূর করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। বপ্যটের পুত্র গোপালদেব জনগণের প্রতিনিধি হইয়া বাংলার সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। তাম্রশাসনে তাঁহার মহিমা কীর্তিত হইল: প্রকৃতিপুঞ্জ রাজলক্ষ্মীর প্রসারিত কর তাঁহার হস্তে ধারণ করাইল, দিঙ্মণ্ডল-প্রসারিত তাঁহার যশ পূর্ণিমা-রাত্রির জ্যোৎস্নাতুল্য অম্লান শুভ্রতায় পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল—"

লোকেশ ঘরে ঢুকল। চটির শব্দে মুখ তুলে তাকালেন অমরেশ।

—কতখানি লেখা হল বাবা?

—বেশি আর এগোতে পারলাম কই। এত লেখবার আছে, এত ভাববার আছে—মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে অমরেশ খাতাটা বন্ধ করে ফেললেন। প্রণতির কণ্ঠে যে আন্তরিকতা আর আগ্রহের সুর লোকেশের মধ্যে তা নেই। যেন নিতান্তই বাপের সঙ্গে একটা সহজ ভদ্রতা রক্ষা করে চলে সে। অমরেশ জানেন, অতীতকে লোকেশ শ্রদ্ধা করে না। প্রত্নতত্ত্বের অরণ্যে জাতীয় ঐতিহ্যের সন্ধান করে বেড়ানো তার কাছে নিছক আত্মবিলাস বলেই মনে হয়। ইকনমিক্সের ছাত্র সে, তার কাছে বর্তমানের দাবিটাই অগ্রগণ্য। নতুন আশা, নতুন আদর্শ, নতুন সংকল্প।

অমরেশ বললেন, বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ছোট টুলটার ওপরে লোকেশ বসল। তারপর সঙ্কুচিত ভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন অমরেশ। কয়েকবার নাড়াচাড়া করলেন্ পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, কী করতে চাও তুমি?

—কিসের কথা বলছেন?

—রাজনীতির। যে ঝড় তুলছ, তার মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে তোমার?

লোকেশ হাসল: ঝড়ের কাজ সে করবেই। যার শক্তি আছে ঝড়ের সঙ্গেই চলবে,

আর যে পারবে না সে হাওয়ায় উড়ে যাবে। আমার মতো এক-আধজনের কথা তো ভাবিনি।

—তা বলছি না—অমরেশ আস্তে আস্তে কলমটা টেবিলের ওপরে ঠুকতে লাগলেন : সকলের কথা, দেশের কথা। যা করতে যাচ্ছ, তার কি এখন সময় হয়েছে ?

—সময় ?—লোকেশ তেমনি মৃদু হাসল : সময় তো আপনা থেকে আসে না বাবা, তাকে তৈরি করে নিতে হয়। ভুল যদি করি, সেও ভালো। কিন্তু এই লজ্জা আর অপমানের মধ্যে স্থির থাকতে পারছি না।

—হুঁ—অমরেশ এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন : কিন্তু এই পথই তুমি বেছে নিলে শেষ পর্যন্ত। আরো তো অনেক কিছুই করবার ছিল তোমার। লেখাপড়া, কাজকর্ম—

লোকেশের চোখের সামনে অমরেশের পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। জ্বলজ্বল করছে বলিষ্ঠ অক্ষর : "সেই দারুণ দুর্দিনে দেশের গণশক্তি জাগিয়া উঠিল। এই অরাজকতার অত্যাচার দূর করিবার জন্য—"

লোকেশ বললে, সারাজীবন আপনি ইতিহাসের চর্চা করেছেন বাবা। আপনি তো জানেন, এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন নিজের জন্যে যা-কিছু সব মিথ্যে হয়ে যায়, তার চাইতে ঢের বড় কাজের ডাক আসে। আমি জানি, এ কথা আপনি মনের থেকে বলেননি।

অমরেশের মুখের ওপর দিয়ে একঝলক রক্ত খেলা করে গেল। যা বলতে যাচ্ছিলেন, বলতে পারলেন না। লোকেশ ছোট্ট একটুখানি খোঁচা দিয়েছে তাঁকে। স্বার্থপরের মতো ব্যক্তিগত ভালো-মন্দের কথা ভাববার দিন আর নেই : বুড়ো হয়ে গেছেন অমরেশ, ক্লান্তি আর অবসাদের বোঝা এসে তাঁকে ঘিরে ধরেছে। আজ তিনি কামনা করেন একটি পরিপূর্ণ সংসার। গৃহী হয়েছে লোকেশ, ঘর বেঁধেছে, পরিজন মুখরিত একটি সংসারের মধ্যে সহজ হাসি আর আনন্দের আলোতে তাঁর অন্তিম দিনগুলো মধুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে মন লোকেশের নয়—বৃহত্তর জগৎ, বৃহত্তম সত্যের ইঙ্গিত এসেছে তার কাছে।

অমরেশ ক্লিষ্টভাবে বললেন, বেশ।

গভীর সহানুভূতিভরে লোকেশ বাপের মুখের দিকে তাকালো। অমরেশকে সে বুঝতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে কোথায় তাঁর ব্যথা। কিন্তু কী করতে পারে সে। আজ নীড়ের মোহ নেই, দিগন্তের দাবি এসেছে। ঘরের মঙ্গলশঙ্খ তার জন্য নয়, সন্ধ্যার দীপালোকও তার নিভে গেছে।

ঘরে একটা দুঃসহ স্তব্ধতা। কে কী বলবে বুঝতে পারছে না। অমরেশ মাথা নিচু করে টেবিলের ওপর আঁচড় কাটতে লাগলেন, যেন লোকেশের মুখের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছে না তাঁর। লোকেশ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে। একটা সুতীব্র অস্বস্তি দুজনকেই পীড়িত করে তুলছে—আর বাতাসে বাজছে খস খস করে কাগজ

ওড়বার শব্দ।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকল প্রণতি। গুমোট একরাশ মেঘ যেন ঘরের মধ্য থেকে কেটে গেল।

নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন দুজনে।

প্রণতি বললে, তোমার চা ঠিক হয়েছে বাবা?

অমরেশ জবাব দিলেন না, যেন কথাটা তিনি শুনতেই পাননি।

এক নিঃশ্বাসে চা শেষ করে লোকেশ উঠে দাঁড়ালো।

—আমি একটু বেরুচ্ছি নতি।

—এখন? এত রাতে?—প্রণতির কালো চোখে আশঙ্কার পাণ্ডুর ছায়া ঘনালো: কোথায় চললে তুমি?

—কাজে।—লোকেশ সস্নেহে হাসল: 'ডু অর্ ডাই।' আমার জন্যে ভাবিসনি নতি।

প্রণতির বুকের রক্ত ছলছল করে উঠল মুহূর্তে: কখন ফিরবে?

—জানি না। জানি না হয়তো আর ফিরব কিনা। আজ অনেককেই অনেক কিছু দিতে হবে, হয়তো আমার ক্ষতিও তোদের সইবে।

লোকেশ আর দাঁড়ালো না। ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল বাইরে, অন্ধকার মাঠের পথে তার চটির শব্দটা মিলিয়ে গেল।

প্রণতি আর্তনাদ করে উঠল: দাদা কোথায় গেল বাবা?

অসহায়ের মতো মাথা নাড়লেন অমরেশ—তিনি জানেন না। শুধু প্রণতির চোখে পড়ল, তাঁর আঙুলগুলো থর থর করে কাঁপছে—লিখতে গিয়ে কাগজের ওপরে একটা আঁচড় পড়ে গেল।

অনেক রাত্রে অমরেশের ঘরের আলো নিভে গেল। কিন্তু প্রণতির চোখে ঘুম নেই, অতন্দ্র চোখ মেলে উৎকর্ণ হয়ে জেগে আছে সে। কখন ফিরবে লোকেশ, দরজায় কড়া নাড়বে, দরজা খুলে দিতে হবে তাকে। কিন্তু কোথায় গেল লোকেশ, কী করতে গেল?

কালপুরুষের অতন্দ্র পাহারায় রাত্রির ভারমন্থর প্রহরগুলো চলেছে বয়ে। বাতাসে পাকা ফসলের গন্ধ। দূর বনান্ত কালি মেখে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে বাতাস যেন কী একটা কথা অনবরত বলে চলেছে, আসমুদ্রহিমাচলের সমুদ্বেল প্রাণ-তরঙ্গ যেন বাণীমুখর হয়ে উঠেছে গাছের পাতায় পাতায়। চোখের জলের মতো শিশির পড়ছে টপ—টপ—টপ—

আর অমরেশ স্বপ্ন দেখছেন বিস্মৃত তাম্রলিপ্তের। স্তব্ধ বালুবেলার ওপরে আছড়ে

পড়ছে ফেনায়িত নীল তরঙ্গ। 'গৌড় ভুজঙ্গ' শশাঙ্ক গুপ্তের রণতরীর মাথার উপরে উড়ছে শূলাঙ্ক-নিশান। বরুণছত্রধারী মহারাজার তলোয়ারের দীপ্তি সমস্ত আর্যাবর্তের ওপরে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। স্বাধীন বাংলা—বিজয়ী বাংলা। পায়ের নিচে চূর্ণ হয়ে গেছে মালব, জ্বলছে নালন্দার বিহার, আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বোধিক্রম। বেদ—ব্রাহ্মণ—রাজা। হিন্দুশক্তি সহস্র শিখায় গৌড়ের আকাশকে আলো করে দিয়ে জ্বলছে অনির্বাণ যজ্ঞাগ্নির মতো।

—'বন্দে মাতরম্'—

চমকে জেগে উঠল প্রণতি—জেগে উঠে বিছানার ওপরে বসলেন অমরেশ। মাঠের ওপারে থানা, বন্দর। সেদিক থেকে সহস্র কণ্ঠে কোলাহল উঠছে। 'বন্দে মাতরম্'—'বন্দে মাতরম্'। কী হচ্ছে ওখানে? ওখানে কি প্রলয় চলেছে? আস্তে আস্তে আকাশটা লাল হয়ে উঠল—বন্দরে আগুন লেগেছে।

আগুনের শিখা আর চিৎকার—আকাশ-বাতাস-পৃথিবী কাঁপছে। দুম্ দুম্ করে বন্দুকের শব্দ।

ঘর থেকে পাগলের মতো ছুটে এল প্রণতি—আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ল অমরেশের পায়ের কাছে: বাবা, দাদা কোথায়, দাদা?

অমরেশের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে—শুধু বন্দর নয়, সমস্ত পৃথিবীটাই তাঁর কাছে রাঙা হয়ে গেছে আগুনের রক্তাভ শিখায়। নিঃশব্দে প্রণতিকে তিনি বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

দুর্যোগ আর দুঃস্বপ্নের রাত্রি ভোর হয়ে গেল। পরদিন এল দারোগা, এল পুলিস। বাড়ি সার্চ করলে, জবানবন্দি নিলে অমরেশের। লোকেশ ফিরল না।

লোকেশ এল তিনদিন পরে—শহর থেকে। গোরুর গাড়িতে করে তাকে আনা হয়েছে রাশি রাশি কলাপাতায় মুড়ে। সারা গায়ে কয়লার গুঁড়ো মাখা—যাতে পচে না যায়। একটা উৎকট গন্ধে তার কাছে এগোনো যায় না। শব-ব্যবচ্ছেদে সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত, কালো রক্ত আলকাতরার মতো এখানে ওখানে শুকিয়ে রয়েছে। বুকের বাঁ দিকে বুলেটের প্রকাণ্ড ক্ষত-চিহ্নটা হাঁ করে আছে—রক্তহীন দেহের নীল রঙের বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ডটার আভাস।

নির্বাক শোক-ম্লান মুখে দু-একজন করে গাঁয়ের লোক এগিয়ে এল, কেউ দুটো ফুল ছড়িয়ে দিলে, কেউ আনল চন্দন কাঠ। স্বাধীন বাংলার সৈনিকদের দেহধূলির সঙ্গে লোকেশের চিতাভস্ম মিলিয়ে গেল।

লোকেশ বলেছিল, তার ক্ষতিও হয়তো সইবে। ক্ষতি সইল কিনা কে জানে, কিন্তু দিনের পর দিন কাটতে লাগল অব্যাহত আর নির্ভুল নিয়মে। প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজন,

প্রতিদিনের ছোট বড় অসংখ্য দাবি-দাওয়া—সব মিথ্যে হয়ে যায় তবু বাঁচবার প্রয়োজন থাকে। সামনে যখন দেখা যায় কিছুই নেই, শুধু দুপুরের খররৌদ্রে কাঁপছে জলন্ত মরীচিকা, দিকে-দিগন্তে অর্থহীন শূন্যতা, তখনো রক্তাক্ত-ক্লান্ত-চরণে পা ফেলে এগিয়ে চলে মানুষ।

কী আছে আর অমরেশের জীবনে, কিসের জন্যে তাঁর প্রত্যাশা, তাঁর স্বপ্ন। লোকেশ আর ফিরবে না কোনোদিন। বৃহত্তর পৃথিবীর আহ্বান কেড়ে নিয়েছে তাকে, ছিনিয়ে নিয়েছে চিরদিনের মতো। অমরেশের পৃথিবী থেকে চলে গেছে লোকেশ, চলে গেছে শৃঙ্খলিত অপমানের গণ্ডিসীমার বাইরে।

কিন্তু সত্যই কি লোকেশ নেই? বহু লোকের জলন্ত চোখে, বহু মানুষের দৃষ্টির দীপ্ত-শিখাতে তা হলে কাকে দেখা যায়? কার প্রতিজ্ঞা বহু পেশীতে আজও আলোড়িত হয়ে উঠছে? একবার হয়তো ভুল হয়েছে আমাদের, একবার হয়তো হার মেনেছি আমরা। কিন্তু সেইখানেই কি শেষ? বারে বারে এমনি অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা পদচিহ্ন এঁকে যাই—আমাদের রক্তাক্ত পদলেখা জলজ্বল করে জালিয়ানওয়ালায়, সেবাগ্রামে, কর্ণফুলীর তীরে, বুড়ী-বালামের অরণ্যে, মেদিনীপুরের রাঙা মাটিতে। ভাবীকালের পথনির্দেশ সেই রক্তলিপিতে।

অমরেশের বয়স বেড়েছে। ঝুলে পড়েছে চোখের চামড়া, মাথার চুলে আরো বেশি করে ছড়িয়েছে শুভ্রতার আভরণ। কিন্তু নতুন আশ্বাস ও আশায় বুক ভরে উঠছে তাঁর। বাংলাদেশের ইতিহাস লিখে চলেছেন অমরেশ:

"জয়-পরাজয়, দুঃখ-দৈন্য-মৃত্যুর মধ্য দিয়া আগাইয়া চলে বাংলার জীবন। পাল বংশের শেষ শিখা নিভিয়া আসে, কুমার পাল, গোবিন্দ পালের মূর্তি মহাকালের বিস্মৃতি-যবনিকার অন্তরালে তিরোহিত হয়। বিক্রমশিলা ইতিহাসের পাতা হইতে মুছিয়া যায়, ওদন্তপুর ভুলিয়া যায় তাহার বর্ণগৌরব। স্ফটিক-মণ্ডিত জগদ্দল-বিহারের কোনো নির্দেশ বরেন্দ্রভূমির বুকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দুর্দিন, দুঃস্বপ্ন, মাৎস্যন্যায় দাক্ষিণাত্যের সেনবংশ—"

প্রণতির মুখে হাসি নেই, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সারাক্ষণ কাঁদে লোকেশের জন্যে। তার লেখার টেবিল, তার পড়বার বইগুলো, ব্র্যাকেটে তার জামা কাপড়। তার ফাউণ্টেন পেনের কালি এখনও শুকোয়নি। ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে সে যে দম দিয়ে গিয়েছিল, তার জোরে ঘড়িটা আজও চলছে। সব আছে, লোকেশ নেই, 'ফলেন্ এঞ্জেলের গ্লোরিয়াস ডেথ' দেখেছে প্রণতি—দেশের জন্যে নিজেকে বলি দিয়েছে সে। তবু মনে এক মুহূর্ত শান্তি নেই, তবু প্রতিক্ষণ বুকের ভিতরের ক্ষত চুঁইয়ে রক্ত পড়ে।

কিন্তু প্রতিদিনের দাবি আছে—প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজন আছে। চোখের জল মুছে চায়ের পেয়ালা নিয়ে যথাসময়ে সে এসে দাঁড়ায় অমরেশের সামনে:

—তোমার চায়ে আর একটু চিনি দেব বাবা?

অমরেশ আস্তে একটা চুমুক দিয়ে বলেন, না।

—কয়েকটা ফল কেটে আনব?

লেখার খাতার দিকে চোখ রেখে তেমনি অনাসক্ত ভাবেই জবাব দেন অমরেশ: থাক এখন।

—আজ কতটা লিখলে বাবা?

জানালা দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকান অমরেশ: পালযুগ প্রায় শেষ করে আনলাম। তুই শেলফ্ থেকে ওই বইটে দিয়ে যা তো মা, The Last Monarchs of the Pala Dynasty in Bengal—

সেই কথাবার্তা—সেই পুরোনো দিনগুলোর পুনরাবৃত্তি। সব আছে অথচ কিছুই নেই। যান্ত্রিক জীবন, যান্ত্রিক মুহূর্ত। নিঃশব্দে চলে আসে নিজের ঘরে প্রণতি, তারপর টেবিলে বসে কাগজ আর তুলি টেনে নেয়। দিগন্তে অরণ্যময় কালো পাহাড় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। বহু নীচে তিস্তার নীলধারা—মৃত্যুহিম প্রবাহ চলেছে পাথর কেটে, করকরে বালির মধ্য দিয়ে। আর শুকনো ঝোরার পথে একান্ত একখানা পাথরের চাঙাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে লোকেশ। হাওয়ায় তার জামা উড়ে যাচ্ছে, তার মুখে ঝকঝক করছে দিনান্তের সূর্যকিরণ। 'দেবদূতের মৃত্যু'! হাতের তুলি থেমে যায় প্রণতির। চোখের জল পড়ে ছবিটা নষ্ট হয়ে গেছে।

দিনের পর দিন কাটে। যে আগুন জ্বলেছিল তার শিখা আস্তে আস্তে নিভে যায়। অকালবোধনের পূজা শেষ হয় ব্যর্থ-বলিতে। বুকের মধ্যে ঘা মারে তীব্র আক্রোশ। কিন্তু কী যেন ভুল হয়ে গেছে, কী একটা অপরাধে ব্যর্থ হয়ে গেছে সমস্ত চেষ্টা। এত সংগ্রাম—এত রক্ত—ভাবীকালের পূর্ণতর সংশোধনের জন্যেই হয়ত প্রতীক্ষা করে আছে।

লোকেশের সঙ্গীরা জেল থেকে, শহর থেকে একে একে ফিরে আসছে। তিন মাস পরে এল নিতাই, প্রসন্ন আর জামাল। নিতাইয়ের হাঁটুর নিচে ঘা শুকিয়ে গিয়ে একটা কালো পোড়া চিহ্ন চকচক করছে। বন্দুকের দুটো গুলি—একটা লেগেছিল তার পায়ে, আর একটা লোকেশের বুকে। সেই কাল-রাত্রিতে লোকেশের পাশেই দাঁড়িয়েছিল নিতাই।

নিতাই গজরে ওঠে।

—দিদিমণি, সেই ফর্সা বেঁটে দারোগাটা—

প্রণতি বলে, থাক নিতাই। যে নিমিত্ত, তার উপরে রাগ করে লাভ নেই।

—দিদিমণি!

—মিথ্যে মন খারাপ করো না নিতাই। কত কাজ তো করবার আছে। আত্মহত্যা করো না।

নিতাই বোঝে, তবু বুঝতে চায় না। গুলি খেয়ে তারই বুকে আহত পাখির মতো লুটিয়ে পড়েছিল লোকেশ। দু'হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে নিতাই অনুভব করেছিল, ফোয়ারার মতো ধারায় ধারায় গরম রক্ত তাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। আবার বন্দুকের শব্দ। হাঁটুতে একটা অসহ্য যন্ত্রণা। তারপরে আর কী হয়েছিল মনে পড়ে না।

অমরেশ কোনো দিকে তাকান না—তাঁর ইতিহাস রচনা চলেছে অব্যাহত ভাবে। মাথার সাদা চুলগুলো আলোতে চিকচিক করে, কপালে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম জমে ওঠে, লিখতে লিখতে টনটন করে আঙুলগুলো। কিন্তু অমরেশের লেখার বিরাম নেই, যেন জীবনে এ ছাড়া কোথাও কোন উদ্দেশ্য নেই তাঁর। বাইরের পৃথিবী মুছে গেছে তাঁর দৃষ্টি থেকে। অতীতের কঙ্কালাস্তীর্ণ শ্মশানের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট প্রদোষালোকে এগিয়ে আসছে দলে দলে ছায়ামূর্তি—পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে, মহাস্থান থেকে, তাম্রলিপ্তের সমুদ্রতট থেকে, পদ্মার পরপারে বিক্রমপুরের ভোজনবর্মদেবের রাজধানী থেকে। সেই সৈনিকদের দলে লোকেশকেও যেন চেনা যায়।

প্রণতি পড়ার বই নিয়ে থাকে, কখনও বা থাকে তার ছবি নিয়ে। 'দেবদূতের মৃত্যু' শেষ হলো না এখনো। একখানা কাগজ ছেঁড়ে, আর একখানায় নতুন করে রেখাপাত করতে হয়।

কালো পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে লোকেশ, মুখের ওপরে সূর্যালোক। এই জায়গাটাই কিছুতে ঠিক হচ্ছে না। বাটিতে সোনালী রঙের মধ্যে তুলি ডুবোতে গিয়েই প্রণতি চমকে গেল।

গুর—গুর—গুর—

জানলার বাইরে আকাশটায় কে যেন নিকষ কালো রঙ ঢেলে দিয়েছে। দূরে কাছে বনশ্রেণী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, থমথম করছে পৃথিবী—তালগাছের পাতায় পাতায় বিদ্যুৎ চমক দিয়ে যাচ্ছে।

দিগন্তে হঠাৎ কে হাহাকার করে কেঁদে উঠল। হাজার হাজার ডাইনী যেন একসঙ্গে মাথার চুল ছিঁড়ে অভিসম্পাত দিচ্ছে। জানালাটা বন্ধ করবার আগেই হাওয়ায় প্রণতির ছবি উড়ে গেল, রঙের বাটিটা উপড়ে পড়ল মাটিতে।

নিজের ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে প্রণতি ছুটে এল অমরেশের কাছে। বাইরে তখন কী যে চলছে কল্পনাও করা যায় না। হাজার হাজার ডাইনীর আর্ত চিৎকারে পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিয়েছে। তাদের কালো চুল আকাশে ঝড়ের পাল তুলে উড়ে যাচ্ছে: রাশি রাশি ধুলোয় বৃষ্টির ছাটে, উপড়ে-পড়া চালে, গাছের পাতায়, দিকদিগন্ত একটা প্রলয়

স্রোতের মতো ছুটে যাচ্ছে কী একটা সর্বনাশের অভিমুখে।

অমরেশের বুকের কাছে, মড়ার মতো পাংশু মুখ নিয়ে প্রণতি বসে রইল। বাইরে কী হচ্ছে? এ কি ঝড়? এমন ঝড় প্রণতি দেখেনি কোনদিন। তাদের এতবড় দালানের এ-- পাশ ওপাশ থেকেও ঝুপ ঝুপ করে ইট খসে পড়ছে—খানিকটা চুন-সুরকির আবর্ত হাওয়ায় ঘরের মধ্যে উড়ে গেল।

প্রণতি বললে, বাবা আমরা ঘর চাপা পড়ে মরব নাকি!

অমরেশ বললেন, কী জানি।

আস্তে আস্তে বাতাসের বিক্ষোভ শান্ত হয়ে এল। জানালা খোলা যায় না, তবু একটু ফাঁক করে প্রণতি দেখলে পথঘাট কোথাও কিছু নেই—শুধু গাছের পাতা আর ডাল পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

ওপারের বন্দরটা মাটিতে শুয়ে আছে, কোথাও বা চালাহীন ঘরের কয়েকটা খুঁটো একটা নগ্ন-পরিহাসের মতো আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু নদীর দিক থেকে ও কিসের শব্দ? হু হু করে ও কী আসছে? সামনের মাঠটা থই থই করছে জলে। তাম্রলিপ্তের সমুদ্র—মরাগাঙ কি আজ উতরোল হয়ে উঠল?

চারিদিক থেকে হৈ হৈ করে মানুষ ছুটে আসছে। গেল, গেল—সব গেল। ঝড় যা করবার করছে, বানে আর কিছু বাকি রাখবে না। পোটলাপুঁটলি যে যা পেরেছে কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে আসছে অমরেশের বাড়ির দিকেই। গ্রামে এই একমাত্র দালান। এই একমাত্র বাড়ি, সেখানে হয়ত আসন্ন অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

হায় হায় করতে করতে মানুষ ছুটে এসে উঠেছে অমরেশের বারান্দাতে। এক নয়, দুই নয়, দুশো—আড়াইশো। চোখের দৃষ্টিতে উন্মত্ততা। সমস্ত দালানটা গিজগিজ করছে নানা স্তরের পুরুষ, নারী, শিশু, বালিকা, ভদ্র-অভদ্রে।

—রক্ষা করো, রক্ষা করো ভগবান!

সব ঘরগুলো খুলে দিলে প্রণতি। একতলা, দোতলা, কোনখানে আর মানুষের দাঁড়াবার জায়গা নেই। কে নেই সেই দলে? নিতাই আছে, প্রসন্ন আছে, জামাল আছে। এক মাসের শিশুকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এসেছে নতুন দারোগার স্ত্রী —তার পিছনে এসেছে দারোগা। তার ইউনিফর্মের নিচে খাপে ভরা পিস্তলটা বৃষ্টিতে ভিজে ঝকঝক করছে।

—হায় হায়, সব গেল! ভগবান রক্ষা করো!

তবু ওই দারুণ দুর্যোগের মধ্যেও আড়াইশো জোড়া চোখ তীব্রভাবে এসে পড়েছে দারোগার পরিবারের দিকে। এরা কারা? এরা কেন এখানে? এখানে আসবার কী অধিকার এদের? নিতাইয়ের চোখে আকাশের বজ্রের ঝিলিক।

দারোগার ছেলেমানুষ শান্ত বউটি থরথর করে কাঁপছে। আর্তবিহ্বল তার চোখ, সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। ওদিকে আড়াইশো জোড়া দৃষ্টির আগুন যেন তার গায়ে এসে বিঁধছে বিদ্যুতের তীব্র জ্বালার মতো। বুকের মধ্যে এক মাসের শিশুটির শরীর ঠাণ্ডায় হিম হয়ে আসছে—এমন ভাবে থাকলে ও বাঁচবে না। দারোগার ভিজে পিস্তলটা কোমরের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ছে, দু'হাতে মুখ ঢেকে একটা মূর্তির মতো বসে আছে সে।

প্রণতি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দারোগার স্ত্রীকে বললে, আপনি ভেতরে এসে কাপড়টা ছেড়ে নিন। খোকার ঠাণ্ডা লাগছে।

কৃতজ্ঞ বিহ্বল চোখ মেলে দারোগার স্ত্রী নিঃশব্দে উঠে এল। দারোগা একটি কথা বললে না। বসে রইল তেমনি নীরব আর অনড় হয়ে।

বাইরে কালো জলের স্রোত—প্রলয়ের তীক্ষ্ণ ধারা। বাড়ির মধ্যে অগণিত মানুষের কোলাহল। যা গেছে তার জন্যে বিলাপ, যে এসে পৌঁছুতে পারেনি তার জন্যে হাহাকার। এবার আর কিছু থাকবে না, যাবে যাবে সব যাবে। হায় ভগবান, এ কি সর্বনাশ তুমি পাঠালে!

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কেবল অমরেশের। ঘরে আলো জ্বলছে, আর সেই পাণ্ডুলিপির ওপর তাঁর লেখা ফুটছে :

"কিন্তু এই হিংসা-দ্বেষ জর্জরিত বাংলাও আবার প্রাণ পাইবে, আবার জাগিয়া উঠিবে নূতন শক্তি লইয়া, নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া! অন্ধকার বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সূর্য দেখা দিবে। চরম সর্বনাশের পটভূমিতে, চরম দুর্গতির পরমলগ্নে সমস্ত জাতি আসিয়া দাঁড়াইবে সর্বজনীন ঐক্যের বেদীতে। যাহারা পরস্পরের বুকে আঘাত হানিতেছে—মোহে অন্ধ হইয়া, স্বার্থে আত্মবিস্মৃত হইয়া—সেদিন সর্বগ্রাসী মৃত্যুর হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইতে গিয়া তাহাদের হাতে হাতে রাখী বাঁধিতে হইবে। দেশে দেশে ইতিহাসের ইহাই শিক্ষা—"

বাইরে সুতীব্র জল-গর্জন। ভেতরে কি রাখী-বন্ধনেরই মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যাচ্ছে?